ত্রিপুরা থিয়েটার

TRIPURA THEATRE 2023

UGC CARE LISTED JOURNAL

TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE TRIPURA THEATRE

ত্রিপুরা থিয়েটার-এর সভাগৃহে বাংলাদেশের প্রতিনিধি

নাটকের শেষে কুমিল্লা, বাংলাদেশে ত্রিপুরা থিয়েটার-এর শিল্পীবৃন্দ

Published with the Financial Assistance of Sangeet Natak Academy, New Delhi

ত্রিপুরা থিয়েটার

অষ্টাদশ বর্ষ
(২০০৭ থেকে নিয়মিত)

An Annual Journal on Theatre

Tripura Theatre is indexed in UGC Care List
ত্রিপুরা থিয়েটার ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত

Published Annually

TRIPURA THEATRE
Since 2007
Vol - 18, Issue - 1

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,

সম্পাদক- বিভু ভট্টাচার্য **সহকারী সম্পাদক** - বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদকমন্ডলী-সদস্য

ড অশেষ গুপ্ত,ড সৌগত কুমার নাথ, প্র. মৃদুল বড়দোলই, ড শান্তনু দাশ,
ড. শুভঙ্কর ঘোষ রায় চৌধুরী

TRIPURA THEATRE

(Santosh Market, 37, Akhaura Road, Agartala - 799001, Tripura,
at the end of the Market and then right side).

Editor - Bibhu Bhattacharjee
Asstt. Editor - Biprajit Bhattacharjee

Editorial Board Members:

1. Dr. Ashes Gupta (MA, PhD), Professor, Dept of English, Tripura University, Agartala.
Phone: 9862826675, Email Id - ashesgupta@tripurauniv.ac.in.

2. Dr. Sougata Kumar Nath, Prof., Dept of English, Assam University, Silchar, Assam.
Ph. No - 9435179050 / 8638431169. Email Id- sougata.kumar.nath@aus.ac.in

3. Prof. Mridul Bordoloi, Dept of English, Dibrugarh University, Dibrugarh, Assam.
Ph. No- 9435036559 / 8638879665. Email Id – Mridul_bordoloi@dibru.ac.in

4. Dr. Santanu Das, Associate Prof. & HOD, Dept. of Drama, (R B U)
Rabindra Bharati University, 56A B T Road Kolkata-700050, West Bengal.
Ph. No – 9433946882, Email ID - santanu.das@rbu.ac.in

5. Dr. Suvankar Ghosh Roy Chowdhury, Asst. Prof, Dept of English, Raidighi College.
Kolkata, West Bengal.
Phone – 9830391628 Mail Id- suvankar@raidighicollege.org.in

Office
Hospital Road Extension Gandhighat, Agartala - 799001, Tripura
Ph. : 09436126846 / 9436450193, 9436137729, 7005122924
Mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com
Website : www.tripuratheatre.com

Available at
TT's Office ◆ Akshar ◆ Boi-Ghar ◆ Jan Bichitra - Agartala, Tripura
Dhyanbindu ◆ Patiram - College Street, Kolkata

ত্রিপুরা থিয়েটার-২০২৩

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

অষ্টাদশ বর্ষ

অক্টোবর- ২০২৩

প্রচ্ছদ

প্রণবশ্রী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

মাইক্রো গ্রাফিক্স, আগরতলা

বিভু ভট্টাচার্য, সভাপতি, ত্রিপুরা থিযেটার, হসপিটাল রোড এক্সটেনশন ঃ গান্ধীঘাট ঃ আগরতলা - ৭৯৯০০১ ঃ ত্রিপুরা কর্তৃক প্রকাশিত।

ফোন ঃ ০৯৪৩৬১২৬৮৪৬/ ০৯৪৩৬৪৫০১৯৩

Email-bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

website : www.tripuratheatre.com

TRIPURA THEATRE

A Journal on Theatre and Performing Arts

A Publication of Tripura Theatre (Drama Group) Agartala

18th Year, October - 2023

Published by Bibhu Bhattacharjee, President, Tripura Theatre, Hospital Road Extn. Gandhighat, Agartala- 799001, Tripura

UGC Care List Sl. No. 1, Discipline - Art & Humanities
Sub-Arts & Humanities (All), Focus Subject - Visual Arts & Performing Arts

Cover Design - Pranabsree Hazra

Type Setting and Printed at :
MICRO GRAPHICS, 6-A, Mantribari Road, Agartala.

Published by Tripura Theatre

Price ₹. 600.00

ত্রিপুরা থিয়েটারের সদস্য সদস্যাগণ

শুভ্রাংশু চক্রবর্তী - উপদেষ্টা

বিভু ভট্টাচার্য- সভাপতি

শেখর সি দত্ত - সহ সভাপতি

গায়ত্রী চৌধুরী- সহ সভানেত্রী

কমল মজুমদার- সম্পাদক

শ্যামল কান্তি দে- সহ সম্পাদক

বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য- সহ- সম্পাদক

অপূর্ব সাহা- অফিস সম্পাদক

শ্যামলিমা দে- সহ অফিস সম্পাদিকা

মিহির কান্তি ভট্টাচার্য- কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত মুখার্জী- কার্যকরী সদস্য

শুভঙ্কর ভট্টাচার্য- কার্যকরী সদস্য

মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জী- সদস্য

শিল্পী ভট্টাচার্য- সদস্যা

সবিতা ভট্টাচার্য- সদস্যা

মণিদীপা রায়- সদস্যা

কণকনা মজুমদার - সদস্যা

সুপ্রিয়া চৌধুরী- সদস্যা

সাগরিমা দে- সদস্যা

অভিজিৎ ভট্টাচার্য- সদস্য

দিবাকর ভৌমিক- সদস্য

গঙ্গোত্রী মুখোপাধ্যায়- সদস্যা

সূ চি প ত্র

নাট্য আন্দোলনে গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকা
অপূর্ব দে - ১০

অত্যাচারীর কৌশল ও নাটক "কবর"
পাতাউর জামান - ১৮

এ আই-এর নাটক, নাটকীয় এ আই
বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য - ২৮

রবীন্দ্র-নাটকে শুক্রাচার্য রাভার অভিনবত্ব
বরুণ কুমার সাহা - ৩১

ধর্ম-মোহ থেকে প্রেমের পথে যাত্রা :
সাইমন জাকারিয়ার 'বোধিদ্রুম' নাটক
পরমাশ্রী দাশগুপ্ত - ৪০

বাউল নিপীড়ন ও
ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ
জামসেদ আনোয়ার তপন - ৪৯

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস
নাট্যচর্চায় এক নতুন সম্ভাবনা
সঞ্জয় কর - ৫৩

ত্রিপুরায় বাংলা পথনাটক
সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা
মলয় দেব - ৫৮

সন্মাত্রানন্দের নাটকের একটি বিশ্লেষণী পাঠ
দেবশ্রী পাল - ৭০

কমল রায়চৌধুরীর নাটক
একটি পর্যালোচনা
পদ্মকুমারী চাকমা - ৮১

তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' ও
মনোজ মিত্রের 'পাখি' নাটকে
মধ্যবিত্ত সমাজমানস : একটি নিবিড় পাঠ
দীপঙ্কর সাহা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য - ৯০

শেখর দেবরায়ের নাটক "মনসাকথা"
একটি পর্যালোচনা
সুতপা চক্রবর্তী - ৯৮

বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম আধুনিক
নাটককার মধুসূদন দত্ত
অহীনা দে - ১০৬

অসমিয়া বেতার নাটক
প্রসঙ্গ ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার
'শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট'
জাহ্নবী দাশ - ১১০

'ছেঁড়া তার' নাটকে মন্বন্তরের অভিঘাত ও
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক
রূপশ্রী দেবনাথ - ১১৭

নাট্যকার সুকুমার
সুচিত্রা বেরা - ১২৩

প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর 'গুণধরের অসুখ'
স্বতন্ত্র নাট্যশৈলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন
প্রিয়ব্রত নাথ - ১৩০

দেশভাগ : সব হারানোর কথকতা
প্রসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর'
রাজীব ঘোষ - ১৩৬

CONTENTS

Performing The Tiger:
Bagher Magon, nocturnal
Agartala and a rendezvous.
Ashes Gupta - 144

The Case of the Murder in the Park The Third Assassin in *Macbeth*
Tapu Biswas - 152

The Idiom of Badal Sircar's Third Theatre
Suvankar Ghosh Roy Chowdhury - 163

Ritual and Performance
Interpreting Ritual Drama
'Koratpa'Performed by the
Meitei Kidnas of Tripura
Kshetrimayum Premchandra - 172

Theatre - in- Education
(Learning through Theatre)
is an invaluable resource
Vijai Kumar Singh - 184

Perverts and Prostitutes: A
Reading of Select Bat-tala
Bengali Farces
Sib Sankar Mazumder - 201

Towards a Decolonial Model
through *Jatra* :
Rabindranath Tagore and
His Theatre
Arnab Chatterjee - 213

Nangiarkoothu The Evolution of
an Independent Female Narrative
Salini V. G - 221

Decolonizing & Politicizing the
Stage after the Independence:
Writings of Utpal Dutt,
Badal Sircar on Theatre
Bidhan Mondal - 228

Mahasweta Devi's *Water*
Voicing Human Rights
Durgesh Ravande - 236

Folk Theatre of the Sundarbans
Ecology, Ethics and Endangerment
in *Bon Bibir Palagaan*
Indrani Chakraborty - 244

Myth and Orality as Theatrical
Mechanisms, Unearthing the
Subversive Potential in Karnad's
Naga-Mandala and *Hayavadana*
Souparna Roy - 252

"Who Can Silence the Drums? Delta
Women Speak." An Ecofeminist
Study of Osonye Tess Onwueme's
Selected Plays
Biswajit Mondal - 264

The Monster of Society Hijra
Subjectivity in *7 Steps around Fire*
Banani Ghosh - *273*

Play Review : Taray'e Taray'e
A Hallucination in the Mirror
Tania Koley - 282

নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পানুপ্রাণিত
কাবুলিওয়ালা
চন্দন সেন - ২৮৯
ভেলা (অনু নাটক)
সৌমিত্র বসু - ৩১৪
হুলুস্থুল
কুন্তল মুখোপাধ্যায় - ৩২০
হনন
বারীন চক্রবর্তী - ৩৪৮
পিঁপড়া
আকতারুজ্জামান - ৩৬৬
শতবর্ষে রক্তকরবী : একটি আলেখ্য
শান্তনু দাস - ২৭৬
ন্যায়ের খোঁজে : *বের্টোল্ট ব্রেশট*
রূপান্তর - **নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য** - ৩৯৪
একক নাটক : প্রসন্ন- প্রহর অন্তে
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় - ৪০৯
চোরা বালি
শিবংকর চক্রবর্তী - ৪২৩
বেরনার্দার সংসার : *গারসিয়া লোরকা*
অনুবাদ : **আদিত্য সেন** - ৪৪২
পারিবারিক
মৈনাক সেনগুপ্ত - ৪৮৫
হবু রাজার দেশে
গায়ত্রী চৌধুরী - ৪৯৭
জয়মন্ত্রধারানাম
সুদীপ্ত দত্ত - ৫১১
ঝড়
মনুজেন্দ্র কুন্ডু - ৫৩২
..এবং নন্দলাল: *গল্পকার : ভীষ্ম সাহানি*
নাট্যরূপ : **অনির্বাণ পয়ড়্যা** - ৫৪৮
নেতাজির অন্তর্ধান কাহিনী বিষয়ক
সেভেন্টি টু ডেজ
পার্থ মজমুদার - ৫৭০
জন্ম ভিটির গান
শুভাশিস চৌধুরী - ৫৯৫
নেশা বিরোধী নাটক
জীবন-সঙ্গী ডট কম
বিভু ভট্টাচার্য - ৬২৩

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,
মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে)
দপ্তর : হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা-৭৯৯০০১: ত্রিপুরা

ত্রিপুরা থিয়েটারের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বছরে ন্যূনতম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, সঙ্গে পুরনো, দু'বছরে একবার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব, বছরে একবার মহালয়ায় নাটকের বই (ত্রিপুরা থিয়েটার) প্রকাশ, সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ; এই নিয়ে ত্রিপুরা থিয়েটারের পথ চলা।

২০০৬ থেকে নিয়মিত।

আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনা

রচনা ও নির্দেশনা - বিভু ভট্টাচার্য

ধরতী আবা, স্বামী বিবেকানন্দ (এন এস ডি আয়োজিত ডিব্রুগড়ে পূর্বোত্তর নাট্যোৎসবে যোগদান), **'অলকা', 'মতিজানের মেয়েরা', 'কাবুলিওয়ালা'** (এনইজেডসিসি আয়োজিত গৌহাটিতে শিল্পগ্রাম উৎসবে যোগদান) ও ছোট নাটক **অম্লমধুর,** প্রভৃতি।

- চলতি প্রযোজনা -

'বাপুজী' (এনএসডি আয়োজিত প্রাগয্যোতিষ নাট্যোৎসবে-২০২০, ইটানগরে যোগদান) **'মতিজানের মেয়েরা', 'কাক চরিত্র', 'পিতা'** এবং নেশা বিরোধী নাটক **'জীবন সঙ্গী ডট কম'** প্রভৃতি।

নাট্যোৎসব

প্রতি দু বছরে একবার 'বামাপদ মুখোপাধ্যায়' আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব
২০১২ থেকে নিয়মিত

নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনা

বছরে একবার, ২০০৬ থেকে নিয়মিত।

২০২০ সাল থেকে বইটি ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়।

যো গা যো গ

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন ঃ গান্ধীঘাট ঃ আগরতলা - ৭৯৯০০১ ঃ ত্রিপুরা
ফোন ঃ ০৯৪৩৬১২৬৮৪৬/ ০৯৪৩৬৪৫০১৯৩
Email-bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com
website : www.tripuratheatre.com

সম্পাদকীয়

নাটক সমবেত শিল্প। সকলে মিলে এই অভিযাত্রায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে এগিয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয়ই এই দীর্ঘস্থায়ী কাজ চালিয়ে যাবার সোপান হিসাবে কাজ করে। খুব সহজভাবে তো আর সমাজ চলে না। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে সমস্যা নেই, সংকট নেই। দুনিয়াব্যাপী রয়েছে অপশক্তির দম্ভ নানা দেশে নানা রূপে। সৃষ্টি হচ্ছে মানুষে মানুষে বিভেদ সারা পৃথিবী জুড়ে। এতসব অপচেষ্টার মধ্যেও মানুষ শুভ চেতনায় ভর করে এগিয়ে চলে। আলোর পথ বেছে নিতে চায় তার অনুভবে বিশেষ করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

বাধা যে আসেনা তা নয়, বড় দুর্গম এই পথ, কিন্তু শুভ চেতনা কখনো থমকে থাকে না। সম্মুখপানে এগিয়ে চলাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সমগ্রতার প্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের এটাই প্রাথমিক সোপান। অনুকূল প্রতিকূল সমাজের নানা ঘটনায় ঋদ্ধ হয়ে সুস্থ সংস্কৃতি প্রগতির পথকে শাণিত করে। এই চর্চায় হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা সমাজের কোন বিষয়ই বাদ যায় না।

এখানেই অনুঘটকের কাজটি করতে চায় নাটক। শুধু যে মঞ্চে উপস্থাপন তাই নয়, নাট্য সম্পর্কে আলোচনা সভা, মত বিনিময়, প্রকাশনা, সমস্ত কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত। সমাজের যে কোন বিষয় সম্পর্কে নান্দনিকতার আশ্রয়ে সমগ্রতায় ভর করে, শুধুই এগিয়ে চলা।

দেশ বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে যে সকল নাট্যব্যক্তিত্ব গবেষকদের লেখায় ত্রিপুরা থিয়েটার ২০২৩ ঋদ্ধ হয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আর বিজ্ঞাপন দাতা এবং পাঠকদের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা।

বিপ্লব ভট্টাচার্য

নাট্য আন্দোলনে গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকার অবদান

■ অপূর্ব দে

বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে নাট্য পত্র-পত্রিকার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা নাটক যেহেতু প্রচণ্ড গতিশীল ও প্রাণবন্ত সত্তা;প্রতিদিনই তার চেহারা ও প্রকৃতি কিছু না কিছু পাল্টাচ্ছেই— সেহেতু নাট্যপ্রবাহের নানা বর্ণময় স্তরকে বোঝার জন্য নাট্য পত্রিকার ইতিহাস ও কার্যক্রম জানা বেশ জরুরি। অথচ ইতিহাসের ধুলোর আস্তরণে চাপা পড়ে গেছে নাট্য পত্রিকার ইতিহাস। সেই ধুলো ঝেড়ে তার ভিতর থেকে নাট্যপত্রিকার ইতিহাস তুলে ধরলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যপত্রিকা 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত ১৯০১ সালের ১লা মার্চ, শুক্রবার। সাপ্তাহিক এই নাট্যপত্রিকাটি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'রঙ্গালয়' নাট্যপত্রিকাটি বেশিদিন না চললেও নাট্যজগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ গড়ে তুলেছিল। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আগে শুধুমাত্র নাট্য-বিষয়ক পত্রিকার কথা কারও মাথায় উদিত হয়নি। এমন কি নাটকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মানুষেরাও নাট্যপত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় নৃপেন্দ্র সাহা লিখেছেন:

> 'শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের জন্যও বিশেষ ধরণের প্রত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করে তাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে, অথচ নাট্য আন্দোলন সংগঠিত করেও তার জন্য কোন পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করা ভাবতে অবাক লাগে। সবচেয়ে আশ্চর্য সংগীতচর্চা, স্বরলিপির ব্যবহার নিয়েও পত্রিকা বেরিয়েছিল খোদ ঠাকুর বাড়ির বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্যশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়, অথচ নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টিরহস্য ও সমস্যা বিষয়ক পত্রিকা উপেক্ষিত থেকে গেল'।[১]

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে। সংগীতচর্চা বিষয়ক পত্রিকাটির নাম 'বীণাবাদিনী' (মাসিক), শ্রাবণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক তৎকালীন হারমোনিয়াম প্রস্তুতকারক সংস্থা ডোয়ার্বিন এণ্ড সন। পত্রিকাটি দুই বছর চলেছিল। পরবর্তীকালে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা' (১৮৭৮) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাট্যকার মনোমোহন বসু 'সংবাদ বিভাকর' নামে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং 'মধ্যস্থ' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৯০ সালে 'মজলিস্' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়। এই পত্রিকায় নাট্যজগতের দুই দিক্‌পাল গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষ লগ্নে প্রকাশিত হয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় 'সৌরভ' পত্রিকা (১৮৯৫। শ্রাবণ, ১৩০২) এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই পত্রিকাগুলিকে কিন্তু নাট্যপত্রিকা বলা যায় না। কেন না উক্ত পত্রিকাগুলিতে কবিতা, উপন্যাস, অন্য বিষয়ে

প্রবন্ধের পাশাপাশি নাট্যপ্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লেখা, নানা নাট্য সমালোচনাও স্থান পেত পত্রিকাগুলোতে। প্রত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা নাচ্যচর্চায় জড়িত থাকা সত্বেও নাটক বা থিয়েটার বিষয় খুব বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তাঁরা সাধারণ বিভিন্ন বিষয় বা প্রসঙ্গের সঙ্গেই নাট্যজগৎ নিয়ে বিবেচনা করেছেন মাত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে কুর্ণিশ জানাতেই হয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে 'রঙ্গালয়' পত্রিকার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচর্চার নানা বাঁকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক নাট্যপত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। আবার কালের নিয়মেই একাধিক পত্রিকা হারিয়ে গেছে বা বিলুপ্ত হয়েছে। ধারাবাহিক নাট্যচর্চার প্রচার ও প্রসারে নাট্যপত্রিকাগুলির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে, এমনই একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্যপত্রিকা 'গন্ধর্ব'। বিগত শতকের চারের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা— একের পর এক উত্তাল পটভূমিকা দেখেছে বাংলা। এরই প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩)। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে তখন বিরাট সঙ্কট, রাজনীতির ক্ষেত্র জুড়ে বিরাট হতাশা, সামাজিক জীবনে ভাঙনের ভয়ঙ্কর প্রেতচ্ছায়া। এমন সময় গণনাট্যের আত্মপ্রকাশ ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। গণনাট্য সংঘই প্রথম নাট্যচর্চার সঙ্গে 'আন্দোলন' শব্দটি জুড়ে দেয়। গণনাট্য সংঘ একদিকে যেমন স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলেছিল, তেমনি অন্যদিকে সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনেছিল। গণনাট্য সংঘের মুখপত্র হিসেবে 'গণনাট্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে, সলিল চৌধুরীর সম্পাদনায়। গণনাট্যের গর্ভ থেকেই জন্ম হয় 'গ্রুপ থিয়েটার' -এর। ১৯৪৮ সালে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে গড়ে ওঠে প্রথম গ্রুপ থিয়েটার 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা। শম্ভু মিত্র ছিলেন বহুরূপীর কর্ণধার। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' (১৯৫৪) প্রয়োজনার বিরাট সাফল্যের পর দলের মুখপত্র রূপে 'বহুরূপী' পত্রিকা (১ মে, ১৯৫৫) প্রকাশিত হয়। এটা আজ প্রমাণিত যে, বহুরূপী শুধু বাংলা নাট্যে নতুন দিশা দেখায়নি, নাট্যপত্রের প্রকাশনাতেও নবমাত্রা সংযোজন করেছে। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে যে সূচনা বহুরূপী করেছিল, নাট্যপত্র প্রকাশনা সেই নবধারার সুরই শোনা গিয়েছিল। 'গন্ধর্ব' পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে তার অগ্রজ 'বহুরূপী' পত্রিকাকে অনুসরণ করেছিল।

জন্মলগ্নে 'গন্ধর্ব'-র কাজ শুরু হয় শুধুমাত্র নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে। বাংলা নাট্যজগতে নবনাট্য আন্দোলনে বীজমন্ত্র রোপিত করেছিল। নাট্যকর্মীরা গণনাট্য না নবনাট্য কোনটা আঁকড়ে ধরবেন তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। 'গন্ধর্ব' অবশ্য নবনাট্যের উপরই আস্থা রেখেছিল। এই নাট্য দলের প্রধান স্থপতি ছিলেন শ্যামল ঘোষ। তাঁরই উৎসাহে ও সক্রিয়তা 'গন্ধর্ব' নাট্যদল তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি 'বহুরূপী' নাট্যপত্রের মতো একটি নান্দনিক পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। 'বহুরূপী'র মতো দলের মুখপত্র হবে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা ঠিকই কিন্তু সমকালীন অন্যান্য নাট্যদলগুলির নাট্য-ভাবনার প্রতিফলন ঘটবে গন্ধর্বের

পাতায়— এই ভাবনাও তাঁর ছিল। 'গন্ধর্ব' নাট্যদলের নামকরণ করেছিলেন নির্মল দত্ত। শ্যামল ঘোষ, নির্মল দত্ত, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম স্যান্যাল, নৃপেন্দ্র সাহা, প্রতুল চৌধুরী প্রমুখ স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে। নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার দিনই তাঁরা নতুন পত্রিকা প্রকাশ করবেন। বিশ্বরূপ মঞ্চে গন্ধর্ব ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকটি মঞ্চস্থ করে ১৯৫৮ সালের ৫ই অক্টোবর। সেদিনই স্মারক পত্রিকার আদলে শরৎ সঙ্কলন 'গন্ধর্ব' (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হল। 'ছোটগল্প' পত্রিকার প্রকাশনায় অভিজ্ঞতা থাকার কারণে নৃপেন্দ্র সাহাকে সম্পাদনায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন চিত্রশিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। 'পত্রিকা সম্পাদনা প্রসঙ্গে' লেখা হয়েছিল:

> 'গন্ধর্ব' পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হ'ল। পত্রিকা, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের পত্রিকা প্রকাশের উদ্যম ও উদ্দেশ্য থেকে গন্ধর্ব-র প্রকাশে কিছু বিশিষ্টতা আছে। কেন না গন্ধর্ব মূলত: নাট্যবিষয়ক পত্রিকা ।....গন্ধর্ব প্রকাশের মূলে যেমন সাহিত্য-উৎসাহ রয়েছে তেমনি আছে নাটক বিষয়ে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করার প্রয়াস, ফলত: নাটক বিষয়ক একটি সাহিত্য পত্রিকা বললে গন্ধর্বের পরিচয় মোটামুটি দেওয়া হ'ল।'

পত্রিকার প্রথম প্রচ্ছদটি হয়েছিল সুচারু ও নয়নশোভিত। 'গন্ধর্ব' দলের স্মারক তৈরি করেছিলেন নির্মল দত্ত। আর 'গন্ধর্ব' পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। দলের স্মারকটিকে মধ্যশীর্ষে রেখে তিনটি পৃথক চতুষ্কোন রিভার্সের মধ্যে বলিষ্ঠ বর্ণলিপিতে নামাক্ষর রচনা করেছিলেন। প্রচ্ছদের জমিনে কালো, লাল ও সবুজের ব্যবহার করেছিলেন, উপরে পত্রিকার নাম,নিচে হস্তাক্ষরে শরৎ সংকলন /১৩৬৫ লেখা ছিল। প্রথম ও শেষ ছয় পাতায় ছিল বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন অংশ বাদ দিলে ছাব্বিশ পাতার পাঠ্যাংশ অর্থাৎ দুই ফর্মার পত্রিকা। প্রথম 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একালের গন্ধর্ব' নামে এক পাতার শুভেচ্ছা লিপি। অজিত কুমার ঘোষের 'অপেশাদারী নাট্যাভিনয়ের ধারা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবনের ছায়া' নাটক, প্রণবেশ চক্রবর্তীর নিবন্ধ 'ভারতীয় নাট্যের প্রাগ্‌বাক্' এবং 'দলিলের গল্প' (ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি সংক্ষেপ)। নির্মল দত্তের 'দলিল' নাট্যাভিনয়ের রেখাচিত্র ছিল কয়েকটি।

পরবর্তী সংখ্যা থেকে একক দায়িত্ব দেওয়া হলো নৃপেন্দ্র সাহাকে। গন্ধর্বের প্রকাশ স্থান গন্ধর্বের তখনকার মহলাকক্ষ ১৩৩/১এ আপার সার্কুলার রোড। সেটি ছিল বসন্ত সংকলন, ১৯৫৯ সালের ৮ মার্চ। উক্ত সংখ্যায় নাটকের নানা সমস্যা ও আধুনিক কালের নাটক সম্পর্কে নানা চিন্তাকে সংগ্রহ করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দু'টি সংখ্যার অনিয়মিত প্রকাশের পর ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে 'গন্ধর্ব' প্রকাশিত হতে থাকে। প্রচ্ছদে লেখা হয় 'নাট্য প্রাসঙ্গিক ত্রৈমাসিক'। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে স্থায়ী প্রকাশক হলেন রমন মহেশ্বরী। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'পত্রিকা সম্পাদনা প্রসঙ্গে' বলা হয়েছিল;

> 'নবনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটক সম্পর্কেও প্রগতিশীল পত্রিকা

> ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে 'থিয়েটার', 'গণনাট্য', 'বহুরূপী', 'পাদপ্রদীপ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও 'বহুরূপী' ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলি অধুনালুপ্ত। 'গন্ধর্ব' এই নাট্য আন্দোলনেরই নতুন মুখপত্র। বিশেষ নাট্য সংস্থার পত্রিকা হিসেবে সেই সংস্থার কথা যেমন এতে থাকবে, সামগ্রিক নাট্য আন্দোলনের নানা সমস্যা ও তার আলোচনাও 'গন্ধর্ব'র অন্য উল্লেখযোগ্য দিক।'

ধীরে ধীরে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা বাংলা নাট্য আন্দোলনের আশ্রয় হয়ে ওঠে। নাট্য আন্দোলনের সামগ্রিক আবেদনকে স্পষ্ট এবং পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকা সদা সতর্ক প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেছিল। একদিকে তরুণ নাট্যকর্মীদের সমস্যা-সঙ্কট, অন্যদিকে অভিজ্ঞ নাট্যোৎসাহীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। গন্ধর্বের তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৬০) নবীন ও প্রবীন নাট্যকারের নাটক ছাপা হয়। নাট্যজগতে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবীন নাট্যকার মন্মথ রায়। তাঁর নবীন বয়সের রচনা 'সেমেরেমিস' (১৯২৩) নাটক উক্ত সংখ্যায় ছাপা হয়। পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তরুণ ছাত্র মনোজ মিত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মোরগের ডাক' (১৯৬০) প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিলে;

> 'সাইত্রিশ বছর পূর্ব্বে বাংলাদেশের এক দিক্‌পাল নাট্যকার যে নাট্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন, ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত করে এক উত্তরসূরি নাট্যকারের কতোখানি অগ্রগতি হয়েছে বা হয়নি তার বিচারের ভার সুরসিক পাঠকবর্গের।'

প্রবীন ও নবীন নাট্যকারের সমন্বয়ের জন্য উক্ত সংখ্যাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে 'বহুরূপী' ও 'গন্ধর্ব' উভয় পত্রিকাই 'রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা' বের করে। বিষয়সূচি ও লেখক সমাবেশের গৌরব নিয়ে গন্ধর্বের রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা পাঠক মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। (১৩৬৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (মে, ১৮৬১) রবীন্দ্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষকরা। 'রবীন্দ্রনাট্যের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন আশোক সেন। আশোক রুদ্র লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্য', আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাট্যকবিতা', সুধীর চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'বাংলা নাট্য সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের প্রহসন প্রসঙ্গে' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সুবীর রায়চৌধুরী, অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'গ্রীক নাট্যচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের নাটক ও প্রযোজনা' নিয়ে লিখেছিলেন কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, মণি বাগচী লিখেছিলেন 'পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ', রতন সান্যালের প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্র-সকাশে না', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র নাট্য সংখ্যার মতোই 'গন্ধর্ব'র 'সার্ত্র সংখ্যা' (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৬৪) 'ব্রেশট্ সংখ্যা' (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৬৫) পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছিল।

'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা নবনাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, নতুন নাটক-কারদের তুলে আনা তাদের লক্ষ্য ছিল। সে কারণে তারা

কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে নাটক লিখিয়েছিলেন। কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, সমরেশ মজুমদার, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। কবি শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো প্রতিষ্ঠিত কবিদেরও নাটক ছেপেছিল 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা। মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়দের মতো অনেক নাটককার এই নাট্যপত্রিকার হাত ধরে উঠে এসেছিলেন। গন্ধর্বের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৬১) বিমল করের 'কর্ণকুন্তী সংলাপ' নাটকটি প্রকাশিত হয়। তাঁর 'ঘাতক' নাটকটি প্রকাশিত হয় পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৬২)। এছাড়া 'শঙ্খ' নামক একটি রাজনৈতিক নাটক ছাপা হয় পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'ঝড়' নামে একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয় 'গন্ধর্ব'-এর ঊনিশতম সংখ্যায়। রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের 'আশ্রয়' নাটক প্রকাশিত হয় একচল্লিশতম সংখ্যায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সামনে অন্ধকার', সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'সুড়ঙ্গ', সমরেশ মজুমদারের 'সত্যমেব জয়তে' নাটকগুলি চল্লিশতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমরেশ মজুমদারের 'তীর্থযাত্রী' (৩৭তম সংখ্যা), 'বেমানন' (৪২তম সংখ্যা) নাটক এবং একটা নক্সা 'টেক্কা' একচল্লিশতম সংখ্যায় বের হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক 'এলাকা' চুয়াল্লিশতম সংখ্যায় এবং শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ নাটক 'মানুষ' (মূল রচনা- হাবানটের হাসেন ক্লেভর) চল্লিশতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনুবাদ নাটক ছাপানোর ক্ষেত্রেও 'গন্ধর্ব' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছিল। তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল— 'বিদেশী নাট্য প্রগতি সম্পর্কে বিশেষ সংকলন' নামে। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী নাট্যরসিকদের ভিন দেশীয় নাট্যচিন্তার সঙ্গে একটা পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ফলে 'গন্ধর্ব' পত্রিকার দৌলতে আমরা পেলাম বেশ কিছু বিদেশী নাটক এবং নাট্য অনুবাদকদের। যেমন জর্জ বানার্ড শ-এর 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেসন' অবলম্বনে উৎপল দত্তের 'মধুচক্র', বার্টল্ট ব্রেশটের 'চক সার্কেল'-এর বাংলা রূপান্তর 'খড়ির গন্ডী', আন্তভ চেকভের 'সোয়ান সং' অবলম্বনে অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন', লুইজি পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেক্টার ইন সার্চ অফ অ্যান অথার' নাটক থেকে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', ম্যাক্সিম গোর্কির 'কুইয়ার পিপলস্-এর বাংলা রূপান্তর করেন কুমার রায় 'এরা সব অদ্ভুত' নামে, সফোক্লিস 'অয়দিপাউস' অবলম্বনে শ্যামল ঘোষের 'পরবাসী অয়দিপাউস', সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাঙা দ্বীপের ইতিকথা' (মূল রচনা- মিখাইল আকানাসিয়েবিচ বুলগাকভ), স্বাথীলেখা সেনগুপ্তের 'মাননীয় বিচারক মণ্ডলী' (মূল রচনা- আকিরা কুরোসাওয়া) ফ্রেডরিক ডুরেন্টমেন্টের দ্য ভিজিট' থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ফেরা' ইত্যাদি। এই অনুবাদিত ও রূপান্তরিত নাটকগুলি বাংলা নাটক তথা থিয়েটারকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকার মান বাড়িয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা উক্ত নাটকগুলি ছাপিয়ে সেতুর কাজ করেছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পোস্ট মাস্টারের বউ', 'সূর্যের মতো সমুদ্র', অমর

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চেনা মুখ : অচেনা মানুষ', নায়িকার নাম নিয়তি', 'সন্ধ্যার রঙ', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'এ জন্মের অধিকার', 'এক চক্ষু', 'জীবনের ছায়া', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'বর্ণ পরিচয়', 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ', উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকার', কার্তিক লাহিড়ীর 'জাতশত্রু', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'আত্মহত্যা মহাপাপ', 'কানামাছি', 'জীয়ন পালা', 'বরনারীর সন্ধানে', শত্রুদমন', 'মিস্ ইণ্ডিয়া' তুলসী লাহিড়ীর 'চোরাধীনতা', 'পরীক্ষা', 'ভিত্তি', বিজন ভট্টাচার্যের 'অবরোধ', 'হাঁসখালির হাঁস' দেবকুমার ভট্টাচার্যের 'ধোঁয়া ধূলোর নক্ষত্র' (মূল রচনা- অসীম রায়), 'নিয়মভঙ্গ', 'বিষহরি', 'সনাতন চরিত', দেবাশিষ মজুমদারের 'অসমাপ্ত', 'স্বপ্নসন্ততি', বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুর স্বাদ', মনোজ মিত্রের 'নীলকণ্ঠের বিষ', 'মহাত্মা', 'রঙিন মাছেরা', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'কানামাছি খেলা', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'তোতারাম', 'নীল রঙের ঘোড়া', 'বাইরের দরজা', 'রঙিন কাঁচ', রমাপ্রসাদ বণিকের 'শরণাগত'(মূল কাহিনি - সমরেশ মজুমদার), রাজেশ্বর মিত্রের 'অসুরিক', 'মন্ত্রদ্রষ্টা', 'শেষ পর্ব','স্বপ্ন বাসবদত্তা', শ্যামল সেনগুপ্তের 'রবি মীনে', সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জয় জয়ন্তী', সলিল সরকারের 'প্রবহতি', সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর 'মানুষের দান', সেলিম আলদীনের 'কিত্তন খোলা', সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর 'জনক', ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর 'জলজ্যান্ত', জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষঘুম' ইত্যাদি নাটকগুলি 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই 'গন্ধর্ব' সাহিত্যের সঙ্গে নাটকের একটা সমীকরণের কথা বলে এসেছে। সে সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একটি বিষয় উঠে আসছিল যে 'বাংলা নাটক নেই'। বাংলা নাটক না থাকার কারণ হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মতামতকে প্রকাশ করা হচ্ছিল। তাঁদের মতে, নাটক লিখে লাভ নেই। গ্রন্থ প্রকাশ তো দূরের কথা, এমন কি কোনো পত্র পত্রিকাও নাটক ছাপাতে আগ্রহী নয়। তারা উপন্যাস, কবিতা, গল্প ছাপাতে রাজি থাকলেও নাটকের ক্ষেত্রে চরম উদাসীন। 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা কিন্তু কথাসহিত্যিক, কবি, অপ্রতিষ্ঠিত নাটককারদের নাটক ছাপানোর ঝুঁকি নিয়েছিল। সদ্য প্রয়াত প্রভাতকুমার দাস 'বহুরূপী' ও 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকার প্রতিতুলনায় মন্তব্য করেছেন:

'.... প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই বহুরূপী যে স্মরণীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন— সেটি কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের 'কেন নাটক লেখেন না' প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে কয়েকটি সময়োপযোগী জবানবন্দী লিখিয়ে নেওয়া। বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর প্রমুখের সেইসব লেখা একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে পরবর্তীকালে— পরবর্তী প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের অভিমত যুক্ত করে। 'গন্ধর্ব' এই রকম সমস্যা গুরুত্ব দিয়েই বিমল কর আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখকদের দিয়ে নাটক লেখানোর চেষ্টায় সাফল্য পেয়েছিল।'[২]

অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা নাটক ছাপে না এই দুর্নাম ঘুচিয়েছিল 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা। কবি ও সাহিত্যিকদের নাটক রচনার ক্ষেত্রে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা ও তার সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা কাব্যনাট্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। 'কবিতার সহিত নাটকের বিবাহ আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য'- এই আপ্তবাক্যকে সামনে রেখে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা কাব্যনাট্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। কবি হিসাবে যাঁরা প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন বা ভবিষ্যতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে অমন অনেক কবিকেই কাব্যনাট্য রচনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল 'গন্ধর্ব' পত্রিকা। তাদের চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যাটি 'কাব্যনাট্য' সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল (মে-জুলাই, ১৯৬২)। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল :

> 'গন্ধর্বর বর্তমান সংখ্যাটি কাব্যনাট্য সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করতে পেরে আমরা যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছি। সাম্প্রতিক কালে বাঙলা সাহিত্যে এবং অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চে কাব্যনাট্য সম্পর্কে যে কৌতূহল দেখা গিয়েছে, সেই কৌতূহলকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে তুলে এনে চরিত্রবান করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান সংকলনটিতে।
>
> কী আমাদের সাহিত্যে, কী মঞ্চে কাব্যনাট্য এখনো এমন কি, ভ্রূণাবস্থা কাটিয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু এই নতুন আর্ট ফর্মটি আমাদের শিল্প সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে এবং কোন কোন কবি, কোন কোন নাট্য প্রযোজকের কল্পনাকে আক্রমণ করেছে। এই সুবাদে 'গন্ধর্ব' তার কাব্যনাট্য সংখ্যা প্রকাশ করা দায়িত্বের অন্তর্গত বলে মনে করে।'

আসলে নতুন কাব্যনাট্য আন্দোলনের ঢেউ সে সময় কলকাতার বুকে আছড়ে পড়েছিল। 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা সময়ের দাবি মেনেই 'কাব্যনাট্য' সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিল। কাব্যনাট্যের সম্ভাবনাকে উস্‌কে দিয়ে বাংলাদেশের নাট্যমানসিকতাকে কাব্যনাট্যমুখী করে তুলতে চেয়েছিল। কবি কৃষ্ণ ধরের 'এক রাত্রির জন্যে'। 'দ্বিতীয় নায়িকা', 'ফুলওয়ালী', 'রণতলাইয়ের হরিণী', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'রাতের অতিথি', রাম বসুর 'নক্ষত্রের গতি' দিলীপ রায়ের 'চা বাগান', দিলীপ কুমার সেনের 'যযাতি', গিরিশঙ্করের 'সঙ্কটের ছায়া' ইত্যাদি কাব্যনাট্যগুলি গন্ধর্বর পাতায় স্থান পেয়েছিল।

'অযথা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে'— এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে 'বহুরূপী' পত্রিকা সমকালীন নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা প্রকাশ করেনি। একদিক থেকে কিন্তু 'গন্ধর্ব' পত্রিকা একধাপ এগিয়েছিল। সমকালীন নাট্যপ্রযোজনার সমালোচনা নির্দ্বিধায় গন্ধর্ব ছাপিয়েছে। বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস', 'মুক্তধারা', 'দশচক্র', 'বিসর্জন', লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'তিতাস একটি নদীর নাম'। 'কল্লোল', সাম্প্রতিকের 'অয়েটিং ফর গোডো', থিয়েটার ইউনিটের 'কৃপণের ধন', চতুর্মুখের 'নির্বোধ', নান্দীকারের 'নাটকের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনার নাট্যসমালোচনা বের হয়েছিল 'গন্ধর্ব' পত্রিকায়। নাট্যবিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনাও ছাপা হতো গন্ধর্বতে। 'গন্ধর্ব' পত্রিকাকে একবার ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। টি.এস.এলিয়ট-এর 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল' নাটকের অনুবাদের জন্য।

নাটকটির অনুবাদ স্বত্বের জন্য প্রকাশক ফেবার এণ্ড ফেবার-এর কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। প্রকাশক অনুবাদের স্বত্ব হিসাবে একশো পাউণ্ড দাবি করেছিল । 'গন্ধর্ব' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী একমাস পর তাঁদের পত্রিকার আর্থিক দৈন্যের কথা জানান। পত্রিকাটি যে অপেশাদার ও অবাণিজ্যিক সেকথাও তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে জানান। বিদেশী প্রকাশ সন্তুষ্ট হয়ে একশো পাউণ্ডের জায়গায় এক পাউণ্ডের বিনিময়ে স্বত্ব দান করেছিলেন। আবার গন্ধর্বের গর্বের একটা দিক হলো যে, ১৯৮৫ সালে প্যারিস শহরে বাংলা নাট্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রদর্শনীতে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা স্থান পেয়েছিল।

নৃপেন্দ্র সাহার সম্পাদনায় 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকার পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। প্রথম ত্রিশটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন নৃপেন্দ্র সাহা। ১৯৫৮ — ১৯৮১ সাল পর্যন্ত একটানা চলে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা। তারপর অন্তরালে চলে যায়। ১৯৮৫ সালে জগন্নাথ হালদারের সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশ হতে থাকে। সুধাংশু মৈত্র ও দেবকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। অবশেষে ১৯৯৬ সালে 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকার যাত্রাপথ শেষ হয়। প্রথম পর্বের 'গন্ধর্ব'-র নাট্য আন্দোলনে যে ঝাঁজ ছিল, দ্বিতীয় পর্বের 'গন্ধর্ব'-র সেই তেজ কিন্তু ছিল না। তবে গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে নিচুতলার নাট্যকর্মীদের কাছে 'গন্ধর্ব' পত্রিকা খুবই গ্রহণীয় ও আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। আজও নাট্যপত্রিকার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রিকা তার নিজস্ব সময়সীমায় কিছুকাল অনিয়মিত ও অপ্রকাশিত থাকলেও, সেই সময়সীমাতেই অন্যান্য অনেক নাট্যপত্রিকার মতো ক্ষণজন্মা বা তাৎক্ষণিক হয়নি। এর অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে নাট্যের প্রতি এই নাট্যপত্রিকার দায়বোধ।

সাক্ষাৎকার

১) 'বঙ্গীয় নাট্য আন্দোলন ও নাট্য সাংবাদিকতা', নাট্য আকাদেমি পত্রিকা প্রথম সংখ্যা, মে, ১৯৯০, সম্পাদকমণ্ডলী—নৃপেন্দ্র সাহা, অশোক মুখোপাধ্যায় ও রথীন চক্রবর্তী, পৃ: ১২।

২) বাংলা নাট্যপত্রের নানা পর্যায়, ব্রাত্যজন নাট্যপত্র— সম্পাদক- ব্রাত্য বসু, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০১২, পৃ: ১২।

লেখক : **ড. অপূর্ব দে, পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য গবেষক।**

Author : **Dr. Apurba De, eminent playwrit & theatre scholar.**

অত্যাচারীর কৌশল ও নাটক "কবর"

■ পাতাউর জামান

কবর নাটক মুনীর চৌধুরী জেলে বসে রচনা করেছিলেন। এ নাটকের বিষয় ভাষা আন্দোলন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির আগের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। নাটকের মধ্যে গল্পের অংশটাও খুব সোজা, ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানো হয়েছে। রাতের অন্ধকারে ট্রাকভর্তি গুলি-খাওয়া লাশ কবর দিতে এনেছে রাজাকার নেতা। নেতার সঙ্গে হাফিজ বলে একজন পুলিশ আছে আর আছে কয়েক জন গার্ড। নেতা আর হাফিজ কবরস্থানে বসে মদ খায়। সেখানে তারা মদের ঘোরে ভাবে লাশগুলো কবরে যেতে চায়না। গুলি খাওয়া লাশগুলো মুর্দা ফকিরের নেতৃত্বে আবার বাঁচতে চায়। তারা অধিকার চায়। তারা তাদের উপর, দেশের-দশের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পরে গার্ডের কথায় যখন ওদের হুশ ফেরে তখন সকাল হব হব। মৃত লাশগুলোকে ততক্ষণ কবর দেওয়া হয়ে গেছে, আসলে নেতা আর হাফিজ মদের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল। বা এও হতে পারে- ওদের মনের মধ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঘটা অত্যাচারীর শোষণ এবং অত্যাচারিতের প্রতিরোধের প্রক্রিয়া প্রাক্-চেতনে ছিল, সেটাই উঠে এসেছে এখানে। কিন্তু এখানে আমরা শুধু কী এই ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শোষণ— এগুলো খুঁজব? অবশ্যই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা এখানে দেখবো এই নাটকে অত্যাচারীর অত্যাচারের কাঠামোটাকে, যে অত্যাচারের কাঠামো অতীত থেকে একেবারে আধুনিক বিশ্বেও সমানভাবে অনুসরণ করে আসছে অত্যাচারীরা। অন্যদিকে অত্যাচারিতরাও প্রতিবাদ করছে, আবার অত্যাচারিতদের কেউ কেউ কীভাবে অত্যাচারিতদের পক্ষে থেকেও অত্যাচারীর হাতকে শক্ত করে, সেটাও বুঝবার চেষ্টা থাকবে এখানে। সেই সঙ্গে থাকবে সংঘবদ্ধ অত্যাচারের কাঠামোটিও কীভাবে এখানে এসেছে এবং কেন এই কাঠামো জরুরি হয়ে পড়েছিল?

কাঠামো

একটা দৃশ্য দিয়ে শুরু করা যাক। অনুমান করে নিন একটা মঞ্চ। মঞ্চে দেশনায়ক, আধুনিক কালের কোনো মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছে। অনবরত জাতি বিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ দিয়েই চলেছে। সভার পাশ দিয়ে রাম শ্যাম অপিসে যাচ্ছিল। যদু মধু ক্ষেতে কলকারখানায় যাচ্ছিল কাজে। সবাই মনে মনে ভাবছে,এসব কথায় আমার আর কী। আমি এই বেশ আছি। ওদের যা হচ্ছে হোক না। এরপর এমন একদিন এল, রাম শ্যাম যদু মধুর মালিক বলল, তোমাদের কাল থেকে এক ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে। ওরা মেনে নিল। পরের মাসে বলল, আরো এক ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে। তাও মেনে নিল।

পরের মাসে বলল, এই যে কাজ করছিলে সেটা থাকবে না। যদি মাইনে কম নাও তাহলে থাকবে। প্রথমে দেখা গেল চারজনই বিরোধিতা শুরু করেছিল। মালিক বাধ্য হল ওদেরকে দিয়ে আগের মত কাজ করাতে। কিন্তু পরের দিন থেকে যেটা শুরু হল, মালিকপক্ষ উঠতে-বসতে তাদের কাজের দক্ষতা, কাজের নিষ্ঠা, নৈতিক সততা, তাদের ব্যক্তিগত নানান ত্রুটি, পারিবারিক প্রশ্নে হেয়, সামাজিক ক্ষেত্রে অনবরত নীচু দেখানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অপর হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিনের পর দিন এটাই চলতে লাগল। মালিক পক্ষ এর মধ্যে করল কী- এদের মধ্যে একজনকে বলে এই বলে তোষামোদ করতে শুরু করল যে, তুমি অনেক ভালো ওদের থেকে। তোমার আর আমার সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থান সমান। তুমি কেন ঐ 'ছোটলোক' দের মতো হতে যাবে? আমি তোমার জন্য আরো বড়ো এবং ভালো কিছু একটা রেখেছি, তোমাকে এত বেশি কাজ করতে হবে না। পরে যখন মালিক আবার বলল, তোমাদের কাল থেকে হাফ মাইনে। যারা যারা এই সিদ্ধান্ত মানবে তারা তারা কাজে এস, যারা যারা মানবে না , তারা এসো না। দেখা যাবে, কেউ আর প্রতিবাদ করছে না।

কার্যত এটি একটি কল্পিত দৃশ্য, যার মিল বর্তমানে অনেক কিছুর সঙ্গে অনেকেই দেখতে পাবেন। আসলে এখানে মালিক পক্ষ বা শাসক পক্ষ ' অত্যাচারী অবস্থা নির্মাণ ' করেছে, [১] এই অত্যাচারী অবস্থা নির্মাণের পিছনে আসলে মালিক পক্ষ বা শাসক পক্ষ তার 'কর্মচারীর ব্যক্তিসত্ত্বা' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে মালিক পক্ষ বা শাসক পক্ষ আসলে অত্যাচারী পক্ষ আর তার কর্মচারীরা অত্যাচরিতের দলে— এই সরল সমীকরণটি না উল্লেখ করলেও এটা জলের মতো পরিষ্কার।

কিন্তু একটা প্রশ্ন উপরের নাট্যদৃশ্য থেকে করা যেতে পারে, আপনারা নাট্যদৃশ্যের এই গল্পের মধ্যে ঠিক কী খুঁজে পেলেন? আপনারা এর মধ্যে ঠিক কী চান? এই প্রশ্নের উত্তর এক এক জন এক ভাবে দিলেও সবাই মূলত: এ বিষয়ে সহমত হবেন তারা আসলে নাট্যদৃশ্যের এই গল্পের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান। সেই অত্যাচারীর কৌশল খুঁজে পান। আর পান অত্যাচারিতদের প্রতিক্রিয়া, সে সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়, যে কোনো একটা, সঙ্গে অত্যাচারের কখনো বা দুটোই।

আসলে একজন শাসক, অন্তত আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে, বেশ কিছু রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে, সরকার পক্ষ ' ক্লাইমেট অব ফেয়ার' -এর [২] এমন একটা বাতাবরণ তৈরি করে, যে বাতাবরণে আছে ভয় তৈরি করার কাঠামো। আর সেই ভয়ের আবহ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করেছে, তাকে ব্যক্তিগতভাবে ভাঙা শক্ত। সঙ্ঘবদ্ধভাবে যদি প্রতিবাদ করা যায়, তাহলে ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু ভয় সৃষ্টিকারী অত্যাচারী পক্ষ সব সময় এমন একটা সুপরিকল্পিত বাতাবরণ তৈরি করে, যেখান থেকে অধিকাংশ মানুষ বেরিয়ে আসতে সক্ষমই হন না। কিন্তু কেন বেরিয়ে আসতে

পারেন না? কারণ "অত্যাচারীরা ক্ষমতাবলে অত্যাচার করে, শোষণ করেএবং বলাৎকার করে; সেই ক্ষমতা দিয়ে তারা যেমন অত্যাচারিতকে মুক্ত করতে পারে না, তেমনি নিজেদেরও মুক্ত করতে পারে না। ... অত্যাচারিতের দূর্বলতার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অত্যাচারীর ক্ষমতাকে কিছুটা খর্ব করার প্রচেষ্টার মানেই দাঁড়াবে মেকি দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন। সত্যিকার অর্থে, এই করুণা প্রদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই করতে পারে না। নিজেদের 'দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের' অবিরাম সুযোগ লাভের জন্য অত্যাচারীকে অন্যায়-অবিচারের প্রক্রিয়াকে প্রবহমান রাখতে"[৩] হয়।অন্যদিকে 'অত্যাচারিতের কাজ হচ্ছে তাদের সাথে একাত্মতা-ঘোষণাকারী লোকজনকে নিয়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা। এই সংগ্রাম প্রাক্সিসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অত্যাচারের সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিলাভের পথে কঠিন বাঁধা পেরোতে হবে তাদের; কারণ অত্যাচার-নিপীড়নকারী বাস্তবতার মধ্যে বসবাসকারী লোকজনকে বিরাজমান অবস্থা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তাদের চেতনাকেও তা বিভ্রান্ত করে। অত্যাচার-অবিচার মানুষের মধ্যে আপসকামিতারও জন্ম দেয়। এই আপসকামিতার হাত হতে রক্ষা পেতে হলে অন্যায় অবিচারের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই '[৪] করতে হবে। ফলত অত্যাচারী পক্ষ তার ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়। অত্যাচারিত পক্ষ, সে ক্ষমতা রোধ করতে চায়। ফলে তারা একটা 'সংগঠিত বিশৃঙ্খলা'র [৫] পরিস্থিতি তৈরি করে। অত্যাচারীর এই 'সংগঠিত বিশৃঙ্খলা' তৈরির ক্ষেত্রে তারা একদল 'ক্ষুদে অত্যাচারী' তৈরি করে অত্যাচারিতের পক্ষের কিছু মানুষকে মেকি সহানুভূতি এবং কৃত্রিম কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে। এসব দৃশ্য অনেক নাটকে দেখা যায়।

প্রবেশক

কবর নাটকে এসব কিছু আছে। সেই সঙ্গে আছে দুটো পক্ষ, অন্তত ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের রীতি মেনে পূর্ব পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ। এখানে পূর্বপক্ষে আছে নেতা আর প্রতিপক্ষে আছে মুর্দা ফকির আর কবরে না -যেতে চাওয়া মূর্তিরা। এবং 'ক্ষুদে অত্যাচারী'র ভূমিকা পালন করেছে হাফিজ। কেন এই সমীকরণ? আসলে কবর নাটক লেখার পিছনে অত্যাচারীর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির একটা বড়ো ভূমিকা আছে, সেটা তারা পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করেছিল বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করতে। কবর নাটক সৃষ্টি হওয়ার ইতিহাস, মুনীর-মানস অত্যাচারীর সৃষ্ট ভয়ের আবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কাঠামোর প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে।

১৯২৫ সালে ২৭ নভেম্বরে জন্ম মুনীর চৌধুরীকে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়েসে আল বদরের ঘাতক দল তুলে নিয়ে যায় যাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত না থাকতে পারে। তারপর আর তিনি ফেরেননি। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন সেই সময় তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। রবি গুহ, দেবপ্রসাদ, মদন বসাক, সরদার ফজলুল করিমরা ছিলেন তার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মুখ্য প্রেরণা। অন্যদিকে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, অজিত কুমার গুহের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে প্রগতি

লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন। কেন 'কবর' নাটকে ভাষা আন্দোলন সক্রিয়, কেন এই নাটকে অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারের কাঠামোকে নাঙ্গা করে দেখানো হয়েছে, তার একটা বড়ো কারণ এই যে মুনীর চৌধুরীর ভাষা আন্দোলনের প্রতি প্রথম থেকেই সক্রিয় অংশগ্রহণ, এই আন্দোলনকে সমর্থন এবং এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাঙালীর জাতীয়তাবাদ জড়িত ছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকায় সর্বপ্রথম যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, মুনীর চৌধুরী সেখানে ভাষণ দেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে তিনি উদ্যোগী হয়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাকে কারাবরণ করতে হয় ২৬ ফেব্রুয়ারিতে। প্রায় দু বছর কারাগারে বন্দী ছিলেন। ১৯৫৩ সাল, তখন তিনি ঢাকা জেলে। জেলে তার সঙ্গী ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি অনুরোধ করেন যাতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলের রাজবন্দীরা অভিনয় করতে পারে এমন একটি নাটক লেখার জন্য। মুনীর চৌধুরী লিখলেন কবর নাটক । অভিনয়ও হল।[৭]

অনেক নাট্যতাত্ত্বিক আর উইন শ'র 'বেরী দ্যা ডেড' (১৯৩৬) নাটকের প্রভাব মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকে আছে বলে মনে করেন। তাঁরা 'বেরী দ্যা ডেড' নাটকের মৃত সৈনিকদের বিদ্রোহের বাস্তবতার দিকটির সঙ্গে কবর নাটকের মূর্তিদের বিদ্রোহকে তুলনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু কবর নাটকে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে শুধু উপস্থাপন করা হয়নি। বরং 'বাস্তবতার বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে নেতা ও ইন্সপেক্টরের মদ্যপান জনিত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ... মুর্দা ফকিরের বৃত্তান্তে ভাষা -আন্দোলনকে অতিক্রম করে মুনীর চৌধুরী আমাদের সামাজিক জীবনের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত,[৮] আসলে 'সামাজিক জীবনের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত'— এই বক্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে অত্যাচার ও অত্যাচারীর দ্বন্দ্বের দিকটি। কিন্তু কীভাবে লুকিয়ে আছে?

কবর নাটকের যে মঞ্চ নির্দেশনা আছে, সেটা তৈরি করা হয়েছে অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে। কারণ নাটকটি জেলখানায় অভিনয়ের কথা মাথায় রেখে লেখা। জেলখানায় ন্যূনতম উপাদান নিয়ে অভিনয় করা সম্ভব। এ নাটকের মঞ্চ নির্দেশনায় ভারতীয় ক্লাসিক মঞ্চভাবনা বা পাশ্চাত্য মঞ্চভাবনার কোনো প্রভাব নেই। বিভিন্ন লোকনাট্য ধারায় যেভাবে নাটকের মঞ্চভাবনাকে নাট্যকার শুরুতেই নির্দেশ দিয়েছেন, 'মঞ্চে কোনোরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হবে না। হ্যারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।'[৯] এটা গেল জেলে পাওয়া এমন সব উপাদান ব্যবহার করে আলোর ব্যবহারের দিক। মঞ্চটা কেমন হবে? — এরও নির্দেশ আছে এ নাটকে, ' তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কালো কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুটি অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কি ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎঅংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।'[১০] শাসক কীভাবে ভাষা আন্দোলনকারীদের অধিকার যারা

বুঝে নিতে চায়, তাদের উপর অত্যাচার করে, নাটকের নির্দেশনা সে দিকের সংকেত দেয়। যেভাবে পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসক ক্রমাগত জোর করে আসছিল তাদের ভাষাকে চাপিয়ে দিয়ে, তাদের শাসনকে মেনে নিতে, তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু বাংলাদেশীরা সেটা মেনে নিতে পারেননি। আসলে অত্যাচারী পক্ষ সব সময় তার মতাদর্শ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা না -মেনে নিলে, অত্যাচারীরা ভয়-দমন-পীড়ন-শাস্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। শারীরিক এবং মানসিক হেনস্তার ফলে এমনভাবে নিপীড়ন করা হয়, যাতে তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে না -পারে। কিন্তু অত্যাচারীরএই শোষণ কাঠামোকে কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ করে কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, প্রতিবাদে। আবার কখনো শিল্প সাহিত্যকে মাধ্যম করে ঠিক যতটা বলা যায়, সেই মাত্রাবোধকে অক্ষুন্ন রেখে প্রতিবাদ করে। একেবারে শুরু থেকে ভাষা আন্দোলনকে খর্ব করা, বাঙালি জাতিকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে মুনীর চৌধুরী যেমন প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের পথে নেমেছিলেন, সভা সমিতি করা, বক্তৃতা দেওয়ার কাজ করেছিলেন, তেমনি জেলে বন্দী থেকেও নাটককে হাতিয়ার করে নাট্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ভাবনার মধ্যেও প্রতিবাদের সেই ছাপ রেখেছেন।

কবর নাটকে দেখি অত্যাচারীরা ভয়ের বাতাবরণ অনেক আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল। নেতা যখন কবরস্থানে বসে মদ খাচ্ছিল সে সময় নেতার পিছন থেকে হাফিজ প্রবেশ করলে ভয় পেয়ে বলে, 'ওহ! আপনি! এমন করে নাকে মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চমকে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে এ-রকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি'[১১] এই 'গত চার-পাঁচ' বছরের উল্লেখ বেশ কয়েকবার এই নাটকে এসেছে। সময়ের হিসেব দেখলে দেখা যায়, নাটকের ঘটনাটা ঘটেছে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রাতে। ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা অতিক্রম করায় ২২শে ফেব্রুয়ারি হয়েছে। ১৯৫২ এর 'চার-পাঁচ' বছরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আসলে ভয় সৃষ্টি করার এবং ভয় পাওয়ানোর ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই যারা ভয় দেখাবে, তারা কেন ভয় পাবে! পাকিস্তানি শাসক আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকেই ভয় পেয়ে এমন ভয়ার্ত সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণময় একটা 'সংঘটিত বিশৃঙ্খলা' তৈরি করেছিল।

শাসক অত্যাচারের কাঠামোতে অত্যাচারিদের মধ্যে থেকে তাদের অনুগামী কয়েকজন 'ক্ষুদে অত্যাচারী' তৈরি করে। এই অনুগামী তৈরির পিছনে থাকে শাসক পক্ষের মেকি দয়া -দাক্ষিণ্য এবং করুণা প্রদর্শন। কিন্তু অত্যাচারী বা শাসক কখনো অনুগামীর অধিকারকে মান্যতা দেয় না। আসলে অনুগামীর অধিকারকে মানলে তার চাহিদা এবং দাবিকেও মেনে নিতে হয়। তার অস্তিত্বকেও মেনে নিতে হয়। কিন্তু তা তারা করবে না। তারা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধে,কিছুটা ক্ষমতার স্বাদ পাইয়ে দিয়ে তাকে নিজের করে নেওয়ার ভান করে। এতে অনুগামীরা তুষ্ট হয়ে অত্যাচারীকে ছাড়িয়ে ক্ষুদে অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

এরা হয়ে ওঠে শাসক পক্ষের সহযোগী। যখন প্রতিবাদী পক্ষ শাসক পক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন শাসক পক্ষ তার সহযোগী ক্ষুদে অত্যাচারীকে প্রতিবাদী পক্ষের সামনে এগিয়ে দেয়। আর ক্ষুদে অত্যাচারী শাসক পক্ষকে সমস্ত রকমের সাহায্য করে থাকে। প্রত্যক্ষ দমনে কাজ না-হলে পরোক্ষ দমনে ছলনার সাহায্য নেয়।

কবর নাটকে হাফিজ 'ক্ষুদে অত্যাচারী' এই কাঠামোকে মেনেই সৃষ্টি। শাসক প্রথম থেকেই হাফিজকে রিসোর্সফুল অফিসার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারা হাফিজের নাম রেকমেন্ড করেছে। তারা হাফিজের নাম রেকমেন্ড করবে উপর মহলে প্রমোশনের জন্য। হাফিজকে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবে । কারণ হাফিজ অত্যাচারিতদের মতো 'বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়' না, 'নিমক বলে মানে'[১২]। বেতনকে দাবী হিসেবে মেনে নিলে আসলে অত্যাচারিতদেরও মেনে নিতে হয়, তাদের অধিকারগুলোকেও মেনে নিতে হয়, যেটা পাকিস্তানি শাসকরা মেনে নেয়নি। কারণ অত্যাচারিতকে কখনো মানুষ হিসেবে ভাবে না। এরাও, নেতা, পাকিস্তানি রাজাকাররাও ভাবেনি। মানুষ এখানে একটা সংখ্যা, বস্তু মাত্র।[১৩] শাসকপক্ষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বেতন মানে অনুদান। নিমক খেয়েছে সে কারণে অনুদান। আনুগত্য প্রকাশ করেছে, তার কারণে পুরস্কার এই বেতন। বিনিময় প্রথার মতো, তুমি আমাকে আনুগত্য প্রকাশ কর, পরিবর্তে আমি খুশি হয়ে তোমাকে অনুগ্রহ করব, পদ দেব, সুযোগ সুবিধা দেব। এটা যে শ্রমের বিনিময়ে, অধিকার সেটা মানতে নারাজ। শাসক পক্ষের বিপরীতে থাকা এরা অধিকারের দাবী করলেই বাঁধে দ্বন্দ্ব। কারণ শাসক পক্ষ হাফিজের মতো 'ফেইথ ডিসিপ্লিন'ওয়ালা লোক চায়, যে তার হয়ে কথা বলবে, সওয়াল করবে এবং মন যুগিয়ে চলবে। হাফিজকে কাছে টেনে নিয়েছে শাসক পক্ষ, কেন? কারণ হাফিজ অত্যাচারীর এই সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েছে প্রশ্নহীনভাবে।

কবর নাটকে যে দুটো দল আছে, শাসকের পক্ষে এবং বিপক্ষে, তার মধ্যে হাফিজ পক্ষের দলে। শাসক বিপক্ষ দলের লোককে নিজের দলে টানার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাতের ছক তৈরি করে। প্রত্যক্ষ ছকে থাকে সরাসরি আঘাতের দিক। পরোক্ষ আঘাতে থাকে কখনো কখনো ছলনার আশ্রয়। এখানে অত্যাচারী কৌশলে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত সংকট এমনভাবে তৈরি করে, যা অত্যাচারিতকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। হাফিজ যেভাবে ছলনার মাধ্যমে কবরে না-থাকতে চাওয়া গুলি খাওয়া মূর্তিগুলোকে, অধিকার বুঝে নিতে চাওয়া মৃত মূর্তিগুলোকে কথায়-ছলনায়, মিথ্যে আশ্বাস-প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়ে, তাতে হাফিজ নিজের অবস্থান ভুলে শাসকের স্থানে বসেছে।

এ নাটকে শাসক পক্ষের বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে মুর্দা ফকির চরিত্র। মুর্দা ফকির মানুষ মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানেন না-খেতে পাওয়া। মুর্দা ফকির শাসক পক্ষের বিড়ম্বনার পিছনে কাজ করেছে এই সূত্রটি— একটি নিয়মকে প্রশ্ন করা থেকে কখনো কখনো উদ্ভূত হতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [১৪] মুর্দা ফকির প্রশ্ন করে শাসককে অস্বস্তিতে ফেলেছে এই বলে যে, কেন মূর্তিরা কবরে থাকতে চাইছে না? কেন মানুষের গা দিয়ে বারুদের গন্ধ? লাশগুলো

গোর দেবার সময় 'গোসল' দেওয়ার ফলে মূলত গোলাপ জলের সুবাস বের হবার কথা। কেন লাশগুলো কাটাকুটি করা? কেন লাশগুলো থেকে বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে? স্বাভাবিক লাশে এটা থাকে না। মানে অস্বাভাবিক কিছু একটা সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে এমনটা। কেন এরা কবরে থাকবে? অথচ কবরে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল যখন সব কিছু অস্বাভাবিক তখন অস্বাভাবিকের নিয়ম মেনে এরাও থাকতে চাইছে না।

এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমেই 'সংঘবদ্ধ বা সমষ্টিগত অপরাধ'-এর [১৫] বিরুদ্ধে না-মানার আর একটি প্রয়াস মুর্দা ফরিকের চরিত্র গঠনের মধ্যে খুঁজে দেখা যেতে পারে। যায় বলেই মুর্দা ফকির নেতার মুখের উপর, শাসকের মুখের উপর সরাসরি কথা বলেছে। নিজের দাবি জানিয়েছে ।

যেটা দিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল-

এই নাটকে বারংবার গত পাঁচ বছরের কথা এসেছে ঘুরে ফিরে! যার মধ্যে ছিল ভয় দেখানোর কথা। স্বাভাবিকভাবে এটাই হওয়ার কথা ছিল- একটা বাংলাভাষিক অঞ্চলের ভাষা বাংলাই হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা তা মানবে কেন। যেহেতু এই পূর্ব দৃষ্টিকোণ আসলে অস্বাভাবিক। কারণ এরা পূর্ব বাংলার স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন করছে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা এমন একটা সংঘবদ্ধ অপরাধের পরিমণ্ডল তৈরি করছে, যাতে ভয় এবং ত্রাসের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বাধ্য হবে 'অপরাধী' রা আনুগত্য প্রকাশ করতে। অন্তত এ নাটকে বর্ণিত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে পাঁচ বছরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে, নেতার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তারা সকলেই অপরাধী। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। পাঁচ বছরের তৈরি সংঘবদ্ধ অপরাধের বছরে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ, তা আসলে ছিল পাকিস্তানীদের তৈরি সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধাচরণ। যা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবাদের চূড়ান্ত সীমানা স্পর্শ করেছিল। বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্রভূমি তৈরি হয়েছিল। 'গত পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বিশ্লেষণ করলে, উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে পালে হাওয়া পেতে পারে।

১৯৩৭ সালে মুসলীম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্না উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা করতে উদ্যোগী হলেও ফজলুল হকের বিরোধিতায় সেটি কার্যকর হয়নি। ১৯৪০ -এ লাহোর প্রস্তাবের প্রাক্কালে এই ভাষা ইস্যু উঠলে তা নানা কারণে ধামাচাপা পড়ে গেছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগের ফলে এই ভাষার প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ১৭মে মুসলীম লীগের প্রভাবশালী নেতা খালিকুজ্জামান এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব দেন। কিন্তু ড. শহীদুল্লা এবং অন্যান্যদের বিরোধীতায় সেটি কার্যকরী হয়নি। ঐ বছর জুলাই মাসে 'গণআজাদী লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা স্পষ্টতই পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাইছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'তমদ্দুন মজলিস'। এরা সভাসমিতি এবং পত্রপত্রিকায় লেখা-লেখির মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে সওয়াল

করেছিল। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ', পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক, বিভিন্ন সংঘ সভা সমিতি লেখালেখির মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে দাবী জানায়। এদিকে ১২ ডিসেম্বর বাঙালি-অবাঙালির সংঘর্ষ হয়। এর ফলে ১৩ ডিসেম্বর সচিবালয়ের কর্মচারীরা ধর্মঘট ডাকেন। ফলস্বরূপ ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার। ১৯৪৮ সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' দাবী তোলে ফেব্রুয়ারিতে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবহারের দাবিও ওঠে। ভোটাভুটিতে বাংলা ভাষার পক্ষে সওয়ালকারীরা মুসলীম লীগের ভোটে হেরে যায়। এর প্রতিবাদে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালন করা হয়। ২ মার্চ দ্বিতীয় বারের জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল। ১১মার্চ পরিষদ হরতালের ডাক দেয়। এই হরতালে লাঠিচার্জ করা হয়, সেই সঙ্গে ৬৯জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি করতে বাধ্য হন। এর মধ্যে বন্দীমুক্তি, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উপস্থাপন করার কথা জানায়। ২৪ মার্চ মহম্মদ আলী জিন্না ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' সঙ্গে বৈঠকে বসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার পক্ষে মত দেয়। প্রতিবাদে সেই সভা থেকেই না না ধ্বনিত হয়। ৬ এপ্রিল নাজিমুদ্দিন ৮ দফা চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে ৮ এপ্রিল থেকে ১৮ দিন ভাষা সহ অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে চলে ছাত্র-আন্দোলন, ধর্মঘট। ১৮ নভেম্বর লিয়াকত আলী ঢাকায় এলে ছাত্র বিক্ষোভ হয়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা হয়, ১৯৪৯-এ আরবি হরফে বাংলা লেখার সরকারি ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে আকরম খাঁ -এর সভাপতিত্বে 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালে নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ২৭ জানুয়ারি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করেন। প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয় । আব্দুল মতিন আহ্বায়ক হয়ে 'নতুন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এরাই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে। এই পরিষদ ২১ এ ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকে। [১৬]

এই নাটকের সূত্রপাত ঠিক এর পরেই। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলি চালানোর প্রত্যক্ষ আঘাতের পরের ঘটনা দিয়ে। সেই অর্থে কবর নাটকে নেতা কিছু হম্বি-তম্বি করলেও প্রত্যক্ষ আঘাতের সেরকম কোনো উদাহরণ নেই। পরিবর্তে পরোক্ষ আঘাতের বাতাবরণ দিয়ে এ নাটকে সাজানো হয়েছে। সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে ওস্তাদ হাফিজ হয়েছে শাসক পক্ষের তুরূপের তাস। কিন্তু এই নাটক শুরু হওয়ার আগে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের জনগণের উপর কীভাবে সংঘবদ্ধ অপরাধের ফলে ভয়ের বাতাবরণ, ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছিল?

এই সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। প্রতিবাদীদের উপর কীভাবে প্রত্যক্ষ আঘাত হানা হয়েছিল?— এত সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় একদিকে যেমন গুলি চালানোর ঘটনায়, কবরে না থাকার প্রশ্নে। মুর্দা ফকির আসলে এ নাটকে গোটা পূর্ববঙ্গের ত্রাসের -ভয়ের- অত্যাচারের সামনে নুইয়ে না -পড়া চরিত্র। শাসকের শোষণের যখন কোনো অস্ত্র কাজ করে না, তখন বিকল্প মগজধোলাই অস্ত্রের প্রয়োগ করে। সেই জন্য নাটকের শেষে নেতা বলে, 'হুম! চলো! আর দ্যাখো মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক"। [১৭] কিন্তু সবাই হাফিজ হয় না। মুর্দা ফকির তো নয়ই। শাসকরা জানে মুর্দা ফকিরেরা সংক্রমনাত্মক রোগের মত সহজেই এবং অনায়াসে তাদের প্রতিবাদ - প্রতিরোধকে ছড়িয়ে দেবে জনতার মধ্যে। অনায়াসে ভেঙ্গে দেবে অত্যাচারীর অত্যাচারের কাঠামোকে।

টীকা ও তথ্যপঞ্জিঃ-

১) "কোনো একটি পরিস্থিতিতে 'ক' যখন 'খ' -কে শোষণ করে বা দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে 'খ' -এর ব্যক্তিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে তখনই অত্যাচারী অবস্থার সৃষ্টি হয়" অত্যাচারিতের শিক্ষা, পাওলো ফ্রেইরী, অনুবাদ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০২০, প্রথম অধ্যায়, পৃ.৩৭।

২) "In the Contemporary era, well-known industrialist Rahul Bajaj, in a function attended by Home Minister Amit Shah, claimed that there was a "climate of fear" in the country. 'Nobody from our India Undeclared Emergency, Arvind Narrain, The Modi Era, Antx, India, 2022, p.60.

৩) অত্যাচারিতের শিক্ষা, পাওলো ফ্রেইরী, অনুবাদ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ২০২০, প্রথম অধ্যায়, পৃ.২৬-২৭।

৪) এ, প্রথম অধ্যায়, পৃ ৩৩।

৫) 'সংগঠিত বিশৃঙ্খলা' আসলে 'সংঘবদ্ধ অপরাধ'-এর একটি দিক। 'সংগঠিত বিশৃঙ্খলা সুনির্দৃষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়। একটা পরিকল্পনা থাকে বিশৃঙ্খলাকারীর। 'সংঘবদ্ধ অপরাধ' -এর ক্ষেত্রেও তাও। শাসক বা অত্যাচারীর কাছে 'সংগঠিত বিশৃঙ্খলা' আসলে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। অত্যাচারীর ক্ষেত্রে প্রতিবাদের ।

৬) শাসক পক্ষ অত্যাচারীদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য তাদের সুবিধা দিয়ে এমন কয়েক জনকে তৈরি করে, যারা শাসক পক্ষের হয়ে কাজ করে। সামাজিক বা আর্থিক বা অধিকারগত দিক দিয়ে যে শাসক শ্রেণিভুক্ত না -হলেও মানসিকতায় এরা শাসক পক্ষের অনুসারী। অত্যাচারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অত্যাচার এরাই বাস্তবায়িত করে থাকে।

৭) মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, ভূমিকা আনিসুজ্জামান, পৃ. তিন চার পাঁচ।

৮) ঐ, ভূমিকা , আনিসুজ্জামান, পৃ. ১৩।

৯) মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২,

ভূমিকা আনিসুজ্জামান, কবর, পৃ. ৩৭।

১০) ঐ, পৃ. ৩৭। ১১) ঐ, পৃ. ৩৮। ১২) ঐ, পৃ. ৩৯।

১৩) 'যদি ভাবতে বসি, মানুষের কী মূল্য, দেখব তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে তার আইডেন্টিটির সঙ্গে, সে পরিচয় তাকে যতদূর অব্দি নিয়ে যেতে পারে, তা হিসেব করে, তাকে একটি ছকে পুরে ফেলা হয়েছে। সে এখন একটা ভোট, একটা সংখ্যা, বস্তু এক। মানুষ তার মনের মৃত্যু হোক বা বেঁচে থাকায়, কেউ কখনও মানুষকে ঠিক ও ভাবে দেখল না।'এ জন্ম মারাত্মক দুর্ঘটনা, রোহিত ভেমুলা'র সুইসাইড নোট থেকে, ভাষান্তর অনির্বাণ ভট্টচার্য, রবিবারোয়ারি, এই সময়, রবিবার, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩।

১৪) রোমিলা থাপার, বিরুদ্ধতার স্বর বেদের সময় থেকে শাহিনবাগ, অনুবাদ যশোমতী দেব সহ-অনুবাদ ও পাঠসম্পাদনা প্রসিত দাস, প্রতিক্ষণ, ২০২৩, পৃ.২১।

এখানে বিরুদ্ধতা কি জরুরি?- এই অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক লিখছেন, 'বুদ্ধ যে ধম্ম এবং বিনয়ের শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে অনুধাবন করার মতো ব্যর্থতা বা অভাব থেকই বিবাদের জন্ম হয়। সকল স্তরে এর ব্যাখ্যা হতে পারে, নিয়মকে অমান্য করা; আর গভীর স্তরে এর ব্যাখ্যা হতে পারে, নিয়মকে প্রশ্ন করা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। '

১৫) সংঘবদ্ধ বা সমষ্টিগত অপরাধের পিছনে কাজ করে এটি সুনিদৃষ্ট উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দেশ তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাষ্টকাঠামোকে ব্যবহার করে ভয়ের, ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ১৯৭০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচারড নিক্সন সেনেটর জন এল ম্যাকব্রেলানের আনা 'অর্গানাইজড ক্রাইম কন্ট্রোল অ্যাক্ট' এ স্বাক্ষর করেন এই ভয়ের ও ত্রাসের বাতাবরণ যাতে না -তৈরি করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে বিজাতীয় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে ক্ষমতাবান, রাষ্ট্র চালানোর নিয়ন্ত্রণ যার হাতে, সে অন্যদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাষ্ট্রের কাঠামোর আইন, সংস্থা দিয়ে ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের এই সংস্থা কখনো পুলিশ, কখনো সেনা, কখনো আমলা, কখনো কৃত্রিম ভাবে তৈরি জনমত, কখনো নেতা– এইরকম অনেকেই হতে পারে।

দ্রষ্টব্যঃ

১)Almendares, Nicholas and Landa, Dimitri, Collective Crimes: A Joint Intention Apporach (February 28,2022). Indiana Legal Studies Research Paper No. 431, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract+3791701 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3791701

২) Collective Crime and Collective Punishment JEFF MCMAHAN, Criminal Justice Ehtics,Winter/Spring2008,-https:/www.philosophy.rutgers.edu.joomlatools-files/documan-files/Collective_Crime_Collective__Punishment.pdf

১৬) http://www.ebookbou.edu/bd/Books/Text/SSHL/BABSS/bhi_Unit-02.pdf ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলীর জন্য এই লিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে।/

১৭) মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, কবর, পৃ.৫৮।

লেখক : **পাতাউর জামান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, কলকাতা।**

Author: **Pataur Jaman, Asstt. Professor, Bengali, South Calcutta Girl's College.**

এ আই-এর নাটক, নাটকীয় এ আই

■ বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাদা থিয়েটার, একাডেমী অব পারফর্মিং আর্টস, প্রাগ আর চার্লস ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা মিলে একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটান। স্টেজে প্রথমবারের মতো একটি নাটক অভিনীত হয় যা কোন মানুষ রচনা করে নি। এই নাটকটি নির্মাণ করেছে এ আই। এ আই, আর্টিফিসিয়েল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন পুরো বিশ্বে একটি বহু চর্চিত নাম। পারমাণবিক বোমা নির্মাণের পর এই বোধহয় প্রথম তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী, গবেষক থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রী আমলা ব্যবসায়ী সবাই এ আই এর উপকারিতা এবং ঝুঁকি সম্বন্ধে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত এবং চিন্তিত। নিঃসন্দেহে সভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী কীর্তি কিন্তু তার প্রভাব সাধারণ মানুষের জনজীবনে কিভাবে পরবে সেটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিমেষের মধ্যে আপনি যে কোন কঠিন সমীকরণের সমাধান বের করে ফেলতে পারবেন। লিখে ফেলতে পারবেন, বা আপনার হয়ে এ আই লিখে দেবে, পাঠকের জন্য চমৎকার গদ্য আর প্রেয়সীর জন্য লাভ সনেট বা নিদেনপক্ষে একখানা গবেষণাপত্র যা কিনা কোন অ্যান্টি -প্লেজিয়ারিজম সফটওয়ারের দ্বারা ধরা সম্ভব হবে না। বা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী বানিয়ে তুলবে অতুলনীয় এক ছবি যা শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই সব ঘটনাই কিন্তু ঘটে চলেছে আমাদের চোখের সামনে। খবরের কাগজে নিত্য খবর উঠছে এরকম। তবে চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে যেভাবে এ আই অগ্রসর হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে সে কোন্ রূপ ধারণ করবে তা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে তার নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে জোরালো আওয়াজ উঠছে বিভিন্ন মহলে। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসেছেন এই যুযুধান সমস্যাকে মোকাবিলা করতে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক জফ্রি হিন্টন, যিনি কিনা সম্প্রতি গুগলের চাকরি ছেড়েছেন, এ আই সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমে আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে যা কিনা মানব সভ্যতার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমনিতেই আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ফেক নিউজ, ফেক ইমেজের ছড়াছড়ি, তার মাঝখানে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অসৎ অসংযত প্রয়োগ কোন্ নতুন বিপদ ডেকে আনবে বা আনছে তা ভেবে উনি সত্যিই উদ্বিগ্ন।

এবার ফিরে আসি যা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। ১৯২০ সালে চেকোস্লোভাকিয়ান লেখক, নাট্যকার ক্যারেল চ্যাপেক তাঁর লেখা "আর -ইউ -আর" (R.U.R -রসুমস ইউনিভার্সাল রোবটস) নাটকে প্রথম রোবট শব্দটি ব্যবহার করেন। আর ঠিক ১০০ বছর, সেই নাটকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরেকটি নাটকের আগমন ঘটল যার রচয়িতা স্বয়ং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। নিছক কাকতালীয় ঘটনা বলে এটাকে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। চ্যাপেকের নাটকে দেখানো হয় যে মানুষের আবিষ্কৃত হিউম্যানয়েড রোবটস প্রথমে মানুষের অধীনে কাজ করতে থাকে কিন্তু পরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যা মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়। বড় পর্দার হলিউডি চিত্রনাট্য মনে হলেও বর্তমান প্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য কতখানি গভীর সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। যাই হোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নির্মিত এই নাটকটি একটি প্রোজেক্টের অংশ হিসেবে দেখা হয়।

প্রোজেক্টের নাম : AI: When a Robot writes a play (এ আই: যখন একটি রোবট নাটক লেখে)। ডঃ রুডলফ রোজা যিনি চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সস্টিটিউট অফ ফরম্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিকসে কাজ করেন, তাঁর নেতৃত্বে এই কাজটি সম্পন্ন হয়। ইন্সস্টিটিউটের অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে, তিনি মেশিন লার্নিং এর উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাটকের স্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য একটি সিস্টেম তৈরি করেন। তিনি Open AI-এর ভাষা মডেল GPT-2 ব্যবহার করেছিলেন, যা আট মিলিয়ন ওয়েবপেজ থেকে চল্লিশ জিবি(৪০ জিবি) টেক্সট প্রক্রিয়া করেছে। আন্তর্জালিক জগতে যত তথ্য রয়েছে এই দুনিয়া সম্বন্ধে , মানব জাতি সম্বন্ধে, প্রায় সমস্ত কিছু নিমেষে আয়ত্ত করে ফেলেছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জন্ম দিয়েছে এই নাটকের। নাটকটির ৯০ ভাগ লিখেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মাত্র ১০ ভাগ মানুষের দ্বারা সমন্বয় করা হয়েছে। দলটি তাকে শুধুমাত্র একটি পরিচায়ক দৃশ্য দিয়েছিল। বাকিটি সে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করেছে। এই নাটকে রয়েছে ৮টি দৃশ্য এবং দেখান হয়েছে এক রোবটের জীবন এবং মানব জগতে তার অস্তিত্ব। নাটকটিকে ব্ল্যাক কমেডি হিসেবে গণ্য করা হলেও এতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উপাদান পাওয়া গেছে। এই নাটকের উদ্ভাবন এবং প্রদর্শন দুইই সাড়া ফেলে দিয়েছে সাংস্কৃতিক মহলে।

এরকম একটি অবস্থায় শিল্প বা শিল্পীদের ভবিষ্যৎ কী? এই প্রশ্ন বারবারই করতে ইচ্ছে করে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যত শক্তিশালী হয়ে উঠবে দিন দিন, যত নিখুঁত হতে থাকবে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তার নির্মিত সৃষ্টি ততই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। এতদিন প্রতিযোগিতা ছিল নিজেদের মধ্যে, কে ভালো লিখতে পারবে, কে ভালো গান গাইতে পারবে, কে বিজ্ঞানকে নতুন দিশা দেখাবে বা কে গণিতের কোন কঠিন সমীকরণের সমাধান খুঁজতে পারবে, কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে মানব জাতির হাজার বছরের

অর্জিত জ্ঞান, তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে ওঠা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিমেষের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারছে এবং কৃত্রিম প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তুলতে পারছে উৎকর্ষ মানের শিল্প সেখানে প্রতিযোগিতা বড়ই একতরফা এবং নিরর্থক হয়ে যায়।

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এবং শিল্প কোন উদ্দেশ্যসাধনে নয়, বরং সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করতেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। শিল্পের সাধন এবং তার প্রয়োগ মানুষকে করে তুলেছে সৃজনশীল আর সমাজকে বাসযোগ্য। সেই প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসের দিনগুলোর সময় থেকে অদ্যাপি প্রচলিত আধুনিক শিল্পের সবটাই মানবজাতির অদম্য কল্পনা-প্রতিভার প্রমাণ দেয়। আর তা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নেরই একটি বিশেষ অঙ্গও বটে। স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থান যদি বিপন্ন হয় ভবিষ্যতে সেটা মানবজাতির পক্ষে যাবে না সেটা ধরে নেওয়াই যায়।

লেখক : **বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য,** ইংরেজী সাহিত্যে পিএইচ ডি গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা এবং এই জার্নালের সহ-সম্পাদক।

Author: **Biprajit Bhattacharjee, Ph.D Scholar of English literature in Presidency University & Asstt. Editor of this Journal.**

রবীন্দ্র-নাটকের নবরূপায়নে শুক্রাচার্য রাভার অভিনবত্ব

■ বরুণ কুমার সাহা

১

অসমের গোয়ালপুর জেলার রামপুর নামক এক অখ্যাত গ্রামের নাট্যশিল্পী শুক্রাচার্য রাভার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে—তিনি যেমন করে ভাবেন, অন্যরা সেভাবে ভাবেন না, বা ভাবতে পারেন না। নাট্যক্ষেত্রে তাঁর সেই অভিনবত্বের জন্যই সেই অখ্যাত গ্রাম রামপুর আজ বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত। এমনকি স্বল্পায়ু[১] শুক্রাচার্যের মৃত্যুর পরও— তাঁর অতি আপন— রামপুর গ্রামে শালবনে অনুষ্ঠিত 'Under the Sal Tree.'[২] থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে দেশের তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাট্যপ্রেমী লোক নাটক দেখতে আসেন, নাটক পরিবেশন করতে আসেন।

২

২০০৩ সালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার বিখ্যাত নাটক 'রূপালীম'-এর রাভা সংস্করণের পরিকল্পনা ও সার্থক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নিজের দক্ষতা আরও ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শুক্রাচার্য এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি নাটক বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংযোজন-বিয়োজন -পরিবর্ধন-পরিমার্জন হতে পারে, সেখানে পুনর্নির্মাণ অথবা বিনির্মাণ হতে পারে, তবে অবশ্যই শিল্পের ঔচিত্যবোধের পরিসীমায় থেকে। এরপর ২০০৪ সালে যখন তিনি নাট্যকার এইচ.এস. শিবপ্রকাশের কানাড়া নাটক 'মাদাইয়া মুচি' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস আরও জাগিয়ে তুললেন, তখনই তাঁর জীবনে অন্য একটি অভিনব ঘটনা ঘটে গেল এবং সেটা হচ্ছে বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব হেইসনাম কানহাইলালের সংস্পর্শ। নাট্যগুরু কানহাইলাল তাঁর প্রিয়-শিষ্য শুক্রাচার্যের সম্মুখে খুলে দিলেন নাট্যজগতের এক বিরাট দুনিয়া— গুরু কানহাইলালের ছত্রছায়ায় শুক্রাচার্য প্রায় দুবছর মণিপুরে নাট্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কানহাইলালের নাট্যাদর্শ, শৈলী, বিনির্মাণ, শারীরিক কৌশল থেকে শুরু করে আধুনিক নাটকের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।"[৩] বলা যায়, এখানেই শুক্রাচার্য প্রকৃত অর্থে নিজের একটি শিল্পাকাশ খুঁজে পেলেন।

এরপর কয়েক বছর বিভিন্ন নাট্যচর্চা, কর্মশালা ইত্যাদিতে নিজেকে জড়িত করেন শুক্রাচার্য, এমনকি ২০০৭ সালে নেদারল্যাণ্ডের নাট্যকর্মী এভেলিয়েন পুলেন্সের সহযোগিতায় একমাস ব্যাপী কর্মশালারও আয়োজন করেন।[৪] কানহাইলালকে গুরু হিসেবে বরণ করার

পর বেশ কিছু নাটক পরিচালনা করেছিলেন তিনি। যেমন '—'পয়দম'[৬]। একটি লোককথাকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল এই নাটকে। ফলে নাটকটি কল্পনার ক্ষেত্রে শুক্রাচার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ, স্বাধীনতা ও সম্ভাবনা ছিল প্রচুর এবং সেক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছেন। ২০০৬ সাল থেকেই নাটকটি রামপুর, গুয়াহাটি, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে— ভাষার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও— প্রদর্শিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপর 'দাংগায়', 'দুমুকচি' ক্রমে ২০০৯ ও ২০১০ থেকে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হতে থাকে।

৩

দেশের বিভিন্ন স্থানের মঞ্চসফল নাট্য-প্রদর্শনের পর নিজের স্টাইল ও লক্ষ্য নিয়ে শুক্রাচার্যের আত্মবিশ্বাস সেসময় তুঙ্গে। তিনি নাট্যভাবনার নিজস্ব রূপরেখা এঁকে ফেলেছিলেন ততদিনে। ফলে পোক্ত হাতে এবার তিনি ঝুঁকি নিলেন আরেকটি চ্যালেঞ্জিং কাজে, এবং সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' নাটকের মঞ্চায়ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূল নাটকটিকে হুবহু নিজের মাতৃভাষা রাভায় তুলে ধরলে তিনি সফল হতেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু সন্তুষ্ট হতেন না। তাই 'রথের রশি'র নবরূপায়নের মধ্য দিয়ে দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন তিনি। বলা যেতে পারে 'রথের রশি' নবরূপায়নের অভিনব পরিকল্পনা, যথাযথ প্রযোজনা ও সুপরিকল্পিত পরিচালনা নাটকটিকে নতুন আর্টিস্টিক রূপ প্রদানে সক্ষম হল। তিনি যতগুলি নাটক করেছেন সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রদর্শিত হয়েছে রবি ঠাকুরের এই নাটকটিই। শুক্রাচার্যের মৃত্যুর পর যে 'স্মরণিকা' প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে 'রথের রশি' কোথায় কোথায় প্রদর্শিত হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যেমন— বাদংদুপ্পা কলাকেন্দ্র (রামপুর), প্রাগজ্যোতি আইটিও (মাছখোয়া, গুয়াহাটি), রবীন্দ্র ভবন (গুয়াহাটি), ডিব্রুগড়, নায়া দিল্লি, চণ্ডীগড়—অসমের বিভিন্ন গ্রাম যেমন বরদামাল, দরনি, দেপালচুং, ভৈষখুলি, নদীয়াপাড়া। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন— আইআইটি (গুয়াহাটি) ও সোনাপুর কলেজ। কলকাতার টালিগঞ্জ পোলো ক্লাবে নাটকটি প্রদর্শিত হওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমে (Times of India, 12 November 2012) বিষয়টাকে এভাবে ফোকাস করা হয়েছিল— "As part of their 7th Rabindra Utsav Celebtations, Heppening in association with Badungduppa Drama Group fron goalpara, Assam, organised Rabindranath Tagore's play 'Rather Rashi' on the Tollygunge Club premises recently, performed by Assamese actors of the Rabha community in their dialect. It was a unique representation of tagore's play."[7] এছাড়াও কলকাতার রবীন্দ্র সদন, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি স্থানেও মঞ্চসফলতার সঙ্গে শুক্রাচার্য পরিচালিত 'রথের রশি' নাটকটি প্রদর্শিত হয়। নাটকটি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে সেটা মঞ্চস্থ করার জন্য শুক্রাচার্য অনেক জায়গায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয়েছিলেন। গুয়াহাটির শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে নাটকটি প্রদশিত হওয়ার কথা ছিল ২০১৮ সালের জুন মাসে। কিন্তু তার মাত্র কয়েকটি দিন

অগেই হঠাৎ নাট্যশিল্পী শুক্রাচার্যের অকাল প্রয়াণ ঘটে। নাটকই ছিল শুক্রাচার্যের সাধনা। আর তাঁর এই সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবিহ্বল বাড়ুংডুপ্পা গোষ্ঠীর শিল্পীরা ওই নির্দিষ্ট দিনটিতেই নাটকটি প্রদর্শন করেন এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শুক্রাচার্য পরিচালিত 'রথের রশি'র চাহিদা আজও আমরা লক্ষ করি। মণিপুর কলাক্ষেত্রের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে 'রথের রশি' প্রদর্শিত হয়। শুধু তাই নয় ৬ জানুয়ারি ২০২৩-এ কোকরাঝাড় লিটারেরি ফেস্টিভ্যালে[৮] ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ কেরলে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যালেও[৯] বাড়ুংডুপ্পা কলাকেন্দ্র শুক্রাচার্য পরিকল্পিত নতুন শৈলীতে রবিঠাকুরের অমর সৃষ্টি 'রথের রশি' পরিবেশন করে।

৪

'রথের রশি'র মতো ক্লাসিক নাটকের নবরূপায়নের প্রচেষ্টা শুক্রাচার্যের কাছে মোটেই সহজ কথা ছিল না। কোন্ কোন্ বিষয় তিনি নতুন করে ভেবেছেন সেটা আলোচনার জন্য প্রথমে মূল 'রথের রশি' নাটকের বিষয়বস্তুর দিকে একবার নজর দেওয়া প্রয়োজন।

রথযাত্রার উৎসব, তাই সকলে আনন্দ-উৎসবে সামিল হতে ভীষণ উৎসুক। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবার কিন্তু রথ এগোচ্ছে না। এই সর্বনাশের অর্থাৎ রথ না চলার পেছনে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ কারণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা হল মানুষের মধ্যে 'বিভেদ'। নাট্যকার খুব কৌশলের সঙ্গে এই 'রথ' ও 'রশি'কে প্রতীকী ঢঙে উপস্থাপন করেছেন যেখানে 'রথ' হচ্ছে কাল এবং 'রশি' হচ্ছে এমন একটি সম্মিলিত শক্তি যা কালের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পূজা-পার্বণ ও মন্ত্রবলের সাহায্যে রথ টেনে নেওয়ার মূল দায়িত্ব তো পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের। কিন্তু এবার বিফল হয়েছে তারা। এরপর ক্ষত্রিয়রা এলো নিজেদের অপার বাহুবল প্রয়োগ করল, কিন্তু রথটা চুলমাত্র এগিয়ে নিতে পারল না। তারপর এল বৈশ্যরা, তারাও বিফল। শেষে এল শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত নিচুতলার মানুষরা। তারা রথের রশিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বিস্মিত করে রথ চলতে লাগল। তবে পরিচিত পথ দিয়ে নয়, সেই রথ উচ্চ শ্রেণির সকল দম্ভকে ভূলুণ্ঠিত করে অবহেলিত মানুষদের মাটির পথ ধরে কালের যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। শূদ্ররা এমন কী করল যার জন্য ঈশ্বর তাদের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে উঠেছে, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে স্বয়ং লেখকের মানস-চরিত্র যুগদ্রষ্ট্রা 'কবি'—

> 'ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
>
> নইলে ছন্দমেলে না। এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
> ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
> সেইখান থেকেই মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাঁত করে।
> সমান করে দিলেন তাঁর আসনটা।'[১০]

তবে কালের যাত্রা এখানেই শেষ নয়। কাল তো চিরগতিশীল। যুগদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাই কবি চরিত্রটির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পটপরিবর্তনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে এতদিন ধরে যারা নিষ্পেষিত হওয়ার পর অবশেষে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে, তাদের মধ্যেও হয়তো অহংবোধ জন্মাবে, তারাও হয়তো নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে শুরু করবে। তখন আবার রথের চাকা ঘুরবে, উল্টোরথের পালা আসবে, আবার উঁচুতে-নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

৫

শুক্রাচার্য রাভা 'রথেরে রশি' নাটকের শুধুমাত্র মূল ভাবটিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের মতো করে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন। বিষয়টা অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং ও বিতর্কের, কারণ কোন লোককাহিনিকে নিজের মতো করে রূপ দিয়ে পরিবেশন করা সহজ, অনেকটাই ফ্ল্যাক্সিবেলিটি থাকে সেখানে, কিন্তু কোন এক মহান লেখকের রচনাকে নতুন করে সাজানোর ক্ষেত্রে নানা বিতর্কের অবকাশ থাকে। কিন্তু তবুও কিছু নতুন করতে গেলে তো ঝুঁকি নিতেই হয়। শুক্রাচার্য তাঁর শিল্পকর্মে নিজস্ব স্টাইলকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যে-সব বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে এগিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ elasticity । তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে যখনই একটা নতুন ভাব তাঁর মনে সাড়া জাগাত, তখনই তিনি নতুন ফর্ম ও কন্টেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতেন। তিনি অকপটে বলেছেন— "সেই কারবারটি 'রথের রশি' করার সময় বহুবার ঘটেছিল ... বহুবার ভাঙেছি, গড়েছি।"[১১] এখানেই তো রয়েছে মূল চ্যালেঞ্জ। রথযাত্রার যে সংস্কৃতি বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত, কোনো রাভা অধ্যুষিত অঞ্চলে তা সেভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ফলে শুরুতেই প্রশ্ন জাগে যে, শুক্রাচার্য নাটকটির রাভা সংস্করণের যে পরিকল্পনা করেছেন, সেটা কতটা খাপ খাবে সেখানে! অবশ্য শুক্রাচার্য এক্ষেত্রে নিজেই সেই সমস্যার কথা প্রকাশ করেছেন— "... এই সংকট আমি অনুভব করেছিলাম যখন 'রথের রশি' নাটকটি শুরু করেছিলাম... কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকটি মূল বাংলা সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর surface-এ বাংলা মানসিকতা রয়েছে। সেখানে স্থানীয় চেতনার পরিকাঠামো রয়েছে। সেগুলোকে রাভা সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমি বহুবার ধর্মসংকটে পড়েছিলাম। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, একটি বাক্য যে ভাব ফুটিয়ে তুলেছে নাটকে সেই নির্দিষ্ট ভাবের সমার্থক ভাব বা নিদর্শন রাভা বা অসমিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ধারণা আমাদের এই ভূখণ্ডে হয়তো Obsolete ।"[১২] হয়তো সে জন্যই শুক্রাচার্য রাভা 'রথের রশি' নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে মূল ঘটনা রথযাত্রা রেখে রাভা জীবনের একটি ছবি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যাতে আঞ্চলিক রাভা দর্শকরাও নিজেদের প্রতিচ্ছবি নাটকটিতে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

আমরা জানি যে এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ চার বর্ণের মানুষদের ফোকাস করেছেন।

তাদের পোষাকের ক্ষেত্রে শুক্রাচার্যের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। তিনি ব্রাহ্মণের পোষাকের ক্ষেত্রে ধুতি ও গেরুয়া গাত্রবস্ত্র, ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি রাজার ক্ষেত্রে ধুতি ও লাল গলবস্ত্র এবং বৈশ্যদের ক্ষেত্রে ধুতি ও সবুজ গলবস্ত্রের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শোষিত-বঞ্চিত নিচুতলার মানুষদেরে ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি খেটে খাওয়া রাভা মানুষদের জনজাতীয় পোষাক ব্যবহার করেছেন এবং নাটকটিতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিল্পীরাই রাভা জনগোষ্ঠীভুক্ত। এই জনগোষ্ঠীর সেন্টিমেন্টই শুক্রাচার্যের অভিনবত্ব। নাটকের মূল টার্গেট হচ্ছে অস্পৃশ্যতার গ্রাসে নির্যাতিত মানুষদের উত্থান। তাই শুক্রাচার্য রাভার এই নব-সংস্করণে জনজাতীয় পোষাকে উপস্থাপিত জনজাতীয় শিল্পীদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ আমরা খুঁজে পাই।

৬

আমরা জানি যে নাটকের পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে মঞ্চসজ্জা, কারণ— "মঞ্চস্থাপত্য, দৃশ্যপট ইত্যাদি নাটককে দেয় তাঁর সঠিক ও নিজস্ব পরিবেশ যা থেকে নাটক পায় সজীবতা।"[১৩] বিশেষ করে 'রথের রশি'র কথা ভাবলে শুরুতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা রথ, যেখানে যুক্ত একটি দড়ি এবং রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন মানুষের সমাগম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে শুক্রাচার্য এখানে এই সমস্ত কিছুকে অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ রথ এখানে অদৃশ্য, দড়িও অদৃশ্য। কিন্তু চরিত্রগুলোর অভিনয়-কৌশল ও শারীরিক ভঙ্গিমার দক্ষতায় ব্যাপারটা অদৃশ্য হলেও সহৃদয়-সমাজ তা মানসচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। মঞ্চে অদৃশ্য শূণ্যতার মধ্যে একটি রথকে এস্টাব্লিশ করাটাই ছিল শুক্রাচার্যের বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেছেন, "প্রাথমিক অবস্থায় খুবই অস্বস্তিতে ছিলাম, রথ ও রশিটি কী করে উপস্থাপন করা যায়? ... রথের রশি টানার দৃশ্যটি নির্মাণ করতে আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লেগেছিল। এই দৃশ্যটি নির্মাণ করতে বাডুংডুপ্পা নাট্যকর্মীদের বডি মুভমেন্টের ওপর যথেষ্ট অনুশীলন করতে হয়েছিল। মঞ্চে প্রতিটি সেকেণ্ডে কার কোথায় অবস্থান হবে সেটা রেখাচিত্র এঁকে এঁকে আমাদের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল।" এতগুলো চরিত্রকে সার্থকভাবে এই দৃশ্যটিতে ফুটিয়ে তুলতে তিনি 'Rhythm', 'Tempo' ও 'Pause' এই তিনিটি বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস যে এই তিনটি ধ্বনি-প্রভাবের সঙ্গে 'মঞ্চ-জ্যামিতি'র সঠিক প্রয়োগ একটি নাটককে মঞ্চসফল করে তুলতে পারে। তাই রাজার রথে চড়া, ব্রাহ্মণের ঘন্টা বাজিয়ে আবাহন করা, তরপর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকলের রথের রশি ধরে টানার চেষ্টা ও ব্যর্থতা, এই সমস্ত কিছু মূকাভিনয় শিল্পীদের মতো করে করতে হয়েছে, যদিও নাটকটিকে মাইম-সর্বস্ব বলা যায় না এবং চরিত্ররাও পুরোপুরি মূক ছিল না।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটি রথের চাকা স্থাপন করা হয়েছিল, যা কালের গতিময়তার প্রতীক। তার ঠিক সামনে ছিল সামান্য উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, অনেকটা যাত্রাপালার আদলে। নাটকটির প্রথম উপস্থাপনায় স্বাভাবিকভাবেই কোন আলোকসজ্জা বা মাইকের ব্যবস্থা ছিল না— যা রামপুরের শালবনের নাট্যস্থলের একটি বৈশিষ্ট্য,[১৪] তবে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চায়নের সময় আলো ও মাইকের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল।

৭

শুক্রাচার্য পরিচালিত 'রথের রশি'তে আবহ-সংগীতের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। শূদ্ররা এসে যখন সম্মিলিত ভাবে রথের রশি স্পর্শ করে, তখই নেপথ্যে ভেসে ওঠে কাঁসর-ঘন্টার পাশাপাশি উলুধ্বনি, এবং সেই মিউজিকের তালে তালে চরিত্রগুলো একসঙ্গে এমনভাবে অঙ্গ-সঞ্চালন করে যেন সত্যিই একটা রথ গড় গড় করে এগিয়ে যাচ্ছে। রথটাকে পেছন থেকে যারা ঠেলছে, রথের রশি যারা টানছে তাদের হাতের শিরা উপশিরা যেন জেগে উঠছে, মুখমণ্ডলে ও হস্ত সঞ্চালনায় তীব্র বলপ্রয়োগের ছাপ সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট ঝোঁকে রথটাকে এগিয়ে নেওয়ার শারীরিক ভাষা ও ভঙ্গিমা রথ ও রশিটিকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে। এই শারীরিক ভাষার শৈলীটিকে শুক্রাচার্য সর্বাধিক গুরত্ব দিতেন, কারণ সংলাপ একটি নির্দিষ্ট ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু শারীরিক ভাষা সর্বকালের, সর্বশ্রেণির, সর্বস্থানের মানুষের জন্য অভিন্ন ও বোধগম্য। কত কম কথায় একটি অখণ্ড ভাবকে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে এবং মূল কাহিনিধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশন করা যেতে পারে সেটাই ছিল শুক্রাচার্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই এই মিতব্যয়িতাকে তিনি বলেছেন— 'সশব্দ নীরবতা'। তাঁর বক্তব্য— "সর্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতা সেই ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা। শরীরের ভাষা সকলের বোধগম্য। সেখানে স্থানিক মান ব্যাপারটা থাকে না। জান্তব ও আদিম প্রতিক্রিয়াগুলো সবই বিশ্বজনীন। যাতনা, নিপীড়ন, ব্যথা এই সমস্তকিছু যখন উদ্দীপক হয় তখন জান্তব প্রতিক্রিয়াগুলো সর্বদা সার্বজনীন।"[১৫]

৮

মূল নাটকটিকে আমরা দেখেছি যে চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে পরিস্থিতির জটিলতাকে তুলে ধরা হয়েছে। রথ না চলা, উচ্চবর্ণের জাত্যাভিমান ও শূদ্রদের ওপর লাঞ্ছনা এই সমস্ত কিছু রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এখানে কোনো ডাইরেক্ট সংঘাত দেখানো হয়নি। কিন্তু শুক্রাচার্য নাটকের মূল থিম অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষদের লাঞ্ছনার দিকটাকে সরাসরি উপস্থাপন করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণরা সামাজিক স্থানে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপস্থিতি ও জলপান কার্যকে ভর্ৎসনা করছে। রাভা পোষাক পরিহিত এইসব সাধারণ জনতাকে দিয়ে কীভাবে ধনপতিরা শোষণ করছে, লাঞ্ছনা করছে, সে দৃশ্যও শুক্রাচার্য মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংযোজন করেছেন। মূল নাটকে সন্ন্যাসীকে আমরা ভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখি যিনি যুগসংকটের কথা ঘোষণা করেছেন—

'সর্বনাশ এল।

বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,

ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।"[১৬]

কিন্তু শুক্রাচার্য এই চরিত্রটাকেই বাদ দিয়েছেন। তবে কবির ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন তিনি। মূল নাটকের শেষে কবির সংলাপে রবীন্দ্রদর্শন ফুটে ওঠে। শুক্রচার্য এই কবি চরিত্রটাকে বাদ দিয়ে সর্বশ্রেণির মানুষদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়েছেন। এই দৃশ্যটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কারণ কবির নির্দেশে অন্ধকারে দিনযাপন করা এই লোকেরা বেরিয়ে এসে নানা পুথিজ্ঞান অর্জন করেছে। এখানেই শুক্রাচার্যের অভিনবত্ব। এখানেও চরিত্রের হাতে সরাসরি কোনো পুথি নেই, অথচ অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে তারা এমনভাবে গ্রন্থ বের করে করে, পাতা উল্টে উল্টে পাঠ করছে এবং শেষে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে জগতকে নতুন করে দেখছে যে পুরো ব্যাপারটা সংলাপ-সংযমতা থাকা সত্ত্বেও সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকটির শুরুতেই মহিলাদের কথোপকথনের মাধ্যমে এবারের রথযাত্রার অঘটনকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

'এবার কী হল, ভাই!

... ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল;

রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।'[১৭]

কিন্তু শুক্রাচার্য তাঁর নবরূপায়নে রথ দেখতে আসা কোনো নারী চরিত্রকে সংযোজন করেননি। কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষদের দলে নারী চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও জেগে উঠেছে এবং অন্যায়কারী ও শোষকদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে।

৯

এই আলোচনার শেষে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' নাটকটি যেভাবে রচনা করেছেন সেখানে নতুন কিছু সংযোজন অথবা মূল নাটকের কিছু চরিত্র বা ঘটনার বিয়োজন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। এক্ষেত্রে বলা যায় যে নাটকের রূপান্তর বা নবরূপায়ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথও জীবনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। কখনো 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্যরূপ, 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে 'বিসর্জন', 'মায়ার খেলা' নীতিনাট্যে রূপান্তর, 'পূজারিণী' কবিতা থেকে 'নটীরপূজা'র নাট্যরূপ ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য 'রথের রশি' নাটক রচনার নেপথ্যেও অনেক কথা লুকিয়ে আছে, কারণ 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' এই রচনা দুটি রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের অন্তর্গত। 'কালের যাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)। তবে ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই রচনার উৎস সম্পর্কে

লেখক বলেছেন— 'আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।'[১৮] সেই 'রথযাত্র'র পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপই হচ্ছে 'রথের রশি'। অতএব মূল ভাবকে অটুট রেখে কোনও রচনার 'রূপান্তর' ব্যাপারটা গ্রহণ করা যেতেই পারে, যদি রূপান্তরকারীর সেই প্রয়াস ঔচিত্যবোধের নিরিখে যথাযথ হয় এবং সহৃদয়সমাজের অন্তরে রসসঞ্চারের পাশাপাশি 'সিদ্ধরস' ভঙ্গ না করে। শুক্রাচার্যের 'রথের রশি' নবরূপায়নের প্রয়াস এই দিক থেকে সার্থক, কারণ তিনি মূল নাটকের ভাব ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে অক্ষুন্ন রেখে নতুন শৈলীতে নাটকটিকে পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের নাটকটিকে নতুন করে আস্বাদন করায়।

তথ্যসূত্র

১। জন্ম ১০ এপ্রিল ১৯৭৭ এবং মৃত্যু ৮ জুন ২০১৮

২। খোলা আকাশের নীচে শালবনের মাঝখানে অকৃত্রিম ভাবে অনুষ্ঠিত থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল যা ২০০৮ সালে প্রথম প্রবর্তন করেন শুক্রচার্য রাভা। সঙ্গে ছিলেন পদ্মভূষণ হেইসনাম কানহাইলাল ও মণিপুর কলাক্ষেত্রের দল। শুক্রচার্যের অকাল প্রয়াণের পরও প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে এই ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং দেশ-বিদেশের নাট্যদল সেখানে নাটক পরিবেশন করছে। গতবার (১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) আয়োজক 'বাড়ুংডুপ্পা'র (শুক্রাচার্য প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল) শিল্পীরা 'ঋষি জোলংখা' (রাভা) নাটকটি পরিবেশন করেন। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরের নাট্যদল 'টিনি টেইলস্ থিয়েটার কোম্পানি' পরিবেশন করে 'আলোর গান' (বাংলা ও মারাঠি দুই ভাষা মিশ্রিত নাটক), পশ্চিমবঙ্গের 'বিরতি সমূহ পারফরমার্স' পরিবেশন করে 'অথ হিড়িম্বা কথা' (বাংলা), গুয়াহাটির 'আঁক' পরিবেশন করে 'এরেন্ডিরাস মেটামোরফসিস' (অসমিয়া), মুম্বাইর 'রাহি থিয়েটার' পরিবেশন করে 'ঝলকারী' (হিন্দি), গুজরাটের 'আহমেদাবাদ থিয়েটার গ্রুপ' প্রদর্শন করে 'পঞ্চ নো বেশ' (গুজরাটি ও হিন্দি দুই ভাষা মিশ্রিত নাটক) এবং শ্রীলংকার 'সল্ট থিয়েটার কোম্পানি'র 'মাই সুইট্ রোটেন হেরিটেন্স'।

৩। বরুণ কুমার সাহা শুক্রাচার্য রাভার নাট্যচিন্তা ও অভিনবত্ব: একটি অধ্যয়ন, ত্রিপুরা থিয়েটার (খণ্ড- ১৭/ সংখ্যা-১), সেপ্টেম্বর ২০২২, আগরতলা, পৃষ্ঠা ৮৬ ।

৪। Evelien Pullens educated a group of young actors from Northeast India in Puppetry and objects. The Theatre Embassy workshop started with sponge puppets and training of basic skills.Heisnam Tomba from Manipur to everything on camera. We workwed in the small village Rampur in Assam. <www.evelienpullens.nl>, https://www.youtube.com/watch?v=fYhgFjIKmp4, Date :24-04-2023

৫। ট'পয়দম হচ্ছে পয়দম পাখি। ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নাটকের উপজীব্য বিষয়।

৬। নয়ন রাভা (সম্পা), স্মরণিকা, রাজহুয়া আদ্যশ্রাদ্ধ পরিচালনা সমিতি, গোয়ালপাড়া, ২০১৮, পৃষ্ঠা১৩০

৭। নীলোৎপল বরুয়া, শুক্রাচার্য রাভা যাত্রা আরু মাত্রা, বাড়ুংডুপ্পা প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৮, গোয়ালপাড়া, পৃষ্ঠা ১৭৯

8. https://kokrajharlitfest.com/, Date : 01/04/23

9. httpas://"ww.newindianexpress.com/states/kerala/2023/jan/15/10-dayinternational-theatre-festival-of-kerala-promises-to-deliver-the-world-to-enthusiasts-2538144.html, Date: 16/05/2023

১০ । রথের রশি, রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), পৃষ্ঠা ২৭৫

১১ । নীলোৎপল বরুয়া, শুক্রাচার্য রাভা যাত্রা আরু মাত্রা, বাডুংডুপ্পা প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৮, গোয়ালপাড়া, পৃষ্ঠা ৮৪

১২ । তদেব, ১০৪

১৩। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি কোষ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, দেজ, আগস্ট ১৯৯৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪১

১৪। অসমের গোয়ালপাড়া জেলার রামপুরস্থিত বাডুংডুপ্পা কেন্দ্রে যে শালবনের খোলা মঞ্চ রয়েছে, সেখানে সর্বস্তরের হাজার হাজার জনতার সম্মুখে নাটক পরিবেশন হয়। সেখানকার নিস্তব্ধ পরিবেশ ও দর্শকদের এতাত্মতার জন্য বাঁশের গ্যালারির শেষ ব্যক্তিটিও চরিত্রদের বক্তব্য ও বাদ্যযন্ত্রের (স্থানীয় লোকবাদ্য) ধ্বনি স্পষ্টভাবে শুনতে পান। এমনকি Under the Sal Tree অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসা দেশ বিদেশের নাট্যদলও আলোক যন্ত্র ইত্যাদি কৃত্রিম পন্থা পরিহার করে নিজেদের নাটক পরিবেশন করে থাকে।

১৫। নীলোৎপল বরুয়া, শুক্রাচার্য রাভা যাত্রা আরু মাত্রা, পৃষ্ঠা ৮২

১৬। তদেব

১৭। রথের রশি, রবীন্দ্ররচনাবলী (একাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২৬, পৃষ্ঠা ২৫৫

১৮। রবীন্দ্ররচনাবলী (একাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৪২৬, পৃষ্ঠা ২৮৯

লেখক : **ড. বরুণ কুমার সাহা, সহকারী অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।**

Author : **Dr. Barun Kumar Saha, Asstt. Professor, Bengali, Guwahati University, Assam.**

ধর্ম-মোহ থেকে প্রেমের পথে যাত্রা : সাইমন জাকারিয়ার 'বোধিদ্রুম' নাটক

■ পরমাশ্রী দাশগুপ্ত

১৯৯৪ -এ মহাশ্বেতা দেবীর প্রকাশিত উপন্যাস 'বেনে বউ'-এর ভুমিকাতে তিনি লিখেছিলেন- 'এখনো আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতকে ও অন্যান্য বিগত শতকে বাস করি।'[১]

বিংশ শতকে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনার গুরুত্ব আর প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশ করতেই মহাশ্বেতা দেবী এই মন্তব্য করেছিলেন। পুরাতন কাহিনি যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমাজমানসে বাহিত হয়ে চলে তা নতুন যুগ প্রেক্ষিত এবং ব্যক্তি মানসের চেতনায় নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেলে আসা শতকের গল্প-কাহিনির সঙ্গে আধুনিক মানুষের এক যোগসূত্র আছে। তা শতাব্দী পেরিয়ে,ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে 'বহু ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।[২] যুগবাহিত আখ্যানগুলি মানুষের মনের গভীরে 'যৌথ অবচেতনায়' স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। এর মধ্যে ব্যক্তিচিহ্ন ও যুগচিহ্ন মিশ্রিত হলে, এটি নতুন যুগ ও কালের প্রেক্ষিতে পুনর্নির্মিত হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনিগুলিও এই কারণে বার বার পুনর্নির্মিত হয়েছে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও অন্যান্য মাধ্যমে। চর্যাপদ আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের লিখিত খণ্ড খণ্ড পদগুচ্ছ হলেও এর মধ্যে এক বিনাসুতোর মালা গাঁথা রয়েছে। প্রাচীন বাংলা সমাজ জীবনের এক সংকট কালকে অবলম্বন করে নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের পাশাপাশি মানুষের অমলিন জীবনযাপনের কাহিনিই চর্যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। চর্যাগুলির মধ্যে বীজ আকারে যে সম্ভাবনা থেকে গেছে, তা নতুন যুগ ও কালের প্রেক্ষিত বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় যখন তা পুনর্নির্মিত হয়ে ওঠে। চর্যার মধ্যে বিনির্মাণের প্রবল সম্ভাবনার ক্ষেত্র আছে, আর এ কারণেই কখনো উপন্যাসে, কখনও কবিতায়, কখনও বা নাটকে এর নতুন নতুন রূপ আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আধুনিক মানস ও শিকড়ের সন্ধানে প্রাচীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। চর্যাপদের কবিদের কথা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন 'বেনের মেয়ে'(১৯১৯)। বৌদ্ধ ধর্মের সমকালীন রূপ ও সমাজ জিজ্ঞাসার নানা অভিমুখ উন্মোচিত হয়েছে এখানে। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালির জীবনধারা অধিকারের নানা প্রশ্নে দ্বন্দ্বে দ্বিধায় উন্মুখ ছিল, তাঁরই নিবিড় পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করি সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) উপন্যাসে। একুশ শতকের প্রথম দশকেই আমরা চর্যাপদ অবলম্বনে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস পেয়েছি, শিবাশিস

মুখোপাধ্যায়ের 'কাহ্ন' (২০১০) । চর্যাপদের কাহিনিসূত্রকে ব্যক্তিচেতনায় জারিত করে সাইমন জাকারিয়া একুশ শতকের প্রথমেই রচনা করলেন 'বোধিদ্রুম' (২০০২) নাটক, যা তাঁর দীর্ঘকালের ইতিহাস চেতনার ফসল। চর্যাপদ নিয়ে সৃজনমূলক চর্চা বহুদিন থেকেই চলছিল। উপন্যাসে, কবিতায় চর্যার ভাবনা বার বার নতুন রূপে এসেছে, কিন্তু চর্যাকে নাট্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম। চর্যা নিয়ে লিখিত উপন্যাসগুলিতে চর্যাপদের সময়কাল, চর্যাপদের পদকর্তা ও চরিত্রের কথা থাকলেও চর্যাপদের অভ্যন্তরস্থ কাহিনিকে অবলম্বন করে নাটক রচনা এর আগে হয়নি।

এক

চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক' সম্পর্কে অনেকে মনে করেন এই নাটকে বুদ্ধদেবের জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনা বা বুদ্ধদেবের সমগ্র জীবন কাহিনিকে নাচ-গান ও বর্ণনা ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবেশন করা হতো। নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া মনে করেন, চর্যাপদের কাহ্ন-ডোম্বী, শবর-শবরীর নাটকীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত এ কথা প্রমাণ করে যে, শুধু বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনিকেই প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের রূপ দেওয়া হত না- তার পাশাপাশি বাংলার লোকজীবনের সাধারণ নর-নারীর জীবন কাহিনির অনেক ঘটনাও বুদ্ধ নাটকে উপস্থাপন করা হত। চর্যাপদের অনেক পদের ভিতরে সে রকম অনেক নাট্যাখ্যানের বীজ লুকিয়ে আছে, যা লক্ষ করেছেন নাট্যকার। আপাতদৃষ্টিতে চর্যার পদগুলো বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এইগুলির ভিতরে একটি কাহিনিসূত্র আবিষ্কার করা যায়। যে কাহিনি বিকশিত হয়েছে নাটকীয় টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে।

নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক ও বাংলাদেশের লোকনাটকের বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনার বৈচিত্র্য নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। প্রাচীন বুদ্ধ নাটকের সঙ্গে তিনি চর্যাপদের ভিতরকার কাহিনির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন খুবই সাবলীলভাবে। চর্যাপদের ভিতরকার কাহিনি বিচার করলে দেখা যায় যে, ১০ সংখ্যক পদে কাহ্ন জাতপাত বিসর্জন দিয়ে নগরের বাইরে বা লোকালয় বহির্ভূত বা অচ্ছূত কোনও এক ডোম্বীর উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করছে এবং ১৯ সংখ্যক পদে বাদ্য বাজিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ডোম্বীকে বিবাহ করে কাহ্ন যেন নবজন্ম পাচ্ছে, কারণ সে 'জাত' হারাচ্ছে। বিবাহ শেষে কাহ্নের সুখী দাম্পত্য জীবনের কথাও ১০ নং পদ থেকে জানা যায়। অন্যদিকে নাট্যকার নারী ডোম্বীর দিক থেকে কাহিনিসূত্র বিচার করতে গিয়ে দেখেছেন ২০ নং পদে এক নারীর ভিতরকার আর্তির কথা আছে। সেখানে নারীটি বলছে— "আমি নিরাশী। (আমার) স্বামী ক্ষপণক (অথবা আকাশবৎ শূন্য মনের)। আমার সুরত-সুখ (এমন যে) বলা যায় না। ওগো মা, আঁতুড়ঘরের দিকে চেয়ে প্রসূত হলাম। এখানে যা চাই, তা এখানে নেই। আমার প্রসব বাসনা-পুত্র। নাড়ি বিচার করতে গিয়ে দেখি সেও হতভাগ্য।"[৩]

নারীটির এই উক্তি নাট্যকারকে ভাবিত করে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, পুরুষ প্রেম

নিবেদন করে বিবাহ করলেও দাম্পত্য জীবন কি আদৌ সুখের হয়েছিল? ২০ নং পদ কিন্তু সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা বলে না। নাট্যকার এমন সম্ভাবনাও দেখেন যে শ্বশুর-শাশুড়ির চোখে ধূলো দিয়ে বধূর পরকীয়া প্রেমে মত্ত হওয়ার কাহিনি হয়তো এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। কারণ স্বামী যার উদাসীন ও অক্ষম , পরকীয়া প্রেমের মধ্যে সে তো সার্থকতা খুঁজবেই। এরই মধ্যে একদিন পদ্মার স্রোতধারা বেয়ে দস্যু আসে, তারা লুট করে দেশ। ৪৯ সংখ্যক পদে আছে সোনা রূপার সঙ্গে তার ঘরের বধূকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়। এতে এক স্বামীর মর্মভেদী ধ্বনি উচ্চারিত হয়-

"নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেশ।" [৪]

অর্থাৎ নিজ গৃহিণী চণ্ডালে নিয়ে গেল, এখন আমার বাঁচা মরায় তেমন কোনও পার্থক্য নেই। অন্যদিকে ৫০ সংখ্যক পদে আছে এক ভিন্ন দাম্পত্য জীবনের কথা। সেখানে চমৎকার কার্পাস ফুল ফুটেছে। বাড়ির চারিপাশে জ্যোৎস্নায় অন্ধকার দূর হল। কংনি দানা পাকলো, শবর-শবরী মেতে উঠল। শবরকে দাহ করার চিত্রের মধ্যে দিয়ে এই দাম্পত্যজীবনের পরিসমাপ্তির কথাও আছে। সব মিলিয়ে চর্যাপদের অন্তর-আত্মায় এক নাটকীয় কাহিনি আবিষ্কার করেছেন নাট্যকার। কাহিনিতে প্রেম- বিবাহ, সুখ- তৃপ্তির পাশে অতৃপ্তি, পরকীয়া সম্পর্ক, দাম্পত্যকলহ, নারী অপহরণ, স্বামীর অন্তর্জাত বেদনা- সব কিছুর মধ্যে আছে এক নাটকীয় টানাপোড়েন ও যৌক্তিক ভিত্তি। এই নাট্যসম্ভাবনার উপরেই নির্মিত হয়েছে 'বোধিদ্রুম' নাটকটি। নাট্যকারের কথায়—

> " সময় ও প্রেক্ষাপটের বিচারে চর্যার কাহিনি সুদূর প্রাচীনযুগের হয়েও তা একই সাথে সাম্প্রতিক এবং শাশ্বতকালের। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই, কিছুটা কল্পনা, কিছুটা বাস্তবে চর্যাযুগের চরিত্রদের সাথে বসবাস করে রচিত হয়েছে এই নাটক।"[৫]

এছাড়াও চর্যা সমকালীন প্রাচীন বাংলার আবহ সৃজনের লক্ষ্যে ভাষাভঙ্গিতে শব্দ ও শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে, এছাড়াও বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ অন্বেষণ সূত্রে রচিত এই নাটকের মধ্যে 'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনার দৃষ্টান্তও আছে। ২০০২ এ লিখিত এই নাটক ওই বছরই ঢাকা থিয়েটারের ৩০তম প্রযোজনা হিসাবে অভিনীত হয়। সাইদুর রহমান লিপনের নির্দেশনায় নাটকটির পূর্বলিখন 'ন নৈরামণি' ২০০২ এর ১৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে প্রদর্শিত হয়।

দুই

বোধিচিত্তের পথ নির্বাচন করেছিল কাহ্ন। এই পথে চলতে হলে প্রথমে ইন্দ্রিয় সুখ মেটাতে হবে এবং তারপর তা দমন করতে হবে। ইন্দ্রিয়সুখ দমন করতে পারলেই

বোধিচিত্তের লাভ হবে। 'বুদ্ধ নাটক' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে 'বোধিদ্রুম' নাটকটি আরম্ভ হয়েছে আর সেখানেই বজ্রাচার্যের কাহ্নের প্রতি নির্দেশ ছিল -

> " ... বিবাহ করে চিত্ত মাঝে ইন্দ্রিয় সুখ জাগাও - তারপর মরজীবনের ইন্দ্রিয় সুখ মেটাও -এবং ইন্দ্রিয় দমন করে বোধিচিত্তের পথে এসো... হ্যাঁ হ্যাঁ বোধিচিত্তের পথে আসতে বিবাহ করো ..."[৬]

বোধিচিত্ত লাভের আকাঙ্খায় কাহ্নের প্রয়োজন ছিল বিবাহের, অন্যদিকে কাহ্নর পিতামাতার কাহ্নকে সংসারে বেঁধে রাখার এটাই ছিল একমাত্র ভরসা। এভাবেই ডোম্বীর সঙ্গে কাহ্নের বিবাহের কারণ ও তার আয়োজন প্রাচীন বাংলার অনুষঙ্গে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কাহ্নের গৃহ পরিবেশ বর্ণনায় বাঙালির যৌথ পরিবার জীবনের আদর্শকেও বজায় রেখেছেন তিনি। কাহ্নের পিতা-মাতা ছাড়াও এ গৃহে ছিল ভুসুক ও বঙ্কী। কাহ্নের দাদা-বৌদি। সম্পূর্ণ পরিবারের বিশ্বাস ছিল ডোম্বীর মোহে কাহ্নের বোধিচিত্ত লাভের আকাঙ্খার সমাপ্তি হবে। সে চিরতরের মত সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে যাবে। সূর্যমেলা থেকে গৃহমুক্তি ঘরে স্থাপন করা হয় ওই একই উদ্দেশ্যে। কাহ্ন-ডোম্বীর সুখমিশ্রিত দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। চর্যাপদের দুটি লাইন—

"নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।"[৭]

'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনার অনুষঙ্গে বার বার ফিরে এসেছে। এই বুদ্ধ নাটকের আসরেই নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার জটিল ও দুরূহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় কাহ্ন। সেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কাহ্ন সংসার ও ডোম্বীর মায়া থেকে বহুদূরে চলে যেতে থাকে। কাহ্ন অনুভব করে বোধিচিত্তের সময় এসে গেছে। সে এখন ইন্দ্রিয় দমনের দিকে যেতে চায়। বজ্রাচার্য প্রভুর নির্দেশে সংসার থেকে সে বহুদূরে যাত্রা করে। ডোম্বীর গর্ভে থাকে কাহ্নের সন্তান, কিন্তু সমস্ত কিছুকে সে উপেক্ষা করে। ডোম্বীকে বজ্রাচার্য প্রভু ও কাহ্ন 'ধর্ম জীবনে দেবী' করে রাখতে চায়। অথচ ডোম্বীর নারী জীবনের সার্থকতা দেবীত্বে নয়। সে স্বামী -সন্তান পরিবার ও প্রেমের মধ্যে জীবনের পূর্ণতা খোঁজে। বোধিচিত্তের প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই। অন্যদিকে বজ্রাচার্যের পথ অনুসরণ করে কাহ্ন সোমপুর বিহার থেকে প্রাচীন পুণ্ড্রনগর হয়ে শেষ পর্যন্ত নেপালে পৌঁছে যায়। এভাবেই নাটকে 'দ্বন্দ্ব' তৈরি হয়। ডোম্বীর ইচ্ছার সঙ্গে কাহ্নের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব। বোধিচিত্ত লাভের আকাঙ্খার সঙ্গে সংসার যাপনের দ্বন্দ্ব।

ডোম্বীর প্রসব বেদনা কাহ্ন মাতার বুকে আবার আশা জাগিয়ে তোলে। ডোম্বীর মৃত সন্তান প্রসব সেই আশাকেও নিঃশেষিত করে। বঙ্কী সান্ত্বনা দেয় ডোম্বীকে, সেও হারিয়েছিল তার সন্তানকে। দুঃখচেতনায় বঙ্কী ও ডোম্বী কোথাও এক হয়ে যায়। একদিন

নাট্যদলের কুক্কুরী কাহ্নগৃহে কাহ্নের বোধিচিত্ত লাভের সংবাদ পৌঁছে দেয়। ডোম্বী কিছুতেই খুশি হতে পারে না। কুক্কুরী যখন তাকে 'দেবীর সম্মান ' জানাতে আসে, তখন সে মোক্ষদাত্রীর অর্ঘ্য ছুঁড়ে ফেলে দেয়, প্রত্যাখ্যান করে। দস্যু লুণ্ঠনকারীরা যখন দেশ আক্রমণ করে, বঙ্কী কুরাড়ী হাতে তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। অসম যুদ্ধে ভুসুক-বঙ্কী ক্রমশ পরাজিত হয়। বঙ্কীর বস্ত্র হরণ করে উল্লাসে ফেটে পড়ে দস্যুরা। বন্ধন উপেক্ষা করে ভুসুক এক সময় মাটি আঁকড়ে বঙ্কীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে গিয়ে দস্যুদের আক্রমণে আবার ছিটকে পড়ে। ভুসুকের সামনে বঙ্কীকে অপহরণ করে দস্যুরা। বেঁচে থাকার সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে ভুসুক। নাট্যকার চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃত করেন-

" আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।
... জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ।"[৮]

বঙ্কী ফিরে আসে, কিন্তু স্বামী গৃহে স্থান হয় না। অপহৃত মেয়েদের সমাজ এমন কি তার নিজের পরিবারও স্থান দিতে চায় না। আর এভাবেই গৃহ হারায় বঙ্কী। নারীর সামগ্রিক অসহায়তার চিত্র এভাবেই চর্যাপদ আশ্রয়ে নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। বঙ্কী ও ডোম্বী নারীর পারিবারিক ও সামাজিক বিপন্নতার প্রতীক হয়ে ওঠে। তীব্র সংকট ও অসহায়তার মধ্যে তারা সংসার ত্যাগ করে।

> " সে সমাজ-সংসারে বিপন্নের কোনো স্থান নাই... আছে কেবল বিপন্নের অপমান প্রত্যাখ্যান। সেই সমাজ -সংসারের প্রতি ডোম্বীর মনে জাগে তীব্র অভিমান। সে তাই বঙ্কীর বিপন্নতার সাথে স্বামী কাহ্নর বোধিচিত্ত প্রাপ্তিতে নিজের একাকিত্বের বিপন্নতা আর মৃত-সন্তান প্রসবের বিপন্নতাকে মিশিয়ে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে বঙ্কীর সাথে।"[৯]

যন্ত্রণা তাদের একই। স্বামী-সংসার হারানোর যন্ত্রণা। কিন্তু এসেছে তা দুই ভিন্ন পথে। ডোম্বী অনুভব করে দস্যুর আক্রমণ বঙ্কীর জীবনকে বিপন্ন করেছে। 'ধর্মের দস্যুতা' তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে রিক্ত করেছে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে দু'জনেই বুদ্ধ নাটকের দলে যোগ দেয়। প্রাণ সঞ্চারিত হয় বুদ্ধ নাটকে।

ডোম্বীর নৃত্যগীতের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কুক্কুরীও তাকে 'মোক্ষদাত্রী' হিসাবে নির্বাচন করে। ডোম্বীর মনেও মোহ জাগায় কুক্কুরী। কিন্তু ডোম্বী অন্বেষণ করে যথার্থ সংসার প্রেম। বোধিচিত্ত-মোক্ষের জন্য সে আর ব্যবহৃত হতে রাজি নয়। আশ্রয় দিয়ে যে ব্যক্তি আশ্রিতের কাছে মোক্ষ চায় , তার বন্ধনে ধরা দিতে চায় না ডোম্বী। দৃঢ়তার সঙ্গে ডোম্বী ও বঙ্কী আবার আশ্রয়হীন হয়। ডোম্বী খুলে ফেলে তার দেবীর আভরণ। মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়ে দুই নারী। জীবন নদীর বাঁক বদলায়। ডোম্বী জীবনধারণের জন্য পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে।

পাটনীবৃত্তিতে যুক্ত হয় সে। এখানেই যেন তার সার্থকতা। বোধিচিত্তের পথবিভ্রম নারীর দৃষ্টিতে ধরা দেয়। তাই সে যে প্রশ্ন রাখে কুক্কুরীর কাছে তা, পুরুষের সাধনার পথে ব্যবহৃত হওয়া সমস্ত নারীর প্রশ্ন—

> "যে পিপাসা একজনকে নিয়ে যার তৃপ্তিতে -বোধিচিত্তে ... আরেক জনকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রণায় বেদনায়... সে কেমন পিপাসা..."[১০]

পুরুষের পিপাসা নিবৃত্তির পথে নারীর পিপাসা না মেটার প্রশ্নটি নাট্যকার এইভাবেই ডোম্বীর জবানিতে উত্থাপন করেন।

নদী পারাপার করতে করতে আরও এক কাহ্ন, পদকর্তা কাহ্নপাদের সঙ্গে পরিচয় হয় ডোম্বীর। সে ডোম্বীকে নিয়ে পদ বাঁধতে চায়। ডোম্বীর মনে হয় বোধিচিত্ত প্রাপ্ত সেই স্বামী কাহ্নই ফিরে এসেছে আরেক রূপে এই যুবক কাহ্নতে। এই কাহ্নের কোনও বোধিচিত্তের মোহ নেই। ব্রাহ্মণ কাহ্ন ডোম্বীর প্রেমে ব্রাহ্মণ্য ভুলে যেতে চায়। চর্যাপদের গান নতুন করে রূপান্তর করেন নাট্যকার। কবি, প্রেমিক কাহ্ন যেন বলতে চায় —

নগর বাহিরে ডোম্বী রে তোর ঘর।
ছুঁয়ে যাস পথে যেতে বারবার।।
ডোম্বী রে তোর সঙ্গ আমি নেবোই নেবো।
কাহ্নু আমি তোকে সবই দেবো।।
তোর নেশাতে সবই ছাড়ি।
হাড়ের মালা গলায় পরি।। [১১]

কাহ্ন মানুষের থেকে জাতকে বড় করে দেখে না। যে সমাজে মানুষের থেকে জাত-কূল বড় সেই সমাজকে মানে না কাহ্ন। ডোম্বীকে লাভ করতে সে পরিবারের বিরুদ্ধে যায়। সমাজ ডোম্বীকে 'নৈরামণি' বলে। তুবও ডোম্বীর ভিতরেই আশ্রয় খোঁজে কাহ্ন। যুবক কাহ্নের চোখে কোনও প্রলোভন নেই, শুধু নিজেকে সমর্পণ করার আনন্দ আর তৃপ্তি ছাড়া কিছুই দেখে না ডোম্বী। সে আনন্দের অভিব্যক্তি সে স্বামী কাহ্নের মধ্যে কখনই দেখেনি।

> " স্বামী-কাহ্নুর আনন্দ ছিল মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে যাবার ... ভোগের ...।

কুক্কুরীর আকাঙ্খাও ছিল মোক্ষ আর ভোগ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু কবি কাহ্নুর আকাঙ্খা একেবারে অন্যরকম....."[১২]

শেষ পর্যন্ত তারা সমাজ - সংসার ত্যাগ করে। ধর্ম মোহের, জাতপাতের বন্ধন কাটিয়ে শুধুমাত্র ভালোবাসাকে বাঁচাতে তারা বেরিয়ে পড়ে। এই যাত্রা ধর্মের প্রবঞ্চনা, জাতপাতের ব্যবধানে মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।

তিন

চর্যাপদের নাট্য সম্ভাবনার সূত্র ধরে লেখা এই 'বোধিদ্রুম' নাটক চর্যাপদকে বহুমাত্রিক তাৎপর্য দিয়েছে। প্রথাগত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চার মরা গাঙে বান এনেছে যে সমস্ত সৃজনশীল লেখকেরা, তাদের মধ্যে সাইমন জাকারিয়া অন্যতম। বুদ্ধ নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনার সঙ্গে নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সংমিশ্রণে এই নাটক আধুনিক জনমানসে গভীর আবেদন রাখে। যা অতীতকাল, সমকালকে পেরিয়ে চিরকালের পথে এগিয়ে যায়। 'বোধিদ্রুম'নাটকে নাট্যকার যে গভীর জীবনবোধ গ্রন্থিত করেন, তা সূত্রাকারে এইরকম-

এক. বোধিচিত্ত লাভের যে পথ, তার মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। পুরুষের মোক্ষলাভের বাসনায় নারী সেখানে ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করে যে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে পুরুষ পৌঁছাতে চায়, সেখানে শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি দান করায় নারীর ভূমিকা। এইভাবে ভারতবর্ষীয় নানা সাধন পদ্ধতিতে নারীর সৌন্দর্য ও যৌনতাকে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়।

দুই. নাটকটি একটি নারীর দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডোম্বী এই নাটকের মুখ্য চরিত্র, যে পার্থিব কামনাবাসনার মূর্ত প্রতীক। তার রক্ত মাংসের মনুষ্যত্ব এই নাটকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। প্রেমে, আবেগে, অধিকার বোধে সে বার বার দেবীত্বের মহিমা প্রত্যাখ্যান করে। স্বামী-সন্তান-সংসারের মধ্যে জাগতিক আনন্দ খোঁজে। ধর্মীয় সাধনার অপার্থিব মোহের বিপরীতে তার অবস্থান।

তিন. সাধকের থেকে প্রেমিক, ডোম্বীর কাছে অনেক বেশী আত্মত্যাগী ও নির্মোহ । সাধনার সিদ্ধির থেকে প্রেমের অমৃতলোকে এই নাটকের ইতিবাচক দিক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

চার. ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে পার্থিব ইচ্ছার দ্বন্দ্ব এই নাটকটির অভ্যন্তরে তীব্র টানাপোড়েন তৈরি করেছে। শেষ পর্যন্ত সাধকের থেকে কবি ও প্রেমিক প্রকৃত জীবনের সন্ধান দিয়ে গেছে। আর এর মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের জীবন চেতনার ছবিও পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃত আনন্দ প্রেমে ও ভালোবাসায়। চর্যা এভাবেই নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে নাটকে ধরা পড়েছে। চর্যা হয়ে উঠেছে আবহমানের প্রেমিক হৃদয়ের কথা। 'আজও কান পাতলে তাদের প্রেমগাঁথা চর্যার শরীর থেকে বাংলার মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে।'

শুধু বিষয় ভাবনার দিকে থেকেই নয়, পাশ্চাত্য অনুকৃতির যুগ পেরিয়ে নাট্যরূপকে বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার তীব্র চেষ্টাও আছে এখানে। আর এ কারণেই প্রাগাধুনিক সাহিত্য বুদ্ধ নাটকের আঙ্গিকে নতুনভাবে, নতুন নাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে দেশজ অঙ্গিকে নাটক লিখেছেন সাইমন জাকারিয়া। তাঁর লেখা 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' নাটকটিতেও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যাভিনয়রীতি ও সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাটকটিতেও নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

পৌরাণিক ঘটনা মূল্যায়িত হয়েছে। এখানেও সীতা অগ্নিপরীক্ষার বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থান জ্ঞাপন করে প্রশ্ন তোলে—

" তোমার মনে আছে রামচন্দ্র, আমি তোমাাকে তোমার বাবা-মা-ভ্রাতা ভগ্নিকে আপন করার জন্য ফেলে এসেছি আমার বাবা-মা এবং পরিচিত পরিমণ্ডলকে। এও কী অগ্নিপরীক্ষা নয়?... রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অপহৃত জীবনে প্রতিনিয়ত অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে...."[১৩]

কখনও ডোম্বীর কথায়, কখনও সীতার উক্তিতে যুগ যুগ ধরে নারীর অবদমিত ও অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ্যে এনেছেন নাট্যকার। পুরাণের নারী ও চর্যার নারীকে তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে কাহিনি ও কাব্যকে পুনর্মূল্যায়িত করার সুযোগ দিয়েছেন।

সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই লেখিকা চর্যার দ্বি-মুখী বিরোধের প্রেক্ষিতকে নির্বাচন করেছিলেন। সেখানে চর্যার কবি কাহ্ন স্বপ্ন দেখে এমন এক ভূখণ্ডের, যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিপীড়ন থাকবে না। আর তাদের মুখের ভাষাই হবে রাজদরবারের ভাষা। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপন্যাসের শরীরে ধারণ করে চর্যাপদকে নবরূপ দেওয়া হয়েছিল। চর্যাপদের এইরকম নবরূপ দানের নতুন নতুন প্রচেষ্টায় 'বোধিদ্রুম' নিশ্চয়ই এক অন্যতম সংযোজন। সেখানে প্রাচীন বাংলার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রাচীন বাংলার নানা শব্দ, প্রাচীন বাংলা নাটকের আঙ্গিকেও ব্যবহার করা হয়েছে।

রূপসী বাংলা'-য় জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

" ... তখন এ জলসিড়ি শুকায়নি, মজেনি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া-ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুরর জিনের
শব্দ হত এই পথে- আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে - কি যেন খুঁজেছে, ... " [১৪]

আধুনিক কবিমানসের প্রাচীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্খা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে। উপনিবেশ পূর্ব বঙ্গ জীবনের মায়া-মোহ থেকে জীবনানন্দ মুক্ত হতে পারেননি। প্রাচীনের কথা কবি চেতনায় স্মৃতিতে নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। সাইমন জাকারিয়া যখন প্রাচীন বুদ্ধ নাটক, চর্যার চরিত্র ও মুখ্য কাহিনি ধারা অবলম্বনে নাটক লেখেন তখনও এক ভিন্নতর বাস্তবতার জন্ম হয়। যার অবস্থান আমাদের সময়ের থেকে খুব বেশী দূরে নয়। এখনও সাধনার পথে বা পুরুষের নানা কর্মযজ্ঞে নারীর ভূমিকা শুধুই সহযোগীর। ভোগবাদী সমাজে নারীও নানাভাবে পণ্যায়িত হয়। কাম ও ভোগের পথে নারীর মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে তাকে বস্তুতে পরিণত করা হয়। বোধিদ্রুমের 'ডোম্বী' যেন সেই সমাজ মানসিকতার বিরুদ্ধ এক মূর্ত প্রতিবাদ। নারীর আপোষহীন লড়াইয়ের বার্তা সমাজের বুকে পৌঁছে দেয় সে।

নাট্যকার এই নাটকে ভোগবাদী সমাজকে ধিক্কার জানিয়েছেন। প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন চর্যাপদের। জীবনের শ্বাশ্বত অনুভব মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে। প্রাচীন সাহিত্য-সমাজ তার কালগত সীমা ছাড়িয়ে নতুন যুগ প্রেক্ষিতে আবহমানের রূপ ধরে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মমোহের তৃষ্ণায় নয়, ভোগের আবর্তে নয়, নিঃস্বার্থ প্রেমেই মানুষের প্রকৃত আনন্দলাভ। এই বার্তা, এই সময়ে মানবসমাজে পৌঁছে দেওয়া কি জরুরি ছিল না?

সূত্র নির্দেশ :

১. মহাশ্বেতা দেবী, 'বেনে বউ', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১
২. বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', কলকাতা, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স, ১৪১৭, পৃ. ৩২
৩. সাইমন জাকারিয়া, 'নাটক সংগ্রহ', ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০, পৃ.৪৪
৪. ঐ, পৃ. ৪৫
৫. তদেব
৬. ঐ, পৃ.৪৮
৭. ঐ, পৃ.৬১
৮. ঐ, পৃ.৭১
৯. ঐ, পৃ.৭৫
১০. ঐ, পৃ.৮৪
১১. ঐ, পৃ.৮৬
১২. ঐ, পৃ.৯১
১৩. ঐ, পৃ.৩১১
১৪. জীবনানন্দ দাশ, 'রূপসী বাংলা' , কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ১৯৫৭, পৃ. ১৬

লেখক: **ড. পরমাশ্রী দাশগুপ্ত, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।**
Author : **Dr. Paramsree Dasgupta, Asstt. Professor, Bengali, Tripura University.**

বাউল নিপীড়ন ও ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ

■ জামসেদ আনোয়ার তপন

আমার চার দশকের বাদ্যযন্ত্র
গানের খাতা নথিপত্র,
পুড়াইয়া করেছে ছাই,
মনের দুঃখ কার কাছে জানাই
ও ভাইরে ভাই .....

বাউল রণেশ ঠাকুরের গানটি কান্না, আক্ষেপ আর বেদনার তুমুল হাহাকার নিয়ে অনুরণিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে। রাতের আঁধারে আসর ঘরটি আগুনে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে দুর্বৃত্তেরা। এমন কাজটি কারা করতে পারে ভেবে পায় না রণেশ ঠাকুর। কারো সাথে বিরোধ হয়েছে কিনা, নিজের অজান্তেও কারো মনে কষ্ট দিয়েছে কিনা, মনে করার চেষ্টা করেন। ঠিক মনে করতে পারেন না। কাউকে সন্দেহ করতে মন সায় দিচ্ছে না। এমন নির্বিরোধী মানুষ তিনি।

চল্লিশটি বছর ধরে তিল তিল করে সংগ্রহ করা সঙ্গীত সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গই ছিল একমাত্র সম্বল তার। গানের বই, খাতা, বেহালা, দোতরা, ঢোল, ছইট্টা, হারমোনিয়াম এসব নিয়ে সাজিয়েছিলেন প্রিয় ঘরটি। নাম দিয়েছিলেন 'আসর ঘর'। সপ্তাহে -মাসে আসর বসতো কাছে দূরের পথ থেকে আসা সতীর্থ সঙ্গীত পিপাসু বাউলদের নিয়ে। প্রতিদিন নিয়ম করে শিল্পীদের গলা সাধতে হয়। নিয়ম করে নতুন শিল্পীরা আসতেন গান শেখার জন্য। ঘরটি ছিল দেবালয়ের মত; এ ঘরে এলে কেমন যেন পবিত্রতায় উদ্ভাসিত হত মন। গুরুর শেখানো গানগুলো আজো কেমন জীবন্ত !মনে হয় গুরুজী বাউল -সম্রাট শাহ আব্দুল করিম যেন এখনও নিত্য আসরে যোগ দেন! নতুন নতুন তৈরি করা গানগুলো গুরুর চরণে উৎসর্গ করে আনন্দে ভরে যেতো মন। একেকদিন সুরের আবেশ আর বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে যেত সবাই। মানুষের কথা, জীবনের কথা, ধর্মের নিগূঢ় বাণি-সত্য ও সুন্দরের কথাইতো তার গানের মূল উপজীব্য, তাহলে কেন এমন হলো, ভেবে পান না রণেশ। তার মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

রণেশ ঠাকুর এটাও জানেন যে পৃথিবীর সবকিছু তো তার গানের মতো সুন্দর ও পবিত্র নয়। এখানে মানুষ আছে, মানুষের উপর মানুষের নিষ্ঠুর শোষণ আছে, আছে ধর্ম আর জাত-পাতের ব্যবধান । মানুষের স্বার্থপরতা আছে। সত্যসুন্দর মানবধর্মের বিপরীতে

আছে ধর্মের নামে কুৎসিত অধর্ম।

এইতো মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। রাজবাড়ির পাংশায় ২৮ জন বাউলের চুল দাড়ি কাচি -দা দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল। ঘটনার দিন মোহাম্মদ ফকিরের বাড়িতে অতিথি হয়ে দূর দূরান্ত থেকে আমন্ত্রিত বাউলরা এসেছিলেন। এলাকার প্রভাবশালী লোকজন এই বাউলদের জোর করে ধরে নিয়ে যায় মসজিদে বলা হয় বাউলরা ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে সুতরাং জোর করে তওবা পড়ানো হয়, তাদের লম্বা লম্বা চুল দাড়ি জোর করে দা দিয়ে কাচি দিয়ে কেটে দেয়া হয়। দা দিয়ে কাটতে গিয়ে একজনের ঘাড়ের কাছে কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। লজ্জায় অপমানে যাটোর্ধ্ব মোহাম্মদ ফকির বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ভয়ে এলাকার কোন লোক প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি, বাউলদের বিরুদ্ধে এমন কুৎসা রটানো হয়েছিল যেন কেউ তাদের পক্ষ নেয়ার কথা ভাবতে না পারে। ওখানকার প্রশাসনের লোকজন এবং তৎকালীন এম পি জিল্লুর হাকিমের ভাষ্য ছিল এমন যে বাউল নির্যাতনের বিষয়টা একটু তুচ্ছ ঘটনা।

তুচ্ছ ঘটনা তো বটেই। দয়া করে এখনও যে পৃথিবীতে জীবিত রাখা হয়েছে তাদের! রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শফিউল আলম ছিলেন লালন ভক্ত একজন চিন্তাশীল মানুষ। ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে বাসায় ফেরার পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তাঁকে। লোকটি বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে লালনের গান সংগ্রহ করতেন, আখড়ায় বাউল শিল্পীদের সাথে কথা বলতেন, নিমগ্ন থাকতেন লালন সাধনায়। এ ধরনের মানুষদের হত্যা করার পর কিছু কমন কথা প্রচার করা হতো। যেমন ইনি নাস্তিকতা প্রচার করতেন, ফেসবুকে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কটুক্তি করতেন, তাঁর ক্লাসে মেয়েদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ করেছেন ইত্যাদি। শফিউল আলমের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রচারই হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকেরা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এসব একেবারেই মিথ্যাচার।

মিথ্যাচারই হল বাউল নিপীড়কদের প্রধান অস্ত্র। মিথ্যাচারের এই অস্ত্রটি তারা ব্যবহার করে সর্বত্র। যেমন করেছে নেত্রকোণার কেন্দুয়ায়। এই উপজেলার বাসিন্দা আবদুল হালিমের বাড়িতে ভক্তদের নিয়মিত আসর বসতো, যেখানে লালন গানের বাইরে নানা বিষয়ে অলোচনা হতো। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে আয়োজিত সেই আসরের বার্ষিক অনুষ্ঠানটি পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। 'হেফাজতে ঈমান' নামের একটি সংগঠন লিফলেট বিলিয়ে অপপ্রচার চালায়। ইউএনও'র কাছে অভিযোগ করে বাউলরা অনৈসলামিক কাজ করে। তো এই গুরুতর অভিযোগ পেয়ে মহান পুলিশবাহিনী সদর্পে চড়াও হয় অনুষ্ঠান আয়োজকদের উপর। প্রশাসন আর তথাকথিত ঈমানের হেফাজতকারীরা যখন একই সুরে কথা বলে তাকে চ্যালেঞ্জ করে অনুষ্ঠান করার শক্তি কি গ্রামের সেই নিরীহ বাউলদের থাকে?

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় আওয়ামীলীগ দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও তার ভাই জামাত নেতার সাঙ্গপাঙ্গরা চড়াও হয়েছে বাউল হারেছ ফকিরের উপর। তাঁর চল্লিশ

বছরের সংগৃহীত বাদ্যযন্ত্র ভাংচুর এবং তাঁকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

দু-তিন বছর আগে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে শরিয়ত সরকার নামে যে বাউলকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে, বছরখানেক সেই বাউল শিল্পী জেলে অন্তরীণ ছিলেন। পালা গানের নিয়ম অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়ে বয়াতি বা শিল্পী তার নিজস্ব ঢং এ কিছু কথা বলেন। এদিন তিনি জানতে চেয়েছেন কোরাণের কোন আায়াতে গান নিষিদ্ধ করা হয়েছে? চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, কেউ প্রমাণ দিতে পারলে তিনি গান ছেড়ে দেবেন এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি যে প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তার জবাব পাওয়া তো দূরের কথা সেই শিল্পীকে গ্রেফতার করে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে এই স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয়া হয় যে, বাউল গানের অনুষ্ঠানে যা বলেছেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত।

বাউল নিপীড়নের জন্য সকল স্থানে যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে কায়েমী স্বার্থবাদী এক শ্রেণির মানুষ। এর পক্ষে আছে রাষ্ট্রীয় কালাকানুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগকারী 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেন, ব্যস, তাতেই হয়ে যায়। এরপরে আর কিছুই যেন বিবেচনায় নেয়ার থাকে না। অনেক সময় পুলিশ নিজেই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে দেয়। এর পর অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অভিযুক্তকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাউল নির্যাতনের মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুলিশের তৎপরতা দেখা যায় না। কোথাও কোথাও ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে নিপীড়কদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হলেও শুরু হয়ে যায় স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন মহলের উদ্যোগে আপসরফার তৎপরতা।

এই যখন বাংলাদেশে বাউলশিল্পীদের অবস্থা তখন রণেশ ঠাকুর তাঁর বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জন্য বিচার প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোবল পান না। রাতে অগ্নিকাণ্ডের পর গোটা দিন তিনি মনের দুঃখে কেঁদেছেন। খুব ভোরে খবর পেয়েই উদীচী দিরাই শাখার বন্ধুরা ছুটে গিয়েছেন,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন। বিকেলে যখন রণেশ ঠাকুরকে ফোন করি তখন বেচারা ক্লান্ত বিধ্বস্ত। ঠিকমত কথা বলতে পারছিলেন না। ধারণা করতে পারি সারাদিন নানা কিসিমের লোকজনের সাথে কথা বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। থানায় অভিযোগ দেয়ার কথা বলায় ইতস্তত করছিলেন। উদীচী তার পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে শুনে গলার স্বরটা একটু একটু করে বাড়ছিল। আশেপাশের শুভানুধ্যায়ী সতীর্থ বন্ধুরাও সাহস দিয়েছেন। সকলের পরামর্শ মেনে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপেক্ষা করেছিলাম, প্রশাসন কী ধরণের তৎপরতা চালায়। দু'একবার পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ছবি তুলেছে পোড়া বাড়িটার - ঐ পর্যন্তই ছিল পুলিশি তৎপরতা।

শারীরিকভাবে নির্যাতন, একঘরে করে দেয়া, হুমকি-ধমকি এসব এখন বাউলদের নিত্য উপহার। অথচ ইউনেস্কো ২০০৫ সালে বাউলসঙ্গীতকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্যও এক বিরাট গর্বের বিষয়।

ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর উদ্যোগ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাউল গানের বিশাল ভাণ্ডার থেকে প্রায় পাঁচশত গান সংগ্রহ করে সংকলিত করা হয়েছে, যেখানে শতাধিক গানের ইংরেজি অনুবাদ ও দেড়শ গানের স্বরলিপি যুক্ত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলার অমূল্য সম্পদ বাউল গান সংরক্ষণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বাউলশিল্পী অধ্যুষিত অঞ্চল সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, নাটোর প্রভৃতি অঞ্চলে ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু করা উচিত। না হলে কালের গর্ভে অনেক গান এবং গানের সুর হারিয়ে যাবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাউল শাহ আব্দুল করিমের একনিষ্ঠ শিষ্য রণেশ ঠাকুরের বই, খাতাপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিশ্ব ঐতিহ্য ও সভ্যতার এক বিরাট ক্ষতি করা হলো। এটি সাধারণ কোন অপরাধ নয়, বরং সামগ্রিকভাবে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবিক সংস্কৃতির উপর এক বিরাট আঘাত।

মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, জীবনবোধ, ধর্ম, প্রেম ও দেশের কথাই বেশিরভাগ সময় উঠে এসেছে বাউল সাধকদের কথায় গানে ও জীবনাচরণে। এর পাশাপাশি সকল অন্যায়, অবিচার , কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বাউলরা সকল সময়ে সোচ্চার থাকেন বাণী ও সুরে। আজ তাই এই তথাকথিত তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ করে না দেখে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। সমাজে যখন অমানবিকতার দাপট চলছে এমন সময়ে বাউলদের কাছেই আমাদের যেতে হবে। তারাই সমাজের প্রকৃত শিক্ষক ও বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষকে মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

তাই আক্রান্ত বাউলের পাশে দাঁড়ানো সমাজের সচেতন অংশের নৈতিক দায়িত্ব। অবশ্য যারা সমাজের ঘটনা দুর্ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগে নিজের লাভক্ষতির হিসাব কষেন যারা নিজেদের বিবেক ও হিতাহিত জ্ঞানকে সঁপে দিয়েছেন কায়েমী স্বার্থের পদপ্রান্তে, তাদের কাছ থেকে নৈতিক অবস্থান গ্রহণের প্রত্যাশা করা যায় না। আউল- বাউল লালনের দেশের বাদ বাকি বিবেকবান ও হৃদয়বান মানুষেরা একতারার পক্ষাবলম্বন করবেন এটাই প্রত্যাশিত।

পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ'কে বিশ হাজার টাকা আর দুই বান টিন দিয়ে মিটমাট করার চেষ্টা দেখে এই শংকা আরও প্রবল হচ্ছে যে এই দেশে বাউল হয়ে জন্ম নেওয়া অপরাধ। যেমন মনের দুঃখে গান বেঁধেছেন বাউল শিল্পী আনান বাউল:

কেন যে ভাই গান শিখিলাম, কেনই বা হলাম বাউল
এই দেশেতে বাউল হওয়া মস্ত বড় ভুল।

লেখক : **জামসেদ আনোয়ার তপন, সহ-সভাপতি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় সংসদ।**

Author : **Jamshed Anowar Tapan, Vice President and former Genaral Secretary of Udichi Artist Association, Central Committee, Dhaka, Bangladesh.**

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস : নাট্যচর্চায় এক নতুন সম্ভাবনা

■ সঞ্জয় কর

ত্রিপুরা রাজ্যের নাটকের ইতিহাস প্রায়১২৫ বছরের পুরানো। রাজ অন্তঃপুরে রাজ অনুগ্রহে যে নাট্যচর্চার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সেই নাট্যানুশীলন উমাকান্ত ছাত্র নাট্য সংস্থা (১৯২৩), রনবীর কর্তা, ত্রিপুরেশ মজুমদার, সুধাংশু দত্ত, শিবদাস ব্যানার্জী, শক্তি হালদারদের চর্চায় নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে ষাটের দশকে এসে পৌঁছয়। এই সময়ে কলকাতায় 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নবনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটারের ভাবনা এই রাজ্যকেও আন্দোলিত করে। ষাটের দশকে আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ ও রূপম। এতকালের ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাট্যধারায় এবার সংযোজিত হতে লাগলো সামাজিক দায়বদ্ধতার নাটক। পশ্চিমবঙ্গে সাড়া জাগানো প্রযোজনা আগরতলা সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে অভিনীত হতে থাকে। সাতের দশকের আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রতিষ্ঠার পর অসংখ্য নাট্যদল গড়ে ওঠে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন হয়ে ওঠে শহরের সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র।

বিগত কয়েকটি দশকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে এখানকার থিয়েটারের চর্চার রূপ ও অভিমুখ অদল বদল হয়েছে নানাভাবে। অসংখ্য নাট্যদল গড়েছে, ভেঙ্গেছে, হারিয়ে গেছে। নাট্যদলগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দক্ষ শিল্পীর অভাব, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি নিয়েই এখানকার থিয়েটার নতুন শতকে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিন ধরেই এখানকার নাট্যশিল্পীরা এটা অনুভব করছিলেন, থিয়েটারের একক দল ভিত্তিক অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান জটিল সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকা কঠিন। একে অন্যের হাত ধরে সম্মিলিত নাট্য উদ্যোগ গঠন করে এখানকার নাট্য চর্চাকে শক্তিশালী ও বেগবান করা যায় কিনা! এই ভাবনার মূলে দেশে বিদেশে নাট্যক্ষেত্রে যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে কাজ করার কিছু উদাহরণ সামনে ছিল। পূর্বেও প্রায় বছর ১৫ আগে একবার এমন উদ্যোগ আগরতলায় নেওয়া হয়েছিল। প্রথম উদ্যোগের ব্যর্থতাকে মাথায় রেখেই এবারের আলোচনা শুরু হয়। সম্মিলিত উদ্যোগের সামনে মূল লক্ষ্য রাখা হয়, ধারাবাহিক নাট্য প্রযোজনা, পারস্পরিক আদান প্রদান ও পরামর্শের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রযোজনার গুণমান উন্নত করা, প্রতিটি নাট্যদলের প্রযোজনার সম্মিলিত প্রচার, টিকিট বিক্রিতে প্রত্যেক দলের সহায়তা এবং সর্বোপরি রাজ্যের নাট্যচর্চার অগ্রগতির জন্য সম্মিলিতভাবে সক্রিয় হওয়া। এই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিসর প্রস্তুত করা হয় দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই সম্মিলিত হওয়ার কাজটি মোটেই সহজ ছিলনা। বলা যায় দীর্ঘ আট মাস ধরে বহু আলোচনা, বহু যুক্তি তর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় এবং সম্মিলিতভাবে কিছু দায়িত্ব পালন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

এক । প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবার সম্মিলিত নাট্যপ্রয়াসের হয়ে এক একটি নাট্যদলের নাট্য-প্রযোজনা।

দুই । রবীন্দ্র ভবন দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া প্রতি নাট্যদলকে নাট্যপ্রয়াস প্রদান করবে।

তিন । একই ফরমেটে প্রত্যেক নাট্যদলের টিকিট ছাপানো হবে এবং প্রয়াস কর্তৃক এর ব্যয় বহন করা হবে।

চার । প্রতিমাসের নাট্য-প্রযোজনার পাঁচটি করে টিকিট নাট্যপ্রয়াসে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি দলের নেওয়া বাধ্যতামূলক।

পাঁচ । সম্মিলিতভাবে নাটকের প্রচার।

অবশেষে, মূলত রাজধানী আগরতলার নাট্যচর্চাকে গতিশীল ও উন্নত করার লক্ষ্যে এখানে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত অভিনয়ের জন্য শহরের ১৬টি নাট্যদল একত্রিত হয়ে ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে গঠন করে 'সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস'। নিয়মিত নাট্য চর্চার এই কর্মকাণ্ড ২০২০ সালের ২৭শে মার্চ বিশ্বনাট্য দিবসে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারণে এই কর্মসূচি দীর্ঘ এক বৎসর স্থাগিত রাখা হয়। বিশ্বব্যাপী অতিমারীর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে, করোনা বিধি মেনে প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার নিয়মিতভাবে অভিনয়ের এই সম্মিলিত প্রয়াস ২৭শে মার্চ বিশ্বনাট্য দিবসে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে ১৬টি নাট্য দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের যাত্রা শুরু হয়। নাটক দেখার জন্য ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ধার্য হয় ৫০ টাকা। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় শিল্পতীর্থের প্রযোজনা 'কিপ লাইলেন্স'। এটা অনস্বীকার্য, সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের এই কর্মকাণ্ড চালু হওয়ার পিছনে শুরু থেকেই ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতার একটি বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার, কবিতালোক, নাট্যলোক, সুরপঞ্চম, শিল্পতীর্থ, নাট্যভূমি, কাব্যলোক, নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটার, পটভূমি, ত্রিপুরা থিয়েটার, নন্দনতৃষা, রংপীঠ, উত্তর ফাল্গুনী, ভাবিয়া, সমর্পণ, রাঙ্গামাটিকে নিয়ে এক নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে। আগরতলা নগরীর এক একটি নাট্যদলের যে খণ্ড খণ্ড নাট্যচর্চা, তা সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস গঠনের মধ্য দিয়ে এক যুথবদ্ধ চর্চায় রূপান্তর হলো। কিন্তু যাত্রাপথ সুগম ছিল না। ২১-এর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় শনিবার নাট্যভূমির প্রয়োজনার পর আবার করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য ধারাবাহিক নাট্যাভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ৬ মাস বন্ধ থাকার পর নভেম্বর থেকে পুনরায় সুরপঞ্চমের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে আবার ধারাবাহিক অভিনয় চালু হয়। এরপর একে একে ডিসেম্বর মাসে নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটার, ২০২২ এর জানুয়ারিতে ত্রিপুরা থিয়েটার, ফেব্রুয়ারিতে উত্তর ফাল্গুনী নাটক প্রযোজনা করে। ২০২২ এর বিশ্বনাট্য দিবস উদ্‌যাপনের জন্য মার্চ মাসে অভিনয় বন্ধ ছিল। এপ্রিলে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার, মে

মাসে সমর্পণ, জুন মাসে রাঙ্গামাটি, জুলাইয়ে ভাবিয়া, আগস্ট মাসে কবিতালোক, সেপ্টেম্বরে পটভূমি, নভেম্বর মাসে নন্দনতৃষা, ডিসেম্বরে নাট্যলোক এবং রংপীঠ জানুয়ারি মাসে প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে। সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের ১৬টি নাট্যদল অন্তর্ভূক্ত থাকলেও প্রথম রাউণ্ডে মোট ১৫টি নাট্যদল তাদের প্রযোজনা করে। একটি দল অনিবার্য কারেণে তাদের প্রযোজনা করতে পারেনি। গুণমানের দিক থেকে কিছু নাটক যেমন বেশ প্রশংসিত হয়েছে, পাশাপাশি কিছু নাটকের দুর্বলতাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তবে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের ধারাবাহিক নাট্য চর্চার প্রতি দর্শক সাধারণের যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তাকে ধরে রাখার মতো যোগ্য প্রযোজনা মঞ্চে উপস্থাপন করার গুরুত্ব সবার থেকে জরুরী হয়ে উঠে।

গত দুটি বছরে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস কি কি কাজ করেছে, তার একটি চিত্র :

সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে এই কর্ম উদ্যোগে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়। রাজ্য সরকার প্রয়াসের আবেদনের সাড়া দিয়ে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এবং তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অর্থ মঞ্জুরি দেয়। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রথম রাউণ্ডের নাট্য প্রযোজনা সম্পন্ন করা হয়।

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের লোগো তৈরি করে দেন শিল্পী স্বপন নন্দী।

প্রয়াসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হলের ভাড়া হ্রাস করার জন্য এক প্রতিনিধি দল গভর্ণমেন্ট অডিটোরিয়াম ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান কমল দে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে এবং এর ফলস্বরূপ রবীন্দ্র ভবন দু'নম্বর প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া শুধুমাত্র মাসের দ্বিতীয় শনিবার সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের নাট্যাভিনয়ের জন্য এক চতুর্থাংশ হ্রাস করা হয়।

সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস ১৮ই মার্চ ত্রিপুরা সরকারের রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটি দ্বারা নথিভূক্ত হয়।

সম্মিলিত নাট্যপ্রয়াসের অন্তর্ভূক্ত নাট্য দলগুলোর নাটকের প্রচারে এবং প্রসারের জন্য একটি ফেস্‌বুক পেজ খোলা হয়।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কোভিড সচেতনতামূলক ভিডিও নির্মাণে নাট্য প্রয়াসের সাহায্য চাওয়া হয়। এর জন্য দপ্তর থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয় যা দিয়ে প্রয়াসের সব দলগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে আটটি প্রচার ভিডিও নির্মাণ করা হয়।

শিল্পতীর্থের সঙ্গে যৌথভাবে ২০২২ ও ২০২৩ সালের বিশ্ব নাট্যদিবস শোভাযাত্রার মাধ্যমে পালন করা হয়।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে এনএসডি-র স্থায়ী জায়গা সংকুলানের ব্যাপারে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

অসুস্থ শিল্পীদের সাহায্যে চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস অন্তর্ভূক্ত নাট্যদল এগিয়ে এসেছে।

গত ৪ এপ্রিল, ২০২৩ রাজ্যের সম্ভাবনাময় নাট্যশিল্পী উত্তম চক্রবর্তী এক মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়। সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস প্রয়াত শিল্পীর শিশুপুত্র ও স্ত্রীর পাশে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রয়াসের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রয়াস অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন নাট্যদল ও ব্যক্তি অর্থ সাহার্য করেন। গত ২ জুলাই প্রয়াতের স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে সংগৃহীত মোট অর্থ ৫০ হাজার টাকার একটি চেক্ প্রয়াতের স্ত্রী অংকিতা ভট্টাচার্য-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২৮ মার্চ, ২০২৩ থেকে ধারাবাহিক নাট্যচর্চার দ্বিতীয় রাউণ্ড শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে, গত চারটি মাসের প্রতিটি দ্বিতীয় শনিবারে আগরতলা রবীন্দ্র ভবনের ২ নম্বর হলে চারটি নাট্যদল আরো সংগঠিত ভাবে নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আগরতলার নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে এখন অন্তত এই খবরটুকু পৌঁছে গেছে, মাসের দ্বিতীয় শনিবার শহরে নাটক দেখার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস অন্তর্ভূক্ত দলগুলি হল ভাড়া ও প্রযোজনার একটি সীমিত অংশ হলেও সদস্য দলগুলির টিকিট বিক্রির থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে, কয়েকটি নাট্যদল নতুনভাবে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের সদস্যপদ নিতে আবেদন করেছে। যে সব দলের নাট্য চর্চার ধারাবাহিকতা রয়েছে, যে সব নাট্যদল প্রযোজনার গুণমানের দিক থেকে একটি সাধারণ মান বজায় রাখছে, সে সব দলকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াস তার ব্যাপ্তি বাড়াতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে আগরতলার বাইরেও অন্যান্য নাট্য প্রধান শহরগুলিকে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তারও ভাবনা চিন্তা প্রয়াসের কর্মকর্তাদের রয়েছে।

১৫টি নাট্য সংস্থার নাট্য মঞ্চায়নের বিগত একটি আবর্তন থেকে কিছু অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, যা আগামী দিনে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে।

১) দর্শকের আনুকূল্য আদায় করার উপর প্রয়াসের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করছে। যে সহায়তা নাট্যদলগুলি পাচ্ছে, এর সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে নতুন সম্ভাবনার গ্যারান্টি তৈরির দায়িত্ব আজ সবার কাঁধে। এটা সবার অনুভব, একটি নাট্যদলের প্রযোজনাগত দুর্বলতা সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের প্রতি দর্শকের সামগ্রিক আস্থাকে খর্ব করবে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই একে অন্যের হাত ধরা।

২) সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের যূথবদ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ নাট্যদলের ভিতটাকে মজবুত করার সুযোগ এসেছে। এক দুজনকে নিয়ে নাট্যদল টিকিয়ে না রেখে, নতুনদের দলে কি ভাবে নিয়ে আসা যায়, সে পথ খোঁজার এখন উপযুক্ত সময়।

৩) সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস টিকিয়ে রাখতে হলে একে দলীয় রাজনীতির ছোঁয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। ব্যক্তি, নাট্যশিল্পীর, নাট্যদলের আলাদা আলাদা রাজনৈতিক আদর্শ থাকা

স্বাভাবিক। কিন্তু, সম্মিলিতভাবে নাটকের স্বার্থে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে এই বিবিধতাকে মেনে ও সম্মান জানিয়ে যে এগোতে হবে, সে শিক্ষা সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস কার্যকর করার চেষ্টা জারী রেখেছে।

৪) এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস গঠনের মধ্য দিয়ে আগরতলার নাট্য আঙ্গিনায় নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। নাট্যশিল্পী ও নাট্য দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস এই সম্পর্ককে সারা রাজ্যে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এখন ক্রমশ সামনের দিকে এগোচ্ছে।

১২৫ বছরের নাট্য ঐতিহ্যকে বর্তমান আধুনিক সময়ের উপযোগী করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সমতুল্য করার লক্ষ্য সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের। এর সঙ্গে ত্রিপুরার জাতি-জনজাতির নাট্য উপাদানের সংযোগ ঘটিয়ে এ রাজ্যের নাট্যদলগুলি নাট্যক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে সতত সক্রিয়। সেই লক্ষ্য পূরণে, সর্বস্তরের সহযোগিতাকে সম্বল করে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস আগ্রণী ভূমিকা পালন করবে— এ আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : **সঞ্জয় কর, রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং "সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস"এর সম্পাদক।**
Author : **Sanjoy Kar, eminent Theatre Personality of Tripura.**
Secretary, "Sommilata Natya Prayash".

ত্রিপুরায় বাংলা পথনাটক
সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা

■ মলয় দেব

১

নাটক সমন্বয়ী প্রদর্শনমূলক শিল্প। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শিল্পীর মানবিকতা অনুসারী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি নাটকে শিল্পীত হয়। পথনাটক ইস্যু ভিত্তিক ক্ষুদ্রাকৃতির এক বিশেষ ধরণের নাট্য আঙ্গিক, যাতে নাট্যকর্মীরা জনগণের সাথে সরাসরি সংলাপ তৈরী করতে পারেন। জীবন ঘনিষ্ঠ সমষ্টিচেতনা সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে জনগণও খুব সহজে ব্যক্ত করতে পারেন তাদের প্রতিক্রিয়া। আর এভাবেই পরিবেশনামূলক শিল্পের পাত্রপাত্রীদের পাশাপাশি জনতাও সংস্কৃতির নির্মাণে অংশীদার হয়ে উঠেন। প্রাচীন ভারতের 'বীথিনাটিকা' নামক নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে একালের পথনাটকের রূপাঙ্গিকের সামান্য মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও ভাবগত দিক থেকে পথনাটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'বীথিনাটিকা'-এর মূল লক্ষ্য ছিল পথচলিত মানুষকে রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে আনন্দ দেওয়া, আর একালের পথনাটকের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং প্রচার; সাংস্কৃতিক অভ্যুদয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। লোকনাট্যের নানা আঙ্গিক ও প্রয়োগশৈলীকে আত্তীকরণ করেও[১] বিষয় চয়নের দিক থেকে পথনাটক একেবারে অভিনব। লোকনাট্যের মতো কোনও ঐতিহ্যবাহী পুরাণকথা বা রূপকাশ্রিত প্রেমকাহিনি নয়; পথনাটকে জনগণের প্রিয়, সহজবোধ্য ও সুপরিচিত অভিব্যক্তিগুলিকে স্বতন্ত্র ভাষায়, ছাঁচে তীব্র গতিময়তায় পরিবেশন করা হয়। পথনাটক প্রদর্শন কালে পথচলিত কর্মমুখর মানুষের যাওয়া আসার মধ্যেই পরিবেশনকারীদের ঘিরে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত একটি বৃত্ত তৈরি হয়। আর এই বৃত্তই পথনাটকের মৌলিক আকৃতি। বাধা মঞ্চ থেকে অভিনেতারা পথে নামেন বলে, প্রেক্ষাগৃহের নাটকের মতো তাদের পরিবেশনায় উপাদানের বাহুল্য থাকেনা, আলোকসজ্জারও প্রয়োজন হয় না, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ও পোষাক ব্যবহারে বাহুল্য বর্জন করা হয়।

আধুনিক পথনাটকের উদ্ভব ঘটেছে বিশ শতকে 'ইউরোপ আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে।[২] "একদিকে রাজনৈতিক শক্তি, বিপরীতে দুর্নৈতিক শক্তি — এ দুয়ের দ্বন্দ্ব, সংঘাতই পথনাটকের কর্মীদের কাছে প্রাণসম্পদ। রাজনীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাট্যসৃষ্টির প্রধান পাথেয়।"[৩] সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শকে ধারণ করেই রাশিয়া, জার্মানি, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে পথনাটকের চর্চা ও

চর্যা শুরু হয়। ভারতেও একই প্রয়োজনে পথনাটকের সূচনা ও বিস্তার ঘটেছে।

২

বাংলা পথনাটক রচনার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। স্বাধীনোত্তর বাংলায় শাসকশ্রেণির অপশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। প্রবল শক্তিশালী এই মাধ্যমটি প্রথম সংকলিত রূপ পায় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনী নাট্যসংখ্যা হিসেবে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা পরিচালিত 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকায় (৪:৫ ডিসেম্বর ১৯৬৬)।[৪] তারপর পথনাটকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায় (২:২ নভেম্বর ১৯৭৮- জানুয়ারি ১৯৭৯) কয়েকটি আলোচনা ও সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। তারপর এই পত্রিকায় একে একে 'পথনাটক সংখ্যা' (৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭ 'ক্রোড়পত্র পথনাটক' (৯ : ৩ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল১৯৮৭), 'সফদর হাশমি ও জননাট্য মঞ্চ সংখ্যা' (১১ : ২ নভেম্বর ৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯), 'পথনাটক সংখ্যা' (১১ : ৪ মে-জুলাই ১৯৮৯, 'পোস্টার নাটক সংখ্যা' (১৩ : ৩ ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯১) প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকার 'পথনাটক সংখ্যা' (৮ : ৫-৬, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৯), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা'র 'পথনাটক সংখ্যা' (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ) এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথনাটকের কথা'[৫] (১৯৮৭) গ্রন্থে লোকনাট্যের সঙ্গে পথনাটকের আত্মীক সম্পর্কের পাশাপাশি অঞ্চলভেদে পথনাটকে বৈচিত্র্যের দিকটিও আলোচিত হয়েছে। সীমা সরকার তাঁর 'পথের নাটক' (১৯৯৮) গ্রন্থে বাংলা পথনাটক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ১৯৪৯ - ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অভিনীত পথনাটকের একটি সারণি সংযোজন করেছেন। উপরোক্ত পত্রিকাত্রয়ী ও গ্রন্থদ্বয়ে ত্রিপুরায় পথনাটকের চর্চা ও চর্যার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই অনালোচিত রয়ে গেছে। তাই আমরা প্রস্তাবিত প্রবন্ধে ত্রিপুরায় রচিত ও অভিনীত বাংলা পথনাটক নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব। প্রবন্ধটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ত্রিপুরার কয়েকজন সহৃদয় নাট্যকর্মী। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

ত্রিপুরায় পথনাটকের সলতে পাকানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে। সে সময়ে জনশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত সুধন্বা দেববর্মার বাংলা ও ককবরক এই দ্বৈত ভাষায় রচিত 'এগিয়ে চলো' (১৯৪৮) নাটিকাটিকে ত্রিপুরার প্রথম পথনাটক হিসেরে আখ্যায়িত করা হয়। নাটকটি জনজাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করার নিমিত্তেই রচিত হয়েছিল। এই একই ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহেন্দ্র দেববর্মা লেখেন 'রাজেন্দ্র হত্যা' ও 'কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী' এই দু'টি ছায়ানাট্য। পথনাটকের আদলে রঞ্জন রায়ের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটক দু'টি সে সময়ে চলতে থাকা অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসংয়োগ তৈরিতে

সমর্থ হয়েছিল।[৬]

ষাটের দশক থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনে ত্রিপুরায় সংস্কৃতি কর্মীরা ব্যাপকভাবে রাস্তায় নামতে শুরু করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলন,টেস্ট রিলিফের মজুরীর দাবী, জি আর-এর দাবী, লেভি-র জুলুমের বিরুদ্ধে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় পথনাটক শুরু হয়। 'জাঠা অভিযান'- মহকুমার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে যেতে একই সঙ্গে চলত বক্তৃতা, গান, নাটক। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ (১ নভেম্বর ১৯৫৫ - ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫) তখন সমস্ত গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল। এই সংগ্রামের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অনুপম ঘটক রচনা করেন তাঁর 'আঠারো বছরের যৌবন'। নাটকটি অভিনয়কালে ত্রিপুরার স্থানীয় সমস্যা যুক্ত হয়ে যায়। সে সময় চাকরি, বেকারভাতা প্রভৃতি চালুর দাবীতে আন্দোলনরত কাজল বর্মণ নামে এক ছাত্র পুলিশের গুলিতে মারা যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে 'ত্রিপুরা বেকার সংস্থা' নামক বামপন্থী সংগঠন তাদের আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে নাটকটি প্রদর্শনকালে 'কাজল ভিয়েতনাম' নামক গানটিকে যুক্ত করে।[৭] ঐ সময়ে আগরতলার একাধিক নাট্যসংস্থাও নাটকের বার্তাকে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পথনাটক প্রদর্শনে এগিয়ে আসে।

সত্তর ও আশির দশকে রাজ্যের গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ' (১৯৬৬) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থার সাড়া জাগানো পথনাটক 'বাস্তব শাস্ত্র'। নাটকটি দুশোরও বেশি অভিনীত হয়েছে। এই নাটকটি ছাড়া সংস্থা কর্তৃক প্রদর্শিত পথনাটকগুলি হল— 'দিন বদলের পালা', 'আর হবেনা দেরি', 'শনিঠাকুরের পাঁচালী', 'মাচাং বাবা', 'গুপ্তবিদ্যা' ইত্যাদি।[৮] 'অনামী' (১৯৬৮) নাট্যসংস্থার সদস্যবৃন্দ জীবনমুখী নাটক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার মানসে একের পর এক পথনাটক অভিনীত করেন। তাঁদের অভিনীত নাটকগুলি হল—'রক্তে বোনা ধান', 'উজান', 'জুলিয়াস ফুচিক', 'হারানের নাতজামাই', 'স্বপ্নের ভারত' ইত্যাদি।[৯] 'অনামীর অন্যতম নাট্যকর্মী পার্থ রায় পরবর্তী সময়ে গঠন করেন 'ত্রিপুরা ইয়ুথ কয়্যার'। পার্থ রায়ের নির্দেশনায় এই সংস্থাও'অনামী'র পথনাটকের ধারাকে বজায় রেখে 'রক্তাক্ত জারুল বাঁচাই', 'আঁধার পেরিয়ে', 'সংহতির গান', 'এবার রাজার পালা', 'হল্লাবোলের গান' ইত্যাদি পথনাটক উপস্থাপন করেন।[১০] ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা 'রূপম' (১৯৬৭) পরিবেশিত সচেতনতামূলক কয়েকটি পথনাটক হল — 'ভেল্কির খেলা' (১৯৯৬), 'অথ সারমেয় কথা' (১৯৯৯), 'মুরগী' (২০০১), 'রাজব্যাধি' (২০০৪) ইত্যাদি।[১১] 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, কের চৌমুহনী ইউনিট'-এর শিল্পীরা 'অভ্যুত্থান', 'জুলিয়াস ফুচিক' ও জ্বালা' এই তিনটি রাজনৈতিক বক্তব্য নির্ভর পথনাটক উপস্থাপন করেন।[১২] প্রতিভাবান নাট্যকার মানিক চক্রবর্তী কয়েকজন তরুণ শিল্পী নিয়ে গঠন করেন 'রূপায়ণ' (১৯৭২)। এই সংস্থার মৌলিক সৃষ্টি 'থিয়েট্রন'। মানিক চক্রবর্তীর

নির্দেশনায় ভীড়বহুল উন্মুক্ত জায়গায় ২-৫ মিনিটের নাটক পরিবেশন করতেন থিয়েট্রন শিল্পীরা। তাঁদের পরিবেশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো— 'কলার খোসা', 'হরিবোল', 'ধর্মঘট', 'বেবিফুড', 'বিচার', 'এর লাইগ্যা না তো', 'পাইছি রে' ইত্যাদি।[১৩]

'কৃষ্টি সংসদ' (১৯৮৪)-এর শিল্পীরা গণসংগীত ও পথনাটক নিয়ে রাজ্যের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। 'কৃষ্টি সংসদ' প্রযোজিত পথনাটকগুলি হলো— রতীশ মজুমদারের 'হাঁড়িবাবা', 'নক্সী কাঁথার গান' ও সমীর দত্তের 'পুর রাজ'।[১৪] সঞ্জয় করের 'নাট্যভূমি' (১৯৯৩) 'ডলি সংবাদ', 'মৎস্য রাজার দেশে', 'হাত ধরো বন্ধু', 'জলকথা', গন্তব্য প্রভৃতি পথনাটক উপস্থাপন করেছে।[১৫]

এর পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বিষয়ে সচেতনতা বা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, সংস্কার, স্বচ্ছ ভারত, স্বাস্থ্য বীমা, ফসল বীমা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নারী পাচার ও ধর্ষণ, সামাজিক ন্যায় বিচার, লোকআদালত, বিপিএলদের বিনামূল্যে চশমা বিতরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে স্বল্পায়তনের পথনাটক রচিত ও পরিবেশিত হচ্ছে। 'ত্রিপুরা থিয়েটার'-এর এই ধারার উল্লেখযোগ্য পথনাটক হলো— বিভু ভট্টাচার্যের 'আলোর দিশারী', 'সবার জন্য শিক্ষা', 'আঁধার পেরিয়ে', 'আমরা ৯৯ পারসেন্ট', দেবাশিস ভট্টাচার্যের 'ধ্রুবতারা', অসীম কুমার রায়ের 'মিশন -টু-থাউজেন্ড-নাইনটিন', কমল মজুমদারের 'বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে', গায়ত্রী চৌধুরীর 'অন্নপূর্ণা' ইত্যাদি।[১৬] 'শিল্পতীর্থ' (১৯৯৩) অনেকগুলি পথনাটক পরিবেশন করেছে। ড্র সুশান্ত সিন্‌হা ও কার্তিক বণিকের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক 'রাহুমুক্তি'। সুশান্ত দে-র 'ধর্মসূত্র', 'গোপী বাঘা ফিরে এলো', কার্তিক বণিকের যুদ্ধবিরোধী নাটক 'বিপন্ন সভ্যতা' ও সংস্কার বিরোধী নাটক 'খুড়োর কল' শিল্পতীর্থের প্রযোজিত পথনাটক।[১৭]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন দেশে জরুরী অবস্থা জারী হবার পর মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সুনীল দত্তের রচিত 'রক্তে বোনা ধান' নাটকটি নিদয়া, বক্সনগর, নলছড়, সোনামুড়া, ধনপুর, পুলুবাড়ি, কলমছড়া, রাঙ্গামাটি, কলমক্ষেত, মেলাঘর প্রভৃতি অঞ্চলে কমপক্ষে চল্লিশবার পরিবেশিত হয়েছে।[১৮] বিজন ধরের 'লাগাতর' পথনাটকটি লাগাতর ধর্মঘটের সমর্থনে রচিত একটি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রধান শিল্পসুন্দর নাটক। নাটক চলাকালীন দর্শকের মধ্য থেকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকে অভিনয়ে অংশগ্রহন করতেন। নাটকটির বিষয় চয়ন ও উপস্থাপনা শৈলীতে অভিনবত্ব রয়েছে। সে সময়ে ধর্মঘট বিরোধী গুণ্ডারা আকস্মিকভাবে ধর্মঘটের স্বপক্ষে চলা মিছিল বা পথসভায় আক্রমণ করত। এই প্রেক্ষাপটেই বিজন ধর আলোচ্য নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি ত্রিপুরার নানা জায়গায় পরিবেশিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনসংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।[১৯] বিলোনীয়ার ছাত্র, যুবক, কর্মীদের ওপর একের

পর এক তৎকালীন সরকারের যে অত্যাচার চলছিল তার প্রতিবাদে সত্তরের দশকের শুরুতে বিজন ধর রচিত ও সমীর ধর প্রযোজিত 'রক্তাক্ত বিলোনীয়া' নাটকটি আন্তঃমহকুমা নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা পুরস্কার পায়।[২০]

বিলোনীয়ায় পথনাটক চর্চা শুরু হয় সাতের দশকের শেষের দিকে। অদম্য প্রাণশক্তি, দিপ্র রাজনৈতিক চেতনা ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সে সময়ে নাটককে হাতিয়ার করে পথে নামেন প্রদীপ কান্তি দাস, অসিত সাহা, হারাণ দাস, পীযূষ সাহা, অরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। তাঁদের নির্দেশনা ও প্রযোজনায় বিলোনীয়ার ভীড়বহুল স্থানে সে সময়ে পরিবেশিত হয়েছে - 'ছাগল', 'বিড়াল', 'এম.এল.এ. জগাদা', 'কলার খোসা' ইত্যাদি নাটক। ৮১-৮২-র দিকে এল.ইউ.ওয়াই.এ-এর নাট্যশিল্পীরা শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত করা ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের লক্ষ্যে পথনাটক উপস্থাপনায় এগিয়ে আসেন। এঁদের কয়েকেজন হলেন— অপূর্ব কুমার দেব, বিনয় পাল, দেবাশিষ দত্ত প্রমুখ। নব্বই-এর দশকে 'সংলাপ', 'পাঞ্চজন্য', 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি নাট্যসংস্থা পথনাটক প্রযোজনায় এগিয়ে আসে। এই সংস্থাগুলি বিলোনীয়ায় পথনাটক চর্চার ধারাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। উপযুক্ত নাট্যসংস্থার মধ্যে বর্তমানে পথনাটক পরিবেশনায় 'ত্রিবেণী'ই অধিক সক্রিয়।[২১] বিলোনীয়ায় রচিত মুক্তাঙ্গনের কয়েকটি নাটক হল— সুশান্ত সিংহ রায়ের 'আলোয় ফেরা' (১৯৭২), 'দংশনে বিষ' (২০০১), 'মহানিদ্রা' (২০০১),'ঊনকোটির কান্না' (২০০১), 'ফিরিয়ে দাও' (২০০১), 'বিশ্বত্রাস' (২০০২); সমীর কান্তি দেবনাথের 'ইতিহাসের পাতা'(১৯৮৪), অজয় ভূষণ তিলকের 'মইন্যার মার সংসার' (১৯৮৬), 'গ্রামের নাম পলাশপুর' (১৯৮৮), সুরেশ চক্রবর্তীর 'সেই রাত এই দিন' (১৯৯৫), 'জীয়ন কাঠি' (২০০১), বিনয় পালের 'পরিবেশের সংকট' (১৯৯০), 'অভিজ্ঞতা' (১৯৯৬), গোপীনাথ দত্তের 'বাঁচার সংগ্রামে' (১৯৯৬) ইত্যাদি। [২২]

ধর্মনগরেও একই সময়ে পথনাটকের চর্চা শুরু হয় মতিলাল দে ও বিশ্ববন্ধু সেনের তৎপরতায়। মতিলাল দে সদ্য স্নাতক বিশ্ববন্ধু সেনকে নিয়ে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দীঘির পাড় ও থানার সামনে রেলপথ সম্প্রসারণ ও শিল্পের দাবিতে তাৎক্ষণিকভাবে 'দাবি' নামে একটি অরাজনৈতিক নাটক পরিবেশন করেন। এটাই ধর্মনগরের স্থানীয় শিল্পীর দ্বারা পরিবেশিত প্রথম পথনাটক।[২৩] এর আগে আগরতলার 'রূপম' ও 'রূপায়ণ'-এর শিল্পীবৃন্দ ধর্মনগরে পথনাটক পরিবেশন করেছেন। 'রূপায়ণ'-এর থিয়েট্রন' গ্রুপ মানিক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'কলার খোসা' নামক মানবিক চেতনা ঋদ্ধ একটি নাটক ধর্মনগরে উপস্থাপনা করেছিল। মতিলাল দে ধর্মনগরে নিয়মিতভাবে নাটকের চর্চা শুরু করেন সাতের দশকের শেষার্ধে। তাঁর রচনা ও নির্দেশনায় এবং 'রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদ' (১৯৬৮)-এর প্রযোজনায় উত্তর ত্রিপুরার হাটে মাঠে একাধিক সচেতনতামূলক পথ নাটক

প্রদর্শিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুরে ও ভাষায়, তাদের জীবনকে বিষয় করে তিনি অনেকগুলো পথনাটক উপস্থাপনা করেছেন। 'ইন্দুর দৌঁড়ের খেইড়' এই ধারারই উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই শ্রেণির নাটকগুলো পরিবেশন করে তাঁরা মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেতেন।[২৪]

ধর্মনগরে রাজনৈতিক বক্তব্য নির্ভর পথনাটকের চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অজয়ভূষণ চক্রবর্তী, ভূপাল নাগ, অমল রায়, কল্যাণ চক্রবর্তী, কানাই লাল দত্ত, সুব্রত দাশগুপ্ত, অশোক দাশগুপ্ত, দীপ্তেন্দু নাগ, রণজিৎ পুরকাস্থ, রণজিৎ সূত্রধর, প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ, জ্যোতির্ময় রায়, প্রভা দাশ, দীপঙ্কর গুপ্ত, পার্থ নাগ, অনির্বাণ চক্রবর্তী, পিন্টু দে, দীপক কর, ধীরেন্দ্র দে, পল্লব হোম রায় প্রমুখ। বামপন্থী সংগঠনের অবিভক্ত ধর্মনগর মহকুমার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাংস্কৃতিক কর্মী জ্যোতির্ময় রায়দের দিয়ে ৮০-এর দাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বাঙালি ও জনজাতির মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি পুনর্স্থাপনের লক্ষে 'ফাইদি কিসিং ফাইদি' (আয়রে বন্ধু আয়) নাটকটি কদমতলা, বাগবাসা, পানিসাগর, জ্বলাবাসা, পেঁচারথল, কাঞ্চনপুর, মাছমারা, দশদা প্রভৃতি জায়গায় শতাধিকবার প্রদর্শন করান।[২৫] তারপর আগরতলার তুলসীবতী স্কুলের মাঠে অন্যান্য পথনাটকের সঙ্গে এবং ৮২-র বইমেলার মাঠেও নাটকটি উপস্থাপিত হয়। জ্যোতির্ময় রায় 'দ্বিধা নয় বন্ধু', 'আমরা সবাই', 'বাঁচতে চাই', 'আলোর পথে' ইত্যাদি নির্বাচনী নাটকও উপস্থাপন করেন। জোট আমলে জেলভরো আন্দোলনের বাস্তব প্রেক্ষিতে পুলিশি নির্যাতন ও ফায়ারিঙের প্রতিবাদে জ্যোতির্ময় রায় লেখেন তাঁর 'অঙ্গীকার' নাটক। বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তোলার জন্য 'ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি' (বিজ্ঞান জাঠা) ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পরিচালনায় অনেকগুলো সংস্কার বিরোধী নাটকও পরিবেশিত হয়। এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাটক 'চেতনা'। এটি নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তির দাবিতে কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ বিভেদের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল। জ্যোতির্ময় রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় স্বাক্ষরতা বিষয়ক নাটক 'আলোর পথে', জল ও পরিবেশ বিষয়ক নাটক 'অক্সিজেন ভগবান', জাতীয় ঐক্য ও শান্তি-সম্পীতি বিষয়ক 'সজাগর', এইডস্ বিষয়ক নাটক 'সচেত রহো' ইত্যাদি ধর্মনগরের একাধিক স্থানে বহুবার অভিনীত হয়েছে। বহিঃ রাজ্যের শ্রমিকদের কথা মনে রেখে শেষোক্ত নাটকটি বাংলা ও হিন্দি উভয় ভাষায় একাধারে পথনাটক ও পুতুল নাটক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।[২৬] তছাড়া অমল রায়ের 'লাশ বিপণি', কল্যাণ চক্রবর্তীর 'মে দিন', শংকর ভট্টাচার্যের 'হো গিয়া কাম', হৃষিকেশ নাথের 'রিফিউজি', নিবারণ নাথের 'চুপকথা' ও 'শিকড়' ধর্মনগরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পথনাটক।[২৭]

খোয়াই-এ আটের দশকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পথনাটক চর্চার শুরু হলেও ধীরে ধীরে সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঞ্জয় করের নির্দেশনায় খোয়াই-এর অগ্রণী নাট্যসংস্থা 'কালচার‍্যাল

ক্যাম্পেইন' পথনাটক প্রদর্শন শুরু করে। ৮০-র দাঙ্গার পর পরই ৮৩-র নির্বাচন উপলক্ষে কমল রায়চৌধুরীর 'বাঁচতে হলে' নাটকটি পরিবেশিত হয়। এই নাটকের মূল বিষয় শান্তি ও সম্প্রীতি। দেশভাগের পর বহু উদ্বাস্তু বাঙালি ত্রিপুরায় এসেছেন। উন্মুক্তমনা জনজাতিরা এদের সাদরে গ্রহণ করলেও বিষয়টিকে বহিঃরাজ্যের এক শ্রেণির স্বার্থসন্ধিৎসু মানুষ সুনজরে দেখেনি। তাদের প্ররোচনায় কীভাবে এ রাজ্যের আবহমানকালের শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। নাটকটি পঞ্চাশেরও বেশি বার প্রদর্শিত হয়েছে। কমল রায়চৌধুরীর 'বাঁচতে হলে -২', 'পুনর্জন্ম' (১), চন্দন সেনগুপ্তের 'পুনর্জন্ম(২)' প্রভৃতি নাটকে মানুষের রাজনৈতিক চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[২৮] ৯০-এর দশক থেকে অরুণ পালের নির্দেশনায় 'বিষবৃক্ষের ফল'; অসীম রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় 'মিশন ২০১৯', 'অহনও সময় আছে', 'ফুলস্টপ', 'ধূসর অন্ধকারে' প্রভৃতি নাটক পরিবেশিত হয়েছে। ৮০-র দশকে হীরেন্দ্র সিনহার রচনা ও নির্দেশনায় 'নাট্য সংসদ'-এর প্রযোজনায় ''নির্বাচনী কড়চা' (১৯৮৭), 'নির্বাচনী পাঁচালী' (১৯৮৮), 'যম ও রাজার নরক দর্শন' (১৯৯২), 'জীবনের জন্য' (১৯৯৩), 'ভলো করে বাঁচতে হলে', 'দশাননের দুর্দশা', 'হও সাবধান', 'এ যুদ্ধ কেন', সময়ের বার্তা', 'ক্যান্সার রুখুন'(২০০৯) ইত্যাদি পথনাটক উপস্থাপিত হয়।[২৯]

সঞ্জয় কর একাধিক ছদ্মনামে পথনাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পথনাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'তৃতীয় চক্ষু', 'এ বড় সত্যি', 'টি স্টল', 'গন্তব্য', 'দূর্গ', 'জলকথা', 'চল পাল্টাই', 'যে জন আছে মাঝখানে' ইত্যাদি।[৩০] তাঁর নাটকে রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কথাও উঠে এসেছে।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সি.আই.টি.ইউ-র প্রযোজনায় সফদর হাসমির 'হল্লাবোল' নাটকটি পরিবেশিত হয় হীরেন্দ্র সিনহার নির্দেশনায়। একই সময়ে প্রদর্শিত 'যম রাজার নরক দর্শন' খোয়াইতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পথনাটকের পরিবেশনা খোয়াই বিভাগ জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তুলে। সুকান্ত ব্রিগেড, জীবনানন্দ ব্রিগেড, ব্রজলাল ব্রিগেড, সফদর ব্রিগেড, লালন ব্রিগেড, পূবালী ও উৎপল দত্ত ব্রিগেড-এর শিল্পীরা পথনাটক উপস্থাপনা করে। একই সঙ্গে প্রায় ১০০জন শিল্পী এর সাথে যুক্ত হন এবং সবগুলো ব্রিগেড একই সঙ্গে ১৫দিন ব্যাপী বিভাগের বিভিন্ন প্রান্তে নাটক উপস্থাপন করে।[৩১]

৮০-র জুনের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে সম্প্রীতি রক্ষার মানসে সুবোধ চন্দ রচনা করেন 'সম্প্রীতি' নাটক। এই নাটকটি কুমারঘাটের প্রথম পথনাটক। 'চলন্তিকা নাট্য সংস্থা'র প্রযোজনায় নাটকটি কুমারঘাট, কাঞ্চনবাড়ি, ফটিকরায়, মাছমারা, পেঁচারথল, বিরাশিমাইল অঞ্চলে একাধিকবার উপস্থাপিত হয়।[৩২] উগ্রবাদীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে

সুবোধ চন্দ লেখেন তাঁর 'আর নয় আন্‌ধাইর'। কাজল রঞ্জন চক্রবর্তীর রাজনৈতিক বক্তব্য নির্ভর নাটক 'লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ', ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'পথ তুমি কার'। নাটকটি কুমারঘাট, পানিসাগর প্রভৃতি অঞ্চলে অভিনীত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানবিজ্ঞান ও পরিবেশ সচেতনতামূলক আরেকটি নাটক হলো 'আহ্লাদে আটখান'। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এই নাটকে বৃক্ষরোপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মানসে তিনি লেখেন 'জল-ই-জীবন' এবং যত্রতত্র গাছ কেটে ফেলে রাখার প্রতিবাদে লেখেন 'বৃক্ষ তুমি কার'। অভিজিৎ চক্রবর্তীর স্বচ্ছভারত মিশনের প্রতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য লেখেন 'ডাস্টবিন' নাটক।[৩৩] কুমারঘাটে দ্বিতীয় মহকুমাভিত্তিক বইমেলা উপলক্ষে শেখর ভট্টাচার্য লেখেন 'চলইন বইমেলায়'।[৩৪]

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য সাতের দশকে কর্মচারী আন্দোলনের স্বপক্ষে কৈলাশহরে দু'একটি পথনাটক করেন। আশির দাঙ্গার প্রেক্ষিতে মানবতার পক্ষে তিনি লেখেন তাঁর 'পরাণের স্বপ্ন' নাটকটি।[৩৫] কৈলাশহরে পথনাটকের ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘঠাতে অকৃত্রিম পরিশ্রম করেন 'গণ-সংস্কৃতি কেন্দ্র'-এর শিল্পীবৃন্দ। তাঁরাই গণমানুষের কাছে নাটককে পৌঁছে দেন। সে সময়ে রতীশ মজুমদারের 'সমকালের পালা' ও 'হাঁড়িবাবা', বিমান দামের 'বুথ দখল' প্রভৃতি নির্বাচনী পথনাটক হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। নাটকগুলির নির্দেশনা করেন রতীশ মজুমদার। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে রতীশ মজুমদার তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের জোর-জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে রচনা করেন তাঁর 'হাঁড়িবাবা' পথনাটক। অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরার নানা নির্বাচনী সভা ও উঠোন সভায় নাটকটি কতবার যে উপস্থাপিত হয়েছে তার হিসেব নেই। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে বিমান দাম স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রচনা করেন 'গোল্ডেন এক্সপ্রেস' নামক পথনাটক। মৃদুল বণিকও কৈলাশহরের আরেকজন শাক্তিশালী নাট্যকার ছিলেন। তিনি দুটি পথনাটক রচনা করেন।[৩৬]

কমলপুরে বিপ্লব মজুমদার বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে একাধিক সরকারি প্রকল্পকে সামনে রেখে পথনাটক রচনা ও নির্দেশনায় এগিয়ে আসেন। তাঁর লেখা কয়েকটি সচেতনতামূলক নাটক হলো—'নিবারণের কিচ্ছা' (স্বাক্ষরতা), 'চলো ম্যালেরিয়া দমন করি', 'এইডস্ একটি ভাইরাস', 'ত্রাণ', 'গাছ আমাদের প্রাণ' ইত্যাদি। কমলপুরের আরেকজন পথনাটক রচয়িতা হলেন দেবোপম রায়। তাঁর লেখা একটি জনসচেতনতামূলক নাটক হলো 'রঙিন ত্রিপুরা'। এই নাটকটি স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে রচিত হয়েছে। এই নাটকগুলি কমলপুরের নানা জায়গায় 'সায়ক নাট্য সংস্থা' পরিবেশন করেছে।[৩৭]

সাব্রুমে ব্যাপকভাবে পথনাটক চর্চা শুরু হয়েছে সাতের দশকে। সে সময় থেকে প্রণব মজুমদার, উত্তম কুমার বসাক, হরিহর দেবনাথ সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে

বেশ কিছু পথনাটক রচনা ও নির্দেশনা করেছেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জরুরী অবস্থার প্রতিবাদে প্রণব মজুমদার রচনা করেন 'চুপ! একদম চুপ!' নাটকটি। তিনি ঐ সময় সাহিত্য ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে লেখেন আরেকটি পথনাটক 'পোড়া কাগজের ঘ্রাণ'। পথনাটকের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী সফদর হাসমীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে তিনি লিখেছেন 'ছবি' নাটকটি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ইস্যু নিয়ে উত্তম কুমার বসাক লিখেছেন 'সংঘাত'। এর পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে— প্রণব মজুমদার 'সূর্যগ্রহণ', হরিহর দেবনাথের 'কাজলাদি' (মরণোত্তর চক্ষুদান), তপন ভৌমিকের 'কবজ', উত্তম কুমার বসাকের 'উত্তরণ' (পণপ্রথা বিরোধী), কালিচরণ দাসের 'মৃত্যুদূত' (এইডস্ বিষয়ক), দেবাঞ্জন দেবনাথের 'আলোর পথে' (সংস্কার বিরোধী', নিতাই ভৌমিকের আমরা করব জয়' (এইডস্ বিষয়ক), রতন চক্রবর্তীর 'আহ্বান', কানু কুমার বণিকের 'স্বাক্ষরতা', 'গ্রহণ', 'প্রতিবাদ', 'ডাইনী', 'মরণনেশা', 'পরিবার পরিকল্পনা', 'বাল্যবিবাহ' ইত্যাদি। অশোকানন্দ রায়বর্ধন ও ডাঃ ননীগোপাল চক্রবর্তীর ওয়ার্কশপ লব্ধ পথনাটকটি হলো 'অথঃ হর-গৌরী কথা'।[৩৮]

এই মাধ্যমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাব্রুমে প্রদর্শন শিল্পী হিসেবে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন—তাপস চক্রবর্তী, সুনীল দেবনাথ, প্রতাপ দে, সুকান্ত দেবনাথ, কৃষ্ণ নাথ, বিপুল নাথ, শিবানী ভট্টাচার্য, সঞ্জয় সেন, রাজেশ পাল প্রমুখ। নব্বইয়ের দশকে মনু বাজারে যাঁরা পথনাটক করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— অলক সেন, হেমেন্দ্র দেবনাথ, কবিপদ দেবরায়, সদাসুখ দাস প্রমুখ। বিশ শতকের শূন্য দশক থেকে 'সৃজনী সাংস্কৃতিক সংস্থা' (২০০৬)-র সম্পাদক সঞ্জীব দে পথনাটক রচনা ও নির্দেশনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সাব্রুম স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তথ্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহায়তায় এই সংস্থার সম্পাদক কর্তৃক রচিত ও নির্দেশিত প্রথম পথনাটকটি হলো 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার' (২০০৬)। নাটকটি সাব্রুমের দশটি স্থানে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর রচিত বিজ্ঞানভিত্তিক পথনাটক 'সংস্কার' (২০০৭) জলেফা, কলাছড়া, ভূড়াতলি, সোনাইবাজার, বনকুল বাজারে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর লেখা পরিবেশ সচেতনতামূলক নাটক 'পরিবেশ ও আমরা' (২০০৮) মোট বারোটি স্থানে, 'এইডস্' (২০০৯) দশটি স্থানে, 'অনুপমা' (২০১০) চারটি স্থানে, 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার' (২০১১) পাঁচটি স্থানে, সামাজিক অবক্ষয় ও বিজ্ঞানচেতনা নির্ভর একাঙ্ক 'যাদুকাঠি' (২০১৫) দশটি স্থানে পরিবেশিত হয়েছে। শেষোক্ত নাটকটি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে চুড়াইবাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে চুড়াইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পরিচালনায়ও প্রদর্শিত হয়েছে।[৩৯]

উদয়পুরের ক্রিয়েশন সেন্টার 'রাম রহিমের বাছা' (১৯৯৩), 'আক্রান্ত চেতনা' (১৯৯৪) এই দুটি পথনাটক উপস্থাপনা করেছে।[৪০] তাছাড়া 'লিটল ড্রামা অর্গানাইজেশন'

প্রতিবছর সচেতনতামূলক পথনাটক পরিবেশন করে।[৪১] অমরপুরের ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতা সঞ্চারের লক্ষ্যে শংকর সাহার নির্দেশনায় 'অপহরণের ভাইছড়া', 'এখন বুঝলাম', 'আমরা অচ্ছ্যুত নই', 'আমাদের অধিকার', 'মাতৃদুগ্ধ', 'মাদুলী প্রভৃতি পথনাটক পরিবেশন করেছে।[৪২]

৪

ত্রিপুরায় আশি ও নব্বইয়ের দশকে মূলত রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে পথনাটক প্রদর্শিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন ইস্যুকে অবলম্বন করেও স্থানীয় নাট্যকারেরা নাটক রচনা করেছেন। স্থানীয় নাট্যকারদের রচিত এধরনের ইস্যুভিত্তিক দুটি সংকলন গ্রন্থ ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী অনুপম চক্রবর্তীর 'আমরা বাঁচতে চাই', 'পাঁচ বছরের পালা', কমল চৌধুরীর 'মাদার এণ্ড সন্ এণ্ড কোং', কালীচরণ বৈষ্ণবের 'নাচের পুতুল' ও কল্যাণ রায়ের 'নতুন রাজার পালা' এই পাঁচটি পথনাটক 'সমকালের পালা' (ডিসেম্বর ১৯৮২) নামে সংকলিত করে। আর দ্বিতীয়টি দুলাল উড়িয়ার 'পদধ্বনি প্রকাশনি', আগরতলা থেকে 'পথনাটিকা' (২১ ফেব্রুয়ারি) নামে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে কমল রায় চৌধুরীর 'পুনর্জন্ম', চন্দন সেনগুপ্তের 'শপথ', কল্যাণ রায় ও শিবপ্রসাদ ধরের 'আজিও ঘটে', দুলাল উড়িয়ার 'উপলব্ধি', নীলকণ্ঠ মাঝির 'সমতলের পালা' ও অনুপম চক্রবর্তীর 'দিন বদলের ডাক' এই ছয়টি নাটক গ্রন্থিত হয়েছে। সংকলনভুক্ত এই নাটকগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী শাসন, রাজনৈতিক অরাজকতা, মহাজনী শোষণ, বেকারত্ব, জাতিদাঙ্গা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া ও শান্তি-সম্প্রীতির ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

পরিবর্তনশীল সমাজ-প্রতিবেশে পথনাটকেরও রূপ পরিবর্তীত হচ্ছে। করোনা অতিমারী পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার নাট্যকার, নির্দেশক ও প্রযোজকেরা পিটার ব্রুকের নাট্য আদর্শকে মনে রেখে ছোট জায়গায় নাটক পরিবেশনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এর সার্থক দৃষ্টান্ত চন্দ্রস্নাত করের নির্দেশনায় নাট্যভূমির রুফটাফ স্পেসে পরিবেশিত 'করোনা কোলাজ (২০২০), বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্যের রচনা ও নির্দেশনায় ত্রিপুরা থিয়েটার প্রযোজিত মুক্তাঙ্গণ নাটক 'MIGA' (Make India Great Again) (২০২১), সঞ্জয় করের রচনা ও নির্দেশনায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সহকর্মী বিস্মৃতপ্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামী নীরা আর্যের জীবনভিত্তিক নাটক 'নাগিন কন্যা' (২০২৩) নাট্যভূমির রুফটাফ স্পেসে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছে। এর পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তাঙ্গনেও নাটকটি একাধিকবার পরিবেশিত হয়েছে। ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের নির্দেশক প্রভীতাংশু দাশ প্রতি মাসের শেষ রবিবার 'হরিপদ দাশ পারফরমেন্স স্পেস'-এ শিশু কিশোরদের জন্য পাপেট শো করছেন, পাশাপাশি সেখানে নাটকের শোও হচ্ছে। এভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় পথনাটক

চর্চা এগিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১) সীমা সরকার, জানুয়ারি ১৯৯৮, পথের নাটক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৫

২) শিব শর্মা, 'পথনাটকের ঐতিহ্যগত বিষয় বিকাশ ও বিভ্রান্তি', নৃপেন্দ্র সাহা, চন্দন সেন (সম্পা), ২০০৪, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পত্রিকা ৯, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৭

৩) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজনীতি, রাজনৈতিক পথনাটকের চরিত্র', তদেব, পৃ. ১৫

৪) প্রভাতকুমার দাস, 'পথনাটক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাপঞ্জি' তদেব, পৃ. ১৯৪

৫) বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মে ১৯৮৭, পথনাটকের কথা, মোম, কলকাতা

৬) সঞ্জয় কর, নাট্যব্যক্তিত্ব, আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ২৮/০৬/২৩

৭) সমীর ধর, নাট্যব্যক্তিত্ব, আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ১৮/০৫/২৩

৮) নারায়ণ দেব, ফেব্রুয়ারি ২০২২, ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ. ১০২, ১০৫

৯) তদেব, পৃ. ১০৬। ১০) তদেব, পৃ. ১০৭ । ১১) তদেব, পৃ. ৮৯-৯২

১২) তদেব, পৃ. ১২১-২২

১৩) উত্তম চক্রবর্তী, নাট্যব্যক্তিত্ব, জোড়াপুকুর পাড়, বনমালীপুর, সাক্ষাৎকার, ২৭/০৬/২৩

১৪) নারায়ণ দেব, ফেব্রুয়ারি ২০২২ ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ. ১৭২

১৫) তদেব, পৃ. ২০৮

১৬) বিভু ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী ও ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যপত্রের সম্পাদক, সাক্ষাৎকার, ২২/০৪/২৩

১৭) কার্তিক বণিক, নাট্যকর্মী, আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ২৪/০৬/২৩

১৮) সমীর ধর, নাট্যব্যক্তিত্ব, আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ১৮/০৫/২৩

১৯) তদেব

২০) তদেব

২১) পিনাক দত্ত, 'সমাজোত্তরণে পথনাটক', সমর বিশ্বাস (সম্পা), সিতারা, আন্তঃস্কুল নাটক প্রতিযোগিতা সংখ্যা', ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২, বিলোনীয়া, পৃ. ৯-১০

২২) আশীষ পোদ্দার, 'বিলোনীয়র নট্যচর্চায় স্থানীয় পাণ্ডুলিপি', তদেব,পৃ. ৫-৮

২৩) মতিলাল দে, নাট্যব্যক্তিত্ব, চন্দ্রপুর, কাঁঠালটিলা, সাক্ষাৎকার, ২৩/০৫/২৩

২৪) তদেব

২৫) জ্যোতির্ময় রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব, চন্দ্রপুর, কাঁঠালটিলা, সাক্ষাৎকার, ২৩/০৫/২৩

২৬) তদেব

২৭) নারায়ণ দেব, ফেব্রুয়ারি ২০২২ ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ. ৩৩২

২৮) অরুণ পাল, নাট্যকর্মী, খোয়াই, মুঠোফোন সাক্ষাৎকার, ২৭/০৬/২৩

২৯) তদেব

৩০) সঞ্জয় কর, নাট্যব্যক্তিত্ব, আগরতলা, সাক্ষাৎকার, ২৮/০৬/২৩

৩১) অরুণ পাল, নাট্যকর্মী, খোয়াই, মুঠোফোন সাক্ষাৎকার, ২৭/০৬/২৩
৩২) কাজল রঞ্জন চক্রবর্তী, নাট্যকর্মী, কুমারঘাট, সাক্ষাৎকার, সহযোগী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন চিটাগাঙ বস্তি স্কুলের শিক্ষক পিন্টু পাল, ২৪/০৫/২৩
৩৩) তদেব
৩৪) শেখর ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী, কুমারঘাট, সাক্ষাৎকার, সহযোগী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন চিটাগাঙ বস্তি স্কুলের শিক্ষক পিন্টু পাল, ২৪/০৫/২৩
৩৫) রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, নাট্যকর্মী, কৈলাশহর, সাক্ষাৎকার, সহযোগী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন চিটাগাঙ বস্তি স্কুলের শিক্ষক পিন্টু পাল, ২৪/০৫/২৩
৩৬) বিমান দাম, নাট্যকর্মী, কৈলাশহর, সাক্ষাৎকার, সহযোগী হিসেবে সঙ্গে ছিলেন চিটাগাঙ বস্তি স্কুলের শিক্ষক পিন্টু পাল, ২৪/০৫/২৩
৩৭) সুমন সাহা, নাট্যকর্মী, কমলপুর, মুঠোফোন সাক্ষাৎকার, ২১/০৬/২৩
৩৮) প্রণব মজুমদার, নাট্যকর্মী, সাব্রুম, মুঠোফোন সাক্ষাৎকার, ২৭/০৬/২৩
৩৯) সঞ্জীব দে, নাট্যকর্মী ও বিষয় শিক্ষক, মুঠোফোন সাক্ষাৎকার, ২২/০৬/২৩
৪০) নারায়ণ দেব, ফেব্রুয়ারি ২০২২ ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ. ৪৩১
৪১) তদেব, পৃ. ৪৩৭
৪২) তদেব, পৃ. ৪৭২

লেখক : **ড. মলয় দেব,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা
Writer : **Dr. Maloy Deb, Asstt. Professor, Bengali, Tripura Central University.**

সন্মাত্রানন্দের নাটকের একটি বিশ্লেষণী পাঠ

■ দেবশ্রী পাল

অতীত সব সময় পথ চলার নির্দেশক। আর বর্তমান রূপে সেই আবার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাই সময়ের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। এইভাবে কালের স্রোতে বয়ে চলা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সময় বিশেষে স্থান পরিবর্তন করে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে নিরন্তর সমৃদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকা এই আমরা, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে নিজেদের কতটুকু সমৃদ্ধ করতে পেরেছি? কালের স্রোতে আমাদের কি উত্তরণ হয়েছে নাকি আমরা শুধুই গা-ভাসিয়ে চলেছি? এই ধরণের প্রশ্ন, নিজেকে কখনও করেছি কি? কিন্তু যারা করেন, তারা, আমার-আপনার মত ভোগসর্বস্ব জীবনের জন্য ইঁদুর দৌড়ে সামিল হন না। তাই তারা হয়ে যান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। আর এই বিচ্ছিন্নতাকামী মানুষদের ওপর পরে সমাজের শ্যেণদৃষ্টি। সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দ এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সময়ের স্রোতে নিজের স্থান বদল করতে করতে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। যার প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে। যে সাধনায় আছে নিরন্তর সত্য অন্বেষণের প্রয়াস। তারই বাস্তব সম্মত রূপায়ণ 'বাস্তবায়ন' নাটকটি।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশত বছর উপলক্ষ্যে 'ত্রিপুরা থিয়েটার' পত্রিকার শারদ সংখ্যা ২০১২ তে প্রকাশিত হয় স্বামী সন্মাত্রানন্দের 'বাস্তবায়ন' নাটক। আমরা জানি, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্মাত্রানন্দের সাবলীল গমন থাকলেও 'বাস্তবায়ন' নাটকটির হাত ধরে একজন নাট্যকার রূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটকটি আমার পড়া কোন প্রহসন বা নাটক যেমন, মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' অথবা বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' - এর মতন নয়। সম্পূর্ণ নাটকটিতে না আছে কোনও অঙ্ক বিভাজন, না আছে কোনও দৃশ্য বিভাজন। তবে দৃশ্যান্তরের মধ্যে দিয়ে নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলেছে ; যেখানে মূল নাটক 'বাস্তবায়ন' এর অন্তর্গত আরও দুটি নাটকের প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি। নাটকের মধ্যেকার নাটক দুটি হল 'আত্মহনন' ও 'যুগাবর্ত' । ঠিক একই রকমভাবে আমরা মনে করতে পারি , রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকটির কথা। যেটি 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' দ্বৈত নাটিকার সমন্বিত রূপ। 'কালের যাত্রা ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৩৯ সালে (১৯৩২)। 'কালের যাত্রা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে 'রথের রশি' নাটকটি, 'রথযাত্রা' নাটিকা রূপে ১৩৩০ সালে (১৯২৩) 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং 'কবির দীক্ষা', ১৩৩৫ সালের (১৯২৮) বৈশাখ সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী'তে 'শিবের ভিক্ষা' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আঙ্গিকগত দিক থেকে সন্মাত্রানন্দের অন্যান্য সাহিত্যের মতন নাটকটিতে এমন

একটি চরিত্র আছে যে কিনা স্বয়ং একজন রচনাকার, যার হাতে অপর কোন নাটক বা উপন্যাসের সৃজন হচ্ছে। যেমন 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র শাওন অথবা 'তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি'র ময়ূখ। 'বাস্তবায়ন'- এ এহেন চরিত্রটি হল আলেখ, যার হাতে সৃজন হয়েছে 'আত্মহনন' ও 'যুগাবর্ত' নাটক দুটি । 'বাস্তবায়ন' এর প্রথম দৃশ্যটির মধ্যে দিয়ে প্রথম নাটকটির ('আত্মহনন') সঙ্গে পাঠকের সামগ্রিক পরিচয় হয়। সেখানে মহড়া কক্ষে মৈনাক ও সন্ধ্যাদীপা দু'জন, 'আত্মহনন' এর প্রীতম ও শ্রীতমা চরিত্রের ভূমিকায় খসড়া পাঠ করে চলেছে; যার বিষয়বস্তু সমসাময়িক 'অস্তিত্ব সংকট'। যার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মূল নাটকের মূল চরিত্রদ্বয় আলেখ ও আন্দোলনের মধ্যেকার কথপোকথন দ্বিতীয় দৃশ্যটিকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তবে অস্তিত্ব সংকটের এই প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে বয়ে চলা মানব ইতিহাসের যাত্রাপথে, যে যাত্রাপথের পথিক কিন্তু আমরাও। তাই 'আত্মহনন' থেকে 'যুগাবর্ত'এর অভিমুখে নাটকটির পথ চলা আরম্ভ হয় 'বাস্তবায়ন' এর তৃতীয় দৃশ্য থেকে; সেখানে প্রেক্ষাপট পাল্টে যাওয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তথাগত বুদ্ধ, বৃক্ষতলে বেদীর উপর বসে আছেন। আর তাঁর নীচে একদিকে বসে আছেন আনন্দ, কোশলরাজ প্রসেনজিত; অন্যদিকে মিগারমাতা যুবতী বিশাখা, একজন শ্রেষ্ঠী ও কোশলরাজের সেনাপতি। এঁনাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন ধর্ম ও দর্শনের নিরিখে সামাজিক বৈপরীত্যের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

এরপর ঝড়-ঝঞ্জাপূর্ণ রাত্রির আবহে পাঁচজন নারীর সমবেত সঙ্গীত ক্ষণিকের দৃশ্যপটকে পরিবর্তন করে দেয়, আমাদের নিয়ে যায় উপকথার চরিত্র বিক্রমাদিত্য ও বেতালের সান্নিধ্যে। এইভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যেতে যেতে আমরা চতুর্থ থেকে পঞ্চম দৃশ্যে এসে দেখি, সার্জারির রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর অ্যান্ড্রু ভেসালিয়াস প্রবেশ করেছেন এবং সেখানেই বেতাল অসাড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, ষষ্ঠ দৃশ্যান্তরে বিক্রমাদিত্য ও ভেসালিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ-বসুবন্ধুর এবং সপ্তম দৃশ্যান্তরে গ্রীক দার্শনিক বৃদ্ধ, উন্মাদ সক্রেটিসের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যেখানে এঁনাদের সকলে বিভিন্ন যুগের মানুষ হয়েও যুগের আবর্তে পড়ে; মানুষের মধ্যে থাকা সেই সংকটের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আবর্তিত হতে হতে সেটা বর্তমান আকার ধারণ করে। এবং অন্তিম দৃশ্যে আমাদের সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে, আন্দোলন ও আলেখের কথোপকথনের পূর্ব সূত্র ধরে আন্দোলনের কন্যা তিয়াসার অস্তিত্বের সংকটকে, তারই আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে বাস্তবজীবনে সফল করে তুলেছেন নাট্যকার সন্মাত্রানন্দ।

বিস্তৃতভাবে মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রসঙ্গ সূত্রে বলে রাখি, নাট্যকার নাটকের কোথাও 'দৃশ্য' বা 'দৃশ্যান্তর' শব্দ বন্ধের ব্যবহার করেন নি। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে শব্দবন্ধ দুটি গ্রহণ করেছি। হয়তো নাট্যকার নাটকের লক্ষণ, চরিত্রদের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপের চেষ্টা করেন নি, যতটা তিনি নাটকের মূল ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে

তৎপর ছিলেন।

মূল নাটকটির শুরু একটি মহড়া কক্ষের দৃশ্য দিয়ে। বেঞ্চে বসে নাটকের মহড়া চলছে। মহড়া চলছে 'আত্মহনন' নাটকের। নাটকটি লিখেছেন আলেখ, মূল নাটকে যিনি একজন নাট্যকার। অন্যদিকে মৈনাক ও সন্ধ্যাদীপা চরিত্র দুটি, চিঠি হাতে 'আত্মহনন'- এর প্রীতম ও শ্রীতমা চরিত্রের সংলাপ পাঠ করে যাচ্ছে। সেই পাঠ শুনে আমরা বেশ বুঝতে পারছি; পার্কের বেঞ্চে বসে শ্রীতমা, প্রীতমের ওপর ক্ষোভ - অভিমানের স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছে। এহেন ক্ষোভের কারণ শ্রীতমার বিশ্বাস ভঙ্গ করা; হ্যাঁ, প্রীতম সাত মাসে তাকে তিনবার ঠকিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজের মত একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে থেকেও তাকে বার বার ইভটিজিং-এর স্বীকার হতে হয়েছে। এইভাবে একটি নারীর অস্তিত্ব ও সম্মানের রক্ষক যারা, তারাই যদি প্রতিনিয়ত সেই নারীর ভক্ষক হয়ে ওঠে, তবে সেটা নারীর কাছে আত্মহত্যারই রূপান্তর। তাই শ্রীতমা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। দেখতে গেলে, একে নারীর অস্তিত্ব সংকট অবস্থা ছাড়া আর কি বা বলতে পারি! নিজের 'অস্তিত্ব সংকট' শ্রীতমা মেনে নিতে পারে নি, তেমনই মানুষের কাছে এই নাটকের যে কোনও মূল্য থাকতে পারে সেটাও আন্দোলন মেনে নিতে পারে নি। তবে এর জবাব আলেখের কাছে থাকলেও তথাকথিত প্রমাণ ছিল না। আর সেই প্রমাণ পেতে আন্দোলনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আলেখের অপর একটি নাটকের জন্য। নাটকটির নাম 'যুগাবর্ত'।

বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে যে অস্তিত্বের সংকট 'আত্মহনন'- এ দেখানো হয়েছে, সুদূর অতীত থেকেই যুগ পরিবর্তনের ধারায় সেই সংকটের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। যার প্রমাণ স্বরূপ আলেখের পরবর্তী নাটক 'যুগাবর্ত'। নাটকের শুরুটা এইরকম, তথাগতকে ঘিরে তাঁর শিষ্য আনন্দ ও আরও চারজন বেদীর নীচে বসে আছেন। যাঁদের মধ্যে দুজন; প্রথম জন রাজনৈতিক ধর্ম ও দ্বিতীয় জন সাংসারিক জীবন ধর্মের নিরিখে ভগবান বুদ্ধের পূর্ণ অহিংসা নীতি পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এঁরা হলেন কোশলরাজ প্রসেনজিত ও মিগারমাতা যুবতী বিশাখা। অন্যদিকে যে সকল যুবকেরা আবার আনন্দ বা সেনাপতির মত (তথাগতর নিকট উপস্থিত) ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসাহী হয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম তথা বুদ্ধনীতি উভয় পালনেই ব্যর্থ। তাদের সেই ব্যর্থতার কারণ ধরা পড়েছে প্রসেনজিত ও বিশাখার বক্তব্যে;

'প্রসেনজিত।। ভগবন মর্মদর্শী। এ পর্যন্ত আমার মোট বারোজন যুদ্ধবিদ্যানিপুণ সেনাপতি এবং গণনাতীত সৈনিক— তথাগতর সর্বত্যাগের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সঙ্ঘে ভিক্ষুরূপে প্রবেশ করেছে। যাদের হস্তে একদিন শোভা পেতো খর তরবারি, গদা, তোমর ও খড়্গ, আজ তাদের হস্তে তথাগত তুলে দিয়েছেন ভিক্ষাপাত্র। ...

বিশাখা ।। ... এই সব প্রব্রজ্যাকামী যুবকগণ যে তথাগতর ধর্ম ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করছে, তা আমাদের মনে হয় না। তথাগতর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েই এই যুবকগণ

প্রব্রজ্যাকামী হয়েছেন- এই আমার বিশ্বাস। ফলত, তথাগতর উপস্থিতিতে সঙ্ঘ হয়ে ওঠে সর্বতোভদ্র, আর তাঁর অনুপস্থিতিতে সঙ্ঘে প্রবেশ করে অনাচার। যখনই আপনি এ স্থান থেকে অন্য কোনো সংঘারামে দেশনায় গিয়েছেন, তখনই এই বাস্তব ঘটনার সাক্ষী আমাদের বারংবার হতে হয়েছে।'(১)

অতএব উক্ত চরিত্র দুটির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বুদ্ধ সমকালীন সামাজিক বৈপরীত্যের ছবি। সেটা কীরকম? বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করার জন্য আর্যাবর্তে প্রতিভাবান উচ্চ রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় যুবকদের অভাব, কোশলরাজের রাজ্য-রাজ্যনীতি পরিচালনা ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। আর মল্লবিদ্যায় পারদর্শী বিশাখার পক্ষে সাংসারিক হিংসার বশবর্তী হয়ে তথাগতর অহিংস নীতি পালন করা সম্ভব ছিল না। অথচ এর বিপরীতে তথাগতর ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্ষত্রিয় যুবকেরা, যাদের প্রতিভায় সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হত তাঁরা সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করায় তা সুস্থ সমাজ রক্ষার প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। অতএব একদিকে আত্মধর্ম (সাংসারিক ও রাজনৈতিক) পালন করতে গিয়ে অহিংস তথা সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া, আর অন্যদিকে সত্যান্বেষণের চেষ্টায় নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া- সমাজ ও ধর্মের চিরায়ত এই দ্বন্দ্ব, উভয় ক্ষেত্রেই অস্তিত্ব সংকটকে প্রবল করে তুলেছিল। এবং এর পরিণতি সম্পর্কে বুদ্ধ, শিষ্য আনন্দকে বলছেন,

'বুদ্ধ।। আনন্দ, একথা বহুলাংশে সত্য। আর সে কারণেই এ পরিহাসের বিষয় নয়। এ এক ভয়ঙ্কর সত্য। আজ হতে বহু শতাব্দী পর, যখন আমরা কেউ কায়িকরূপে অবস্থান করব না, এই তথাগতের মহাপরিনির্বাণের বহু বহু শতাব্দী পরে যখন এই শরীরের ভস্মাবশেষ, একগুচ্ছ কেশ, একটি নখাগ্রের উপর শত শত স্তূপ রচিত হবে, এই কায়াকে অবলম্বন করে শত শত আলেখ্য, সহস্র সহস্র মূর্তিনির্মিত হবে, তখন তথাগতর শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে, মানুষ তথাগতর ব্যক্তিরূপেরই মাত্র উপাসনা করবে। যখন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র সত্যকে বিস্মৃত হয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তিমায়ায় নিজ চিন্তা, বুদ্ধি, শুভবোধকে আচ্ছন্ন করে, তখনই সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের ঘোর দুর্দিন সমাসন্ন হয়। তাই আনন্দ, এ পরিহাসের বিষয় নয়, এ অতি ভয়ঙ্কর বাস্তব সত্য।'(২)

তথাগত মুখনিঃসৃত 'ব্যক্তিমায়া ' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। কারণ মায়ার তাড়নায় মানুষ জন্ম জন্মান্তরের সীমিত অস্তিত্বের মধ্যে বার বার পাক খেতে থাকে। যার উৎস 'অবিদ্যাজনিত অহংকার।' এই অহংকারের অন্ধকার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে মানুষ তার সীমিত অস্তিত্বকে 'সত্য' বলে ভুল করে। যতই তারা লোভ-লালসা-কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে চায় ততই 'প্রকৃতসত্য' থেকে দূরে সরে যায়। নির্গত হওয়ার পথ হারিয়ে বারবার এই দুঃখ জরা ব্যধিগ্রস্থ সংসারেই ফিরে আসতে হয়। তাই মায়াময় এই সমাজ - সংসারের প্রতি ক্ষোভ উদগীরণ করে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের

গ্রীস দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন,

'সক্রেটিস।। হ্যাঁ, সমাজ। সমাজ এক ভণ্ড প্রতিষ্ঠান। এই সমাজ সত্যান্বেষীর পথে ছড়িয়ে দেয় কাঁটা। তার জ্ঞানকে নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করে। স্বার্থপর সমাজ সত্যান্বেষীর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তাকে নির্বাসিত করে। তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে সমাজ; এই ভণ্ড প্রতিষ্ঠান!'(৩)

একইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় অ্যানাটমিস্ট অ্যান্ড্রু ভেসালিয়াসের সত্যান্বেষণের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে ইউরোপীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ পাদ্রির দল আর কিছু কুয়োর ব্যাঙ ডাক্তার। তাই মৃত্যুর পরেও মানুষের কাছে সত্যের আলো পৌঁছে দেবার জন্য ফিরে গেছেন তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রতম শতকের ভারতবর্ষে। বিক্রমাদিত্যের সময়কালীন সেই ভারতবর্ষ,

'... যেখানে শব ব্যবচ্ছেদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, যেখানে জ্ঞান চিরমুক্ত- এই ভারতবর্ষে। ... ।' (৪)

তাই উপকথার চরিত্র হয়েও বিক্রমাদিত্য যে অশরীরী আত্মাকে রোজ রাতে কাপালিকের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন অথচ ব্যর্থ হতেন, আজ সেই বেতালের মৃতদেহ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভেসালিয়াসের হাতে তুলে দিলেন।

ভেসালিয়াসের এহেন জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা দেখে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

'...বাঃ, এইভাবে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখলে, অন্ত্র, তন্ত্র, শিরা, উপশিরা, মল, মূত্র পূর্ণ শরীরের প্রতি আসক্তি চলে যায়। বৈরাগ্যের ভাব প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।'(৫)

সমাজ - সংসারের মধ্যে থেকে পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য চিকিৎসক ভেসালিয়াসের সত্যান্বেষণের প্রয়াসকে বৌদ্ধ শ্রমণ অসঙ্গ 'বৈরাগ্যের ভাব' বলেছেন। সেই ভাব সক্রেটিসের মধ্যেও ছিল, যার জন্য দুজনের মৃত্যু দুজনকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। নাহলে তিনি নিজে একজন খ্রিস্টপূর্ব সময়কালীন দার্শনিক হয়ে খ্রিস্ট পরবর্তী ষোড়শ শতকের ভেসালিয়াসকে বলতেন না,

'সক্রেটিস।। মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যেত, হে শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক অ্যান্ড্রু ভেসালিয়াস, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে কি ভাবে? মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না। ... ।'(৬)

তাই তো তিনি অসঙ্গ-র ভ্রাতা বসুবন্ধুকে বলছেন,

'সক্রেটিস।। দেখলাম ... দেখলাম যুগে যুগে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে চলেছে অভিযাত্রীর মতো। কি আনন্দ তাদের । শত শত বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে , বিপদ তুচ্ছ করে তারা অন্বেষণ করছে সত্যের ... বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সেবায়, ত্যাগে, আধ্যাত্মিকতায় ...

সর্বত্র সেই সত্যের অনুসন্ধান ।....।'[৭]

অতএব সমাজের এই বৈপরীত্য ও সেখান থেকে উৎসারিত সংকট যুগে যুগে বিশ্বের সর্বত্রই লক্ষ করা যায়, আর সেই সবের দ্রষ্টা হয়ে সক্রেটিস ভাবীকালের প্রতিটি সত্যান্বেষী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আর দেখেছেন তাদের করুণ পরিণতিকে; নীতিকথার গল্পকার ঈশপকে সমাজ পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করেছিল, সমাজ একদিকে যেমন বুদ্ধের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছিল অন্যদিকে তেমন যিশুর ওপর হেনে ছিল ক্রুশবিদ্ধের আঘাত। আবার প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতার কারণে ষোড়শ শতকের ইতালীয় দার্শনিক জিওর্দানো ব্রুনোর গায়ে আগুন লাগিয়ে ছিল এই সমাজই। আর নির্বাসনে পাঠিয়েছিল গ্যালিলিওকে। নিষ্কৃতি পায়নি আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতবর্ষও, যেখানে কবীর-নানক-তুলসীদাস ও জ্ঞানেশ্বরের মত সাধকরা সমাজের নানান উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন। আবার এই সমাজ, মানুষের ওপর বিষ উদগীরিত করে হয় তাকে বদ্ধ পাগলে (জার্মান দার্শনিক নীৎসে) পরিণত করেছে, না হয় তার নিজের মেয়ের সঙ্গে অসুস্থ জীবন (মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড) কাটাতে বাধ্য করেছে। তবুও এই নিষ্ঠুর । যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্য 'যুগাবর্ত'- এ সক্রেটিসের অন্তিম সংলাপ ছিল,

'সক্রেটিস।। তবু সহ্য করতে হবেই। এই ঘোর কালকূট , এই তীব্র বিষ, এই তো বাস্তব... এই যুগ যুগান্তমন্থিত হেমলকের মৃত্যুনীল যন্ত্রণা সহ্য করাই সৃজনশীল মানুষের নিয়তি। (হেমলকের পাত্র তুলে ধরে) এক হিসাবে এই তো অমৃত।এই বিষ পান করেই তো সত্যান্বেষী মানুষ যুগে যুগে অমর হয়েছে। কে আছে, কার সাহস আছে সত্যের জন্য এই বিষ পান করার? যে পান করবে , সেই-ই অমর হয়ে যাবে। এসো, পান করো। ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করে এ অমৃত পান করবে কে? এসো!'[৮]

অতীতের এহেন সত্যান্বেষীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল আজকের তিয়াসা, সে মূল নাটকে আন্দোলন ও সঞ্চারীর মেয়ে। 'যুগাবর্ত' নাটক সমাপ্তির পর আন্দোলনের কাছে সঞ্চারীর ফোন আসে। তিয়াসার সুইসাইডাল নোট পড়ে সে আন্দোলনকে জানায়, তাদের মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইভটিজিং -এর শিকার হচ্ছিল, তাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সে অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছে, সঞ্চারী অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তিয়াসার মুখে গ্যাজলা বেরোচ্ছে। সব শুনে আন্দোলনের এটাই মনে হল, আরেকটা আলেখের ঐ অবাস্তব 'আত্মহনন' নাটকের মত। সেই অবাস্তবতার মধ্যেও যে বাস্তবতা থাকে, তার প্রমাণ সে নিজের মেয়ের কাছ থেকেই পেল।

অতীত ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে যে সমস্যা, ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবার পেরিয়ে সমাজের বৃহত্তর ক্ষত রূপে যখন সকল যুগের মানুষকে একই আবর্তের মধ্যে এনে ফেলে তখন সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন 'যুগাবর্ত'-এর মতন সামাজিক নাটকের। যেখানে সেই সমস্যা সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছে 'যুগযুগান্ত- মন্থিত

হেমলকের মৃত্যু নীল যন্ত্রনা ' সহ্য করার মধ্যে দিয়ে। 'আত্মহনন' - এর শ্রীতমা সেই পথে অগ্রসর হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তবে তা নাটকের ক্ষেত্রে আর 'বাস্তবায়ন'- এ তিয়াসার ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়া ও মুখে গ্যাজলা বেরনোর ইঙ্গিতে আমরা বুঝতে পেরেছি, আত্মহত্যার প্রকৃত 'বাস্তবায়ন' ঘটেছে। অর্থাৎ নাট্যকার সেই যুগাবর্ত থেকে উত্তরণের পথকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। সংস্কৃত নাটকের মতন নাট্যকার, নাটকের কাহিনির গতিকে অক্ষুন্ন রাখতে স্থান-কাল-কাহিনির ত্রিবিধ ঐক্য সূত্রকে গ্রহণ করেননি। যার দৃষ্টান্ত আছে, ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত' -এ। যেখনে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে ঘটনার ব্যবধান বারো বছরের। যদিও ইউরোপীয় নাট্যচর্চার ইতিহাসে এই ধরনের নাটককে 'আধুনিক সমাজ-সমস্যামূলক ট্র্যাজেডি' বা সমস্যা- নাটক' বলা হয়। যেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক নানা সমস্যার প্রভাব ও তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি জীবনের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও অবস্থানকে কীভাবে আলোড়িত করে, তা দেখানোই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নীতি- নিয়মের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি মানুষ কীভাবে পীড়িত ও বিপর্যস্ত হয়, সেটাও এই ধরনের নাটক রচনার ক্ষেত্রে উপজীব্য বিষয় ছিল। তবে নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অলৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন যা সন্মাত্রানন্দের সাহিত্যের বিশেষত্ব। যেমন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে এক সরল রেখায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নাট্যকার সময়কে কখনও তিনটি (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) পৃথক পৃথক কালখণ্ডের ফসল বলে মনে করেন নি। এই তিনটিই আসলে একই সরল রৈখিক পথ ধরে হেঁটে চলেছে অথচ আমাদের দৃষ্টিতে তা আসে না। তাই মানুষ সেটাকে বিশ্বাসও করে না। ভাবতে গেলে বিষয়টি বেশ খটমট ও জটিল প্রকৃতির অথচ সন্মাত্রানন্দ এই বিষয়টিকে খুব সহজভাবে নাটকে উপস্থাপন করার জন্য সময়ের তিন কালখণ্ডের প্রতিনিধি রূপে সেই কালের কিছু জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের এখানে উপস্থাপিত করেছেন যাতে করে তাঁদের ভাবনা ও সমাজের প্রতি তাঁদের কর্মকান্ড সময়টিতে অথবা সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে।

এক কালখণ্ডের প্রতিনিধি চরিত্রের সঙ্গে অন্য কালখণ্ডের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ ও কথপোকথনের মাধ্যমে কালের অখণ্ডতায় নাট্যকার মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানকে দেখিয়েছেন, যে অখণ্ডতার অভাবে সম্পর্কের বন্ধনহীনতা একদিন কালের গতিকে রোধ করেছিল। কারণ সেই অখণ্ড কালের গতি সর্বদা পশ্চাতবর্তী হলেও তা মানুষের চেষ্টায় এগিয়ে চলে সম্মুখে। যে গতিময়তার টানে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় 'রথের রশি' নাটিকার সৃজন । এই গতিময়তাই প্রকৃত অর্তে নাড়ীর টান, নাটকে যার ব্যঞ্জনা 'রশি' রূপে। যা থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; অথচ মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে সেই বাঁধনের উপর আঘাত হেনেছে কখনও শস্ত্র কখনও শাস্ত্র আবার কখনও বা স্বর্ণচক্র দিয়ে। ফলে ভিতরে ভিতরে জর্জরিত হয়ে, সম্পর্কের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদে, বাঁধন গেছে তার আলগা হয়ে। তাই

কালের যাত্রায় বার বার কবির ডাক পড়েছে। কারণ 'কবির দীক্ষা' মন্ত্রে নিয়ত ঋর্ণার মতন গ্রহণ ও দানের মধ্যে দিয়ে অসীম সম্পদের সন্ধান পায় মানুষ, যা তাকে পূর্ণ করে তোলে। যা পূর্ণ তাই সুন্দর, যা সুন্দর তাই প্রাণময়, আর যা প্রাণময় তাই গতিময়। নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশতম জন্মোৎসব উপলক্ষে উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সম্পর্কে একটি পত্রও লেখেন। উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে সেই পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল;

'বিষয়টি এই- রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এ গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ- বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, ...।'[৯]

আজ থেকে প্রায় একশত বছর পূর্বে 'কালের যাত্রার' অন্তর্ভুক্ত 'রথের রশি' নাটিকাতে রবীন্দ্রনাথ, যে কালের গতিহীনতার কারণস্বরূপ যুগ-যুগান্তর ধরে দেশ-দেশান্তরে মানুষের মধ্যেকার সম্বন্ধহীন দুর্গতির কথা বলেছেন এবং 'কবির দীক্ষা'য় তার থেকে মুক্তির পথও বাতলেছেন। আজ সেই দুর্গতি পথ পেরিয়ে এসে, একবিংশ শতকের সাহিত্যিক সন্মাত্রানন্দের সাহিত্য চিন্তায়, সেই মুক্তির পথই পাথেয় হয়ে উঠেছে যা পরস্পর কার্যকারণ সূত্রে গথিত। যার নমুনা আমরা যেমন তাঁর 'বাস্তবায়ন' নাটকে পেয়েছি তেমনই 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' উপন্যাসেও পেয়েছি। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য নাটক ও উপন্যাস, উভয়ের থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম,

'রাজা বিক্রম।। একি অর্থহীন প্রলাপ। এ কি অবাস্তব সংলাপ !!

ভেসালিয়াস।। প্রলাপ নয়। শুনুন, রাজা। আমি অ্যান্ড্রু ভেসালিয়াস, ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। আর আপনি উপকথার চরিত্র। তবু সে উপকথা অনুযায়ী আপনি প্রথম শতকের লোক। আমি ভূত নই, আমি আপনার ভবিষ্যৎ। আমরা ভিন্ন কালের চরিত্র, একই যুগের নই। তবু এই যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সময়ের দেওয়াল পেরিয়ে - এ সবই তাঁর ইচ্ছায়!...

রাজা বিক্রম ।। তবে কার ইচ্ছায় ভিন্ন যুগের মানুষ হয়েও, এই নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল নৈশ বনভূমিতে আমাদের দেখা হ'ল, যুবক?

ভেসালিয়াস।। নাট্যকারের ইচ্ছায় মশাই, নাট্যকারের ইচ্ছায়! আরে বুঝতে পারছেন না, এটা একটা নাটক চলছে? আমরা চরিত্র ... অভিনয় করছি মাত্র। সবই অভিনয়, সব অভিনয়...[১০]

'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' উপন্যাসের 'চাগ লোচাবা' নামধেয় চতুর্থ অধ্যায়ে সন্মাত্রানন্দ বর্ণনা করেছেন এইভাবে 'ঝুঁকে গাঢ় কমলা রঙের পাঞ্জাবিটা নিয়ে সোজা হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল অমিতায়ুধ। আর তখনই যেন সাপের ছোবল খেয়ে চমকে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সে!

" এই অসময়ে তুমি এখানে কেন এলে, লোচাবা!

এক লহমায় যেন সব পাল্টে গেছে। সামনে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর নেই। তাঁর জায়গায় কাষায় পরিহিত জরাজীর্ণ এক ভিক্ষু। মুণ্ডিতমস্তক। এক সঙ্কীর্ণ কক্ষের গাত্র সংলগ্ন প্রস্তরাসনে আসীন প্রবীণ সেই বৌদ্ধ শ্রমণ। অমিতায়ুধ চতুর্দিকে চোখ তুলে দেখল। শপিং মলের দেওয়ার, বিপণি, সামগ্রী ভোজবাজির মত উবে গিয়ে তৎস্থলে প্রাচীন কোনও সৌধের অভ্যন্তরস্থ কক্ষের ভিত্তিগাত্র, পুস্তকাগার, প্রস্তরশয্যা, উচ্চকাষ্ঠাসনে স্থাপিত এক বুদ্ধমূর্তি, পদতলে এক স্ফুটনোন্মুখ শ্বেত পুণ্ডরীক।

... দুই হস্তে ধৃত গাঢ় কমলাবর্ণের একটি বস্ত্রখণ্ড, যেন তিব্বতদেশ হতে আনীত এই বসন শ্রদ্ধাস্বরূপ বৃদ্ধ ভিক্ষুকে উপহার দিতে যাচ্ছে।

... উপরন্তু মূহূর্ত পরেই সে দেখল, সে নিজেই সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিচ্ছে, "আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন, আর্য শ্রীভদ্র। আমি চাগ্ লোচাবা, উত্তর কুরুবর্ষ বা তিব্বত থেকে নালন্দায় বিদ্যালাভার্থে এসেছি। আমাদের দেশের তন্তুবায়নির্মিত এই উজ্জ্বল সঙ্ঘাটি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।'[১১]

বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত পাঠকের কাছে সন্মাত্রানন্দের এই ঘরানাটি অবিদিত নয়। তবে এই ঘরানা গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আমাদের জানান, 'আমি একটা নির্জন আশ্রমে থাকতাম এবং সেখানে চারপাশে একটা অরণ্যের মতই ছিল। বড় বড় রাবার গাছের জঙ্গল, শাল-সেগুন -এর মধ্যে ছিল আমার ঘর। এইখানেই আমি থাকতাম আর একটা স্কুলে পড়াতাম। দিনশেষে আমি এই গাছগুলোর নীচে এসে বসতাম, কোনো বই-টই পড়তাম, কখনও কিছু নিজের মনের কথা লিখতাম। এই নিভৃত জীবনটি আমি চোদ্দ বছর কাটিয়েছি। এইভাবে কাটাতে কাটাতে আমার নিজের মধ্যে একটা কল্পভবন তৈরি হয়। আমার মনে হয়, এই যে সামনের শাল জঙ্গল, এর মধ্যেই যেন ইতিহাসের নানা বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এরই বনপথের একদিক থেকে যেন রাজা বিক্রমাদিত্য মধ্যরাত্রে খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে চলেছেন, অথবা ঐ টিলার অন্যদিকে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু দুই ভাইয়ের দেখা হচ্ছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব আমার কল্পভুবনকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করতে

শুরু করে। এইসব ভাব-ভাবনা ধীরে ধীরে আমাকে লেখার দিকে চালিত করে। আমার অবস্থানটা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের ওপরও নয়, আবার তা কল্পনা নির্ভর কোনো অতীন্দ্রিয় ভুবনের ওপরও নয়। ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং অতীন্দ্রিয়নির্ভর এই উভয়ের মধ্যে যে একটা চলাচল, সেই চলাচলই আমার লেখালেখির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে বলে আমার মনে হয়। '[১২]

উক্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হল যে, তাঁর সাহিত্যের বাহ্যিক উপাদান বাস্তব ঘেষা হলেও ইতিহাস তাঁর কল্পনার জগতকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই জগত হতে উৎসারিত সৃজনশীলতার মধ্যে যে বিশেষ প্রকার আনপ্রনাউন্সড মেসেজ থাকে, ঐতিহাসিক কাহিনিকে অবলম্বন করে তিনি পাঠকের মননেও তার বিস্তার ঘটাতে চান। অর্থাৎ তাঁর কাছে ইতিহাস বলতে তথাকথিত ঘটনার ঘনঘটা নয়, আসলে তা 'চিন্তার ইতিহাস'। কারণ মানুষ মননের দ্বারা জীবিত থাকে, তাই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে সে যে কাজই করুক না কেন তা কিন্তু ইতিহাস বলে গণ্য হবে না। অতএব সাহিত্যিকের কথা অনুযায়ী 'ইতিহাস' হল,

'তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ মানুষটার জন্মানোর আগে বা আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত চিন্তার ইতিহাস। কীভাবে এই পৃথিবীর মানুষজন চিন্তা করে এসেছে, তার সম্মিলিত রূপ কী, সেই চিন্তার যে ধারা সেই ধারাতে এই মানুষটি নতুন কী দিয়ে গেলেন, তাঁর ঐ দানের থেকে পরবর্তীকালের মানুষেরা আবার নতুন কী করে এই চিন্তার প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন,এটাই যথার্থ মানুষের ইতিহাস"। [১৩]

অতএব চরিত্রদের মানসিকতা নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার প্রভাব যে আছে, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কারণ বাস্তবিক যে অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি লড়াইয়ের বীজ বপন করেছিলেন, তা আজ 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা'র মধ্য দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা আবার সেখানেই ফিরে যাই, যেখান থেকে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম কারণ জীবন আর নাটকের মেলবন্ধন তো ঘোচবার নয়। আসলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটাই রঙ্গমঞ্চে যবনিকার ন্যায় তার নিজের অন্তরালে 'সত্য' চরিত্রটিকে আড়াল করে রাখে। সমাজে থাকতে হলে, এই আড়ালের উন্মোচন আমাদেরই করতে হবে, কিন্তু করবো কীভাবে? এই প্রসঙ্গে যুগনায়ক বলেছেন, 'তাহার উত্তর এই, সত্য- প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছু ক্ষতি নাই । সত্যই সকল প্রাণী এবং সকল সমাজের মূল ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং সত্য কখনো সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না।'[১৪] তাই নিঃস্বার্থ পরতার ন্যায় যখন কোন সৎ কার্য বা সৎ চিন্তা, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পতিত যবনিকাকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করে, সমাজের আড়ালে থাকা প্রকৃত সত্যকে সামনে আনবে, তখনই গড়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ সমাজ। আর মানুষকে তা গড়তে হবে সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে থেকে, নিরন্তর সত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে।

তথ্যসূত্র -

১) সন্মাত্রানন্দ, 'বাস্তবায়ন', 'ত্রিপুরা থিয়েটার', সম্পাদনা বিভু ভট্টাচার্য, শারদ সংখ্যা ২০১২ (৬ষ্ঠ বর্ষ- ১ম সংখ্যা), ত্রিপুরা থিয়েটার প্রকাশন, আগারতলা - ৭৯৯০০১, পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫

২) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬, ৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৪, ৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯০, ৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২, ৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৩, ৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৪, ৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৫

৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালের যাত্রা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা-৭, পরিবর্ধিত সংস্করণ।

১০) ১) সন্মাত্রানন্দ, 'বাস্তবায়ন', 'ত্রিপুরা থিয়েটার', সম্পাদনা বিভু ভট্টাচার্য, শারদ সংখ্যা ২০১২ (৬ষ্ঠ বর্ষ- ১ম সংখ্যা), ত্রিপুরা থিয়েটার প্রকাশন, আগারতলা - ৭৯৯০০১, পৃষ্ঠা ৯১

১১) সন্মাত্রানন্দ, 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা', ধানসিড়ি প্রকাশনা,কলকাতা-৫০, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

১২)https://drive.google.com/file/d/1mzC2Uy2WPRA_oVJK6sFxST3-McCnablL/view?usp=drivesdk

১৩) https://drive.google.com /file/d/1mzPz CYEEhUXAbD9npO4ZLiPmEWz 824/view?usp=drivesdk

১৪) স্বামী বিবেকানন্দ, 'জ্ঞানযোগ', উদ্বোধন, বাগবাজার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২৬।

সহায়ক গ্রন্থ-

১) কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮

লেখক : **দেবশ্রী পাল, গবেষক, বাংলা সাহিত্য, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, (BHU) উঃ প্রদেশ।**

Author : **Debasree Paul, Bengali, Banaras Hindu University (BHU), UP.**

কমল রায়চৌধুরীর নাটক : একটি পর্যালোচনা

■ পদ্মকুমারী চাকমা

নাট্যকার কমল রায়চৌধুরীর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ)অবিভক্ত ত্রিপুরা জেলা চাঁদপুরের সাহাপুর চৌধুরী বাড়িতে জন্ম। পিতা স্বর্গীয় খগেশ চন্দ্র রায়চৌধুরী, পেশায় চিকিৎসক। মাতা স্বর্গীয়া বকুল রাণী রায়চৌধুরী। নাট্যকারেরা তিনভাই, তিন বোন। ছ'ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। দেশভাগের শিকার হয়ে নাট্যকারের বাবা ১৯৪৭- এর জুলাই মাসে ত্রিপুরায় আসেন। আর এক দুমাস পরই মায়ের হাত ধরেই তাঁর ত্রিপুরায় আসা। প্রথমে ভাড়া বাড়ি, তারপর ধীরে ধীরে খোয়াইয়ে বসত গড়েন নাট্যকারের বাবা। বাবার সামান্য রোজগারেই সংসার চলত। সে সময় ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। চিকিৎসক বাবা বেশিরভাগ সময়ই বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে রোগীর চিকিৎসা করাকেই জীবনের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পয়সা পেতেন না ঠিকই, কিন্তু সম্মান ভালোবাসার ঘাটতি হতো না। রোগীর পরিবারের লোক জুমের উৎপাদিত ফসল দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। যাইহোক, এভাবে সংসার এর চাকা ঘুরতে থাকে। তিনিও একসময় শিক্ষকতার পেশায় ব্রতী হন। নাট্যকারের সহধর্মিনী জয়ন্তী চৌধুরীও প্রকৃত অর্থে সহধর্মিনীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। অনেক নাটকের পাণ্ডুলিপি সযত্নে তিনি সংরক্ষণ করে রেখেছেন, নাট্যকারের দুই কন্যা। দু'জনেই বিবাহিত। নাট্যকার বর্তমানে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তারপরেও তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেমে নেই।

নাট্যকার ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে খোয়াইয়ে বিদ্যালয় জীবনের পাঠ শেষ করে মহারাজা বীরবিক্রম মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ে আই.এ এবং বি.এ. পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরু ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম কর্মস্থল কুলাই উচ্চ বিদ্যালয়। তারপর ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আগরতলার হাপানিয়া হাইস্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সুনামের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন।

নাট্যকার তাঁর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। যুদ্ধের ফলে দলে দলে উদ্বাস্তু হয়ে আসা লোকেদের কীভাবে খোয়াই নদীর উপর বাঁশ দিয়ে সেতু তৈরি করে এপারে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন তিনি। স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁদের সাহায্যের জন্য তিনিও এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর ওরা সরকারি সুবিধা পেয়ে বিভিন্ন শিবিরে চলে যায়। যুদ্ধের শেষে অধিকাংশ শরণার্থীরাই ফিরে গেছে তাদের নিজ দেশে।

সংবেদনশীল মানুষকে যুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয় স্বাভাবিকভাবে নাড়া দেয়। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁরা কয়েকজন মিলে তখন একটি সংস্থা গড়ে তোলেন, নাম

'লেখক শিল্পী সংঘ'। মুক্তি যুদ্ধের তহবিলে দেওয়ার জন্য 'লেখক শিল্পী সংঘ ' খোয়াইতে গান গেয়ে টাকা সংগ্রহ করে। নাট্যকার নিজে, হীরেন্দ্র সিনহা, চন্দন সেনগুপ্ত, প্রদীপ সরকার, নিখিলেশ দাস বিশ্বাস প্রমুখরা কবি সুকান্তের 'অভিযান' নাটকের শুরুর গানকে উপজীব্য করে তহবিল সংগ্রহে নেমেছিলেন। গানের কয়েকটি পঙক্তি নিম্নরূপ-

"ক্ষুধিতের সে ভার সব ভার লও লও কাঁধে তুলে।
শত কোটি কোটি নরনারী মরে অসহায় অনাদরে।।"

(সরাসরি নাট্যকারের কাছ থেকে নেওয়া)

কামিনী সিংহের অনুরোধে এই গানে সুর দিয়েছিলেন নাট্যকার নিজেই। সেই সময়ে তাঁরা ৫০০ টাকারও বেশি চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং M.N.A (Member of National Assembly) -এর হাতে তুলে দেন। নাট্যকারকে এসব ঘটনা বিশেষ নাড়া দেয়। তাই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি লিখলেন 'আবদুলের মা' নাটকখানি। নাটকটি পান্ডুলিপি আকারে রয়ে গেছে, মঞ্চস্থও হয়নি। কমল রায়চৌধুরী নাটকের পাশাপাশি গান, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনীগ্রন্থও লিখেছেন। তাঁর 'সহযোদ্ধা মার্কশ-এঙ্গেলস জীবন ও সংগ্রাম' গ্রন্থটি ৫ই মে , ২০২৩ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ও আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় ।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ত্রিপুরার প্রজারা রাজন্য শাসন থেকে মুক্তির জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তার ফসল মুক্তি পরিষদ, জনশিক্ষা আন্দোলন। এই প্রতিবাদ প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোয়াইতে মিলিটারি শাসন চালু হয়। মুক্তি পরিষদের সংসদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ প্রায়শই চলত। ফলত মুক্তি পরিষদের অনেক সদস্য আহত হতেন। তাদের চিকিৎসার জন্য নাট্যকারের মানবদরদি বাবার ডাক পড়তো। শুধু তাই নয়, মুক্তি পরিষদের সদস্যরা অতিথি হিসেবে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। এজন্য নাট্যকারের বাবাকে তাদের গোপন আস্তানার খবর ফাঁস করে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে ডেকে নিয়ে নানা প্রলোভনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোনমতেই তিনি এসব ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজি হননি। নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এই মানুষটি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন আজীবন। স্বাভাবিকভাবে বাবার আদর্শ নাট্যকারের মনে দাগ কেটেছিল। শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওযার সুবাদে কর্মপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত তাঁর অবাধ যাতায়াত, অন্যদিকে ছোটবেলায় বাবার কাছে আসা মুক্তি পরিষদের সদস্যদের কর্মপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিতি তাঁর 'দেব না তিতুন' নাটকটি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই নাটকের চরিত্ররা অনেকটাই বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসে। 'দেবো না তিতুন' ১৯৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও নাটকটির প্রথম অভিনীত ১১-ই জুলাই, ১৯৮২ সালে খোয়াই টাউন হলে। প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল 'খোয়াই কালচারেল ক্যাম্পেইন '। নাটকটি ত্রিপুরা থিয়েটার ষোড়শ বর্ষ, অক্টোবর-২০২১, পুনর্মুদ্রণ হয়।

১৯৪৫ সালে ত্রিপুরার জনশিক্ষা সমিতি শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক শোষণ ও তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে গণমুখী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গোটা উপজাতি সমাজকে জাগিয়ে

তুলেছিল। এর ফলে চার'শ এর উপর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রজারা রাজার শ্রেণিস্বরূপকে বুঝে নিতে সক্ষম হয়। নাটকেও তাই মহারাজের কণ্ঠে সেই ঐতিহাসিক সত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে এভাবে-

" ধূলিলুণ্ঠিত হয় যদি রাজমুকুট/শিরচ্ছেদ বলে তারে।
নাহি হবে তাই/একটিও বিদ্যালয় তাহাদের তরে।"[১]

প্রজা সাধারণ বুঝতে পারে শিক্ষাই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই শিক্ষার জন্য তারা লড়াই করে। নিজেদের মৌলিক অধিকার নিয়ে সোচ্ছার হয়। রামকুমার উজ্জীবিত কণ্ঠে বলে- " আমরা তাই সারা ত্রিপুরায় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলব- আর পাশাপাশি যতদিন না রাজা স্কুল করে দেয়, ততদিন আমরা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তুলব - নিজেরাই চালাব।"[২] এর মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম মারা যান। তারপরেও খাজনা আদায় বন্ধ হয় না, বন্ধ হয় না অত্যাচার। তাই এর বিরুদ্ধে চলে সংগ্রাম। নগুরাই ও অন্যান্যরা প্রতিবাদের সুরে তাই গেয়ে উঠে- " আর তিতুন দেব না/ আমরা সবাই দাঁড়াব রুখে/তিতুন দেব না। / মুক্তির দিন আসে/দেখ বিশ্ব জুড়ে/ঐক্য গড়েছে/ কিষাণ মজুরে"- [৩] প্রজাদের এই রোষের কথা রাজদরবারেও পৌঁছায়। সেনাপতি তাই বলেন- " বন্ধ হয়েছে খাজনা। দেয় না তিতুন।"[৪]

'জামাই খাটা' প্রথার কথাও এই নাটকে রয়েছে। লক্ষীচরণের ঘরে পাঁচ বছর ধরে জামাই খাটে মুংকুরুই। তারপরেও সে নিশ্চিত হতে পারে না হীরামতির সঙ্গে তার বিয়ে হবে কিনা। তাই সে বলে " কত বছর কাইত্যা গেল। আমার বিয়া হইত নানি। আজই কইব শ্বশুররে। হয় বিয়া দাও, নইলে চইল্যা যাইব আমি।"[৫] এই প্রথা অনুযায়ী ছেলেকে মেয়ের বাড়ি গিয়ে থাকতে হতো এবং নানাধরনের কাজ করে দিতে হতো। এতো খাটার পর যদি শ্বশুর মনে করতেন এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না তাহলে কারোর কোন কিছু করার থাকতো না। নাটকে পদ্মমোহনের বক্তব্যে তা আরো পরিষ্কার " আমি নিজেই খাটছি পাঁচ বচ্ছর... অনেক বছর খাইট্যা তারপর বিয়াঐ হইত না। অনেক শ্বশুর চাইর পাঁচ বছর খাটাইয়া তাড়াইয়া দিত জামাইরে।"[৬] রাজা লোকজন ও মিলিটারির খেয়ালখুশি মতো বেগার খাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে নাটকের কাহিনি নির্মিত হয়েছে।

নাট্যকারের 'ধর্মগোলা' নাটকটি 'অভিনয় ত্রিপুরা' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি'১৪ - জুন ১৪) প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'নাট্যভূমি' নাট্যদল দ্বারা একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ, কলকাতা, গৌহাটিতেও নাটকটি অভিনীত হয়েছে। নাটকটিতে ত্রিপুরার রাজন্য আমলের শোষণের চিত্র রয়েছে। ত্রিপুরার রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকালে গ্রাম -পাহাড়কে রাজন্য শোষণ থেকে মুক্ত করতে লড়েছিলেন রতনমণি রিয়াং। তিনি নিপীড়িত মানুষদের মনে প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলতে তাই বলেন-" ত্রিপুরার রাজা, ইংরাজের বংশ, বশংবদ।

করদ রাজ্য। ইংরেজেরে কর দিয়া যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া, রসদ দিয়া, রাজত্ব বজায় রাখে রাজারা। অতএব, ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদেরও সংগ্রাম করতে হইব। আমরার দেশমাতা কান্দে। ... আমাদের দেশমাতা আজ বন্দিনী। তারে মুক্ত করতে আমরা জীবন দিমু।" [৭] কবিগানের আঙ্গিকে নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে। একদিকে খরায় ফসল নষ্ট হয়। অন্যদিকে খাজনা হিসেবে ঘরে মজুত সব ধান রাজার পাইকরা নিয়ে চলে যায়। একদিকে মহামারী, আরেকদিকে দুর্ভিক্ষ। অসহায় মানুষ অর্ধাহার, অনাহারে দিনাতিপাত করছে। তার উপর খাজনা দুই টাকা থেকে বাড়িয়ে চার টাকা করেছে নবনিযুক্ত খগেন্দ্র সর্দার। অন্ন-বস্ত্রহীন অসহায় মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রতনমণি রিয়াং। শিলা নামক এক প্রজার বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দেওয়া হলে রতনমণিই তাকে বলে " তুই আইয়া পড় আমার আশ্রমে। পরিবারের সবাইরে লইয়া আইয়া থাক। যতদিন বাড়িঘর তৈরি না হয় ---"[৮] এভাবে রতনমণি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে প্রজাসাধারণের। আর তার হাত ধরেই 'ধর্মগোলা'র অবয়ব নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। ধর্মগোলা হল সেই ভাণ্ডার, যা গরীব, দুঃখী, অত্যাচারিত-পীড়িত লোকদের আহার যোগায়। রতনমণি অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলার নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "পৃথিবীর বহু দেশে রাজা নাই। সমাজের লোকেরাই সমাজ চালায়। শুন শুন, আইজ হইতে নতুন জীবন, নতুন সমাজ। মন্ত্রীসভা তৈরি কর। সেই সভা চালাইব প্রজার সমিতি। ধর্মগোলার হিসাব নিকাশ, প্রতিরক্ষা, সব চলব তারই সিদ্ধান্তে- "[৯] গণচেতনায় বিশ্বাসী বিদ্রোহী রতনমণিকে তাই রাজার লোকেরা কারারুদ্ধ করে এবং "শোনা যেতে থাকে চাবুকের শব্দ আর 'ডাকাইত', 'জাপানের চর', 'রাজদ্রোহী', 'নরঘাতক'। গুলির শব্দ। তিনবার। রতন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। .... তার শেষ উচ্চারণ- আং স্বদেশী ছা।"[১০] ত্রিপুরার এই 'ঐতিহাসিক সত্য' নিয়ে নাটকের কাহিনি নির্মিত হয়েছে।

'ত্রিপুর রাজার উপাখ্যান' নাটকটি 'ত্রিপুরা থিয়েটার' পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ২০২২) প্রকাশিত হয়। এই নাটকটিতে প্রেম, অহিংসা, ভালবাসা ও মানবতার বার্তা রয়েছে। একশ্রেণির মানুষ ঘরশত্রু বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে শুভ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেয় তারই চিত্র দেখতে পাই নাটকটিতে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কিরাত মাতার সন্তান ত্রিপুর রাজ সিংহাসনে বসলেন। এতে চন্তাই -মন্ত্রী ও সেনাপতি এই ত্রি-মূর্তি ক্ষেপে যায়। তারা কিভাবে ত্রিপুরকে ধ্বংস করা যায় সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা হেড়ম্বকে উস্কিয়ে ত্রিপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমশালী ত্রিপুরের হাতে হেড়ম্ব রাজার মৃত্যু ঘটে। হেড়ম্ব রাজা মৃত্যুর আগে ত্রিপুরকে সাবধান বাণী শোনান- " ঘরেই তোর রয়েছে বিভীষণ" [১১] তখন ত্রিপুরের স্বগত উক্তি " সত্য বটে তোমার কথা হেরম্বরাজ! শত্রুরূপে বন্ধু তুমি, অপ্রিয় হলেও বলে গেলে সত্য কথা।" [১২] যুদ্ধশেষে তিনি দ্রুত রাজ্যে ফিরে আসেন এবং দেখতে পান শত্রুরা সবকিছু

লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। কিরাত আর কুকি প্রজাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়েছে। এরা একে অন্যের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, একে অন্যকে আক্রমণ করছে। এই সমস্যা নিরসনকল্পে রাজা পথে বেরলে শিব ছদ্মবেশধারী চন্তাইয়ের আচমকা আক্রমণে তিনি নিহত হন। চন্তাইয়ের সঙ্গে সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিল। এবারে তাদের জন্য নিষ্কন্টক হল রাজ্য পরিচালনার বন্ধুর পথ। চন্তাই রাজ সিংহাসনে বসলেন। সেই সময় রানী হীরাবতীর গর্ভে ছিলো ত্রিলোচন। শেষে সাবালক ত্রিলোচনকে সিংহাসনে বসানো হয়। ত্রিপুর রাজাকে প্রজাদরদী, ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী সর্বোপরি মানবতার পূজারী হিসেবে অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। পুরাণ কাহিনির মোড়কে আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে নাটকটিতে।

'বধ্যভূমি বীরচন্দ্র' নৃত্য নাটকটি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মনুতে ১১ জন মানুষের আত্ম বলিদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত হয়েছে। বীর শহীদদের সম্মানার্থেই নাটকটি লিখিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাদের আত্মত্যাগ নাট্যকারকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমরা জানি, যেকোন দাবি আদায় বা বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে নানা বাঁধা বিপত্তি আসে। মাঝপথে সেই সংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর থাকে প্রতিপক্ষ । তাই তো দস্যুদলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-

" সাবধান, সাবধান, সাবধান
ভেঙে করব সব খান্ খান্
রাখবনা এই দেশে লাল,
তুলে নেবো পিঠের ছাল।
যদি বলো কেউ ইনকিলাব,
মেরে তোকে ডাকাবোই বাপ;
সকলেই শোনো পেতে কান—
মাথা তুললেই হারাবে প্রাণ।" [১৩]

তারপরও সংগ্রাম থেমে থাকে না। সবকিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে শহীদেরা গেয়ে ওঠে-

" আমরা চলেছি দুর্গমের পথে
মুক্তির সংগ্রামের শপথে,
কোনো বাঁধা মানবো না" [১৪]

গণতান্ত্রিক আন্দোলন কোনো কিছুতেই আটকে থাকে না। তাজা জীবনের বিনিময়েও মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এগিয়ে যায়। তাই নাটকের শেষে পঞ্চকন্যা ও কুশীলবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে চির সত্যের বাণী-

" শুনে রাখ ওরে শয়তান
তোর খড়্গতলেও খাড়া আছে শত শহীদের গর্দান।
রক্ত দিয়েই ওরা যে তোদের রক্ত পিপাসা রোখে।

তোরা কি থামাবি তারে?
বীরচন্দ্রমনু রয়েছে এই পৃথিবীর পিঠে,
যাহার আকাশে প্রতি প্রভাতেই নতুন সূর্য ওঠে
তোরা কি থামাবি তারে?"[১৫]

'অতিক্রমনের ক্রন্দন' নাটকটি 'অভিনয় ত্রিপুরা' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৩- জুন' ১৩) প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি একটি নারীর স্বাধীন সত্তা ক্ষুন্ন হওয়ার কাহিনি। নারীজীবনের বাধা-বিঘ্ন ও পরাধীনতার কথা নাটকটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। দাম্পত্য জীবনে নারীরা আজও স্বাধীন নয়। স্বাধীনতার মূল পথ থেকে তারা আজও বিতাড়িত, বঞ্চিত। নাটকের মূল চরিত্র ছন্দা। পেশায় অভিনেত্রী। বিভিন্ন পালায় সে ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্রে অভিনয় করে। অভিনয় করতে করতে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে সে একীভূত হয়ে যায়। নারীদের যাপিত জীবনে বঞ্চনা ও ছলনার শিকার হওয়াকে সে মেনে নিতে পারে না। সে প্রতিবাদ করে। তাই সে " আমি হতে চাই বিপ্লবী জোয়ান অব আর্ক, যে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য, কিন্তু যাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল রাজতন্ত্র আর চার্চের রক্ষণশীলতার জাঁতাকলে। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি সে ছিল অনমনীয়"[১৬]

বাস্তব জীবনে সে মহিমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধে। প্রথম প্রথম মহিমের পুরুষত্বের অহংকারকে সে বুঝতে না পারলেও শেষে মহিম যখন তার পেশা নিয়ে কথা বলে তখন আর তাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে তাকে বলে "কাল থেকে আমার অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে এক পাও দেয়া যাবে না । যদি দেয়া হয়- তাহলে জন্মের মত সঙ সাজার আর খেমটা নাচার সখ মিটিয়ে দেব।"[১৭] মহিম ছন্দার পেশাকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করে। মহিমের এই আচরণে নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্য প্রতিভাত হয়। ছন্দার জবানী তখন নারীর জবানী হয়ে ওঠে "কষ্ট সহ্য করার সময় নারী।" [১৮] ছন্দা হতে চেয়েছিল মহুয়া। নদের চাঁদ মহুয়ার জন্য যেমন পাগলপারা, তেমনি তার জীবনেও সেরকম এক প্রিয় মানুষকে চেয়েছিল সে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সেটা ঘটেনি। তাই সে বলে " গল্পের নদের চাঁদ আমার বাস্তবের জীবনে এলো না।" [১৯] যে এলো সে তো তাকে ব্ল্যাকমেল আর তার ইচ্ছেয় ছন্দাকে পরিচালিত করতে চায়। তাই তো নাটকের শেষে ছন্দার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে " হয়ে যাব জোয়ান অব আর্ক। ভেঙে দেব মিথ্যার প্রাচীর, দুর্জয় এক মহাস্রোত গড়ে তুলে।" [২০] এভাবেই দিগ্বিজয়ী অভিযানের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত সূর্যোদয় ঘটিয়ে ভালোবাসার, বাঁচার এবং মুক্ত জীবনের বার্তার মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি।

ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে উপজীব্য করে তিনি আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। সোনামুড়ায় খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে কাজল নামে একটি ছাত্র মারা গিয়েছিল। সে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লেখেন " কাজলের মা" নাটকখানি। নাটকটির পান্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। লেনিনের জন্ম শতবর্ষে 'লেনিন' (১৯৭০) নামে একটি নাটক লেখেন তিন। নাট্যকার নিজেই

বলেছেন এই নাটকটি লিখতে গিয়ে তিনি জর্জ বার্নাড শ'কে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নাটকটির মতো এই নাটকের পান্ডুলিপিও হারিয়ে গেছে। নাট্যকারের মতে এটিই তাঁর প্রথম নাটক। এরপরে তিনি John Glasworthy's 'জাস্টিস' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। এটিও পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক গানও লিখেছেন। ত্রিপুরার লাগাতর ধর্মঘট চলাকালীন গণতান্ত্রিক কনভেনশন ডাকা হয় এবং সেখানে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই গণতান্ত্রিক কনভেনশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে নাট্যকারের রচিত গান গাওয়া হয়েছিল। এই গানটি সমন্বয় সংগঠনের স্কোয়াডে সকাল-সন্ধ্যায় গাওয়া হত। এই জনপ্রিয় গানটির কয়েকটি কলি নিচে দেওয়া হল।

"পূব থেকে পশ্চিম দিগন্তে , / উত্তর দক্ষিণ মেরুপ্রান্তে,
একে একে শিহরণ জাগল; / অনাদি অতীত শেষে অনন্ত ভাবীকাল।
ব্যাথা শেষে আশা হয়ে উত্তাল, / আমাদের বুকে ওরা কথা কয়ে উঠল।
মুঠি করে তাই আনি বিদ্রোহী রোদ্দুর, / প্রাণভরে শুষে নেয় অশ্রু সমুদ্দুর।"
(সরাসরি নাট্যকারের কাছ থেকে নেওয়া)

মৌলিক নাটকের পাশাপাশি তিনি কয়েকটি নাটকের অনুবাদ ও গল্প- উপন্যাসের নাট্য রূপান্তর করেছেন। অনুবাদকর্মেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় মেলে। 'স্পার্টাকাস' নাটকটি 'ত্রিপুরা থিয়েটার' শারদ সংখ্যা - ২০১৬', ১১ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাট্যকার হাওয়ার্ড ফাস্ট এর ইতিহাসাশ্রিত ইংরেজি উপন্যাস 'স্পার্টাকাস' (১৯৫১) এর বাংলা অনুবাদ পড়ে এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে নিজস্ব বক্তব্য-" আকর্ষণটি হল স্পার্টাকাস চরিত্র এবং তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত রোম সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসের বিদ্রোহ। যদি আমি ভুল করে না থাকি, তাহলে এই বিদ্রোহই সম্ভবত বিশ্বের শোষিত শ্রেণির প্রথম বিদ্রোহ।" [২১]

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী অর্থাৎ যীশু খৃষ্টের জন্মের একশো বছর আগের এ ঘটনা। আমেরিকাতে আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ক্রীতদাস প্রথা রদ করেন। ক্ষুধার তাড়নায় এখনো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এক অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। আর এই শেকলটি রয়েছে ধনিক শ্রেণির হাতে। দূর নিয়ন্ত্রণী চৌম্বক শক্তির দ্বারা ধনবানেরা টেনে নেয় অভাবীদের এবং তথাকথিত চুক্তির নামে তাদের আবদ্ধ করে শোষণের যাঁতাকলে। সারাজীবন নামে মাত্র খাওয়া-পরার বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তিকে লুঠ করে দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে পুঁজিপতিরা। উপন্যাসে বর্ণিত ক্রীতদাসের শোচনীয় জীবনচিত্রের সঙ্গে বর্তমানের অভাবক্লিষ্ট, অর্ধাহার-অনাহারে ন্যুব্জ, সংগঠিত ও আন্দোলন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত, ছাঁটাই-খড়্গের ভয়ে সদা শঙ্কিত, মহাজনী ঋণ ভারে জর্জরিত শ্রমজীবী-কৃষিজীবীদের মর্মান্তিক জীবনচিত্রের কোন পার্থক্য নেই। তাই স্পার্টাকাস আজও প্রাসঙ্গিক। খুব বেশি করেই প্রাসঙ্গিক। এই

নাটকের কাহিনি শোষিত শ্রেণির জনগণের মুক্তি সংগ্রামে গতি সঞ্চার করেব, এটাই কাম্য। নাটকের শেষে বৃদ্ধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে লড়াইয়ের শাশ্বত বাণী " যতদিন বেঁচে থাকব, প্রতিটি বাঁদীকে বলে যাব, তোর মত বাচ্চাদের জন্ম দিতে। যারা লড়াই করবে। লড়াই করতে করতে মরবে। তোর মত-তোদের মত- মরবে তবু মাথা নোয়াবে না। লড়াই করবে, মরবে। কিন্তু শান্তিতে থাকতে দেবে না রাক্ষসগুলোকে।"[২২] বা স্পার্টাকাসের উক্তি "তবু লড়ে যেতে হবে- আমরাও অসংখ্য, আমরাও অনন্ত-" [২৩]

'ওথেলো' কমল রায়চৌধুরীর অনূদিত নাটক। এটি উইলিয়াম শেক্সপীয়র রচিত ট্রাজেডী নাটক 'ওথেলো'-র বঙ্গানুবাদ। বর্ণবিদ্বেষ, প্রেম, ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশোধ ও অনুশোচনার মতো বহু বিচিত্র ও চিরকালীন বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটকটির ভাবানুগ অনুবাদে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

'শেকল পরা ছল' নাটকটি ২০০৫ সালে ত্রিপুরা নজরুল একাডেমি আগরতলা, নজরুল জন্মজয়ন্তী স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়। এটি একাঙ্ক নাটক। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কারাজীবন অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের নির্মম বর্বরতার ছবি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ভারতবাসীর প্রতীক নজরুলের কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে- "আমার জন্মভূমি মাকে আমি ভালোবাসি। এটা কি অপরাধ? মাকে ভালোবেসে আমি কবিতা লিখেছি। এই কি রাজদ্রোহ?" [২৪]

নাট্যকার কমল রায়চৌধুরী কয়েকটি পথনাটক লিখেছেন। যেমন-' বাঁচতে হলে' (১৯৮১) নাটকটি আশি দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা। তাঁর আরেকটি পথনাটকের নাম হল 'মাদার এণ্ড সন এণ্ড কোং' গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী, ডিসেম্বর, ১৯৮২, পুস্তিকায় প্রকাশ পায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দুই ছেলে মিলে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানির কথাই ব্যক্ত হয়েছে উক্ত পথনাটকে। এছাড়াও তাঁর আরেকটি পথনাটক 'ফিরে আসা' । একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছিল। তারা শিক্ষিত জনজাতি যুবকদের স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখিয়ে বিপথে পরিচালিত করে এবং বিদেশী বিতাড়নে জিগির তুলে রাজ্যে বিভেদকামী মানসিকতার জন্ম দেয়। এই বিষয় নিয়ে নাটকটি রচিত। নাটকে অমিয় নামক যুবকটি স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী কিন্তু তার বাবা ধনঞ্জয় কিছুতেই উগ্রপন্থাকে সমর্থন করে না। এখানেই পিতা এবং পুত্রের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য। পিতা ধনঞ্জয়ের নিষেধ অমান্য করে অমিয় উগ্রপন্থী দলে যোগ দেয়। পরে তার ভুল ভাঙে। সবই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। তখন সে আত্ম অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। এই মানসিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে নিজে পিস্তলের গুলিতে আত্মহননের চেষ্টা করে। শেষে পিতাপুত্রের আদর্শগত ঐক্যের মধ্যে দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি। এই নাটকটি ককবরক ভাষায় অনুবাদ করেন প্রশান্ত দেববর্মা 'কিফিলিই ফায়মা' নামে। নাটকটি বর্ণমালা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

নাট্যকার কমল রায়চৌধুরী ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি

মার্ক্সবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী। তিনি মানবতার পূজারী। শ্রমিক, দিন-মজুর, খেটে খাওয়া মানুষেরা যুগে যুগে বঞ্চিত, লাঞ্চিত, অবহেলিত, পদদলিত হয়ে আসছে। কিন্তু সবার সময় একইভাবে যায় না। একদিন তারাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবে। এজন্য বলিদান দিতেও তারা প্রস্তুত। এই চিরশাশ্বত বাণীই বারবার তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। তিনি একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার। সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর দৃষ্টি ও দায়বদ্ধতা প্রশংসনীয়। তাঁর নাটকগুলিতে আধুনিক জীবনচেতনা, ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত, নানাবিধ জটিলতার পাশাপাশি কাহিনি ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়, নাট্যঘটনার গতিশীলতায় নাট্যকারের মুন্সিয়ানা পরিলক্ষিত হয় যা নাট্যোৎকর্ষের পরিচয়বাহী। ভবিষ্যতে নাট্যকারের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

তথ্যপঞ্জী

১) কমল রায়চৌধুরী (১৯৮৭), 'দেবো না তিতুন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ.৩৫
২) ঐ, পৃ. ১৫ । ৩) ঐ, পৃ. ৪৩ । ৪) ঐ, পৃ. ১৯ । ৫) ঐ, পৃ. ৬ । ৬) ঐ, পৃ. ৪৯
৭) 'অভিনয় ত্রিপুরা', ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি '১৪- জুন'১৪) পৃ.১৩৫
৮) ঐ, পৃ. ১২৫ । ৯) ঐ, পৃ. ১৩৭ । ১০) ঐ, পৃ. ১৪৭
১১) 'ত্রিপুরা থিয়েটার', সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ২০২২) পৃ. ৩৪৩
১২) ঐ, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪
১৩) কমল রায়চৌধুরী, 'বধ্যভূমি বীরচন্দ্র' (১৯৪৯) , জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, আগরতলা, পৃ. ২ ।
১৪) ঐ, পৃ. ৩-৪ । ১৫) ঐ, পৃ. ১৪
১৬) 'অতিক্রমণের ক্রন্দন' 'অভিনয় ত্রিপুরা', পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৩- জুন' ১৩,) পৃ.১১৯
১৭) ঐ, পৃ. ১১৮ । ১৮) ঐ, পৃ. ১০৪ । ১৯) ঐ, পৃ. ১০৪ । ২০) ঐ, পৃ. ১২৩
২১) 'স্পার্টাকাস', 'ত্রিপুরা থিয়েটার, শারদ সংখ্যা - ২০১৬' ১১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ.৪৯৫
২২) ঐ, পৃ. ৫৫২ । ২৩) ঐ, পৃ.৫৪৯ । ২৪) ঐ, পৃ. ২৭০ । ২৫) ঐ, পৃ. ২৭১
২৬) ঐ, পৃ. ২৭৩
২৭) 'শেকল পরা ছল' (২০০৫), ত্রিপুরা নজরুল একাডেমি আগরতলা, নজরুল জন্মজয়ন্তী স্মরণিকা, পৃ. ৮১

লেখক : ড. পদ্মকুমারী চাকমা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় ।
Author : **Dr. Padma Kumari Chakma, Asstt. Professor, Bengali, Tripura Central University.**

তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' ও মনোজ মিত্রের 'পাখি' নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজমানস : একটি নিবিড় পাঠ

■ দীপঙ্কর সাহা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মানব মনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কিন্ত মানব মধ্যবিত্তকে বিভিন্ন সমালোচকগণ সংজ্ঞায়িত করেছেন বিভিন্নভাবে। কেননা এই 'শ্রেণী''র আচার-আচরণ, মন-মনন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে বিচিত্র পথগামী। এদের মধ্যে অনেকেই বিপুল সম্পদ আহরণ করে বিত্তবান হয়ে ওঠে, আবার সম্পদের বিনাশে অনেকেই সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষে বিচলিত হলেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, এমনকি সমাজ বিকাশের ধারায় কখনও গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়নি। এই শ্রেণি সম্পর্কে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ভারতীয়দের ধারণা এক নয়। ফ্রান্সে এরা 'বুর্জোয়াজি'এবং ইংল্যান্ডে 'মধ্যশ্রেণি' নামে পরিচিত। বুর্জোয়া কথাটির ফরাসী ভাষায় অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ব্যবসায়ী বা দোকানদার। এরা ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত, শিল্পকর্ম বা ব্যবসায় এরা আয় করে থাকে। 'বিত্ত'র মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তের শ্রেণিকরণ করলে মার্ক্সের সমাজতন্ত্রের আলোকে এর সংজ্ঞা দাঁড়ায়-

'' a middle class in the literal sense of the term is interpreted ... as a privileged upper minority feeding on surplus value and state favouralism and inexorably driving it's victims into ranks of the proletarait.''[2]

[Edwin R.A. Seligman (ed.)- Encyclopedia of Social science , Vol-9, Thee Macmillan Company, New York, 1950, p-407 (Reprinted)

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিত্তের মালিক হলেন সমাজের পুঁজিপতিরা আর সমাজের নিচু তলায় রয়েছে শ্রমজীবী জনসাধারণ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে '' প্যারাসাইট' বা পরান্নজীবী সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিরাজ করে। সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজপুরুষ ও পারিষদবর্গ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং 'এই বুর্জোয়া শ্রেণী'[৩] রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিকও ছিলেন। এঁদের নিচের তলায় ছিল বেতনভুক্ত ও একই সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, ব্যবসাজীবী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি, আর এদের নীচে ছিল কায়িক শ্রমজীবী প্রজা সাধারণ। সমালোচক আবদুল মওদুদ, তাঁর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"বর্তমানে বুর্জোয়া বলতে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বোঝায়, যাদের আয়ের পরিমাণ মোটা ; তার নীচে মধ্যশ্রেণী, যাদের আয় মাঝামাঝি পরিমাণের এবং তাদের নীচের শ্রেণীকে বলা হত নিম্নমধ্যবিত্ত"।[৪]

১৯৪৭ পূর্ববর্তীকালে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃত উত্থান এবং ১৯৪৭ -৫৭ কালপর্বে চলতে থাকে তাদের খোলস পরিবর্তন। এসময়ে নাট্যকারগণ কাহিনি বর্ণনায় নিবেদিত প্রাণ, মধ্যবিত্ত জীবন চিত্র নির্মাণের মনোযোগী ছিলেন না। ১৯৫৮-৭১ সময় পরিসরে বহুবিধ সংঘাত , সংঘর্ষ ও কালিক বৈরিতায় মধ্যবিত্ত হয়ে উঠেছে সচেতন ও শ্রেণিবদ্ধ। আত্মসচেতন মধ্যবিত্তজীবন উপস্থাপনায় নাট্যকারদের দক্ষতা ও বিচক্ষণ ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২-৯০ পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সুক্ষ্মতর প্রচেষ্টা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলা নাটকের অবয়ব নির্মাণ করেছে। বঙ্গদেশের নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিজাত। তাঁদের যাপিত জীবন অভিজ্ঞতা, ফলিত জীবনধারা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন রূপায়নে হয়েছে অত্যন্ত সহায়ক, স্বচ্ছন্দচারী, বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ও দক্ষতা চিহ্নিত। তাই বঙ্গদেশের নাটক অনেকাংশে হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনভাষ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে ও পরবর্তীকালে নাট্য সাহিত্যে বিভিন্ন রকম শ্রেণির রূপান্তর লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ এখন উপেক্ষিত, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবারভুক্ত জীবন , তাঁর সমস্যা ও সংগ্রামের চিত্র লক্ষ করা যায়- বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরাবালি', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানীর জীবন', সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাস্টার' , তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার', মনোজ মিত্রের 'পাখি', রাধারমণ ঘোষের 'শতাব্দীর পদাবলী' প্রভৃতি নাটকে। মৃত্যুঞ্জয়ী মধ্যবিত্ত জীবন সাহিত্যের কানাগলিতে মুখ লুকায়নি, সাহিত্যের নানান উপাদানের অন্যতম প্রাচীন উপাদান নাটক। এই নাট্য সাহিত্যের জগতেও দেবতাদের পেছনে ফেলে মধ্যবিত্ত মানস তাঁদের নিজস্ব অবয়ব প্রদর্শন করেছে।

বিংশ শতকের উত্তরার্ধের প্রথম দুই দশকের নাট্যজগতে মধ্যবিত্তের ছোবল কিভাবে পড়েছিল, তাই এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য। উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' এবং মনোজ মিত্রের 'পাখি' নির্বাচিত এই দুইটি নাটককে কেন্দ্র করেই আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস করব।

'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' নাটকের প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬। বিশ্বরূপায় 'গিরিশ নাট্য উৎসবে' শনিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ সালে 'অচলায়তন' সংস্থার প্রযোজনায় এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি সম্পর্কে ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন-

"স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। .. গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের ওপর বীতরাগ হচ্ছে।"[৫]

সাংসারিক জীবনে সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে মানুষ পরস্পরের প্রীতির সম্পর্ক ভুলে একে অপরকে দোষারোপ করছে এবং নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা আত্মজনের ওপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ ও বঞ্চনার মূল কোথায়, তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশ তারা সব

কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে কিছু লোক মানুষ হয়ে বাঁচবার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এদের নিয়েই 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' নাটকটির বৃত্ত গঠিত হয়েছে। শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়, আজকের এই দুর্দিনও কেটে যাবে, তার ইঙ্গিত রয়েছে নাটকটিতে-

"যুগান্তের ভস্মরাশি প্রলয়ের প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে/ লুপ্ত হয় ঝনঝনার বাতাসে/ তারপর তপস্বীর তপস্যার বহ্নিশিখা হতে/ নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে/ বাণী ও হরিসাধন এ যুগের তপস্বী, তাদের তপস্যা সার্থক হবে , এ বিশ্বাস রাখি।"[৬]

নাটকের প্রথমেই নাট্যকার লক্ষীপ্রিয়ার সংসারের চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত সমাজের করুণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে। অভাব, বেদনা এবং উদ্বেগ নিয়ে অবসন্ন লক্ষীপ্রিয়া আজ হার মেনে সংসার থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯-২০ বছরের মেয়ে বাণী, হতাশ মুখে তার মায়ের কাছে বসে রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীযুগের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা, রুক্ষতা, হৃদয়হীনতা নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারে প্রতিনিয়ত যে ক্ষয় ও শূন্যতা সৃষ্টি করেছে, সেই ভাঙনের চিত্রও নাটকটিতে বর্তমান। স্বভাবতই সমালোচক জানিয়েছেন-

" এই সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে, পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পরস্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ এবং বঞ্চনার মূল কোথায়,তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।"[৭]

নাটকটি সর্বব্যাপী সামাজিক বিপর্যয়ের একটি দলিল হয়ে রয়েছে। 'নবান্ন'র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের মতো মধ্যবিত্তের 'গোত্রান্তর' এখানেও সত্য হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের অভিমান বিসর্জন দিয়ে এখন সাধারণ দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন। সর্বহারা, নিঃস্ব, রিক্ত দুইটি নর-নারীর মিলনে অর্থাৎ বাণী ও হরিসাধনের জাত-কুলের বাধা,ভেদাভেদ শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন চিরন্তন বিচ্ছেদ নিয়ে আসতে পারেনি। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পারিবারিক সম্পর্কও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক পরাভব-ই মানুষের দুঃখের কারণ। অর্থের অভাব, দারিদ্রের পীড়ণ মানুষের মনুষ্যত্ব ও বিবেককে হত্যা করে অমানুষে পরিণত করেছে। সমাজের বাস্তবতার চিত্রে বর্ণিত সেই মধ্যবিত্ত সমাজের ধীরে ধীরে নিচুস্তরে চলে আসার ছবি ফুটে ওঠে বাণীর ছোট ভাইয়ের কণ্ঠে-

"হরিদা চুপি চুপি আসে কেন ? আমরা থাকতে আসে না কেন, আমি কিছু বুঝি না বুঝি ?"[৮] নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, হরিসাধন নিজের প্রচেষ্টায় সবাইকে ভালো করার প্রয়াসে একটি পাঠশালা বানিয়েছে। হরিসাধন ও বামাচরণের কথায় জানা যায়, যে আবহাওয়ায়, সমাজে তাদের বসবাস করতে হয়, সেখানে মানুষ গড়া খুব কঠিন কাজ, এরমধ্যে দু-চারটে মানুষ গড়ে তুলতে পারলেই বাহাদুরের কাজ হবে। সেই সময় হরিসাধনের কথায় মধ্যবিত্ত সমাজের চরম সত্যবাণী উদ্‌ঘাটিত হয়-

" এরা দুঃখের ঘা খেয়ে এমন মজবুত আর শক্ত যে উৎসাহ আর সুযোগ পেলে এরা অসাধ্য সাধন করবে।"[৯]

সলিল সেনের নাটক "নতুন ইহুদী'-তে যেমন দেখা যায় জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের সূত্রে গোটা জীবনব্যবস্থার মূল্যায়ন- যার একদিকে আছে তীব্র অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং আদর্শবাদ, অন্যদিকে বিপর্যস্ত মানবজীবনের মূল্যবোধ, সামাজিক অবক্ষয়, অবলম্বনহীন সংসার পীড়িত মানুষের অস্তিত্বের দুরধিগম্য সমস্যা, জীবনের অর্থহীনতা, আত্মিক মৃত্যু এবং ব্যক্তিত্বের পরাজয়। 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার ' নাটকেও একইরকম বক্তব্য লক্ষ করা যায়। নাট্যকার দেখিয়েছেন , চারিদিকের পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার জন্য, মধ্যবিত্ত মানুষ সাধারণ মজুর শ্রেণিতে পরিণত হয়ে এমন সব কাজ করছে, যেন এই পৃথিবী নরকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সেই সময়ে হরিসাধন সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুন্দর মানসিকতা গঠনে ইঙ্গিত দিয়েছে। তার কথায় পরিস্ফুট হয়, এই নরককে স্বর্গ করতে না পারলে পৃথিবীর শত শত মা, মেয়ে, কৃষক সবার সংগ্রাম বৃথা হয়ে যাবে। ফলত অনেক সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেও হরিসাধন বরাবর বাণীকে বলেছে-

"দুঃখ পাওয়াতেও সুখ আছে জানো বাণী।... বিকট দারিদ্র আজ আমাদের মানুষের মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড শত্রু হয়ে মহামারীর মত সারাবিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। কেউ অদৃষ্ট বলে সয়েই যাচ্ছে, কেউ নানাভাবে এড়াবার চেষ্টা করেও এড়াতে পারছে না। আমি এড়াতে চাই না। আমরণ লড়তে চাই। " [১০]

চতুর্থ দৃশ্যের শুরুতে দেখা যায় ইন্দ্রনাথ, অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে নিজের ভুল দেখতে পেয়ে, অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে সেই জ্বালা মেটাতে রোজ অনবরত মদ্যপান করে চলেছেন। ঘটনার অগ্রগতিতে জানা যায় ছোটকার মৃত্যুর কথা, বিশু পালিয়ে বেড়াচ্ছে কারণ সে খুন করেছে। গা ঢাকা দিয়ে বাড়িতে এলেও বিশু নিস্তার পায় না, পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। বাণী কিছুতেই স্থির হতে পারে না, কেননা তাদের এত সুন্দর সংসারে কি করে যে আগুন লেগে গেল, সেটা সে ভেবে পাচ্ছিল না। কেন যে যুদ্ধ এলো , সবকিছুর দাম বাড়লো, এই সংসারের চিন্তায় বাবা মদ ধরলো, দাদা পড়া বন্ধ করে কুসঙ্গে মিশলো, এমনকি বাবার চাকরি চলে যাওয়ার পর যেটুকু টাকা ছিল সেটাও শেষ হয়ে গেছে ধার-দেনা মেটাতে মেটাতে। সেই সময় বাণী নিজেকে একা মনে করলেও হরিসাধন বাণীকে বোঝায়, কেঁদে লাভ নেই, মহাবিপদেও ধৈর্য হারাতে নেই। বাণীর বাবার কথা উঠলে, হরিসাধন পাশের ঘরে লণ্ঠন জ্বালাতে গিয়ে দেখে, ইন্দ্রনাথ গলায় দড়ি দিয়েছেন। বাণী টলে পড়ে যায়। হরিসাধনের চরম সত্য কথার মধ্য দিয়ে নাটকটি সমাপ্ত হয়, সেখানেও দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ। সমালোচকের ভাষায়-

" ... সাহসে বুক বাঁধতে হবে। যে দুর্নীতি দুনিয়ায় এ হাহাকার এনেছে, ঘরে ঘরে সর্বনাশ ছড়িয়েছে, যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটিয়েছে ; - আজ নূতন করে তাকে নির্মূল করবার শপথ নিয়ে ... এগিয়ে চলতে হবে। হার মানা চলবে না।

”[১১]

জীবনযুদ্ধের এই বেদনাময় অধ্যায় পার হয়ে মানুষ এগিয়ে চলে নতুন জীবন, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগের ফলে বাংলার সমাজে প্রচণ্ড ভাঙ্গা-গড়া অনবরত চলতে থাকায় সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় অনুশাসন, জাতপাতের সংস্কার চুরমার হয়ে এক নতুন সমাজ ও জীবনবোধের প্রত্যয় জন্ম নেয়। অর্থনৈতিক মানদন্ডে বর্তমান সমাজ ধনী ও দরিদ্র শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। জীবনযুদ্ধে পলায়ন মনোবৃত্তি কোন পথ নয়, আর কায়িক শ্রম কোন অপরাধ নয়। সাহসের মধ্যে দিয়ে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেই এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত করতে হয়। নাটকটিতে হরিসাধন ও বাণী সেই পথ-ই দেখিয়েছে । বিশু ও ছোটকা জীবনের বিপরীত পথে চলতে গিয়ে এক শোচনীয় পরাজয়ের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছে। অন্যদিকে ইন্দ্রনাথ সেই পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থেকে জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। তবে বাণী ও হরিসাধন নিম্ন -মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙনের ফলে ধাপে ধাপে নীচে নেমে মজদুর শ্রেণিতে পরিণত হলেও তাদের লড়াই করে বেঁচে থাকার ইতিহাস নাটকটিকে এক অনন্য মর্যাদা প্রদান করেছে।

‘পাখি’ নাটকটিতে মূল চরিত্র শ্যামা, নীতিশ, চৈতালি চ্যাটার্জি ও গোপাল। একটি হ্যারিকেন কোম্পানীতে সেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করে নীতিশ। তার মাসিক আয় ৩০০ টাকা এবং প্রতি হ্যারিকেন বিক্রি বাবদ ৩০ পয়সা কমিশন। এই সামান্যতম আয়ের উপর ভিত্তি করে স্ত্রী শ্যামাকে নিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালাতে হয়। তারা দুজন ভাড়া থাকে একটি পুরনো বাড়ির জরাজীর্ণ ঘরে। সেই ঘরের বিছানা থেকে শুরু করে তৈজসপত্র, সব কিছুতেই ধরা পড়ে দারিদ্র্য। এর মধ্যে দিয়েই সুগৃহিণী শ্যামা যথাসম্ভব মানিয়ে গুছিয়ে চলবার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে শ্যামার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় নীতিশ। কারণ নীতিশ নিজের দুঃখ দুর্দশাকে ভুলে গিয়ে হাসি-খুশিতে আনন্দে দিন কাটাতে চায়। মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতার পুরোপুরি ছাপ নীতিশের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তার স্বপ্ন, জীবনে অন্তত একদিন মানুষ দিলদরিয়া হয়ে খেয়ে পরে আনন্দে বাঁচুক। চারিদিকে দেনায় ডুবে থাকলেও নীতিশ মাইনে পেলে বউকে নিয়ে হোটেলে খেতে যাওয়ার জন্য উৎসুক্য প্রকাশ করে, বউকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। নীতীশের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়েই ‘পাখি’ নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সনাতন গোস্বামী স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

“পর্দা উঠলেই দেখা গেল ঘরে একটা সাবেকি পালঙ্ক তার ওপর ছেঁড়া গদি। একটা চেয়ার। একটা টেবিল। ... ‘প্রায়’ চারধারেই ঝুলছে নানা রঙের, নানা আকন্দের কাগজের শিকলি ফুল, বিচিত্র সব কারুকার্য। রঙ আর রূপের সমারোহ এ সংসারের মালিন্য ঢেকে দিয়েছে।”[১২]

স্বামী নীতিশের এই বেহিসেবি জীবন-যাপনে স্ত্রী শ্যামা অত্যন্ত পীড়িত। মধ্যবিত্তের কষ্টকর জীবনে স্বামীর এই বেপরোয়া খরচ যদিও বিবাহবার্ষিকীর জন্যই, তবুও শ্যামার

কাছে এই উৎসব মনে হয়েছে অহেতুক। কেননা মধ্যবিত্তের জ্বালা ভুলে কিংবা ভোলার চেষ্টা করে নীতিশ আনন্দে মেতে উঠলেও কোমল মনের শ্যামা সেই হতদরিদ্র জীবন-যাপনের পীড়ায় নির্মম ভাবেই পীড়িত। মধ্যবিত্ত হয়ে নিজেদের আর্থিক দৈন্য নিয়ে নীতিশের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, ঘটা করে এ উৎসবটা পালন করতেই হবে। শ্যামার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্তের যে আশা-আকাঙ্খা, স্বল্পতে তুষ্ট হওয়া, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থায় আনন্দে হাসিতে জীবন কাটানো ইত্যাদি চিত্র লক্ষ করা গেলেও অন্যদিকে জীবনের বহিপ্রকাশে , মধ্যবিত্তদের বাস্তব সাংসারিক জীবন যে কতোটা বিপর্যস্ত, সে চিত্রও বর্তমান-।

"মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন রেশন উঠছে না, বাড়িওয়ালা মুদির কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছি। আমি মরছি ছোটদি বড়দির কাছে হাত পেতে..কোথায় দুটো পয়সা বেশি রোজগার করবে..না ড্যাম ড্যাম হ্যারিকেন ! থাকবে না, থাকবে না, এ চাকরিটাও যাবে।" [১৩]

মধ্যবিত্ত মানুষ সর্বত্র-ই সংসার নিয়ে চিন্তিত। বাস্তবেও দেখা যায় চাকুরিজীবী বা কোম্পানীতে কর্মরত ব্যক্তিরা মাসের শেষে মাইনে পেলেও সেই সংসারের মহিলারাই জানেন, কি করে তাদের সমস্ত মাস পার করতে হয়। নাটকটিতে শ্যামা, বাস্তব জীবন সম্পর্কে নীতিশকে সচেতন করে দেয়, কেননা নীতিশ সংসারে টাকা দিয়েই মুক্তি পেতে চায়। সারা মাস কি করে সংসার চালাতে হয়, সেটা শুধুমাত্র তার স্ত্রী শ্যামা-ই জানে। শ্যামা বিস্ময়ের সঙ্গে নীতিশের কাছে এতো আয়োজনের জোগাড় সম্পর্কে জানতে চাইলে , প্রথমদিকে নীতিশ বিভিন্ন অজুহাত দিলেও পরক্ষণেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। নীতিশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলে এসব করেছে। কারণ আজ সন্ধ্যায় ননী, ননীর বউ, বাচ্চা, ভুবন, ভুবনের বউ, ভুবনের রাঙা কাকিমা, তার ছোট বোন সব মিলিয়ে মোট ১৩ জন আসবে, আজ সন্ধ্যায় এদের সবাইকেই আমন্ত্রণ করেছে নীতিশ। হঠাৎ পাওনাদারেরা এসে হাঙ্গামা করলে শ্যামা নীতিশের বুক পকেট থেকে তাদের পাওনা টাকা বুঝিয়ে দেয়। সেই টানা হ্যাঁচড়ায় পকেট থেকে চিঠিটা মেঝেতে পড়ায়, চিঠিতে চোখ বুলিয়েই নীতিশ আর্তনাদ করে ওঠে। প্রবল ক্ষোভে ও যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে নীতিশ ঘরের সাজসজ্জা সব নষ্ট করে দেয়। কারণ সেই চিঠিতে জানা যায়, যাদের জন্য এই আয়োজন, এত সাজসজ্জা, তারা কেউই আর আসবে না। নীতিশের চোখে জল টলমল করতে থাকে। নীতিশ ভাবে এই লজ্জা, অপমানের যন্ত্রণা শ্যামাকেও বিদ্ধ করবে নিশ্চয়ই। সেই মুহূর্তে শ্যামা অদ্ভূত চাঁপা গলায় বলে ওঠে-

" কেন যাও, কেন যাও ঐ বড়োলোক বন্ধুদের কাছে, যারা শুধু আমাদের গরিব বলে করুণা করে ! কেন কেন যাও ? ... নাইবা এলো ওরা ... ওরা কে অ্যাঁ, যে এলো না বলে সব নষ্ট করে দিতে হবে ? ওরা আমাদের কেউ না গো ... কেউ না ...। "[১৪]

শ্যামার এই বক্তব্য দিয়েই নাটকটি শেষ হয়। প্রবল অপমানের ব্যথা বিক্ষোভ নীতিশকে বিপর্যস্ত করে। নাট্যকার গরিব ও বড়লোক বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে বড় করে দেখাতে গিয়ে বাস্তব সমাজের মতোই মধ্যবিত্ত ভাগ্যের নিদারুণ অবহেলা, অপমান, অবজ্ঞা,

কষাঘাতের জ্বালা নীতিশের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। পাখিটার চোখ নষ্ট হয়ে গেলেও তার সুদূর নীলাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে যায়নি, সে আজও ইচ্ছে করলেই ডানা দুটো মেলতে পারে। সকল তুচ্ছতা ও অপমানের গ্লানি অতিক্রম করে শ্যামার কণ্ঠে তাই আত্ম স্বাতন্ত্র্যবোধের উজ্জীবনের সুরে দুজনের ডানা মেলে নীলাকাশকে ছুঁয়ে দেখার প্রতিজ্ঞামন্ত্র উচ্চারিত হয়। সুতোয় আঁকা পাখি পোকায় কাটতে পারে, কিন্তু শত বাধাতেও মনের পাখি থেমে থাকে না। শেষ মুহূর্তে আত্মমর্যাদাবোধ ও শত দৈন্যকে উপেক্ষা করে প্রেমের ও চিরন্তন মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবন স্নিগ্ধ রসের ধারা, মোহনায় পৌঁছে মধ্যবিত্ত সমাজের করুণ রসবাহী দিগন্তব্যাপী হাহাকারে পরিণত হয়ে চিরন্তন প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার মহাসাগরে মিশে গেছে। শুধু তাই নয়, নাট্যকার কাহিনিতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনের পাশাপাশি, যা দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আত্ম অন্বেষণ করে বেঁচে থাকার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। নাটকটিতে নীতিশ, শ্যামা এবং নীতিশের বন্ধুরা যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করেছে।

> "আজো এক অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় স্থিত! আমি
> পলেস্তারা খসে যাওয়া এ প্রাচীর আবার বদলাবো
> এই পুরাতন মঞ্চ অতীতের নিক্ষিপ্ত হবে আর একবার
> আবার নতুন মঞ্চে জ্বালাবো নতুন দীপাবলী, চারপাশে
> আমি থাকবো আমার গা ছুঁয়ে থাকবে আমার স্বজন, আর
> সারিবদ্ধ আমরা সবাই থাকবো উৎসব-সূচীতে। আমি
> 'তোরণ উন্মুক্ত রাখো' এ নির্দেশ টাঙাবো তোরণে।"[১৫]

অবিশ্বাস্যদৃঢ়তায় মধ্যবিত্ত সমাজের 'আমি' কেন্দ্রিক প্রাণ সকল হতে চায়নি কখনো, অতীতের ব্যর্থতার গ্লানিভরা প্রাচীরকে বদল করে নতুন মঞ্চে নতুন দীপাবলীর দীপ জ্বালাতে তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত থেকেছে। হতাশাররক্তবীজ মধ্যবিত্ত সমাজে দীর্ঘস্থায়ী আসন কখনোই অর্জন করতে পারেনি। ফলত মধ্যবিত্ত তাঁর নিজস্ব গা ঘেঁষে স্বজন নিয়ে আজও তাঁদের অস্তিত্বকে জানান দেয়। কায়িক শ্রমবিমুখ এই বিত্তবান শ্রেণি ডারউইনের তত্ত্বজ্ঞানে 'অস্তিত্বের সংগ্রাম'-কে হাতিয়ার করে যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের সব নিয়ে ডাইনোসর না পিপীলিকার ডানায় ভর করে সারিবদ্ধ সারণীতে সমাজের রাস্তায় এগিয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতায় বা ভূগোলের পলিগঠিত শিলায় জীবাশ্ম হয়ে থাকার মানসিকতা মধ্যবিত্ত জীবন মানসে কখনোই ছিল না, তাই কাঁটাতারের বিভাজন অমান্য করে মধ্যবিত্ত আজ সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁদের নিজস্ব রামধনুর বর্ণালীচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়েছে। হতাশাই শুধু নয়, রাহুর ন্যায় অমৃত সুধা পান করে মধ্যবিত্ত সমাজজীবন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে। মরুভূমির মধ্যে ক্যাক্টাস যেমন করে তাদের জীবনকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, ঠিক তেমনি মধ্যবিত্ত সমাজও নিজস্ব খোলস পরিবর্তন করে উল্টেপাল্টে বেঁচে থাকার রসদ নিজেরাই জোগাড় করে নেয়। এতে কখনো কখনো তাঁদের স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু মুদ্রানির্ভর সমাজব্যবস্থায় তাঁরা কখনোই হারিয়ে যায়নি। বৃত্তিময় মানবজীবনে বুদ্ধিমত্তার চরমে মধ্যবিত্ত

সমাজ। সমকাল ও ভাবিকাল সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থায় সুস্থির আবাস মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেরাই গড়ে তোলে। জটিলতাপূর্ণ দ্বন্দ্বময় জীবনে নানাভাবে সমালোচিত হলেও তাঁরা আলোর টিমটিম শিখায় আজও নিজেদের উজ্জ্বল করে রেখেছে। যুগাবসানে আগুন লেগে যা ছাই হবার, তা ছাই হয় আর যা টিকে থাকে, তাকে নিয়ে সৃষ্টি নবযুগের। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানসকেও দেখা যায়, একইভাবে যুগের আগুনে দগ্ধ হয়ে যা বেঁচে থাকে, সেটা নিয়েই নবযুগের অর্থাৎ এক নতুন ভবিষ্যতের উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে।

তথ্যসূত্র ঃ-

১) বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৬৮, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ১৬৩

২) ওয়াকিল আহমেদ, 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৩, প্রথম পুনর্মুদ্রণ,জুন ১৯৯৭, পৃ.৩৯

৩) বিনয় ঘোষ, 'বাংলার নবজাগৃতি', প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৫, তৃতীয় মুদ্রণ ১৮২৩, পৃ.৬৫

৪) আবদুল মওদুদ, 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৯

৫) জগন্নাথ ঘোষ (সম্পা), 'তুলসী লাহিড়ীর ছোঁ তার', বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৫

৬) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), 'তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা বইমেলা

৭) দীপক চন্দ্র ,'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৪

৮) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), 'তুলসী লাহিড়ীর নাট্য সমগ্র' প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১২

৯) তদেব, পৃ. ৩৯১, ১০) তদেব, পৃ. ৪১১– ৪১২,

১১) দীপক চন্দ্র, 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৪

১২) সনাতন গোস্বামী (সম্পা), 'নির্বাচিত একাঙ্ক পাঠ', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০১

১৩) মনোজ মিত্র 'নাটক সমগ্র(১ম)', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, ১৪) তদেব, পৃ. ৪৩৮

১৫) আহসান হাবীব, 'কবিতা সমগ্র', অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৭

লেখক: **দীপঙ্কর সাহা, গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়**
ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।

Writer : **Dipankar Saha, Scholar, Bengali, Guwahati University and**
Dr. Sanjay Bhattacharjee, Associate Professor, Bengali, Guwati University, Assam.

নাট্যকার শেখর দেবরায়ের "মনসাকথা" নাটক একটি পর্যালোচনা

■ সুতপা চক্রবর্তী

এখনও প্রতিবছর বরাক উপত্যকার গ্রামে-গ্রামে সমস্ত শ্রাবণমাস জুড়ে পদ্মপুরাণ পড়া হয়। পড়া অর্থে গীত হয় এটি। সারাদিনের কাজের শেষে মূলত বিকেলবেলা পাড়াপড়শি, নারী পুরুষ মিলে পদ্মপুরাণ গীত হয়। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন গীত শুরু হয় ও শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন সমাপ্ত হয়। পরের দিন মনসা পুজা এবং তারও পরের দিন হয় চান্দের পুজা। মনসা এ অঞ্চলের একজন প্রধান লৌকিক দেবী। ওঝার গান হয় মূলত একদিন -মনসা পুজোর দিন। মনসা এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সংস্কারের সাথে অনেকটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শেখর দেবরায় এই অঞ্চলের সন্তান। তাই তাঁর জীবনে এই সংস্কৃতি ও সংস্কারের প্রভাব পড়াটা যে অবশ্যম্ভাবী এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, "লোকসংস্কৃতির নিষ্ঠাবান গবেষক ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধই এই নাটকের উৎস। 'মনসামঙ্গল কাব্য : পুনর্বিচার' ('একা এবং কয়েকজন'/১৪০৮) শীর্ষক উক্ত প্রবন্ধে প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, মনসামঙ্গল কাব্য সর্পদেবীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে জয়ী হবার এক সাহিত্যিক দলিল।

লেখাটি পড়েই মনে হয়েছিল, চাঁদ সওদাগরের বাম হাতে পুজা নিবেদন সামন্ততান্ত্রিক কৌশল মাত্র! এই চাতুর্য কি মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলেই শেষ হয়ে গেছে? নাকি আজও তা বহমান। এই উত্তর সন্ধানেরই ফসল 'মনসাকথা'।" [১] মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে লেখা 'মনসাকথা' নাটকটি। তবে তা অনেকটাই মূল সুর থেকে সরে এসে মিশে গেছে বরাক উপত্যকায় 'আলো হাওয়া রৌদ্র' - এর সাথে। 'মনসাকথা' নাটকে সর্বমোট গানের সংখ্যা আছে সাতটি। মূল মনসামঙ্গলের কাহিনিকে এখানে নাট্যকার যতটুকু অনুসরণ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি করে মনসাপুজায় হওয়া ওঝানৃত্যের আদলে নাটকটি রচিত হয়েছে। গায়েন, বায়েন, দোহার সহ নাটকটি আত্মপ্রকাশ করেছে। দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা এখানে সরাসরি আসেনি। এসেছে লৌকিক সমাজে অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠানের নাট্যরূপ বর্ণনার ভেতর দিয়ে। এই যে সমস্ত নাটকে গায়েন, বায়েন, দোহার বারবারই ঢুকে পড়ছেন এ তারই ইঙ্গিত। মঞ্চ নির্মাণে ময়ূরপঙ্খী নৌকার প্রসঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে 'পাখাজ' এর ব্যবহার। মূলত গায়েনই এই 'মনসাকথা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মনসা কিন্তু নন। কারণ গোটা নাটকটিকে ধরে রেখেছেন এই গায়েন, বায়েন, দোহাররা। তাদের দ্বারা গীত গান ও বন্দনার মধ্য দিয়েই আমরা চম্পকনগরীতে প্রবেশ করি। মনসা, সনকা, চাঁদসওদাগর, বেহুলা, লেংগা এবং মাঝিদের সাথে পরিচিত হই। আরেকটি প্রসঙ্গে থমকে

পড়তে হয়। সনকা ও সীতার মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল। অদ্ভুত প্রচ্ছন্ন এক মিলের ছায়া এই দুজনের মধ্যে এসে লেগেছে। দুর্মুখের মুখে রামচন্দ্রের সীতার কথা ও লেংগার মুখে চান্দের সনকার কথা শোনার মধ্যে একই পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। [২] একই বিষয়ের উপর তৈরি আরেকটি স্বতন্ত্র নাটক শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালার মধ্যে আবার একেবারেই অন্যরকম একটা বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। এখানে কোনো দূত কিংবা অন্য কোনো বাইরের লোকের থেকে নয়, বরং চাঁদ নিজেই একদিন ঠাকুরঘরে গিয়ে সনকাকে মনসার ঘট পুজো করতে হঠাৎই দেখে ফেলেন---

" কিসে শান্ত হইরে সনকা। মানুষ যে ঘর বান্ধে সেকি শুধু ইট কাঠ পাথরের ঢের দিয়া, কও? বিশ্বাস না যদি থাকে- ঘরে এস্যা যদি দেখে, ঘরে তার অন্ধকার কোণে কোণে সর্প ঘোরে- তাইলে সে সর্প দালানে কোনোদিন সংসারের প্রতিষ্ঠান হয়? সেটা কি কখনো ঘর হয়? ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়— হায় - হায়, ভগবান , মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে? বিশ্বাস কোথায়? " [৩]

শম্ভু মিত্রের চাঁদের কাছে সরাসরি সনকার বিরুদ্ধে কেউ ক্ষোভ ওগরায় না। কিন্তু শেখর দেবরায়ের সনকার বিরুদ্ধে চাঁদের কাছে লেংগা তার যাবতীয় ক্ষোভ ঝাড়ে। আরেকটি বিষয় আশ্চর্য, শম্ভুমিত্রের সনকাকে চাঁদ সওদাগরের সমাজের মানুষেরা আড়ালে তীব্র অপমান করে। হেয় চোখে দেখে। ব্যক্তি নারীর চূড়ান্ত অসম্মান করে -

"চলো-চলো, গিয়া বলি, এখন সে জারজ লখাই 'বাপা-বাপা' বলো চাঁদের কোলেতে যাবে, আর বেণীনন্দ সনকারে কোলে নিয়্যা বিছানায় শুবে।" [৪]

কিন্তু শেখর দেবরায়ের সনকাকে সওদাগরের সমাজের মানুষেরা 'মা'-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। মান্যি করে। এর একটা কারণ, দুটো ভিন্ন পরিবেশে লেখা দুটো নাটক। অর্থাৎ আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের অজান্তেই আমাদের অবচেতন মনে তার নিজের মতো করে এক ধরনের মূর্তি তৈরি করে রাখে। সেই মূর্তির সঙ্গে আমাদের প্রায় কারোরই দেখা হয়না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই মূর্তিই আমাদের বাইরের অবয়বকে চালনা করে। আর শুধু বাইরেই নয়, ভেতরে ভেতরে আমাদের চিন্তাশক্তিকেও চালিত করে। এই কথাগুলির পেছনে যুক্তিটি হল, শেখর দেবরায়ের যে পরিবেশ এটি ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব ভারতের পরিবেশ। এখানে বিশুদ্ধ বাঙালিসমাজ অপেক্ষা অন্যান্য জাতি-উপজাতিদের সঙ্গে মিলনের ফলে এক মিশ্র বাঙালি হৃদয় গড়ে উঠেছে। উত্তর পূর্বের অনেক জনজাতি-উপজাতি-পার্বত্য জনজাতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত। তাই নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও এতো সহজে উত্তর পূর্ব ভারতের পরিবেশে " আরে বাবা নারীর কলঙ্ক কথা বড়ো মিষ্ট লাগে। শোনামাত্র বিশ্বাসের ইচ্ছা জাগে।" [৫] — এই উক্তিগুলি সচরাচর মন থেকে উঠে আসে না। আর তাই আমরা দেখি 'মনসাকথা'য় মাঝিরা সব সনকাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে—

"মাগো কাইন্দ্য না ! তুমি মোদের সতী লক্ষ্মী— ভাসানো যাওনের আগে কইয়্যা যাই, এইবারের পাটনে আমরা চান্দ সাধুরা লীগ ছাড়ুম না।" [৬]

মধ্যযুগের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসাকে যেভাবে নারীর অধিকার আদায়ের মুখ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়, 'মনসাকথা'তে তেমনটি নয়। সেখানে বরং ব্যক্তি থেকে বড় হয়ে ওঠে সমষ্টির চিন্তা, সমষ্টির ভাবনা। আর তাই নাটকটি নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের গল্প হতে গিয়েও শেষপর্যন্ত তা বৃহত্তর জনমানসের লড়াইয়ের গল্প হয়ে ওঠে। 'মনসাকথা'নাটকটিতে মনসা শুধু নারীর অধিকার আদায়ের মুখ নয়। তার চেয়েও বেশি সমাজের ক্ষমতাবানদের সাথে ক্ষমতাহীনদের লড়াই -এর গল্প । কোনো নারীবাদী তত্ত্ব নয়, শুধুমাত্রই বিশুদ্ধ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গল্প। মনসা এখানে প্রতীকমাত্র। কারণ মনসা এখানে নিপীড়িতা নন। ক্ষমতা তার আছে। বিষও আছে তার কাছে। মানুষের প্রাণ হরণের ক্ষমতা তার আছে। পুজোটা আসলে মনসা নিতে চাইছেন না। মনসা এখানে একটি মাধ্যম। পুজোটা এখানে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিকে সমাজে সসম্মানে বেঁচে থাকার, মান্যতা দেওয়ার লড়াইয়ের পুজো। তাই এই নাটকে নারী- পুরুষের দ্বন্দ্ব থেকে অনেক বড় হয়ে ওঠে সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গের লড়াই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এখানে গায়েন। ময়ূরপঙ্খী নৌকো এবং ডানদিকে মনসার একটি বেদী দিয়ে মঞ্চসজ্জার পরপরই তাই আমরা সোজা শুনি গায়েন-বায়েন, দোহারদের সমবেত কণ্ঠে বন্দনা। এখান থেকেই মূলত আমাদের নাটক শুরু, চম্পকনগরীতে আমাদের যাত্রারও শুরু !—

"পরথমে বন্দনা করি পূবে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর। আমরা বন্দনা করি গো।।" [৭]

বন্দনা শেষ হতে না হতেই গায়েন এর হাতে নাটকটির মূল সূত্র চলে যাচ্ছে। গায়েন এটাকে নিয়ে খেলতে নেমেছেন মঞ্চে। গোটা নাটকটির ভার গায়েন একা কাঁধে নিয়েই আমাদের সঙ্গে করে ঢুকছেন চম্পকনগরীতে। মাঝে মাঝে সুতলী ছেড়ে দিচ্ছেন নাটকের অনান্য পাত্র পাত্রীর উপর। আবার সুযোগ বুঝে ঠিক নিজের কাছে টেনে আনছেন সুতলী। বায়েন দোহাররাও তাকে সময় মতো সঙ্গ দিয়েছেন। গোটা নাটকটি এইভাবেই এগিয়েছে।

" আসেন গো বাবুমশাইরা, — আপনাগো আইজ একখান কিচ্ছা শুনাই ! মা মনসার চরণ বন্দনা করলাম, আপনারা নিশ্চয় বুইজ্যা লইছেন, আমি কোন কিচ্ছার কথা কইবার লইছি। আরে আপনারা অইলেন মাইন্যজন ! মোর কোন ভুলচুক নিজ গুণে ক্ষেমা করবেন গো। তা অইলে শুরু করি—। " [৮]

মনসা সাপের দেবী। এদিকে চান্দ সওদাগর মাঝিমল্লা নিয়া বাণিজ্য করতে যান। সওদাগর ভোলানাথের পূজারী। তার সাপের ভয়ডর নাই। মাঝিমল্লারা সাপের দেবী মনসাকে মান্যি করে। পুজো করে। এই মান্যি করার পেছনেও এক ইতিহাস আছে—

"তারা কয়, তাগোরে মোড়োলেরা কইয়্যা গেছে, সেই কবে— কোন কালে— তাদের বংশ রক্ষা করেছিল এই নাগমাতা জরুৎকারু । বাবু মশায়েরা তো জানেন ! মনসার আর এক নাম জরৎকারু। "[৯]

'মনসাকথা' নাটকে গায়েন এর 'বাবুমশায়েরা' সম্বোধনটুকু লক্ষ্যণীয়। ওঝা কিংবা গায়েন এরা প্রত্যেকেই সেই সমাজের যে সমাজ মনসাকে দেবী জ্ঞানে পুজো করে। মান্যতা দেয়। উল্টো দিকে নাটক দেখতে আসা দর্শকরা বণিক সমাজের কিংবা চান্দ সওদাগরের প্রতিনিধি অন্ততপক্ষে নাটক চলাকালীন সময়টুকু নাট্যকার খুব কৌশনে এভাবেই নাটক দেখতে আসা প্রত্যেক দর্শককেও 'মনসাকথা' নাটকটির এক একজন চরিত্র বানিয়ে তুলেছেন। দর্শকরাও যে কখন নাটকটি র ভেতর ঢুকে পড়েন সেটা খোদ দর্শকরাও টের পান না। এটাই নাট্যকারের মুন্সিয়ানা। এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়।

গায়েন মঞ্চে চান্দ সওদাগরের সাথে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয় করিয়ে দেন নাকি এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চোখের সামনে আয়না তুলে ধরেন ঠিক বোঝা যায় না। চম্পকনগরীতে বণিক সমাজে চান্দ যে কতটুকু প্রভাবশালী গায়েন তার বর্ণনা দেওয়া শুরু করেন এইভাবে—

"তার চৌদ্দ ডিঙা তরতরাইয়া বইয়া যায় — দেশে দেশান্তরে।" [১০]

শুধুমাত্র অর্থে-ধন-সম্পত্তিতে নয়,শারীরিক সৌন্দর্যে ও ব্যক্তিত্বেও চান্দ অন্য সব বণিকদের ছাড়িয়ে গেছেন। গায়েন চান্দ সওদাগরের রূপ ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা করেন এইভাবে—

"পূন্নিমার চান্দের মত তার উজল বরণ। ধ্বজদণ্ডের মত দীঘল শরীর। চক্ষির ইশারায় যেন জিলকির ঝিলিক। ভয় ডর বইল্যা কিচ্ছু নাই। সমাজে খাড়াইয়া যখন কথা কয়, তখন আরও পাঁচজন না মাইন্যা পারে না। " [১১]

চান্দ সওদাগর এবং মনসাকে নিয়ে লেখা প্রতিটি মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে এর নাট্যরূপেও একটি বিষয় বড় লক্ষ্যণীয়। মনসা একমাত্র শিবের পরমভক্ত চান্দ সওদাগরের কাছেই পুজো পেতে চাইছেন। মান্যতা পেতে চাইছেন। স্বীকৃতি আদায় করতে চাইছেন। অন্য কোনো বণিকের কাছ থেকে কিন্তু এটা চাইছেন না। বা অন্য কোনো বণিক কিংবা ভক্তের থেকে তাকে স্বীকৃতি আদায় করতেও দেবাদিদেব বলছেন না। আবার মনসার সমস্ত রাগ চান্দ সওদাগরের উপর হওয়া স্বত্ত্বেও তাকে কোনোভাবে শারীরিক আঘাত তিনি করেন না। যা আঘাত করছেন সবকিছু তার পুত্রদের উপর, তার ধনসম্পত্তির উপর। চান্দের সমস্ত দুর্বল জায়গার উপর আঘাত করে চান্দকে বাধ্য করতে চাইছেন তাকে পুজো দিতে। জোর করে ভক্তি আদায় করতে চাইছেন। এবং কিঞ্চিৎ হলেও শেষ পর্যন্ত আদায় করছেন। কিন্তু এতে প্রকৃতঅর্থে জয় মনসা থেকেও বেশি তার ছলাকলার হয়, তার গায়ের জোরের হয়,

কিন্তু মনের জোরের জয় হয় কি? ভক্তের উপর ভগবানের মনের জোরের জয় তো হয় না। এও এক অদ্ভুত রহস্য। অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' — এ আমরা দেখি মনসার জন্ম শিববীর্যে নাগলোকে হয়। নাগরাও মনসার জন্মের পর পুজো করেছেন। মান্যতা দিয়েছেন—

" পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী, পাইয়া মৃণাল সন্ধি,
পাতালে নামিল মহারস
পাইয়া পাতাল পুরী, জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা দেখিতে রূপস।।
বার্তা পাইয়া নাগরাজে, পাতালে বাজনা বাজে,
সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে।
যাহার যেই ব্যবহার, দিয়া বস্ত্র অলংকার,
বাড়াইয়া থুইল পদ্মবনে।। "[১২]

কিন্তু চাঁদ সওদাগর অনড়। তিনি কিছুতেই মনসার পুজা দেবেন না। এদিকে চাঁদ সওদাগর যেদিন সভা ডাকেন সেদিন লেংগা এসে খোদ চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকাকে মনসা পুজোর দায়ে অভিযুক্ত করে। লেংগা বলে, যে সওদাগর সমাজের মানুষদের নিদান দেয় সে তো নিজের ঘরও সামলাতে পারে না। তার ঘরের বউ-ই তো মনসাপুজো করে। সওদাগর এই কথা শুনে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেন না। মঞ্চে শুরু হয় টান টান উত্তেজনা। সওদাগর সনকার দু'হাতে ধরে রাখা ভারা লাঠি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। উত্তেজনা প্রশমিত হয়। ওদিকে গায়েন গেয়ে ওঠেন—

" ভাঙিল পূজার ঘট হেমতাল দিয়া।
ফেলিল ভিটার মাটি সমুদ্রেতে নিয়া।।
ঘর ভাঙি ফেলাইল দুঃখ গেল দূরে।
পঞ্চগব্য করিয়া সহকারে নিল ঘরে।।" [১৩]

শেখর দেবরায় এই নাটকটিতে পুঁজিবাদী ভোগবাদী শ্রেণির আরো ফুলে ফেঁপে ওঠার সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনে কি পরিমাণ বিপর্যয় নেমে আসে তারই প্রতিফলন দেখিয়েছেন। চান্দসওদাগর পুঁজিবাদী শ্রেণির প্রতিভূ। বাণিয়াতন্ত্র সর্বক্ষেত্রেই গোটা সমাজকে যেভাবে গোগ্রাসে গিলছে তারই একটি চিত্র নাট্যকার 'মনসাকথা' নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছেন। সাধারণ মানুষ দুটো পয়সার লোভে, পেটের তাগিদে পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে সর্বস্ব খুঁইয়ে ভয়ে আতঙ্কে অশান্তিতে দিনাতিপাত করে। তারা কামকাজ পায়, সুখও পায়। কিন্তু শান্তি পায় না। মনের প্রশান্তি পায় না। পুঁজিপতিদের কথায় তাদের উঠবস করতে হয়। 'মনসাকথা' নাটকে শেখর দেবরায় ১ম মাঝির মুখ দিয়ে সেই কথাগুলোই বলিয়েছেন, " বণিক্যেরা আইনের আগে, এই ঠাঁই তো

নগরী ছিল না। আমরা সহজ সরল মুখ্য সুখ্য মানুষ, জলা-জঙ্গলায় বড় অয়েছি, কষ্ট অইলেও মোদের দিন কেটেছে। এটা মানি, উত্তর দিশা থাইক্যা বণিক্যেরা আওনের পর এক এক বণিক্যের নামে এক এক ঘাট অইল! জেল্লা দেওয়া বাড়িঘর অইল! দেশ দেশান্তরে ডিঙ্গা আওন-যাওন ধরল। আমরাও কাম-কাজ পাইতি লাগলাম— এই পাওনের লোভে পইড়্যা আমরা মনের খুশিতে বণিক্যগোর মর্জি মতন পরাণ পাত কইরে ডিঙ্গার কাঁড়ার ধরেছি। দিন নাই- রাত নাই- কত ধন দৌলত এপার ওপার কেরেছি। তারপর— মোদেরও বুঝ বুদ্ধি হল, এজন সেজনের লগে কথা কইয়্যা বুঝলাম, নিজেগোর জানটা কার জন্য শেষ করছি! মোদের শরীরের ঘাম যত ঝরে— বণিক্যের দালান তত বাড়ে। হিসাব নিকাশের খাতাটা যখন খুলি— তখন দেখি, সওদাগরেরা পুন্নিমের চান্দের মত উজলা অইতেছে— আর আমরা যেন সব্বাই ঢাকা পড়্যে আছি অমাবস্যির আন্ধাইরে—। [১৪]

মেহনতী মানুষের মুখের কথা ১ম মাঝির মুখে আমরা শুনতে পাই। মনসা মেহনতী সাধারণ মানুষের প্রতিভূ। সওদাগর পুঁজিবাদীর। চম্পক নগরে মনসাপূজা নিষিদ্ধ বলে ট্যাঁড়া দেন সওদাগর। সাধারণ মানুষের মনে সুখ নাই, কণ্ঠে গান নাই। এরই মাঝে গায়েন নাটকের সুতলী চম্পকনগরীর পাত্র পাত্রীদের থেকে আবার তার নিজের হাতে নিয়ে নেন। দর্শকদের উদ্দেশ্য করে গায়েন বলতে থাকেন—

'অহংকারী চান্দ সাধু করে নানা ছল।
অধিক পদ্মার সঙ্গে বাধিল কোন্দল।।
রাত্রি দিন গালি পাড়ে কোপ অহংকারে।
কোপ মনে বেড়ায় চান্দ সাপ পাইলে মারে।।
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ পথে দিল থানা।
চম্পকনগরের মধ্যে পূজা করল মানা।।
মহাদেবের কন্যা পদ্মা সবে করে ভয়।
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মুখে লয়।।
অভিমানে বলে পদ্মা কি করি উপায়।
লঘুতর ভৎর্সনা আর সহন না যায়।। [১৫]

লখিন্দরের প্রাণনাশ, বেহুলার লখিন্দরকে ফিরিয়ে আনা, চান্দ সওদাগরের বাঁ হাতে মনসাকে পুজো দেওযার মধ্য দিয়ে 'মনসাকথা' নাটকটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নাটকটির শেষ পর্বে টান টান উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে নাট্যকার সক্ষম হয়েছেন। মূলত গায়েনের হাতেই তখন নাটকটির লাগাম দিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। গায়েন যতটুকু পাকা, যতটুকু পটু হবেন গোটা নাটকটিও ততই আকর্ষণীয় হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই 'মনসাকথা' যতটুকু চান্দ সওদাগর ও মনসার, তারও অধিক গায়েনের। গায়েনই এই নাটকের মুখ্য ও একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র।

'মনসাকথা' নাটকটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে অসংখ্যবার। অভিনীত হয়েছে বাংলাদেশেও। মনসা পূর্বভারতের লৌকিক দেবী। বরাক উপত্যকায় তার নাম বিষরি বা বিষহরি। মনসার এই বিষহরি নামের পেছনের একটি ইতিহাস আছে। লোকসংস্কৃতির গবেষক শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু ভট্টাচার্য তাঁর "মনসামঙ্গল কাব্য: নাগ ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে" প্রবন্ধে বিষহরি সঙ্গে আমাদের জানাচ্ছেন যে— " মহাভারতে বিষহরি একটি বিদ্যার নাম, ব্রহ্মা কশ্যপকে এই বিদ্যাদান করেছিলেন। (আদি. ১৬।১৬)। নাগরা বিষের ব্যবহার এবং বিষ চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন। তক্ষক নাগ প্রেরিত তপস্বীর বেশধারী নাগদের দেওয়া বিষাক্ত ফল খেয়ে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছিল। ভীমের বলবীর্যে ভীত দুর্যোধন তাকে হত্যা করার জন্য কালকূট মিশ্রিত খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন। বিষক্রিয়ায় চেতনাহীন ভীমকে দুর্যোধন লতা দিয়ে বেঁধে জলে ফেলে দেন। ভাসতে ভাসতে অচেতন ভীম নাগলোকে উপনীত হলে নাগ বালকেরা বাসুকি নাগকে গিয়ে বলল,

অয়ং নরো বৈ রাজেন্দ্র! অপ্সু বদ্ধা প্রবেশিত:।
যথা চ নো মতির্বীর। বিষোপীতো ভবিষ্যতি।।
(আদি.১২৩।৪৭)

(মহারাজ! আমাদের মনে হয় লোকটি বিষপান করেছিল। এরপর কোন লোক একে বেঁধে ফেলে দিয়েছিল) বালকদের কথায় বাসুকি সেই লোকটিকে দেখতে গেলেন এবং তার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। কারণ ভীমের মাতামহ কুন্তীভোজ ছিলেন বাসুকির দৌহিত্র। সাত দিন নাগলোকে থাকার পর অষ্টম দিনে ভীম অলৌকিক ও মঙ্গলকর জলে স্নান করে বিষনাশক সুগন্ধি ঔষধের সঙ্গে নাগদের দেওয়া উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে অমিত বলবীর্যের অধিকারী হয়েছিলেন।"[১৬]

যে কোনো নাটক নিয়ে কথা বলতে হলে সেই নাটকটির মঞ্চাভিনয় দেখাটাও নাটকটি পড়ার সাথে সমান প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। 'মনসাকথা'ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। নাট্যকার শেখর দেবরায়ের থেকে আমরা এটা জানতে পারি যে এই নাটকটি কম করেও ষাটবার বিভিন্ন ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে। কাহিনি বিন্যাসেও বেশ কয়েকবার ছোট বড় পরিবর্তন এনেছেন। ফলে একজন দর্শকের সাথে অন্য আরেকজন দর্শকের একই নাটক দেখার মধ্যে দৃষ্টিগতভাবে কিছুটা হলেও পার্থক্য থাকবে। তাছাড়া মঞ্চসজ্জা, আলো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক, নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত সামগ্রীও নাটকের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সবকিছু পরিমাণ এবং পরিমাপ মতো হলেই একটি সফল নাটকের জন্ম হয়। ফলে সব মঞ্চে একই মানের নাটক উপহার দেওয়ার ক্ষমতা একা নাট্যকারের হাতে থাকে না। এ কথাটিও আমাদের স্মরণে থাকুক। নাট্যকারকে এক্ষেত্রে অনেকটাই অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয়। দেশের অন্যান্য জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ করার এ এক অন্যতম প্রতিবন্ধকতাও বটে। 'মনসাকথা' নাটকটির একজন অন্যতম দর্শক অমিতাভ দেব চৌধুরী নাটকটি নিয়ে তাঁর 'মনসা কথা: প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে জানাচ্ছেন,"

"নাটকটি যেন এক তর্ক— নাট্যকারের নিজের সঙ্গেই নিজের। সবচেয়ে বড় তর্ক অবশ্য গড়ে ওঠে মনসামঙ্গলের প্রচলিত বা মূল পাঠটির সঙ্গে শেখরের নিজস্ব পাঠটির। সুতরাং, যে দর্শক নাট্যকারের ব্যাখ্যাকে মেনে নেবেন না, তাঁরও তর্ক লিপ্সা এতে উস্কে যাবে। তিনিও বাধ্য হবেন নাট্যকারের সঙ্গে মনে মনে , কিংবা তাঁর নিজেরই মনের সঙ্গে এক তর্কে জড়িয়ে পড়তে। এখানেই নাটকটির চূড়ান্ত সার্থকতা। কাহিনির স্তরকে ছাপিয়ে উঠে এক প্রাণময় তর্কের স্তরে দর্শককে নিয়ে যেতে পারে সে। অভিনয়ও, এ ধরণের নাটকে, কেবলমাত্র বাস্তবতার মুদ্রা ও অনুকরণ মাত্রই হয়ে থাকে না। শরীর এবং নৈ:শব্দকে (মূকাভিনয় স্মর্তব্য) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজে লাগিয়ে শেখরের অভিনয়শৈলী নির্মিত। মূর্ত এবং বিমূর্তের দ্বন্দ্বময়তা তাঁর অভিনয়কে যেন প্রায় এক ritual-এর পর্যায়ে নিয়ে যায়।" [১৭] এই নিয়ে যাওয়াটাই 'মনসাকথা'কে আর পাঁচটা নাটক থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। দর্শকদের কাছে আরো বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. মলয় দেব সম্পাদিত 'শেখর দেবরায়ের লোক ঐতিহ্য আশ্রিত দুটি নাটক 'মনসা কথাও রইদ রাজার কিচ্ছা'। পৃষ্ঠা নং -১৩

২. কৃত্তিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত , দেব সাহিত্য কুটীর, পুনর্মুদ্রণ-২০২২, উত্তরকান্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫৭৩-৫৭৪।

৩. 'চাঁদ বণিকের পালা', শম্ভু মিত্র। এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রকাশক শমিত সরকার। প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৪। পৃষ্ঠা নং - ২৪

৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪৮ । ৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং - ৪৮

৬. মলয় দেব সম্পাদিত 'শেখর দেবরায়ের লোক ঐতিহ্য আশ্রিত দুটি নাটক 'মনসা কথাও রইদ রাজার কিচ্ছা'। পৃষ্ঠা নং -২৭

৭. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৫ । ৮. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৬ । ৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৭

১০. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৭ । ১১. ৯. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ১৮

১২. কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল। শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য বি.এ. (সঙ্কলক), সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪২, পৃষ্ঠা নং-৭

১৩. মলয় দেব সম্পাদিত 'শেখর দেব রায়ের লোক ঐতিহ্য আশ্রিত দুটি নাটক 'মনসা কথাও রইদ রাজার কিচ্ছা'। পৃষ্ঠা নং -২৪

১৪. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ২৬ । ১৫. তদেব। পৃষ্ঠা নং- ২৮

১৬. সর্প-সংস্কৃতি ও মনসা , সম্পাদনা - অঞ্জন সেন, শেখ মকবুল ইসলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

১৭. মনসাকথা, শেখর দেবরায়। 'মনসাকথা: প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা', প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০২। পৃষ্ঠা নং- ৪৯।

লেখিকা : **ড. সুতপা চক্রবর্তী, গবেষক, শিলচর, আসাম।**

Author : **Dr. Sutapa Chakraborty, Scholar, Silchar, Asam.**

বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম আধুনিক নাটককার মধুসূদন দত্ত

■ অহীনা দে

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বিশিষ্ট লেখকের লেখনীর স্পর্শে বাংলা সাহিত্য ধন্য হয়েছে তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫.০১.১৮২৪-২৯.০৬.১৮৭৩)। তিনি একাধারে কবি, অন্যদিকে নাটককার ও প্রহসন রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের দ্বার তিনিই উন্মোচন করেন। বাংলা নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়া এনেছিলেন।

বাংলা নাট্যমঞ্চে মধুসূদনের আবির্ভাব কিছুটা আকস্মিকভাবেই। শ্রীহর্ষ রচিত 'রত্নাবলী' ইংরাজী অনুবাদের সূত্রেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাথে যুক্ত হন। এই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই মধুসূদন নাট্যজগতে পদার্পণ করেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক অনুদিত শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকটির অভিনয় দেখে তিনি বিরক্ত হন। এই বিরক্তি থেকেই নিজেকে বাংলা নাটক রচনায় নিয়োজিত করেছিলেন। যদিও মাদ্রাজে থাকার সময় 'Rizia' নামে একটি ইংরাজি নাটক লেখেন, কিন্তু নাটকটি ছাপা হয়নি। 'রত্নাবলী' নাটকটি অভিনয়ের জন্য পাইকপাড়ার দুই ভাই রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। মধুসূদন নাটকটি দেখে এসে প্রিয় বন্ধু ও বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক গৌরদাস বসাককে বললেন- 'রাজারা একটা হতচ্ছাড়া নাটকের জন্য কত টাকাই না খরচ করেছেন। একথা যদি আগে আমার জানা থাকত তাহলে তোমাদের থিয়েটারের উপযোগী কিছু দিতে পারতাম।' মধুসূদনের বাংলা ভাষার প্রতি দখল কম বলেই গৌরদাস বসাক তাঁর কথায় গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাস বসাককে একটি পত্রে লেখেন, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে যাঁর এত অধিকার তিনি মাতৃভাষায় চর্চা করলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে। তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুমতি পেয়ে তিনি কিছুদিনের মধ্যে লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি (১৮৫৯)। নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক। সমসাময়িক নিকৃষ্ট মানের যাত্রাগান ও নাটকের দূরবস্থা মধুসূদনকে নাটক রচনায় প্রেরণা দেয়, অলীক নাট্যরঙ্গে ব্যথিত হয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকার লিখেছেন-

'অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

মহাভারতের প্রসিদ্ধ যযাতি-শর্মিষ্ঠা - দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। পাঁচ অঙ্কের তেরো গর্ভাঙ্কের এই নাটকটি মধুসূদন মেয়ের নামে নাটকটির নামকরণ করেছিলেন। নামকরণ 'শর্মিষ্ঠা'র নামে হলেও শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি ততটা সজীব হয়ে উঠতে পারেনি, বরং দেবযানীর চরিত্রই অধিকতর গুরুত্বলাভ করেছে। নাট্যশিল্পের

প্রয়োজনে মহাভারতের কাহিনির পরিবর্তন সাধন করেছেন মধুসূদন। নাট্যকার নাটকে ভারতীয় আলংকারিক রীতি অনুসরণ না করে পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণ করেছেন। তাই কাহিনি উপস্থাপনে শেক্সপিয়র কথিত পঞ্চসন্ধি রীতি মান্য করা হয়েছে। তবে মধুসূদন প্রাচ্য প্রভাব একেবারে বর্জন করতে পারেননি। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তিনি সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবনা এবং উপসংহার-গীত সংযোজন করেছিলেন, যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। কাহিনির গ্রন্থনায়, চরিত্র-চিত্রণে, এমনকি কথোপকথনেও মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের বিশেষত কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী 'শর্মিষ্ঠা' নাটকেও বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর নাটকটি প্রথম বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। ১৮৫৯-র ২১শে সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক পত্রে গৌরদাস বসাককে লেখেন- 'The representation of the drama of Sharmistha has come off gloriously. Night before last was the sixth of last night of its performances. [১] সেই সময়ে মাত্র ২২ দিনের ব্যবধানে একটি নাটকের ছয়বার অভিনয়ের কথা ভাবাই যায় না। বোঝা যায়, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

'শর্মিষ্ঠা'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকটি (১৮৬০) লিখেছিলেন। নাটকের কাহিনি নেওয়া হয়েছে গ্রীক পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্প 'Apple of Discord' থেকে। সৃজন শক্তির গুণে নাট্যকার নাটকটিতে গ্রীক পুরাণকে ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। গ্রীক নাটকের জুনো, ভেনাস, প্যালাস, প্যারিস ও হেলেন যথাক্রমে শচী, রতি, মুরজা, ইন্দ্রনীল ও পদ্মবতী চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। 'ডিসকর্ডিয়া' নারদ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। পাশ্চাত্য নাটক অনুসরণে নাট্যকার নারদ চরিত্রটিকে খলনায়করূপে উপস্থাপিত করেছেন। তবে নাটকের চরিত্রগুলির নামকরণ ভারতীয় রীতি মেনেই করেছেন। এই নাটকে সংস্কৃতের প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। সংস্কৃতের ধারা অনুসরণ করে শৃঙ্গার বা প্রেম-রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র বর্ণনার দিক থেকে তিনি কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন। 'পদ্মাবতী'র ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকী ও সখীর কথোপকথনের সঙ্গে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র ষষ্ঠ অঙ্কের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীলের বিরহ - দুঃখের বর্ণনায় কালিদাসের নাটকের ছাপ স্পষ্ট। ভাষাও সংস্কৃতানুগ। এই নাটকে মধুসূদন কলির উক্তিতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন। 'পদ্মাবতী' নাটকটি অভিনয় করতে বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসেনি। ফলে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর বৌ বাজারে বাবু রাজেন্দ্র দত্ত-র বাড়িতে।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দেই মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি রচনা করেন। দুটি প্রহসনই সামাজিক প্রহসন। প্রহসন দুটি রাজাদের অনুরোধেই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ ও পৃষ্ঠপোষকের প্রবল আপত্তিতে প্রহসন দুটি অভিনীত হয়নি। প্রথম প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ইংরেজিতে শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক যুব সমাজের পানাসক্তি, লাম্পট্য, কুকীর্তি,

ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা ইত্যাদি দিকগুলিকে তীব্র ব্যঙ্গ -বিদ্রুপ করা হয়েছে। তারা স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বার্থপরতা, মদ্যপানে আসক্তি, বারাঙ্গনা-বিলাসী, ও নৈতিকতাহীন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়কার সমাজজীবনের জীবনাদর্শের অভাব মধুসূদনকে এই প্রহসন রচনার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। কাহিনির ধারাবাহিকতা না থাকলেও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের একটি সার্থক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রহসনটি প্রথম ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শোভাবাজার নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয়। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকো থিয়েটারেও এর অভিনয় হয়েছিল। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' -এ রামগতি ন্যায়রত্ন এই প্রহসনকে বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুই অঙ্ক ও দুই গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অধিপতিদের ধর্মের নামে ভন্ডামি, লাম্পট্য, নারীলিপ্সা ও নানা ব্যভিচারকে এই প্রহসনের মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়েছে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায়। প্রথম সংস্করণে প্রহসনের পূর্বনাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। পাইক পাড়ার রাজাদের অর্থব্যয়ে প্রহসনটি মুদ্রিত হয়। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অধিপতিদের তীব্র ব্যঙ্গ করার ফলে প্রহসনটি মঞ্চস্থ হয়নি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল, 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হলে সমাজের যুবসমাজ খেপে যাবে এবং নাট্যশালা আক্রান্ত হতে পারে আর 'বুড়ো' শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চস্থ হলে সমাজের মূল অধিপতি ব্রাহ্মণ সমাজ বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠবে। ফলে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ থেকে যুবসমাজ কেউই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাটক দেখতে আসবে না। এই সমাজিক ও আর্থিক ঝুঁকি তাঁরা নিতে চাননি।

মধুসূদনের রচিত তৃতীয় নাটক হল 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajathan' গ্রন্থের এক করুণ কাহিনিকে নাটকের বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রাণা ভীমসিঙ্ঘের কন্যা অপরূপ সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন জয়সিংহ ও মানসিংহ। যিনি ব্যর্থ হবেন তিনি ভীম সিংহের রাজ্যকে আক্রমণ করবে বলে ভয় দেখান। কন্যা স্নেহ ও রাজ্য রক্ষা -কোনটাকে বেছে নেবেন তা নিয়ে ভীম সিংহ যখন গভীরভাবে চিন্তিত তখন কৃষ্ণকুমারী বিষপানে আত্মহত্যা করে পিতা ভীমসিংহ ও রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিলেন। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটির মূল কাহিনি ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও নাট্যকার নাটকটিকে রোমান্টিক ট্র্যাজিক রূপ দিয়েছেন। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক। এই নাটকেই নাট্যকার প্রথম পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করেছেন। রাজভ্রাতা ও সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহকে শেক্সপীয়রের 'King' নাটকের বাস্টার্ড চরিত্রের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আবার প্রাচ্য প্রভাব ও লক্ষ্যণীয়। যেমন কৃষ্ণা চরিত্রে শকুন্তলার প্রভাব রয়েছে। মধুসূদন জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, 'কৃষ্ণকুমারী'

নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবতঃ মৃচ্ছকটিকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। '[২] কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নাটকটি উৎসর্গ করা হয়। এই নাটকটিও বেলগাছিয়া নাট্যশালাতে অভিনীত হল না। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'তে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ের পর ১১ই ফেব্রুয়ারীতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছিল, 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এরপর নাটকটি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত একটি নাটক হল 'মায়াকানন'। রোগশয্যায় থাকাকালীন তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। কিন্তু নাটকটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত নাটকটিকে পৌরাণিক নাটক রূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। 'কৃষ্ণকুমারী'র সাথে এই নাটকে সাদৃশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। রাজকুমারী ইন্দুমতীর চরিত্র কৃষ্ণকুমারীর আদলে রচিত হয়েছে। সুশীলতা, ধর্মপরতা, সংযম ও সারল্য চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে।

লক্ষ্যণীয় বেলগাছিয়া নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাটককার মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটে। আবার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাঁর 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকে ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত না হওয়ায় নাটক লেখা ছেড়ে দেন। অর্থাৎ বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তাঁর অপমৃত্যু ঘটে। মধুসূদন দত্ত তিনটি তিন ধরনের নাটক ও দুটি প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভিতকে কিন্তু মজবুত করে যান। কেননা তিনি যখন নাটক লেখা শুরু করেছেন তখন বাংলা নাটকের ভিত মজবুত ছিল না। মধুসূদনের পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ নাটককারদের নাটকগুলি ছিল একেবারে সংস্কৃত ঘেষাঁ পুরাতন ধাঁচের। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোবশী'(১৮৫৭) ইত্যাদি নাটকগুলির মধ্যে আধুনিক নাট্যলক্ষণ কিছুমাত্র ছিল না। মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে দূরে সরে গেল। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম আধুনিক নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন মধুসূদন দত্ত।

তথ্যসূত্র -

১) আচার্য ড. দেবেশ কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', 'ইউনাইটেড বুক এজেন্সি', প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা , ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, প--৩৫৯।

২) ঐ, পৃ-৩৬৪।

লেখক : **অহীনা দে, স্নাতকোত্তর ছাত্রী।**

Author : **Ahina Dey, Student.**

অসমিয়া বেতার নাটক

প্রসঙ্গ ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার 'শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট'

■ জাহ্নবী দাশ

যেহেতু ছোটদের মন ভীষণ নরম-সরম, যেমন খুশি তাদের গড়ে তোলার একটা সুযোগ থেকেই যায়। এই মন ও চিন্তন সঠিকভাবে গড়ে তোলার অনেকটা দায়িত্ব বর্তায় শিশু সাহিত্যের ওপর। কিন্তু আমরা মারাত্মক ভুল করব যদি ভাবি যে শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ বিতরণ। সাহিত্যরসের উপস্থিতি সেখানে থাকতেই হবে। কারণ আনন্দ রসের সঞ্চার হয় এই সাহিত্যরসের হাত ধরেই। সাহিত্যের রস, ভাব বা বিষয় উপভোগে তারতম্য আসতেই পারে বয়স হিসেবে, কিন্তু তার সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার একটা ক্ষমতা থাকা চাই, " যথার্থ শিশু সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব বয়সের নর-নারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়, বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে-- কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মত শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবেই।"[১] ছোটদের পৃথিবীটা যেহেতু বড়োদের মতো কুটকাচালিময় নয়, তাই তাদের বিশ্বাসের জগতটাও অত্যন্ত গভীর। নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুন তাদেরও আছে। বড়োদের চেয়ে আলাদা হলেও যুক্তি বা বুদ্ধি তাদের নেই এটা ভেবে নেওয়াটা মারাত্মক অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। ছোটদের বিশ্বাসটাকে ধরে রাখতে চাইলে যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হল সেই বিষয়ের ওপর লেখকের বিশ্বস্ততা। শিশু পাঠকের সেই বিষয়ের সঙ্গে কমিউনিকেট করাটা চাইই-চাই। তাই দেখি ছোটা ভীমের পাকামি থেকে ঘুমকাতুরে নবিতার আলসেমি বা শিনচ্যানের দূরন্তপনায় শিশুমন তো বটেই, আমরা প্রাপ্তবয়স্করাও আকৃষ্ট হই অনেক বেশি। শিশু বা কিশোরকে তার সমস্ত দোষগুণ নিয়ে সাহিত্যে তুলে ধরাটাই কঠিন। এখানে গোঁজামিলের কোন অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আমরা যেমন উল্লেখ করতে পারি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'র, অসমিয়া শিশু সাহিত্যে তেমনি তুমুল উপস্থিতি ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার।

অসমিয়া শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি চিহ্নিত অধ্যায় ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া। রসিকতাবোধ তাঁর বড়ো শক্তি, হাসি মজা আর কৌতূকের অপূর্ব পরিবেশনায় অসমিয়াদের শৈশব-কৈশোরকে রাঙিয়ে তুলেছেন তিনি। ১৯৪৭ সালে 'উদয়' পত্রিকায় 'পথ নিরুপম' গল্প দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের শুরুয়াৎ। তবে রামধনু যুগের স্বনামধন্য এই গল্পকার উপন্যাস এবং নাটক রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অসমিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রান্তিক' তথা কিশোর পত্রিকা 'সঁফুরা'র প্রতিষ্ঠাপক সম্পাদক ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া। 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল', 'সন্ধ্যারাগ',' অনির্বাণ' এর হাত ধরেই আমূল পাল্টে যায় অসমিয়া সিনেমা। চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন বলেই একটা সহজাত পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তাঁর। ক্যামেরার

পিছনে থেকে গোটা ফিল্মকে যেভাবে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা ছিল, ঠিক তেমনি লেখক হিসেবেও দৃষ্টি ছিল ছোট বড়ো প্রত্যেকটি জিনিসের উপর। শিশু মনস্তত্ত্বটা বরাবরই ভালো বুঝতেন ড. শইকিয়া। 'মর মর দেউতা' উপন্যাসে 'বুঢ়া যাওক, তার পাছত মই তক কি করোঁ চাইল। মোতকৈও তোর চুলি চুটি হৈ যাব চাই পাকিবি"২ উক্তিতে বিপুলের যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে তিনি তুলে ধরেছিলেন, "শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহা দুষ্ট" নাটকে তাই শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। ছোট্টপ্রাণের অপরাজেয়তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমার রায়ের মতই। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তিনি কখনো ভুলেননি যে তিনি তত্ত্ববিদ নন, মতাদর্শ প্রচার করতেও আসেননি। তাই 'ছোট্ট সোনা বন্ধু'রা মার্কা ন্যাকামি দিয়ে শিশু কিশোরদের মন ভোলানোর তাগিদে তাঁর কলম ধরা নয়। পূর্বসূরীদের ছক বাঁধা পথে ড. ভবেন্দ্রনাথ শুরু থেকেই হাঁটতে অস্বীকার করেছেন।

'চেমনিয়া নাট' বা শিশুদের নাটকে, বলা ভালো যে কোনো শিশু সাহিত্যেই রয়েছে রাজপুত্র,রাজকন্যা কোটাল, মন্ত্রী, রাক্ষস-খোক্ষস, হাতি ঘোড়া, বাঘ-ভালুক বা অপ্সরাদের কাহিনি। এখানে দাঁড়ি টেনেছেন ভবেন্দ্রনাথ। ১৯৭৯ সালে রচিত আলোচ্য নাটকে আমরা তাই শুনলাম দেখলাম জানলাম কচি মন মাত্রেই মারাত্মক রকম কৌতূহলী। তারাও যথেষ্ট বোঝে। তাদেরও মতামত রয়েছে। চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকতাকে তারা পরোয়া করে না খুব একটা। রুণি, বাপু, মনু, আর ভুলু সেই শিশুমনেরই বহি:প্রকাশ । শৈশবের নিষ্পাপ দুষ্টুমি, উপস্থিত বুদ্ধি, হাসি-ফূর্তি, নিজস্ব চিন্তা নিয়ে এই নাটক রচনার ৪৪ বছর পরেও একেবামেদ্বিতীয়ম্। গুয়াহাটি বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত নাটকটি তুমুল জনপ্রিয় হওয়ার দরুণ বহুবার গুয়াহাটি তথা ডিব্রুগড় কেন্দ্র থেকেও সম্প্রচারিত হয়। ধ্রুবজ্যোতি শর্মা 'শিশু সাহিত্যিক ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া' প্রবন্ধে যথার্থ বলেছেন, "শান্ত শিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহা দুষ্ট'র পাছত এনেকুয়া দ্বিতীয় এখন শিশু উপযোগী অথচ ডেকা গাভরু বুঢ়া-মেথা সকলোয়ে শুনি ভালপোয়া নাটক আমি আরু রেডিওত শুনিবলৈ পোয়া নাই।"[৩] এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো অসমিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে বেতার নাটকের। প্রায় চার হাজার বেতার নাটক রয়েছে অসমিয়া ভাষায়। সত্যপ্রসাদ বরুয়ার 'ধরালৈ যিদিনা নামিব সরগ'(৬ জুলাই, ১৯৪৮) গুয়াহাটি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক।

মঞ্চে অভিনীত বা পাঠ্য নাটকের সঙ্গে বেতার নাটকের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে বেতার নাটক মুহূর্তের জন্য শিথিল হলেই শ্রোতা অন্য একটি বেতার কেন্দ্রে মনোনিবেশ করে ফেলেন। বেতার নাটক যেহেতু শ্রব্যশিল্প তাই এর শৈলী ও উপস্থাপনা সাধারণ নাটক থেকে অনেকটাই আলাদা। নাটকের পটভূমি তথা perspective কণ্ঠস্বর, নাটকীয় উৎকণ্ঠা, সংলাপের সরলতা অথচ মিতব্যয়িতা, আবহ সঙ্গীত, সাউন্ড এফেক্ট ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা নাট্যকারের অবশ্যই থাকা চাই। চলচ্চিত্র নির্দেশক ছিলেন বলেই ভবেন্দ্রনাথকে যেমন বহুলোকের সঙ্গে মিশতে হতো, তেমনি ছবির শুটিং হতো নানান জায়গায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ

জিনিসকে মনে রাখার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আটপৌরে লোকগুলি -- দুদুলের মা, প্রভাকর চৌধুরী, পূর্ণিমা মাসী, মামনি দত্ত, ছোট পিসি, রুমি, বাপু, ভুলু, মনু তাঁর নাটকে জায়গা করে নিয়েছে। একই সঙ্গে নিজস্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিয়ে ধরা দিয়েছে অসমের সংস্কৃতি, অসমিয়াদের যাপন চিত্র। ধর্মীয় রীতিনীতি, সংস্কার থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই এড়িয়ে যান নি নাট্যকার। ড. শইকিয়ার পরিশীলন, তাঁর পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল' ইত্যাদি সিনেমায় যেমন রয়েছে, তেমনি উপলব্ধ হয়েছে এই নাটকেও। সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূক নাটকটির বড়ো সম্পদ। বাক্যগুলি অনতিদীর্ঘ ও নিরলংকৃত। এবং যেটা সবচেয়ে অনবদ্য সেটা হলো অতি নাটকীয়তার অভাব। Sensational বা melodramatic ব্যাপারটা অপছন্দ ছিল তাঁর। সংলাপের মধ্য দিয়ে কোন মানুষ কোন ঘটনা বা অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছেন যতটুকু দরকার। রুণি, ভুলু, মনু, বাপুদের বয়সি ছেলেমেয়েরা যে ভাষায় কথা বলে ঠিক সেই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। যাদের প্রত্যক্ষ শ্রোতা বা পাঠক হিসেবে নিয়েছেন তিনি , সেই কিশোরদের সঙ্গে তাঁর কমিউনিকেশন এর ফলে বেড়ে গেছে অনেকখানি। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি,

(ক) "মই চিকটিব নোয়ারোঁ বুলি ভাবিছ নেকি?"[৫]
(খ) "মই পাইছোঁ, ভরি ধুবলৈ লৈ গৈছোঁ। কার ছেন্ডেল মই কি জানো!"?
(গ) " রুণি: হাফবয়েল কণীত বোলে বেছি জোর থাকে।
মনু: ছে: ! পেলপেলিয়া !
ভুলু: শেঙুনর নিছিনা।"[৬]
(ঘ) " ধরিম রবি। আয়ু ! বা ! ইমান জোর !"[৭]
আর এভাবেই অসমিয়া শিশু সাহিত্যের সিলেবাসের বাইরে বেরিয়ে আসেন ভবেন্দ্রনাথ।

'শান্তশিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট' শিশু নাটকটি সাতটি খন্ডে বিভক্ত। নাটকের প্রথম খন্ডে ছুটির দিনে বাড়ির পাশের জুবিলি পার্কের সামনের রাস্তা দিয়ে যে গাড়িগুলো আসা-যাওয়া করছিল খেলার ছলে তাদেরই নম্বর নোট করছিল মনু, বাপু আর ভুলু। অনেকটা মেমরি গেমের মতো । ঠিক তখনই একটি গাড়ি এক পথচারীদের ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। যদিও ততো সময়ে সেই গাড়ির নম্বর নোট করে নিয়েছে বাপু। ঘটনাচক্রে গাড়িটি ছিল আয়কর বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার মৃগেন্দ্রকুমার কলিতার। তিনি জানতেন পুলিশের কাছে বাপুরা তার গাড়ির নম্বর দিয়ে দিলে তিনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই বাপুর বাবা প্রভাকর চৌধুরীকে বাড়ি এসে শীতল গলায় হুমকি দিতে একটুও পিছুপা হননি।" মুঠতে চৌধুরী, আপুনি ল'রা দুটাক বুজাই ক'ব। সরু সরু ল'রা -- এইবোর লেঠার মাজলৈ আহিব নালাগে। আরু লেঠাটো অকল সহঁতরে নহব। লেঠা আপনারো"।[৮] চাকরি ক্ষেত্রে অহেতুক ঝামেলা অবশ্যম্ভাবী জেনেও কিন্তু প্রভাকর চৌধুরী ছেলেদের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। খুব সহজ করেই বাবারা যেমন সন্তানকে বুঝিয়ে থাকেন ঠিক সেভাবেই

মনুর কাঁধে হাত রেখেছেন,“ নালাগে মনু! তই মিছা কথা ক'ব নালাগে। তই যি দেখিছিলি তাকে কবি, যি লিখিছিলি তাকে দেখুয়াবি”।[৯]

বাপু আর ভুলুর লেখা কাঠের গুঁড়োর মোরব্বার রেসিপিটি গৃহলক্ষ্মী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রুণি আর ভুলুর মায়ের নামে। দ্বিতীয় খণ্ডের গল্প এই নিয়েই। পত্রিকাটি হাতে এলে স্বাভাবিকভাবেই রেগে যান ভুলু আর রুণির মায়েরা। পত্রিকাটির সম্পাদককে একটা বিহিত ব্যবস্থা নেবার জন্য চিঠিও লেখেন। যেটি পোস্ট করার দায়িত্ব ছিল ভুলুর। কিন্তু ভুলু সেই চিঠি পোস্ট করেনি। ইতিমধ্যে সেই রেসিপিতে মুগ্ধ হয়ে আটজন পাঠক লেখিকাদ্বয়কে চিঠি লেখেন। মনু আর রুণির মায়েদের রাগ তখন গলে জল। একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে মনু তার মাকে বলে, “ অ মা, রচনাখন বাপু হতে লিখিছিল বুলি এতিয়া তঁহতে সম্পাদিকালৈ এখন চিঠি নিলিখ কিয়? তেতিয়াহে আমি তহঁতক ভাল মানুহ বুলি জানিম।”[১০] মনুর মা আশ্বাস দেন, “ লিখিম দে মনু। কাইলৈকে লিখিম।”[১১] আসলে ভবেন্দ্রনাথের স্টাইলটা কোনদিনই চিৎকৃত ছিল না শিশু মনস্তত্ত্বটা খুব ভালো বুঝতেন বলেই তত্ত্ব উপদেশের পথ দিয়ে তিনি হাঁটেন নি। আর ঠিক সেইজন্যেই মনু বাপুদের বাবা-মায়ের এই সহজতা তাদের ছেলেদের সততার প্রতি থাকা বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে স্বাভাবিক ছন্দে।

বাপুদের বাড়িতে বেড়াতে আসা ছোটপিসির মানিব্যাগ হারিয়ে যাওয়া নিয়েই ভবেন্দ্রনাথ লিখেছেন নাটকের তৃতীয় খন্ডটি। দাদা বৌদির কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই ছোটপিসি ইচ্ছে করে নিজের মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলেন। বাড়ির কিছু হারালে সবসময়ই প্রথম সন্দেহ করি কাজের লোকটিকেই। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি আপা-- বাপুরই বয়সী যে ছেলেটা তাদের বাড়ীতে কাজ করতো, চোর সন্দেহে গৃহকর্তা তাকে যথেষ্ট মারিপিট করেন। বাপু বা মনু ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। প্রকৃত সত্য জানার পর মনু সরাসরি তার বাবাকে প্রশ্ন করেছে, “ আপনালোকে বস্তু এটা হেরালেই প্রথমতে চাকরটাকে কিয় ধরে? সি নিছে নে নাই, সেইটো ঠিক নোহায়াকৈ কিয় তাক ইমান মারে? যদি খাবলৈ নাথাকিলহেঁতেন তেনেহলে ময়োতো কারোবার ঘরত চাকর হলোহেঁতেন-- এনেকৈ মার খালোহেঁতেন।” [১২]

মিলনপুরে বেজবরুয়া রোডের বড়ো চারআলির পাশে সরস্বতী পূজো করার বাপুদের উদ্যোগ নিয়ে লেখা নাটকটির চতুর্থ খণ্ড। স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে পাড়াতেও একটা পুজো হোক, বাপুদের খুব ইচ্ছে ছিল। চাঁদার বই ছাপানো থেকে চাঁদা তোলা, ডাইরিতে সমস্ত তথ্য লিখে রাখা- - কাজ চলছিল ভালোভাবেই। আর তখনই বিজয় সহ বাপুদের দলের কয়েকটি ছেলে চাঁদার টাকা নিয়ে কারচুপি শুরু করে। বাপুরা চাঁদা তুলতে গেলে এক ভদ্রলোক তাদের সন্দেহ করে বসেন, “ জানো ! তোমালোকে পইচাবোর তুলি কি করিছা ঠিক নাই”। [১৩] খুব কষ্ট হয় বাপুর। সরস্বতী পুজো করার প্ল্যানটাই ভেস্তে যায়। সে সিদ্ধান্ত নেয় যাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছিল বৃত্তির টাকা দিয়ে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেবে, “মোক পাছত বিহুত,পূজাত কাপোর দিবও নালাগে, স্কুলত পইচা দিব নালাগে। মই মানুহবোরক

পইচা ওভোতাই দিম"।[১৪]

রাতের বেলা বাড়িতে একা থাকতে গিয়ে ভূতের ভয়ে কাবু হওয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পঞ্চম খণ্ডের কাহিনি। মা-বাবার অনুপস্থিতিতে এক রাত বেশ নিজেদের মতো করে কাটাবে ভেবেছিল বাপু, মনু তার রুণি। তাদের সঙ্গ দিয়েছিল ভুলু। মাখন-পাউরুটি, মিষ্টি আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে সে রাতে সবাই আলাদা আলাদা শুতে যায়। কিন্তু ঘুম আর আসে কই! রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্যতম শব্দেও তারা আঁতকে উঠতে শুরু করে। গভীর রাতে মা-বাবা ফিরে এলে তারা দরজাই খুলতে রাজি হয়নি। ধরেই নিয়েছিল, আগন্তুক দুজন আসলে মা বাবা নন, মা-বাবার ভূত, " ভূত নহয় যদি রাম রাম বুলি ক"।[১৫] একটি শোল মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ভবেন্দ্রনাথ ষষ্ঠ খন্ডের প্লট বুনেছেন। বাপু আর মনু মস্ত বড়ো একটি শোল মাছ ধরে বাড়িতে এনে লুকিয়ে রাখে। কারণ পুকুর টুকুরের পাশে যাওয়া তাদের নিষেধ ছিল। রুণি একটি ছোট মাছ ধরে বালতিতে মাছটিকে লুকিয়ে রাখে শোবার ঘরের আলমারির পেছনে। তাদের প্ল্যান ছিল, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা বলবে যে মাছটি কিনে এনেছে। কিন্তু মায়ের কাছে টাকা ছিল না। তাদের শোল মাছ খাবার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে তাদের বাবা তখনই বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ান। অবস্থা বেগতিক দেখে রুণি বাবাকে আটকায়। পুরো ঘটনা খুলে বলে। শোল মাছকে কেন্দ্র করে ছেলেরা এতগুলো মিথ্যে কথা বলেছে জানতে পেরে চৌধুরী ভীষণ কষ্ট পান। কোন চিৎকার চেঁচামেচি না করে রুণিকে দিয়ে তিনি ছেলেদের জানান, "মাক মাছটো খুব ভালকৈ রান্ধিবলৈ কৈছে। ভুলুকো মাতিবলৈ কৈছে। চবকে ফূর্তি করি খাবলৈ কৈছে। ... আরু কৈছে, দেউতাই কাইলৈ ভাত নাখায়, ভাতর টেবুললৈকো নাযায়। লঘোনে থাকিব।"[১৬]

কম্পিটিশনের জন্য মনুর আঁকা একটি ছবির ছিঁড়ে যাওয়া নিয়ে চারজনের মধ্যে মনোমালিন্য ও পুনর্মিলন সপ্তম খণ্ডের বিষয়বস্তু। বাপু মনু দুই ভাইয়ের পরস্পরের সঙ্গে কথা না বলা, ভুলুর তাদের বাড়িতে না আসা, মনে মনে তিনজনেরই কষ্ট পাওয়া অথচ বাইরে এক ইঞ্চি জমিও না ছাড়ার পণ নিয়ে অদ্ভুত মুন্সিয়ানায় গল্প বুনেছেন ড. শইকিয়া। ঠোক্করহীন সংলাপে এই নাটক আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই বাড়ির গল্প, "ল। এইটো তার গরু। ক'ত শোয়ে শুই থাকক। এই সোপা তার কাপোর। মোর তাঁত থব নোয়ারো। লৈ যা।"[১৭]

সুকুমার আর সত্যজিৎ রায়ের মতোই ড. শইকিয়া জানতেন শৈশব মনে শুধু একতাল তুলতুলে স্বপ্ন নয়। আজকের কচি মনগুলি আগামীর ভবিষ্যৎ। ক্যারিয়ার সর্বস্ব জীবনে ছোটদের কল্পনাপ্রবণ মনটাকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের তলানিতে এসে ঠেকেছে। হয়তো বা অনেকটাই দায়ী পরিস্থিতিও। আমরা মনে করি, যেহেতু আমরা আবার ওদের অনুভূতি, কল্পনা, স্বপ্ন বা আবেগকেও ভাগ করে নিতে প্রস্তুত নই। ওরা যে অনেকটাই বোঝে, সেটাই বুঝে উঠতে পারি না আমরা। ব্যাডমিন্টন ম্যাচ নিয়ে দু'দলের মায়ের চালাকি তাই চোখ এড়িয়ে যায় নি বছর ন'য়েকের বাপুর," কিয় নকম? মোর হলেও কম। আরো

ডাঙর মানুহর কথা যদি কবই নালাগে,তেনেহলে তেওলোকে আমার আগত সেইবোর কাম করে কিও ? ভাবে চাগৈ -- এইবোর পোয়ালি পোয়ালি লরা, কি ডাল বুজে ! আমি কিন্তু সব বুজোঁ বুইছ !"[১৮] এই একই সৎ সাহস নিয়ে মনু তার বাবাকে বলেছে, " চবেই কিয় আমার ভুল হব পারে বুলি কব ? মই কিন্তু মিছা কথা কব নোয়ারো। আরু বহির পাতবিলাকো ফালিব নোয়ারো।"[১৯] 'পাগলা দাশু'তে 'আমি'র পরিসর চিহ্নিত করে বাংলা সাহিত্যকে এক লহমায় সাবালক করেছিলেন সুকুমার। 'কিয় নকম ? মোর হলেও কম' বা 'মই কিন্তু মিছা কথা কব নোয়ারো'-- অসমিয়া শিশু সাহিত্যে এতোটা স্পষ্ট উচ্চারণও ভবেন্দ্রনাথের আগে কেউ করেননি।

তথ্যসূত্র :

১) গঙ্গোপাধ্যায়, আশা; শিশু সাহিত্যের স্বরূপ- বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০ -১৯০০); ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ:৩০৪-৩০৫।

২) শইকিয়া, ড. ভবেন্দ্রনাথ; ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার শিশু সাহিত্য সমগ্র; ১ম প্রকাশ ২০০৬; বনলতা, গুয়াহাটি, পৃ: ৫২৮।

৩) https://nilacharai.com29.06.2023

৪) শইকিয়া, ড. ভবেন্দ্রনাথ; ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার শিশু সাহিত্য সমগ্র; ১ম প্রকাশ ২০০৬; বনলতা, গুয়াহাটি, পৃ: ৪০২।

৫) পূর্বোক্ত, পৃ:৪৬১, ৬) পূর্বোক্ত, পৃ:৪২৬, ৭) পূর্বোক্ত, পৃ:৪৪৪, ৮) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৬৫, ৯) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৬৮, ১০) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৮২, ১১) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৮২, ১২) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৯৮, ১৩) পূর্বোক্ত, পৃ:৪১৩, ১৪) পূর্বোক্ত, পৃ:৪১৬, ১৫) পূর্বোক্ত, পৃ:৪৩৩, ১৬) পূর্বোক্ত, পৃ:৪৫১, ১৭) পূর্বোক্ত, পৃ:৪৬১, ১৮) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৫৮, ১৯) পূর্বোক্ত, পৃ:৩৬৮

অসমিয়া উক্তিগুলির বাংলা ভাবানুবাদ:

(২) বুড়ো যাক তারপর আমি তোকে কি করি দেখতে থাক। আমার থেকেও তোর চুল ছোট হয়ে যাবে দেখে নিস।

(৩) শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহা দুষ্টর পরে এমন দ্বিতীয় একটি শিশু উপযোগী অথচ যুবক-যুবতী বৃদ্ধ সকলে শুনে পছন্দ করা নাটক আমার আর একটাও রেডিওতে শুনতে পাইনি।

৪) আমি চিমটি কাটতে পারিনা বলে ভেবেছিস নাকি ?

৫) আমি পেয়েছি, পা ধুতে নিয়ে গেছি। কার স্যান্ডেল আমি কি জানি ?

৬) রুণি-হাফ বয়েল ডিমে নাকি বেশি জোর থাকে।
মনু- ছি; ট্যালট্যালে।
ভুলু- সর্দির মতো।

৬) ধরব দাঁড়া। ইস্ । বাপরে ! এতো জোর !

৭) মোটকথা চৌধুরী, আপনি ছেলে দুটিকে বুঝিয়ে বলবেন। ছোট ছোট ছেলে-এইসব ঝামেলার মধ্যে না এলেই ভালো। আর ঝামেলা তো শুধু তাদের হবে না। ঝামেলা

আপনারও।

৮) লাগবে না মনু। তোকে মিথ্যে কথা বলতে হ‌ে না। তুই যা দেখেছিলি তাই বলবি, যা লিখেছিলি তাই দেখাবি।

৯) ও মা, রচনাটি বাপুরা লিখেছিল বলে এখন তোমরা সম্পাদিকাকে একটি চিঠি লিখছো না কেন? তাহলেই তো তোমাদের আমরা ভালো বলে জানব।

১০) লিখবো রে মু। কালকেই লিখবো।

১১) আপনারা জিনিস একটা হারালেই প্রথমেই চাকরটাকে কেন ধরেন? নিয়েছে কি নেয়নি তা ঠিক হওয়ার আগেই তাকে এত কেন মারেন? আমাদের যদি খাওয়ার না থাকতো, তাহলে আমি তো কারো বাড়িতে চাকর হতাম-- এভাবেই মার খেতাম।

১২) কে জানে! তোমরা টাকাগুলো তুলে কী করছো ঠিক নেই।

১৩) আমাকে পরে বিহুতে, পূজোতে কাপড় দিতেও হবে না, স্কুলে টিফিনের জন্য টাকা দিতেও হবে না। আমি মানুষগুলিকে টাকা ফিরিয়ে দেব।

১৪) ভূত না হলে রাম রাম বলো।

১৫) মা'কে মাছটা খুব ভালো করে রান্না করতে বলেছে। ভুলুকে ডাকতে বলেছে। সকলকে ফূর্তি করে খেতে বলেছে। ... আর বলেছে, বাবা কালকে ভাত খাবে না, ভাতের টেবিলেও আসবে না। উপোস থাকবে।

১৬) নে। এইটা তার বালিশ। কোথায় শুবে শুয়ে থাক। এসব তার কাপড়। আমার এখানে রাখতে পারব না। নিয়ে যা।

১৭) কেন বলব না? আমার হলেও বলবো। আর বড়োদের কথা যদি বলতেই না হয়, তাহলে তারা আমাদের সামনে সেসব কাজ করে কেন? ভাবে বোধ হয়, ... এসব ছোট ছোট ছেলে, কী আর বুঝে । আমরা কিন্তু সব বুঝি বুঝলি।

১৮) সবাই কেন আমাদের ভুল হতে পারে বলে বলবে? আমি কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে পারব। না আর খাতার পাতাগুলোও ছিঁড়তে পারবো না।

লেখক : **ড. জাহ্নবী দাশ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, লামডিং কলেজ, আসাম।**
Author : **Dr. Jahnnabi Das, Asstt. Professor, Bengali, Lumding College, Assam.**

‘ছেঁড়া তার’ নাটকে মন্বন্তরের অভিঘাত ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

■ রূপশ্রী দেবনাথ

বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯ খ্রি) । সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি জগতের প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পেশাদারী মঞ্চে তুলসী লাহিড়ী অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। গীতরচনা, সুর-সংযোজনা, নাট্যরচনা, মঞ্চাভিনয়, নাট্য-পরিচালনা, চিত্রনাট্য নির্মাণ, চলচ্চিত্রে অভিনয় ইত্যাদির পাশাপাশি ভারতীয় গণনাট্যের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে তাঁর সাংস্কৃতিক পদচারণার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও কোনো নির্দিষ্ট একটি পেশায় তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি ফিরে যান রংপুর সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলায়। সেখানে ১৫০ বিঘা জমি কিনে চাষবাস শুরু করেন। সে সময় তিনি গ্রাম উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত, অত্যাচারিত কৃষকদের একেবারে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গরীব দুঃখী ও খেটে খাওয়া কৃষক সমাজকে নিয়ে ১৯৪৩সালে লিখলেন ‘দুঃখীর ইমান’ নাটক। বাংলার বুকে ১৯৪৩ সালে দেখা দিয়েছিল মন্বন্তর। কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে আর বাকিটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের কারণে। মন্বন্তরকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। সে সময় এই দরদী মানুষটি নিজেদের খামার বাড়ির গোলা খুলে দিয়ে মন্বন্তর পীড়িত চাষীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষাপটে তুলসী লাহিড়ী তাঁর সাড়া জাগানো নাটক ‘ছেঁড়া তার’ রচনা করেছিলেন। ‘ছেড়া তার’ নাটকটি তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভবের নাটক। আদ্যন্ত শিল্প সচেতন মানুষ ছিলেন তুলসী লাহিড়ী , সমকালীন সময় ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল সুগভীর। তিন অঙ্ক ও নয়টি দৃশ্যে বিভক্ত ‘ছেড়া তার’ নাটকে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক জীবন, মুসলমান সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কার, হিন্দু -মুসলমান সমাজের পাশাপাশি অবস্থান,অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের মিলিত প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ও এই নাটকে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে।

তুলসী লাহিড়ীর জন্ম পরাধীন ভারতে, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে । সমগ্র দেশটি যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি হয়ে উঠেছিল। পরাধীন ভারতে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশে ঘটে যাওয়া একাধিক আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা, গান্ধীজির নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’ ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গা, বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশভাগ ও স্বাধীনতা সবকিছুই তিনি দেখেছেন। দেশের বুকে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা তখন ধীরে ধীরে সাহিত্যে উঠে আসতে থাকে। একসময় সাহিত্যের সীমানা ও প্রেক্ষাপট পূর্বের পরিসর ত্যাগ করে বিস্তৃত আকার

ধারণ করতে থাকে। সাহিত্যে অঙ্কিত হতে থাকে দেশভাগ, দাঙ্গা ও মন্বন্তর কবলিত মানুষের আর্তনাদ। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ঘটে যাবার পরপরই বাংলার বুকে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। বাংলার সমাজ ইতিহাসে যাকে বলা হচ্ছে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। এই মন্বন্তরের কবলে গ্রাম বাংলার চিরাচরিত চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। কালোবাজারী মহাজনদের শোষণ ও ঘুষখোর প্রশাসনিকের তৎপরতায় এক অভাবনীয় জৈবিক ক্ষুধা মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে। ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায় একমুঠো ভাতের জন্য কিংবা এক বাটি ভাতের ফ্যানের আশায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মানুষ ভিড় জমায় রাস্তার বুকে। ছুটে যায় শহর কলকাতায়। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটকে সেই চিত্র অঙ্কন করেছেন।

দুই

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রংপুর জেলার গ্রাম্য কৃষকসমাজকে নিয়ে 'ছেঁড়া তার' নাটকটি রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ভয়াবহ মন্বন্তর সেদিন সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। যুদ্ধের ভীষণ প্রকোপ নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবনে গভীর আঘাত হানে। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে সাধারণ কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। এমন একটা সময়কালের বাস্তবচিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন যার শিরায় শিরায় দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি । তিনি দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের সময় রহিমের মতো শেকড়বিহীন মানুষগুলো কীভাবে খড়-কুটোর ন্যায় ছন্নছাড়া হয়ে যায়। শোষক শ্রেণির আসল রূপ অঙ্কন করেছেন হাকিমুদ্দির মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে চোখে আঙুল দিয়ে একই ফ্রেমে নাট্যকার দেখাবার চেষ্টা করেছেন শোষিত ও শোষকের সামাজিক অবস্থান। যে সমাজের একভাগে রয়েছে শেকড়বিহীন কিছু মানুষ, শেষ সম্বল বলতে যাদের আছে শুধু জীবনটুকুই, আর অন্যভাগে আছে সেইসব মানুষ, যারা সমাজে শোষকের প্রতীক।

মন্বন্তর যে সাধারণ মানুষের সুখী জীবনের সর্বনাশ করে দিতে পারে এই নাটকে তা চিত্রিত হয়েছে। দরিদ্র কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের ওপর এসে পড়ে যুদ্ধের চাঁদার চাপ। গ্রামের মাতব্বর শয়তান হাকিমুদ্দির হাতে সরকারের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়ের ভার অর্পিত হয়। আকালের দিনে 'যুদ্ধের চাঁদা', 'রাজার মঙ্গন'[১] দেওয়া গরীব চাষীদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে গ্রামে আকাল দেখা দেয়। হাহাকার শুরু হয় চারিদিকে। কৃষকের হাতে টাকা নেই, আবার টাকার বিনিময়েও চাল পাওয়া যায় না। কৃষক পরিবার আসন্ন উপবাসের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। গ্রামের ধনী মাতব্বররা ধানের গোলা লুঠ হবার ভয়ে শঙ্কিত। গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আকালের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। মন্বন্তরের হাহাকার বাড়তে থাকলে কৃষক লাঙ্গল , গরু, বীজধান বিক্রি করতে শুরু করে। দেশ জুড়ে আকাল ছড়িয়ে পড়লে মানুষ কচু, ঘেচু সেদ্ধ খেয়ে প্রাণে টিকে থাকবার চেষ্টা করে। নাট্যকারের ভাষায় 'চাইরোপাকে হাহাকার। এই যুদ্ধে দ্যাশটাকে খাইবে।'[২] এমনকি মানুষ নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। গরীব ধনী সকলেরই আতঙ্ক বাড়তে

থাকে। শোষক হাকিমুদ্দি হাতে ক্ষমতা পেয়ে রহিমের মতো সম্বলহীন কৃষকের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। ক্রমাগত শোষণ বঞ্চনার আঘাতে ক্লান্ত রহিমকে একসময় হার মানতে হয়। রহিম স্বীকার করে "হাকিমুদ্দির মনের সাধটা মিটল। মোর জমী জমাও খাইলে, ফির তারে বাড়িতে মোর বৌ-বেটা ভিক্ষুক হয়া খাবার গেল্।"[৩] এভাবেই যুগে যুগে সহায় সম্বলহীন মানুষেরা আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে মার খায়। শোষণ তাদের সবকিছু নিংড়ে নেয়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত এক সাধারণ আত্মসম্মানবোধ বাঁচানোর অদম্য লড়াইয়ের নাটক 'ছেঁড়া তার'। এই নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম। সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক মানুষ সে। তার পিতাও একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। চাষবাস করে মোটামুটি ভালোভাবেই একসময় তাদের জীবন চলে যেত। পড়াশোনায় ভালো মেধাবী ছাত্র রহিম ছিল ক্লাসের ফার্স্ট বয়। গানবাজনায়ও তার তালিম ছিল। অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্বেও পয়সার অভাবে বাধ্য হয়ে রহিমকে পড়ালেখা ছাড়তে হয়। সেজন্য রহিমের আক্ষেপেরও শেষ ছিল না। স্বার্থপর জোতদার হাকিমুদ্দি কৌশলে তাদের জমিজমা কেড়ে নেয়, ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা অবনতির দিকে যায়। অবস্থার চাপে পড়ে রহিমের লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি, কিন্তু তার মার্জিত রুচিবোধ, সৌন্দর্য-চিন্তা, উন্নত ও প্রবল ব্যক্তিত্ব তাকে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ করে তুলেছে। মন্বন্তরের দিনে চরম অর্থ কষ্টে গ্রামের সহজ সরল মানুষ লুঠতরাজের চিন্তা করে। কিন্তু রহিম চরম দুর্ভিক্ষের দিনেও 'মান আর হুশ' বজায় রেখে চলে। গ্রামবাসীদের মাথা স্থির রাখতে বলে। রহিম যুক্তি দিয়ে হিন্দু-মুসলিম গ্রামবাসীকে বোঝায়, লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। নাটকের শেষ দৃশ্যে সমবেত হিন্দু-মুসলিম গ্রামবাসীর রুদ্রমূর্তির সামনে হাকিমুদ্দির ব্যক্তিত্বের খোলস খসে পড়ে। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রহিমের জীবন ও পরিবারের ট্র্যাজিক পরিণতির মধ্য দিয়ে এই নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে।

'ছেঁড়া তার' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। বুবুক্ষের হাহাকার তখন চরমে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে গোবিন্দ, মামুদ, তমিজ, শ্রীমন্ত এদের অসহনীয় অবস্থা হয়। রহিমের দুর্দশাও চরমে ওঠে, না খেয়ে তার মা মারা যায়। অভাবের তাড়নায় রহিমের অনেক জমি হাকিমের পেটে যেতে থাকে। না খেতে পেয়ে পথে ঘাটে মানুষের মৃত্যু হয়, জ্যান্ত মানুষকে টেনে নিয়ে যায় শিয়াল কুকুর। এমনকি ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ জরু-গরু বিক্রি করে দেয়। অনেকে সরকারী লঙ্গরখানায় আশ্রয় নেয়। কিছু মানুষ খাদ্যের আশায় শহরে পাড়ি জমায়। শহর কলকাতা ভিক্ষুকে ভরে যাবার সংবাদ বেরোয় খবরের কাগজে। রহিম কাগজ পড়ে গ্রামবাসীদের শোনায় " কলিকাতার শহর ভিক্ষুকে খালি ভরি গেইছে। যত তোমার না- খাওয়া মানুষগুলা খালি ফ্যান দাও, ফ্যান দাও করি কাইন্দতেছে আর রাস্তায় ইতি-উতি পড়ি দম্ ফুরাইতে মইত্তেছে।"[৪] চরম কষ্ট যন্ত্রণা বিপর্যয়, বিপন্নতার মধ্যে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

তিন

'ছেঁড়া তার' নাটকে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং সেই কাহিনিতে

প্রাধান্য বিস্তার করেছে মুসলমান ধর্মকেন্দ্রিক কুসংস্কার। যার সুযোগ নিয়েছে মহাজন-মজুতদার তথা শোষক -প্রবঞ্চকেরা। নাট্য-কাহিনিতে হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসীর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থানের বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় তারা কেউ কারো সঙ্গ ছাড়েনি। নাটকে তুলসী লাহিড়ীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অথচ এই নাটকে দুটি ধর্মের মানুষের মধ্যে কোথাও দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের ছবি নেই, বরং তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিপূর্ণ অবস্থানই সমগ্র নাটক জুড়ে লক্ষ করা যায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও নাটকটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শোষণ ও শাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামবাসীর মিলিত প্রয়াস নাটকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে ধূর্ত হাকিমুদ্দির অপকৌশল তারা নস্যাৎ করতে পেরেছে। হাকিমুদ্দি ধর্মের ভাণ করে, কিন্তু অন্তরে সে ধর্মপ্রাণ নয়। ধর্মকে সে স্বার্থ আদায়ের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে মাত্র। ধর্মের দোহাই দিয়ে হাকিমকে সে নানাভাবে শোষণ করেছে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। রহিমের পিতার মক্কায় হজ করতে যাবার প্রসঙ্গটিও হাকিমুদ্দির চক্রান্তের অঙ্গীভূত।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্কের প্রতিফলন অত্যন্ত প্রাণস্পন্দনময় একটি বিষয়। বাস্তব সমাজজীবনে এই সম্পর্ক যেমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে, সম্প্রীতি-সন্দেহে চিহ্নিত, সাহিত্যের পাতায়ও তা ঘৃণা বিদ্বেষে, প্রীতি ও প্রত্যাখ্যানে সমন্বিত। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ছেঁড়া তার নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমের সহায়ক হিসেবে সমগ্র নাটক জুড়ে তিনটি চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়, তারা হলো মহিম, শ্রীমন্ত, গোবিন্দ। এই তিনজন মানুষ রহিমেরে বিপদে ছায়ার মতো সঙ্গ দিয়েছে। ধর্মে তারা তিনজনই হিন্দু। প্রথমেই শ্রীমন্ত চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সংকটের সময় বন্ধুত্বের আসল পরিচয়ের স্বরূপ। রহিমের জন্য শ্রীমন্তর সহানুভূতির অন্ত নেই। নিজে অন্নহীন তাও রহিমকে খেতে দিতে না পারার জন্য সে কষ্ট পেয়েছে। এমনকি ধার করে চিঁড়া এনে রহিমকে খেতে দিয়েছে। সম্পদে বিপদে শ্রীমন্ত রহিমের নিত্য সঙ্গী। রহিমের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিও সে শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করে । দুর্ভিক্ষে অসহায় রহিমকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, লঙ্গরখানা হাকিমুদ্দির ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। সরকার আকালের দিনে অসহায় মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মন্বন্তরের ভয়াবহ দিনে মানুষ সবকিছু ভুলে লাইন দিয়ে লঙ্গরখানায় খেয়েছে। শ্রীমন্তের মুখে জানা যায় —" দ্যাখ যায়া কত হিন্দু-মুসলমান, বাবাজী ফাবাজী সব আসি জড় হইছে, আকালে সব এক হইয়া গেল।"[৫] কিন্তু যে হাকিমুদ্দি চক্রান্ত করে রহিমকে নিঃস্ব করেছে তার বাড়ির লঙ্গরখানায় সে কোনোভাবেই খাবার খেতে পারে না। ফুলজান ও বসির হাকিমের বাড়ি থেকে ক্ষুধার্ত ফিরে এলে রাগে দুঃখে রহিম ফুলজানকে তালাক দেয়। তখন শ্রীমন্তই বসিরকে চিড়া সংগ্রহ করে খেতে দিয়েছে। ফুলজানকে তালাক দিয়ে বসিরকে সঙ্গে করে রহিম ছুটে শহরের দিকে। যাবার সময় শ্রীমন্তকে সে ভরসা করে বলে যায়—"বছিরকে নিয়া মুই যাই

সহরে- বাড়ীঘর দেখিস্ দুইটা মাস্-দুইটা মাস্।"[৬] রহিম চলে গেলে শ্রীমন্ত ফুলজানকে তালা কিনে দেয়, সাবধানে থাকতে বলে। রহিমের অনুপস্থিতিতে শ্রীমন্ত সরেমামুদের সাহায্যে রহিমের জমি আবাদ করে, ফসল কেটে খবর পাঠায় রহিমের কাছে। রহিমুদ্দির গ্রামে ফেরার সংবাদ পেয়ে কোদাল, দা, বালতি নিয়ে রহিমের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে দেয় শ্রীমন্ত।

দুর্ভিক্ষের দিনে অপর যে চরিত্র রহিমকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি রহিমের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু মহিম। রহিম ছেলে বসিরসহ শহরে চলে আসে মহিমের কাছে। একটি হিন্দু পরিবার দুর্ভিক্ষের দিনে সন্তানসহ রহিমকে আশ্রয় দেয়। অসুস্থ বসির মায়ের জন্য কাঁদে। কিন্তু মুসলমান হয়ে রহিম হাদিস অমান্য করে তালাক দেওয়া স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারে না। তখন রহিমকে তার বাল্যবন্ধু মহিম বোঝানোর চেষ্টা করেন— " আমরা যেমন ভগবানকে অন্তর্যামী বলি-মানে সকল মানুষের মনের কথা তিনি জানেন বলে বিশ্বাস করি, তেমনি তোদের খোদাও অন্তর্যামী একথা তোরও বলিস ত?"[৭] মহিমবাবু সহজ সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত করবার চেষ্টা করেছেন। রহিমের সংসারটিকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করেছেন। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সন্তানকে তার মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কথা বার বার ভেবেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় ভেবেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় এক বন্ধুর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন মহিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বন্ধু মহিমের কথায় রহিম রাগের মাথায় করা নিজের ভুল বুঝতে পারে। ফলে অসুস্থ বসিরকে আর বেশিদিন সে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে না। তাই শহর থেকে ফিরে মুসলমান রীতি মেনে রহিম আবার ফুলজানকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চেয়েছিল। হিন্দু-মুসলীম গ্রামবাসীরাও চেয়েছিল রহিম ও ফুলজান যেন তাদের সংসারে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু তাতে বাধা সৃষ্টি করে হাকিমুদ্দি। হাকিমের ঔদ্ধত্য দেখে বরদাস্ত করতে পারে না মিলিত হিন্দু-মুসলিম জনতা, তারা গর্জন করে উঠে "খবরদার । দ্যাওয়ানী গিরি চইলবার নয়। জুলুম করি করি আস্পর্ধা বাড়ি গেইছে।"[৮] হাকিম লক্ষ করে হিন্দু -মুসলিম গ্রামবাসী সব এক হয়ে প্রতিবাদ করছে। সে বিদ্রুপের সুরে বলে- "হুঁ। হেঁদু মুছলমান সব এক জোট হইছেন দেখি।"[৯] তাদের পরস্পর সহানুভূতি ও নির্ভরশীলতার বিষয়টি এখানে দারুণভাবে সফল হয়েছে। ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে যে অদম্য শক্তি নিহিত থাকে, এখানে সে বিষয়টিও স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। গণনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও এখানে সফলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নাটকের আরেকটি চরিত্র গোবিন্দ, ধর্মে সেও হিন্দু। এই চরিত্রটি নাট্যকার সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। রহিমের শুভার্থী গোবিন্দ শত দুঃখের মধ্যেও অম্লান হাসির কুসুম অক্ষয় রেখেছে। রহিম ফুলজানের চরম ট্র্যাজিক পর্যায়ে গোবিন্দর ব্যথাকাতর মূর্তি আমাদের মুগ্ধ করে। রহিম আত্মহত্যা করলে মিলিত জনতা হাকিমকে টেনে নিয়ে আসে। গোবিন্দ বলে "আর শুনাশুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির সয়তানী আইজে শ্যাষ।"[১০] ফলত কাহিনি বিন্যাসের পাশাপাশি চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকার নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি আজও সে স্বাক্ষর বহন করছে।

নাটকে বর্ণিত গ্রামের খেটে খাওয়া সহজ সরল মানুষগুলো ধর্মপ্রাণ, তবে পরধর্ম বিদ্বেষী নয়। নিজের ধর্মে বিশ্বাস স্থির রেখে তারা পাশাপাশি অবস্থান করে। নাটকের দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে শ্রীমন্ত ও রহিমের কথোপকথনে সহজ সরল মানুষগুলোর ধর্মভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। রহিম জানায়- " এতকাল মানুষ তাই মানি আইস্‌ছে। কেউ আল্লা কেউ হরি বলি, কেউ নামাজ কেউ পূজা করি...।"[১১] আমরা যে নামেই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করি না কেন তিনি যে আদতে একজনই সে বোধশক্তি এই মানুষগুলোর মধ্যে আছে। আমরাই ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভাবে সেই পরম সত্তার আরাধনা করি, এই যা তফাৎ।

'ছেঁড়া তার' নাটকে দুর্ভিক্ষের বাস্তবচিত্র যেমন এসেছে পাশাপাশি নাট্যকার মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যত্ব, মানবিকতার দিকটিকেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম মাইলস্টোন এই নাটক। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের পর 'ছেঁড়া তার'-ই নাট্য আন্দোলনের বক্তব্য- বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের নাটক প্রহসনে বঙ্গের নির্যাতিত কৃষকদের কথা তুলে ধরে প্রতিবাদ প্রতিরোধ জানিয়েছিলেন। সে ধারারই উত্তরাধিকারের দায়িত্ব বহন করছে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'।

সূত্রনির্দেশ ঃ-

১) সনাতন গোস্বামী, তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৬, ২) তদেব, পৃ-৬৬, ৩) তদেব, পৃ-৯১ ৪) তদেব, পৃ-৮৯ ৫) তদেব, পৃ-৯১ ৬) তদেব, পৃ-৯৫ ৭) তদেব, পৃ-১০০, ৮) তদেব, পৃ-১১৫ ৯) তদেব, পৃ-১১৫ ১০) তদেব, পৃ-১১৯ ১১) তদেব, পৃ-৯২

সহায়ক গ্রন্থ

১) অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৫

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লি: দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০

৩) কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), উপোসি বাংলা, সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সেরিবাণ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০

৪) গৌরী দে, কমেডিয়ানদের কথা, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী ২০১০

৫)মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৪

৬)নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), নাট্য একাদেমি পত্রিকা ৫, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

৭)৬)নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), নাট্য একাদেমি পত্রিকা ৫, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রকাশকাল ১৯৯৯

৮) সনাতন গোস্বামী, তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়া তার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৬

লেখক : **ড. রূপশ্রী দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।**

Author : **Dr. Rupasree Debnath, Asstt. Professor, Bengali, Guwahati University, Assam,**

নাট্যকার সুকুমার

সুচিত্রা বেরা

অদ্ভূত, আজগুবি, অসম্ভব বিষয়ের অমর সৃষ্টিকর্তা সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৪) অনন্যসাহিত্য ভাণ্ডারের রত্ন তাঁর নাটকগুলি। মোট আটটি নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যে নাটক লেখার নতুন পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর ছড়াগুলোতে যেমন হাসির মাঝে সমাজব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকে, নাটকগুলো কিন্তু বেশিরভাগই নির্মল হাস্যরসে ভরপুর। ১৯১০-১১ সালে গড়ে তোলেন 'নন্‌সেন্স ক্লাব' নামে একটি আড্ডা স্থান। এই ক্লাবের জন্যই লেখেন প্রথম দুটি নাটক 'ঝালাপালা' (১৯১১) ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (১৯১১)। অন্যান্য নাটকগুলো হল : 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'চলচিত্ত চঞ্চরি', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'ভাবুক সভা' এবং 'মামাগো'।

হাস্যরস ও ব্যঙ্গ এই বিষয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে 'ঝালাপালা' নাটকটিতে। নাটকের মূল কাহিনি অনাবশ্যক, অবাঞ্ছিত এবং সুযোগসন্ধানী কিছু মোসাহেবদের অত্যাচার থেকে এক জমিদারের তার উকিল -মামার সাহায্যে পরিত্রাণ প্রাপ্তি। পণ্ডিত, কেষ্টা, ঘটিরাম, জমিদার, দুলিরাম, খেটুরাম, ভৃত্য রামকানাই, ওস্তাদ কেবলচাঁদ, মামা কেদারকৃষ্ণ মিলে নাটকে হাসির হাট খুলে বসেছে। তিনটি দৃশ্যে মোট ছয়টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। হাসি ঠাট্টার মধ্যে নাটকে যে ব্যঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে সেগুলো স্পষ্ট হয়েছে গানগুলোর মধ্য দিয়ে। যেমন দ্বিতীয় দৃশ্যে জমিদারের কিছু মোসাহেব জমিদারের জন্য এক গানের মজলিসের আয়োজন করতে ব্যস্ত। সেখানে গায়ক এবং শ্রোতা উভয়ই গান সম্বন্ধে অজ্ঞ। দুলিরামের কথায় " আমাদের কাছে 'গা'-ও যা 'ধা'- ও তাই— সবই সমান,"[১]। জমিদারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা এই অযাচিত সুবিধাবাদী লোকগুলোর প্রকৃতির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে জুড়িদের গানে:

(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার।।
....
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফূর্তি কচ্ছে নিত তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘন্টা মারচে আড্ডা বখশিশাদির সন্ধানে।।
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক।।
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর।।[২]

শিক্ষা, সংগীত বিষয়ে অপটু ও অনভিজ্ঞ এই গ্রাম্য লোকেদের আচরণে নাট্যকার পরিহাস করেছেন। গ্রামের পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের দৌড় কতটুকু, তা বোঝা যায় যখন কেষ্টা 'আই গো

আপ, ইউ গো ডাউন' এর মানে জিজ্ঞেস করে। পণ্ডিতের উত্তর " 'আই'— 'আই' কিনা চক্ষুঃ'গো'—গয়ে ওকারে গো— গৌ গাবৌ গাবঃ ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল— গরুর চক্ষে জল— অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে — কেন কাঁদিতেছে— না 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা— 'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদোমখানা — গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না — তাই না দেখে, 'আই গো আপ'— গরু কেবলি কান্দিতেছে—"[৩]।

ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ বহির্ভূত কৌতুকপূর্ণ নাটক 'অবাক জলপান' (১৯২১)। শব্দ সৃষ্টি নিয়ে সুকুমারের কারবার। তিনি 'জল' শব্দের বহুমাত্রিক ও বিবিধ ব্যবহার দেখিয়ে শিশুদের বেশ চমকপ্রদ জলপান করিয়েছেন। জলের সন্ধানরত এক পথিক সাহায্য চেয়ে কেবল জ্ঞান পেয়েছে। গ্রামের লোকগুলো অস্বাভাবিক ও আপন সংকীর্ণ স্বার্থে বন্দি। নাটকটি বয়স্কদের পাঠযোগ্য হলেও, মূল লক্ষ্য নাবালক পাঠকশ্রেণি। এই নাটক বিষয়ে নবেন্দু সেনের মন্তব্য- "...তুলনামূলকভাবে এ রচনাটির শিল্পগুণ পূর্বে আলোচিত নাটকগুলির (সুকুমারের অনান্য নাটক) শিল্পগুণ থেকে অনেকটা বেশি সরল বোধ হয় একটু স্থূলও। শব্দের যমকে, পানে সৃষ্ট এর হাস্যরসে নব নব খুশির জোয়ার এসে লাগেনি। পদ্ধতির একঘেয়েমিতায় নতুন চিন্তাশক্তির জোরালো দ্যুতি নেই"[৪]।

হাসি- ঠাট্টার পাশাপাশি শিশুদের নীতির শিক্ষা দিয়েছেন 'হিংসুটি'(১৯২১) নাটকটিতে। সবকটি চরিত্র বালিকা। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনে হিংসার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ছোট শিশু বোঝে না হিংসা কী, কীভাবে তা মনে বাস করে। হিংসার রূপ কালো, কুৎসিত, নোংরা। এই বিশ্রী রূপ দেখিয়ে শিশুদের মন থেকে হিংসাভাবের বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সুকুমার রায়ের এই একই বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র ছড়াও রয়েছে। নাম 'হিংসুটিদের গান'। কিছুটা অংশ নিচে তুলে ধরা হল:

" আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌,
তোমরা ত তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম"[৫]।

বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভরপুর একটি নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। এর আদিনাম ছিল অদ্ভুত রামায়ণ।[৬] গদ্য পদ্যের সংমিশ্রণে লেখা, আগাগোড়া হাসি-হাসি এই নাটকটি পাঠ করলে ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া কোনো রামায়ণ নাটকের মঞ্চদৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই হাসির আড়ালে কোনো প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ উঁকি দেয় না। এ শুধু নির্মল হাসি। চরিত্রগুলো এখানে আরও সজীব। রক্ত-মাংসের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রক্ত-মাংসের প্রত্যক্ষ দেখা সাধারণ বাঙালি ঘরের চরিত্র বলে মনে হয়। রাম-রাবণের গুরু-গম্ভীর রাজবৈশিষ্ট্য প্রাত্যহিকতার সারল্যে মজার চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তাদের শত্রুতা এখানে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। চারটি দৃশ্যে (রামের শিবির, রণস্থল, রামচন্দ্রের শিবির, শিবির

প্রাঙ্গণ) রাম-রাবণের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের আহত হওয়া এবং সেরে ওঠার গল্প বলা হয়েছে। নাটকের শুরু রামের রাজস্বপ্ন দর্শন দিয়ে, "কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়েছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে— পাপত চ, মমার চ!"[৭]। শুনে সকলে আশা করে রাবণ বোধহয় 'এক্কেবারে মরে গেছে।' দূত খবর নিয়ে আসে রাবণ মরেনি, বরং যুদ্ধ করতে 'আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল'। তখন সুগ্রীব, বিভীষণ,লক্ষ্মণ, হনুমান চলে বীরত্ব দেখাতে রণস্থলে। রাবণকে সত্যি সত্যি আসতে দেখে সকলের বীরত্ব ঘুচে যায়, কেবল সুগ্রীব সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়। কিন্তু রাবণের এক প্রহারে সুগ্রীবের অবস্থা ' ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি'। পলায়নরত সুগ্রীবকে দেখে রাবণের উক্তি , " ছি, ছি, ছি— এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম!"[৮]

এবার লক্ষ্মণের পালা। রণক্ষেত্রে নেমেই রাবণ কর্তৃক শক্তিশেলাহত হয়। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে এক বিরল হাসির দৃশ্য —লক্ষ্মণের মূর্ছা যাওয়ার সুযোগ রাবণ তাঁর পকেট লুণ্ঠন করে। সংবাদ পেয়ে সকলে রাবণের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে বলতে থাকে 'রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো। ' আর লক্ষ্মণের দুর্দশার দায় সুগ্রীব হনুমানের কাঁধে দেয় এবং আট আনা জরিমানা হয় তার। মন্ত্রী জাম্বুবান লক্ষ্মণের চিকিৎসার 'প্রেসক্রিপশন' লিখে হনুমানকে বিশল্যকরণী, মৃত সঞ্জীবনী আনতে কৈলাশে পাঠায়। হনুমান অনেক ওজর আপত্তি দেখায়। হোমিওপ্যাথি করতে বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলা বকশিস্ পেয়ে রওয়ানা হয়। এর পর বিভীষণের পাহারাদারিতে যমদূতেরা শিবিরে ঢুকতে বাধা পায়। তখন স্বয়ং যমরাজ এসে উপস্থিত হয় সেখানে। বিভীষণের সঙ্গে একপ্রস্থ সদর্প বাক্যালাপ চলে তাঁর। হঠাৎ হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে প্রবেশ করে এবং যমের মাথায় স্থাপন করে। পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে যমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার যমদূতেরা তাদের তেরো আনা মাইনের জন্য মড়াকান্না জুড়ে দেয়। ইতিমধ্যে ওষুধ খেয়ে লক্ষ্মণ সেরে ওঠে। তখন এই মহৎকর্মের বাহাদুরি ও বাহবা নেওয়ার প্রতিযোগিতা চলে সকলের মধ্যে। এবং এই সঙ্গে গল্পে নটে গাছটি মুড়োলো আর 'মহানাটকের ' সমাপ্তি হল।

এই নাটকে বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি', 'বজ্র আটুনি ফসকা গেরো', 'পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে', 'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ'।

'ভাবুক-সভা' (১৯১৪)পদ্যে রচিত ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ নাটক। ১৯১৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। এটি ছিল সচিত্র নাটক। পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকটিতে সুকুমারের আঁকা ছবিটিতে ছিল 'জ্যোৎস্না রাতে জলের ওপর একটি ঝুঁকে পড়া ডালে ভাবুকদাদা তাঁর কবিতার খাতা ও কলম হাতে খাতার দিকে নিমগ্নচিত্তে চেয়ে বসে আছেন। তাঁর উড়নির একাংশ জলে ঝুলে পড়েছে, অন্য অংশ হাওয়ায় উড়ছে"[৯]। একজন সিনিয়র ভাবুক এবং দুজন ছোকরা ভাবুক নাটকের চরিত্র । সকলে মিলে ভাবের মাহাত্ম্য শুনিয়েছে, নানান ভাবনার কথা বলেছে। নাটক শুরু হয়েছে 'ভাবের ঝোঁকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত"

ভাবুকদাদাকে নিয়ে। যখন মনে ভাবের প্রচণ্ড বেগ আসে তখন মানুষের আত্মা বাস্তব জগতের উর্দ্ধে পৌঁছে যায়। সেই ভাবকে অবলম্বন করে মানবাত্মা ভবনদী পার হতে চায়। এই ভাব থেকেই হয় সৃষ্টি। মানুষের মনের ভাব সৃষ্টির ভাষা খুঁজে — "অব্যক্ত ভাবনাগুলো যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে"[১০]। সব ভাব প্রকাশিত হতে পায়না। কিন্তু ভাবুকের মনে ভাবের খোরাকের অবধি নেই। 'ভাবের ঢেঁকি' সর্বদাই পড়ছে। সুতরাং "গতস্য শোচনা নাস্তি'। এক মানুষের মনের ভাব অন্য মনে সঞ্চারিত হয়। তাই জীবনে সাহিত্যের এত কদর। যুগ যুগ ধরে শত সহস্র ভাব এসেছে। মানুষ ভাবের সাগরে ডুব দিয়েছে পার্থিব জগৎ-জ্ঞানশূন্য হয়ে। অনেক ভাব হারিয়ে গেছে, অনেক ভাব ভাষা খুঁজেছে। এই তত্ত্বকথা সুকুমারের লেখনীতে মজার রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। লীলা মজুমদার তাঁর স্মৃতিকথায় এই নাটকটি সুকুমারের কণ্ঠে শোনার এক মনোরম অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন:

'ভাবুক-সভা' বড়দার ২০/২১ বছর বয়সে লেখা বোধহয় সন্দেশে বেরিয়ে থাকবে, আমাদের পড়া জিনিস। কিন্তু পড়া যে এমন রঙ্গ-রসে ভরা হতে পারে এ আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। সে কি মুখ-ভঙ্গি, সে কি হাত পা নাড়া, কথার মধ্যিখানে সে কি রস। সাজ নেই, দৃশ্যপট নেই, প্রকৃতির সেই দৃশ্যপটের মধ্যিখানে এ কি রসের ধারা?[১১]

ভাবরে মূল বস্তু হচ্ছে রস। ভাব অর্থের ধার ধারে না। তাই অভিধান , ব্যাকরণ, পঞ্জিকা সবই ভাবুকের কাছে বুজরুকী আর গাঁজার সমান। তাই ভাবুকের দল ভাবের নামতা আওড়ায় " ভাবের পিঠে রস, তার উপরে শুন্যি"। ভাবুকের এবং ভাবরাজ্যের তত্ত্ব অতি সুক্ষ্ম বিষয়। আর এই গুরু বিষয়টিকেও সুকুমার রায় বিশুদ্ধ হাসি -কৌতূকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এককথায় 'ভাবুক-সভা' "ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা"। "ভাবুক-সভা'র ভাবই সুকুমারের পরবর্তী নাটক 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' এ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবুকদাদার "অর্থ! অর্থ ত অনর্থের গোড়া!" উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' এর উৎস। ১৯১৫ সালে 'অলকা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় নাটকটি। এটিকে শিশুনাটক ঠিক বলা যায় না। এর রস শিশুদের বোধগম্য নয়। দ্রুম' অর্থাৎ বৃক্ষ 'কল্পদ্রুম' 'অভীষ্টফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ। যাহার কাছে কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়। "[১২] সুতরাং বলা যেতে পারে ' শব্দকল্পদ্রুম' এক অর্থ এমন এক বৃক্ষ যেখানে ইচ্ছানুসারে শব্দ পাওয়া যায়, অর্থাৎ মানুষের মস্তিস্ক।

নাটকের চরিত্র আশ্রমের গুরুজি আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা ও বিশ্বম্ভর। বিশ্বম্ভর এখানে অনেকটা বহিরাগতের মতো। নাটকের গুরুজির মূল বক্তব্য শব্দ অর্থহীন বা 'অর্থই শব্দের বন্ধন'। আর এই বন্ধন ছিন্ন করে "শব্দের বিষদাঁত'অর্থকে ভেঙে সশিষ্য স্বর্গারোহন করতে চেয়েছিলেন। আশ্রমের শিষ্য বেহারীর এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনে অর্থ বোঝাতে গুরুজি শব্দসংহিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে "শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব— শব্দই সৃষ্টি শব্দই সব! ... শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়, ... শব্দ ব্রহ্ম" [১৩]। কিন্তু যে শব্দের স্বরূপ অর্থ, সেই শব্দশক্তিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। অথচ মানুষের

চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ যে বাক্যে তার প্রকাশ অর্থযুক্ত শব্দে। কিন্তু তিনি 'শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে' চাপাতে বারণ করেছেন। কারণ এতে 'শব্দশক্তি ম্লান' হয়ে যায়। শব্দশক্তি এখানে অর্থহারা শব্দরূপের শক্তি অর্থাৎ আক্ষরিক শব্দশক্তি। গুরুর সমস্ত বক্তব্য লঘু করে দিয়েছে একমাত্র বিশ্বম্ভর। গুরুজির কথায় তার মনে পড়ে গিয়েছে ছেলে বেলায় লেখা এক পদ্যের কথা ('কাছে এসে ঘেঁষেঘেঁষে এত ভালোবেসে বেসে / টাকা মেরে পালালি শেষে') ।শব্দ প্রসঙ্গ তার মনে পড়ে মতিলালের ভুঁইপটকার কথা এবং সেখান থেকে সোজা গুরুজির ন্যাজ নিয়ে কথা ওঠে। গুরুজির সশিষ্য স্বর্গারোহণের পথে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল বিশ্বম্ভর। কারণ তার শরীরের ভার এবং দ্বিতীয়ত সে ভাবছিল। গুরুজির মতে শব্দলোকে ভাবের কোনো স্থান নেই। এরপর আবির্ভাব হয় বিশ্বকর্মার। 'শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই'? বলে তিনি শব্দকল্পদ্রুম নিক্ষেপ করেন এবং "দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন"। এই দৃশ্যেই আছে সেই বিখ্যাত মন্ত্র,

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি ধর্মতলায় কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দিকাশি ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।[১৪]

'চলচিত্ত - চঞ্চরি'(১৯২৭) নাটকে সুকুমারের ব্যঙ্গ ও রাগ সবথেকে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৫-১৬ সালে রচিত এই নাটকটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে গবেষক নবেন্দু সেন লিখেছেন:

"এখানে চলচিত্তচঞ্চরি নামক অসার, আজগুবি, বই অবলম্বনে ছোটদের জন্যে , 'স্কুলস্টোরি বুক' লেখার অক্ষমতার প্রতি মৃদু কটাক্ষপাত করা হয়েছে।"[১৫]

চারটি দৃশ্যে গঠিত এই নাটকে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবশে ঘটেছে। চরিত্রগুলো দুটো দলে বা সভায় বিভক্ত। একদল সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা, এবং অন্যদল শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। দুটি দলের মধ্যে রেষারেষি অবশ্যই আছে, তার ওপর দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগী মনোভাব রয়েছে। যেমন ভবদুলালের অভ্যর্থনার সময় ঈশান বলেছে 'আমার গানটা আগে হয়ে যাক'। সত্যবাহন প্রতিবাদ করেছে 'ওসব গানটানে কাজ নেই... আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে'। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয় 'গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক'। 'নিজের ঢাক নিজে পেটাতে' ওস্তাদ ঈশান ও সত্যবাহন। যখনই সুযোগ পেয়েছে তারা তাদের রচিত গ্রন্থাদির 'বিজ্ঞাপনের চটক' দিতে ছাড়েনি।

এই দুই দলের কোনোটিতেই যে পড়ে না সে হল ভবদুলাল। ভবদুলাল চরিত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন সুকুমার রায়। এই নাটকে তিনি সভা-সমিতি নিয়ে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। এবং এই নাটকেরই একটি চরিত্র হয়ে সভা ভণ্ডুল করেছেন এবং সভ্যদের নাস্তানাবুদ করেছেন। যার ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সাম্য সভার সদস্যরা মিলে তার লেখার খাতাটি

ধ্বংস করেছে।

আসলে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি সভা-সমিতির প্রতি রাগ প্রদর্শন করেছেন। একসময় যে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসভায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল তারই কিছুটা ছায়া পড়েছে নাটক রচনার প্রেক্ষিতে। এবং এই সব সভায় যে অহেতুক, অনাবশ্যক তত্ত্বালাপ ও বাক্যালাপ চলে তারই প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ভবদুলালকে দেখে বোকা-বোকা, অস্বাভাবিক মনে হলেও আসলে সে আত্মসচেতন ব্যক্তি। সভার সমস্ত রকমের গুরু-গম্ভীর আলোচনাকে সে ব্যর্থ করেছে নানাভাবে। সমীক্ষা মন্দিরে যখন সবাই নিঃশব্দে সাধনায় রত, তখন ভবদুলাল সশব্দে প্রবেশ করে, এবং তার ছোটবেলায় পাগলা বেড়াল কামড়ানোর গল্প বলে সমস্ত বিষয়টাকে উল্টে দিয়েছে। পরিস্থিতি দেখে ঈশান যখন বলে ওঠে "দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়", তখন ভবদুলালের পাল্টা জবাব " তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন"।

ভবদুলালের সঙ্গে দাশুর চরিত্রের একটা মিল রয়েছে। তাদের দেখে পাগল ও বোকা মনে হয়। কিন্তু তাদের সংলাপে বোঝা যায় তারা বাস্তবে সচেতন এবং স্বাভাবিক। ভবদুলাল বার বার বলেছে তার মাথার অসুখ, " আমার আবার মাথার ব্যামার আছে কিনা।" কিন্তু সে তাদের সমস্ত যুক্তির কথা তাদেরই ফিরিয়ে দিয়েছে সময়ে-সময়ে। সত্যবাহন তাঁর 'অখণ্ড -সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের তত্ত্বব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে "ঘোড়া চতুস্পদ, গরু চতুস্পদ, ঘোষ পোষ মানে, গরু পোষ মানে— সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোনো তফাৎ নেই।" নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখি ভবদুলালের মাথার ব্যামোর কারণ হিসাবে সে সজারুর কথা বললে ঈশান প্রতিবাদ করেছে। তখন ভবদুলালের যুক্তি " ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্"।[১৬] শেষ পর্যন্ত সকলে ভবদুলালের ওপর চটে যায়। নাটকের শেষে সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার সদস্যরা ভবদুলালের লেখার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেললেও সে ঘোষণা করেছে " খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কি হয়েছে। আবার লিখব— চলচিত্তচঞ্চরি— লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড় বড় করে সোনার জলে লেখা চলচিত্তচঞ্চরি— পাবলিশড বাই ভবদুলাল"[১৭]।

'সন্দেশ' এ প্রকাশিত 'মামাগো' (১৯২১) সুকুমার রায়ের নাটকগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র। নির্ভেজাল হাস্যরস ও আনন্দে ভরপুর এই নাটকে দুটি চরিত্র বালক ও তার মামা। বালক নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেভাবে কথার মারপ্যাঁচে মূল বক্তব্যটি পেশ করেছে তাতে নাটকে দারুণ কৌতূকময় ও মজার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বালকের একটাই চাহিদা, তা হল মামার থেকে প্রাইজ নেওয়া। সেই কথা বলার জন্য সে নানা কথার প্রসঙ্গ টেনে আনে। ঘুমন্ত মামাকে ডেকে তুলে কাঁদো কাঁদো সুরে জানায় যদি ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায়, কিংবা হঠাৎ তাদের বাড়ির উপড়েই বা এসে পড়ে, কিংবা গোবিন্দর মামার মতো তার মামাটিও মরে যায়— কে কতদিন বাঁচবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। মামা রেগে আসল কথা জানতে চাইলে বালক প্রকৃত সমস্যার কথা

বলেছে, " তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে— কই দিচ্ছ না ত"; ধমক ও চড় মেরে মামা জানায় " যা! আজ বিকেলে প্রাইজ পাবি এখন"। তখন হাসতে হাসতে এবং গাল ঘষতে ঘষতে বালক প্রস্থান করে।

"ঝালাপালা" সুকুমার রায়ের প্রথম নাটক হলেও, এর আগে 'রামধন বধ' নামে একটি ছোট নাটক তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটির পান্ডুলিপি পাওয়া যায় না। মাত্র আটটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, সমাজমনস্কতা ও ধর্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতির অসংগতির দিকগুলি কৌতূকরস মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখা মুক্ত, বিশুদ্ধ হাসি আর আনন্দে ভরা।

পাদটীকাঃ

১। সুকুমার রায়, সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৮, পৃ.২৭৭।

২। ঐ, পৃ. ২৭৬, ৩। ঐ, পৃ. ২৭৪,

৪) নবেন্দু সেন, "প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশুসাহিত্য", সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ১৯৯২, পৃ.১২৭।

৫। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬, ৬। নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৪, ৭। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০, ৮। ঐ, পৃ. ২৯৩,

৯। হেমন্তকুমার আঢ্য, "সুকুমার রায়: জীবনকথা", পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১৯৯০, পৃ.৬২।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সাহিত্য সৃষ্টি", সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩১৪, পৃ.৯১।

১১। লীলা মজুমদার , "পাকদণ্ডী", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৮৬, পৃ.৬০।

১২। রাজশেখর বসু (সংকলিত), "চলন্তিকা", এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা-৭৩, পৃ.১৩০।

১৩। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩২-৩৩৩। , ১৪। ঐ, পৃ. ৩৩৯। , ১৫। নবেন্দু সেন, প্রাগুক্ত, পৃ.-১২৭।, ১৬। সুকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২৬।, ১৭। ঐ, পৃ. ৩২৬।

লেখক ঃ **সুচিত্রা বেরা, গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি, আসাম।**

Writer : **Suchitra Bera, Scholar, Cotton University, Guwahati, Assam.**

প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর 'গুণধরের অসুখ' স্বতন্ত্র নাট্যশৈলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

■ প্রিয়ব্রত নাথ

বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী সংযোজন নাট্যকার প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর 'গুণধরের অসুখ'। প্রচলিত নাট্যধারা থেকে সরে গিয়ে বিষয় ও গঠনশৈলী দু-দিক থেকেই অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় নাটকটিতে। নাট্যকারের জন্ম ১৯৪৮ খ্রিঃ ২৭ ডিসেম্বর আসামের কামরূপে। তার বাবার নাম মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও মা লক্ষ্মীদেবী। তার উল্লেখযোগ্য কতগুলি রচনা হচ্ছে মিছিলের অসুখ, একটি নাটকের জন্ম, পাশেই রহিয়াছে, রক্ত, যাত্রা ইত্যাদি। আলোচ্য 'গুণধরের অসুখ' নাটকটি রচিত হয় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডু রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায়। নাটকটির অভিনবত্ব নাট্যকারকে আলাদা পরিচিতি প্রদান করেছে। উক্ত নাটকের জন্যই তিনি ২০০১ সালে 'সত্যেন মিত্র' পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক অরুণ কুমার বসুর মতে, 'গুণধরের অসুখ' সঠিকভাবে একটি আধুনিক নাটক। নাটকটির উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যকার নিজে বলেছেন-

"গুণধরের অসুখ নাটকে ভাবনাটার সূত্রপাত মনে আছে। মালিগাঁও থেকে গৌহাটি যাচ্ছিলাম সিটি বাসে। আমার পাশের সিটটাতে একজন দুস্থ বিধবা মহিলা। দু আঙ্গুলে একটা বাসের টিকিট ধরে রেখেছেন তিনি স্পষ্টভাবে। .... স্বাভাবিক হিসেবে কন্ডাকটার অনেককে ডিঙিয়ে ভদ্রমহিলার কাছে ভাড়া চাইলেন। আর ভদ্রমহিলা টিকিটটা ফেলে দিয়ে ছোট্ট মলিন পার্স থেকে ৫০ পয়সা একটা কয়েন বার করলেন। বড় স্পষ্ট ভাবে অনুভব করলাম ৫০টা পয়সার মূল্য তার কাছে অনেক বেশি।"[১]

উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লেখকের মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল তার থেকেই নাটকটি রচনার সূত্রপাত। স্বাভাবিক জীবনে আমরা যেসব সামাজিক নিয়মের লক্ষণ রেখায় আবদ্ধ থাকি তার বাইরে গিয়ে চরিত্র নির্মাণের যে বাসনা তৈরি হয়েছিল নাট্যকারের মনে তার থেকে নাটকটির পরিকল্পনা।

নাটকটির আখ্যানভাগ অনেকটাই গৌণ। এতে নাটকের মধ্যেই আরেকটি নাটক দেখানো হয়েছে নিখোঁজ গুণধরকে খুঁজে বের করার প্রয়াসে সচেষ্ট নাট্যদলের নাটক উপস্থাপনা থেকে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নাট্যকাহিনির বিস্তার দেখা যায়।।

সমালোচক শান্তনু রায়চৌধুরীর মতে----

"নাটকের সামগ্রিক নাট্যকাহিনীকে দুটো পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে নাট্যদলের প্রারম্ভিক আবেদন থেকে শুরু করে গুণধরদের দোকানে উজ্জ্বলের দ্বিতীয় আগমন পর্ব পর্যন্ত নাট্য কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে প্রথম দৃশ্যে; এবং মাথার রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার দৃশ্য থেকে শুরু করে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাহিনী বিধৃত হয়েছে দ্বিতীয় দৃশ্যে।"[২]

তবে কাহিনীর তুলনায় চরিত্রের উত্থান পতনই পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নাট্যকার কেন্দ্রীয় চরিত্র গুণধরকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তার পাশে আরোও চরিত্র বিশেষ করে উজ্জ্বল, ছন্দা, পবিত্র এই তিনটি চরিত্রের প্রেমের গল্পকে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

নাটকটির মূল বিষয় যে গুণধর চরিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি থেকে অনেক দূরত্বে তার অবস্থান। সামাজিক জটিলতা স্পর্শ করতে পারেনা তাকে। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন----

'গুণধরকে খুঁজতে আমাদের নাটকের এই অভিনেতাটির সঙ্গে বাহ্যিক মেল খুঁজবেন না দয়া করে যদিও ওরিজিনাল গুণধরের চিবুকের নিচে বাদামী রঙের তিল রয়েছে একটা। চেনা যাবে তার আচরণের অস্বাভাবিকতায় - তার অসুখে। "[৩]

উজ্জ্বলের সঙ্গে গুণধর এর কথোপকথনে আমরা গুণধরের চরিত্রের simplicity 'র কথা জানতে পারি। পাঁচ পা ওয়ালা গরু দেখতে গিয়ে পরীক্ষায় বসা হয় না তার। পাড়ার ছেলেরা তার পিঠে গাধা লিখে আনন্দ পায়। গুণধর ও আপত্তি করে না বরং সেই আনন্দে সে নিজেও শরিক হয়। সে নিজে যেমন হাসতে চায় অন্যকেও হাসাতে চায়। তাইতো চক্রবর্তীর কাছে থেকে পাওনা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন ছেলে র জন্য মা-বাবারা যে সব সময় চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন সেটই স্বাভাবিক। হতাশ বাবা বলে ওঠেন—

"বুড়ো হতে চললাম, আর কতদিন আগলে রাখব। অ্যাই আমি মরে গেলে তোর কি হবে রে?"

মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আর পাঁচটা ছেলের মতই। মাকে খুব ভালোবাসে সে। অনেক টুকরো ঘটনার কোলাজে নাট্যকার গড়তে থাকেন গুণধরকে। আর বারবারই তার আত্মস্বার্থহীনতার ছবিটি ফুটে ওঠে।

উজ্জ্বল, পবিত্র আর ছন্দার ত্রিকোণ প্রেমের গল্প সাময়িকভাবে পাঠককে ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। এখানে নাট্যকৌশলের অভিনবত্ব লক্ষণীয়। কারণ উক্ত ত্রিকোণ প্রেমের পুরো ঘটনাই টেলিফোন ভিত্তিক। উজ্জ্বল ও পবিত্র মঞ্চে এলেও ছন্দাকে কিন্তু দর্শকরা দেখতে পাননি। তবে দেখতে না পেলেও ছন্দার চরিত্রকে বুঝতে অসুবিধা হয় না আমাদের।

গুণধরের মতোই আমরাও যেন ছন্দাকে আমাদের মানসচোখে দেখতে পাই। পবিত্রর সঙ্গে গুণধরের কোন পরিচয় নেই। তার সঙ্গে ও সে একাত্মতা অনুভব করে। তার কষ্টে সেও সমব্যথী হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল যখন পবিত্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তখন গুণধর খুব খুশি হয়। তেমনি আবার উজ্জ্বল যখন তার বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গুণধর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আজকের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে বেশিরভাগ মানুষই আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে সেখানে দাঁড়িয়ে গুণধরের মতো চরিত্ররা আমাদের আশার আলো দেখিয়ে যায়। ডাক্তার দেখাতে ডাক্তারের সঙ্গে তার কথোপকথন তার চরিত্রের মানবিক দিককে আরোও স্পষ্ট করে তুলে হারুর ঠাকুমার ব্যথা কল্পনা দিদির দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়। গুণধরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ডাক্তার কখন যে রোগী হয়ে পড়ে সে নিজেও বুঝতে পারে না। শেষে জানা যায় যে- "সেদিন ওরা ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসার পর ডাক্তার একটু তাড়াতাড়ি চেম্বার বন্ধ করেছিলেন। অনেকদিন পর সেই রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি।"[৫]

এভাবেই গুণধর সমাজকে মানসিকভাবে সুস্থ করতে ব্রতী হয়ে ওঠে বার বার। বয়স্কা ভদ্রমহিলা গুণধরের দোকানে এলে গুণধরের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় ইচ্ছে করেই সে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে নকল টাকা নেয়। বাবা দুঃখ প্রকাশ করেন- " তোর কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না রে"?[৬]

এরকম প্রচুর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নাটকে বার বার দেখা যায় গুণধর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক শান্তনু রায়চৌধুরী বলেছেন-

"গুণধরের চরিত্রের কল্পনাশক্তির আতিশয্য এই নাটকে জাদু বাস্তবতার সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলে, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বড় প্রখর। তাই সে যে কোনো চরিত্রকে দেখার পর তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ অনায়াসে বলে দিতে পারে।"[৭]

তার চরিত্রের এই অতীন্দ্রিয় শক্তি তার চরিত্রকে যেন এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। পবিত্র-ছন্দা- উজ্জ্বলের টেলিফোনের কথা শুনেই সে তাদের চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করে নেয় এবং পাঠক-দর্শক মহল যেন অবহিত হয় গুণধরের মাধ্যমে। এখানেই নাট্য রচনার অভিনব কৌশলও যেন পরিলক্ষিত হয়।

অন্যের দুঃখে সহজেই কাতর হয়ে পড়া এক আবেগের তীব্রতা তার চরিত্রকে মানবিকতার এক উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এমন ব্যতিক্রমী ছেলে মা-বাবার মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কারণ তাদের মন ও চরিত্র চিরকালীন সমাজ ব্যবস্থার আদলে গড়ে ওঠা। তাই তো বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে ওঠেন— " বুড়ো হতে চললাম আর কতদিন আগলে রাখব?" [৮] নাটকের শেষ দিকে গুণধর যেন পবিত্রর চরিত্রে ঢুকে পড়ে।

পবিত্রর প্রয়োজন যেন তারই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। সে পবিত্রর হয়ে উজ্জ্বলের ঋণ পরিশোধ করতে এগিয়ে আসে। সে পবিত্রকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়। তার উক্তি তখন আর তার উক্তি না হয়ে পবিত্রর বক্তব্য হয়ে ওঠে। গুণধর পবিত্র হয়ে বলে ওঠে-

‘ আমার আনন্দ, আমার গান, আমার হারমোনিয়াম, আমার অসুস্থ মা, আমার মেহনতের ফসল আমার গলায় তুলতে দেবে না সে হিম্মত কার?”[৯]

এভাবেই গুণধর পৃথিবীর সব ব্যথা বেদনাকে আত্মস্থ করে নিয়ে সুখের বিস্তার করতে চায়। নাটকের শেষ দিকে গুণধর ক্ষুদ্র সামাজিক পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নকরে এক অজানা জগতের দিকেও অগ্রসর হয়। “ সে বলে ওঠে ওরা আমাকে ডাকছে।”[১০] এই ‘ওরা’ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিরা নন। এরা অনির্দিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিবর্গ- যারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। গুণধর যেন তাদের উদ্ধার কর্তা। বিশ্বের অগণিত মানুষের আহ্বান যেন তাকে সংসার ও সমাজের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকতে দেয় না। তাই সে সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে পা বাড়ায় নিরুদ্দেশের যাত্রাপথে। এভাবেই সে হারিয়ে যায় এবং যার সন্ধান নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই।

গুণধরের আশেপাশে অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা আবর্তিত হলেও নাটকটির মূল বিষয় গুণধর চরিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে উজ্জ্বল, পবিত্র বা ছন্দার গল্প সমান্তরালভাবে চললেও তেমন প্রাধান্য অর্জন করতে পারেনি। তবে সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার দিক থেকে দেখতে গেলে এই ত্রিকোণ প্রেমের গল্পটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্বই এর দশকের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা, বেকার সমস্যা, পোশাক, আহার, নারীর অবস্থান -অনেক কিছুর বাস্তব প্রকাশ ঘটেছে ত্রিকোণ প্রেমের গল্পটির মধ্য দিয়ে। শুধু তা-ই নয় চরিত্রটিও যেন আরও স্পষ্টতা পেয়েছে উজ্জ্বল ও পবিত্রর বিপ্রতীপে।

নাটকটির পটভূমি যে গুয়াহাটি শহর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এর বেশিরভাগ দৃশ্যই অভিনীত হয়েছে গুণধর এর বাবার দোকানে। যার ঠিকানা হচ্ছে বড়োবাজার গুয়াহাটি বারো। এই সূত্রে নাট্যকার অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুকৌশলে। যেমন ডাক্তারের চেম্বারে গুণধরের ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভূমিকম্প প্রবণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা। তবে ঘটনা প্রবাহের দিক থেকে নাটকটিকে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না এর আবেদন সর্বব্যাপী ও চিরকালীন।

নাটকটির অন্যতম এক প্রধান চরিত্র হচ্ছে টেলিফোন। উজ্জ্বল, ছন্দা, পবিত্রর ত্রিকোণ প্রেমের গল্প তথা তাদের চরিত্রের পরিচয় ও বিকাশ মূলত টেলিফোন কেন্দ্রিক। টেলিফোনকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা চরিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা বোধহয় আমরা এই নাটকেই প্রথম দেখতে পাই। আমরা নব্বইয়ের দশকের প্রচুর সিনেমায় টেলিফোনের ব্যবহার

দেখতে পেয়েছি। সিনেমার ঘটনা ও চরিত্রের উত্থান-পতনে টেলিফোনের একটা প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি। আসলে সে সময় জনজীবনে টেলিফোনের ব্যবহার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এদিক থেকে দেখতে গেলে নাটকটির কালগত পটভূমি যে নব্বই এর দশকের তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া পোস্টকার্ডের উল্লেখ ও ছন্দার বয়সী মেয়ের শাড়ি পড়ার বিবরণে নাটকটির কালগত পটভূমি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে আমাদের।

উপস্থাপনার দিক থেকেও নাটকটি ব্যতিক্রমী। প্রথমে দেখাযায় এই নাটকের চরিত্র যারা, তারা প্রকৃত চরিত্র নয়, এরা চরিত্রের ভূমিকাভিনেতা। যার উল্লেখ রয়েছে নাটকের শুরুতেই। এবং এই ভূমিকাটি নেতারা দাঁড়িয়ে আছেন মঞ্চে একটি নাটক উপস্থাপন করবেন বলে যে নাটকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে গুণধর চরিত্রের উপস্থাপনা। টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে গুণধর এর অসুখ স্পষ্ট করে তোলাই ছিল নাটকটির মূল অন্বিষ্ট অর্থাৎ নাটকের ভিতর নাটক দিয়েই নাটকটির সূচনা। অন্যদিকে চরিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এখানে প্রায় সব চরিত্রই আবর্তিত হয়েছে গুণধর চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। বাকি চরিত্রগুলোর সঙ্গে কথোপকথনের ও আচরণের মধ্য দিয়েই নাটকটির কেন্দ্রীয় গুণধর চরিত্রের প্রকাশ স্পষ্টতা পেয়েছে। উজ্জ্বল, পবিত্র ও ছন্দার গল্প মনে হয় Dramatic refief মাত্র। অন্যদিকে অধ্যাপক শান্তনু রায়চৌধুরীর মতে —

" নাটকটি একটি প্রয়োজন সঞ্জাত নাটক। অর্থাৎ এটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের সংকল্পে আবদ্ধ নাটক। এই নাটকটির উপযোগিতার ক্ষেত্রটি হল নিরুদ্দিষ্ট গুণধরকে খুঁজে বের করা।"[১১]

সুতরাং এদিক থেকেও নাটকটি যে ব্যতিক্রমী তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা জানি যে সংলাপ নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সংলাপের উপর নাটকের সার্থকতা অনেকাংশেই নির্ভরশীল। আলোচ্য নাটকটি ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে গুণধর চরিত্র অন্যান্য কলাকুশলী তথা নাটকের ঘটনাক্রম সবকিছুই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সার্থকতা পেয়েছে। শুধুমাত্র যথোপযুক্ত সংলাপ ব্যবহারের জন্যই। বলা যায় নামকরণের কথা এখানেও ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। পাঠক দর্শক প্রথমে নাটকটির নাম শুনে আকস্মিকতায় নিমগ্ন হন। সচরাচর এরকম নাম আমাদের চোখে পড়ে না। 'অসুখ' শব্দটি প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমেই তাই পাঠকের মনে যেন এক নেতিবাচক ধারণা জন্ম নেয়। তবে নাটক যতই এগোতে থাকে আমরা বুঝতে পারি এই অসুখের প্রকৃত স্বরূপ। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, "শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ আত্মচিন্তায় নিমগ্ন গুণধর সেখানে সমাজের সবার কথা চিন্তা করে। সবার দুঃখে দুঃখী হয় একাত্মতা অনুভব করে অন্যকে আনন্দে আপ্লুত করাতেই যেন তার তৃপ্তি। এমন ব্যতিক্রমী চরিত্র হয় না এই অসুখ আসলে মানবিক স্বরূপের নানা বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে বলতে গেলে নাটকটির নামকরণও ইঙ্গিতবাহী হয়ে

উঠেছে 'অসুখ' শব্দের ব্যবহারে। অধ্যাপক শান্তনু রায়চৌধুরীর মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"... গুণধরের নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য মানব সমাজ থেকে মানবতার অন্তর্ধানকে সূচিত করে। নাটকের দলের নিরুদ্দিষ্ট গুণধরের সন্ধান প্রকৃত অর্থে মানব সমাজে নতুন করে মানবতাকে আহ্বান জানানোর এই নামান্তর।"[১৩]

নাটকের একেবারে শেষে পবিত্র ও বাবার বক্তব্যে উক্ত মন্তব্যে সমর্থন পাওয়া যায় সহজেই। একদম শেষে পবিত্র বলে ওঠে—

" আপনাদের কারো সামান্যতম দুঃখেও যদি কোন অনাত্মীয় যুবকের দুই চোখ জলে ভরে ওঠে..."[১৪]

সুতরাং নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণধরের সন্ধান যাত্রা দেখা যায় তা যেন শুধুমাত্র ব্যক্তি গুণধরের অনুসন্ধান নয়- আমাদের মানবিক সত্তার অনুসন্ধানও। সুতরাং সার্বিক বিচারে বলা যায় সংলাপ চরিত্র বিষয় ও বর্ণনার অভিনবত্বে 'গুণধরের অসুখ' নাটকটি আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অভিনব সংযোজন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী নাট্যকারের কথা, 'গুণধরের অসুখ' বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ, গুয়াহাটি, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৭, পৃ.২৬।
২. শান্তনু রায়চৌধুরী- 'গুণধরের অসুখ অনাত্মীয় রক্তবন্ধনের কোলাজ' ভিকি পাবলিশার্স, ২০১৫,
৩. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৭০।
৭. শান্তনু রায়চৌধুরী-, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১।
৮. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৯০।
১০. পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪।
১১. শান্তনু রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩২।
১২. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫।
১৩. শান্তনু রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৪।
১৪. প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.৯৬।

লেখক : **ড. প্রিয়ব্রত নাথ,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,এস.এস কলেজ, হাইলাকান্দি,আসাম ।
Author : **Dr. Priyabrata Nath, Asstt. Professor, Bengali, S.S. College, Hailakandi, Assam.**

দেশভাগ : সব হারানোর কথকতা : প্রসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর'

■ রাজীব ঘোষ

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল রেডক্লিফের কলমের একটি আঁচড়ে রাতারাতি ভারত রাষ্ট্র তার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি সব নিয়ে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন হয়েছিল ভারত। কিন্তু 'দেশভাগ' নামক বিভীষিকাময় বিভাজনের হাত ধরে আসা আমাদের বহু আকাঙ্খিত সেই স্বাধীনতা, তার সাথে নিয়ে এসেছিল বিবিধ অস্থিরতাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকে, একে একে কালোবাজারি, মুনাফাবাজি, মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর, দারিদ্র, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতার কালোছায়া, সর্বোপরি উদ্বাস্তু নামক একটি শ্রেণীর সৃষ্টি সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতটিকে নাড়িয়ে দেয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের সৃষ্টির ফলস্বরূপ রাতারাতি মানুষ তার নিজভূমে পরিচিত হয় বিদেশি রূপে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মূলত শহর কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে মুসলমানেরা চলে যেতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেখান থেকে হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করে আসতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায়। অনিচ্ছাকৃত এই আসা-যাওয়ার পথে কত লক্ষ, অগণিত মানুষ হয়েছে বাস্তুচ্যুত, কতজন তার চোখের সামনে বিনষ্ট হতে দেখেছেন ঘরের আব্রু, কত লোক প্রাণ হারিয়েছে তার সঠিক হিসেব জানা যাবে না কোনোদিনও। পশ্চিমবঙ্গে আগত সেই উদ্বাস্তুদের স্থান হয়েছে বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেদিন তা ছিল নিতান্তই সামান্য। ধীরে ধীরে নরকময় এই জীবন তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলে তারা প্রতিবাদ করতে থাকে, জোট বাধে, গড়ে উঠতে থাকে উদ্বাস্তু কলোনী। অবধারিতভাবে সেদিন পরিবর্তন আসে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিন্যাসে, সামাজিক চালচিত্রে, মানুষের মনমানসিকতায়।

সামাজিক এই পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী রূপেই প্রভাবিত করেছিল সাহিত্য ক্ষেত্রকেও। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই সেদিন সমাজের আয়না হয়ে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারেনি। সময়ের হাত ধরে আসা জীবনের রূঢ় সত্য প্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধ সাহিত্যিকরা বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আঙ্গিকের পরিবর্তনের দিকেও ঝুঁকলেন। শুধুমাত্র গল্প, উপন্যাস নয়, নাটকেও দেখা গেল দর্শকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা। মঞ্চস্থ নাটকের প্রতিটি চরিত্র, বর্ণিত কাহিনি, সমস্যা, উত্থান, পরিণতির সাথে জনগণের আত্মার যোগাযোগ স্থাপনের এই চেষ্টা থেকেই জন্ম নেয় গণনাট্য। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় ঘোষ, শম্ভু মিত্র এবং অবশ্যই বিজন ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, 'Indian People's Theatre Associa-

tion' বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। গণনাট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যে নামটি অবশ্যম্ভাবীরূপে উঠে আসে, তিনি হলেন সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্য।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে ক্ষিরোদবিহারী ভট্টাচার্য এবং সুবর্ণপ্রভা দেবীর ছেলে বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম। পেশায় শিক্ষক ক্ষিরোদবিহারী মহাশয় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। পিতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার ফলস্বরূপ ছেলেবেলা থেকেই বিজন ভট্টাচার্য বিচিত্র ধরনের ভূমি সংলগ্ন মানুষের কাছাকাছি এসেছেন। তাদের জীবনযাত্রা, উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রথা ও রীতিনীতিকে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি খুব কাছের থেকে। ফলস্বরূপ পরবর্তীতে তাঁর নাটকের চরিত্ররাও হয়ে উঠেছে জীবন্ত, বাস্তবসম্মত ও মাটির কাছাকাছি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরবর্তীকালে কলকাতার কলেজে পড়াকালীন তিনি ছাত্র আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতিতে জড়িয়ে পরেন। ধীরে ধীরে মানবদরদী বিজন ভট্টাচার্য মার্ক্সীয় মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে অনুরক্ত হন। একসময় জীবিকা নির্বাহের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকরি নেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৯৪৩ এর ভয়াবহ মন্বন্তর নাড়িয়ে দিয়ে যায় তাঁর সত্তাকে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' রচিত ও মঞ্চস্থ হয়। এরপর সেই সম্ভার আরও ঋদ্ধ হয়েছে— 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪),'জীয়নকন্যা'(১৯৪৫), 'কলঙ্ক' (১৯৫০), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৯), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১),'দেবীগর্জন' (১৯৬৬),'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯) ইত্যাদি নাটক সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল সমকালীন সামাজিক, মানবিক, আত্মিক পরিস্থিতিকে।

গণনাট্য আন্দোলনের পথিক বিজন ভট্টাচার্য বাংলা নাট্যরচনার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার কথা, খুব সাধারণ ও বাস্তবসম্মতরূপে মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে সর্বদা। তাঁর বেশিরভাগ নাটকেই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী মানসিকতা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। কৃষকের দুরবস্থা, শ্রমিক শোষণ, মধ্যবিত্ত চরিত্রের ত্রিশঙ্কু অবস্থা এবং পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে বলিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা তার নাটকে সার্বিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ/১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হলেও ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শারদীয় 'বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত 'গোত্রান্তর'ও বিজন ভট্টাচার্যের এইরূপ একটি নাটক। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের মঞ্চে, ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয় নাটকটি। নাট্যকার স্বয়ং 'হরেন্দ্র মাস্টার' চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন। সমকালে দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতির হাত ধরে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক নয়, মানুষের পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকেও কিভাবে নিঃশব্দ পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল, তারই ছবি উঠে আসে 'গোত্রান্তর' নাটকে।

'গোত্রান্তর' নাটকে প্রথমেই দেখা যায়, মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে ডিস্ট্রিক্ট

বোর্ডের কাঁচা সড়কের পাশে শান্তি কলোনির দোচালা প্রাইমারি শিক্ষায়তনে। শিক্ষক হরেন্দ্র জনাকয়েক ছাত্র নিয়ে শিক্ষাদানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। বেশিরভাগ ছাত্রই তখন পরিবারের সাথে পাড়ি দিয়েছে শহরে। সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষ তখনও পায়ের নীচে শক্ত কোনো মাটি খুঁজে পায়নি; এমতাবস্থায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ থেকেও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর যোগাড় করা। হরেন্দ্র মাস্টারের আক্ষেপ বাস্তব চালচিত্র ফুটিয়ে তোলে—

"সব ঐতিহ্য কাটাকাপড়ের দোকানে গিয়া উঠছে, হুঁ: !"[১]

শুধুমাত্র শিক্ষা-ই নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে ভিন্ন চেহারাতে হলেও সংকটের উপস্থিতি ছিল। দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণির লোক-ই তাদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে পাড়ি দিচ্ছিল ভিনদেশে। সমাজে উচ্চবিত্ত, উচ্চশ্রেণির লোকেদের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে আরও বিভিন্ন পেশার যে মানুষেরা অর্থাৎ কামার, কুমোর, বাদ্যকার, নাপিত, গণৎকার, সেই অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষগুলি সেদিন উপার্জনহীন হয়ে পরে বাবু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগে। পটুয়া হরিপাল দুঃখ করে জানায়, আজকের মানুষ শহরাভিমুখী; তাদের এই এগিয়ে চলার স্রোতে সাধারণ লক্ষ্মী, দশভূজা বা গণেশের পট কেনার মতো বিলাসিতার সময় নেই কারও। দারিদ্র তার থাবা গেড়েছে সর্বত্র; মূল্যবৃদ্ধি তখন আকাশছোঁয়া। তাই হরেন মাস্টার পটুয়া হরিপালকে বলে—

> " তোমার সরার দেবদেবীর প্রাণ নাই পাল। নাইলে দেখতা, তোমার বেবাক দেবদেবী তাগো শত সহস্র বাহনগুলারে ল্যাজ মলা দিয়া ক্ষেপাইয়া তুল্যা, স্বর্গ-মর্ত্য রসাতলে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাইত। দেবতার ত্রিশূল দানবে হাত করছে পাল, আজ আমাদের এক কঠিন পরীক্ষা, বুঝলা !"[২]

সমকালীন দুঃসময়ে নবপ্রজন্মের উদ্দেশ্যহীনতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের চিন্তাও বিচলিত করেছে হরেন্দ্র মাস্টারকে। তাই সে হরিপালকে বলে—

> " আচ্ছা পাল মশায়, তুমি তো মূর্তিটূর্তি আঁক দেবদেবতাদের ? (বিষ্টুপদকে দেখিয়ে) তা বাঙলাদেশের এই উত্তরাধিকারের নি একখানা পট বানাইতে পার ! ... হাস, ভাব ফাজলামি করি ! কিন্তু এ-ও সাংঘাতিক কথা জানবা পাল, এইসব ছেলেপেলেদের কোনও ভবিষ্যৎ নাই। ভাবতে পার ?"[৩]

ধীরে ধীরে হরেন্দ্র মাস্টারও উপলব্ধি করতে থাকে যে এবার টিকে থাকার জন্য তাদেরও পাড়ি দিতে হবে শহরে। এরপর নীতিজ্ঞান ও আদর্শ শিক্ষকের সত্তা নিয়ে জীবনের ইঁদুর দৌঁড়ে টিকে থাকার লড়াইয়ে ক্লান্ত হরেন্দ্র মাস্টার একদিন বাধ্য হয়ে তার পরিবার ও ছোটোভাই কেশবের হাত ধরে পাড়ি দেয় স্বপ্ন নগরী কলকাতা। অপরিসর, মনুষ্য বসবাসের প্রায় অযোগ্য কলকাতার সেই ফ্ল্যাটবাড়িতে স্থান সংকুলান অসুবিধা জেনেও, চোখে অভাবের ছাপ তার উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিলেও হরেন্দ্র মাস্টার তার স্ত্রী শঙ্করী ও কন্যা গৌরী তা

বুঝতে চায় না। তারা নতুন একটি শুরুর আশায়, শুভ দিনের আশায় ভুলে থাকতে চায় সমস্ত যাতনাকে। কিন্তু বেশিদিন তাদের এই শহরে আসার মিথ্যে আনন্দে সত্যি দারিদ্রকে ঢাকার অভিনয় চলে না। কাবুলিওয়ালা এসে বাড়ি ভাড়া আদায়ের জন্য হুমকি দিয়ে যায়। কেশবের চাকরি চলে যাবার চিঠি এসে পরে হরেন্দ্রর হাতে। অবস্থার কাঠিন্য আদর্শ শিক্ষক হরেন্দ্রকে বাধ্য করে, আভিজাত্যবোধ এবং শিক্ষক হিসাবে দম্ভ ও অহঙ্কার ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় ফেরী করে উপার্জন করতে। তাঁর স্ত্রী শঙ্করীর বক্তব্য সমকালীন সময়ের বলি প্রতিটি নারী জীবনের জ্বলজ্যান্ত ছবি হয়ে ওঠে—

> "দ্যাখ তাই, ঘরের বউ-ঝিরে কী অমানুষ বানাইছ তোমরা। শুধা মাইয়া মানষের জান, কয় বলে কাছিমের পরান, তাই টিক্যা আছি আইজও। সেই যে আছিল এক ছিন্নমস্তা, নিজ হাতে নিজ মুণ্ডু, নিজ রক্ত নিজে খাইয়া বাঁচে, তা আমরাও তাই।"[৪]

একদিকে যখন হরেন্দ্র মাস্টার,শঙ্করী বা কেশবের মতো চরিত্ররা তাদের মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার, ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য সর্বোপরি একমাত্র মান-মর্যাদাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল, তখন অপরদিকে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি দিন দিন আরও ফুলে ফেঁপে উঠছিল; পাশাপাশি তাদের অর্থলোলুপতা, নির্মমতা, অমানবিকতাও একই হারে বেড়ে যাচ্ছিল। সামান্য অর্থের জন্য তারা কতটুকু নীচে নামতে পারে, তার উদাহরণ দেখি উচ্চবিত্ত মালিকের কাবুলিওয়ালা মারফত বাড়ি ভাড়া আদায়ের চিত্রে। হরেন্দ্র মাস্টারের উক্তি আমাদের সামনে সেইসব মানুষদের স্বরূপ উন্মোচিত করে—

> " ঘরে বইয়া আইস্যা হামলা করে মশায়। ঘরের মাইয়াগো পর্যন্ত ইজ্জৎ রাইখ্যা কথা কয় না— এগুলা তো পূব পশ্চিম কোন বঙ্গেরই না। "[৫]

সমকালীন সময়ের ফসল হিসেবে মূল্যবোধহীনতা, সহানুভূতিশীল মনুষ্যত্বের পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসার উদাহরণ হরেন্দ্র মাস্টারের এই আক্ষেপটুকু।

নাটকের অগ্রগতির সাথে সাথে দেখি, ধীরে ধীরে ভদ্র জীবনের মুখোশ খসে পড়েছে। হরেন্দ্র মাস্টারের পরিবারের ঠাঁই হয় বস্তিতে। সমাজের তথাকথিত ভদ্ররা যখন অবজ্ঞায়, স্বার্থচিন্তায়, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল তখন আর্থিক ক্ষমতায় প্রায় নিঃস্ব হয়েও মানবিকতায় অনেক বেশি ধনী ও উজ্জ্বল বস্তিবাসীদের মাঝে স্থান হয় তাদের। এতদিন পর্যন্ত ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এই মাপকাঠির আবরণে ঢাকা ছিল সমাজ; সময়ের সংকট ধীরে ধীরে সবাইকে একই গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত করে দিতে থাকে। শৈলী চরিত্রের মুখে তাই শোনা যায়—

"দুঃখীর কোনও জাত নেই মা। আমরা সব দুঃখী। আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে তো? তবে আমরা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব না, এটা ঠিক!"[৬]

কিন্তু সে বস্তিতেও তাদের লিপ্ত হতে হয়েছে অস্তিত্বের সংগ্রামে। এই অবস্থায়

খুব স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ ছিল না সমাজের নারীরা। গৌরীও বাদ যায় না সেই নোংরা নজর থেকে। ধীরে ধীরে এই বস্তিতেই তারা একত্র হয়, গড়ে উঠতে থাকে তাদের ঐক্য। হরেন্দ্র আবার সুযোগ পায় বস্তিবাসীদের শিক্ষাদান করার। কিন্তু এ শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত নয়, এবার হরেন্দ্র মাস্টার শিক্ষা দেয় জীবনের—

> "... না খবরদার না — আমরা ক -তে কলাগাছ কমু না, খ'-তে খরগোস বলব না! আমরা বলব ক-তে কলকারখানা, খ-তে খেতখামার, গ-তে গান্ধীরাজা, ঘ-তে ঘর ঘর ভাই, ঙ-তে উয়াং চুয়াং, চ-তে চল বাড়ি চল, ছ-তে ছোলাছাতু ...।"[৭]

সময়ের অভিঘাত মানবজীবনকে, তাদের মানসিকতায় পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল ঠিকই, কিন্তু পুরাতন সংস্কার, দম্ভ, অহংকার, মিথ্যা-কৌলিন্য চেতনা কিছু সংখ্যক মানুষকে করে তুলেছিল আরও সংকটাপন্ন। তারা না পারছিল নিজেদের উচ্চশ্রেণির অংশভুক্ত করতে, না পারছিল নিম্নশ্রেণির সমগোত্রীয় বলে মেনে নিতে। তাদের অস্তিত্বের সংকট হয়ে উঠছিল দিন দিন আরও গভীরতর। এই নাটকে হরেন্দ্র মাষ্টারের স্ত্রী শঙ্করীর মধ্যেও দেখেছি সেই সংকট। তথাকথিত ভদ্রতা ও ভদ্রলোকের মাপকাঠি সমন্বিত সংকীর্ণ গণ্ডি কিছুতেই পরিবর্তিত হয় না তার। তাই আত্মবিশ্বাসী, খেটে-খাওয়া যুবক কানাইও শুধুমাত্র শ্রমিকও বস্তিবাসী হবার অপরাধে, শঙ্করীর কন্যা সম্প্রদানের উপযুক্ত পাত্র হয়ে উঠতে পারে না। কানাইয়ের তুলনায় নারীর দালাল ভামিনীকে তার অনেক বেশি বিশ্বস্ত বলে মনে হয়। কারণ সে গৌরীকে একজন বড়বাবুর নেকনজরে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এভাবে নিজের মেয়েকে পাত্রস্থ করে সমাজে একটি মানদণ্ডে মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করার নামান্তরে নিজেদের-ই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় শঙ্করী। যদিও একদিন শঙ্করীকেও সময়ের হাতে পরিবর্তিত সামাজিক মানদন্ডকে মেনে নিতে হয় বাধ্য হয়ে। অবশেষে কানাই ও গৌরীর শুভপরিণয় অনুষ্ঠিত হলেও, রাতের অন্ধকারে হরিধনের অমানবিক আক্রমণে আবার আগুন জ্বলে ওঠে বস্তিতে। শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম ও প্রতিবাদ- প্রতিরোধের আগুনকেই বিজয়ীর আসনে বসান নাট্যকার। তারা সত্য ও সৎসাহসে ভর করে হঠিয়ে দেয় পাপ ও পাপীকে।

স্বাধীনতা উত্তর বিশ শতকীয় সমাজে সেদিন ন্যূনতম টিকে থাকার সংগ্রামে ছিন্নমূল মানুষ কিভাবে নিজেদের অভিযোজন ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র উঠে এসেছে এখানে। দেশভাগ যেখানে সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়াকেই মানুষের ভবিতব্যতে পরিণত করেছিল, সেদিন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য দেখালেন যে— আজ সমাজ ও তার মানবসম্পদের কাছে জাত, বংশমর্যাদা, পেশা, অর্থ নির্বিশেষে গোত্রান্তর-ই চূড়ান্ত বাস্তব। নাম, গোত্র, মান, মাথার উপরের ছাদ, ক্ষুধার অন্ন সব-ই যখন জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ তখন টিকে থাকার লড়াইয়ে গোত্রান্তরই একমাত্র রাস্তা। সময়ের সংকট গোত্রান্তর ঘটিয়েছিল সামাজিক

অবস্থানে, আর্থিক অবস্থায়, মন-মানসিকতায়। বাস্তব জীবনকে অঙ্গীকার করে রচিত যে সাহিত্য, তাতেও সেই সত্যের অপলাপ হতে পারে না। তাই এই গোত্রান্তরের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের এক শুভদিনের ইঙ্গিতটুকু-ই দিয়েছেন নাট্যকার। তিনি বলছেন—

> " অঙ্গ ছাপিয়ে কেন আঙ্গিক বড়ো নয়, নামগোত্র জলাঞ্জলি গেলেও কেন মেয়ের গোত্রান্তরে বিয়ে হবে না, আত্মপ্রত্যয়শীল শ্রমিক যুবক কেন বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের রাঙা টুকটুকে বর নয়, সংস্কারান্ধ মধ্যবিত্ত মানসে এই যুগসত্য অস্পষ্ট থাকলেও, বৃহত্তর মানবসমাজের চৈতন্য বুদ্ধির দরবারে এই প্রশ্নের উত্তর চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে।
>
> নীতিবাদের প্রশ্ন নয়— জীবনের ক্ষেত্রেই 'গোত্রান্তর' আজ যুগসত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জ্বল - নাটকে তার অপলাপ করা কোনও নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না। কারন জীবনবিচ্যুত শিল্পরসের উন্মার্গ সন্ধানে যে স্বখ্যাত আত্মরতির প্রশ্রয় আছে, তাতে ডুবে মরাই যায়- প্রাণ পাওয়া যায় না। "[৮]

দেশভাগ জাতির কাছে যে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছিল, তার প্রতি দায় আমাদের অনেকটা থাকলেও তাকে উপলব্ধি করার দায়িত্বের অভাব প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়েছে। সময়ের ঘেরাটোপে বন্দী সমাজ ও তার মানুষের সেই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে এক নবজীবনের সূচনা করতে গেলে যে সর্বতোভাবে গোত্রান্তর-ই সেদিন একমাত্র পথ ছিল সেই ইঙ্গিত দিয়েই নাট্যকার নাটকটি শেষ করেছেন।

উল্লেখপঞ্জিঃ

১। বিজন ভট্টাচার্য, "গোত্রান্তর", 'বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)', (নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৮, পৃ.৩৪৯
২। তদেব, পৃ.৩৫১, ৩। তদেব, পৃ. ৩৫০, ৪। তদেব, পৃ. ৩৫৫, ৫। তদেব, পৃ. ৩৭৫
৬। তদেব, পৃ. ৩৭৭ । তদেব, পৃ. ৩৮৬
৮। বিজন ভট্টাচার্য, "ভূমিকা", "গোত্রান্তর", 'বিজন ভট্টাচার্য রচনা সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)', (নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০০৮, পৃ.৩৪৪

লেখক : **ড. রাজীব ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, বিলোনীয়া, ত্রিপুরা।**

Author : **Dr. Rajib Ghosh, Asstt. Professor, Bengali, Iswarchandra Vidyasagar College, Belonia, Tripura.**

BIKRAM DATTA
Govt. Contractor & Order Supplier
Belonia, South Tripura
Mobile : 8416087995
(Development of DTW Scheme by own
Air compressor Machine - 450MX 1100C FM)

ENGLISH
ARTICLE

বাংলা
না ট ক

PERFORMING THE TIGER:
Bagher Magon, nocturnal Agartala and a rendezvous

■ **Ashes Gupta**

Come grass in stealthy steps, let me touch you and say I love you.
Come grass sprinkling colours,
let me write down the endearing smile.
With a dimpled sunny cheek, the bird pecks corn
on your body. ('Grass', *The Mystic Mountain*, p.137, trans.mine)

As the day crept in stealthily, the hesitant mist reluctantly faded out from the wintry landscape. The aroma of peeled oranges and morning tea with impromptu cricket on dewy grass breathed in an air of laziness. Mridul Debroy's lines candidly paints a winter scene so typical of Agartala, where the evening like a shaman, cast a spell with a chill. It was the month of Magh[1] and the nights were intercepted by the occasional howl of a jackal. Wayback in the 60's and 70's electricity like a finicky lass played truant games and nocturnal Agartala attempted visibility through candles and lanterns. For bigger occasions there was the petromax (the hazak light). Suddenly the silence of the night was broken with the thudding of sticks on the ground and the chanting of rhyme like utterances in dialectical Bangla.

সিক্কা লড়ে, সিক্কা লড়ে
ঝর্ঝরাইয়া টাকা পড়ে।
এউগ্লা টাকা পাইলাম রে
বাইন্যা বাড়ি গেলাম রে,
বাইন্যা বাড়ি ঢুপির ছাউ
এউগ্লা ঢুপি নিবারে
আমরা তো মাগিয়া খাই
বাঘের নামে শিন্নী চাই।
বাঘাই গেল রাঘাইপুর
কিন্যা আনলো চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলে বর্তমান, আসু আসু করে ধান ... ...
হেইও হো, হেইও হো ... ... ।

(traditional, as quoted by Bibhu Bhattacharjee)

(A literal translation of this is next to impossible partly due to the almost nonsensical nature of the lyrics. However, the intricate ritual of emulating a tiger and highlighting the plight of the subaltern classes who performed this

folk ritual is evident here from the words 'বাঘা বাঘ বাঘাই' meaning 'tiger' and 'মাগিয়া খাই' meaning 'beg to survive' or mendicancy).

The strangeness of this ritualistic utterance with masked faces in the darkness visible, the approximation of a tiger's form and the thudding sound created a mystic and sinister prelude for a lanky hand thrust out in expectation of alms. The young boy rubbing sleep out of his eyes stood startled as he watched a performance of 'Bagher Magon' (বাঘের মাগন)- the Tiger's Mendicancy. Far away a night bird took its flight with the flapping of drowsy wings.

Performing the tiger is archetypal and various forms of this performance is scattered across the length and breadth of South East Asia, once the happy hunting ground of this species. Human history of survival in such terrains encodes fighting with the tiger, appeasing it, worshipping it, narrating its escapades and its mystic powers of shape shifting or, as in this case of Bagher Magon- performing it.The intricate rituals of Dokhin Ray [2] (whose vahana or conveyance is the tiger) of the mangroves of Sunderbans or the belief of shape shifting weretigers of the Garos of Meghalaya[3] are all cases in point. The tiger has long been regarded as a major symbol of masculine yang[4] energy and the king of the animals in ancient Chinawhere it was believed that tigers could live for a thousand years and turn white or albino after living five centuries. Infact, man's awe of the tiger probably stems from his association of the latter with a sense of hypermasculinity[5] (body parts of the tiger have been associated with aphrodisiac properties in South East Asia) and a certain logic-defying aesthetic of ferocity coupled with beauty has always accounted for its mystic aura. At the more mundane and human level, such responses for the tiger are widespread in those areas where, till date, life means a continuous struggle for survival against this beast. For it is but human to deify that which is otherwise unsurmountable. And the same is true for the plebeian, subaltern classes ('ইতরজন', 'ছোটলোক') in and around the town of Agartala or from across the border, who undertook to perform the tiger in Bagher Magon. It was a transformation, a metaphorical shape shifting in the name of this ritualistic performance, that atleast, for the time being, transported the subaltern and the marginalised to a sublime plane beyond all the negative codifications of the society dominated by the upper classes. In its own unique way this performance also transcended the shackles of

Brahmanical Hinduism and aligned itself with an alternate spirituality in line with Tantra[6] and other esoteric cults. The idea was to emulate and worship the tiger whose wrath could wreak havoc in their lives. However, one might argue that Agartala or for that reason Tripura of 60's and 70's was already devoid of the tiger in its fast-depleting forest cover and hence this seems to be a very loose conjecture. But it should be remembered that what might have started as a ritual of necessity centuries ago against the real threat of a predator, survives as a performance down the annals of history encoding intense cultural and mystical patterns.

In order to trace the roots of this performance in the topography and culture of Tripura, I realised that it was essential for me to explore the folk traditions of tiger worship and performance in the pre-partitioned Bengalthat included erstwhile East Pakistan, now Bangladesh. The reader should keep in mind that undivided Tripura had Comilla and the Chittagong Hill Tracts (CHT) under the royal jurisdiction and even post 1947 and after the Bangladesh War of Liberation or Muktijuddho of 1971, the Indo-Bangla border had remained remarkably porous, allowing movement to and from both sides. And remembering that intangible culture is the only baggage that can be most conveniently and invisibly 'smuggled' across any international border, it is but natural that much of what was practiced in East Bengal (Bangladesh) easily sipped in to Tripura, courtesy refugee influx and exodus as well as porous state of the border. The same was true for Bagher Magon. The etymological roots of the word 'Bagha' (বাঘা), according to folklorist Gopendrakrishna Basu, is basically a ritual for worshipping the Tiger God. Cowherds of Maimansingh district of Bangladesh performed this ritual that culminated in Chaitrasankranti[7]. Throughout the entire month they would collect alms (‘ঢোলা’ অথবা ‘মাগন’) from the villagers in the name of Baghai by singing or rather reciting verses that were known as Baghair borat (বাঘাইর বরাত). On the day of Sankranti they prepared a meal from what they received as alms and left the first portion of the meal for the Tiger God 'Baghai' by the firnges of the forest, while they consumed the rest as prasad. This ritual of appeasement ended with a prayer to Baghai to spare their cattle and livestock.The form that I witnessed as a child must have undergone multiple modifications and mutations that converged in camouflaging

like a tiger, thudding sticks in unison, swaying with the beats of the dhak[8]-all to create a better impact on the spectator coupled with the dark night, howling jackals and the eeriness of a sleepy town.

The socio-cultural and economic context of the plebeian classes to which performers of Bagher Magon belonged was such that it perpetuated a sense of alienation not only from the intricate ritualistic refinement of Brahmanical Hinduism of the upper classes, but also induced in them an urge to shape a subaltern pantheon of gods and goddesses that related to their real-life ordeal of existence. For them notions of rarefied spirituality and asceticism were remote and farfetched, as were the scriptures that transmitted and disseminated such mystic philosophies. Hence, they sought recourse to such ritualistic performances that served a dual purpose; of venerating a force that could guarantee their sustenance if properly appeased, and to fashion in their own way cultural texts out of these performances and rituals such as Padmapuran that celebrates the feats of the Snake Goddess Manasa (oftene referred to as 'বই' and the ritualistic reading and recitation as 'বই পড়া' in this part of the country).The Bhadralok[9] class of Agartala had little affinity to these performers of Bagher Magon and for them this was a shabby uncouth performance that lacked sophistication, culture and class. Thus, the obvious shortcut was to get rid of these nocturnal nuisances with a bowl of rice, a handful of dal and some potatoes. I believe that such performances hardly ever communicated the wrath of the tiger that might befall the Bhadralok if the latter denied alms to these mendicants since, the threat of the tiger in the urbanscape of Agartala town of the 60's and 70's was farfetched and meaningless, and also because by then the performers had themselves moved away from the original means of livelihood (that of cowherds living on the fringes of the forests haunted by tigers) and hence for them too, this had become a mere ritualistic performance for money. Those who performed Bagher Magon in my childhood belonged to the subaltern classes of the daily labourers, famished farmers, rickshaw pullers and so on,but never cowherds.

Variations in the performances of Bagher Magon across the districts of Tripura has been registered. For instance, the version that I witnessed as a boy had masked performers in artificial tiger skins with sticks and petromax or kerosene lanterns in their hands. But Bibhu Bhattacharjee of Tripura Theatre in a telephonic conversation told me

that the performances that he saw in his boyhood days at Khowai were accompanied by Hara Gouri[10] and dhak. However, the centrality of Bagh or Baghai as the deity was retained.I would request the reader not to overlook the economic motive of money making that the rustic compositions of Baghair borat (বাঘাইর বরাত) encoded,as is evident in the lines:

সিক্কা লড়ে, সিক্কা লড়ে
ঝর্ঝরাইয়া টাকা পড়ে।
এউগ্না টাকা পাইলাম রে
বাইন্যা বাড়ি গেলাম রে.....

This is reflective of the plight of these plebeian classes for whom such a performance probably ensured a square meal. But at the sametime this is also reflective of how, with the change of times, the notion of alms sought by the mendicant performer that consisted of sidha[11]comprising of food grains, pulses, vegetables and edible oil, was gradually replaced by coins and currency, though the ritualistic performance continued unabated embracing modifications and innovations. This is an instance of the dynamicity of the folk form, that survives even in the digital confines of the Coke Studio. And before I forget, as a post-performance reflection I am intrigued by the absence of women in such performances of Bagher Magon, for in the variations where Gouri is also present, the part of the goddess was enacted invariably by boys. I leave this question open ended and for the readers to speculate, but I do so with a hint at the double jeopardy faced by the women of these plebeian classes, of being a woman and a plebeian at the same time and hence their annihilation from the performance. Or does it have to do with the hyper masculinity of the tiger cult which, even within the confines of marginalised classes, shuns compromise through the portrayal of a female in performance?

And so fi nally, the famished tigers of performance retreat muttering obscenities and cutting bawdy jokes at the landlord, moving to the next house hopeful of a better prospect. The sleepy town echoes the thudding and chanting of eerievoices as they fadeout and silence is restored.The Bhadralok of Agartala ignore it as another interruption in an otherwise cultured life of taste and finesse, of Tagore and occasional Marx, and smudge it off from their mnemonics. But the trajectory of

this performance leaves an indelible imprint on my mind and today when Iattempt to document this, I unearth layers of connotations that defy simplification. And as I sign off, I c an not resist quoting Mridul Debroy once again, for life comes a full circle and such nostalgic memories from the past bring sout the primordial elemental being in our psyche that syncs with the primal equation of the hunter and the hunted:

When innumerable stars climb up the sky,
I feel like one of those
primeval men of the world.
One who has not learnt to dress
Moves in a dense forest
hungry, in search of prey.
A gradual leaf-shedding darkness all around
tongue licking the lips of exhaustion.

Yet he doesn't know,
any moment,
he himself can be hunted. ('Hemlock I',*The Mystic Mountain*, p-132, trans.mine)

NOTES:

1. The tenth month in the Bengali calendarand is the last month of the two months of winter season viz. Poush and Magh.

2. A deity worshipped in Sunderbans who is believed to control all the beasts of the jungle and hence needs to be propitiated for safety.

3. A tribal group who live in India (western highlands of Meghalaya and the southern foothills of Assam) and northern Bangladesh, are noted for their diverse beliefs on weretigers - that is, human beings with the ability of turning themselves, in various ways, into ferocious tigers and subsequently back to human form.

4. The masculine active principle in nature that in Chinese cosmology is exhibited in light, heat, or dryness and that combines with yin to produce all that comes to be.

5. Exaggerated image of hegemonic masculinity, mainly in the media. It over emphasises the ideals, such as physical strength, aggression and sexuality set out for men, thereby reinforcing them.

6. The philosophy and set of spiritual practices that emerged in India around the 6th Century, focused on the direction and manipulation of universal energy

as a means of liberation.Though it is most commonly understood to be a co-development of esoteric Hindu and Buddhism traditions, Tantra has also influenced a variety of Eastern religions such as Daoism, Shinto, Jainism and Tibetan Bon.

7. Celebrated on the last day of Chaitra that marked the beginning of the farming season in the Bengali calendar.

8. A membranophonic percussion instrument from Bengal, suspended from the neckand usually played with sticks. The left side is coated to give it a heavier sound. The player is known as Dhaki.

9. The proclaimed original inhabitant of Kolkata and West Bengal. Bhadralok (Bengali: ভদ্রলোক *bhôdrôlok*, literally 'gentleman', 'well-mannered person') is Bengali for the new class of 'gentlefolk' who arose during British rule in India (approximately 1757 to 1947) in Bengal region in the eastern part of the Indian subcontinent. Most, though not all, members of the Bhadralok class are upper caste, mainly Baidyas, Brahmins, Kayasthas, and later Mahishyas. There is no precise translation of Bhadralok in English, since it attributes economic and class privilege on to caste ascendancy. The two biggest factors that led to the rise of the Bhadralok were the huge fortunes many merchant houses made from aiding the English East India Company's trade up the Ganga valley, and Western-style education (at the hands of the colonial rulers and of missionaries). The steep rise in real estate prices in Calcutta also led some petty landlords in the area to become wealthy overnight. The first identifiable Bhadralok figure is undoubtedly Ram Mohan Roy, who bridged the gap between the Persianised nobility of the Sultanate era in Bengal and the new, Western-educated, nouveau riche class.

10. The other name for Shiva alias Mahadev, the etymological root for the pro-Hindu slogan Har Har Mahadev, while Gouri alias Parbati alias Uma is his wife.

11. Almsinthe form of paddy, dal,vegetables and edible oil.

REFERENCES: (In English):

Banerjee, Sumanta. 'Bogey of the Bawdy: Changing Concept of 'Obscenity' in 19th Century Bengali Culture'. EPW.Vol.22.No.29 (July 18th,1987). p.1197-1206.

http://www.jstor.org/stable/4377248.(accessed on 14 Nov.2019).

"Bhadralok". *Wikipedia*, Wikimedia Foundation,https://en.wikipedia.org/wiki/Bhadralok. Chakraborty, Bidyut. *The Partition of Bengal and Assam: Contours of Freedom.* Routledge. 2004..

Chakraborty, Prafulla K., *The Marginal Men*. Lumiere Books, 1990.

Chatterjee, Partha. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse.*Oxford University Press. 1986.

Ghosh, Parimal.'Where Have All the 'Bhadraloks' Gone?' *Economic and Political Weekly,* Vol. 39, No. 3 (Jan. 17-23, 2004), pp. 247-251, 2004.

http://www.jstor.com/stable/4414522, (accessed on 11 Dec.2019).

Gupta, Ashes. 'Living the dream: narrating a landscape lost and a land left behind.'

Sengupta, Jayita ed.Barbed Wire: Borders and Partitions in South Asia.

Routledge , 2012; pp: 50-65.

_---------- ed. *The Mystic Mountain: An Anthology of Tripura Bangla Poetry in English.* Akshar Pub.: Agartala, 2017.

(In Bengali):

চৌধুরী, দুলাল। সম্পা. 'বাংলার লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ', আকাদেমি অব ফোকলোর : কলকাতা

দাস, নির্মল। ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা, বুক ওয়ার্ল্ড : কলকাতা, ২০০৮ ।

ফ্লেমিংস দই। 'ভারতকোষ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : কলিকাতা, ১৯৭২ ।

রায়বর্ধন, অশোকানন্দ। 'দক্ষিণ ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি ও বাঘ', বুক ওয়ার্ল্ড : কলকাতা, ২০০৮।

I am indebted to Dr. Nirmal Das, Dept. of Bengali, Tripura University and Sri Bibhu Bhattacharjee, Editor,Tripura Theatre for their valuable inputs about Bagher Magon.

Author : **Ashes Gupta, Professor, Dept. of English, Tripura University (A Central University)**

The Case of the Murder in the Park
The Third Assassin in *Macbeth*

Tapu Biswas

But Who Did Bid Thee Come On the Stage?
William Shakespeare

A theatre director looks at Shakespeare with the assumption that his huge popularity was based on his comprehensive understanding of how plays work on the stage. In his mind, it is even possible that Shakespeare did not care about publishing his plays because he knew that printed words cannot do justice to the living experience that we call theatre.

However, after nearly half a millennium, we are obliged to reconstruct his stage vision and theatrical intent from problematic texts, and perforce substitute our own interpretations for what might (or might not) have been the author's. Though this is true of staged plays in general, it becomes crucial in such instances as the presence of the 3rd Murderer in *Macbeth* (Act III Sc iii). Our problem is: what is this character doing on the stage? Why do not two assassins suffice for killing Banquo? Of course Banquo was a redoubtable warrior; but on a stage where a handful of men traditionally represented swarms of soldiers or a plethoraof plebeians, two killers in the dark would surely have sufficed!

Raffel in his edition of *Macbeth*, citing the presence of powerful eidetic memory in oral cultures (and assuming that the Elizabethan audience shared the acute linguistic sensibility of a twentieth century literary critic) quite successfully conveys to us how the Elizabethan audience, with their profound belief in magic, must have reacted to the eerie atmosphere of the play: through the play's language shot through and through with magic and witchcraft symbolism. (Raffel 2005, xixff) But in the process he also overlooks the fact that the Elizabethan audience also *saw* the play, and visible anomalies would certainly have attracted their attention to the detriment of the play's appreciation. As Aristotle cautions us:

> The poet should remember (1) to put the actual scenes as far as possible before his eyes. In this way, seeing everything with the vividness of an eye-witness as it were, he will devise what is appropriate, and be least likely to overlook incongruities. This is shown by what was censured in Carcinus, the return of Amphiareus from the sanctuary; it would have passed unnoticed, if it had not been actually seen by the audience; but on the stage his play failed, the incongruity of the incident offending the spectators. (Poetics 1455a [trans. Bywater 1920])

Less than half a century before Raffel, however, Bernard Lott had advised us to the effect that

> We may sometimes forget that what we have before us is not essentially a book at all, but the words of a play, something which was written to be spoken and acted on the stage of a theatre. (Lott 1958,x-xi).

Yet both Raffel and Lott have largely avoided discussing the problem regarding the worrisome stagepresence of the 3rd Murderer. Perhaps they considered the problem unsolvable. That is why we need to take a fresh look at the problem over again, from a theatre Director's perspective, taking passingnote of the ground already covered by previous major commentaries.

The murder of Banquo falls into two parts: preparation (III.i) and execution (III.iii). The first part shows Macbeth telling the two murderers that he will acquaint them 'with the perfect spy o'th' time' 'within the hour'. In the second we find the hour elapsed, and the pair joined by a mysterious third murderer whose authenticity is questioned by the first. There is the explanation that the earlier 'acquaint thee' indicates that Macbeth himself will supply the exact information/view ('spy') regarding the time. Shakespeare, with his penchant for mixing up his metaphors, could well have had this in his mind. This literal meaning of 'spy' have led some critics (Clark 2015, 209: 'The sense of 'espial', observation, keeping watch, seems most appropriate to spy') to argue that Macbeth himself would be there at the murder spot to 'acquaint' the killers with the exact moment of action.

This argument for Macbeth's personal presence at the crime scene is potently absurd. What about his guests at the palace, who are supposed to congregate at seven in the evening (III.i.40)? Moreover, as noted by Dover Wilson (Wilson 1947, 137), the appearance of the 1st Murderer in the banquet scene would be completely superfluous. Macbeth's eager queries about Banquo's death, and especially his frustration at Fleance's escape would simply be useless burdens, indeed, distractions, in this tensely wrought scene. Thus, to argue Macbeth'spresence at the murder scene is to assume that Shakespeare had no idea of what theatre is about.

The notion that Macbeth was the 3rd Murderer was introduced by Allan Park Paton in *Notes and Queries* 1869 (Furness1873, 160; Paton for some reason had assumed that the guests had gathered around midnight, although the 2nd Murderer says that all except Banquo were already there by nightfall) which gave rise to much controversy and discussion, altogether disregarding the fact that Macbeth himself had planned to avoid direct involvement in the murder:

> Though I could With bare-faced power sweep him from my sight. . . . yet I must not, . .. but wail his fall Who I myself struck down. (III.i.120-25)

Dover Wilson's suggestion that Macbeth would have been extra-cautious about leaving behind witnesses to this murder seems apposite, since the two murderers, like the two grooms earlier, would become eye-witnesses to his crimehad he personally involved himself in Banquo's death. Therefore, from the perspective of the character's psychology and motivation, Macbeth is unlikely to have beenthe 3rdMurderer.

But then, who *is* the 3rd Murderer ? Dover Wilson comments thus onthe 'perfect spy o'th' time':

> Obscure. Johnson and others take it as referring to 3rd Murderer in 3. 3 to whom Macbeth] delivers detailed instructions. Others again explain as 'the knowledge, or espial, of the perfect time to act' (E.K.Chambers.); 'spy' lit.-'espial, observation' (Kittrege). I agree with Johnson and suggest that a line or two, making the reference clear, has been cut after 1. 129.

And again on the stage direction at III. iii.:

> The presence of the 3rd Murderer has exercised critics, some maintaining him to be Macbeth incognito. This is irreconcilable with Macbeth's consternation at the news of Fleance's escape (3. 4. 21 f.), and with 'Thou canst not say I did it' (ibid. 50). I suggest that Shakespeare adds him (perhaps originally introducing him at the end of 3. 1) to show that Macbeth, tyrant-like, feels he must spy even upon his own chosen instruments.

However, Shakespeare the theatre person habitually, or rather professionally, makes such obscure intentions clear through dialogues, as at III.i.120-25 and IV.i.145-47. Nor does he leave us to speculate on the reasons for the two princes' flight from Scotland. Even at III.i. Macbeth supplies us with his reasons for killing Banquo *after* he has arranged to meet the murderers, and extracted the necessary information from Banquo about his journey.

Clark (2015) comments on" the perfect spy o'th' time':

> A problematic expression. Johnson took it to refer to the Third Murderer, and emended *the* to 'a'. But this seems too literal minded, and inconsistent with the Murderers' surprise when the Third Murderer appears in 3.3. OED spy n. 4 gives 'the action of spying, secret observation or watching', citing this passage. The sense of 'espial', observation, keeping watch, seems most appropriate to spy.

The natural question here would be: why should Macbeth tell the murderers that he (or an agent of his) will spy on them? And Clark adds a further note on 3.3.01:

> Speculations as to the identity of theThird Murderer have included Ross and Macbeth himself. *Directors (e.g. Irving, Nunn) have favoured Seyton*. Macbeth'sanxiety in 3.4 seems to rule him out, and as Dover Wilson says, the introduction of a further assassin shows that Macbeth,'tyrant-like, feels he must spy even uponhis own chosen instruments' (137).Furness reviews the several candidates,Williams, 'Third', dismisses the idea that Macbeth himself was the Murderer, and Wiggins discusses the relations between the three (77– 8).(Clark 2015, italics mine)

We shall note here in passing that not only the literary commentators, but the past Theatre Directors, 'e.g. Irving, Nunn' too have been biased

towards the 'character' rather than the on-stage action and theatrical justification of the character's presence: in other words, on his *function*. They also were all to oconcerned with the identity of the 3rd Murderer to consider the purpose of his stage presence.

II

The modern Director's problem is: Whatever his personal identity, the 3rd Murderer is very much there on the stage. How should we make him not only convincing, but also a necessary part of the action, without interfering with the text, and without being bound by the stage directions imposed by the commentators?

As the text stands, the 1st Murderer opens the scene with a question: Who asked you to come along with us? *Prima facie*, he is not acquainted with the 3rd Murderer or his exact errand. The 3rd Murderer responds: 'Macbeth'. Is it possible that in such a crucial joint murder project, two vital members would be unacquainted with each other? The 2nd Murderer advises the 1st Murderer that they need not suspect him, since he has *already* repeated the right instructions that Macbeth had given them too. This clearly indicates that they have already met and discussed things together. So the scene opens with a glitch. What does the 1st Murderer mean by his query? Surely not what we take it to be!

Were Macbeth the 3rd Murderer, we would have to assume either that the two murderers are obtuse enough not to recognize the look and the voice of the king with whom they had talked merely an hour ago; or that Macbeth was a professional histrion, able to disguise his identity completely. Such concealment is not uncommon in Shakespeare; but then, we also know that Shakespeare had other, visual ways of indicating such concealment, as in *Measure for Measure* for example, or in *Twelfth Night*. He often kept his audience in suspense; but keeping them in confusion was never his way of doing theatre.

Next, we find the 1st Murderer breaking out into poetry: 'The west yet glimmers with some streaks of day . . .' etc. This is of course poetry demanded by stage convention, and Elizabethan playwrights did use such verbal indications of time through language (as at III.ii.51ff). Since there is no aristocrat here on the stage, the villein is obliged to utter the evocative poetry perforce. But they also provided visual aids (Dessen 1988, 70-83).In

the 'Sleep walking scene' for example, although the Doctor and the Maid have already established the time verbally,the Lady somnambulates with a taper in hand to symbolize night time—and that in spite of having the stage-business of constantly rubbing her hands together. It was obligatory: Mrs Pritchard is on record as having used it; and especially Mrs Siddons, who set it aside after entry, but could not dispense with it altogether. (There is a probability that the original Lady appeared with a 'paper' in her hand instead of a 'taper', as described by the Gentlewoman, and as possibly seen by Simon Foreman in 1611; But stage conventions are more urgent than the demands of individual scenes; and it was required by the stage that the Lady present a visual proof of the time being night time.) In the present scene Banquo and Fleance will soon come onstage with a torch to signify total darkness. But why is there no visual aid to indicate the juncture of day and night in this crucial opening of this scene?

Next we hear horses, and Banquo calls for light offstage. The 2nd Murderer infers that it must be Banquo, and there are dialogues to explain why Banquo will appear on foot rather than on horseback. This information is provided by the 3rd Murderer who, like an efficient spy, seems closely informed about the habits of the lords. He also fits into the Macbeth world as a spy, since Macbeth retains flocks of paid spies like an efficient ruler ('There's not a one of them, but in his house I keep a servant fee'd', III.iv.131-2).

What happens on the stage after this is hilarious business. Banquo and Fleance enter 'with a torch', and seeing them not twenty feet awayin the light of a burning torch, the 2nd Murderer enthuses 'A light! A light!' At this, the 3rd Murderer blandly enlightens him: 'Tis he', and the 1st Murderer, instead of attacking the visible victim, tells the others to 'Stand to't.' Hearing this, Banquo wisely predicts: 'It will be rain tonight.'I do not know of any funnier situation on the stage than this. Surely Banquo'sentrance here is untimely and awkward.

But there is more to this entrance than mere fun. Lords never carry their own torches: neither now, northen. *Macbeth* II.i. in the First Folio opens with 'Enter Banquo, and Fleance, with a Torch *before* him', followed by'Enter Macbeth and *a Servant* with a Torch' (Shakespeare 1952, 779-80). Yet here, after Banquo's explicit call for a light, we find him carrying his own torch! Where did he get it? Did a servant bring it to him ? And how

could that servant leave the 'your lordships' to carry their own lights? Two royal guests groping through the dark towards the palace carrying their own light would have made as unconvincing a picture as could be on the Elizabethan stage. Something is a miss here too.

Literary editor-annotators have traditionally interpolated their own stage directions to Shakespearean texts (which is technically a transgression: most of them having no directorial experience). This is considered acceptable in a 'literate' society, though the reverse is not true: the theatre director cannot add lines to the texts; and Davenant, Garrick and their crew have been thoroughly deprecated since at least the nineteenth centuryfor their 'improvements' on the Shakespearian texts (although Bowdler ruled at home). But the Director is obliged to insert stage directions in order to put up a play, and here he cannot be bound by what the literary editors consider right or wrong. The stage has its own logic which makes the show acceptable to the audience. Therefore we will assume a few things in order to justify this problematic and cryptic scene (178 words in 20 dialogues) — and with it the function of the 3rd Murderer— on the stage.We will attack the problems noted above in sequence.

1. The first step concerns stage props. Night-time was indicated on the Elizabethan stage by a torch (or a taper). But this scene is taking place at a time that is neither day nor night— a time when a lighted torch *will be needed* as soon as the 'glimmer of day' fades out. To visually indicate this juncture of day and night, our stage requires an unlighted torch— carried by the 3rd Murderer.

2. The second step concerns vocal delivery. The three murderers have obviously conversed earlier; and therefore the 1st Murderer cannot reasonably challenge the 3rd Murderer as to his authenticity. What he wants to know is why the other fellow has joined them *here*, which was obviously not in the original plan: the 3rd Murderer was supposed to operate from a different spot, but instead has come along with the other two to lead them to the exact spot of action. This would have been necessary, as we shall see. The stress on the 1stMurderer's opening question falls not on 'you', but on the word ***join***. He possibly suspects that the 3rd Murdereris there to spy on them.

3. Being reassured by his companion, the 1st Murderer takes control of the situation and comments on the time of the day. Presently the 3rd Murderer— a 'spy', and therefore sharp of hearing— hears horses and busies himself with lighting the torch (with flint stones, which takes some time).

4. Then we hear Banquo calling for a light. The 2nd Murderer reasons that since all the other guests are already in the palace, this must be Banquo's voice. (This is a problematic dialogue; and its presence seems justified only in view of the fact that it kills a little time on the stage.)

5. The 1st Murderer mentions that the horses are going round (essential dialogue because one cannot bring up a pair of horse-riders on the Elizabethan stage, but one have to explain why a lord and his son are making their way on foot through a dark woody path).

6. At this opportunity, the 3rd Murderer, smarting from the 1st Murderer's earlier bossing, decides to establish his superior statusby showing off his intimate knowledge, as a spy, of the habits of the people who matter (also justifying to us the pedestrian entry of a lord and his son).

7. But this wastes time, and the 2nd Murderer tries to hustle him along by reminding him of his job: not words, but 'A light! A light!' is called for now.

8. By this time, however, the torch has lit up. The 3rd Murderer confirms the 2nd Murderer's guess, and runs out of the stage with his lighted torch.

9. The other Murderers wait: 'Stand to't'. Tension builds upon the sage.

10. Banquo soon enters with Fleance. The 3rd Murderer, now impersonating a palace servant with a torch in hand, leads them to the other two assassins.

11. The attack begins. The 3rd Murderer drops the torch on the ground, and attacks Fleance. The 1st Murderer steps on it and puts it out. Banquo dies, but in the confusion Fleance escapes.

12. The 3rd Murderer is angry at this, but the 1st Murderer apparently had taken Macbeth's 'dark hour' a little too literally, and 'botched' the operation. They leave the stage disgruntled.

In real life, an assassination cannot be expected to take care of itself. Every detail has to be attended to. The scene of crime is a royal park— more like a wood where the king hunts game. Without a guide to lure them to the right spot (or if guided by any other than an accomplice to the crime), Banquo and Fleance might easily have reached the palace through a different route: missing the assassins altogether. Even if they chanced upon this spot, the torch-bearer would have been a standing witness to the crime. Therefore guiding both the villains and the victims to the exact spot was a necessary task that only an expert— the 3rd Murderer, the 'perfect spyo'th' time'— could accomplish.

We should not also overlook the fact that costumes send their own message (as at V.iii. in our play) to the audience; and therefore the 3rd Murderer could profitably be dressed in palace livery—the ultimate camouflage to generate automatic trust in the guests, and explicate the whole action before us instantly at first sight.

A last note on the untimely entry of Banquo in the First Folio: Elizabethan staging was dependent on prompting, and *Macbeth* was almost certainly printed from a prompt-copy. This has given rise to such textual anomalies as Macduff's 'Ring the bell' at II.iii.80, which Dover Wilson had discarded as the prompter's personal memo about his duty to ring the bell at the said cue. We know that the prompter of the 'Padua Prompt book' at II.ii.8 indicates Macbeth's entry before the Lady says 'Whether they live or die'— that is, a full five lines before his actual entry. We'll similarly take 'Enter Banquo and Fleance' to bethe prompter's memo that '*here I have to warn Banquo and Fleance of their impending entry*.' In actual practice the pair enters the stage a few moments after the prompter's reminder.

Thus we may reconstruct the accepted text in the following manner:

Macbeth 3.3 (from Clark 2015, 215-17; [Stage Directions added])
[*Enter three* MURDERERS, *the* THIRD *one in livery,carrying an unlit torch.*
1 MURDERER But who did bid thee ***join*** with us?

3 MURDERER Macbeth.
2 MURDERER He needs not our mistrust, since he delivers
Our offices, and what we have to do,
To the direction just.
1 MURDERER Then stand with us.
The west yet glimmers with some streaks of day.
Now spurs the lated traveller apace
To gain the timely inn, and near approaches
The subject of our watch.
3 MURDERER Hark, I hear horses.
[MURDERER 3 *busies himself with lighting the torch*
BANQUO (*within*) Give us a light there, ho!
2 MURDERER Then 'tis he: the rest,
That are within the note of expectation,
Already are i'th' court.
1 MURDERER His horses go about.
3 MURDERER Almost a mile; but he does usually,
So all men do, from hence to the palace gate
Make it their walk.
[MURDERER 2 *hustles* MURDERER 3
2 MURDERER A light, a light.
3 MURDERER 'Tis he.
[MURDERER 3 *runs out with the lighted torch.*
1 MURDERER Stand to't.
They wait. ***Enter*** **BANQUO** ***and*** **FLEANCE***,*
with MURDERER 3*bearing the torch.*
BANQUO It will be rain tonight.

1 MURDERER Let it come down.

[*Two*MURDERERS *attack* BANQUO.

BANQUO O treachery!

MURDERER 3*throws down his torch and attacks* FLEANCE.

MURDERER 1*tramples out the light*. Fly, good Fleance, fly, fly, fly.
Thou mayst revenge –
[*Fleance escapes*]
O slave! [*Dies*.]

3 MURDERER Who did strike out the light?

1 MURDERER Was't not the way?

3 MURDERER There's but one down: the son is fled.

2 MURDERER We have lost Best half of our affair.

1 MURDERER Well, let's away, And say how much is done.

[*Exeunt*

It should be noted how this theatrical reconstruction develops out of a basic Elizabethan *stage* convention. The contention here is that it is not possible to realize the real impact of a play unless one sees it as something taking place, neither as in a story or film, nor so much as in real life, but on the Stage. As some theatre critics suggest, theatre is about what happens on the stage; the written words are nothing more than mere footnotes to those happenings.

I am in debted to Prof. Dattatreya Dutt'sannotations to his wonderful Bengali translation of *Macbeth* (Kolkata 2008) for the above the atrical reconstruction.

Bibliography

Bywater, Ingram (trans.) 1920 *Poetics* (Oxford)

Clark, S, and P. Mason (ed.) 2015 *Macbeth* (Bloomsbury, Arden Shakespeare)

Dessen, A. C. 1988 'Elizabethan darkness and modern lighting' in *Elizabethan Stage Conventions and Modern Interpreters* (Cambridge University Press)

Furness, H.H. (ed.), 1873, *Macbeth* (Macmillan, New Variorum Shakespeare)

Lott, Bernard (ed.)1958 *Macbeth* (Longman, New Swan Shakespeare)

Raffel, Burton (ed.), 2005 *Macbeth* (Yale University,The An notated Shakespeare)

Shakespeare, W. 1952 *The First Folio Edition 1623* (O.U.P. Facsimile)

Wilson, J.D. (ed.) 1947 *Macbeth* (Cambridge Dover Wilson Shakespeare)

Author: **Dr. Tapu Biswas, D.Litt., Associate Professor & Teacher In-charge, Department of English & Vice-Principal, Bhasha Bhavana, Visva-Bharati University.**

The Idiom of Badal Sircar's Third Theatre

Suvankar Ghosh Roy Chowdhury

In the 2020 edition (Volume 15, Issue 1) of 'Tripura Theatre', I had the opportunity to discuss the ideological ground upon which Badal Sircar's Third Theatre was founded. The essay titled *Badal Sircar evam Theatre-er Tritiyattwa* focused primarily on exploring how the Third Theatre searched for a unique identity beyond the canons of the 'First' and the 'Second' theatres (as defined by Sircar), living more in the moment of 'becoming' than in 'being'. The ideological contours that Sircar determined for his theatre were thus, to say the least, elusive and eternally in flux. However, for theatre, establishing its ideological nature allows one only a partial view of the medium. Subsequently, questions such as 'What happens to all these ideological sounds and furies when a play moulds itself into a theatrical idiom?' or 'How far is this ideological vision valid in relation to the theatrical language?' start coming up. Therefore, those of us who have considered it necessary to understand the Third Theatre in philosophy might as well take a step forward now to further assess if its theoretical framework corresponds to the special theatrical idiom it chooses for itself. The present paper offers a few insights into this.

The determinants of a Third Theatre text puts it in a position where not only its functionality and sacrosanctity can be questioned, but also its process of formation may be addressed with a special concern that entails an engagement with language. Moving a step further, one may infer that a text that demands an awareness of its theatricality for a reader's understanding, does not only form itself with the language that is scripted but also with the unscripted performance codes inscribed into the theatrical language with provisions for modifications and improvisations. In an attempt to locate Sircar with his new theatre, in time, one finds him reviving his group 'Satabdi' (in 1969, the group stopped its activity on the proscenium stage as they could not meet the rising expenses of production) and making a humble beginning at the ABTA Hall in 1972, with the production of *Sagina Mahato* (which was initially written for a proscenium production

and was in fact produced on the conventional stage) with some one hundred and twenty spectators to witness. Based on the ideals which Sircar proposed for his new kind of theatre, *Sagina Mahato* marks a low-cost, intimate attempt. The space was different from the conventional proscenium stage, the audience seated on all sides, and at a lesser distance from the actors, and the set brought down to a bare minimum – all these not only marked the beginning of a new theatre, but also made a huge statement on a new theatrical language that was in the making. The years following the production of *Sagina Mahato* kept Sircar busy searching for a space that would help, on a long-term basis, execute the language into performance. All this while, Sircar kept searching for the means that would form this new language in a more systematic way.

Some forty years down the line, if one looks back to the venture Sircar took up at the beginning of the 1970s and the end it finally achieved, to say the least, Sircar's search and development of the new theatrical idiom to which he subscribed, were never-ending in their exhaustive nature. In the early part of his "The Third Theatre", Sircar mentions the challenges that he and his group were facing with this new theatrical venture:

> The whole process was necessarily slow; we were not just *rehearsing* a play set down in definite terms by the playwright but *confronting* a script to create live theatre out of it. What we were learning was useful not just for this play, but for other plays to be taken up in future. We were preparing a base whereby the next play may not be *written* by Badal Sircar or any other playwright but *created* by Satabdi – the entire group.[1]

Beginning with Anganmancha, Sircar made changes in the way his theatre should appear to the audience, and in the course of time, it was these changes that came to define the basic parameters of his alternative theatricality. As Sircar points out in his book, the sitting arrangement for the Anganmancha was made differently with benches at three different levels which "were sufficient to ensure a good view for all".[2] Doing away with the concept of a fixed space for the spectators, remarkable flexibility was brought in the theatre that allowed Sircar to arrange the seats differently for different shows, and often would bring the spectators within the theatrical space, thereby offering newer dimensions to the performer-spectator

relationship. Economically, too, the use of ordinary lights instead of spotlights, the use of curtains to reduce the echo problem of the room, and assigning the team members and not a professional the duty of controlling the light proved to be helpful as well. The basic traits that Sircar kept preaching throughout his career originated in these early executions: his theatre was flexible, portable and inexpensive – as it depended less on props and theatrical appendages to get production going. Though the factor of portability and the inexpensive nature worked on an applied level, the notion of flexibility was primarily a conceptual term as well and it is in the flexibility with which Sircar's theatre associated itself, lies the unique 'thirdness' of his venture.

But how do we really reconcile the concept in a live medium like theatre, when it is practised? What are then the practical/ applied manifestations of the conceptual 'thirdness' of the Third Theatre? Structurally speaking, the Third Theatre oscillates between the complete domination of form over content, and vice versa. Neither does it claim to be a theatre that experiments with forms for the sake of experiments, nor is it possible to conclude that the impact of the themes chosen for this theatre would have been the same in proscenium production. Though we generally tend to associate a kind of structural experiment with the sphere of alternative theatres and believe that such theatres live primarily in form, Sircar's lifelong claim that their form was never set prior to the content holds considerable truth. Doubtless, his themes were such that they demanded intimacy and directness in form and thus, one reciprocated with another: creating a third space, neither entirely stuck up with form nor completely submitting it to a pre-written script.

On a performative level, the thirdness of Sircar's theatre can be traced to the production of a particular play or the way it develops into a full-fledged performance. Exceptions apart, Sircar's productions did not generate out of rehearsals of a fleshed-out play-text. Neither were they entirely impromptu. Again, they followed a path where a particular theme or a rough dramatic sketch would be put to workshops and rehearsals for further development into a full-fledged text, and in turn, as per demand, would draw out newer patterns of acting in workshops. The text of the Third Theatre exists in between the scripted and the unscripted – in a state of becoming, and its scripted entity is never complete without an

understanding of the unscripted scopes of its developments. As the unscripted mainly refers to the sphere of the performance which is at once momentary and evolutionary, definitive and plural, a closer look into Sircar's methods of production, particularly his performance codes – might offer us issues and dimensions which form his unique, 'third' theatrical language.

Theatrical language, which combines the lingual and the para-lingual, the scripted text and the unscripted performance, a product of a practitioner's materialization of his conceptual grounds in terms of theatrical experience – highlights the mode of expression one uses to present a narrative theatrically. In the case of a conventional theatre production, the performance is largely dependent on the text (usually available as a scripted play-text on the page) that is being dramatized. But in the alternative theatrical sphere, often a text is carved out of a performance, thus prioritizing the latter over the former. Sircar's Third Theatre, in this situation, perhaps attempts to reconcile these two elements of expression: the script and the performance – into a symbiotic relationship of mutual development through workshops and training. It is fit, therefore, for a while now, to follow the means of production that Sircar used, in order to introspect further on what constituted the novelty of the language of his Third Theatre.

Workshops were used by Sircar as one of the prime methodologies in his theatre. The earliest instance of such a workshop that was functional in the formation of the 'third' theatrical language can be found documented in Sircar's essay "The Third Theatre" when in October 1972, he and his group visited Manipur to organize a workshop and subsequently a performance of the shorter version of his play *Spartacus*. The workshop and the way it was executed are crucial to our understanding of the alternative theatrical idiom that the Third Theatre subscribes to. It was not a workshop conducted for the ensuing performance in particular. For that, rehearsals were organized later – which were a kind of illustration and implementation of the basic training given at the workshop. The activity of the workshop may be divided into four main sections for a better, coherent understanding of its modus operandi:

With thirty-nine participants, Sircar, at the very beginning, formed a *circle* – to ensure equality. He analyses that a circle would not allow anyone to sit behind another, "so there are no back-benchers and no

difference in status"[3], and also "the closed circle"[4] would bring about "a sense of unity and team-spirit, the extent of which can hardly be imagined until the circle is actually tried out."[5] Subsequently, Sircar introduced a series of *psycho-physical exercises* for attaining "strength and flexibility of the spinal system."[6] These exercises were incorporated to channelise human energy properly in the direction of theatrical projection. Sircar analyses from the behavioural patterns of the participants that initially they would come with major psychological blocks and inhibitions that often need to be removed through the workshop, and it is here the idea of sitting in a circle and developing equality and unity, or the sets of psycho-physical exercises removed such obstacles. Along with the physical training, there was *vocal training* as well where the participants were asked to make any sound that would be necessary for a theatrical production. Sircar further elucidates that by a combination of psycho-physical exercises and voice training, "[a]fter a period, various associations and images begin to form freely in the mind of the participant during the exercises, and a voyage to the inner self begins."[7] This voyage to the inner self, the journey not to a particular character's impersonation but to a series of states of mind was perhaps the final destination Sircar was aiming at in his workshops. In the long run, these training and journeys would be the factors that would develop a dramatic narrative in the form of a play. Added to these were a few *games* to build up trust among the participants. Such games would often require someone to fall freely from a height of four to six feet, and others catch that person before she falls on the ground. The games would develop mutual trust among the participants which would eventually make them more spontaneous and carefree in their final, performative moves.

In order to constitute his own theatrical idiom, Badal Sircar thus takes up two major elements of performance – space and body – that would set his kind of theatre remarkably different from others. It is difficult to decipher which of these two instigated the rise of the other – whether it was the physical acting that was in search of an intimate space for an unconventional aesthetics, or it was the space that, devoid of artificial light, acoustics and props, demanded such contribution of the human factor as a substitute. But they worked well together.

Therefore, focussing on the representation of human emotions and states and not on the imitation of characters, Sircar introduces in his

theatre some special features such as audio effects with the human voice, the use of chorus both in terms of physicality and vocal support, scopes for individual physical/ gestural acting and all these, resulting in an unprecedented, free communication between the actors and the audience. However, such scopes suggest what has not been scripted or explicitly directed and therefore exists only in possibility. Also, despite the immense scope of improvisation these techniques provide, there are textual directions and directorial analysis that document a considerable part of this unique language. Talking in terms of his plays that were put into performance, each of them shows clear signs of a developmental process that is not complete in the play-text itself. It is true that even the play-text is created through a number of workshops and training, and even after that, the theatrical language remains impregnated with further possibilities, scripted in the text or otherwise, to be implemented in performance. The methods and the procedures used for the performances constitute the uniqueness of the theatre. For instance, we find Bishakha Roy talking about *Michhil*, arguably the most performed Third Theatre text to date:

> The play *Michhil* was prepared by following a special method. In the method of enactment, as there is no scope to enunciate one's own voice, an actor must take the responsibility to acquire some skills as per situational demands. Theoretically, in such a method, a director's words are considered final. But as there is an obligation in the Third Theatre to find one's own voice, all the theatre workers had to understand their contribution to the direction process by themselves.[8]

Bits and pieces of contribution make a full-fledged Third Theatre performance. And in these acts of contributions, an actor's body and the voice become functional instruments: "Our bodies were our assets. In our theatrical production, full implementation of the body was necessary. Swaying our bodies, we have created the wind blowing over the paddy fields, broken down machines, the wails that suggest the devastation caused by the salty water that flows in through embankment, the tattered mother earth by bombing."[9] One might go on adding instances from the various workshops Sircar used to organise for such activities and revelations – some case-specific, some general, some 'intensive', while some were

'extensive'. An elaborate discussion of his workshops might just distract us from the particular purpose of this paper. I would rather save that for some other occasion as in the present context, we already have satisfactory glimpses of and from the workshops to take ourselves to the final segment of the discussion.

Thus, when I eventually come back to the point from where our discussion on the theatrical idiom of the Third Theatre had begun, I discern two questions that stand out from this discussion to be addressed:

i) What is then the seminal 'thirdness' in the language of the Third Theatre?

ii) How does such a unique language affect one's understanding of a play-text?

About the thirdness of the theatrical language, one can set apart the other two languages that can be differentiated from the language of the Third Theatre. On one extreme, one can locate a play written for a conventional theatre that believes in extremely meticulous directions and method acting, where the theatricality lies entirely scripted within the text, waiting to be performed. Again, this might well be argued whether such a rigid theatre is at all possible. But all in all, there are texts that offer limited scopes for performative improvisations. Thus, the theatrical language of such a production lies mostly in the exact/ accurate representation of what has been depicted in the play-text. On another extreme, there are cases like instant plays and that too, not of a short span but of considerable length. These performances, narrative or otherwise (in the form of collage, often) do not follow a script whatsoever. Often they are made instantly if they act as shorter fillings. When there is a lengthy production, the performance is developed through extensive workshops where the connecting link between scenes and actions is perhaps noted down only as scribbles or notes – which in no sense, give us a partial, leave alone complete play-text. Such plays are not a rarity. The text of *Manushe Manushe* by Sircar, put to the workshop, holds only a brief description of a situation from where a whole scene complete with dialogues and action would evolve.

Another practitioner of the Third Theatre, Probir Guha, the founder member of 'Alternative Living Theatre', says, "How will you be reaching

at the idea of a play-text where there has been no documentation of the performance in the form of a script? There are many such performances we have produced – lengthy, with the entire necessary dramatic element except for a play-text."[10] In these performances, the theatrical language is variable and dependent entirely on the action rather than on scripted words.

In contrast to these two, a Third Theatre text (and this also brings us to the second question in concern) exists in a space where its textuality is improvised in performance, and performance in turn, gets further textualized. The textuality of the Third Theatre depends on the mutual cooperation of the written text and the unscripted performance. No one factor in this process can be put forward to another, or even if there is a chance, the performance will be prioritized. In more than one instance, Sircar has detested the authority of one absolute text in his theatre, in his comment on *Basi Khabor*, he says: "[t]his play has been made by the group collectively. At a later stage, I made a script on the basis of the materials collected and the decisions made. Whatever I contributed, I did during the process like any other member, and not when I made the script. As such, I am not the author of the play, at best the editor."[11]

The dissociation of the text from its rigid authorship, and yet its printed form assigned solely to the name of Badal Sircar, offers it a position that problematizes the theatrical discourse of a play. The idiom lies neither at the disposal of the written play entirely nor with the performance. Rather, the textuality suggests a third space – a third language, if I may call it so – where the performance evolves from the text and the textual gaps, and in turn, the text is read in the light of the performance. Exclusion of any one factor will result in an incomplete, one-sided reading of the text; and capturing the unique theatrical idiom will only be possible when the literary text shall be read in the light of the performance – not only those that are scripted in the form of directions or speeches and dialogues, but also those that eternally live within the text in the form of possibilities. They are never scripted but exist in the textual gaps as some absent presence which, if put in action, illumines the text. It is here that the theatrical language of the Third Theatre is remarkably different from other definitive languages. Its position of in-betweenness and association with both the scripted and the unscripted makes a particular text (in print or in performance) extremely

fluid and flexible. Also, with the presence of no one author of the text, it opens itself up to a discursive plane, where changes, improvisations, suggestions and interpretations – all are part of the textuality of the theatre, and can be counted as contributions to the particular discourse of a text belonging to the Third Theatre.

Select Bibliography

Jain, Kirti, ed. *Badal Sircar: Search for a Language of Theatre*. New Delhi: Niyogi Books, 2016.

Katyal, Anjum. *Badal Sircar: Towards a Theatre of Conscience*. New Delhi: Sage Publications, 2015.

Kundu, Manujendra. *So Near, Yet So Far: Badal Sircar's Third Theatre*. New Delhi: Oxford University Press, 2016.

Sarkar, Pabitra. *Natmancha Natyaroop*. Kolkata: Dey's Publishing, 2008.

Ray, Bishakha. *Third Theatre: Anya Swar, Anya Nirman*. Kolkata: Thema, 2017.

Sircar, Badal. "Our Street Theatre." *Sangeet Natak* no. 69 (July – Sept. 1983): 18 – 23.

–. *The Third Theatre*. Kolkata: Seagull Books, 2009.

(Footnotes)

[1] Sircar, *The Third Theatre*, 25.

[2] Ibid., 33.

[3] Sircar, *The Third Theatre*, 40.

[4] Ibid.

[5] Sircar, *The Third Theatre*, 40.

[6] Ibid.

[7] Ibid., 41.

[8] Bishakha Ray, *Third Theatre: Anya Swar, Anya Nirman* (Kolkata: Thema, 2017), 5; translated.

[9] Ibid., 53. Translated.

[10] Probir Guha, in discussion with the author, March 2017. Personal communication.

[11] Sircar, *The Third Theatre*, 129.

Author : **Dr. Suvankar Ghosh Roy Chowdhury, Assistant Professor in English, Raidighi College, West Bengal.**

Ritual and Performance
Interpreting Ritual Drama 'Koratpa'
Performed by the Meitei Kidnas of Tripura

Kshetrimayum Premchandra

Abstract

Meitei Kritania, or Kidna, is a small exogamous ritual community which possibly, migrated to Manipur during the reign of Meitengu Lam Kiyamba (1512 to 1523 CE) and subsequent kings. After about two centuries of settlement and cultural and religious acculturation/interaction in Manipur with the other groups, they were displaced again during the traumatic period of Manipur known as *Chahi Taret Khuntakpa* or the Seven Years Devastation (1819-1826 CE) due to Burmese invasion. The fact that they were assigned surnames suggests that the Manipur court gave them citizenship, but the process of assigning *yek-salai* could not be materialised. *Apokpakhurumba, khunlailatpa, saroikhangba,* and propitiating other spirit mediums are some of the Meitei folk religious practices they have retained. This paper interprets this ritual community's annual ritual drama called Koratpa, which is offerings made to the 'first death' from the perspective of performance studies. Structurally, this ritual is akin to laiharaoba, which is based on the principles of 'degenerative chaos and regenerative order' but without the canons and ceremonial rites. The study is carried out in the villages of Bamutia Sub-Division of West Tripura District. The paper is based on the researcher's field visits from 2016-2017 at three Kidna villages. Apart from the data collected from the focus groups, the researcher acted as an 'observer participant' in this ritual drama. Some existing theoretical standpoints of ritual and performance studies and the correlation between the two have been considered.

Introduction: Ritual and Performance

Those who are familiar with Manipuri theatre would remember the very elaborate stage décor and the intricate rituals performed by the Sutradhara and the two Pariparsvikas before the start of the play in Ratan

Thiyam's *Chakravyuha*. Ratan Thiyam prudently incorporates rituals from the Hindu and the local faith in his plays. Also,Thiyam conscientiously merges the two rituals to align with the Sanskrit theatre tradition. The rituals are performed to heighten the intensity of the play, communicate the severity of the actions, and highlight the holiness of the Mahabharata war fought for the truth. Not just Thiyam, and very similarly, Heishnam Kanhailal also theorises performance as 'ritualling' and makes local rituals part of his plays as representative of human needs. Both know, as all the other Manipuris do, that rituals in the Manipuri sense are performed to bring together individuals to celebrate life and to be protected by the protective energies of the cosmos. These rituals, which are celebrations of the interrelatedness of villages and individuals, underscore group development and advancement, a form of mystical communion in which they sing and dance together for shared prosperity. The rituals incorporated in their plays can be regarded as 'expressions of the more abstract and hidden structures of the comprehensive cultural system', which they inherited from their systems of performance (Singer qt in Bell 72-73).

The observations above establish that theatre traditions in Manipur broadly use rituals or are directly influenced by ritual dramas that they grew up watching. Therefore, it is pertinent that local rituals and performance traditions often get centre stage in constructing their plays to connect with the local audience and also for consumption by the audience outside the culture. And why not? Because the Manipuri 'cultural systems' is such that one can not do away with the intrinsic rituals one encounters in his lifetime. Therefore, when Manipuri migrated to Tripura, they brought the cultural system they inherited from their forefathers and celebrated them with much joy and pomp. Some Manipuri performance traditions have captured the imagination of the people of Tripura. The first one is the famed Rasa Lila, which has significantly impacted other communities within the state. And the second one is Lai Haraoba (propitiating festival) which was resurrected not many years ago. Calling Lai Haraoba a performance without explaining its core religious aspects and socio-cultural implications would be foolhardy. However, it is sufficient to say that the Lai Haraoba is the mother of all performance traditions in Manipur.Regarding the connection between modern Manipuri drama and the ancient festival of Lai Haraoba, the eminent Manipuri theatre personality Arambam Somorendra had to say this, "It was because of the fertility of Manipur's

culture, especially in the case of drama, which has been found embedded in the aged old religious performance of the Laiharaoba (32).

Koratpa can be considered a scaled-down version of the Meitei Lai Haraoba, and it is replicated by the Meitei Kidnas (or Kritanias) of Tripura as a ritual drama to sanctify a space before the occupation and settlement in that space. The ritual is performed annually, celebrating the generative capacity of the space/land occupied and the sacredness that will bring prosperity and stability to the settlers. The ritual, when performed,will instila collective life experience in the community, and the space will be perceived sacred. This sacred space evokes a sense of honour, induces esteem and meaning in the community, and provides comfort and sometimes feelings of transcendence to those within the sacred space.

So, the pertinent question which can be posed at this juncture is, why take up this topic? The answer lies in the connection between ritual and performance. Rituals are said to be social dramas, the origin of theatre, and some others see ritual as a separate entity which should be studied secularly. Rituals can forge people's social identities only to be recast in less functionalist terms. Symbolic activities enable people to appropriate, modify, or reshape cultural values and ideals. As Schechner opines, "What rules are to games and sports, traditions are to ritual, and conventions are to theatre, dance, and music" (2005 10).

Victor Turner took the study of performance beyond the proscenium stage and into the carnivals, festivals, protests, and other cultural rituals of an intercultural world. Theories of ritual performance that began to gain currency in the 1970s focused on the significance of rituals in shaping faith systems and the production of cultural elements. The efficacy of ritual acts depends upon those undertaking them. It is what is there in the West. As regarding the origin of drama (or performance) in the Indian theatre tradition and philosophy, we find a similar strain of thought. We can have a look at the Kapila Vatsyayan's "Introduction" to ancient text of *Natyasastra* where he wrote:

> The mythic origin of this text on Indian aesthetics apart, Bharata, who is the supposed author of Natyasastra is responsible for categorising all the facets of art – drama, dance, poetry, music. What Bharata postulates in Natyasastra is the convergence of all the art forms which can act as the fountainhead of both pleasure and

> education. When all these disciplines of art come together and create something in unison, the end product can transcend the body and soul (beyond the visible and physical world to a world of transcendentalism and metaphysics) thus enthusing a sense of true beauty, duty and conduct of life to the ones witnessing the performance. (viii)

What these art forms (dance, poetry, music) do is to give pleasure and education to the ones performing it or witnessing it. Rituals also have very similar functions. As Edward M. Bruner puts it, "A ritual must be enacted, a myth recited, a narrative told, a novel read, a drama performed, for these enactments, recitals, tellings, readings, and performances are what make the text transformative and enable us to reexperience our culture's heritage" (7). We, the human beings, have always tried to relate performances borne out of human needs performed at the green fields, and jungles started finding an audience at courts and enclosures. We became our cultural expressions, our heritage. Rituals were borne out of the basic human tendency to forge an affective bond with nature and its varied manifestations. We felt the need to propitiate the spirits, which made nature angry. We also appeased those who made them sustain. We prayed to the spirits in the sky, spirits on earth, spirits which gave us directions, and spirits of those who had passed away. Besides, there is an underlying human propensity to make sense of what we do and legitimise those 'doings' as actions beneficial to an individual or to a group. A ritual is a meaningful and relatable social action to a particular ritual group, which must correspond to similar or associated actions. It is also our way of showing 'group association'.What is essential in a ritual is 'space' and 'occasion' – where and when they are performed.

Where belief is abstract, ritual is concrete. However, these concrete, verifiable acts unify groups, organise societies, organise knowledge systems, build a 'shared emotional focus', legitimise power structures, open up channels for symbolic communication with the spirits, etc. (Collins 112). For the Manipuris, a ritual is their effort to establish a form of communication with the higher spirits, which would grant them what they wish for. Its beginning could have been in shaping relationships between an individual and nature. It got its extension in the establishment and organisation of families. We, as human beings, offered our first prayers to nature and many of its marvels. We sang and danced for hills, rivers,

trees, birds, flowers, etc. We prayed to the forces of nature for the right amount of rain, cool and calm wind, and enough sunshine to dry our crops, meat, and fish. We began to understand seasons and welcomed them with songs and dances. We understood the importance of directions and appeased them with appropriate rituals. We remembered how we lived with nature in our ancestral environment, so we offered them our produce.

We understood the energy of the sky. We also understood the energy of the earth. So, we started believing that we came from them. We formed our knowledge, we developed rules, and we developed taboos. Our ethos and worldviews developed and ultimately got expanded. Therefore, rituals became our first form of expression, our body movements, our performance, our song, our poetry, and our drama.Hence, ritual performance is perceived as the foundation of drama 'prior to the arts, the sciences of man, and the philosophies, of modern civilisation' (Fergusson 22).Rituals are actions. They are also 'memories encoded into actions' (Schechner, PS 52). The emergence of ritual as a tool to analyse cultures and certain acts as a 'universal category of human experience' began in the nineteenth century (Bell 2009 13).

The Performance Space

Every ritual drama in the Manipuri context takes place at the *lai-pham*, or god's place. It is an open space surrounded by bamboo and trees, or it can be any space where the presence of the spirit or the deity is perceived. In the case of Lai haraoba, the performance space is known as *lai-pung,* or the sacred space. Such a similar space is used by Kanhailal while staging his famous play *Pebet.* Again, it is to be noted that the core idea of the 'performance space' one finds at the *lai-pung*and the *mandap* remains the same. Another example is the transition of the Manipuri dance from the *lai-pung* to the *mandap* in the form of Rasa-Lila.

The performance space that the Manipuris have had since the beginning of time conforms to the earliest universal model of theatrical stage. It is to say that any place can be a performance space, and songs, chants, offerings, prayers, etc., were the first theatrical performances. Schechner also alludes to this idea while he was describing how far the phenomena called "drama," "theater," "performance" occur among all the world's peoples. He writes, "These earliest theaters—or shall I call them temples?—are hidden in the earth, lit by torch, and the ceremonies enacted therein apparently concerned hunting-fertility (2005 67). He is saying that

'performance', 'theatre', 'drama' or any other nomenclature one wishes to use dates back tothe beginning of human history.

Like the Ramlila performances, elsewhere in India, the performance of *koratpa* is an open-air act where the whole village gets involved and becomes active or passive participants. As stated above, the performance begins at the village *mandap* and takes the act to the designated sacred grove where the venerated tree is situated. It is at this spot that the main ritual drama takes place. For Manipuris, performance spaces are usually open and without structures. Let me bring in Meitei*Umang Lai Haraoba,* or the propitiating festival,as an example. The festival takes place in an oval-shaped space surrounded by various trees and plants. After the advent of Hinduism in Manipur and the adoption of other performance styles, Manipuris needed a separate space as there was strong opposition to the new faith from the public. Therefore, many *mandaps* came up as places of worship as well as performance spaces. The love for dance and music of the Manipuris had got a firm footing when they saw the dance and music that the Vaisnavites brought to Manipur. The love for dance and music in the Vaishnavite cult is beautifully expressed by Suresh Awasthi when he writes,"the noblest objective of a devotee of Vishnu is to sing, dance and enact the lilas ... to see and enact the lilas bestows one with divine bliss and redeems one from sin" (12).

Suresh Awasthi further writes, "With the rise of Vaishnavism, many temples and shrines came up as places of worship as well as performance spaces. These performance spaces include built structures either integral to the temple or separate from it. These dramatic performances give the essence of bhakti to the devotees" (12). On the core philosophy of the rituals performed there is so much of convergences between the two faiths. The Meitei ritual systems incorporate descriptive models of the cosmos and the place of individuals, social groups, and society as a whole within it. They celebrate the perceived powers of the cosmic forces through symbolic actions, which we call ritual drama. We need a performance space for such a symbolic action to take place. And that performance space, in the Manipuri sense of the term, can be any place, any space – a replica of the sacred space in which existential dimensions get magnified.

The ritual of *koratpa*is fixed on a day in the Manipuri month of *Kanglen,* which usually falls in July. *Kanglen* marks the end of Rath-yatra

festivities in Manipur. Villagers participate in this ritual drama with much fervour and enthusiasm. They would gather at the village *mandapa* and prepare fruits, flowers, and other items to be offered to the spirits. *Wari-lairikhaiba/thiba*used to be performed before going to the main performance space for the ritual. This ritual drama which begins at the village *mandap* is taken to the *lai-pham.* Seamlessly, the values of the two distinctly different faiths merge without a hitch. Hence, from the perspective of the 'performance space' the entire village and its surrounding areas become one homogenous unit which would come under the protective shield of the deities or gods from both the faiths. This ritual drama enacted year after year is, I believe, what Simon and Mick call "willed theatricalisations" which "help performativity drift into new directions, new spaces" (222). These performance spaces are in relation to real people, real villages. There is ample room and flexibility regarding the use of the space/s. As mentioned before, there is flexibility in the way the ritual drama is staged, the number of performers, and the propitiated deities.

The Performers and the Performance

Performance is not merely a way to express something, but is itself an aspect of that which it is expressing (Rappaport 175-6). Hence, ritual as a performative medium is a living example of human creativity and physicality, and 'ritual does not [mold] people; people fashion rituals that [mold] their world' (Bell 2009 73). As a process of moulding their world, Meitei Kidnas have this tradition of making their spaces sacred through propitiation and sanctification. The places where they settle must be sanctified, and measures for protecting the living and non-living beings must be put together like they had done at their place of origin. What they do conforms to the 'expressing' that Rappaport purports. These measures derive from their earnest efforts to communicate with the cosmic powers which they believe are resided in directions, natural objects, and 'spaces'. They believe that the ancestral environment must be consecrated, for they contend that human beings must devise ways to relate to the ancestral environment, for that is one way of maintaining order. This maintenance involves appeasement rituals. Mircea Eliade has reported the tradition of purifying a settlement area in other cultures. Contesting that settlement in the territory is 'equivalent to consecrating it', he wrote in *The Sacred and Profane: The Nature of Religion:*

> When settlement is not temporary, among the nomads, but permanent, as among sedentary peoples, it implies a vital decision that involves the existence of the entire community. Establishment in a particular place, organising it, inhabiting it, are acts that presuppose an existential choice – the choice of the universe that one is prepared to assume by "creating" it. Now, this universe is always the replica of the paradigmatic universe created and inhabited by the gods; hence it shares in the sanctity of the god's work (34).

The ritual of consecrating a specific area in the Meitei (Manipuri) sense is the exploitation of the idea of repelling possible evil spirits that previously inhabited the area. Dance and music are involved. There are carnival-like celebrations. Those spirits are offered fruits and flowers, a peacemaking gesture with the spirits. After the peace offering is made, the new occupants identify a spot to place their protective spirits. Meitei Kidnas chose a grove or an old tree as a sacred spot. It is at this sacred spot that the main ritual drama is performed.

The number of performers performing *koratpa* differs from village to village. However, whatever the number, the numbers should correspond to the Meitei notion of good or bad numbers known as *chang*and *shi*. *Chang* means 'alive',and *shi* means 'death'. *Chang* is odd number. *Shi* is even number. Sending the odd number of people *(chang)* must be followed strictly. Therefore, performers of *koratpa* can be 3, 5, 7, 9, 11but never 2, 4, 6, 8.

The ritual drama that I am reporting here was performed at Rangamati, Bamutia Sub-division, Tripura, in 2016, and the persons performing the ritual are Nongrakpam Rohinikumar Datta as *maiba*or shaman or priest and two other male helpers. Which means there are three main performers while the rest of the villagers are passive participants.

The spirits/gods worshipped/appeased in this ritual are: i) NongsatakpamChandontakpamTabet (female) as *lamsenbi* or the presiding spirit of the realm/area, ii) *Hanubi Lai* as *khunkonbilai* or caretaker of the village, iii) *Umanglai*– ancestral/tutelary deities/spirits, iv) *Saroi-ngaroi*– malevolent spirits/spirit mediums, and v) Vishnu, the Hindu god.

The principal spirit, or rather, the primary purpose of this ritual drama, is to appease the spirit of NongsatakpamTabet, who died first from among the settlers after they established their village at Rangamati after

they migrated from Manipur. The ritual was conceptualised and performed on the lines of *lamtaiba* (bridging the realms) rituals they were party to in Manipur to seek blessings for a death and disease-free village. *Hanubilai* or *khunkonbilai,*which they propitiate as the caretaker of the village, is interesting because the first settlers and subsequent generations claim that such a spirit in the form of an old woman was spotted in and around the village. It could be their interpretation of the previous presiding spirit of the realm/area.

There is undoubtedly an aspect of the peace offering ritual to *koratpa* in which the performers cleanse and merge the past and present realms. This deed of giving the spirit a place in this ritual is well received, and social solidarity is achieved by compensating her for any misfortune she can cast upon the village or the community.

The third god that the they make their offerings in this ritual is Vishnu, one of the major gods in the Hindu pantheon. In *koratpa* there is always one Hindu god among other spirit mediums, and the god is most likely Shiva or Vishnu. It is because Meitei Kidnas, though they were Hindus initially, were drawn into the dual religion system of Manipur. It is a legacy that they are still living with. The fourth god they must appease is Narottam, who features in many of their beliefs and oral history. Narottam is the god of the village *mandapa.*Oracular pronouncements were part of all ancient rituals in the Indic philosophy and played a significant role in the theatrical arts to appease deities (Varapande159). The Vaishnava *Bhakti* cult stressed the importance of theatrical arts as a means of salvation – '*mukti'*. The presence of the Hindu gods in this Meitei ritual and the pronouncement of the *maiba* (shaman) that all the gods and spirits protect the realm follow the philosophy of 'bhakti' and 'mukti'.

Offerings, especially food and flowers, are generously made to Hindu gods, and the same can be said about Manipuri deities and spirits. The food offered to the deities/spirits is brought back and shared by the community members. The members ostensibly perceive that the gods accepted the food offered, and by eating it (what is left by the gods), they have been blessed with their wishes. They share not just food; flowers offered to the gods are also received with much devotion. They feel that they have shared what they can offer to their gods. This psychic satisfaction is obtained through the ritual in which the worldly things in the form of

offerings are symbolically transported to the spirit realm, and a return of the offerings is perceived.

Koratpa marks a new beginning, the triumph of the protective spirits over the evil spirits. On the outskirt of the village, there isa sacred grove where *koratpa* is performed. The primary performance is right in front of the venerated tree. A nail will be hammered only three times onto the tree's trunk each year, and a silk thread of some length will be tied to the nail. Nails correspond to the number of years since their first settlement, and the silk thread formulates the image of the entire village being encircled by a sacred thread, a way of homologising the village to the sacred space that they have carried all through their journey, and also as a protection from death, disease, and misfortune.[2] The nail can also signify a ritual of construction; village, house, or community.

A small area is dug up in front of the tree where the ritual occurs. The small ditch is the space occupied by *hanubilai.* Fruits and flowers prepared for the spirit are offered in it. The person who acts as *maiba*sits in the middle facing the tree, while his helpers are on the left and right. The *dao* used in digging up the small ditch is an important prop for the whole proceeding. After the prayers are said and offerings made to *hanubilai,* the *dao* will draw seven semi-circle lines vertically in an upward movement. It is known as *mang thong thingba* or 'closing the door of death'. The seven lines represent seven days. The first line drawn is Saturday (beginning with *han*), and more lines are added up in an upward movement which finally stops on Sunday (ending with *sah*). *Hansah* could be a shortened form of *Om harimhansah,* which is a Hindu mantra to prevent diseases. This mantra is on the lips of the *maiba*while drawing the lines.

The second *lai*to be fed is *lamsenbilai*. The same actions of offering and closing the death door are repeated here. The spirit is placed at the north side of the tree and the performers who sit facing east. The southeast side is for the *umanglai* and offerings are made to the spirit after *lamsenbilai*. *Saroi-ngarois* are placed at the southern side of the tree right below the space occupied by *umanglai.* Much is not said while making their offerings to *hanubilai, lamshenbilai* and *umanglai,* the following lines are said to appease the spirits of *saroi-ngarois* so that they do not cause any trouble to the realm:

Lamabatumaba, lamshenbatusenba
Saroihumfumathoi, laikotikunthrahumdoi
Nakhoipumnamakinafamda
Oja gurusingnapirambachakthadu

Eina gurugitungdaleidunapirabani
Masina penbiyu
Gurugi yathangni.

[spirits of the realms, meadows and crevices, sixty-one *sarois* and all the thirty-three crore gods and goddesses, the offering made to you by my ancestors has been made by me today again, be content with this, it is the order of the *Guru*]

After saying this, the *maiba* changes his role from a shaman to that of a Hindu priest and makes his offerings to Lord Vishnu. The place for Vishnu is in-between *hanubilai* and the tree. He is the last to be fed and worshipped. Except for Vishnu, all the other spirits receive the 'closing of the death door' ritual. There is no image or idol of Vishnu, His presence is only perceived. A few Tulasi leaves are used to sprinkle water at the spot where the presence of Vishnu is imagined. All the items prepared for Vishnu shall be placed, and the *priest* will place three big plantain leaves of equal size and put *fola*on them. He, then, chants the *mantra* out loud, *'Klim Krishnaya Govindaya Gopijanavallabhaya Swaha'*[33] After this *mantra* is chanted, the priest would say the following in Manipuri:

Hey Vishnu deva
Khunsinakhundarakpamatamdagee
Kalen hourakpada, ojagurusingna
Irat puja tourambamatunginna
Nanai eina gurugitungdaleiduna
Puja katcharibani
Matam pumnamaktaprabhuna
Khunsingakpisenbiyu
Awa anangtahanbiganu.

[Hey Vishnu deva, since the days of the first settlement, at the commencement of summer, in the way the elders have performed this ritual, I am offering you prayers. May You guard the village and grant good health and prosperity.]

Each portion of *fola* must be eaten up by the three performers of the ritual. The two helpers now carry all the items brought from the village and leave the *maiba/*priest alone at the spot. The *maiba/*priest follows the other two towards the southern side of the tree and, for once, closes the door of death by drawing seven similar lines vertically. This is the last activity at the spot. The death has been tasked with remaining at the spot and never infiltrating the village. It marks the end of the ritual drama.

Conclusion

For a Manipuri, a ritual is a human action that acknowledges the presence of the eternal forces of good and evil and involves subsequent appeasement of those spirits. It also signals a sense of continuity, the past merging with the present or the present trying to make sense of the past. *Koratpa* ritual still exhibits a charm, a mystery, and an interaction with the Meitei Kritanias. When the three performers return from the sacred spot, villagers would be found waiting for them so that they could share the *fola* which is one of the main offerings in the ritual. The simple joy of sharing, the joy that the spirits have been appeased, and the belief that there shall be good health and prosperity in their families all contribute to making this ritual drama more meaningful to the community. *Koratpa* is a ritual that is etched in their collective consciousness, a driving force which enabled them to move on with life in times of trouble and displacement. It is some 'mimetic action' which is replicated repeatedly with 'heightened intensity […] and emotion' to celebrate and experience the transformation of the spaces they call their own (Esslin 23-24).

Notes

(Footnotes)

[1]I wish to acknowledge the help and guidance extended to me by No ngrakpam Rohinikumar Datta of Rangamati, Bamutia Sub-division, and L. Birmangal Sinha or Dhaleshwar, Agartala, Tripura while conducting this research work.

(End notes)

[2] It was a common practice in Burma and Manipur to guard a village or encircle the village by a sacred thread in the times of epidemic, especially cholera.

Rappaport, Roy A.
Ecology, Meaning, and Religion. North Atlantic Books, 1979.
Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction* . Routledge, 2013
Performance Theory. Routledge. 2005
Shepherd, Simon and Wallis, Mick.
Drama/Theatre/Performance Routledge, 2004.
Vatsyayan, Kapila. "Introduction".
The Natyasastra. Sahitya Akademi, 2005

Author : **Kshetrimayum Premchandra, (Ph.D), Assistant Professor in English, Tripura Central University.**

Theatre - in- Education (Learning through Theatre) is an invaluable resource

Vijai Kumar Singh

I have been teaching 'Theater and Drama in Education' in the one-year course "Theater in Education" by the National School of Drama, Tripura for 10 years. I also worked with children as a TIE artist in TIE co. of NSD Delhi for 9 years. In the present article, the material is based on my theoretical and practical understanding, so examining what-why-how of theatre in education, removing this confusion of what is T.I.E.?, Understanding the difference between "teaching through drama" and "teaching drama ' ,Understanding the difference between "teaching drama vs. teaching to teach drama ", what are the possibilities of teaching drama and TIE in the 21st century, and more , it is an attempt to present in simple words so that readers can easily understand.I regret to say that some points mentioned here again and again just because of new concept. I am afraid to make any opinion in theatre because the nature of theater keeps on changing with time, theater keeps on discovering new trends. The theater is a way of looking at life. The theater is a contemplative stage of life from the point of view of art. The Craft, Culture, ability to think, imagination, artistic intelligence along with technical education, theatre is humane education. According to progressive education, it is more useful to teach the student instead of teaching the subject. The challenge with the times is to have a curriculum that is relevant to the times for students both in theory and practice of drama pedagogy.let's start

What is the theater in education?

It is possible to learn from all theatre, but this does not mean that all theater is explicitly designed to be educational. It is necessary to understand here that what is the basic difference between theater in education (Learning through theatre) and education in theatre (Teaching theatre), some people understand theater in education to mean teaching drama in schools/drama presentations or even doing drama with children / for children. Where children's theater aims to create theater awareness

among children, entertain child audiences, and prepare future audiences. While theater in education is imparting education through drama – TIE is a movement that began in the UK in the 1960s, a new form of contemporary theater which is used in schools with different age groups of children and theatrical performance after a long research by a group of teacher actors, it is a unique way of teaching-learning any subject with the technique/strategy of theater which is considered to be the identity of the classic TIE program. Its main purpose is education not entertainment, not what to think but how to think, not only human situations but also understand how to create new meanings, not only to find the answers to questions but also how to ask new questions.

TIE from a global perspective

American philosopher John Dewey (1859–1952) argued that children's cognitive and emotional development is best served by learning through early childhood creative play and problem-solving, and gave a revolutionary idea of learning by doing and learning by reflecting. We learn by doing and the important role the arts play in learning. Influenced by the ideas, two interrelated educational movements, drama-in-education, and theatre-in-education, became more integrated into the curriculum in the UK. Drama in Education (DIE) and Theater in Education (TIE) during the 1970s and 1980s, where DIE was treated primarily as a teaching method in the curriculum and TIE involved teacher-actor teams—which Used to do teaching work with students in demonstrations.

Why is TIE still important to education and society?

TIE began in Britain in the mid-1960s as a defiant movement in direct response to the needs of theater and schools. Theater sought new audiences and new ways of speaking to them. After World War II, there was a search for the theater to have a useful and effective role within society, especially as an educational medium and as a force for social change – Seen most notably in the work of Bertolt Brecht and Augusto Boal and in the wide spectrum of activity ranging from children's theater to political theatre; And, in education, the recognition during the 1960s and 1970s of the importance of the arts in the school curriculum can play a meaningful role in helping children understand and operate in the world in which they live.

Essentially **TIE seeks to use the techniques and imaginative power of theater in the service of education**. It aims to provide an

experience for young people (and, increasingly, the adult population) that challenges and stimulates further investigation of a chosen topic, both in and outside school. One of the key and *most effective features of TIE is the active/reflective participation of young people in drama*. Often placed within dramatic narratives, characters interact with and make decisions during a crisis; or are invited to challenge or offer advice to characters from games they have just seen, sometimes being included in its action. This practice coincidentally runs parallel to Augusto Boll's Theatre and Drama in Education technique. TIE and all TIE-related projects commit their audience to be their learning, to find their solutions when faced with challenges, and to be intelligent and sensitive enough to think (and feel intelligent).

Let us look briefly at some characteristics of TIE,

- Key features such as reflective participation,
- Social learning through role-playing,
- Work with young people & adults in both formal and informal educational settings,
- Use of innovative theatrical forms within the process.

We can see above characteristics in three formats -performance (participatory program), classroom drama (process drama) & workshop (theatre for development). But The term 'Classic' TIE was undoubtedly the concept of the TIE program, However, there is no set formula. The shape, style, and length of the program largely depend on the individual subject.

It typically uses elements of traditional theater (actors in the role and written dialogue, costume, and often the use of scenic and sound effects); educational drama (active participation of students, in or out of role, in improvised drama activities in which images and ideas are explored at the students' level); and simulations (highly structured role-playing and decision-making exercises within simulated 'real-life situations).

It is important to mention here, Some TIE Participatory program with TIE repertory'In India are– Actually, TIE Program is main recognition of TIE. Stage performance plus lesson replaces program. In this TIE Program, there is before, during and after participation in TIE play. Some TIE program in India as follows -.

1- Savdhan! Gora Rakhas aa rahahai & 'Bhukalage to murcurrypiyo' based on TIE Progam 'Rare earth" on pollution devised by TIE CO in England for 10-12 years children directed by **Barry john** who is first director who worked on TIE Program in India.

2- "Iglu – iglu" based on skimo life for 9-12 years , "Rajia sultan" from history" for 14 years , Kitab aur Pistol" based on "life of Bhagat singh' for14-17years, Pandita Ramabai" , social reformer for 12-16years , all under direction of **Maya Rao** .

3- I did four TIE Programs with students at NSD (TIE Wing) Tripura. i consider Creative research of *Theatre-in- education participatory program*– Theatre in education is theoretically based teaching and learning methodology which attend to combine it performances, process drama and Critical pedagogy. Professional actor-teacher team prepare program after researching curriculum topic and social issue with school children where children has given space to reflect on issue. TIE program seeks to challenge the child audience to ask question rather than answer. We did more than 70 shows in schools at Agartala (Tripura) from 2012 till now. I have researched & devised the following four TIE programs with student –teacher in TIE course under class of TIE- theory & practice to examine methodology of TIE like boal 's metaxis dual consciousness similarly Vygotsky,s dual effect (fiction vs. real) , Neelands and goode 's audience –participants ability to respond in the moment imagination concept by Edward bond etc.

- ***Unborn baby*** *(2014): This participatory program is based on reproduction chapter of class 8th and social science class 7th.*
- ***Fair & foul*** *2016:- is based on play "Macbeth" to understand misuse of power.*
- ***Ganit Manthan*** *(2018) – this program is based on math educator Dr. subhramaniyam' book I hate math, I love math to remove fear from math .During the process, participatory program aims at omitting the fear of math, finding its actual meaning and exploring its understanding in real life situations.*
- ***Khela , child right and you*** *(2022)- This participatory program is based on divorce. Children explore and understand child right to use in real life.*

Nowadays, many words similar to TIE are prevalent like Theater Education / Educational Theater / Drama in Education / Theater for Education names create confusion. Theater in Education is the use of theater techniques for education, it needs to be clarified for school Theater training is not intended to inculcate skills, but comes on its own, creating space for imaginary worlds in non-performance space separate from the theater building.

TIE derives the following ideas from existing improvisational theater and education –

Educationist Ivan Illich's book 'De-schooling - The Idea of Schooling helped to understand the school system. School teacher John Holt's book 'How children fail, how children succeed' experiences helped to understand children 'He says children smart,we must try to make them smart, we must beware of making them stupid. Dorothy treats this as a no-penalty zone, a learning environment. Although TIE roots are in Brecht's epic theater performance methodology, TIE took the idea of teaching from Brecht's Learning Play. Brecht used to place his audience in a technique of isolation to find change / to see the real. Method of Teaching from Educational Drama by DorothyHeathcote like Teacher in Role, Mental of Expert, and Idea of Living Through strengthened technique of TIE.

Pout Frere's book *Pedagogy of the Oppressed* created a new consciousness around the world, which Boal used as the core of his Theater of the Oppressed. TIE took the idea of reflective participation to empower children. Audience participation allows thinking of new options in a moment of crisis

In the early 1950s, the idea of introducing drama to the subject of the curriculum became popular with the influence of Dorothy Heathcote. She believed that drama is not a recreation of a story by action. Drama is an encounter with a man through a situation in which change occurs because whatever He/she also struggles with, he/she gets some understanding while facing those challenges.

Russian child psychologist Lev Vygotsky demonstrated that students learn best when adults participate and involve themselves in students imaginative play. First, it is called Zone of Proximal Development and included in TIE. The second theory Dual Defect (imagination to reality, reality to imaginary

world play) establishes children's play in the imaginary world and experimenting in a rational world. Both these elements are through imagination. Drama is the ability to make connections between the imaginary and the real world and to provide a deeper understanding. Educationist Bruner: In the book "Towards the Theory of Instruction", active participation in the learning process has been given special importance because until the child's friendship, emotion, and lifetime value are not added to the knowledge

Let's see clarify confusion of some similar practice

Educational theater is another 'catch-all' term, often used in the United States, to describe theater performed for explicitly educational purposes, usually for young audiences.

Young People's Theater (YPT) is yet another broad umbrella term, trained to cover all forms of professional theater for children and young people, including TIE;

Children's Theater for young audiences and Theater for Children (TYA) both refer to professional performances (in theaters or schools) of self-contained plays for young audiences. Children's theater typically caters to younger audiences (up to about twelve or thirteen years old) while TYA often embraces the teen years. This category includes work by national touring companies, productions by local repertory or TIE companies, and building-based children's theaters (of which there are few in Britain but many in the United States).

Youth Theater usually refers to professional theater work involving young people in the preparation and performance of prepared or written plays by a group. Often theater companies, including former TIE companies, will employ a youth organizer responsible for initiating and promoting such activity. Schools also provide youth theater as part of their extra-curricular provision but independent youth theaters devoted to wider policies of youth development of the theater arts are more common.

Theater education is sometimes, confusingly, also referred to as theater in education. It typically covers three aspects of work that are often considered a normal part of a repertory's responsibility (or in the US) establish relationships with children's theatres, schools, youth clubs, etc., to (a) theater Informed awareness of what it is and how it works, sometimes to teach

theater skills, (b) to provide game appreciation before theater visits (see below), and (c) new audiences for tomorrow These goals are generally accomplished through lectures, to build

Set 'workshops' or 'play days' are often run by the more enlightened repertory companies, using rehearsal pedagogy in schools where curriculum plays are studied. These sessions often include a series of plays in question linked to a commentary that emphasizes the play's contemporary relevance and its dramatic dimension,

Museum Theater is the use of theater and theatrical techniques as a means of mediating knowledge and understanding in the context of museum education (Jackson and Rees Leahy 2005:304). It is usually presented by professional actors and/or interpreters at museums or historical sites.

Theater professionals who implement this kind of work and in USA called *TEACHING artists*. Actor-teacher (or teacher-actor in some places), traditionally reserved for the TIE actor, is fast disappearing as a recognized title. Applied theater practitioners favor the general facilitator or sometimes the actor-facilitator. In museum theatre, the terms are even more varied - actor interpreters, consumer interpreters, presenters, and joker in forum theatre.

But most of it is not TIE. The distinction from TIE is an important one to draw.

Finally, there are three major areas closely related to TIE but outside the professional theater sector:

Education drama or drama in education (DIE) is drama taught in schools, with an emphasis on the form of process drama, DIE mainly depends on a teacher which is different from TIE who meets with children regularly and knows their special needs; DIE - This is similar to TIE, in that drama is used as a means to teach a variety of content areas. The objective is understanding rather than playmaking, although a play may be created in the process. Emphasis is placed on developing the child's imagination, self-awareness and expression, and social skills involving group work Also known as educational drama and drama pedagogy

Drama therapy developed in the UK in the 1960s from drama in education, dramatic play, and TIE. It is generally believed that it involves

the use of drama and theater techniques to promote mental and physical health. This is related to psychotherapy: healing is the primary goal.

Simulation gaming is an educational technology that grew rapidly in the 1970s, developed for use in both schools and management training schemes. (See Taylor and Walford 1970 in which students explore real-life situations, and solve problems.

Theater in Education in India

The countries of the world have accepted Theater in Education in their own, different from the principles of Theater in Education in England. Like other countries of the world, India too, established Theater in Education in the Indian context.

***Theater in Education Company (Sanskar Rang* Toli)**

National School of Drama established its Theater in Education Company (Sanskar Rang Toli) in 1989 to work for and with children. These theater performances with children, breaking away from the TIE principles of earlier efforts, deepened the awareness of theater as an experiential learning method, through a participatory process, of deep reflection. TIE is essential interdisciplinary approaches with inputs from techniques and theories of child development. In addition to working directly with children, with a focus on learning opportunities for spontaneous reaction, improvisation, storytelling, and performance, the need for T.I.E., the utility of drama as a pedagogy in the classroom To give importance to. With summer workshops for children, workshops in schools with teachers and children, and over thirty productions, TIE has grown in the field of working with children and has made a direct presence in theater and education.

Theater in Education course in India

In 2012, the National School of Drama (TIE Unit), Tripura has been established by the school in Agartala, Tripura in collaboration with the Department of Information and Cultural Affairs and Higher Education, Government of Tripura. This unit offers a one-year residential certificate course in Theater in Education for which students are taken from Tripura and the rest of the states. The course aims to prepare the color teacher and T.I.E. for schools. To prepare artists for various activities of

National School of Drama, Tripura, the only institute to prepare drama teachers for children, is seriously studying and teaching theater as

its important subject of education. The vision and design of this course, due to the untiring efforts of former director Ms. Kirti Jain and the positive approach and approval of the then director Dr. Anuradha Kapoor, with the help of late Sudhir Kulkarni, succeeded in turning it into ground reality, all the members of its course committee Countless thanks to all the teachers, trainers and all the students who have continuously contributed and are contributing significantly in the development of this great cause/institution. I hope that in the context of India, the TI E course of the National School of Drama is an invaluable fund, which is going to prove very useful in the future; it is going to bring a revolution in the field of education.

Tripura Project, The Tripura Project is unique because this is the first institutional attempt to make Theatre in Education an independent discipline that encompasses several other disciplines that relate to a child's education and creative expression. The idea of developing a course for theatre in education is to enliven education experience by preparing professionals who are well versed in theatre methods with a deep knowledge about characteristics of children. Students will learn through course content that theatre can aid in understanding personal and human experiences, allowing children to enter into the reality of imaginary situations and characters. Besides subject matter children can explore emotions, attitudes, opinions and relationships, and accommodate these abstract concepts more readily by representing them in a dramatic, and therefore, more concrete form.

The course will teach that drama makes constant demands on a person's imagination; it develops a child's ability to think more effectively. A student involved in a theatre activity will be called upon to practice several thinking skills, such as: inventing, generating, speculating, assimilating, clarifying, inducing, deducing, analyzing, accommodating, selecting, refining sequencing, and judging. Such an experience will enable Theatre artistes to contribute in socially responsible ways to the growth of children.

The course has been designed in a multi disciplinary manner to equip the students with theatre expertise where courses familiarise them with basics of theatre history, design, content and stagecraft. What makes this course unique is the student of theatre is provided foundation courses in child development and linkages between the potential of drama and the

classroom. There is a strong attempt to provide holistic training by rich field based experiences where the prospective students will be guided to integrate the learning and work in mediated environments to absorb the applicability for children. The guided fieldwork and hands on work will enable students to experience the significance of theatre as a tool to communicate, as a medium that addresses multiple competencies and is enjoyed by children as a subject in itself.

Main subjects of study in one year program like Basic principles of theatre, Acting and design practice, Child development, Contemporary India and childhood, Theater in education for children, Drama in education, Presentations, and Theater with children there are workshops. The syllabus decides what to teach but how to teach cannot be decided. It depends on the innovative faculty and what is his/her pedagogical knowledge, skill and experience. Here I would like to refer to John Dewey's "Learning by doing & reflecting ". He said that more important is the learner than the teacher and textbooks. Our education system is that should be focused on whether the learner is a child or an adult. The training of creative and reflective artistic teacher is needed.Creative work cannot be measured in numbers, that's why formative (formatting) assessment is more important.

Innovative and creative Specialists, experts, teachers, practitioners and trainers are invited from NSD, TIE and other institutions related to their specific subject. Students are assessed based on continuous performance, written tests, projects, demonstrations, and viva-voce by subject experts. In this institute, teachers do the work of teaching based on teaching methods/activities like lectures/group discussion/case studies/role play/storytelling/demo-demonstration, presentations, etc. For example, to make the lecture method (one-way teaching) interesting in teaching, question method, PowerPoint, group discussion, and reflective teaching are used to communicate with visuals, so that students do not only get information but also logical reasoning. Brain and artistic mind should also develop. Both the methods of logic (analysis) and experiences (activity) are needed in teaching a person.

Therefore, all subjects include 25% theory and 75% course study/ training. Which is educated /trained by dividing it into two sessions? Other components of the curriculum are; Self-learning projects, expertise as a teacher or artist, school internship, and observing, demonstrating, and

interpreting children - workshops, projects, demonstrations, tutorials, lectures, assignments, laboratory work, enrichment activities, presentation, and Display. This is a residential course so all the students are provided with hostel accommodation so that the training involves regular viewing of theatre, films, and videos, reading and analyzing books and articles, sometimes in whole groups or small groups. Students learn the subject by discussing it with each other in the group.

We know that education in dramatic arts, in theater as a subject, is considered to be the teaching of theatre, history, acting, theatrical literature, design, direction, playwriting, etc. There are both theoretical and practical forms of teaching these subjects and there is a teaching method to educate them, each one has a different teaching method, so it is necessary to decide that all subjects will not be taught with the same teaching method. What is the thing to be taught, what is its form, what is knowledge, information, skill, and value, and what is the method to be taught? Teaching -learning depends on what is the thing to be taught, it is necessary to decide What kind of knowledge and information is going to be taught, and what kind of skill is going to be practiced through mental/linguistic/artistic/physical/ dramatic knowledge, what the students will get and to what level.

Experts emphasize that the use of dramatic techniques as a teaching method is not the same as theater teaching. Theater is an art form that focuses on a product, a play production for an audience. The Mainstream theatre or conventional theatre is based on great script, performance and production that is our cultural heritage. But Drama in the classroom – often referred to as creative dramatics to distinguish them from the theater arts – is informal and focuses on the process of dramatic art for the learners, not the audience. The classroom drama is not only learning about drama but also learning through drama. The art of drama is a way of learning and knowing oneself and the outside world. Theater art is primarily valued as a medium of learning rather than art form and is governed and validated through criteria other than aesthetics. In the educational sphere, the goals of informal drama are far more developmental and learning-based than art-based; its aims are manifold, but they are all directed towards the growth and development of the participant rather than the entertainment or stimulation of the spectator.

Here, I will mention an example of new approach of teaching

,Theatre practitioner, teacher and writer, Prof. DevendraRaj Ankur has mentioned in his book *RANGMACH KA SOUNDARYASHASTRA* that if drama is taught from a theater perspective, then the chances of learning it double. It becomes limitless and if teachers and students explore it collaboratively, it will be wonderful study pedagogy. Studying drama literature through drama, you will say a strange thing is a drama to teach drama, new pedagogy has been discovered productive pedagogy and supporters of education have proved that drama is productive pedagogy in itself. Royal Shakespeare Company uses the Drama in Education technique for teaching Shakespeare. Why should we not use for children and adult education also. Children learn while playing and derive new meanings that are why we study and teach drama to break the monotony of any student. It is the job of the speaker to read the written text for the students; it is our job to make it interesting because we also work for the children. Suppose a child is to be told about a play, it may be difficult to recite. What works is Affective to Cognitive which is effective for both the child and the adult teacher. If I am teaching adults, there will be a lesson first, then there will be some activity or scene work on it, then it is called the cognitive-affective theory, it means, understanding first, then experiment, but for children, first activity, then understanding, that is called effective-cognitive theory. For example, if we take the play, Macbeth, children understand the plot of the whole play within ten minutes with the help of Story Who's Technique, next the hot sitting of the characters of the play, next the scenes in the still image, the conflict of the characters from the drama conventions, all the children understand easily after some activities. The teacher opens the whole drama by asking questions in front of the children in the role, this technique is done with forty-five children simultaneouslyand such drama convention/strategy has been made so that all the children in the classroom learn together at the same time. Drama is studied for a theatrical experience, a study in the group because the conclusion of drama writing is the ultimate goal of performance, but in the study, it is not possible to go to the presentation of every drama or to do scene work, it is also not appropriate according to time. But here, while playing the drama in a given time limit, the words and meaning of every dramatist are explored through drama strategies and it works.

National School of Drama, Tripura, the only institute to prepare drama teachers for children, is seriously studying and teaching theater as

its important subject of education. The vision and design of this course, due to the untiring efforts of former director *Ms. Kirti Jain* and the positive approach and approval of the then director *Dr. Aniradha Kapoor*, with the help of late Sudhir Kulkarni, succeeded in turning it into ground reality, all the members of its course committee Countless thanks to all the teachers, trainers and all the students who have continuously contributed and are contributing significantly in the development of this great cause/institution. I hope that in the context of India, the TI Course of the National School of Drama is an invaluable fund, which is going to prove very useful in the future; it is going to bring a revolution in the field of education.

Let's see what are the possibilities for drama education in National Curriculum at present?

First of all, I would like to mention the information about the efforts being made by the Government of India, which is also available on the website of the mentioned institutions, so that how drama teachers can use drama in the context of education and theatre? The biggest achievement in the National curriculum framework 2023 of the new education policy in India that is mentioned on how must be the teaching of arts in schools and art subject is equal to other subject like science and math. The detail guideline is available in NCF-23.assessment of arts is based on making, thinking and appreciating. So you can imagine what kind of approach and teaching is required for visual and performing arts. Only theatre has capacity to engage better than rest of arts because theatre gives context for learning and all art form.

In the year 2008, NCERT also prepared the syllabus for art teaching and presented the framework of a continuous and comprehensive evaluation for art teaching at primary and upper primary levels. Recently, on the direction of HRD, the material on outcome-based education has been approved/presented, in which all subjects as well as arts have been fixed.

We all know that the Free and Compulsory Education Act 2009 for children, the RTE Act has been implemented since 9th April 2010. Norms and Standards is a part where there is clear instruction for the appointment of upper primary art teachers in the school. Art education at the national upper primary level is a subject that needs to be evaluated.

The National Council of Educational Research and Training, New Delhi prepared the National Curriculum Framework 2005 which was seen as an important part of the Right to Education Act 2009 by the Parliament. The philosophy of this curriculum framework is influenced by constructivism which believes that learning is an ongoing process. The framework is based on the belief that learning is not possible through a one-to-one approach to different subjects but is a social, cultural, and cultural phenomenon. It is related to all the factors affecting the learning process of the children, therefore it is necessary to have a holistic approach to assess the learning of the children. A system of continuous and holistic evaluation has been implemented.

The National Council for Teacher Education has made a two-year diploma course for performing arts, this is an undergraduate program, and it also aims to become a theater teacher at the elementary level. It has all the aspects of TIE. Course of NSD, but till now this course has not started anywhere in India. The good thing is that for the first time, the philosophy and practice of Theater in Education and Drama in Education have been recognized in the Gazette of India.

The Central Board of Secondary Education CBSE has announced that Arts integration has been made compulsory for classes 1 to 12 from the next session. Special importance has been given to Art Integrated Learning/Cross Curriculum, Arts Integration Teaching. It is an approach in which students construct and demonstrates understanding through an art form. Students engage in a creative process that combines an art form and any other subject area (for curriculum or requirement) to gradually develop both.

Drama in Education paper is taught in B.Ed of the National Council for Teacher Education, which means that the teaching of your subject can be made a living experience with the strategy of drama, drama in education is pedagogy in itself, all subjects can be taught Could. The art-based teaching and cross-curricular learning that the government wants are present in drama in education, but unfortunately, theater teaching is being done in all B.Ed, which is not needed by those teachers. 4-year graduation course

The Central Board of Secondary Education designed theater study for classes 11th and 12th was closed after the pilot project due to a lack of

understanding of the pedagogy of theater, the problem is the same curriculum it tells what to teach but It doesn't tell how to teach. The main problem in this did not understand creative pedagogy. It is a matter of happiness that the 2-year Theater in Education course of the National School of Drama is considered eligible for the selection of a drama teacher.

The above government initiative shows that the possibilities of drama education are also being created in India in recent years. Along with this, it has great utility in other fields related to theatre. Students who are proficient in the course can give options at national and international levels in various business areas such as teaching training, media social work, arts management, etc.

Why is theatre teacher needed in the 21st century?

The arts are a means of expressing and interpreting the human experience. The best education/quality of education for individuals is accomplished only when the arts are an integral part of the daily teaching and learning process. The integration of the arts from foundation levels to secondary, and continuing education curriculum is a key to the humanistic development of students. The art of drama is a way of learning and knowing oneself and the outside world. Universality Educational Objectives: The UNESCO Commission on Education in the 21st Century, chaired by Jacques Delor, in its report (1996) identified four pillars for learning to treasure. Four Pillars: Learning to Know / Learning to Do / Learning to Live Together / Learning to Be. With the increasing international pressure on world education and the increasing importance of children in the classroom, these mandates that we pay attention to the reality of classroom diversity and the diversity of learners. Breaking away from the "one size fits all" model and bringing everyone together, classroom processes need to engage individual learners, even when they are large in number. **Theater as a source is an important method of learning**. In an academic context, with theater being a separate discipline and its practice/discipline –, learning and discovery from other disciplines can be an enjoyable and enlivening process. It provides unique educational opportunities, by giving place to participatory learning, beyond the written word, as a curricular process. In addition to being a subject and a method, the theater is both a process and a presentation. Mainly, it essentially approaches all important issues from the children's

point of view and encourages thinking and questioning in children. Theater offers pedagogy that provides opportunities for children to naturally question explore and experiment.

There is a teacher whose art is drama and there is a teacher whose art is drama teaching. There is a difference between these two. Suppose both types of teachers are appointed in a school, then both are working as teachers. There is a basic difference because the training is basic. There is a difference. One knows the subject, and the other has the knowledge of the subject along with training in pedagogy, so the question is can it be taught only with the knowledge of the subject or pedagogy is needed. If through knowledge of the subject can be taught, then why is there a need for teaching and training drama teachers?

A major problem is the lack of teachers trained to teach in various areas of arts education (teaching dance, music, theatre, and visual arts). Such art teachers who are educated for 2 to 6 years in drama schools, art colleges, or universities in various visual and performing arts departments. They neither get training in arts education nor arts education methods in schools. They are trained in their discipline but not as arts teachers, they are not trained in methods of teaching art to students aged 3 to 18 years. The role of a teacher is like a vehicle in a student's life. A teacher must know child psychology, child development, legal responsibility , drama and arts pedagogy, and culture of education. Art education is an activity-based subject that does not require textbooks or books. In such a situation the role of the teacher becomes even more important. They should be more alert, creative, reflective, and creative than other teachers.

Art teaching in the National Curriculum in India has been seen in two ways, as a subject, and as a medium. Overall drama as a subject / as a medium / as a presentation can be four types of objectives can be first for learning subjects for personal development, for learning as an art, and for therapy. Drama can achieve any objective. The teacher has to do three things for every lesson - lesson planning, implementation, evaluation, and the student's three tasks of creating/performing/reflecting/thinking / appreciating. To teach drama in school, the teacher of drama should be well-versed in three qualities. First- Attitude, Second -knowledge of the subject, and Third -study in the technique of teaching. Educator of drama Identity: Self, Role, and Character.

Finally, its main objective is to enable students to actively participate in the form of art, use their skills, enjoy theatre, and understand theatre. Can Theater teach in education and society? 'It has been TIE's ability to hybridize the world of play, reflection, personal development and self –education together with theatrical constructs that is its value. Considering new education policy in India and new scenario of theatre in school education, we can say assets of Theatre –in- education is an invaluable resource because it is pedagogical theatre andonly theatre may give to curriculum context for learning, interplay with thinking and doing, using all art form, imagination, creativity, etc. the theatre in education is being used in school & higher education for future teaching theatre as pedagogy all over the world apart from its own classic & changingform . In India, drama and arts in school education is emerging sector and, there is huge employment in this theatre sectorin coming days. I am worry about arts teachers, Indian government has no preparation for gross root level. Where can government get arts teacher for fifteen lacs school? Current Tripura government is not taking advantage of TIE practice after pursuing my own effort While Former chief minister Mr. Manik Sarkar and education minister Anil Sarkar were started with vision to change education in Tripura that's why NSD started this TIE course in collaboration with the Department of Information and Cultural Affairs and Higher Education.At the end, this is my opinion & advocacy for teaching drama and resource person for TIE but you are free to evaluate your own way that Theatre–in- Education (Learning through Theatre) is an invaluable resource or not.

(Courtesy : 'Learning through theatre' by tony Jackson and prospectus of TIE course)

Author : **Vijai Kumar Singh – the Founder Member and former Director of National School of Drama, Tripura Centre.**

Perverts and Prostitutes:
A Reading of Select Bat-tala Bengali Farces

Sib Sankar Mazumder

"বেরিয়ে এলেম, বেশ্যা হলেম, কুল করলাম ক্ষয়
তবুও কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়" (Sukumar Sen 81)
I left (home), became a prostitute, decimated my clan (for him)
Still my bastard keeper shouts at me (my translation)

The name Bat-tala has a popular resonance in nineteenth century Bengali literature. The preponderance of crudely printed chapbooks from Bat-tala which thrived on sensationalised accounts of murder, debauchery and prostitution considerably alarmed the colonial elites of Calcutta. The earliest references to the publishing business of Bat-tala can be traced back to 1820s, when a certain Biswanath Deb established a printing house in the Chitpur area (Gupta 257). Even when the publishing apparatus of Calcutta shifted its epicenter from Chitpur to the College Street area, Bat-tala still retained its significance for the kind of publications it was known. The common perception about Bat-tala publications is that these were cheaply printed copies of 'pulp' literature thriving on obscenity, vulgarity and debauchery. In recent times, a lot has been written on the emergence and growth of popular literature in Bat-tala and cultural historians like Sumanta Banerjee and Sripantha have defended the popular literature of Bat-tala (Banerjee 2019, Sripantha 2011). Sumanta Banerjee enunciates that there was "a flow of belles-lettres, picaresque novel, satirical sketches of everyday life in Calcutta" with a "farcical streak running through them" which flooded the streets of the city during mid-nineteenth century (Banerjee 1998, 175-6). However, a very influential section within the native elites were keen on associating the Bat-tala publications "with dirty stories, spicy accounts of local scandals" and "poor print" (Banerjee 1998, 184). Litterateurs like Bankim Chandra Chatterjee and Sukumar Sen were at the forefront of a crusade against the Bat-tala publications. Publicizing on behalf of Society for the Suppression of Obscenity, Bankim wrote "It would not be an exaggeration to say that obscenity is the national vice of the Bengalis. Those who may consider this to be an exaggeration, should merely think of Bengali

jokes, Bengali abuses" and in his opinion the farcical Bat-tala publications have thrived on this mass culture of obscenity (Banerjee 1998, 184). Sukumar Sen, eminent philologist, who once described the Bat-tala publications as "literature of the worst imaginable variety", was thoroughly surprised by his discovery that thousands of copies of these cheaply printed books could be sold within weeks (Biswas 10). According to an estimate, between 1854 and 1899, around one thousand Bat-tala publications on various issues were printed and published in the Chitpur (situated in North Calcutta) by the underground press (Biswas 46). It is not difficult to guess that the rising middle class of colonial Bengal was not untouched by the popularity of Bat-tala publications.

Among the most popular publications of the Bat-tala variety were a series of Bengali farces on a range of topical issues like polygamy, widow-remarriage, dowry system, alcoholism, lechery, whore-mongering, religious hypocrisy etc. Most of these farces were essentially didactic and characteristically rather propagandist in nature. The Bat-tala farces immediately became a convenient medium for commentary on contemporary socio-cultural issues. Contemporary records show that when the head priest of the Tarakeshwar temple, Madhab Giri, got embroiled in a murder case in 1873 at least 34 such farces were written and published on the incident. One of these farces titled Mahanter E Ki Kaj (1873) was one of the first plays to be performed in modern Bengali theatre. In fact, the popularity of the 'Mahanta' farces went to such an extreme that it gave rise to various anecdotes. One such anecdote relates that when Babu Bhubanmohan Neogi failed to procure a ticket to watch Uh! Mohanter E Ki Kaj he vowed to established a new theatre hall which ultimately led to the foundation of Great National Theatre in 1973 (Moitra 31). Many of these farcical texts unmasked different kinds of social malice which thrived at the heart of the city but at the same time one could detect an element of exaggeration bordering on perversion which is so characteristic of Bat-tala publications. The use of a grossly abusive language and "idiom of the streets" distinguishes them from the high end literature of the times (Banerjee 1998, 176). Interestingly, a lot of these texts provide probing insights into gender stereotyping as well as role reversals.

A good number of farces have been written on the phenomenon of prostitution in colonial Calcutta, the earliest of which is Bhabanicharan Bandyopadhyay (1787-1848) Naba Babu Bilash (1825). Bhabanicharan was

already known in the popular literary circles of Calcutta as an author of a series of highly entertaining satirical pieces. His Naba Babu Bilash (1825) shook the upper echelons of Calcutta society for a series of startling revelations about the practice of recruiting and training prostitutes. A popular proverb from the city streets hints at the greater power and privilege enjoyed by the prostitutes as opposed to devoted housewives –

" সতীদের অন্ন জোটে না, বেশ্যাদের জড়োয়া গহনা
রাবনের স্বর্ণপুরী, শ্রী রামচন্দ্র বানাচারী"

No food for a devoted-wife, quilted jewellery for the kept
Ravana's Golden-city, hermitage for Sri Ramachandra (my translation)

Terminologies like 'barangana', 'patita' or 'beshya' as opposed to 'bhadramahila' abound in both popular and serious literature of Bengal during nineteenth century. Ratnabali Chatterjee mentions that,

> "The image of the prostitute as the other of good woman was circulated by a number of Bengali texts throughout the nineteenth century. Both high and low literature, subscribed to the theme of moral decay brought about through the agency of sexually deviant women" (Chatterjee 166).

She further adds that an influential section of Bengali male authors of late nineteenth century were so intrigued by the popularity of this variety of literature that they started using characters, motifs and other "literary devices to make it a salacious subject for their male readers" (Chatterjee 166). The influence of the motifs relating to prostitutes, prostitution and other sexual and moral deviance abounds in nineteenth century Bengali literature – popular as well as serious, some of the most prominent specimen of which are Bhabanicharan Bandyopadhyay's Naba Bibi Bilas (1822), Naba Babu Bilas (1825), Amritlal Basu's Alaler Gharer Dulal (1857) and Kali Prasanna Sinha's Hutoum Penchar Naksha (1861) among others. There is hardly any doubt on the fact that Bhadralok writers of nineteenth century Calcutta heavily borrowed ideas and motifs from the culture of the lower orders and gave it a new form.

The Bat-tala publications on prostitution and eroticism, can be broadly classified in to three categories – (i) literature which represent prostitution as an abominable practice causing harm to civil society (ii) those which portray prostitutes as victims of physical, emotional and

financial exploitation, often ending on a tragic note and (iii) the third variety comprises of the kind where prostitutes are represented as crusaders against an unsympathetic society totally, its police administration and legal system. Farces like *Beshyashakti Nibartak Natak* (1860), *Beshyanurakti Bisham Bipatti* (1863) and *Maa Ayechen* (1873) portray the common prejudices of civil society against prostitutes. In the following section of this article an attempt would be made to analyse a few popular farce plays from this period which were written at the backdrop of a great crisis in Calcutta after the introduction of Contagious Diseases Act XIV of 1868, (popularly known as 'Choddo Ain' in Bengali).

Prasanna Kumar Pal's *Beshyashakti Nibartak Natak* is one of the earliest farces of Bat-tala press which unravels certain secret aspects of prostitution. It also represents an image of moral degradation which began to pose serious threats to the fundamental value systems which characterized Bengali middle class families for centuries. In a short introduction to the playwright reminds that he is aware of the fact that his play might not cure his countrymen from the abominable habits, nevertheless he would undertake an attempt and the least success in this endeavor would immensely satisfy him (Biswas 59).

The anonymous play *Beshyanurakti Bisham Bipatti* begins with a Latin proverb "Longum est iter per precepta, brave et effican per exampla", apparently, the learned advice i.e. 'even the wisest counsels make their way but slowly: the effect of good example is more immediate and effectual' is addressed to the deviant section within the city's *bhadralok* community (Bhattacharya 28). Further emphasizing the reformist intent of the play, the anonymous playwright articulates that she is primarily driven by an impulse of social service and it is up to the readers to decide whether the author has succeeded in his mission or not. *Beshyanurakti* presents a starkly unsympathetic portrayal of the prostitutes through the character of Hemalata and her mother Soudamini. Apparently, both of them are sheltered in rented house by Priya babu, a parvenu, who has inherited a considerable amount of property from his father. From the interaction between Priya babu and his friends we are given the impression that except maintaining a kept, he is no other remarkable lapses of conduct – "তা ভাই সত্য কথা বলতে কি, আজকাল সকলেরই এক একটি আছে এছাড়া কেউ নেই" [to be honest brother, these days everyone has one, no one is otherwise] (Bhattacharya 33). In fact Dina babu's observation on the habit of Priya babu reminds us of the popular *bazaari*

proverb of colonial Calcutta – "আজব শহর কলকাতা/ রাঁড়ি বুড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা" [Kolkata is a strange city where prostitutes, wagons and falsity are part of fashion]. Such popular proverbs substantially contribute to our vision of a city precariously under siege of a group of prostitutes. The biggest concern of the native gentry was that many prostitutes took up lodging right inside the heart of the city and it seemed as if the Company officials were failing to shift these prostitutes to a designated area. A contemporary Bengali newspaper reports, "There is not a single locality where you won't find at least ten houses of whores. Every year, instead of coming down, the number of whores in this city is going up" (Bhattacharya 89). Calcutta has literally become, comments Kaliprasanna Singha in a characteristically sarcastic tone "a city of whores" (Banerjee 1998, 89).

Seven years before the publication of Beshyanurakti Bisham Bipatti, some members of Bidyotsahini Sabha, led by Kaliprasanna Sinha, submitted a memorandum to 'Company Bahadur' complaining about the excesses committed by the prostitutes, at times, even in broad daylight. Prostitutes and their pimps enticed young men and women of respectable families to deviate from the path of righteousness. Another significant concern was that certain land-owners (including Maharshi Devendranath Thakur of Jorasanko) of the city allowed prostitutes to occupy rented houses right at the heart of the city which were eventually transformed into brothels by the prostitutes. Members of Bidyotsahini Sabha requested the intervention of city administration into this issue. Soon the Legislative Council of Bengal Presidency was flooded with other similar petitions requesting relocation of the prostitutes and their quarters towards the Sonagachi area of the city or far away from the city periphery. Under immense pressure from the civil society to curb the excesses of prostitutes the Contagious Diseases Act XIV was implemented in 1868.

A few months after the passage of Contagious Diseases Act, its provisions were published in a booklet titled Beshya Guide. It contained a circular from the colonial administration addressed to the prostitutes to get their names and address registered in the manual of local police station on or before 1st of April 1868. A good number of narratives, pamphlets, and farces on the prostitutes were already in circulation before the publication of Beshya Guide, however since the time of its publication this booklet occupied a seminal position in most discourse about the prostitutes in colonial Bengal. Ironically, however, since the passage of Contagious Diseases Act

opinion of the civil society of Calcutta on the plight of the prostitutes got sharply divided. Serious questions were raised from sections within the civil society about its efficacy and the possibility of its misuse by the police to harass women of lower caste and class was not completely ruled out by the colonial administration as well.

Popular literature in Bangali, based on the prostitutes, which appeared since the passage of Contagious Diseases Act sympathetically portray the hardships and exploitations to which prostitutes were subjected. Some of these farces adopt an apologetic tone on behalf of prostitutes. Plays like *Beshyanurakti Bisham Bipatti* and Tarini Chandra Das' *Beshya Bibaran Natak* (1869) begin with a reference to the infamous *choddo ain* and its disastrous impact on the prostitutes in nineteenth century Bengal. *Beshya Bibaran Natak* (1869) begins with a song which represents the chaotic circumstances in Calcutta's red light areas after the passage of the Act XIV. The only choice left with them was to dodge the stringent provisions of the Contagious Disease Act was by escaping to Chandan Nagar, the bastion of the French situated on the other side of River Hooghly:

"কি জানি কি করেন বিচারপতি তাই ভেবে
মরি। অনুভাবে বোঝা গেল, প্রেমের
বাজার মচকে গেলো, খাটবে নাকো ছল
চাতুরি। সইলো সব মিলে, চলো
যাই পলাইয়ে ফয়েস ডাঙ্গায় বাস করি। (Biswas 175)

Wondering what the judge might pronounce/ am dying.
From experience I have realized love tricks won't work any longer.
Dear ones let's escape to Foyes Dangai and settle there (my translation).

This play ends on an inflammatory note as its protagonist Sudhamukhi declares that she would like to be reborn as "an infidel" (Biswas 175):

" স্বামীহীন হইলে পুনর্বিবাহ করিব
হিন্দুকুলে জন্ম আর নাহিক লৈব
হিন্দুকুলে মনুষ্য নাহিক এক জন
হিন্দু ধর্ম মিছে মাত্র বুঝিনু এখন
পরীক্ষা দিতে যেতে হলো জবন ঠাঁই
পরীক্ষা দিয়ে পূণ গৃহে আসিব নাই
জাহ্নবী জীবনে দেহ করিয়ে অর্পণ
বাদসার গৃহে জন্ম করিব ধারণ

বাদসা ঘরে জন্ম লয়ে বিবি হয়ে রব
নিজ জোরে হিন্দু ধর্ম বিনাশ করিব" (Biswas 179).

Will remarry if my husband dies/I'll not be born among the Hindus/ There is not a single man among the Hindus/Now I have realized that Hinduism is a sham/ For (Health) check I had to visit an infidel/ I'll not return (home) after this check-up/ I shall offer my life to earth (i.e. I'll commit suicide)/ I'll be born in a family of a Badshah/ I'll be the Biwi (Begum) of a Badshah/ I'll shall devote all my strength to destroy Hinduism (my translation).

This emotional outburst from Sudhamukhi with which the short play comes to an end, not only reflects the feeling of socio-cultural insecurity from which she suffers but also the rebellious aspect of her character. At the end of a prolonged life of distress and stigma she resolves to avenge herself of the social censures to which she was subjected by the conservative Hindu society. Even in a fundamentally unorganized sector like prostitution there were certain socio-religious codes and principle which the prostitutes did not dared to flout openly. There was an unwritten law that Hindu prostitutes would not entertain clients from Mohammedan community and similarly Hindu men would not visit Mohammedan prostitutes. By the end of Prasanna Kumar Pal's *Beshyashakti Nibartak Natak*, its protagonist Sashimukhi is staring at the possibility of entertaining Muslim clients. However, Kaimuddi's offer for sexual favour appears as the ultimate state of disgrace to Sashimukhi. She interprets it as most unconceivable insult and exclaims on a tragic note,

হা পরমেশ্বর! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল?... আমি এমন কুকর্ম ক্যান করিয়াছিলাম, যে অতি জঘন্য পিশাচবৎ যবন দ্বারাও অপমানিত হইতে হইলো? (Pal 111)

Oh Almighty, was this also in my destiny?...Why did I commit such a crime that I had to be insulted by such a heinous, goblinesque infidel? (my translation).

Ironically, Sashimukh's sense of disgust at the possibility of being compelled to entertain a poor Mohammedan client does not completely reflect the hardships of Hindu prostitutes who were constantly challenged to pick between religious adherence and the compulsions of flesh trade. At times prostitutes as well as their clients used to conceal their identity because of the "predominating commercial interests of both the prostitutes and their clientele, which prevailed over the traditionally ordained religious norms" (Bannerjee 2019, 10). Tarini Chandra Das' protagonist Sudhamukhi draws

reader's attention to the wretched plight of the widows in contemporary Hindu society. Her preference for the abominable life of a prostitute over prolonged widowhood forces poses a daring challenge to Hindu orthodoxism,

"হিন্দু ঘরে জন্ম লয়ে সুখ নাহি হল
হইয়ে বিধবা দুক্ষে কত দিন গেল
বেশ্যা হইয়ে কিঞ্চিৎ সুখ হয়েছিল
সুখের গোড়া হতে বজ্রাঘাত পড়িল" (Biswas 179).

> Unhappy has been my life at a Hindu household/ all my days were spent in distress as a widow/ still a liitle happier I was as a prostitute/ destiny's club struck me with a thunder (my translation)

Few months before the publication of *Beshya Bibaran Natak,* in April 1869 a Bengali news paper reported that there were approximately two hundred Hindu prostitutes in Kolkata and most of them were widows. In fact, a lot of Hindu women were either forced to live the life of an absolute chastity or leave the 'protection' of her in-laws by joining prostitution. Young widows from upper caste of Hindu society who couldn't remarry usually found "their solitary condition unbearable" and turned to prostitution after incidents of unwanted pregnancy (Moitra 12). The child from such unwanted pregnancy, if it happened to be a female, usually, "ended up in the same profession" (Moitra 12). That the scenario in rural Bengal was even worse than the city can be presumed from a memorandum submitted by a section of prominent leaders of Hindu society to the colonial government requesting the exemption of Hindu prostitutes from compulsory pathological examination under the Contagious Disease Act:

> Those women [i.e. Hindu Brahmin widows] who do not court notoriety and admit but a few visitors in secret, should not at present be treated as "common prostitutes" within the meaning of the Act, as it is rather the intention of the Act to bring only under such direct surveillance and examination persons, who are by their own desire recognized as prostitutes (Basu 610).

In another anonymous play *Maa Ayechen*, a prostitute called Kamini narrates the circumstance under which she was compelled to join this abominable profession. Sharing her tragic story with Mohini, a fellow prostitute, Kamini reveals that her prolonged wait for a suitable husband culminated disastrously when her parents tied her in wedlock with an old Brahmin. However, as ill luck would have it, her husband demanded a certain sum of money for

performing the ritual of kushandika. Since her poor parents failed to pay the money Kamini waited in vain for years hoping for the return of her husband. Finally, she eloped with a cousin brother, who deserted her a few days after in the city of Kolkata (possibly she was sold off to a brothel keeper). Sumanta Banerjee observes that "a large number of women who flocked to the red-light areas from the late eighteenth to the mid-nineteenth centuries belonged to Brahmin Kulin families – daughters who could not be married off, and widows who were considered liabilities by their in-laws" (Banerjee 2019, 8). Kamini's predicament confirms the observations of Sumanta Banerjee.

Hemalata in *Beshyanurakti Bisham Bipatti* and Mohini in *Maa Ayechen* represent the polar extremities of the predicament of prostitutes in colonial Calcutta. In the preface to *Beshyanurakti Bisham Bipatti* the anonymous author (who introduces himself as নাট্যানুরাগী ব্যক্তি)confides to the readers that the objective of the play is to foreground the wretched life-world of those prostitutes who dare to leave their 'kulas' and join this abominable profession. Kedar, Priya babu's best friend, offers the latter an interesting piece of advice, " সামান্য বেশ্যাদের উপর love কি faith রাখা উচিত নয়, স্ত্রী জাতি মাত্রেই অবিশ্বাসিনী, তাতে বেশ্যা, ওরা অর্থের লোভে সকলি কত্তে পারে, এমন কি ধন পেলে জীবন পর্যন্ত বিনাশ করে" (Bhattacharya 33) [it is not proper to love or to repose faith on poor prostitutes, womenfolk are untrustworthy, they can do anything for money, they can destroy lives in exchange of wealth (my translation]. In a blatant display of patriarchal arrogance, punctuated by Shakespearian overtones, Kedar's generalization overlaps the distinction between prostitutes and women from respectable classes.

Miss Leslie's (most possibly a pseudonym) prose piece *Elokeshi Beshya* (1876) toys with the option of religious conversion as a possible source of emancipation for the prostitutes. Elokeshi's husband died when she was barely ten years old. After the death of her husband Elokeshi elopes with Khetra babu, a rich man married to a child bride. Ironically, when the news of Elokeshi's immoral relationship with Khetra babu is conveyed to his parents, they accept it without any resistance which is indicative of the fact that in the upper middle class society of colonial Calcutta such occurrences were treated as a 'normal affair'. However, another tragedy befalls on the life of Elokeshi when Khetra babu suddenly dies of illness. Neither her parents nor the family members of Khetra babu would accept her in their midst. With no other option left to her she chooses prostitution

as her livelihood,

" আমারো দুর্নাম হয়েছে, আমারতো স্বভাব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, আর সকলেই আমাকে বেশ্যা বলিয়া জানে, তবে কেন এরূপ গোপনে থেকে মিছা কষ্ট পাই? (Bhattacharya 133).

> I have gained an ill repute, my character is completely tarnished, everyone knows me to be a prostitute, then why should I suffer from the pain of anonymity? (my translation).

Gradually a transformation occurs in the life of Elokeshi as she begins reading passages from the New Testament. She finds solace in the Bible and prays to Lord Jesus –

> O Kind Redeemer, you are the savior of down trodden. Lord, I'm a great sinner and an unfortunate soul; I'm crying at your feet as I have faith in you. Merciful Lord, wash me [of my sins] (Bhattacharya 137).

In a truly Evangelical fashion Elokeshi's narrative ends with an open invitation to the prostitutes to leave the life of ignominy and strive for salvation by following the path of Christianity. Stenhope Press, based in Bou Bazar area of Calcutta, specialised in the publication of Biblical literature. The text of *Elokeshi Beshya* which was first published by Stenhope Press in 1876 bore an English subtitle *The Conversion of Elokesi.* Whereas, there is no hint of 'proselytization' in the Bengali title of the play, its English subtitle, rather surprisingly, foregrounds this idea as an alternative source of emancipation from the miserable plight of prostitution.

***

The epistemology of female sexuality and sexual deviancy in colonial Bengal was exclusively defined and shaped by the bourgeois patriarchy. Moral and religious insensitivity assumed the shape of sustained propaganda supported by half hearted interpretation of quasi-religious texts, some of which made incredulous claims such as sexual propensity in women was eight times as intense as that of men. Fear of female sexuality and anxiety to control it indirectly facilitated the publication chap books from Bat-tala. Whereas, most authors of Bat-tala farces were eager to portray the prostitutes as the root of all evils characterized the society, some devoted attention to issues like polygamy, child marriage and caste practices, one of its constant object of ridicule being the aged 'kulin' husbands with child wives. However, through an admixture of imagined and actual representations of female sexuality the Bat-tala farces augmented a myth of

universal sin of which prostitution was the vilest manifestation. But on the other hand, through their attempt to lend voice to the voiceless, these farces resisted the attempt of Bengali elites to push these women out of the scope of historiography. But their voices could not be completely silenced and often the Bat-tala farces became the vehicle for resistance against bourgeois patriarchal hegemony.

As many as fifteen satirical narratives and farces were available at a time with the street hawkers of Bat-tala's chap books depicting the debauchery of Madhav Giri, the Mahanta of Tarakeswar, most of which were printed between 1873 to 1876. However, some of these overtly licentious farces devoted attention to the scandalous or sexual aspect of the incident rather than criticizing the spiritual/moral deviance of Madhav Giri (Sripantha 35). However, by the time farces and narrative poems involving Tarakeswar Mahanta and Elokeshi started pouring out on the streets of Calcutta, the craze for 'prostitute-farces' were already on the wane. A sustained campaign against the 'objectionable' content and 'virulent' style of the Bat-tala farces launched by vernacular news papers and cultural elites ultimately drew the attention of colonial government towards this genre. The implementation of the Obscene Publications Act in Bengal which was adopted by the British Parliament in 1857 alarmed the nascent publication community of Bat-tala. The following year Calcutta police convicted three publishers in the city for printing 'objectionable' literature. In another instance a penalty of thirteen hundred rupees was imposed on the publisher of Dasharathi Roy's *Panchali* by the Supreme Court of Calcutta (Banerjee 1998, 158). A few publishers from Chitpur area were arrested for publishing and selling Bharatchandra's *Vidya-Sundar,* a text which was considered to be harmful for common consumption for suggestively obscene passages like this -

এসো যাদু আমার বাড়ি
তোমায় দিবো ভালোবাসা
যে আশায় এসেছো যাদু
পূর্ণ হবে মনো আশা
আমার নাম হীরা মালিনী
করি রাঁড়ি নেইকো স্বামী (Banerjee 1998, 142).

Come to my parlour honey/ I would offer love to you/ whatever be your desire/ It'll be fulfilled/ My name is Hira Malini/ I'm a widow, husband's gone (my translation).

Similar passages like the one quoted above were cited to substantiate charges of debauchery and sexual deviance against Bat-tala authors and publishers before court. Scared of harsh punitive consequences most publishers quickly burned or concealed copies of the farcical plays. So, cataclysmic was the impact of this prohibition that by the beginning of twentieth century most of the popular publications of Bat-tala disappeared from public gaze for good. When prominent thespian Amritlal Basu began a desperate search for these texts very few were available and some did not exist at all. Commenting on the literary merit of these farces he wrote, "They were not like Byron, Browning, Shelley, Swift,…[b]ut these books had a language, a flavor, a rhythm of their own…" (Basu 597). Contrary to the perception that standardized high literatures of colonial Calcutta succeeded in wiping out lesser print cultures, the success of Bat-tala chap books lie in opening up the doors of belles letters for the marginalized classes. It is the educated lower middle classes, living in the city as well as in its peripheries, who constituted the major clientele for this low-life literature since it voiced their distinctive concerns, likings, fears and beliefs.

Reference:

Banerjee, Sumanta. *The Parlour and the Streets: Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta. Calcutta:* Seagull, 1998.

— *Dangerous Outcast: The Prostitute in Nineteenth-Century Bengal.* Kolkata: Seagull Books, 2019 (1998).

Basu, Swapan Ed. *Sanbad-Samayikpatre Unish Shataker Babgali Samaj* (Dwitiya Khanda). Kolkata: Paschimbanga Bangla Akademi, 2003.

Bhattacharya, Moue ed. *Beshyapadar Panchti Durlabh Sangraha. Kolkata:* Ananda Publishers, 2011.

Biswas, Adrish Ed. *Bat-talar Boi: Unish Shataker Dushprapya Kuditi Boi.* Kolkata: Gangchil, 2011.

Chatterjee, Ratnabali. "Prostitution in Nineteenth Century Bengal: Construction of Class and Gender." Social Scientist 21.9/11 (Sept.-Oct., 1993). 159-72. JSTOR.web 08/06/2013 1.10 PM.

Gupta, Radhaprasad. "Boipagal Bangali". *Anadasangi: Anandabazar Patrika Sankalan* 1328-1403 (Vol.1). Kolkata: Ananda, 2009.

Moitra, Amit. *Rangalaye Banganati. Kolkata:* Ananda Publishers, 2004.

Pal, Prasanna Kumar. *"Beshyashakti Nibartak Natak"*. Hardikbrata Biswas Ed. *Prahasane Kalikaler Banga Mahila* (1860-1909). Kolkata: Charchapad, 2011. 55-112.

Sripantha Mohanta *Elokeshi Sambad.* Calcutta: Ananda Publishers, 2005 (1998).

Author : **Dr. Sib Sankar Mazumder, Asstt. Professor, English, Assam University, Silchar.**

Towards a Decolonial Model through *Jatra*
Rabindranath Tagore and His Theatre

■ **Arnab Chatterjee**

Abstract:

Tagore's theatre is not only marked by innovative experimentations in terms of both form and content but also by a search for indigenous model. His idea of *swadesi samaj* directed him to come up with a *swadesi* form of theatre beyond the power-politics of Western realistic theatre. The nineteenth century Bengal theatre was primarily a colonial import that marginalised a number of folk performances like *jatra*, *kirtan*, *pancharas* and many other indigenous non-dramatic folk arts like *kathakatha*. The whole idea of theatre was Western, urban and elite. Tagore did not like the Eurocentrism of theatre in India and envisaged and brought an alternative decolonised model. One of the strategies of decolonising the theatre was his use of folk forms of performance and folk culture. Tagore adopted constituent elements from *jatra* to arrive at a decolonial model of theatre where the material conditions of production and reception of texts wouldn't be determined by the coordinates of Western realism. Did Rabindranath seek within the *jatra* a projection of his own version of an ideal folk literature? How did *jatra* conform to his ideology of theatre? How did he reinvent the *jatra* form to suit his programme of decolonisation? This paper will critically try to respond to these questions.

Keywords: theatre, *jatra*, decolonisation, folk, *swadesi samaj*

Tagore's idea of *swadesi samaj* pitted against the belligerent and jingoistic form of Western nation-state had a profound influence on the ways he conceptualised his theatre. The ideological underpinnings of *atmashakti* were smoothly translated into the dramaturgical/theatrical innovations and experiments because he was not merely a playwright but also an actor, producer and director. As a colonial subject, Tagore was thinking of possible spaces of decolonisation that can repudiate the matrix of power relations between the coloniser and the colonised. He had started to put forward a decolonial space through two key concepts- one is *atmashakti* and the second is the regeneration of the villages. His Bengali

essays "Prachya O Paschatya Sabhyata (1901), "Nation Ki" (1901), "Bharatvarsher Itihas" (1902), "Swadesi Samaj" (1904) were catapulted towards a process of decolonization. . "Decolonization is the process of revealing and dismantling colonialist power in all its forms. This includes dismantling the hidden aspects of those institutional and cultural forces that had maintained the colonialist power and that remain even after political independence is achieved (Ashcroft, Griffiths and Tiffin 63)". The establishment of *ashram*-school at Santiniketan in 1901 drawing upon the ancient Indian *tapavan* underlined how he wanted to resist the English education in India introduced. He was an active nationalist when he participated in political protests against the partition of Bengal. He remained faithful to his concerns for his motherland though he began to increasingly distance himself from the mainstream politics of the then nationalists. Abhijit Sen has emphatically asserted that "If between 1900 and 1910 Rabindranath had started to imagine a new nation, he had also started to imagine a new theatre" (47).Tagore's ideas on of decolonility in culture and society informed his idea of theatre. While envisioning a 'new nation', he wrote his famous essay "Rangamancha" where he foregrounded his idea of a 'new' theatre firmly rooted in indigenous cultural traditions. In this brief essay, he explicitly expresses his liking for *jatra*: "In the performance of *jatra* there is no huge gap between the actor and the audience. The entire act reaches a successful culmination on the basis of belief and cordial cooperation with each other" (75-76). His dramaturgical innovations were embedded within the project of decolonisation as these disapprove the colonial and the urban nature of the contemporary Bengali theatre.

Tagore had tremendous fascination for *jatra* and other folk arts. In fact *jatra* was invited to be performed at Jorashanko. JyotindranathTagore in his reminiscences mentioned that the best *jatra* actors of the day, Nemai Das and Nitai Das were invited to perform in their house (Chattopadhyay 38). In *Chelebela* Rabindranath Tagore talked about his excitement at being allowed by the elders of the family to watch *jatra* and recounted his experiences of witnessing *Naldamayantir pala* (29). The Introduction to his play *Tapati* (1929) also brings out his liking for *jatra* where"due to huge crowd the space becomes narrow but the audacity of painted scenes cannot make the mind narrow" (467). The colonial binary of rendering the natives as immature has been dismantled when he calls the practice of frequently introducing painted scene in the dramatic performances childish

that "laughs at real truth and impedes the inner truth" (467).Tagore vehemently detested the use of painted scenery on stage which impedes the awakening of imaginative faculty of the audience. In *Phalguni* (1915) Kabisekhar plays the role of painting images in the mind of the audience through music. For Tagore, the stage was not the space to showcase images. The mind of the audience was the fertile ground to plant images. He did not want the kind of plays that deaden sensibilities and the endless flight of imagination and which foster unthinking passive response. The audience were expected to decode the bits of information and create the 'text' in his/her own way by actively participating in the process of meaning production.

Scholars have pointed out that Tagore's new ideas of theatre began with *Saradatsov*(1908). Is the influence of *jatra* traceable in *Saradatsov* (1908) and the plays written after 1908? Can't one find elements of jatrain the first group of plays including *Valmiki Pratibha* (1881), *Kalmrigaya*(1882), *Mayar Khela* (1888)? Critics have interpreted these plays as operatic. Whether these plays are operatic or not is debatable. What is clearly discernible in these plays is close resemblance to the form of *krishnajatra* also popularly known in villages as *kestajatra*. It is pertinent to note the different types of *jatra*- there are primarily three kinds of *jatra*-*krishnajatra*, *natunjatra* and *gitabhinay* which later on developed into *aitihasicjatra* or *samajikjatra*. *Krishna jatra* was based on songs and contained tales regarding Lord Krishna or sometimes other mythical stories. During 1820s from *Krishna jatra*, *natunjatra* came into being with an aim at secular entertainment. During 1860s *gitabhinay* appeared combining merriment from *natunjatra*, *bhakti* from *Krishna jatra* and pathos from European oriented Bengal theatre. Gradually *gitabhinay* reduced its emphasis on lyric and dance, and started to use prose dialogues. When Tagore wrote *Valmiki Pratibha*, he perhaps, looked back at the *Krishna jatra* or *natunjatra* where usually the narrative unfolded through songs. In *My Reminiscences* Tagore differentiated between *geetinatya* and Western opera and noted that *Valmiki Pratibha* is not "an opera but a little drama set to music" (194). But one cannot deny the influence of Western music in *Valmiki Prathibha.*Tagore was disappointed with the Indian *rag-ragini* lacked feelings due to the rigidity of the grammars and artificialities of the composers.Interestingly he set apart *Mayar Khela* from *Kal Mrigaya* and *Vakmiki Pratibha*: "In this the songs were important not the drama" (196). Though he does not mention the influence of *Krishna jatra*, it seems that

he followed the structure of *Krishna jatra* and blended it with newly learnt Western music. This perhaps added newness to his concept of theatre.

Though the influence of *jatra* along with other folk arts can be located at the very beginning of his career as a dramatist, it cannot be denied that *Saradotsav* (1908) remains as a watershed in his new theatre with a strong ideological position against the Western realistic theatre. The flexibility for incorporating changes with the power of capturing the mind of the audience attracted Tagore. According to Asit Kumar Bandyopadhyay: "The chief feature of *jatra* performance is the scope of changing according to the demand of the situation.*Jatra* has carved a space for itself in Tagore's plays through this change" (358 Translation mine). The open air ambience of Santiniketan was conducive for his ideology of new theatre and the open-air productions of his seasonal plays like *Saradotsav* and *Phalguni* attested his theatrical exigencies. The bare stage with minimum stage props constituted an appropriate setting. Tagore himself played the role of Sannyasi in the 1911 production of *Saradotsav* at Santiniketan where only a blue backcloth stood for the sky.Rabindranath allowed only a blue backcloth to stand in for the sky, and made Abanindranath remove the mica-sprinkled umbrella: "Rabikaka did not like it, and asked, 'Why the royal umbrella? The stage should remain clear and fresh'; so saying, he had the umbrella removed." (133). The topographical and the psychic spaces are played against each other in the dramatic structure of *Phalguni* :" Beginnings: the street" (Sc. I), "Search: the Ghat" (Sc. II), "Doubt: The Field (Sc. III), "Revelation: the Cave-mouth" (Sc. IV).In his mature plays – *Raja* (1910), *Dakghar*(1917), *Muktadhara* (1922), *Raktakarabi*(1924) and *Tasher Desh*(1933) he experimented considerably with the dramaturgical structure with his inclination towards *jatra* tradition. In *Muktodhara,* an unnamed traveller speaks of singing in a *jatra* party. In *Raktakarabi,*Nandini speaks of how Shrikanta disguises as a monster in *jatra* stage and children are afraid of him. What is interesting to note is not merely the influence of *jatra* but how dialogues underscore its presence.

The influence of *jatra* can also be seen in the ways Tagore used songs in his plays. In the absence of stage decor, Tagore thought, the use of songs was essential and grasped almost all the possibilities afforded by song. Sekhar Samddar argues that the use of music was a deliberate dramaturgical strategy of Tagore to provide his plays with a salient

characteristic in opposition to the realist five-act structure of Western drama (126). In *jatra* one can often find the use of song either at the end of a dialogue or as an extended dialogue. In the play *Raja*,Thakurda says that his mind awaits for the impending danger and then sings "*amar sakol nie bose achi sarbonasher ashai*" (I am sitting with all I have in anticipation of ruin). The figure of 'bibek' in *jatra* sings and comments on the action of the play and sometimes articulates the feelings of the audience. Though in Tagore's theatre 'bibek' never appeared on stage, the 'bibek' figure was perhaps at the back of his mind when he created characters like Bishu in *Raktakarabi,*Thakurda in *Raja,* Kabi sekhar in *Phalguni*, Dada-Thakur in *Achalayatan.* Sankha Ghosh has rightly observed that these characters weave an indigenous design into the inner body of the plays in a modern style (17).There is an abundance of songs in Tagore's symbolical plays. He used songs in these plays as an extension of dialogue or as chorus. In the seasonal plays the songs enhance the spirit of festivity and celebration. In *Sarodatsov*"*megherkole rod heseche*" (In the lap of the cloud the sun smiles) opens the spirit of celebration. In *Plaguni* songs become more important than dialogues. Edward Thompson thinks that "*Phalguni* in a sense is the poet's own manifesto. We might take the motto of his own method the watchman's query: is it your custom to answer questions by songs?" (113). A sense of joy intoxicated atmosphere is created in *Phalguni* in the song "*amaderkhapieberai*" (It makes us mad). The song "*ami rupe tomai volabona*" (I shall not bemuse you with my beauty) in *Raja* underlines the key theme of the play suggesting the needlessness of tangible presence and projecting love as the key to conquer everything and the song "*amra sobai raja*" (we are all kings) highlights the idea of good governance as opposed to the politics of violence perpetuated by the colonial masters. The figure of the *baul* sometimes appeared on *jatra* stage in rural areas. In his play *Phalguni*, Tagored played the role of a blind Baul and in *Muktadhara*, popular resistance through the message of non-violence and human love is presented through the figure of the *baul*, Dhananjoy Bairagi.

Tagore's experimentations in the field of theatre culminated in the dance drama which appeared in the late 20s where instead of dialogue, dance constitutes the performance text in the mind of the audience. In *Chelebela* he wrote how he felt about the dance taking place in a *jatrapala* that he was not allowed to see: "In the drowsy state at time the rhythm of the dance was audible" (25). He encouraged folk dances of Bengal and

experimented with traditional dances of Manipuri. Tagore travelled across Europe, America and Asia always and appropriated the best of each culture. He was fond of the dances of Java and Bali. When he travelled to Japan, the Japanese dance mesmarised him so much that he said Japanese dance is 'complete' and European dance is "half-acrobatics, half dance" (519). He had witnessed the use of dance in *jatra*and and also minutely observed the dances of the Japan, Java and Bali and thought of making dance as a new medium of communicating with the audience. The verbal language perhaps appeared as opaque and inadequate for the new kind of plays where dance was projected in the foreground. He refused to enter into the intricate web of words and looked beyond logocentrism. In *Chitrangada* (1936), *Chandalika*(1939), and *Shyama* (1939) dance acted as both kinesic signs and gestural signs and the songs generate oral/aural signs to create the performance text. This constituted a new semiology for theatre.

The use of the components from*jatra* is directly linked with Tagore's long-standing engagement with the folk art and culture. In *Loksahitya* Rabindranath commented on the importance folk literature and argues that the lower part of literature is firmly rooted in the indigenous soil like the way a tree keeps its roots intimately attached to the soil and looks above the sky. That part of literature which is universal is actually based on the regional and there is an immanent relationship between the universal and the local and he thinks that the local remains inaccessible to the outsiders (642). Tagore was trying to locate his new theatre in between the local and the global doing away with the matrix of power relations perpetuated by colonialism. The colonial masters wanted to destroy the village-centric Indian culture to create a sense of loss within the community. Tagore realised that the systematic erasure of the markers of national culture would be fatal for the nation. The politics of colonisation is always geared towards creating a sense of loss in the mind of the colonisers so that they cannot cling to any indigenous model. Tagore raged his immortal war against the British policy of systematic destruction of indigenous culture. *Jatra* was not merely a performing tradition but a dramatic art where he could locate his 'village community'. He kept on harping on the affective bond that remained as the nucleus of rural life.

The process of decolonisation required a sense of indigenous history that could be posited as an alternative to the Western colonial

historiography. *Jatra* along with other folk forms became a subject of interest for him because through the aid of these folk forms he could renew the indigenous past creatively. In a Bengali essay "Itihas Katha" he suggested that *jatra* and *kathakatha* could be considered as alternative forms of teaching history and are conducive for validating history in the untrained public sphere (453). He believed that the history would be accessible to the common mass through *jatra* rather than through text books prescribed in schools. His attempt to excavate the history of the nation and its dissemination among the common mass seems similar to what Ranajit Guha calls "a call for historicality to be rescued from its containment in World-history" (7). Through a popular dramatic folk form like *jatra*,he wanted to make the history of the nation speak through not by domesticating fact but by establishing its entrenched connection with the culture and society. By doing so, he could make a classic coalescence between the voice of emotion and the voice of epistemology that contested Western dominance and broke the binary between the 'alien' and the 'indigenous'.

For Rabindranath the language of folk performing art was not only easily accessible to the people, it was a medium through which a deep understanding of nature, environment and human relationship had been spread across time. He did not look at *jatra* from to revive the ancient tradition and innocently replicate it. He searched for organic and dynamic roots latent within the *jatra* and strove to capture the collective unconscious of the nation so that indigenous people can identify their own culture and tradition keeping aside cultural differences and social divides and feel that their indigenous tradition had not been irrevocably lost. *Jatra* provided him a form to look back upon discarding the Eurocentric urban inflections of theatre that served the colonial interest. For Rabindranath *jatra* was not archaic treasure trove, it was a vital and dynamic form of outlook that was replete with possibilities of integration.It was an indigenous tradition that he refashioned in his theatre with his creative talent.

Ashcroft, Bill; Griffits, Gareth and Tiffin, Helen. *Post-colonial Studies: The Key Concepts*. Routledge, 1998.

Bandyopadhyay, Asit Kumar. *Bangla SahityerItibrito*. Vol. 4. Modern Book Agency Pvt. Ltd, 2012.

Chattopadhyay, Basantakumar. *JyotindranatherJibansmriti*, edited by Prasantakumar Pal. Calutta: Subarnarekha 2002.

Ghosh, Sankha. *Kaler matra o Rabindranatak*. Dej Publishing , 2009.

Guha, Ranajit. *History at the Limit of World- History*. Oxford University Press, 2003.

Samaddar, Sekhar. *Natyamukti O Rabindranath*. Papyrus, 1998.

Sen, Abhijit. *Rabindranath Tagore's Theatre. From Page to Stage*. Routledge, 2022.

Tagore. Rabindranath. *Chelebela*. Kolkata: Visva-Bharati Granthan Bibhag, Poush 1366.

—. "Itihasa-Katha". Rabindra Rachanabali. Government of West Bengal, Saraswati Press Limited, 1992. XIV. 453-54.

—. "Japan Jatri". *RabibindraRachanabali*. Calcutta, West Bengal Government Centenary edition.Vol.10, 1961, pp. 477-532.

—. "Lokashaitya". Rabindra Rachanavali, Visva-Bharati, 1941, pp. 577 - 664.

—. *My Reminiscences*, translated by Surendranath Tagore. Macmillan, 1917.

—. *RabindraNatya-Sanghra*. 2 vols. Visva-Bharati Granthan Bibhag, magh 1406.

—. "Rangamancha". *BichitraPrabhandha*. Visva Bharatigranthaloi, Nov 1957, pp. 73-78.

Thakur, Abanindranath. *Gharoa*. Visva-Bharati rpt. 1987.

Thompson. Edward. *Rabindranath Tagore- Poet and Dramatist*. Oxford University Press, 1992.

Author : **Dr. Arnab Chatterjee, Assistant Professor, English, Harishchandrapur College, Malda, West Bengal.**

Nangiarkoothu
The Evolution of an Independent Female Narrative

Salini V. G

Nangiarkoothu, a solo performance by women, is generally regarded as a subtext of Kutiyattam, the Classical Sanskrit theatre of India. Down the centuries, it has evolved into a rather independent art form owning the spaces and creating new narratives in those spaces. As such, Nangiarkoothu today is a treasure trove to women's performance traditions for the nuances of acting and narration embedded in it as well as for the female authority that has nurtured and developed it. The paper attempts to highlight some of the contemporary performances in Nangiarkoothu thereby establishing its evolution from a sub text to an independent narrative.

Kutiyattam is regarded as the sole surviving classical Sanskrit theatre tradition of India, preserved and revived in Kerala, retaining its pristine serenity yet most modern in many aspects. It is also a storehouse of intrinsic theatre techniques that has attracted theatre enthusiasts across the globe. Kutiyattam, following its origin in early Sanskrit plays is an enactment of plays written by playwrights like Kalidasa, Saktibhadra, Harsha, and most popularly, Bhasa. As such the themes are related to Ramayana, Mahabharata, and often other legends. A centuries old tradition, the history of Kutiyattam has both dark and bright pages. Caste system and the temple culture, which was pivotal in preserving the art form but failed to revive it according to changing socio-cultural time thus suffocating the art within the rigid conventions of tradition. From the verge of extinction with no one to watch the performance inside the temple theatre complex called Koothambalam, Kutiyattam had its second birth when Painkulam Rama Chakyar started teaching the art form at Kerala Kalamandalam disregarding the conventions of caste, and taking it to a secular space.It is now recognized by the UNESCO as a masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity." Among many theatrical elements that has given *Kutiyattam* a unique space in world theatre, the role of women- as practitioners and characters- is especially significant" (V G 443).

The female narrative in Kutiyattam is seen most evidently in its sub text Nangiarkoothu. Nangiarkoothu as the name itself suggests, is the mode of acting by women, the Nangiars. As L.S Rajagopalan in his work *Women's Role in Kudiyattam* says,

'Nangyar Kuttu' is the performance of the *Viskambha* at the beginning of the second act of *Subhadradhananjaya* of Kulasekhara Varman (978-1036 A.D). While the role in the drama proper is very small the prelude is expanded and the story of Lord Krsna's childhood as adapted from the *Bhagavata*, X Skandha is enacted by a 'flash-back technique' called Nirvahana. (Rajagopalan 6)

But Nangiarkoothu has evolved from this definition made by Rajagopalan in 1997. Today it is not just the *nirvahanam* by Kalpalatika, the maid of Subhadra in Kulasekharavarma's play *Subhadra dhananjayam* that is called Nangiarkoothu. It has been revived and refined such that from within the structure and style of Kutiyattam, it has grown to an independent status of that of a solo female performance dealing with varied themes apart from the stories of Krishna. And it is gaining much influence in contemporary theatre as an epitome of female performance.

There is a belief that Nangiarkoothu has its prototype in the ritualistic dance called *Chudalakoothu* done for the purification of the soul of Brahmins qualified to perform ritual sacrifices. Aparna Nangiar, a contemporary Nangiarkoothu performer, who revived and performed *Chudalakoothu* in 2014, says that the acting manuals mentions to end the performance with a *mudiyakkitha*, which is usually done at the end of a complete Kutiyattam performance. This, she says, along with many such, is a hint that *Chudalakoothu* was an independent performance, and not a *nirvahanam* (Nangiar PI).There are many studies which associate the very name of Nangiars, the traditional performers of Kutiyattam to the ancient temple performers or devadasis. "With the integration of Kutiyattam into the temples of Kerala, the Nangiar started taking up the women roles, in addition to keeping the rhythm on the stage and reciting some of the verses in Kutiyattam. The enlarging of her repertoire seems to have been done during the time of Kulasekhara" (Gopalakrishnan 51).

King Kulasekhara who ruled Kerala during the tenth century AD, patronized Kutiyattam and made many innovations to the then existing form. In his own Sanskrit plays *Subhadra dhananjayam* and *Tapatisamvaranam*, he introduced Vidooshaka who speaks the regional

language thus popularizing the art form among his people.

During Kulasekhara's time, the scope of theatric action in Kutiyattam was extended manifold, to cater high tastes. To start with, instead of full plays, single acts from plays were treated as full-fledged plays. The technique of elaboration in theatric action and the detailed enactment of situations that had theatric potential became the highlight of the plays.(Gopalakrishnan 41)

It was along with such innovations that Kulasekhara, who was also a Vaishnavite, introduced *Sreekrishnacharitham*, the stories of Lord Krishna, as narrated by a female character Kalpalatika, in his play *Subhadradhananjayam*, and which came to be known popularly as *Sreekrishnacharitham Nangiarammakoothu*. In the opening scene of Act II of *Subhadradhananjayam*, Kalpalatika enters and says that she has come as per the orders of her lady, Subhadra: *anathamhibhattidariyayesubadhaye* (Nambiar 10). Subhadra has instructed Kalpalatika to fetch the piece of uppergarment that was lost as she was being abducted by the demon, Alambusa. Also Kalpalatika was to know the whereabouts of the young hero who saved Subhadra from the demon (10). Kalpalatika then recapitulates the events and incidents which led to her present role, taking the narrative as back to the very origin of Mathura Kingdom and the adventures of Lord Krishna, who is also the brother of Subhadra.This recapitulative narrative, in its totality, is called *nirvahanam* which is the unique narrative style of Kutiyattam.

Thus *Sreekrishnacharitham Nangiarammakoothu* is but a subplot within the main drama *Subhadradhananjayam*. However, it was performed as ritual offerings in several temples of Kerala by the traditional performers, the Nangiars, and the practice still continues with the same dedication : "In TrichurVadakkumnatha temple, Ambalapuzha Sree Krishna temple, Irinjalakuda Koodal manikyam temple . . . and few other temples, *Nangiar Koothu* is still conducted as a ritual offering" (Paniker 28). The Nangiars who perform the ritual inside the temple Koothambalam, enjoys the status of a priestess whose performance is regarded as a visual sacrifice. Only Nangiars were allowed to perform Nangiarkoothu in the early days, that too only inside the temples. Thus, lack of interaction and familiarity with the world outside the Koothambalam, along with the rigid codes of caste, led to the gradual decay of a powerful female performance tradition, which came to be performed for the sake of a mere ritual. It was during this time,

that late Sri. Painkulam Rama Chakyar started teaching Kutiyattam at Kerala Kalamandalam in 1965 (Namboothirippad 96). Though a Chakyar, the renaissance spirit in Painkulam Rama Chakyar led him to break the barriers of caste and rigid conventions, so as to take his art to the vast world outside. Along with the revival, that Kutiyattam had in general, Nangiarkoothu too was getting refined.

Kalamandalam Girija's joining Kerala Kalamandalam in 1971 as "the first non-Nangiar Student in Kutiyattam" is a milestone in the evolution of its female tradition (Venugopalan 163). All of the revivals in Kutiyattam female space – costume, make-up, characters, actions- happened through Kalamandalam Girija who still remembers how the foreign scholar Betty Jones introduced a new make-up style in her face, how she was chided by an old Nangiar for raising her hands and legs while performing, and how through continuous practices in classroom, the then discordant action and rhythm was synchronised. "Chakyar Ashan had a clear idea about refining Nangiarkoothu as early as 70s", says Girija, "that is why he sent me to Kunjippillakkutty Nangiaramma to get specialized training. He had also taught me several acting episodes like *mayilattam* (peacock dance), *patapurappad* (preparation for war), and *parvatavarnana* (describing the mountain), which were to be later incorporated into Nangiarkoothu stories like Poothanamoksham, Ugrasena bandhanam, and Govardhanodharanam" (Girija PI). Nevertheless, the female turn in Kutiyattam initiated by Painkulam Rama Chakyar and Kalamandalam Girija was taken up by Ammannur Madhava Chakyar and his disciple Usha Nangiar. Nangiarkoothu which thus began its evolution into independence in the late 1970s has now become a vibrant space of female performance which is evident form the contemporary narratives in the art.

Fig.1.
Nangiarkoothu, the old attire. Courtesy: Heike Moser.

In 2005, Magi Sati made a Nangiarkoothu performance which was totally different from *Sreekrishnacharitham Nangiarammakoothu*. Her performance was *Kannakicharitham* based on Ilango Adigal's *Chilappadikaram* focusing on the plight and power of Kannaki. In contrast to the existing way where the female performer, through a female character, eulogized the adventures of a male hero, Sati's performance portrayed a female narrator unfolding the "powerful tale of a woman's fight for justice" (Nagarajan "The Fury of a Woman Wronged"). In the same year, Kalamandalam Girija performed an independent narrative, *Gandharivilapam*, depicting the sorrow of Gandhari as the name suggests. Gandhari, who is the narrator of the story grieves not only at her motherhood, but also thinks about the humiliation suffered by Draupadi. With the same focus on motherhood, Girija performed her next Nangiarkoothu, *Karnotpathi*, portraying the conflict in the mind of Kunti as she mothers Karna. Usha Nangiar's *Draupadi*, though structured in the format of *nirvahanam* in the play *Venisamhara*, where Draupadi recaptures the events that led to the unlocking of her hair and her oath, eventually grows out of the play such that the ending of the narrative, where Ashwathama takes revenge upon Pandavasand in turn cursed by Krishna is something that happens after the events included in the play. Mahabharata's women characters are many and are being explored by the female practitioners of Kutiyattam. Kalamandalam Sangeetha's work on *Amba* is such a recent one.

An unsung character in Mahabharata, named Madhavi was given a voice through Nangiarkoothu by Kalamandalam Girija. As reviewed by V R Prabhoda chandran Nayar, "Madhavi' is an innovative addition to the repertoire of Nangiarkoothu, which was originally restricted to depicting the story of Krishna" (Nayar "Madhavi's Salvation"). The episode called Galavacharitha in Mahabharata, where Madhavi's name is just mentioned, became a Nangiarkoothu exclusively on the assertion of identity by Madhavi, the central character.Salini V G's portrayal of Damayanti, as the *nirvahanam* in the play *Naishadhanandam* can be performed as an independent Nangiarkoothu. A similar notable performance from Mahabharata is *Chitrangada* by KapilaVenu based on Tagore's play.Like *Kannakicharitham*, or *Madhavi*, *Chitrangada* too deviates from the recapitulative style of narration, yet using the techniques of Kutiyattam.

Fig.2. Salini V G performing Damayanti.
Courtesy: HariMenon

Similarly, the female characters of Ramayana too are given representation on stage through Nangiarkoothu performances. Sita's character has been delineated by Margi Sati, Usha Nangiar, and KapilaVenu. Margi Sati's *Seethayanam* traces the journey of Sita from birth to death, while UshaNangiar's performance is an adaptation of *Chintavishtayaya Sita*, a famous poem in Malayalam by Kumaranashan. Kapila, in *Sitaparityagam*, questions the decisions made by Rama and the injustice done to her: ". . . how can such an act be worthy of his lineage and education?" (Coelho "The eyes of Sita"). UshaNangiar's *Ahalyamoksham*, which focuses on Ahalya, Mandodari's*nirvahanam* where story unfolds through the perspective of Ravana's wife, Kalamandalam Girija's *Kaikasi*, portraying the thoughts and feelings of Ravana's mother- all these, and many more, are new narratives choreographed by the contemporary Nangiarkoothu practitioners.

The present day performers of Nangiarkoothu, through years of training, have gained confidence in their body and its potentials. Along with that, Kutiyattam's unique narrative style, which gives immense importance to *nirvahanam*, a solo performance, where the single actor gets ample freedom to use his/her imagination and interpretation to even transcend the written text, and bring in his/her narratives, is an effective tool for the female actor.In Nangiarkoothu, where woman is the actor, narrator, and character, contemporary practitioners, with a knowledge of their body potential, and empowered perspective, uses Nangiarkoothu to express their very self through the female characters and female narratives that they perform. Devoid of male intervention, they own the performance and narrative space, which is why Nangiarkoothu has become their favourite rather than Kutiyattam. Thus Nangiarkoothu has evolved from being a subplot within the drama to a main narrative of independent status. It has evolved from being a mere ritual to that of a powerful female narrative.

V.G., Salini. "The Terrible Beauty on the Stage: Narrative and Performance

Aesthetics of Kutiyattam Analyzed through the Representation of Shurpanakha". *Asian Theatre Journal*, vol. 38, no. 2, Fall 2021,pp 441-61.

WORKS CITED

Coelho, Shebana. "The eyes of Sita: 'Sitaparityagam' performed by KapilaVenu." Review of*Sitaparityagam*. *Narthaki*. narthaki.com / info/ rev16/ rev1931.html.

Girija, Kalamandalam. Personal Interview. 2023.

Gopalakrishnan, Sudha. *Kutiyattam: The Heritage Theatre of India*. Niyogi Books, 2011.

Nagarajan, Saraswathy. "The fury of a woman wronged". Metroplus. *The Hindu*, 3 April 2015.www.thehindu.com/features/metroplus/the-fury-of-a-woman-wronged/article 7065211.ece .

Nambiar, P K Narayanan. *Sreekrishnacharitham Nangiarammakoothu*. Kerala Kalamandalam, 2015.

Namboothirippad, Leela. *Kerala Kalamandalam Charithram*. Kerala Kalamandalam, 1990.

Nangiar, Aparna. Personal Interview. 2020.

Nayar, V R Prabhodachandran. "Madhavi's Salvation." Friday Review. *The Hindu*, 17 Feb. 2011.www.thehindu.com/features/friday-review/dance/ Madhavis-salvation/ article 15448168.ece .

Paniker, Nirmala. *Nangiar Koothu*. Natanakairali, 2005.

Rajagopalan, L.S. *Women's Role in Kudiyattam*. The Kuppuswami Sastry Research Institute, 1997.

Venugopalan, P. *Kutiyattam Register*. Margi, 2007.

V.G., Salini. "The Terrible Beauty on the Stage: Narrative and Performance Aesthetics of Kutiyattam Analyzed through the Representation of Shurpanakha". *Asian Theatre Journal*, vol. 38, No. 2, Fall 2021,pp 441-61.

Author : **Dr. Salini V.G. Performer & Asstt. Professor, English, N.S.S College, Ottapalam, Kerala.**

Decolonizing & Politicizing the Stage after the Independence: Writings of Utpal Dutt and Badal Sircar on Theatre

Bidhan Mondal

Abstract

The socio-cultural power of the European model of theatre in Bengal creates a silencing of the traditional Bengali theatre that reminds us of Edward Said's exhortation of cultural imperialism. This strategic "colonial mimicry" devours and breeds a cultural product which both aligns them with the West and simultaneously produces them as "mimic men". This gap opens up the space for resistance to the colonial discourse and testifies against a wholesome colonized's servitude through a counter-discourse. To decolonize the stage, Utpal Dutt and Badal Sircar explored the pre-colonial past to rediscover the root. The revolutionary appeal in their alternative theatre encouraged Indian English dramatists to challenge the influence of colonial mimicry in the post-independence or post-colonial era of theatre. My article explores the counter-discourse (primarily Leftist political) within the theatrical writings embedded in Utpal Dutt's book *Towards a Revolutionary Theatre* and Badal Sircar's book *On Theatre*.

Keywords: Theatre, Tradition, Stage, Root, Identity, Colonial

Edward Said asserts in *Culture and Imperialism*, "All cultures tend to make representations of foreign cultures the better to master or in some way control them. Yet, not all cultures make representations of foreign cultures and in fact master or control them" (Said 120). Modern theatre's beginning in Bengal was mostly identified with the closing years of the eighteenth century when the British prioritised the European proscenium theatre as a cultural artifact of bourgeois society, thereby establishing the undeniable genetic linkage between empire and theatre. Ananda Lal writes:

> In Calcutta, the Bengali stage remained within the confines of private family theatres open only to invited audiences. But what the enlightened joint households of the Bengal Renaissance lacked by way of organised financial acumen, they amply compensated for by means of trailblazing drama (Lal 33).

With his deep reading and understanding of the Marxist and Communist literature, Utpal Dutt endeavoured to counter this 'colonial mimicry' in the context of Bengali theatre. During his short hectic phase, "with the help of political formats of the agitprop and poster plays, Dutt discovered a form alternative to that of the bourgeoise urban proscenium theatre, which was chiefly a legacy of the colonial British" (Chatterjee 87). To reach the people, he moved towards a more deliberate and direct political theatre from the bounds of conventional bourgeois Western theatre. Kiranmoy Raha, an eminent Bengali critic, called him "the foremost proponent of political theatre with a pronounced leftist orientation" (Raha 170). In the chapter "Dialectics of Theatre" in his book *Towards a Revolutionary Theatre*, Utpal Dutt candidly confesses, "Ours being an out-and-out political theatre, we had been practising a direct colloquy with mostly illiterate audiences in order to make our propaganda intelligible to them". (Dutt 2). His group Amateur Shakespeareans was renamed as Little Theatre Group (LTG) in 1950 and in the later phase of LTG, Dutt directed successful productions like *Angar* (1959), *Ferari Fouj* (1961), *Titash Ekti Nadir Naam* (1963) and *Kallol* (1965).

With a nationalist zeal, Dutt tried to re-write the history of India and the Indian struggle for independence from an anti-imperialist point of view. Dutt scorns colonial baggage carried for a lifetime by the Calcutta theatres translating English and American plays. Exploring the long-deceased possibilities of Absurd Theatre, they imitated the Western European production methods—"They derided revolution, laughed at the political theatre and, in effect, tried faithfully to serve their bourgeois bosses" (81). This dubious way of colonial mimicry that ignores the demand of the mass can be observed in Bhabha's concept of mimicry. Bhabha, in "Of Mimicry and Man", says that in order to make their colonial scheme a success, the West creates its 'doubles' who are similar to them but not quite the same. Thus, introducing the concept of mimicry, as central to the discourse of colonialism, he defines it as:

> Colonial mimicry is the desire for a reformed recognizable Other, as a subject of difference that is almost the same, but not quite which is to say, that the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence; in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excesses, its difference (Bhabha 86).

Utpal Dutt defied this imperial legacy on stage. Kuntal Mukhopadhyay aptly points out that Utpal Dutt was exclusively a dramatist of an anti-imperialist, anti-colonial, anti-fascist viewpoint (Mukhopadhyay 44). When LTG broke up in 1969, Utpal Dutt formed a Jatragroup, "Bibek Natyasamaj", pioneering the recuperation and re-modelling of popular Jatra form to mould it into a political theatre. At this juncture, Dutt wrote and directed around thirty *palas* for several professional jatra teams of Chitpur. Dutt ruminates: "My only real link with the masses was through the professional folk theatre, the Jatra, which I had entered as writer and director in 1969 with the play *Rifle*" (Dutt 106).

Dutt, at this juncture, formed People's Theatre Group (PLT) after leaving the IPTA. They produced *Tiner Talwar* (1971), following the tradition of conventional Jatrapala dealing with the issue of the struggle of Bengali Theatre for survival in the 1870s. PLT's plays *Suryashikar* (1971), *SanyashirTarabari* (1972), *Mahavidroh* (1973), *Titumeer* (1978) were revamped versions of Dutt's Jatra shows that addressed ideas of decolonisation. Decolonialism in Postcolonial Studies finds its true façade in anti-colonial struggles of the colonized:

> The political struggle of colonized peoples against the specific ideology and practice of colonialism. Anti-colonialism signifies the point at which the various forms of opposition become articulated as a resistance to the operations of colonialism in political, economic and cultural institutions (Ashcroft 14).

Dutt's anti-colonial agenda in Jatra was to address the anti-colonial angst "to recapture for the people the important episodes of their past when they took up arms against landlords and the British army" (Gunawardana 227). Alongside this, he continued making poster plays and even tapped the resources of *jatra* (the folk form) for creating another effective alternative to the Western naturalistic proscenium. To highlight the solidarity of armed proletariat revolution all over the world, Dutt wrote purely Communist plays like *Cangor Karagarey* (1965), *Ajeo Vietnam* (1966), *Crushbiddho Cuba* (1967), *Lenin-er Dak* (1970), *Barricade* (1972), *Lenin Kothay* (1976), *Astra* (1976) and *Stalin 1934* (1979). But as Satya Bandyopadhyay believes, we should not consider Utpal Dutt as a political personality but as a theatre personality because the audience of his plays encountered him as a theatre personality (Bandyopadhyay 98). After

interacting with the Naxalite revolutionaries and interviewing the militant peasants, Dutt wrote the play *Teer* (1967) that captured a true story of the Naxalbari uprising "primarily aimed at the feudal exploiter and his ally the police, did not spare the CPI(M)-led government which permitted the massacre at Prasadujot" (Dutt 101). Dutt confirms his support for the CPI(ML) and the Naxalite armed rebellion by sharing that a revolutionary theatre can be "a rallying point for the people's resistance… It is the task of the revolutionary theatre to spread hatred, to preach hatred, to harp on hatred endlessly" (66). In 1977, Utpal Dutt again got involved in the election campaign with *Din Badaler Dwitio Pala*, which played a prophetic role and the Left Front came into power in West Bengal. Dutt wrote about this play—"It is a street-corner play that the audience factor most openly and visibly acts upon the contradictions of theatre" (59). In Jatra style, Dutt also wrote a play *EbarRajar Pala* (1977) that sums up the tragedy of a nation without democracy after the Emergency. It is interesting to note here that the role of street theatre as an agitprop against the ruling party (Congress, in this case), when the Leftist parties were in opposition, changed after 1977. Even in the decade of 1980s, Dutt wrote several street/poster dramas for election campaigns like *Maloparar Maa* (1983), *Tiljalar Jal* (1983), *Mumursha Nagari* (1985), *Kancher Ghat* (1987), and *BangalirBaccha* (1989). Towards the end of the play *Bangalir Baccha* or *Hamey Dekhna Hai*, Dutt once again glorifies the contribution of the Bengali revolutionaries in the nationalist freedom struggle against the British imperialists. Thus, he endows his political theatre with an anti-colonial and nationalist undertone besides being Marxist in perspective.

Utpal Dutt also writes about the careful use of folk elements, Dutt believes "by knocking out precisely that content and using only the score is to replace a vision with a slogan, to misuse folklore, to descend to formalism. Form and content are thoroughly integrated in folklore; to separate them is to kill it" (Dutt 166). To reach the people, Badal Sircar also wanted exposure to the ritualistic folk theatre that maximises the audience's imagination. Sircar desires emancipation of the dramatic, over-simplified and sentimental content in these folk performances like Jatra to create awareness among the masses in the villages. In the first chapter "Third Theatre" of his book *On Theatre*, Sircar writes "… In spite of the popularity of the traditional and folk theatres in the villages, the ideas and the themes remain mostly stagnant and sterile, unconnected with their own

problems of emancipation" (Sircar 2-3). Badal Sircar became the pioneer theatre playwright, director and ideologue to develop a variety of alternative theatres in the 1970s, which has been called alternatively as 'Free Theatre' or 'Third Theatre'. In the 1960s, the early phase of his theatre practice, Sircar performed with his group Satabdi like other theatre groups in proscenium playhouses in Calcutta: "We also took proscenium theatre, sets and lighting for granted. Satabdi at that time was no different from any other group theatre in Calcutta" (8). These plays like *Evam Indrajit*, *Sararattir, Ballavpurer Rupkatha, Basi Khabar*, *Baki Itihaas*, *Pralap*, *TringshaSatabdi*, *Pagla Ghoda*, and*Sesh Nei* were written between 1963-1669. Sumanta Bannerjee observes "a bitter mixture of savage humour and serious political discourse in these plays" (Bannerjee 102) that reflected the crisis in the life of urban Indian middle-class after the Independence. Bahurupi had staged Sircar's *Baki Itihass* (1967), *Pralaap* (1967), *Tringsha Satabdi* (1969), *Pagla Ghoda* (1971), and *Jadi Aar Ekaar* (1976) under the direction of Sombhu Mitra. These were excellent plays that dealt with the complexities of life and human relationships, focusing on the middle class Bengali individual. But Sircar was not content, as proscenium stage is suitable for naturalistic theatre that aims at creating an "illusion of reality in the mind of the spectator" (74). As a result of the competition theatre faced from cinema, Satabdi shifted from the naturalistic proscenium stage to the intimate theatre situation where the theatrical experience can be shared with the interactive spectators instead of keeping them passive. Definitely, Sircar wanted to deviate from the first (traditional) and the second (British) varieties of theatre that were running parallel. But, Sircar did not condemn the first and the second theatre, he elaborates:

> Today both theatre exists, each with its own strength and weakness, and it would be meaningless to select one and condemn the other. What we need to do is to analyse both the theatre forms to find the exact points of strength and weakness and their causes, and that may give us the clue for an attempt to create a Theatre of Synthesis— a Third Theatre (2).

The most significant contribution of Sircar through this new theatre movement was to realize the possibility of creating an alternative to commercialized city-based bourgeois theatre by creating "a *flexible, portable,* and *inexpensive theatre*" (Sircar 85). A theatre free from commercialism and hence bourgeois capitalism, free from dependence on

paraphernalia, and completely mobile, so it remains free to reach out to where the marginalized people are common villagers. A theatre that is literally free for the performers from the dearth of availability of halls and the spectators by doing away with the ticketing system. In the chapter "The Changing Language of Theatre" Sircar explains the term: "At the same time, this theatre was free in the sense that the performance space being open air, was free from the confines of the auditorium. Again it was also cutting down the cost of production through this minimalist theatre to be away from the trap of market forces that had already grabbed commercialized city theatres and group theatres" (85). Sircar wanted to debunk the conventional theatrical approach of developing the story through the dialogic interactions among the characters. Satabdi never restricted the productions to arena-acting for providing acting areas amidst the spectators to enhance the involvement between the actor and the spectator. Breaking away from the Stanislavskian method of acting, Sircar trained his actors to use the physical tools to communicate the meaning and define the space of a performance. Workshop and training methods help the performer "to be aware of one's own body; to discover the hidden potentials of the body; to develop mutual trust, both physical and psychological…bringing the mind-body relationship which distinguishes the theatre from the circus" (103-104). With his emphasis on the proximity of the actor and the spectators and the non-commercial aspect of the theatre, Sircar expected it to be more of a social movement than a commercial venture. After leaving the Anganmancha at the Academy after the Emergency, Satabdi hired several temporary halls/open-air spaces in Calcutta, where they performed major Third Theatre productions. Beginning with *Sagina Mahato* (1971), Satabdi produced *Abu Hossain* (1972), *Spartacus* (1972), *Michhil* (1974), *Bhoma* (1976), *Sukhopathya Bharater Itihaas* (1976) and *Hattamalar Opare* (1977) as Third Theatre productions in the *Anganmancha* or Intimate theatre space in the theatre halls/open-air arenas of Calcutta and the villages. These productions were simple and intimate, but mobile, with continuous physical acting. Based on the story of Gourikishore Ghosh, *Sagina Mahato* revolves around the rise and fall of a working class hero. The play *Michhil* through the motif of a procession raises questions about the death of humanity underlined by the repeated deaths of Khoka. The inhumanity and insensitivity of the human race is again under scrutiny in *Bhoma*, where the main character Bhoma dies of hunger and poverty. Reflecting the stark realities in the villages of Sundarban areas, the play criticizes the aspects

of the metropolis with reference to Calcutta and the Western economic imperialism in general. *Hattamalar Opare* was an adaptation of *Hattamalar Deshe*, a novel by Premendra Mita and Leela Majumdar. In this play, Sircar portrays a utopian world where everything is non-commercial and there is no concept of theft, prison and punishment. *Sukhopathya Bharater Itihaas* is a postcolonial critique that speaks against globalization as the economic imperialism and the neocolonialism.

Nevertheless, though the Western theatre practitioners looked towards performance traditions of the East to rejuvenate their theatre, Badal Sircar followed their instances without recourse to indigenous forms closer to home. Sircar draws upon the influences of folk forms of Indian and Western alternative theatre (like Richard Scechners's Living Theatre and Jergy Grotowsky's Poor Theatre) to indigenize his version of Third Theatre. He has also adapted Western classics to suit the requirement of his third theatre productions. Three such interesting adaptations are Brecht's *The Caucasian Chalk Circle* as *Gondi*, Peter Weiss's *Marat/Sade* as *Ekti Hatyar Natyakatha*, and Fernando Arrabel's *A Picnic on the Battlefield* as *Choruibhati*. But his theatre practice cannot be labeled as imitative because he had a specific form and content that he carefully and consciously devised to present his visions from an Indian perspective. However, in his attempt to reach out to people with a politically alert and critical theatre, the content hardly remained a synthesis of folk and city theatre. Though later on, Sircar has experimented with the folk forms like *pala-gaan* in *Gondi* (1977), *panchali, kabigaan* in *Lakkhichharar Panchali* (1984) and *pandabani* in *Bhool Rasta* (1988). This use of folk forms, along with the fusion of folksongs like *kirtan, bhatiyali* and *ramprasadi*, aimed at reaching out with his socio-political message to the villagers. But Sircar prioritizes intimate theatre always before open air theatre: "I personally feel more at home in Anganmancha. I believe there is still a lot to be explored there because it gives something in terms of intensity of communication which I cannot have in the open air… Artistically, I find more satisfaction in the Anganmancha productions, but as a social being, I find more satisfaction in open-air performance" (136).

Though Utpal Dutt and Badal Sircar may be regarded as poles apart ideologically, both may be seen as emerging with their brands of political theatre. Their principal drive was to take political theatre to the masses, which resulted in opting for non-proscenium forms. The use of

found spaces and open-air ambiance has helped them promote their agenda to connect with a broader cross-section of society. They have commented on the most important socio-political and economic issues relevant to post-independence India, often through a postcolonial critique of colonial history and neocolonial concerns. Most importantly, their alternative theatres in the post-independence have been conscious departures from the naturalistic proscenium theatres that were a colonial import and an infringement upon the long history of pre-colonial non-proscenium folk or traditional performances in India.

Works Cited

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. *Post- Colonial Studies: The Key Concepts*. Routledge, 2002.

Bandyopadhyay, Satya. *Utpal Datta O Taanr Theatre*. Papyrus, 1996.

Bannerjee, Sumanta. "The Theatre of Badal Sircar". *Badal Sircar: Search for a Language of Theatre*. Ed. Kirti Jain. Niyogi Books, 2016.

Bhabha, Homi K. "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse." *The Location of Culture*. Routledge, 1994.

Chatterjee, Sudipto. *The Colonial Staged*. Seagull, 2007.

Dutt, Utpal. *Towards a Revolutionary Theatre*. M. C. Sarkar & Sons, 1982.

Gunawardana, A. J. "Theatre as a Weapon: An Interview with UtpalDutt". *The Drama Review*15.2, 1971.

Jain, Kirti. Ed. Introduction. *Badal Sircar: Search for a Language of Theatre*. Niyogi Books, 2016.

Lal, Anand. "A Historiography of Modern Theatre." *Modern Indian Theatre: A Reader*.Ed. Nandi Bhatia. Oxford UP, 2009.

Mukhopadhyay, Kuntal. *Theatre and Politics: A Study of Group Theatre Movement of Bengal (1948-1987)*. Bibhasa, 1999.

Raha, Kiranmoy. *India-The Land and the People: Bengali Theatre*. National Book Trust, 1978.

Said, Edward. *Culture and Imperialism*. New York: Vintage, 1994.

Sircar, Badal. *On Theatre: Selected Essays*. Seagull Books, 2009.

Author : **Bidhan Mondal, Asstt. Professor, English at Kandra Radhakanta Kundu Mahavidyalaya, West Bengal.**

Mahasweta Devi's *Water* Voicing Human Rights

Durgesh Ravande

Abstract:

The research article explores how violation of human rights takes place in tribal belts of the country through denial of basic amenities and negligence towards tribes as citizens of the nation. The creative response of Mahasweta Devi in form of story entitled *Jal* earlier and its dramatization as *Water* (1972)later puts her at the decoding juncture of the crisis. The performativity is simple but captivating. Her uncompromising love for the socially as well as politically subjugated communities in different regions of the country has been conspicuous concern behind her activist literature. Being a spokesperson of human rights, a staunch believer in human values, she becomes a champion for the rights of deprived communities in the country.She experienced through her constant visits to tribal places and unbiased dialogue with tribes that in most of the cases the government agencies and affluent people team to exploit these people and as a result misery becomes their fate. Inspired by Indian folk form *Alkap* and western form 'The Theatre of the Oppressed', her theatre represents the issues in the actual lives of deprived communities.

The researcher is largely relied on the translated text, some virtual clips of actual performance and interviews of the writer available on internet along with a few secondary sources.

Key-words: Deprived, human rights, non-expensive, violation

Performing art has power to instigate people about their rights and actions. There has been an integrated association between human rights and theatre. "In the wake of the human rights legislation that emerged after World War II and the United Nations' 1948 Universal Declaration of Human Rights, theatre and performance artists have increasingly promoted specific human rights issues in their work and sought to establish special ties with various forms of human rights advocacy" (*Theatre and Human Rights after 1945*:03). With growing global aspirations; the twenty first century has already become a century of human rights. Theatre and performance have

initiated to advocate their importance in a constitutional nation like India. Theatre has been provoking the minds of people in tune with human rights. For example, 'The Jaffa Theatre' has played vital role in bringing together different dimensions of human rights and their meaningful presence in human life. The writers like Ariel Dorfman (Argentina), Athal Fugard (South Africa), Harold Pinter (Great Britain) have created global effect through their human rights allied productions. A mention of the plays like *The Colour of Justice, Fires in the Mirror* and *Twilight* is relevant in this regard. Theatre has a presence in civilized society world over as an expression of social power dynamics in both its effects and its creation. Mentioning Nirbhaya, a collective work by Ensemble facilitated by Yael Farber and inspired by international revulsion at the gang rape and murder of twenty three year old Jyoti Singh Pandey at Delhi in the year 2012 is crucial. On the other hand, 'Dance Theatre' of 1970 is considered effective for expression of human rights and human suffering.To add further, emotional understanding of issues has been considered as one of the significant concerns of the theatre. It is also believed that theatre is capable of creating alternative realities and perspectives to make this world a better place. As one knows, it aims at social change and the communication of peace and human rights principles. The dramatists and performers world over instrumented it as an instigator of change. In short, there has been an empowering quality in theatre. A quality as such is essential in the twenty first century conditionsbecause it has been a complex and more complicated socio-political scenario.

Mahasweta Devi's theatre is largely inspired from *Alkap* a regional folk type. It is a combination of music, dance and theatrical presentation. It is rooted in certain parts of West Bengal. An alkap group of ten to twelve performers is led by a *sarkar* (master) and includes two or three young men called *chhokras* one or two *gayens* or singers, *dohar*, choristers, and musicians. Actually, it is presented in five parts: *Asar Vandana*, *Chhora*, *Kaap*, *Baithaki Gaan* and *Khemta Pala*. These performances usually reflect rural society and put the focus on the prevailing socio-economic condition of the rural masses. In one of her interviews, MahaswetaDevi mentions that "…in the last few years in my travels among the people, I've come across several traditional folk forms, like the *alkap,* with its rich treatment of social themes in an idiom of repartees-earthy, full of blood, and highly sophisticated forms that carry on easily from speech

to singing"(*Five Plays*: xiv). She also adds that there is an impact of *Chho* dance performances on the actual making of her plays. On the other hand, *the* renowned theatre practices like 'Theatre of the Oppressed' maintains its association with human rights. Baul's theatre of the oppressed impresses Mahasweta Devi's theatre in terms of subject and form. 'Acting with least prop but ample deliverance' is significant feature of this theatre.The performing modules of Mahasweta Devi resemble theatricality of this performance type to some extent. The theatre of Mahasweta Devi is at large a theatre of protest. The issues such as sexual abuse human trafficking, political oppression, genocide, and torture of any other kind finds a larger place in protest theatre. Transforming public space into a communal place remains characteristic of theatre like this. The relation of theatre with unspoken and also unspeakable has a rooted concern in case of Mahasweta Devi. Her theatre represents the issues of voiceless people. Her objective is to reach communities, neglected groups of people through modest prop and simplified means of performance. Though the issues of under-privileged classes are demonstrated; it is not a particular kind of theatre but one that incites actual implementation of human as well as democratic rights.

On the other hand, Mahasweta Devi's theatrical practices have resemblance with poor theatre as it believes "…we found that theatre can exist without make-up, without autonomic costume and scenography, without a separate performance area (stage), without lighting and sound effects etc." (*Towards a Poor Theatre*: 19). Performance with least prop and decorative measures is common with both the Poor Theatre and the theatre of Mahasweta Devi.

The play *Water*, divided into fourteen scenes, is a pathetic story of a dome /an untouchable who divines water but has been denied to take it. Many others from his community stand bounded like him before the feudal power.Maghai Dome on one hand and Santosh on the other hand are not just individuals but two contradictory sides of power system. One is at the central position whereas other is on periphery. Maghai is such an unfortunate creature who divines water for Santosh-the centre of village power structure but cannot get even small quantity of water for his family or community. He is modern Bhagirath but remains thirsty all the way. There are two major aspects of dominance in the play. On one hand, denial of water from village well for the untouchables whereas mounting corruption in the welfare

schemes for these people is another trait. In both the conditions, suffering is intense and there seems to have no escape route. The river Charsa often going dry during summer elevates the difficulties for this folk. There is none who can response their sorrow and emancipate them from this cycle of pains. The friends of Maghai's son Dhura often visit their locality but they are labelled as Naxalites by the power-holders like Santosh and police. Hence, any kind of help offered by them fails to produce actual effect. The traumatic condition of low-caste communities through unbearable irregularities in the government schemes like NREGA reveals inferior state of a large section of the society and denotes pragmatic realities.

It can be argued that Mahasweta Devi's non-expensive, simple and optimistic theatre though least known and marginally developed; continues to fight for fundamental rights of exploited people. As D. Soyini Madison observes regarding community- based theatrical performances in rural Africa:

These performances not only reflect who we are but they also shape and direct who we are and what we can become. The major work of performance ethnography is to make performances that do the labour of advocacy, and do it ethically to inspire realms of reflection and responsibility. Bertolt Brecht reminds us that performance must also proceed beyond that of a mirror reflection to become the hammer that breaks the mirror, distorts the reflection, to build a new reality." (*Act of Activism:* 12). The theatre of Mahasweta Devi provokes a great deal of similarity in this regard.

Mahasweta Devi's theatrical engagements stand particularly for oppressed, marginalized community. As stated earlier, her theatrical ideals show an intimate association with Augusto Boal's Theatre of the Oppressed. Boal has suggested that "…the theatre of the bourgeoisie is a finished theatre in which images of a complete and perfect world are presented. But since the oppressed classes do not know what their world would be like their theatre is unfinished –so their theatre is –a rehearsal for revolution" (Srampikal: 28). Similarly, Mahasweta Devi's theatre is an unfinished one as it believes in presenting the issues of subalterns. The stage strategies are often crucial to percept the ideas in the plays of Mahasweta Devi. She maintains stage economy throughout her presentation. The stage prop is sufficient to undermine the difference between her intention and the actual presentation.

Mahasweta Devi has a prestigious position for the idiosyncrasy related to practical writing. As she has been working and writing to change the destiny of tribal people living in the states such as West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orisa. Though her literary activism is restricted to certain regions; she does not consider herself as a writer of a specific state. She denotes: "…all my books could represent India. I consider myself an Indian writer because what I am writing could be true of any part of India" (Dickman, 34). To be précis, her literary distinctiveness is not a flash in the pan but an upshot of her comprehensive expression. The unfailing commitment for the upliftment of 'the wretched of the earth' occupies central position in her writing. Althuserian term determinism denies one to one relationship between economic conditions to resolve superstructure and implies thus multiple reasons behind actual formation of superstructure. Similarly, Mahasweta Devi interprets more reasons behind the oppression of under-privileged classes. Noted Neo-Marxist critic, George Luckas finds depiction of reality as the real criterion of greatness of every great writer. Likewise, Mahasweta Devi undoubtedly shows an indominable faith in Luckas and Brecht also when she accepts the fact that literature should function extensively for people's emancipation struggle. Her literature, in this way, is more like a river in the plain than a gushing cascade.

Theatre can be more effective and direct to unearth the problems in the life of underprivileged communities. As their existence is completely denied and they have been compelled to remain isolated from the main stream of life. There is an extensive depiction of people's emancipation struggle in Mahasweta Devi's plays. On the other hand, theatre for the oppressed communities has always been considered by Augusto Boal, the proponent of Theatre of the Oppressed, as 'a rehearsal for revolution'. In this way, theatre for Mahasweta Devi is a serious engagement with the issues of oppressed, under-privileged communities. It is most suitable, effective for taking, and propagating the social and other issues of these people as violation of human rights in their case seems to have marginal consideration. Like Mahasweta Devi Mangai, veteran theatre person isalso known for human rights practices through theatre. Her theatrical contribution deserves a special mention because like Mahasweta Devi she has areach to masses and also her performance is at the ease of audience as it finds easy to relate with the situations in her plays. Though

Managi takes a feminine stance but on the ground of concern for humanistic values there seems to have similarities with Mahasweta Devi. It can be argued that "there are various terms: cancer survivor, rape survivor etc. It is simultaneously about accepting pain and resisting it. It is about putting together the broken pieces and keeping ourselves intact" (*The Hindu*, Sept.03,2020). The motivation behind producing and enacting play is common in both of these writers.

The play *Water* is all about how power is being used to subjugate a particular group of people. How dominance of a particular class, group of some people governs the lives many people. The issues like human dignity, trust and welfare of larger section of the society are most crucial in the play.There has been a constant struggle or fight between two classes of the society. But the larger group of the society having meagre economic condition finds its survival impossible.Maghai, the protagonist, is much engaged in the work of water divining and takes it as his social responsibility. He believes:

MAGHAI. …The work we were born to may not provide us with food, but was left to us by our ancestors, my grandfather, his father, his father- for ages it has been our work. (146)

MAGHAI. … How can I refuse to come for a job that's been handed down to me by my ancestors, a job that I owe to my caste? ... (153).

But as a matter of fact he could not get water for himself or for his community. He finds a distinction between social responsibility and social untouchability.The conflict between personal and social self is one more important aspect of the play. Maghai has "an instinctive understanding of nature and what the idealistic teacher contributed is a kind of germinal politicization of the instinctive" (*Five Plays*: xii). Threat at different levels and of various kinds carries quintessence in the play. The dominated class is often found under threat. Their rights are often crushed under feet and there is possibility of suppression in future also.

'Present enacting the past happening' is an effective dramatic device used in the plays of Mahasweta Devi. It is just like the playwright has done in her other plays like *Aajir* and *Bayen.* Being a playwright, she aspires to fuse past with present and vice versa to implicit unchanged condition of the particular people. They face similar difficulties, a

constant struggle for basic amenities.The pathetic state is found in the dialogue between Dhura and one character in the play.

DHURA. … When we go to distribute the Prasad from the Dharma Puja in the village, they won't let us stand under the ledges of their huts—we're the untouchables.

ONE. We've gone all over that, Dhura. The castes, upper and lower, don't mean a thing. They are labels designed by men. The Constitution's clear on that. But who cares to uphold the constitution? (126).

The issue of water in the play is centredon caste hegemony existed in India. Dhura and his friends' rebellious attempts, Phulmani's anxieties and Maghai's committed efforts could not challenge the rooted notions of difference and the practices of inequality. To elaborate further, our myths, cultural practices, politics, histories, index for human progress and civilisation are built around the availability and harnessing of water.On the other hand, the playwright does not assure resolution of the problem through building dam over the river. It can mark a line of divide and makes the condition worse than earlier. The caste practices are interwoven with water issue keeping the subalterns at the helm of oppression. Oppression in this regard has two important agendas in relation to the practice of caste system: subjugation and humiliation. The condition of Maghai fits proper in this context. His fight culminates in his death with the river carrying him away as per his last wish. The man, who divined water throughout his life, ended his life in the flow of water but could not assure any source of water throughout his life. Thoughhis ending may dramatically justify Maghai s intricate, metaphysical connection with water but dried and dull social reception conveys his misfortune.

The research article though argues a single play of Mahasweta Devi but it can captivate the readers to comprehend her concern for human values in other plays. The researcher would like to state the foremost findings of the research such as i) the basic amenities like water remain out of reach even after seventy-five years of independence for indigenous communities in some parts of the country. ii) The feudal control i.e. the mode of dominance has its existence to challenge the life of the poverty-stricken people. iii) There is no satisfactory answer to the issues of tribal folk. iv) Human rights still do not find ground in certain parts of the country and theatre is more powerful medium to aware these people of their pathetic

state. v) Being a playwright Mahasweta Devi has skilfully used theatre to demonstrate the issues related with human rights.

The technicality of Mahasweta Devi's plays, their performativity and acceptance on a large scale may be taken as the issues of debate and further discussions. At a particular stage in her life, she found herself uncomfortable with theatre. But the conventional folk performances, their simplicity and stunning effect on the minds of audience enthralled her enough to take this artistic form for expression. The socio-political dominance, the system of exploitation resulting into disregard for human rights of a particular group of people left her restless. She chose theatre and ended space between the actual problems of dominated class and their understanding. Hence her theatre should be appreciated for its genuine and effective message for the survival of human rights in particular and humanity in general.

References:

Devi, Mahasweta (1999), *Five Plays*: Trans. Samik Bandyopadhyay, Seagull Books: Calcutta

Dickman, Sue. (1995), "In Conversation with Indian Women Writers". *The Book Review*.19:4. (April). pp 31-35.

Grotowski, Jerzy (2002), *Towards a Poor Theatre,*Routledge:New York.

Morin,Emilie and Luckhurst,Mary Ed.(2015),*Theatre and Human Rights after 1945,*Palgrave Macmillan:Hampshire.

Srampickal, Jacob. (1994),*Voice to the Voiceless: The Power of People's Theatre in India*, Hurst and Company: London.

Newspaper:

The Hindu-dated Sept.03, 2020.

Author : **Dr. Durgesh Ravande, Professor, English. KKM College, Manwath, Maharastra.**

The Folk Theatre of the Sundarbans Ecology, Ethics and Endangerment in *Bon Bibir Palagaan*

Indrani Chakraborty

Abstract

India has a rich legacy of folk theatre which expresses the indigenous cultural codes, traditional values, and belief systems through music, performance art, stylized poetry, religious ballads, heroic tales, and ritualistic festivities. There are Ritual Theatre (religious in essence), Theatre of Entertainment (secular in essence), South Indian Theatre, and varied sub-genres of Indian Theatre – each replete with distinctive encryptions and heuristic innovation simply in a deep interconnectedness with the environment.Further, it also delineates the indigenous people and their almost futuristic perspective that connects with contemporary ecocritical anxieties. In my paper, I intend to analyse how the folk theatre of the Sundarbans based on the myth of Bon Bibi, showcases the distinctiveness of the environment and its inherited belief system. My paper also aims to exemplify how the dramatic performances of Bon Bibi and the myths surrounding her define the life conditions of the dispossessed community. I intend to further establish that the folk theatre of the Sundarbans is not only spiritual, but it is also political. It highlights how the Anthropocene aggravates and disrupts the life and livelihood of the subalterns who use art as their only armour against a hostile environment created by the Anthropocene.

Keywords : Folk theatre, Indigenous, Anthropocene, Ecology.

Introduction

The emergence and growth of Indian theatre from its earliest form of Sanskrit theatre towards growing a palimpsest of folk theatres is indeed an emblem of a truly diverse civilization. In the beginning, the folk theatre was basically devotional and it centred around themes based on local legends, mythology, and local deities. Later, secular themes of romance, bravery, and heroism started to be celebrated in the matrix of folk theatres. All these chiseled out the distinctive style and signature of respective

regions. For example, *Bhaona,* the performance of the Assamese traditional one-act plays known as *Ankiya Naat* uses the *Brajavali* language created by Sankardeva and uses local art efacts like masks, and musical instruments like *khol* and cymbals to incorporate the spiritual essence of Vaishnavism in lucid and regional fervour. *Ramlila* in Uttar Pradesh celebrates the legend of Ram and Sita. *Raaslila* in North India celebrates Krishna and Radha's adolescent love story. *Ramman* in Uttarakhand's Garhwal worships *Bhumiyal Devta,* the local deity. *Bhavai* in Rajasthan is romantic in essence using local musical instruments like *Jhanjhar* and *Dholak.* Eastern India's *Jatra* evolved from being about Lord Krishna's teaching to various secular themes. *Kariyila* in Himachal Pradesh's foothills, *Swang* in Punjab and Haryana, *Nautanki,* and *Tamasha* in North India, *Burra Katha* in Andhra Pradesh, *Krishna Attam* in Kerala – all these express the distinctive features of respective identity, environment, language, and spirituality of different cultural paradigms. Folk theatre establishes the fact that indigenous culture is intrinsically connected with the environment and interspecies coexistence. Indigenous festivals, songs, dances, and stories reflect that primal bonding that connects human beings with their natural habitat. In this point, I intend to refer to the particular form of the folk theatre performed in the Sundarbans that is based on the myth of Bon Bibi, the protective deity in the forest, and thus point out the intrinsic connection of culture and environment embedded in their theatre.

***Bon BibirPalagaan*: Terror, Territory, and Tradition**

The Sundarbans present a landscape that is hostile and unpredictable. Amidst these challenges, the myth of Bon Bibi emerged and evolved through centuries and now it exhibits a fluid socio-cultural influx. Bon Bibi is worshipped by both Hindus and Muslims which shows a syncretic nature of the indigenous cultural matrix of the Sundarbans that traces back to the rise of Islam in the 13th Century and its impact on the liberal spirituality of Sufism in the late 15th Century. As pointed out in the article "Bonbibi-r Palagaan: Tradition, History and Performance":

The Middle Period of Sufism in Bengal also saw the fusion of Bengali Hindu traditional literary genres with Perso-Arabic Islamic literary genres. Traditional Hindu literary categories such as *mangalkabyas* influenced the development of Perso-Arabic *kissa* or *keccha* literature in the native land in the native language; this ledto the evolution of a distinct kind of literature

called *Pir Sahitya*—Bengali literature concerning the lives of pirs or piranis. The language used in Pir Sahitya was called Musalmani Bangla or Islami Bangla. (Mandal 2017)

The stories about Bon Bibi could be found in the *Pir Sahitya* called *Johurnama,* a *kissa* (short stories traditionally translated from Perso-Arabic love tales) written in Musalmani Bangla. *Johurnama* comprises three texts: *Bonbibi Jahuranama* 1284 (1877-78 CE) by Boinuddin, *Bonbibi Jahura Nama* 1287 (1881 CE) by Munshi Mohammad Khater, *Bonbibir Jahuranama* 1305 (1899 CE) by Mohammad Munshi (Mandal 2017). The *Palagaan* retells the story of Bon Bibi and her twin brother Shah Jongoli who protects the forest people from the fierce Dakshin Ray and his mother Narayani. Though there are three narratives of the story, *Janmakhanda*, *Narayani-r Jang* and *Dukhey Jatra*, the last one (*Dukhey Jatra*) is most frequently performed in the Sundarbans. The interesting fact is, the performative versions of the folklore of Bonbibi created by the *palakaars* (directors or scriptwriters) could have preceded the written version in *Johurnama*. The folk tradition that transformed the tales of Bon Bibi into *Palagaan*, exhibits a nuanced vision as *Palagaan* itself is a Hindu Tradition. The reason behind the fluid nature of the worship of Bon Bibi that transcends even and especially religious barriers lies in the specifics of the terrain. Nowhere in the entire world such a dense *abaad*, a human habitation could be found so close to a tiger conservatory. There are conservations for tigers, dolphins, crocodiles, and even mangroves, but there are no arrangements whatsoever for the poor people of the islands battling for their lives every day. The perilous situation of everyday life which is a constant struggle for existence for all animals including humans raises questions about the dichotomy between the law and its implications.In *The Hungry Tide* (2004), Amitav Ghosh pointed out the destabilizing truth about human/wildlife cohabitation in the Sundarbans. There is a very significant conversation between Kanai and Piya, two urban characters visiting the Sundarbans about the preservation of tigers at the cost of humans:

"That tiger had killed two people, Piya," Kanai said. "And that was just in one village. It happens every week that people are killed by tigers. How about the horror of that? If there were killings on that scale anywhere else on earth it would be called a genocide, and yet here it goes almost unremarked: these killings are never reported, never written about in the

papers. And the reason is just that these people are too poor to matter. We all know it, but we choose not to see it. Isn't that a horror too — that we can feel the suffering of an animal, but not of human beings?" (*HT* 278)

Bon Bibi underlines the basic characteristic of the Sundarbans, as most of the tour and travel guides (including Internet sources) announce, it is a mangrove forest, one of the largest such forests in the world. It lies on the delta of the Ganges, Brahmaputra, and Meghna rivers on the Bay of Bengal, straddling the border between the Indian state of West Bengal and Bangladesh. The site is intersected by a complex network of tidal waterways, mudflats, and small islands of mangrove forest, and presents an excellent example of ongoing ecological processes. The area is known for its wide range of fauna, the Royal Bengal tiger and other threatened species such as the estuarine crocodile and the Indian python. What is systematically less discussed is the inconvenient fact that the Sundarbans is not only a 'beautiful forest' (as the Bengali term suggests) but also a denselyinhabited region, a populated '*abaad'* (fertile land with human dwelling), bursting with human as well as animal life. And the reason behind this almost constant elision is, the fact that the impoverished people dying are extremely poor and marginalised by the dominant representing agencies. In this situation, Bon Bibi functions as the protective deity of the human beings who are dependent on the forest resources for their survival. The ferocious battle against nature thus becomes a regular incident for the local inhabitants. The enactment of the play that celebrates the power of Bon Bibi is therefore seen as a way to placate the natural forces, as a form of worship. As discussed in the article by Mousumi Mandal, "Certain sacred rituals are practised during the performance, such as the body of the actors are to be kept clean, actors are barred from eating non-vegetarian food, woman actors do not take part while menstruating etc. Such rituals are faithfully followed so as to maintain the sanctity of worship" (Mandal 2017). Further, the ideology behind Bon Bibi was meant to support the fragile state of the ecological system of the *attharobhatirdesh* (a land of eighteen currents) by the ethics of sustainability. It is forbidden to carry any weapons inside the jungle, and one must enter only if one has nothing to eat at home and there is no other way except to seek one's livelihood in the forest (Nath 2020).

There are two forms of the *Bon BibirPalagaan* – the traditional form where the *dohar* and *gayen* sing and narrate the story and usually local people perform in the play (Mandal 2017), and the contemporary

Palagaan which is inspired by the popular folk form of theatre in Bengal called *Jatra (*Mandal 2017). This latter form invokes further intricacies that aggravates the already difficult situation of the local people.

***Bon BibirPaala* and Eco-Tourism: Commercializing a Cult**

The contemporary form of *Bon BibirPalagaan* has changed and transformed in its form and essence with the advent of tourism in the Sundarbans. The overnight performances are now shortened to one or two hours with only a few episodes curated for the tourists to suit their itinerary. Thus, the popular form of contemporary *Bon BibirPalagaan* is metamorphosed into an item of entertainment instead of a sacred ritual. This has complex connotations, as pointed out in the article "Vernacular Tradition, Dalits and Connected Social History in the Littoral Bay of Bengal":

One thing that emerges clearly from such commodification of art is that it becomes competitive and contested among the community. Particularly in the context on my investigation, I discovered that different Dalit performance groups lay claim to the authenticity of their performances. While Shama Prasad Baidya asserted that his group were the pioneers in pala performance in Dayapur village, others contested such claims and deprecated its validity. These are common occurrences in all regions of the sub-continent, where local art forms have been commodified to attract global cash flows and to empower local communities with cultural capital by intermediaries who act as cultural brokers […] In this competitive setting, issues of patronage, jealousy, innovation and even authenticity become topics of contestation. These, many of my village informants observed, have further polluted the forest environment, which makes the tigers wild and bloodthirsty. Bonbibi's ordered restraint on human greed and her ethos of worship are today breached by people who once visited the forest. (Das 2022)

Sundarban is endangered by the human imprint on a massive scale. There is uncontrolled fishing and uncontrolled collection of prawn seedlings. There is poaching of tigers, spotted deer, wild boar, and marine turtles (Jana and Basu 8). The tourism industry invaded the inner sanctums of the jungles and replaced the natural habitat with hotels. It also introduced the Tide country with non-biodegradable Expanded Polystyrene (commonly known as 'thermocol') plates and plastic, noise pollution, and diesel engines.

Then there is the most relevant one: "Despite several rules and policies passed for conserving the mangrove forest, encroachment in the protected area for agriculture and extraction of resources continues" (Jana and Basu 8) – this is the prime reason that makes the tigers stray into the villages and kill human beings as they have lost their habitat and now confuse it with human habitation. The borderline between tiger-tolerant areas and human living space has been completely destroyed by unprecedented human interference in forest land's core areas, bringing unusual consequences. It is the reason that the inhabitants of the Sundarbans constantly live under the threat of being killed by wildlife. The inhabitants of the Sundarbans represent the disposable part of humanity whose death and destruction leaves almost no impression on the larger human map. Their surrender to Bon Bibi to help them from the terror of the jungle underlines the helplessness of the marginal who gets no hearing in the institutional locations of power. Even that cry for help to the forest deity has become commercialized – it is a tourist attraction now.

Conclusion:

Bon BibirPala gaan exhibits two very important social and ecological facts. First, the syncretic nature of the deity underlines the living situation of the local people whose cognition of the forest as the primal threat is a legacy that surpasses caste, community and religion. All of the inhabitants in the Delta region feel a very complex relationship with the forest, it simultaneously kills them with its wildlife and nourishes them with its valuable natural resources. Therefore, there is a very important line to be maintained inside the jungle. There is a territory far from the protection of Bon Bibi guarded by *Dakshin Ray*, who protects the resources of the deep forest in the disguise of a man-eating tiger. These two territories should never get crossed. Since the livelihood of the people living here are solely dependent on the land, river and forest resources, a sinister and lethal deity emerged from the collective spirituality of the insiders of the jungle to restrict overexploitation. These two deities are equally remembered in *Bon BibirPalagaan* to express the inherent fear, anxiety and hope felt by the forest people as a uniquely connected community without the apparent differences in their religious beliefs and praxis. The second point is the idea of cohabitation instead of competition, as suggested by Arne Naess in *Ecology of Wisdom* (2008):

If a particular way of life is such that different species or different communities must compete and struggle with each other merely to survive, conditions are worse than if the different entities can somehow specialize, making use of each other's activities, and thus "live and let live"—that is, practice symbiosis. As conceived in modern ecology, symbiotic coexistence does not exclude killing—elk and wolf have lived in symbiosis, the wolves keeping the population of elk within a limit necessary to uphold good, not-too-competitive life conditions and healthy elk communities. (173)

This pact of cohabitation is the forceful resilience that makes the community survive against cyclones through the ages, and then the Covid as well as Amphan (2020). *The Indian Express* reported that Sajal Mondol, the first graduate from the National School of Drama in Delhi, chose to return home to work in the local theatre form and staged a major show of *Palagaan* in 2013 in the Sundarbans and Kolkata and was supported by the state's ministry of culture. *Bon BibirPalagaan* seems destined to keep on emanating the ethics of restraint, the culture of cohabitation and the tradition of fraternity for future ages to imbibe.

Bibliography

Antonioli, Manola. "What is Ecosophy?" *European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes*, N.O, 2018, pp 1-8. https://doi.org/10.6092/issn.2612-0496/8587

Chakrabarty, Kakali. "The Cult of Bonbibi: A Folk Paradigm in Deltaic Sundarbans." Journal of History, Art and Archaeology, Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 49-61. http://www.arfjournals.com/

Das, Debojyoti. "Vernacular Tradition, Dalits and Connected Social History in the Littoral Bay of Bengal." Contemporary Voice of Dalit, Vol. 14, issue 2, 2022.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2455328X221106536

Ghosh, Amitav. *The Hungry Tide*. New Delhi: Ravi Dayal, 2004.

Goswami, Apurba, Sadaf wani and Krishna Raj. "An ethnographic study of BanabibiPalagaan performers in Sunderbans." http://cdedse.org/wp-content/uploads/2018/06/10.pdf

Jana, Hiralal and Debabrata Basu. "SUNDARBAN: AN ANALYSIS OF WORLD'S SINGLE LARGEST COASTAL MANGROVE FOREST."

International Journal of Current Research. Vol. 14, Issue, 04, pp.21293-21303, April 2022. http://www.journalcra.com

Mandal, Mousumi. "Bonbibi-r Palagan: Tradition, History and Performance." Sahapedia, 2017,https://www.sahapedia.org/bonbibi-r-palagaan-tradition-history-and-performance

Nath, Dipanita. "Why the Sundarbans has unwavering faith in Bon Bibi — a forest deity with a stage presence." The Indian Express, epaper, July 5, 2020.

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2 Findianexpress.com%2 Farticle%2 Fexpress-sunday-eye %2 Fwhy-the-sundarbans-has-unwavering-faith-in-bon-bibi-a-forest-deity-with-a-stage-presence-6489948%2F

O'Brien, Jean M. "Historical Sources and Methods in Indigenous Studies: Touching on the Past, looking to the Future." *Sources and Methods in Indigenous Studies*. Edited by Chris Anderson and Jean O'Brien. pp 15-22. London: Routledge, 2017.

Prasad, Archana. "Ritual and Cultural Practice among Indian Adivasis." *Environment end Belief Systems*. Edited by G.N. Devy. pp 10-30. London: Routledge, 2021.

Robinson, Moreton Aileen. "Relationality: A Key presupposition of an Indigenous Social Research Paradigm." *Sources and Methods in Indigenous Studies*. Edited by Chris Anderson and Jean O'Brien. pp 69-77. London: Routledge, 2017.

Strong, Turner Pauline. "History, Anthropology, Indigenous Studies." *Sources and Methods in Indigenous Studies*. Edited by Chris Anderson and Jean O'Brien. pp 31-40. London: Routledge, 2017.

Author : **Indrani Chakraborty, Asstt. Professor, English, Prabhu Jagatbandhu College, Howrah, West Bengal.**

Myth and Orality as Theatrical Mechanisms Unearthing the Subversive Potential in Girish Karnad's *Naga-Mandala* and *Hayavadana*

Souparna Roy

Abstract:

Girish Karnad usually builds the plots of his plays on the bedrocks of ancient myths, legends, folktales and historically momentous events. But he ultimately contemporises these narratives by imparting certain modern sensibility to their original narrative structure. He also exploits the transgressive potential of classical myths, which he often couples with subplots of his own creation with equally subversive force, with a view to passing some penetrating observations on certain contemporary reality. This paper specifically dwells upon the nuances of mythic mechanism in Karnad's plays *Naga-Mandala* (1990) and *Hayavadana* (1975). Entangling myth with oral tales and folk culture in *Naga-Mandala,* Karnad adroitly integrates his dual concerns with the contemporary crises of theatre due to its progressive alienation from oral tradition on one hand and the plight of women in a patriarchal society on the other. In *Hayavadana* Karnad's reworking of ancient myths and lores explores the theme of man's thwarted quest for completeness and perfection and the resultant existential crisis of human identity in a world of muddled relationship. Besides overthrowing the brain/brawn hierarchy, the narrative also provides a critique of the hegemonic discourse which tends to naturalise male dominance over female freedom in a significant way through the agency of the female protagonist Padmini. Thus, Karnad's mythic mechanism seeks to disrupt, dismantle and erase the biased differences and hierarchical polarities by pointing to the harms and hazards involved in the practice of thinking and acting in terms of rigid categories, also giving voice to many silenced micro-narratives of suffering and exclusion.

Keywords: Myth, Orality, Subversion, Hegemony, Exclusion, Identity, Truth.

Myth is usually an anonymous narrative owing its origin to the traditional beliefs of a particular spatio-cultural community, embodying the general ethos and basic value system of that group. It often involves gods, goddesses, demons, fairies and other supernatural and supra-human creatures and events of larger-than-life magnitude. Although its truth value is questionable, myths consist of some deeper implications underneath the surface narrative which may appear fictitious when considered from a rationalistic point of view. Myths often give structure to human experiences, clarify certain intricate conundrums, otherwise insoluble, concerning the human condition in relation to the universe and provide validation for specific customs, rituals, codes of conduct and systems of beliefs of a given community. Myths also offer supernatural interpretations of natural phenomena like rain, drought, flood, diseases etc. Also, certain cosmic events like the Genesis and the Apocalypse find certain explanatory elaboration in myths. Myths thrive on archetypes. Exploiting the potential of archetypal symbolism, myths, on one hand, help humans have a glimpse of the transcendental divine order of the universe and, on the other, facilitate concrete outlets to the dark, subconscious emotions pertaining to the submerged, otherwise inaccessible, realm of human psyche, thus contributing to the maintenance of emotional sanity and mental equilibrium. Writers of different ages take resort to myths and utilise their timeless relevance, often modifying the original version, to comment on some contemporary reality. Thus myths have universal application.

Girish Karnad usually builds the plots of his plays on the bedrocks of ancient myths, legends, folktales and historically momentous events. But he ultimately contemporises these narratives by imparting certain modern sensibility to their original narrative structure. Karnad is known for deploying ancient myths as tools to reinterpret life situations by exploring their symbolic significations from the vantage point of his own time. These myths, in turn, help him gain new and fresh insights into the present. As myths are by nature flexible, it is not difficult to use them in a different but related context. Karnad appears to be particularly conscious of this specific aspect of myths. As a result, he deftly exploits the almost endless ramifications of specific mythic episodes to illuminate certain universal truths in his literary works. The myths not only offer themselves as indispensable interpretative devices to the present but also prove instrumental in giving new meanings to the past vis-a-vis the present. Thus,

myths operate in both ways, binding the past with the present in an interpenetrating relationship of harmonious reciprocity, and herein lies the aptness of T. S. Eliot's remark: "...the past should be altered by the present as much as the present is directed by the past" (Eliot 295). Often, Karnad adds subplots of his own creation to the mythologically oriented primary narrative. He also exploits the transgressive potential of classical myths and lores, matched with subplots with equally subversive force, with a view to passing some penetrating observations on certain contemporary truths. This paper specifically dwells upon the nuances of the mythic mechanism in Karnad's plays *Naga-Mandala* (1990) and *Hayavadana* (1975).

The use of myth in *Naga-Mandala* (1990) is multilayered. Here myth is entangled with oral tales. Orality and theatre belong to two different cultural traditions. Oral tradition exists in close affinity with folk culture. Despite the print capitalism ruling the roost in the market, the oral tradition has managed to survive in variegated forms and patterns because, as Karnad has aptly pointed out, "...in India...the past is never totally lost; it coexists with the present as a parallel flow" (Karnad, *Three Plays* 12). Theatre, on the other hand, has progressed along different course, albeit its origin lying in oral tradition. Here we may refer to Greek theatre which originated in rituals that included the oration of oral tales. This umbilical connection between theatre and orality seems to get veritably impaired, if not wholly severed, with the deepening intimacy between theatre and modern print culture. As a result of its progressive alienation from orality, modern urban theatre becomes a far cry from the breathing and throbbing reality of the community culture. It becomes insulated, abstract, artificial and sophisticated. *Naga-Mandala* is at one level concerned with this theatrical problem while another of its thematic thrust is the plight of women in a patriarchal society. Girish Karnad's mastery lies in how adroitly he integrates his concern with theatre and its contemporary crises vis-a-vis its relation (or the lack of one) with the oral tradition with his significant reflection on the oppressed and marginalised position of women in an exploitative, androcentric social matrix. Here Karnad uses the structure of a two-act play to dramatise an oral tale embedded in folk culture.

"It should be possible to view various folklore genres," as Lauri Honko argues, "not only as isolated acts of verbal art but as a system of different channels of cultural communication" (Honko 4). Karnad uses two

oral tales of Karnataka as the bedrock for his play *Naga-Mandala.* He heard those tales from Prof. A. K. Ramanujan[i]. The first of these tales was about a cobra assuming the form of a man and making nocturnal visit to wedded women. The second one is about the popular belief that a night long vigil in a temple can keep death at bay. Such stories generally keep getting circulated by the women and among the women themselves. In this context Karnad writes: "These tales are narrated by women-----normally the older women in the family—while children are being fed in the evenings in the kitchen or being put to bed. The other adults present on these occasions are also women. Therefore these tales, though directed at the children, often serve as a parallel system of communication among the women in the family" (Karnad, *Three Plays* 16-17). These tales also serve to solidify the bond among women in a patriarchal society. They not only reflect women's sufferings but also their suppressed dreams, fantasies and aspirations, thus embodying an alternative reality or, to borrow the playwright's own words, "a distinctly woman's understanding of the reality around her, a lived counterpoint to the patriarchal structures of classical texts and institutions" (Karnad, *Three Plays* 17).

The word "Mandala" in the title of the play is highly suggestive. According to V. Rangan, "the zeitgeist of the play is the Mandala" (Rangan 201). Structurally a "mandala" comprises a triangle and a square where the triangle is put inside the square. Here the three points of the triangle, as V. Rangan argues, stand for the triangular relationship between Rani, Appanna and Naga, thus amplifying the archetypal pattern of an adulterous relation concerning a husband, a wife and a lover. The square with its four sides corresponds to the external framework of the play involving the Flames (the teller), the Story, the Man (the listener) and the audience (the perpetuator). Here the Man who listens to the Flames and the audience in front of whom the entire story is being enacted act as two receptors in the play, whereas the Story acts as the Bhagavatar[ii] in the Yakshagana[iii] style of presentation, simultaneously serving as the chorus providing significant observations on what is being presented and helping in the maintenance of narrative link. The tale in the framework is a tale about a Story and it redounds to the supreme dramatic craftsmanship of Girish Karnad that this external story gets intertwined with impeccable synchronicity with another internal story about a lady named Rani. The tale in the framework shows how the Story faced existential crisis when kept confined inside the mouth,

illustrating an important aspect of oral tradition. Oral tradition thrives chiefly on the circulation of oral tales. Whenever there is a break in its circulation, oral tradition dies out. So, it must find new narrators for its perpetuation. Similarly when Rani is confined in a room, she is like an uncirculated oral tale and hence in a moribund state of existence. The oral tales also have a paradoxical nature. On the other hand they have an independent existence and on the other they survive only when they find a medium of circulation. From this point of view, to use the words of Karnad, "the status of a tale becomes akin to that of a daughter, for traditionally a daughter too is not meant to be kept at home too long but has to be passed on. This identity adds poignant and ironic undertones to the relationship of the teller to the tales" (Karnad, *Three Plays* 17).

In the course of their circulation, oral tales undergo certain transformations unlike printed texts which remain static. The three different endings of the play is quite in tune with the essential nature of a tale in the oral tradition as oral tales are in constant flux. Here the influence of Brechtian theatre on Girish Karnad is apparent. In the works of Brechet no fixed ending is provided and the audience have to interpret the conclusion on the basis of their understanding of the play. This is the Brechtian way of revitalising theatre through forging a meaningful connection between the world of theatre and that of the audience because a theatre is bound to get entrapped in its own illusion unless there is active interaction between the audience and the characters. This act of 'revitalisation' has also been attempted by Karnad but in his own unique way. He seeks to achieve the same effect by weaving a link between modern theatre and the oral tradition.

There are several mythological associations and underpinnings throughout the play *Naga-Mandala*. To begin with, we find the shadow of Ahalya myth from Valmiki's great epic *Ramayana* in the play. Just as Ahalya was tricked by Indra, impersonating as her husband, into committing adultery, Rani is also hoaxed by Naga, that takes the guise of her husband Appanna, to make love to her. Here, the role of Naga is also redolent of the mythical snake described in Milton's *Paradise Lost* (1667) who proved instrumental in the perpetration of first sexual encounter. There is also the use of the myth of Kunti from the Indian epic *Mahabharata*, though in an inverted form. Just as Kunti shared the magical power received from a mendicant with Madri, the second wife of her own husband, Kurudavva

shares the magic root with Rani to help her in enticing her husband. Again in initiating Rani, who is like a daughter-in-law to her, into family life in the role of an ideal wife, Kurudavva is also much like Kunti who did the same with her daughter-in-law Draupadi in *Mahabharata*. She is quite like a fairy God-mother[iv] to Rani. She also resembles Gandhari to certain extent. Like a Gandhari bemoaning over the sad demise of her son Duryodhana, Kurudavva also laments over the uncanny disappearance of her son Kapanna. Rani is also like Sita of *Ramayana*. Just as Sita devi had to undergo the trial of fire in order to prove her chastity, Rani is also put to the snake ordeal to prove the same. Other than all these mythological associations, one of the most important aspect of the play is of course the incorporation of the 'naga cult'[v] of folkloric origin of the Indian society as the bedrock of the main plot of the play. In fact, the very title of the play underscores the pivotal position of the 'naga' cult in the entire scheme of the play. The ritualistic worship of naga is a common religio-cultural phenomenon all over the subcontinent of India. Particularly in South India many families have their own shrine along with a grove reserved as habitation for snakes. Women wishing for offspring often visit such temples and offer their worship to a stone with the image of snake depicted or engraved on it. In this context the following observation by H. Whitehead is worth citing:

> The worship of serpents, especially the deadly cobra, is common all over South India. In one village of the Wynaad I came across a Mission school which was visited almost daily by a large cobra, which glided undisturbed and harmless through the school-room. Neither teachers nor pupils would have dared to kill it. Constantly they fed it with milk. In many towns and villages large slabs of stone with figures of cobras, often two cobras intertwined, carved in bas-relief are seen on a platform under a large tree. They are worshipped especially by women who want children. (Whitehead 22)

Besides, on the occasion of Naga-Panchami, celebrated throughout North India in the latter half of July on the fifth day of the light half of the Hindu month Shravan, women often pour milk and cereals as oblations into the anthills and snake holes with the hope of overcoming their supposed infertility as serpents are traditionally associated with virility and fertility. Unmarried girls are also found to take part in this ritual with the hope of

being blessed with good husbands. Joseph S. Alter aptly says, "the sexual aspect of snakes is the most dominant motif in folklore and ritual" (Alter 122). There exist so many rituals, like the observance of Naga-Panchami, in the Indian society the purposes of which are primarily the welfare of the husband, children and the family as a whole. Such rites and rituals are in most cases fraught with some deeper political implications as they are manipulated to serve the vested interest of those in power. The patriarchal society formulates its socio-cultural norms to keep women subservient to men. It often takes recourse to myths and rituals for the indoctrination of such norms and codes because, as Susmita Poddar in her insightful article entitled "Bratakatha: Ritualistic Indoctrination Making Chaste and Flawless Women" precisely puts, "Faith in and adherence to the social rules becomes deep-rooted in people's way of life through the repeated observance of socially-regulated rites over the generations" (Poddar 117). She adds, "It is a universal process of social edification. In every society, besides natural and constitutional laws, a set of obligatory customs or mores are prevalent through folk speeches, proverbs, tales, and rituals, which have no legal sanction but act as powerful means of supporting the social order" (Poddar 117). One of the most important dimensions of these rituals is the construction of an ideal model of femininity, representing women as chaste, dutiful, devoted and, in fine, a paragon of perfection. But it is quite ironical that Karnad incorporates the narrative of such a ritual, aiming essentially at solidifying the nuptial bond and perpetuating the connubial bliss, in a story of adulterous relationship which is never sanctioned by the traditional social structure. Thus, Karnad clearly subverts the original purpose of the ritual which is to strengthen the conjugal tie. Through the episode of snake ordeal he blatantly exposes the double standard of the patriarchal moral codes which always demand absolute chastity and devotion of the wife while letting the male promiscuity off scot-free. Karnad here consciously criticises the patriarchal society for its subjugation of women and at the same time portrays how women becomes empowered to find her fulfillment. In course of the play the character of Rani evolves from a state of voicelessness and non-entity status to that of agentive individualism and self-assertiveness through the elevating impact of such crucial experiences as sexual initiation, motherhood and final apotheosis as a divinity incarnate. Towards the end of the play Rani becomes a 'liberated woman' in the truest sense of the term.

Karnad draws the plot of his famous play *Hayavadana* from the ancient collection of stories called *Kathasaritsagar*. But he mainly uses Thomas Mann's adaptation of this Sanskrit book in *The Transposed Heads*. While the original Sanskrit tale, as Kirtinath Kurtkoti argues, "poses a moral problem", Mann's version is a mock-heroic treatment of "the mechanical conception of life which differentiates between body and soul" (Kurtkoti vii). Mann mocks at the sheer baselessness of considering the head superior to the body by exposing the futility of attempting to overcome the intellectual limitations through the transposition of heads. However, Karnad moves one step further as his version is concerned with revealing the existential problem of "human identity in a world of tangled relationship" (Kurtkoti vii). His play, as M. K. Naik comments, is a "memorable treatment of the existential theme of the fundamental ambiguity of the human condition" (Naik 135). The two friends, Devadatta and Kapila, embody the dichotomy between mind and body. Devadatta represents the mind as he is of the intellectual type whereas Kapila represents the body as he is of the of physical type. Devadatta, as the name suggests ('Devadatta' means 'God-gifted'), seems to possess many divinely gifted intellectual qualities. On the other, Kapila, as the name itself indicates ('Kapila' means 'monkey' or 'apish'), is a man of enormous physical strength. Thus, the names of both the friends are significantly allegorical. Although the two characters are used to dramatise the brain/brawn binary, they are intimate friends and complementary to each other. It is with the assistance of Kapila that Devadatta became able to marry Padmini whom he was besotted with. This trio of Devadatta, Padmini and Kapila was almost deified by the people of Dharmapura as they were deemed to be Rama, Sita and Lakshmana by them. But their relationship gets complicated as Kapila and Padmini feel attracted to each other, leading ultimately to the self-decapitations of the two friends. Then Padmini, with the boon of the Goddess Kali, transposes the two heads, putting Devadatta's head onto Kapila's body and vice versa. Here the intervention of Goddess Kali in human affair and the resuscitation of the dead are only acceptable on the mythical plain. However, Karnad here employes the mythical apparatus to explore certain complicated psychological truth. Although it seems that she mixes up the body and the head out of excitement and confusion, she actually acts as per the dictum of her suppressed desire. Inwardly she is always smitten with an irresistible desire to get intimate with the strong and stout body of Kapila. It is, to use

a Freudian terminology, her 'subconscious desire' that gets surfaced through her act of coupling the head of Devadatta with the body of Kapila as it gives her the opportunity to fulfill her secret longing for the masculine body of Kapila. Mohit Ray also highlights this psychological dimension of the play when he makes the following observation:

> The mistake in the transposition of the heads of Devadatta and Kapila can be explained in terms of Freudian slip activated by id. In other words, the subconscious desire for Kapila's body makes Padmini put, albeit unconsciously, the head of Devadatta on Kapila's body. Furthermore, the 'mistake' also absolves her of the responsibility of transgressing the codified morality of her society. (Ray 210)

However, after this bizarre exchange of the parts of the human body, an unprecedented muddle of personality ensues, giving way to a profound crisis of human identity and subverting the idea of evaluating the parts of the human body in hierarchical terms. After certain behavioural deviations from the nature of their respective usual selves, both Devadatta and Kapila return to their former self and old habit with the gradual but complete disenchantment of Padmini with the present situation which is absolutely beyond her grip and which comes to a closure with a price nothing less than the lives of both the friends in a duel and of Padmini herself as she commits suttee[vi]. Thus, Karnad's play *Hayavadans* is essentially a dramatisation of man's thwarted quest for completeness and perfection. The completely perfect combination of brawn and brain achieved by Devadatta and Kapila is not only absurd but also temporary. Hence the human longing for perfection and completion is as unattainable as, to borrow the proverbial words of P. B. Shelley from his much anthologised poem "One Word is Too Often Profaned", the "desire of the moth for the star, / Of the night for the morrow". It always beckons from afar like will-o'-the-wisp, eluding ever the human grasp and lighting "fools / The way to dusty death" (Shakespeare 40).

The sub-plot of the play deals with the same theme of futile human aspiration towards attaining completeness in the backdrop of the myth of Vakratunda and Hayagriva. Vakratunda, the other name of Lord Ganesha, with his human body and elephant's head is the archetypal symbol of incompleteness, imperfection and alienated existence. In the Hindu mythology Hayagriva, the horse-headed avatar of Lord Vishnu, is also

considered to be the epitomisation of incompleteness like Vakratunda. Hayavadana's quest for completeness finds a comically absurd end with his attainment of complete horsehood rather than complete manhood, the animal body getting the better of the human head—an achievement of completeness of the wrong and untoward kind. "Karnad makes use of these mythical figures," aptly remarks Bharathi Chinnasami, "to throw light on the alienation of man and its consequences in human society. He tries to show suggestively the hegemony of Apollonian culture that has captured the racial unconscious of mankind. The modern man represented by Devadatta-Kapila suffers from self-alienation' (Chinnasami).

Besides overthrowing the brain/brawn hierarchy, Karnad's reworking of traditional myth also provides a critique of the hegemonic discourse which tends to naturalize male dominance over female freedom in a significant way through the character of Padmini. Hers is the predicament of the educated, emancipated, modern and self-assertive women confronted with a choice between two extreme polarities and whose exercise of free will ultimately lands her in a kind of existential crisis which is beyond her control. Through this character Karnad brings up the issue of female agency and freedom of sexuality—a domain traditionally kept under male control. The transposition of the heads can be interpreted as a case of the woman exercising her power as per her sexual choice. She is clearly driven, to use a Nietzschean terminology, by her 'Dionysian' impulse, fissuring the smooth veneer of established 'Apollonian' codes of the patriarchal society.

Thus, we find that Karnad's use of ancient myths, archetypes, legends and folktales is not static and one-dimensional. Nor does he draw such elements as mere stories in his plays. Rather his usage and application always bear the mark of his originality and inventiveness. He re-interpretes age-old, time-honoured mythological and folkloric tales in order to contemporise them, throwing fresh light on certain burning and controversial issues of his own era. In the process of such contextualisation of ancient episodes he also re-invents and explicates so many nuances and critical knots often glossed over in the source materials. Such a dynamic approach really helps him question many established social norms that often smack of what Jaques Derrida called 'violent hierarchy'. Karnad precisely attempts to subvert many of these prevalent hierarchies by exposing the differential politics of power underlying various socio-cultural institutions and practices.

He does this through exploring the transgressive potential of many ancient myths and lores accompanied with dramatic subplots of his own invention with equally subversive intent. His (sub)version of the myth-based narratives turn upside down many of the accepted notions and values which are often biased to the core and used as maneuverable tools of exploitation in the hands of those in power to keep the status quo maintained. Above all Karnad is a humanitarian. Hence his adaptation and re-construction of myths are finally oriented towards evincing a great humanitarian zeal that prevails above everything in the end. His mythic mechanism seeks to disrupt, dismantle and erase the biased differences and hierarchical polarities by pointing to the harms and hazards involved in the practice of thinking and acting in terms of rigid categories, also giving voice to many silenced micro-narratives of suffering and exclusion. In short, Karnad seems to be doing exactly what the postmodernist thinker Jean-Francois Lyotard has proposed to do: "Let us wage war on totality; let us be witnesses to the unpresentable; let us activate the differences and save the honor of the name" (Lyotard 82).

End Notes

i. In the preface to *Naga-Mandala* Karnad himself said, "*Naga-Mandala* is based on two oral tales from Karnataka which I first heard several years ago from Professor A. K. Ramanujan" (Karnad, *Naga-Mandala*).

ii. 'Bhagavatar' is the narrator of a story. In Hinduism a 'Bhagavata' is a worshipper or devotee.

iii. 'Yakshagana' is a traditional folk theatre form in Karnataka. It is distinguished for its remarkable application of music, vigorous dance movements, colourful outfits, impromptu speeches, subtle expressions and unique stage techniques.

iv. 'Fairy God-mother' is a magical character to be found in some fairy tales assisting someone in trouble.

v. 'Naga cult' is an ancient practice of worshipping snakes prevalent in various parts of India.

vi. 'Suttee' is the ancient custom in the Hindu religion of burning a wife with her husband at the time of his death.

Bibliography

Alter, Joseph S. "Nag Panchami: Snakes, Sex, and Semen". *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India*. Berkeley: University of California Press, 1992.

Chinnasami, Bharathi. "Karnad's Hayavadana: Themes of Incompleteness and Search for Identity." Jude Livi's Blog. 3 June 2015. n. pag. http://judelivi.blogspot.com/2015/06/karnads-hayavadana.html?m=1

Derrida, Jacques. *Of Grammatology.* Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: The Johns Hopkins Uiversity Press, 1997.

Eliot, T. S. "Tradition and the Individual Talent". *English Critical Texts.* Eds. D. J. Enright and Ernest De Chickera. New Delhi: Oxford University Press, 2015.

Honko, Lauri. "Folkloristic Theories of Genre". *Folklore: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies.* Ed. Alan Dundes. Vol. 3. New York: Routledge, 2005.

Karnad, Girish. *Three Plays*. New Delhi: Oxford University Press, 1994.

Karnad, Girish. *Naga-Mandala: Play with a Cobra*. India: Oxford University Press, 2015.

Kurtkoti, Kirtinath. Introduction. *Hayavadana*. By Girish Karnad. New Delhi: Oxford University Press, 2015.

Lyotard, Jean-Francois. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.* Trans. Geoff Bennington and Brian Massumi. United Kingdom: Manchester University Press, 1984.

Naik, M. K. "From the Horse's Mouth: A Study of *Hayavadana*." *Girish Karnad's Plays: Performance and Critical Perspectives*. Ed. Tutun Mukherjee. Delhi: Pencraft International, 2006.

Nietzsche, Friedrich. *The Birth of Tragedy: Out of the Spirit of Music.* Trans. Shaun Whiteside. India: Penguin Classics, 1993.

Poddar, Susmita. "Bratakatha: Ritualistic Indoctrination Making Chaste and Flawless Women". *Folk, Folklore and Folkloristics: Interpretation of Society and Folklore.* Ed. Bikas Chakraborti. Kolkata: Mitram, 2010.

Rangan, V. "Myth and Romance in Nagamandala or their Subversion?". *Girish Karnad's Plays: Performance and Critical Perspectives*. Ed. Tutun Mukherjee. Delhi: Pencraft International, 2006.

Ray, Mohit. "*Hayavadana*: A Study of Karnad's Use of Source Texts and Folk Form." *Indian Writing in English.* Ed. Rama Kundu. New Delhi: Indus, 1953.

Shakespeare, William. *Macbeth*. Ed. A. R. Braunmuller. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Whitehead, H. *The Village Gods of South india.* New Delhi: Asian Educational Services, 1999 (1921).

Author : **Souparna Roy, Asstt. Professor, English, Chitta Mahato Memorial College, Purulia, West Bengal.**

"Who Can Silence the Drums? Delta Women Speak." An Ecofeminist Study of Osonye Tess Onwueme's Selected Plays

Biswajit Mondal

Abstract

The present paper aims to foreground the literary representation of ecological damage and its impacts on the women of the Niger Delta contextualizing the selected plays of OsonyeTess Onwueme. Since the discovery of oil in the womb of the Niger Delta region, corrupted politicians, businessmen and multinational companies forced the Delta communities to migrate, occupied more and more lands, and 'killed' millions of trees to extract excessive oil. It affected the Nigerian ecosystem, agriculture, fishing as well as the living conditions of the people. Women who have deeper affinity with nature as they greatly depend on forests, land, rivers and air for the provision of food, fuel, clean water, medicinal herbs and income suffered most for the ecological damage. They lost their sources of survival; they were compelled to join in prostitution, and sometimes they were brutally tortured and raped. Onuememe has fictionalised the painful experiences of women and their protests to sustain ecological balance and thereby to protect themselves. So, the paper evaluates Onwueme's*Then She Said It* and *What Mama Said* to represent the intersectionality between ecological damage and women exploitation, and environmental liberation and women emancipation through the lens of ecofeminist frameworks.

Key Words: Osonye Onwueme, oil exploitation, ecological damage, ecofeminism, Niger Delta.

Introduction

> For nearly half a century, Your Honor, the living mothers, sons, and daughters of the land have been trampled. Oppressed. Exploited. And dehumanized…. Since the Sweet Crude was discovered in their land, each one of them has had their own personal tragic experiences. They've been without jobs, farming and fishing resources… painful, hard experiences that

> progressively changed their lives for the worse. (Onwueme, What Mama Said 193)
>
> Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological crisis within a society whose fundamental model of relationships continues to be one of domination. They must unite the women's movement with those of the ecological movement to envision a radical reshaping of the basic socio-economic relations and the underlying values of the … society. (Ruether 204)

Francoise d'Eaubonne coined the term "ecofeminism" in his book *Feminism and Death* (1974) to raise awareness about the links between women's oppression and nature's dominance in an attempt to free women and nature from unjust subjugation. Since its initial stage of development, it has been incorporating new and new aspects to expand its scope and to explore more about the interconnectivity of ecological damage and women's subjugation and exploitation. Merchant accentuates that "women and nature have an old-age association, and affiliation that has persisted throughout culture, language, and history" (75). Likewise, the South Asian ecofeminist Vandana Shiva presents how women are an integral part of nature, both in their imagination and in their daily lives. She argues, "Nature is symbolized as the embodiment of the feminine principle on one level, and she is nurtured by the feminine on another level in order to produce life and offer sustenance" (37). So, GreetaGaard reiterates the opinion of Ruether that "no attempt to liberate women will be successful until an equal effort is made to liberate nature." (2) However, postcolonial ecofeminists have charged the American ecofeminists for their eurocentricism, and they sought a new discourse or an indigenized discourse of ecofeminism as they believe 'nature and women are exploited for the western capitalized patriarchy'. So, Muthuki's analysis of the Greenbelt Movementin Kenya, led by ecofeminist Wangari Maathai, presents a compelling framework for reimagining ecofeminism from an African perspective. Muthuki suggests that Maathai's activism establishes a model where women's empowerment and environmental sustainability are interconnected, primarily exemplified through the tree-planting initiative of the Green Belt Movement. This movement successfully forges "an alliance between women and nature in asserting political agency of both".

Ruether further asserts that African ecofeminists, including figures like Maathai and Nyajeka, advocate for an African ecofeminist praxis centered around restoring balanced and equitable relationships between gender, humanity, and nature. They draw inspiration from precolonial Africa as a reference point for achieving such harmony. While acknowledging the patriarchal aspects of precolonial Africa, they highlight its potential for greater gender equality and traditions that emphasize a balanced coexistence between humans and the environment. In this view, Africa's precolonial era is regarded as having provided larger roles for women and a sense of equilibrium between humans and the land (100).

The exploration of oil deposits in the belly of the Niger Delta posed a threat in the lives of the Delta population. The population mainly relied on fishing and subsistence agriculture, and the excessive extraction of oil by multinational companies in alliance with corrupted politicians led them to confront severe ecological hazards like gas flaring, discharge of refinery effluents into freshwater sources, product spills, atrophy of forests and drill wastes which resulted of land degradation, food and water poisoning, murder, crime, prostitution, etc.Simon and Jeremiahhave explored the impacts of environmental degradation, particularly on women. They argue thatwomen bear the brunt of victimization for the ecological damage. Women of the Niger Delta who rely on nature for their basic needs such as food, employment, housing, clean water, healthcare, and income are left to suffer from unemployment, hunger, poverty, and diseases due to the destruction of the natural environment. Additionally, the economic hardships resulting from environmental degradation make women vulnerable to exploitation by financially privileged oil company workers who offer them financial assistance in exchange for sexual favors.

The female black playwright OsonyeOnwueme, like Wole Soyinka's caustic criticism of postcolonial Nigeria, has made strident criticism of Nigeria, but they are made through women's lenses, a perspective not provided by Soyinka. By representing the neocolonial control of natural resources in the Niger Delta and by criticizing the role of corrupted politiciansthrough the perspective of women, she has not only attempted to establish the voice of women or gender equality, but also manifested the interconnectivity of women and nature: one's oppression leads to the oppression of other, one's liberation leads to the liberation of

other. However, Onowuemereceived a Ford Foundation research grant in 2000 for her project "Who Can Silence the Drums? Delta Women Speak".She, therefore, decided "to go and talk with the people, the rural women especially (of Niger Delta region), …who have for decades been silenced, abused, exploited, oppressed and marginalised.…Their own responses, their anguish (and) their anxieties of survival" became "a kind of raw materials to construct her plays"*Then She Said It* and *WhatMama Said*. (Becker 28)

Then She Said It(2002)and *What Mama Said*(2003) are set in the metaphorical nation-states of Sufferlandand Hungeria,where Sweet Crude has been discovered and multinational companies have installed their machineries to extract it. The lands Hungeria and Sufferland denote to the Niger Delta, "a land of hunger" and "a land where people suffer deprivation, hunger, disease, exploitation and abject poverty." However, multinational companies require more pieces of land for their business. The displacement of indigenous communities from their villages and their subsequent relocation to overcrowded camps is the consequence of this excessive demand. Unfortunately, these camps lack essential social infrastructure, resulting in immense suffering and an increased risk of disease outbreaks. Furthermore, the exploitation of oil resources leads to the pollution of the land and rivers, which are vital sources of sustenance for these communities. The repercussions of this environmental degradation have a profound impact on the people, especially on women because they "till the land", catch fishes from rivers, and sell them in markets.Therefore, the women depicted in *Then She Said It* express their distress over the ecological devastation:

Obida: And look around you. See? They're not even killing usalone. The trees too!

Niger: Our farmlands!

Benue: And rivers!

Niger: The environment.

Benue: Polluting.

Niger: Polluting the land, the rivers, our entire environment …

Women: All polluted.

Obida: They've killed everything with their oil pollution andspillage. We cannot breathe clean air. Fishes die or get fried

> inthe polluted simmering rivers. Water-water everywhere. But wehave no clean water to drink! And now we lose the land too.(Onwueme, Then She 15)

Similar tone of angst, anger and suffering is reverberated in *What Mama Said.* The women characters are lamentingfor their fathers, mothers, sons, daughters, brothers and sisters who havebeen 'roasted' andmurdered just like the fishes and animals:

> Cross River: Ever since they discovered oil in our land, they drill,dry, and fry us alive with the fishes and farmlands allcooking in the oil.
>
> Chorus of Women: The oil. Our oil!
>
> Cross River: So what will become of us … our children? Do yousmell the decaying bodies of husbands, sons, and daughters?
>
> Chorus of Women: Yes!
>
> Cross River: Do you smell the fishes roasting in their hot oil pouredover the rivers?
>
> Chorus of Women: Yes! They've refined our oil into a curse!
>
> Cross River: Plants, animals, children, men, women cooking in theiroil. Oil sapped from the very soul of our sagging land. Ah!People of Sufferland! Do you see yourself drowning?
>
> Chorus of Women: Yes! (Onwueme, What Mama139)

Onwueme has personified the rivers of Niger Delta-Oshimi, Cross River, Niger and Benue- as women characters to mean the close affinity between nature and women. She also implies that the petro-culture of multinational companies not only pollutes the water of rivers, but spoils the lives of women. They are deprived of all kinds of opportunities;they are jobless even after obtaining university degrees and join as prostitution. Omi is forced into prostitution even after obtaining two degrees: "… yes, degrees. Not one, but two." And this is not her only condition. Rather, she says, "… many others like me in this land… with a load of degrees!" (What Mama 104) Oshunis also forced to opt for the life of prostitution for the poverty of her family. Jeremiah argues that these characters typify many young people who are daily flooding the streets in search of jobs. But being frustrated and mortified, they choose the life of prostitution or courtesan of oil directors just like Omi to Oceana and Oshun to

Atlantic.Wadcock observes that most of the prostitution is engendered by weak economics, "inequitable distribution of income which is reinforced by corruption and high rate of unemployment". However, women also experience direct violence on their body. Hadeja is raped when she goes to hawk at GRA/OIL Club by the soldiers. Koko is also raped by soldiers, the manager of oil company and by her uncle Chief when she goes to sell fruits to augment the lean family income:

Obida: They did it-did it. Yes they did it! (More sobbing from Koko)

Benue: The soldiers? (At this point, Koko explodes into tears…)

Women: (Stunned) Soldiers? Police?

Niger: Is it the white man? (Silence)

Benue: The government official?

Obida: Or the chief? (Koko weeps louder)

Koko: (Tearfully) All…all of them. Cut deep with their knife. I fought. Tried…tried to close my eyes. Tight. (Screams) Aaah! How I prayed God to close them forever. Bury me alive. But when I opened, I saw him… grinning… grinning into my face…. (Then She 28)

However, women are not only raped, they are sold to the rich oil directors or to the foreign businessmen. They are also murdered and their dead bodies are 'torn' to hide their identity, to hide their crime:

Niger: Are they never tired of ruining…?
Obida: Killing us!
Benue: At Odi?
Women: They raped and killed women!
Niger: In Choba?
Women: They raped and killed women!
Benue: Across the sea?
Women: They raped and killed women!
Niger: In the land?
Women: They raped… tore up… aaaaaaah!
Benue: And still…
Women: They're raping, selling and killing us. (Then She 30)

Consequently, the women have realized that government doesnot protect their lives. So, they need to take their destinies in their own hands and they need to protest collaboratively to save themselves:

> Young woman: Ok, take your own destiny into your own hands. Its your choice. So now, go ahead and tell the world what you're going through….
>
> Chorus: (pounding their feet) Beat! Beat! Beat the drums! (Then She 32)

Obida suggests to kidnap the oil director to "bring national and international attention to their cause; that's it! That's when they'll pay attention to us and our needs." (Then She Said It 53) The women lead the people chanting, "Enough! We reject all leaders of falsehood." Same tone of protest is also echoed in the slogan of Sufferland women: "We want jobs!....Shell must go! Agip must go! Chevron must go! Texaco must go! Mobil must go! Wellbros must go! Pollution must go! Leave! Leave our oil!... Resource! Resource! Resource control! (What Mama Said 32) Thus, their demands begin with the liberation of natural resources from the hands of neocolonial companies and corrupted leaders who always look for personal benefits. But, the collective voice of the revolutionary women, chorus and drumming emphasize on the pre-colonial African knowledge of land and nature, and the benefits of all (Bantu philosophy). However, their demands gradually shift from the control of land and natural resources to the control of their own bodyto signify the interconnectivity between the liberation of nature and the liberation of theirs:

> Obida: The raping…
> Women: Must be stopped!
> Obida: The killing…
> Women: Must be stopped!
> Obida: The profiteering…
> Women: Must be stopped!
> Obida: The corruption…
> Women: Must be stopped!
> Benue: women. This is our fight…
> Niger: Together! This is our fight! (Then She 33)

Thus, Onwueme like the ecofeminists insists on the liberation of nature first and then the liberation of women. However, the women kidnapped the Texaco deputy oil director and set the new oil installation ablaze. They also captured the government official and traditional chief because of which they have been arrested and brought before the court. Oshimi as the representative of the women begins to narrate the "scars. Scars telling their (our) own peculiar stories. Their (our) stories are so long that if they (we) all were to speak and tell the world all that they (we) have been through, their (our) narratives would never end." (What Mama Said 195) She adds that their fathers, sons, daughters, mothers are killed by white businessmen and the corrupted governments. She requests the other women, "You are now free. Let the world hear your stories. Tell your stories. Who can silence the drums? Sufferland women speak!" Being accused and mortified, the government leader says in shame, "Forgive… daughters! Sisters, forgive! Never! Never again! I shouldn't… shouldn't have… My people! I failed… failed todefend…"(What Mama Said 199). In *Then She Said it*, the women revolutionaries cry out more clearly for that environmental liberation:

Benue: Clean water for cooking and drinking!
Obida: Clean air! Clean environment.
Oshun: Yes. Unpolluted. (Then She 101)

Their demands suggest that a worthwhile existence is tied to healthy environment. Thepeople,therefore, demand a clean environment that would encourage farming and fishing activities andmake their existence meaningful in the oil producing region.

Conclusion

Thus, OsonyeOnwueme's *Then She Said It* and *What Mama Said* depict ecological damage and its impacts on women. The multi-national oil companies in tandem with corrupt politicians have been exploiting the oil of the Niger Delta. As a result, women have lost their basic sources of survival- farming and fishing. And they themselves become the objects to be sold, assaulted and murdered. They experience these cruelties because they have lost their control over the land and its natural resources, and thereby over their body as well. So, Onwueme's revolutionary women primarily emphasize first on environmental liberation because they firmly believe their own emancipation is intimately associated with the liberation of nature.

Works Cited

Becker, Becky, and Osonye Tess Onwueme. "Then, She Said It!: An Interview with Playwright, Tess Onwueme." *Feminist Teacher*, vol. 14, no. 1, 2002, pp. 27–40. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/40545866. Accessed 28 May 2023.

Eme, Worugi Gloria. "Quest for Female Freedom in *Wedlock of the Gods, The Marriage of Anansewa and Then She Said It*." *South Journal of Humanities and International Studies* 3.2, 2020: 39-56.

Gaard, Greta. "Ecofeminism, Women, Animals, Nature." Nature, Living Interconnections with Animals and. Philadelphia: Temple University Press, 1993. 1-12.

Jeremiah, Methuselah Samuel. "The Niger Delta Violence, Women and Ecofeminism." *Research on Humanities and Social Sciences* 4.13, 2014: 77-84.

Muthuki, Janet Muthoni. *Rethinking ecofeminism: Wangari Maathai and the Green Belt Movement in Kenya*. Dissertation, University of Kwazulu-Natal. 2006.

Onwueme, Osonye. *Then She Said It*. San Francisco: African Heritage Press, 2002.

—. *What Mama Said*. Detroit: Wayne State University Press, 2003.

Ruether, Rosemary Radford. *New Women, New Earth: Sexist Ideologies and Human Liberation*. New York: Seabury, 1975.

Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India*. New Delhi: Women Unlimited, 2010.

Simon, E. D. "The Niger Delta Region and the Woman's Predicament: A Study of Kaine Agary's *Yellow- Yellow*." *An International Multi-Disciplinary Journal* 4.3, 2010: 155-166.

Author **: Biswajit Mondal, Ph.D, Research Scholar, English, Ranchi University**

The Monster of Society
Hijra Subjectivity in
Seven Steps around the Fire

Banani Ghosh

Mahesh Dattani in his radio play, *Seven Steps around the Fire* (1999), addresses the problematic sociocultural position of the hijra[1]community in modern India. The bourgeois society vehemently rejects those individuals who do not conform to the established gender norms. A complete silence regarding their plight could be noticed in the official as well as in the unofficial discourses. Structural denial of their agencyis propagated by hegemonic power which results in their elimination from cultural visibility.In the article, "Obscenity, Moral Contagion and Masculinity", Jessica Hinchy analyses "colonial attempts to erase hijras as a visible socio-cultural category and gender identity in public space through the prohibition of their performances and feminine dress". To a larger extent, the collective consciousness of contemporary society has internalised the marginalisation of the hijras in mainstream culture on the grounds of their alterity.

In the preface to his collected plays, Mahesh Dattani asserts, "I am certain that my plays are a true reflection of my time, place and socio-economic background. (xv)" His narrative boldly resists the hegemonic discourse of the heteronormative society by providing an autonomous space to the gender nonconformists. Erin B. Mee rightly proclaims that Mahesh Dattani is "India's first modern playwright to deal sympathetically with issues surrounding homosexuality" (Review 183).In his play *Seven Steps around the Fire,* Dattani brings to the forefront the little subjective narratives of the invisible hijra community which stands in stark contrast with the meta narrative of modern India. His work illustrates how the hijras acquire "a monstrous identity" (Stryker 244) due to their subversive gender expression. In a way he compels his elite urban audience[2] to confront the abject of contemporary hierarchical societyand by this he strives to destabilize the fixed categories of bourgeois society.

In *Seven Steps around the Fire* Dattani foregrounds the injustices meted out to the gender and sexual minorities in post-independence India. The narrative deals with the murder of a hijra, Kamla. Without much investigation police arrests Anarkali, another hijra from Kamla's *gharana*. When Uma, daughter-in-law of Deputy Commissioner and wife of Superintendent of Police, intends to do her research on the hijra community vis-à-vis "class- and gender-related violence" (Dattani 12) for her thesis, unwittingly unearths the mystery behind Kamla's murder. However, this process acts as a revelation for Uma as well—in order to discover her own identity, she transgresses the borders of the self and confronts the abject. On the other hand, she realises how disciplinary power systematically rejects non-normative subjects in order to construct a stable heteronormative society.

Moreover, Dattani addresses the problematic position that the hijra community in India occupies. He focusses on the complex relationship that sexual and gender minorities in India have with those in power—how the political leaders and the police misuse power to deprive nonconformists of the fundamental rights. In spite of the fact that Anarkali identifies herself as a woman, she isintentionally kept in male section of the prison with other inmates. There she is sexually abused by other men. But police do nothing about it. When Uma goes to the prison to meet her, Anarkali sarcastically expresses her situation.

> MUNSWAMY. Anarkali! Come here.
>
> ANARKALI *(from far).* No! I don't want to meet any journalist.
>
> MUNSWAMY. I will come inside and beat you up, you worthless pig!
>
> ANARKALI. I am not in the mood.
>
> UMA. I am not a journalist.
>
> ANARKALI. I don't care if you are the mother of all the whores in Bangalore. I said I am not in the mood!
>
> MUNSWAMY. Why do you want to bring this shame on your family,madam? I beg of you go home.
>
> UMA. Anarkali! Please, help me.
>
> ANARKALI. Go away. After servicing all these sons of whores, my mouth is too tired to talk. (8)

In the above excerpt it is apparent that Anarkali is abused not because of the crime that the police assume she might have committed but because of her gender identity. Anarkali knows the prejudices of the system. That is why she is sceptical about journalists as well. When she realises that Uma is not a journalist, she intends to talk to her. At that moment constable Munswamy orders other inmates to beat her.

> ANARKALI. Wait. *(Approaches.)* Are you really the wife of the big munswamy? Or is this man lying so I will talk to you?
>
> MUNSWAMY. Go away. Madam is no longer interested in your filthy lies.
>
> ANARKALI. I didn't kill her. She was my sister!
>
> MUNSWAMY *(hits the bars with his stick).* Ai! Go back! *(Hits harder.)* Back!
>
> ANARKALI. Would you kill your sister?
>
> MUNSWAMY *(hits the bars again).* Back! Beat it! Kick the hijra!
>
> *The other inmates begin to beat Anarkali up.*
>
> ANARKALI *(hitting back at first).* Ai! Don't touch me!
>
> *The other inmates scream with pleasures as they beat up Anarkali.* (8-9)

Through this scene Dattani seems to suggest that the oppression of hijrasin a modern democratic societyis perpetrated by the authority for propagating the vested interest of particular communities. The heteronormative society systematically dehumanizes non-normative subjects in order to rationalise their exclusion from society. (Champa: Please excuse me, madam. I did not know that . . You see us also as society, no?)

As the drama proceeds it is gradually revealed to the audience that the minister's son, Subbu, is in love with Kamla.They have even secretly married each other. When the minister comes to know of this, he burns Kamla to death. Anarkali knows this truth. She was present at the wedding of Subbu and Kamla. She even has their wedding photograph. Hence, Anarkali gets arrested because the minister wants to confiscate the photograph and destroy it. Further, they know that nobody cares about the lives of the hijras—whatever happens to them the mainstream journalists

would never bring their news to the forefront. That is why, inspite of knowing the truth and having a proof, Anarkali does not say anything and silently endures the torture in prison.

However, after killing Kamla, the minister arranges the marriage of Subbu with a woman from a respectable family. Just after the marriage ceremony Subbu commits suicide and the truth behind Kamla's murder disclosesto the invited guests. But nothing happens. The minister does not get arrested. At the end of the play Uma says,

> They knew. Anarkali, Champa and all the hijra people knew who was behind the killing of Kamla. They have no voice. The case was hushed up and was not even reported in the newspapers. Champa was right. The police made no arrests. Subbu's suicide was written off as an accident. The photograph was destroyed. So were the lives of two young people . . . (42)

In her essay, "Can the Subaltern Speak?", regarding the politics of representation of the subaltern subject,Gayatri Chakravorty Spivak distinguishes between "two senses of representation" i.e., "representation as 'speaking for,' as in politics, and representation as 're-presentation,' as in art or philosophy" (28). Concerning the role of intellectuals within the system of representation, Spivak propounds,

> For the (gender-unspecified) "true" subaltern group, whose identity is its difference, there is no unrepresentable subaltern subject that can know and speak itself; the intellectual's solution is not to abstain from representation. The problem is that the subject's itinerary has not been left traced so as to offer an object of seduction to the representing intellectual. In the slightly dated language of the Indian group, the question becomes, How can we touch the consciousness of the people, even as we investigate their politics? With what voice-consciousness can the subaltern speak? (40)

It should be kept in mind that Dattani does not intend to "speak for" the Other, but rather he foregrounds their abject situation. Moreover, the entire play of Dattani is represented through Uma's perspective. It is Uma who provides the subaltern subject the space for voicing their exploits. Within the elite system she is the only person who finds it important to hear their side of the story.Rather than rejecting the abject, she decides to confront it in order to discover her true identity—her engagement with the

murder of a hijra, acts as a process of undermining the politics of stable identity formation. Uma transgresses the boundary strategically created by society to maintain the stability of the bourgeois self. Indeed, she faces dilemma and thinks of withdrawing and returning to her safe cloistered space. The hegemonic culture compels her to think of the hijra community as "liars" and "beggars"[3] at the back of her mind. But she overcomes the prejudices of society and decides to hear their voice—the voice of subalternity. In an interview, Dattani says, "She enters the world of eunuchs and discovers a tantalizing pot of love, lust, power, jealousy and enough cruelty. In resolving the crime, she meets her own marginalized self. (Banerjee 164)"

Regarding the gender of the monster in Mary Shelley's *Frankenstein,* Judith Butler propounds that "the monster may well be carrying that excess of gender that fails to fit properly into 'man' and 'woman' as conventionally defined" (47). In other words, Frankenstein's monster implies a figuration of the outcast status of a nonnormative subject in a society which protects heteronormative boundaries by enforcing disciplinary norms. The 'creature' occupies an ambiguous space by subverting the borders between man and woman, between human and non-human Other. Regarding the precarious subjective position of the monster, Diana Reese observes that "the monster falls outside of the category of the strictly anthropological, his existence becomes, by default, an instance—a problematically intransigent example—of another, differently embodied rational creature. (55)".

Frankenstein's monster is denied of its human identity by being referred by the pronoun "it".Like the monster, the transgender characters of Dattani's play are referred to as "It" and thus being systematically dehumanised. It is only Uma who respects the gender identity of the hijras and refers to them as "she". But she is constantly being reminded of the customary identity of the hijras by the people around her.

> MUNSWAMY. You may see the hijra now if you wish, madam.
>
> UMA. Will she talk to me?
>
> MUNSWAMY *(chuckling).* She! Of course, it will talk to you. We will beatit up if it doesn't…
>
> SURESH. That is just the sort of name a hijra would fancy. *(Chuckles.)*Anarkali! …

UMA. Yes, I know she is arrested for the murder of her sister, but ..

Suresh chokes with laughter as he is gargling, and coughs.

SURESH *(off).* What's that you said? Sister? *(Re-enters.)* There is no such thing for them. More lies. They are all just castrated degenerate men. They fought like dogs every day, that Anarkali and . . . (7-9)

Here Dattani compels his audience to comprehend the politics behind gender pronouns and its connection with the process of identity formation. At this juncture the function of language in categorising and normalising fixed gender identities should be considered. As at a concert in 2019 Lady Gaga said to the audience, "Ask the question: What is your pronoun?"

In her essay, "My Words to Victor Frankenstein above the Village of Chamounix", Susan Stryker propounds the correspondence between transsexual identity and the monster in Mary Shelley's *Frankenstein*. Like the monster, the transsexuals are radically rejected by a society that is guided by stereotypical gender roles. They are "the invisible minority" (Dattani 21) who belong to the fissures of social constructs. Regarding her transsexual identity, Susan Stryker says,

> I find a deep affinity between myself as a transsexual woman and the monster in Mary Shelley's *Frankenstein.* Like the monster, Iam too often perceived as less than fully human due to the means of my embodiment; like the monster's as well, my exclusion from human community fuels a deep and abiding rage in me that I, like the monster, direct against the conditions in which I must struggle to exist. (238)

Significantly, Dattani's play betrays the "transgender rage" that Stryker intends to conceptualize—the rage that occurs from "a failure to satisfy norms of gendered embodiment" (Stryker 249). The queer characters of the play do not actively revolt against the oppressive social structure. (Even though Anarkali and Champa knew from the beginning who murdered Kamla, they did not reveal the identity of the murderer to the police.)Apparently, they seem to have internalised their marginalised position within the hegemonic culture.The drama does not illustrate revolutionary optimism. It is primarily because Dattani brings to the stage

"real invisible issue…which need to be brought out and addressed" (Mee, Invisible Issues 20). Regarding the problematic situation of Indian English plays, Dattani propounds that "with Indian theatre one has to look at it realistically and mirror what really exists" (Mee, Invisible Issues 26).However, at the subterranean level it could be noticed that the hijra characters of his plays do exhibit agency. The rage is implicitly revealedthrough the scepticism and disdainfulattitude of the nonbinary characters—the explicit vulgar language of Anarkali within the police station, her contempt for the authority, Champa's scepticism regarding the justice system of India.Moreover, their deliberate silence is a form of resistance that James C. Scott conceptualises as "everyday forms of resistance" in his book *Weapons of the Weak* (1985). In connection to the peasant revolt in a Malaysian village,Scott argues,

> One must look rather at the constant, grinding conflict over work, food, autonomy, ritual—at everyday forms of resistance. In the Third World it is rare for peasants to risk an outright confrontation with the authorities over taxes, cropping patterns, development policies, or onerous new laws; instead, they are likely to nibble away at such policies by noncompliance, foot dragging, deception…in place of open mutiny, they prefer desertion; in place of attacks on public or private grain stores; they prefer pilfering. (xvi)

These methods of resistance that are deliberately disguised or veiled are performed in order to evade punishment by the authority. The hijra community often resorts to everyday forms of resistance to exert their agency and establish their fluid identity— the unusually loud hand clap, unschooled singing and dancing, showy makeup, unrefined language, the non-biological guru-chela kinship system.

Unlike Dattani's other plays, *Seven Steps* is constructed as a detective fiction where Uma, a research scholar, is the accidentalsleuth. In *Seven Steps* "Mahesh is subverting a familiar genre" (3), as Jeremy Mortimer says. Uma unearths the truth but fails to give justice to the hijra community. In my view, the play acts more as a reality check for the "cityfied English-speaking" (Dattani xi) audience regarding the contemporary sociocultural situation of subordinate groups. For Mahesh Dattani "theatre is an art with a function" (Tyagi 195).

Notes

1) The hijra community includes transgender, transsexual, eunuchs, and all those individuals who do not conform to gender binarism.
2) His plays are written in English which implies that his target audience is elite upper class who has the privilege of learning a foreign tongue.
3) Under the colonial regime, the hijra community was labelled as a criminal tribe. They were criminalised on the ground of being "beggars", "sodomites", "unnatural prostitutes", and "kidnappers". The 1871 Criminal Tribes Act (CTA) intended to eliminate the public presence of the hijras.

Works Cited

"What is YOUR pronoun?" *Facebook*, uploaded by Pride Live, 16 Oct. 2019. https://fb.watch/lfRQyFJFk0/? mibextid=Nif5oz. Assessed 2nd June, 2023.

Banerjee, Utpal K., and Mahesh Dattani. "Utpal K. Banerjee in Conversation with Mahesh Dattani." Indian Literature, vol. 48, no. 5 (223), 2004, pp. 161–67. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23346512.

Butler, Judith. "Animating Autobiography: Barbara Johnson and Mary Shelley's Monster." *A Life with Mary Shelley*. Edited by Werner Hamacher, Stanford UP, 2014, pp. 37-50.

Dattani, Mahesh. "Seven Steps around the Fire." *Collected Playsby Mahesh Dattani*. vol. 1, Penguin, 2000, pp. 1-42.

Dattani, Mahesh. Preface. *Collected Plays by Mahesh Dattani*. vol. 1, Penguin, 2000, pp. xi-xv.

Hinchy, Jessica. "Obscenity, Moral Contagion and Masculinity: Hijras in Public Space in Colonial North India." *Asian Studies Review*, vol. 38, issue. 2, May 2014, pp. 274-294. https://doi.org/10.1080/10357823.2014.901298.

Mee, Erin B. "Mahesh Dattani: Invisible Issues." *Performing Arts Journal*, vol. 19, no. 1, 1997, pp. 19–26. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/3245741.

Mee, Erin B. Review of *The Oxford Companion to Indian Theatre*. *TDR: The Drama Review*, vol. 50 no. 4, 2006, p. 183-184. Project MUSE,muse.jhu.edu/article/206586.

Mortimer, Jeremy. A Note on the Play. *Collected Playsby Mahesh Dattani*. vol. 1, Penguin, 2000, pp. 3-4.

Reese, Diana. "A Troubled Legacy: Mary Shelley's Frankenstein and the Inheritance of Human Rights." *Representations*, vol. 96, no. 1, 2006, pp. 48–72. JSTOR, https://doi.org/10.1525/rep.2006.96.1.48.

Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance.* Yale University Press, 1985.

Shelley, Mary. *Frankenstein: Or, The Modern Prometheus.* W. W. Norton & Company, 1996.

Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" *In Marxism and the Interpretation of Culture*, edited by Cary Nelson and Larry Grossberg, University of Illinois Press, 1988. pp. 271–313.

Stryker, Susan. "More Words about "My Words to Victor Frankenstein"." *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, vol. 25 no. 1, 2019, p. 39-44. Project MUSE, muse.jhu.edu/article/712707.

Tyagi, Alka. Review of *Collected Plays*, by Mahesh Dattani. *Indian Literature*, vol. 44, no. 4 (198), 2000, pp. 193–95. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23343294.

Author : **Banani Ghosh, Research Scholar, English, Diamond Harbour Womens' University, West Bangal.**

Play Review : Taray'e Taray'e
A Hallucination in the Mirror

Tania Koley

How often do we think about a wide sky full of stars? How often do the lines of a good poem or a song take us deep into a state of solace? How often do we admire a painting with a brown sky and blue hills? These are not mere questions, rather these are bridges that connect us with a realm where rules of time and space haven't yet choked 'Art'. I often think about how it feels to understand and create art. And what I can assume is, it's like learning a new language, it's like observing the same reality in a new manner just like Vincent van Gogh, a Dutch painter, portrays a night sky in his painting *The Starry Night* (1889). Isn't it more beautiful than reality? Isn't it more lively? Films like *At Eternity's Gate* and *Loving Vincent* had already portrayed the pathetic and deprived life of Vincent, but how would it be if Vincent is alive today? What if someone wants to become like Vincent? What if someone forgets the line between reality and imagination and becomes 'insane' according to the present society? Koushik Sen's play *Taray'e Taray'e*, based on Srijato's novel *Tara Vora Akasher Niche* (*Under the Starry Night*), tries to offer some answers to these questions. The play was video documented on 27th July, 2018 and surprisingly exactly 128 years ago van Gogh shot himself.

"Always! Always you have to be drunk", Koushik Sen starts with an ambiguous statement which sets the tone for this play quite clearly. The waves, birds, wind, stars, and time, will tell you, it's time to be drunk. Drunk with what? Alcohol, poems, or eminence? Only then someone can come out of the clutches of set norms of this chaotic civilization. Else this chaos can eradicate people with imagination and artistic perceptions just like it did to Vincent Van Gogh, while he was alive. He was ahead of his time and imagined the world in a unique way. Nobody except Theo, the brother of van Gogh, understood him, nobody except Theo realized the meaning of his paintings then. He became the epitome of art now but if someone wants to speak about imagination and merges the realm of real

and surreal, is this world ready to accept that? Are we ready to listen to what Ritwick wants us to listen to in this play? Or will we too level this as insanity and refuse to enter into that world of starry night?

The whole play simultaneously interchanges the life of Vincent van Gogh, the famous insane painter of the post-impressionist era, and Ritwick, an ordinary young man of the present time with a curse to imagine. Ritwick often sees visions of tanks and guns, his father, dying hummingbirds, and many more. All these want to destroy Ritwick's leftover imagination. That fear is shaking the balance of Ritwick's sanity. The portions of van Gogh's life portrayed in this play actually reflect an artist's internal feud to choose between art and life. In one scene in a conversation between Vincent and his father, Vincent claims he does not need the mercy of Jesus, to him god is a man like Charles Dickens. That sentence uproots our moral religious norms of humanity and places it in a state of doubt. Are these norms worthy enough to survive till now? Who knows! Exactly after this scene of Ritwick's appointment with his psychiatrist who wants to decode the vision about dead hummingbirds, the doctor decodes the scene as the ending of something and the beginning of something new. But, what she fails to understand is the urge to become an artist in Ritwick. Not everything has a bookish meaning, not everything can be understood through some fixed codes determined by civilization. The day Vincent was leaving his father's house he saw a dead hummingbird too. To me, these two scenes actually connect Vincent and Ritwick in a way where space and time do not work. This interchanging storyline actually contrasts Ritwick and Vincent in the same scenario so that we can observe the sufferings both have to go through comparatively.

One of the most beautiful concepts I've found is the use of crows and sparrows to catch the contrast between death and joy. In one scene Vincent is writing a letter to Theo about a newfound poet John Keats at the end of which he lies about his well-being. Immediately to portray the despair of Vincent's heart a bunch of crows starts to caw which marvelously matches the scene and makes it more appealing. In the next scene, Ritwick uses the reference to sparrows when he talks about his Chobi Kaku. Chobi kaku is the source of Ritwick's passion and craving for art and the life story of Chobi kaku serves as a microcosmic and generalized life of an Artist. A

gold medalist in Govt. Art College, Ritwick's Chobi kaku failed to achieve something 'great' in life. The reason I've used quotes for the term is, the definition of this great is determined by society and it is materialistic by origin. Chobikaku committed suicide by taking poison. As soon as Ritwick remembers it, the crows appeared again with a notice to take a rest in the morgue. To whom this notice is given? Is it for Chobi Kaku? Or is it for all those who ever dreamt of being a painter? The notice is given for all those blank pages far from the touch of colors.

It is amazing the way poetry has been used. Starting from Vincent's recitation of Keats' poem to Koushik Sen's little cameos with loaded lines, the presentation is just pinpointed. In one scene Ritwick's father is scolding him for filling the form of Govt. Art College. In utmost despair, Ritwick started to recite a few lines from Jibanananda's *Aat Bochor Ager Ekdin* (*A Day Eight Years Back*), but Ritwick's father shuts him down and Ritwick starts to cry. His father throws all his childhood paintings into the fire. Silently a dream has been murdered, just like Vincent was silenced by society. But the scene that has touched the acme of excellence is Koushik Sen reciting Sunil Ganguly's *Mon Bhalo Nei* (*My Sick Heart*), a scene which reveals a sick heart, not of Ritwick's, not Vincent's, not even the psychiatrist's. This heart reflects each of those who have experienced a sense of loss while watching the night sky. Finally, a few lines from Jibanananda's *Bodh* (*Conscience*) drag us deep into the ocean of existentialism.

If I've to shape the root motto of the whole play into a question, then it has to be about the discrimination between childhood imagination and a mature mind's imagination. With the growth of ourselves, our imagination should evolve into a more polished and realistic version but for most of the cases it fades away, and the rest with the ability to imagine something which is out of the box gets the recognition as insane. For example, in one scene Ritwick asks the psychiatrist why a painting with blue hills and brown sky is appreciated in childhood but in mature age that imagined world is considered a symptom of insanity. One thing is clear that the only reason behind those appreciations is childhood and the stereotyped idea of 'maturity' which, according to society, will gradually eliminate all symptoms of imagination. While Ritwick is a grown man and

should understand the limitations of his own imagination and should not alter it with the actual reality, this hyper-realistic tendency of Ritwick is causing a drastic change in the normal stream of time and space. Practically if we think about evolution, the one thing that elevates mankind is the ability to think. That ability is maintaining the process of survival. But if we start to choke that ability and set its limit to a certain level, then we are standing between mankind and progress. I can very well remember a scene from Beckett's *Waiting for Godot* where while introducing Lucky, Pozzo uses a line that reveals Lucky's ability to dance and think. I've always wondered why Beckett used something like dancing, which is an extra curricular activity with thinking which is the base of mankind. Did he want to portray a future world where the ability to think would be an exception? If it is true, then this play is pointing towards the initial phase of that process of transition. Ritwik's question about the definition of insanity, whether he is insane or those people who can't imagine a colour other than black and white are the actual epitome of insanity, reflects the horrific cry of art, standing at the edge of survival.

The final catharsis appears when Ritwick meets Vincent. Time and space boundaries get dissolved, for there are questions that need to be answered, for there are worlds whose doors have to be found, for there are dreams left to be seen. At the edge of sanity, an unstable Ritwick becomes confused about what is real and asks Vincent about the way out. Vincent, with his gunshot wound, trembles and shows Ritwick the only way. And what is the only way? The way Vincent took many years ago, is the only way in which we're all free, nobody can judge us, no norms can bind our dreams, and no one can call us insane. The way is of death, the eternal way by which many stars have gone lost. Vincent left Ritwick with a light of knowledge, with a 'bodh', with a way leading to the Starry Night. Ritwick left with Vincent that bluish night, leaving the psychiatrist with a remaining sense of realization. No sedative can make that sense lost. No matter how hard we try there will always be persons like Ritwick who will make us think and teach us to imagine.

Anjan Dutta as Vincent, Riddhi Sen as Ritwick, and Reshmi Sen as the psychiatrist, with the little cameos of Koushik Sen, this play wonderfully presents a world of its own. Especially, Neel Dutt's background

music sets the exact tone of that world and it seems like a dream. Every moment of this play has its own story to tell and when we combine all those stories, we get a circle that starts with the birth of an artist and ends with the birth of another. It's like passing on a legacy, a meaning, or a trace of the remaining art. I see this play as a reminder that will make us remember not to stop dreaming and thinking. Be it hallucination, be it childish, or be it insane, it should not stop us from imagining our own little worlds. No matter what the reality is, there should be a stream of imagination flowing alongside it. In a race to be advanced, we often forget to take a look at the wide open fields, the last rays of the sun, and the tall trees standing for years with so much to tell. Plays like these will always make us remember the last weird sketch we made in our childhood, the obscure lines of a poem that once touched us, and the forgotten tone of a piece of music we loved once. This is not just a play, rather this is the only sedative we can take to learn to see the sky beyond the roof.

Author : **Tania Koley, Ph.D Scholar, NIT, Durgapur, West Bengal**

নাটক

ত্রিপুরা থিয়েটার-এর '**পিতা**' নাটকে শিল্পীবৃন্দ (২০২৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পানুপ্রাণিত
কাবুলিওয়ালা

■ চন্দন সেন

চরিত্র

অবনীশ রায় - অধ্যাপক লেখক (মিনির বাবা)। তমালিকা - শিক্ষিকা (মিনির মা)।
মিনি (মৃত্তিকা) আট বছরের বালিকা । রহমত । পুলিশ অফিসার রজত মুখার্জি ।
কনস্টেবল । চারু (প্রৌঢ়া ঝি)। পুলীন (দালাল প্রকৃতির লোক)।
বাজারে আসা দুই আগন্তুক (২)। ওয়ার্ডেন । জেলার । জেলারের বৌ।

দৃশ্য - ১

অবনীশদের ঢাকুরিয়ার ছোট্ট পৈত্রিক বাড়ির বসা/লেখার ঘর। রুচিসম্মত আধুনিকভাবে সাজানো ড্রয়িং রুম। বিকেল (পড়ন্ত) অবনীশ হয়তো লিখছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ঘরের ফোনে জরুরী কথা সেরে নিচ্ছে।

অবনীশ : হ্যাঁ, প্রফেসর রায় বলছি ... নমস্কার! ও আপনি নতুন ম্যানেজার? অচ্ছা এই সময় আমি তো মোবাইল ফোন সাইলেন্ট রাখি।... হ্যাঁ বলুন ও হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের লেখাটা হয়নি এখনো। আরো দিন দুয়েক লাগবে! হ্যাঁ হ্যাঁ আজ হবে না পরশু মানে শুক্রবার কলেজ যাওয়ার আগে ফোনে মনে করিয়ে দেবেন... হ্যাঁ মোবাইলেই, কলেজ থেকে তিনটে নাগাদ লেখাটা নিয়ে যাবেন কেমন? হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার। আর (হেসে) শুনুন আমায় সিম্পলি অবনী বাবুই ডাকবেন প্রফেসর টফেসর শব্দগুলো কলেজের বাইরে ভীষণ ভারি মানে একাডেমিক লাগে... ঠিক আছে ঠিক আছে নমস্কার।

[একটু আগেই অবনীশের স্ত্রী তমালিকা চা টেবিলের এক কোণে রেখে দাঁড়িয়েছে]

অবনীশ : কিছু বলবে? (হেসে) চা নিজেই করে আনলে? চারুদি কি চলে গেছে তমালিকা?

তমালিকা : হ্যাঁ ওদের পাড়ায় কি একটা পূজো আছে। চারুদির উপোস। স্কুল যাওয়ার আগেই বলে দিয়েছি, স্কুলে পরীক্ষা চলছে চারুদি, আজ তাড়াতাড়ি ফিরব। তুমি মিনির বিকেলের বায়নাক্কাটা মিটিয়ে চলে যেও চারুদি ...

অবনীশ : ঠিক আছে, আমি একটু লিখব। সন্ধ্যা ৭টায় নিতে আসবে। আর কিছু?

তমালিকা : যাচ্ছি যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, শুক্রবার তাকে আসতে বারণ করে দিও। শুক্রবার কলেজ থেকে একটু early বার হয়ে মিনির জন্য আনন্দনিকেতনে

ভর্তির ফরম আনতে হবে। ডলিদিকে তেমনটাই বলে রেখেছি কিন্তু। মনে করিয়ে দিলাম।

অবনীশ : এ হ্যাঁ (হেসে) সরি তমালিকা, বলে দেব।

তমালিকা : আমি এখন মিনিকে নিয়ে একটু বসব। ভর্তির জন্য আনন্দ নিকেতন কিন্তু ইন্টারভিউ নেবে। যাই?

অবনীশ : (হেসে স্ত্রীকে বলে) থ্যাংকু ম্যাডাম! (স্ত্রী বার হয়ে যায়, অবনী সামান্য ভেবেই লেখা শেষ করতে মন দেয়। অন্য দিক দিয়ে মিনি ঢোকে। অবনীশ একবার মেয়েকে দেখে নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে দ্রুত লেখা শেষে মন দেয়। মিনি দেখে, বুঝে, বাবার উল্টো দিকে এসে দাঁড়ায়।)

মিনি : আচ্ছা বাবা, মা আর কতবার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ-এর রং, মিনিং এসব বোঝাবে? এখন আবার শুরু করবে-

অবনীশ : (মাথা না তুলে) ওটা ভালো করে মুখস্ত রাখতে হবে, সামনের সপ্তাহের মধ্যে অত বড় স্কুল মানে আনন্দ নিকেতনে ভর্তি টেস্ট হতে পারে, সামনে কিন্তু রিপাবলিক ডে ২৬শে জানুয়ারি।

মিনি : টেস্ট হলে হবে, ওরা যা যা প্রশ্ন করবে তা আমার জানা, মুখস্ত। কিন্তু এবার আমিও ওদের ধরবো! ওরা পারবে?

অবনীশ : (একটু হেসে লেখার থেকে মুখ তুলে) না না ওদের কাছ থেকে নয়, মায়ের কাছ থেকেই তোমার সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও।

মিনি : সিলেবাসে নেই।

অবনীশ : (লেখা থামিয়ে বিস্মিত মিনিকে কাছে টেনে নিয়ে) কার সিলেবাসে নেই?

মিনি : মায়ের স্কুলের সিলেবাসে নেই।

অবনীশ : (অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে চায়) মিনি, তাহলে আমায় quickly প্রশ্ন কর।

মিনি : (বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে) তোমার সিলেবাসেও নেই বাবা।

অবনীশ : (নকল রাগ দেখিয়ে) উরি বাবা! কি সেই ভয়ংকর কঠিন প্রশ্ন যা মায়ের সিলেবাসে নেই আমার সিলেবাসেও নেই?

মিনি : (অদম্যভাবে চেঁচায়) আমায় যে মা বারবার জাতীয় পতাকা পড়াচ্ছে তার তিনটি রং এর মধ্যে যে গোল চক্র তাকে কি বলে বাবা? অশোক চক্র তো?

অবনীশ : হ্যাঁ

মিনি : সম্রাট অশোকের নামে তো!

অবনীশ : correct (হেসে)

মিনি : আর তুমি সেদিন বলেছিলে যারা আমাদের দেশরক্ষা করে সেই মিলিটারির মধ্যে সবচেয়ে বড় বীরদের যে পদক দেওয়া হয় তার একটার নাম অশোক চক্র।

অবনীশ : হ্যাঁ বলেছিলাম তো

মিনি : কার নামে? সম্রাট অশোকের নামে! আচ্ছা এবর বলতো অশোকের birthday কবে?

অবনীশ : ও, (হেসে) এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার মাথায় ঘোরে! বোঝা যাচ্ছে আনন্দ নিকেতনে ভর্তি হতে পারলে... ঠিক আছে সম্রাট অশোকের জন্মদিন, অন্তত তাঁর জন্মসালটা আমি খুঁজে বার করব। মাকেও বলো—

মিনি : সিলেবাস থেকে খুঁজে খুঁজে মা বলল অশোকের বাবা বিম্বিসার, আর মায়ের নাম... তারপর ফোন টোন ঘেঁটে বলল— অশোকের মায়ের নাম... এইযাঃ এখন ভুলে গেছি... মনে এলে বলবো ...(হাসি)

অবনীশ : ঠিক আছে আমিও জেনে বলবো। এখন যাও আমাকে লেখাটা শেষ করতে দাও।

মিনি : যাচ্ছি বাবা। (ফিরে এসে) আচ্ছা বাবা, এমন একজন সম্রাট যার নামে অশোক চক্র, আশোক স্তম্ভ, তার জন্মদিন মৃত্যুদিন আমাদের দেশে কেন পালন করা হয় না বাবা? রবিঠাকুর গান্ধীজি নেতাজির মতো?

অবনীশ : (হেসে) মিনি, দেশ বলতে তখন অনেকগুলো দেশ মিলে যে বিরাট দেশটা বোঝাতো সেটা এখনকার দেশ নয়, আরো বড় ভারত। যেমন আজকের ইণ্ডিয়ার সঙ্গে নেপাল, বাংলাদেশ,পাকিস্তান, আফগানিস্তান যোগ করে একটা বিশাল দেশ।

মিনি : (মাথায় হাত দিয়ে) উরি ব্বাবা! তাহলে হঠাৎ আমাদের এই বিশাল দেশটা ছোট হয়ে গেল কেন?

অবনীশ : উঃ মিনি, এই প্রশ্নের উত্তর শুনেই কিন্তু চলে যাবে... শোনো দেশটা অত বড় হলে এখন শাসন কাজ চালাতে, ঠিকমতো সব্বাইকে দেখাশোনা করতে পদে পদে কত অসুবিধে হতো বুঝতে পারছ? তাই ভারত আর অত বড় দেশ নয়।

মিনি : ও, তাহলে আমায় ছোট স্কুল ছাড়িয়ে বড় স্কুলে পাঠাচ্ছ কেন?

অবনীশ : (হেসে ফেলে) ঠিক আছে পরে এটা বুঝিয়ে বলবো (নেপথ্যে মা- 'মিনি') এবার যাও মিনি, মা ওয়েট করছে, যাও, যাবার আগে ওই খোলা জানালাটা একটু ভেজিয়ে যাও, আবার মায়ের ডাক - 'মিনি')
(ছুটে বেরুতে গিয়ে ফিরে আসে)

মিনি : মা তোমার বৌ তো ? মা ডাকছে মানে তোমার বউ ডাকছে তো?

অবনীশ : হ্যাঁ (রেগে) মিনি এসব কি প্রশ্ন?

মিনি : বাবা বিম্বিসারের বউ-এর নাম আবছা আবছা মনে পড়ে গেল তো, মা বলেছে।

তমালিকা : (প্রবেশ করে) (রেগে) কি হলো মিনি? কতক্ষণ ধরে ডাকছি! বাবাকে লিখতে দাও। এসো তোমার কমপ্ল্যান ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আগে খাও।

মিনি : মা, আশোকের বাবার নাম বিম্বিসার আর মায়ের নাম যেন ফোন দেখে কি বলেছিলে... ভদ্র...ভদ্রা....

তমালিকা : (হেসে) সুভদ্রাণী - চলো

মিনি : তুমি very good, মা! জানালা ভেজিয়েই আসছি। যাও-উঁহু উঁহু, এখানে আর দাঁড়াবে না- বাবা কিন্তু লিখছে। আর বিরক্ত করো না (মা হেসে চলে যায়) (মিনি জানালার ধরে দাঁড়ায় টুলের ওপরে)

মিনি : বাবা, সেদিনের মতো দই ফুচকা পেলে ডাকবো? না বাবা health খারাপ হবে!

অবনীশ : (মুখ না তুলে) যাও মা হেলথ ড্রিংক নিয়ে বসে আছে... তারপর পড়াশোনা... যাও.. যাও

মিনি : আচ্ছা ওই ওই যে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে, ও তো কাবুলিওয়ালা ... কি বিরাট চেহারা! বাবা, ও কতবার করে হেলথ ড্রিংক খায় বাবা... (বাবা নীরবে লিখে যায়) এই কাবুলিওয়ালা, কাবুলিওয়ালা শোনো শোনো...

কাবুলিওয়ালা : (পরিচিত চেহারায় চেঁচায়) লাগবে পেশোয়ারকা আখরোট, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস মেওয়া!

[জানালার সামনে এসে দাঁড়ানো অবস্থা দেখার আগেই মিনি ভয় পেয়ে নিচে চলে যায়। কাবুলিওয়ালা জানালা গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখে কেউ নেই। আবার হাঁক দিতে দিতে চলতে থাকে। মিনি হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে আবার টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকে। জোরে।]

মিনি : কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তুমি কোন কোন হেলথ ড্রিংক খাও? ক'বার করে খাও? ব্বাবা এত লম্বা চেহারা—

[কাবুলিওয়ালা জোরে হাসতে হাসতে জানালার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়]

মিনি : (ভয় পেয়ে, ছুটে ভিতরে চলে যায়) উরিবাবা!

(জানালায় মুখ বাড়িয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে অবনীশকে ডেকে বসে কাবুলিওয়ালা)।

কাবুলি : এখান থেকে আমাকে এক ছোটা লড়কি ডাক পাঠালো বাবুজি। ভাবলাম কুছ খরিদ করবে। বাবুজি ও বাবুজি—

[অবনীশ লেখা ছেড়ে উঠে এসে সৌজন্যের হাসি হেসে কথা বলে]

অবনীশ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মেয়ে ডাকছিল... খুব দুষ্টু— অনর্গল কথা বলে চলে। ঠিক আছে আমি বকে দেবো। আর এসব দুষ্টুমি করবে না।

কাবুলি : নেহি, নেহি বাবু বকবেন না। ছোটা মিঠা লেড়কি। ভাবলাম দিনের শেষে খরিদ্দার মিললো, (হেসে) না, না, বকবেন না। হামি যাচ্ছি। সালাম বাবুসাব।

অবনীশ : ঠিক আছে, ছোট দু প্যাকেট, দাঁড়াও, ভিতরে এসে দাও। (দরজা খুলে দেয়)

কাবুলি : দো ছোটা প্যাকেট ...(ঝোলার ভেতর থেকে দুটো চোট প্যাকেট বার করে)

ভিতরে ঢোকে, বহুৎ সুক্রিয়া বাবুসাব, এই লিন, ছোটা এক প্যাকেট কিশমিস্ আর ছোটা এক প্যাকেট মেওয়া।

অবনীশ : বেশ। কত দাম?

কাবুলি : বাবুসাব, কিশমিসের দাম মেওয়ার দাম শুধু ২৫ রুপাইয়া বাবুসাব, খুকিকে একটু ডেকে দিবেন, ওর সাথে একটু কথা বলব।

অবনীশ : (হেসে) ও পড়াশুনা করছে। বড় স্কুলে ভর্তি হবে তো?

রহমত : (হেসে) বহুত খুব... বহুত খুব... খুকির ভালো হবে। সালাম বাবু। (যেতে উদ্যত) (ছুটে মিনি ঢোকে)

মিনি : (বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফস করে কাবুলিওয়ালাকে বলে) কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তুমি কাবুল থেকে এইমাত্র এলে?

অবনীশ : না, না, এর মত অনেক কাবুলিওয়ালা এখন এই কলকাতাতেই থাকে মিনি।

রহমত : হ্যাঁ, সাচ্ বাত। হ্যাঁ খোঁকি পুরা ৫০০০ কাবুলিওয়ালা কলকাত্তাতেই থাকি। (হেসে) খোঁকি, মালুম হলো? ৫০০০ কাবুলিওয়ালা থাকে। (হাসি) আমি ভি থাকি,- নাখোদা মস্‌জিদ কা বগল মে... (হাসি)

মিনি : (বাবার কোলের মাঝে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে) আর কাবুলে থাকে কে কাবুলিওয়ালা? তোমার বউ?... (রহমত হেসে গড়িয়ে পড়ে)

রহমত : হ্যাঁ হ্যাঁ কাবুলে থাকে।... (হঠাৎ বিষাদ গলায় অবনীশকে) বাবুজি, খুকিকে বলা গুনাহ হোবে... (বিষন্ন অবস্থায় বের হতে চায়) বিক্রিবাট্টা আগের মাফিক নাই। তাই বহুত আদমী নকলি সামান আসলি বোলে বেঁচে— লেকিন, হামি না বাবুজি...

অবনীশ : রহমত! (ঘুরে)

রহমত : বলুন বাবুজি।

অবনীশ : বলছিলাম চারদিকের যা অবস্থা। তোমার ঘুরে ঘুরে এই ছোট্ট ব্যবসা দিয়ে দিন ঠিকঠাক চলছে?

রহমত : (হেসে) নেহি বাবু, আমি রুপিয়া ভি উধার দিই। হামাদের বহুদিনের বেওসা। লেকিন ওভি বহত কঠিন বলে গিলো।

অবনীশ : হুঁ খুবই কঠিন দিন! (নেপথ্যে ডাক- 'মিনি')

রহমত : খোঁকি, এই দু প্যাকেট লিয়ে যাও! মাইজি ডাকছে, লিয়ে যাও।
(অবনীশ ইশারা করে। মিনি ভয় সংকোচ কাটিয়ে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ২ প্যাকেট নেয়। কাবুলিওয়ালা এক বুক তৃপ্তি ও একমুখ হাসি নিয়ে প্যাকেট দুটো হাতে দেয়।)

মিনি : (হাতে নিয়ে) তোমার ঐ লম্বা ঝোলায় আরো অনেক প্যাকেট আছে কাবুলিওয়ালা?

রহমত : (জোরে হেসে) হাঁ হাঁ আরও লাগবে খোঁকি?...

মিনি : না, না শেষ হলে আবার ওই জানালা দিয়ে ডাকবো কাবুলিওয়ালা। আবার তুমি আসবে!— আসবে তো?

রহমত : হাঁ হাঁ খোঁকি, জরুর আসবে।

মিনি : কিন্তু আমার বাবা তো সব জানে। বাবা তোমায় বলছিল না দিন কঠিন হচ্ছে...

রহমত : হাঁ হাঁ বাবুজি সচ বোলা, হামলোগ কা দিন বহত কঠিন বনে গিলো...

মিনি : ও বাবা তোমার সামনে কঠিন দিন! আমার মা বলেছিল next week-এ আমাদের খুব বড় স্কুলে ভর্তির ইন্টারভিউ। সেখানে প্রশ্ন নাকি খুব কঠিন! কি জানি বাবা এমন দিন এল যেখানে সব্বার সবকিছু কঠিন... সোজা কিচ্ছু নেই।
(রহমত হাসে, অবনীশও হেসে ফেলে)

অবনীশ : (হেলে) যাও মা ডাকছে মিনি। তোমরা দুজনে কঠিনকে হারিয়ে দিও, (হাসি)

রহমত : সালাম হুজুর। এবার আসি। খোঁকি আসি। ফির আসবো। (যেতে গিয়ে) খোঁকি, বহত সুন্দর খোঁকি। আচ্ছা তোমার নাম কি আছে?
মিনি বাবাকে আঁকড়ে ধরে তার দিকে তাকায়। (সুস্মিত হাসি নিয়ে অবনীশ বলে) বলে দাও তোমার নাম...

মিনি : (একটু হেসে) মিনি।

রহমত : (প্রবলভাবে হেসে) পেয়ারি লেড়কি কো নাম কি সুন্দর! না-জুক নাম, মিনি।

মিনি : না না, নাজুক মানে তো গুড? মোটেই ভালো নাম না। জানো কাবুলিওয়ালা ৮ বছর আগে একই দিনে দু দুটো Birthday হোল, ঐ যে পাড়ায় ঢোকার মুখে অনেকগুলো নামিদামি দোকান গিলে নিয়ে যে একটা মল হয়েছে দেখলে না, ওটার নাম দিয়েছে ম্যাক্সি বাজার! ম্যাক্সি বাজার! ৮ বছর আগে ওটার যেদিন বার্থডে আমারও সেদিন এই বাড়িতে সেকেন্ড বার্থ ডে। আমার বাবার মা মানে ঠাম্মা। ঠাম্মা এখন তো ওই আকাশে স্টার হয়ে গেছে, আম্মা এই নিয়ে আমার যখন দু বছর আগে স্টার হওয়া আমায় বলে গেছে মিনিরে আশেপাশের ছোট ছোট দোকানকে রাক্ষসের মতো গিলে খেয়ে ওটার জন্ম, ওই যে ম্যাক্সি। তুই হবি তার উল্টো, তাই তোর নাম মিনি।

রহমত : (মুগ্ধ বিস্ময়ে) বহত খুব, বহত খুব। (হাসতে থাকে)খোঁকি, মিনি মা এবার আমি যাই।

অবনীশ : (এতক্ষণ মেয়ের কথাগুলো এনজয় করছিল) (হেসে) আমার মেয়ে কথা বলার সুযোগ পেলে সব ভুলে যায়। যাও মা ভিতরে ওয়েট করছে, এবার যাও।।
রহমত আবার এসো। (রহমত সেলাম করে রওনা হয়)

মিনি : (এগিয়ে গিয়ে) কাবুলিওয়ালা আমার ঠাম্মার কথা মানে আমার ওই বাবার

মায়ের কথা কিন্তু আজও আমার বাবা ভোলেনি। বাবা মেক্সিবাজারে যেতে চায় না। তুমি তো কাবুলিওয়ালা, বড় মানুষ লম্বা লোক, লম্বা ঝোলা কিন্তু ভিতরে তোমার ছোট্ট দোকান ছোট্ট ঝোলার মধ্যে,—তাই বাবা তোমার কাছ থেকে সওদা করল। তাই না বাবা?

(রহমত অবনীশ মিনি তিনজন একসঙ্গে হাসতে থাকে) শোনো কাবুলিওয়ালা এবার থেকে তোমার আওয়াজ পেলেই আমি জানালায় এসে দাঁড়াবো । তুমি আমাকে আর খোঁকি বলবে না, বলবে মিনি।

কাবুলি : (একবুক তৃপ্তি নিয়ে বলে) নেহি নেহি, রহমত তুমাকে ডাকবে 'খোঁকি'।খোঁকি তুম আউর থোড়া বড়া হলে হামি তো আউর বুড্ডা হবো। ভুলে যাব। তখন ডাকবো— মিনি মাঈ- (হাসতে থেকে)

অবনীশ : রহমত, বড় হলে এই মিনিকে আর এখনকার মতো পাবে? মিনি এই কাবুলিওয়ালা রহমত তো খুব বড় , তুমিও বড় হয়ে ওকে মনে রেখো। আচ্ছা মিনি তোমার তো একবার শুনলেই মনে থাকে। বড় হওয়া নিয়ে রবিঠাকুরের কোন লাইনটা শুনিয়েছিলাম।

মিনি : রবি ঠাকুর– অনেক লাইন... তবে এখন যেটা মনে পড়ছে তা তোমার আর মা-র পছন্দ হবে না।- সবটাতেই মানা করা বড়দের ধর্ম। কাবুলিওয়ালা তুমি আমায় মানা করবে না। বাবাও না, তুমিও না- করবে না। মানা করবে না। (নেপথ্যে রবীন্দ্রনাথের গান বাজছে) 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'—

।। দ্বিতীয় প্রেক্ষন ।।

(আগে দেখানো অবনীশের পড়া/লেখার ঘর - তমালিকা স্কুলে যাবার প্রস্তুতি শেষে প্রৌঢ়া চারুদিকে ডাকে)

তমা : চারুদি, চারুদি-

(রান্নারতা চারুদি খুন্তি হাতে নিয়েই ছুটে আসে)

চারু : বল বৌদি-

তমা : মিনির স্কুল কিন্তু আজ বন্ধ। একটু দেখে রেখো।

চারু : (হেসে) ইস্কুল যে বন্ধ তা পরশুই আমায় জানিয়ে রেখেছে মিনি।

তমা : আরে! এলাকার সব স্কুল স্যানিটাইজ করা হবে- তাই বন্ধ। নোটিশ তো দিল গতকাল, মঙ্গলবার। মিনি জানল, আর তোমায় জানালো পরশু?

চারু : (হাসতে থাকে) মিনির স্কুলের প্রিন্সিপালের ভাইয়ের ছোট মেয়ের সঙ্গে নাকি মিনির খুব ভাব। সেই নাকি মিনিকে পরশুই একটা চকলেট খাইয়ে ফিস ফিস করে বলেছে বুধবার ইস্কুল বন্ধ থাকবে আর ওই দিন বেলা ১১টায় (হাসি) প্রিন্সিপালের মেয়েকে নাকি দেখতে আসবে (হাসে)

তমা : (রাগ দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলে) মিনিকে নিয়ে আর পারা যায় না চারুদি। একটু দেখে রেখো... হ্যাঁ আর দেখো ওই যে ইয়া লম্বা জোব্বা পড়া মিনির নতুন বন্ধু ওই যে কাবুলিওয়ালা, যেন চট করে ঘরের ভেতরে ঢুকে না পড়ে।

চারু : না, না দাদা না থাকলে... দাদা না বললে ও ভিতরে ঢুকবেই না। যে তিনবার ঘরে ঢুকে মিনির সঙ্গে বকবক করেছে, তিনবারই দাদা বলার পরেই ঢুকেছে।

তমা : জানি। আসলে চারুদি এত খারাপ সময় পড়েছে কি বলবো! তোমার দাদার তো হুশ কম... একটু দেখে রেখো।—যাই। দরজাটা দিয়ে দাও।

চারু : ঠিক আছে বৌদি, তরকারি এতক্ষণে হয়ে গেছে। দাদা খেয়ে যাবে (হাসিমুখে দরজা দিয়ে দেয়) (চারু চলে যেতে যায়। মিনি সন্তর্পনে ঢোকে)

মিনি : পিসি, বাবা কোথায় গো? বাব্বারে কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছি, মা যায়ই না, যায়ই না... শুধু caution শুধু precaution মা ঘরটাকে স্কুল বানিয়ে ফেলেছে। বাবা কই গো?

চারু : লেখা কাগজপত্র জেরক্স করতে গেছে। ঘরের মেশিনটা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, আসবে এক্ষুনি, তারপর খেয়েদেয়ে তো দাদা কলেজে যাবে। যাই রান্নাঘরে তরকারিটা নামাতে হবে মিনি,

মিনি : তরকারি নামাবার আগে আমাকে ওই তাকের উপর থেকে ম্যাপ পয়েংন্টিং-এর লাঠিটা নামিয়ে দিয়ে যাও তো!

চারু : কি হবে ওই লাঠি?

মিনি : পড়া ধরব, না পাড়লে... লাঠিটা নামিয়ে দাও, পড়া ধরবো।

চারু : কার?

মিনি : (হেসে ফেলে) জানিনা বাবা আসুক!
(চারু তাকের ওপর থেকে ছোট লাঠিটা নামিয়ে দেয়)
(অবনীশ একরাশ কাগজ হাতে নিয়ে ঢোকে) এইতো বাবা এসে গেছে। এবার তুমি তরকারি নামাও পিসি। (চারু হেসে ভিতরে যায়)

অবনী : (টেবিলের ওপর কাগজ রাখতে রাখতে) চারুদি দু'টোয় বেরোব কিন্তু তার আগে রান্না যেন—

চারু : শেষ হয়ে যাবে এক্ষুনি দাদা। (ভিতরে)

মিনি : বাবা, মা বেরিয়ে গেল মানে সাড়ে দশটা বেজে গেল!

অবনী : (টেবিলের কাগজ বাছতে বাছেতে) হ্যাঁ, পৌনে এগারোটা বাজে... তো হাতে লাঠি কেন? ম্যাপ খুলে আমায় কিছু দেখাবে?

মিনি : (হোসে) না পড়া ধরবো, না পারলেই এটা দিয়ে মারবো।

অবনী : কাকে?

মিনি : (বাবার কোলের কাছে এসে) আমার স্টুডেন্টকে আজ পড়া ধরবো বলেছি।

কাবুলি : (কাবুলিওয়ালা জানালায় এসে দাঁড়ায়) খোঁকি—

মিনি : এই তো এসে গেছে আমার স্টুডেন্ট। বাবা খুলে দাও

অবনী : (হেসে) মিনি, এখন সব কাজ ফেলে তোমার স্টুডেন্ট হাজির। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ক্লাস নিয়ে নাও। রহমতের বিক্রিবাট্টা আছে। আমাকেও কাগজপত্র গুছিয়ে কলেজে যেতে হবে। দু মিনিট (দরজা খুলে টেবিলে ব্যস্ত হয়)

রহমত : খোঁকি

মিনি : sit down বসো don't stand up! বসো আগে পড়া দাও। বসো। রহমত বসে এবং তার ঝোলাটা পাশে রাখে)

রহমত : খোঁকি (হাসি) কুছু লাগবে?

মিনি : আরিব্বাবা, আজ তোমার ঝোলায় অনেক কিছু আছে! অতবড় ঝোলায় কি আছে গো?

রহমত : (হাঁথি)

মিনি : দূ-র। বাবা, ও হাতি বলতে পারে না, বলে 'হাঁথি' (হাসে) বাবা ঠিকমতো প্রোনানসিয়েশন পারেনা।

রহমত : হামি কুছু পারি না খোঁকি!

মিনি : (ধমক দিয়ে) খোঁকি না , আমি একটা টিচার। now ইউ আর মাই স্টুডেন্ট, ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট। বাধ্য ছাত্রের মতো বসে শোনো। ব্যাগে কোন হাতি থাকে না... থাকতে পারে না। বোকা স্টুডেন্ট। আর হাঁথি হয় না। হবে 'হাতি'। এলিফ্যান্ট দেখেছো তো? লাঠি রেডী।
(রহমত হো হো করে হাসতে থাকে)

অবনী : (টেবিলের কাছ থেকে কাগজ গোছাতে গোছাতে)মিনি তোমার স্টুডেন্টকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও। ওর ব্যাগ ভর্তি সওদা...বেঁচতে হবে ঘুরে ঘুরে, ছেড়ে দাও।

মিনি : পড়া দিলেই ছেড়ে দেবো বাবা।এই যে, হা হা করে বোকার মতো হাসবে না... রাইমটা মুখস্ত করেছো? গত সপ্তাহে শেখালাম যেটা.. বলো বলো

রহমত : ক্যায়া বোলনে হোগা? কি বলবো?

মিনি : আরে রাইম রাইম। গত সপ্তাহে যা শেখালাম, ধুসস! এক্কেবারে বোকা। আচ্ছা আবার বলছি শোনো— Ba ba Black ship / Have you any wool?
Yes sir, Yes sir three bags full.
বলো Ba ba

রহমত : (বসে হাসতে হাসতে চেষ্টা করে) ব্যা ব্যা ব্যা ব্যা

মিনি : (চেঁচায়) না, এইবার লাঠি ছাড়া Black ship -এর গা থেকে উল বেরোবে

না— (লাঠিটা তুলে) হাত পাতো হাত পাতো, পাতো

রহমত : (হাসতে হাসতে দুটো হাত এগিয়ে দেয়)। ব্যা ব্যা হাথে মারো- হাথে মারো... (হাসতে থাকে) (ছুটে আসে অবনীশ)

অবনীশ: (হেসে) ওকে ওর সওদা বিক্রি করতে হবে মিনি... ছেড়ে দাও। মিনি—

মিনি : ঠিক আছে যাও। পরের সপ্তাহে কিন্তু লাঠিটা রেডি থাকবে। (লাঠিটা রাখতে যায় র‍্যাকে) (রহমত উঠে দাঁড়ায়, এক প্যাকেট আখরোট অবনীশকে হাত বাড়িয়ে দেয়)

রহমত : এটা খোঁকির জন্য! লিন বাবুসাব লিন।

অবনীশ: না, না আছে, আগের বারেরটাই তো শেষ হয়নি। (ছুটে আসে মিনি)

মিনি : নাগো, শেষ হয়ে গেছে! বারে! মা প্যাকেটটা নিয়ে সব্বাইকে নিয়ে শেয়ার করে খাওয়ার জন্যই দিয়েছিল। টিফিনে খেয়েছি, ক্লাসমেটদের দিয়েছি। very good. দাও। (নিয়ে নেয়)
(এক বুক তৃপ্তি নিয়ে কাবুলিওয়ালা উঠে দাঁড়ায়)

রহমত : বহুত খুব, বহুত খুব! খোঁকি ফির মিলেগা।
(অবনীশ হাসতে হাসতে টাকা এগিয়ে দেয়)

অবনীশ: এটা নাও রহমত।

রহমত : মাফি মাঙছি বাবু। এটা লিতে পারব না।
(ছুটে আসে চারু)

চারু : কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা দিদি বলে গেছে তুমি সেদিন যে রান্নার মসলা বিক্রি করেছিলে সেগুলো খুব খুব ভালো ছিল। পরের দিন আবার এনো। দিদি কিন্তু আমায় বলে গেছে। (প্রস্থান)

অবনীশ: ও তাহলে তো তুমি আমাদের হেঁসেলেও ঢুকে গেছো রহমত।

রহমত : (হেসে) না মাইজিকে আমার সালাম দিবেন বাবু! আনবো, পরদিন লিয়ে আসবো, মসল্লা...(মিনি দ্রুত একটা কাগজে হিজিবিজি কাটে)

মিনি : তার আগে হোম টাস্ক। এই যে এতক্ষণ ধরে লিখে দিলাম। এগুলি সব লিখে নিয়ে আসবে কিন্তু। হোম টাস্ক! দেখার পর পড়া ধরবো। না পারলে কিন্তু সেদিন এই লাঠি কারোর কথা শুনবে না, হ্যাঁ! বলে দিলাম।

রহমত : (যেতে যেতে থেমে যায়, হাসতে হাসেতে)হামি এই দিনটায় চলে আসবো খোঁকি।

অবনীশ: না না পরের সপ্তাহে বুধবার ওর স্কুল থাকবে। তুমি ছুটির দিন এসো।

মিনি : হ্যাঁ কাবুলিওয়ালা, আমি পড়া ফাঁকি দিই না। তুমিও পড়া ফাঁকি দেবে না। আমি কিন্তু স্কুলে যাবো।

রহমত : খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে। (হাসে)

মিনি : পড়া না পারলে তোমায় পাঠিয়ে দেবো শ্বশুরবাড়ি। আমি পড়া না পারলে আমাকেও শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হয়— হবে। খু-ব কড়া নিয়ম! হ্যাঁ-
(রহমত জোরে হেসে ওঠে)

রহমত : হামি শ্বশুরকে মারবে... জোরে জোরে মারবে খোঁকি। মিনিকে কোলে তুলে নেয় রহমত। (হাসতে থাকে অবনীশও) মিনি হাতের লাঠি দিয়ে হাসতে হাসেতে রহমতের পিঠে আঘাত করে (রহমতের হাসি বাড়তে থাকে)
(নেপথ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত (পুরুষ কণ্ঠে)। আরো আরও, প্রভু আরও/ এমনি করে/ এমনি করে আমায় মারো

(অন্ধকার)

।। তৃতীয় প্রেক্ষন ।।

তমালি : (ফোন ধরে) আমি বাজার ক্রস করে যে মাঠটা তার সামনে... তোমার আসতে দেরি হবে? না, না আনন্দ নিকেতনের মিটিং আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে কিন্তু। একটু পা চালিয়ে এসো। মিনির নাম প্রথমদিকেই আছে। না, না, দেরি নেই। দেখো লেট না হয় যেন। আমি ওয়েট করছি। বাজার ছাড়িয়ে মাঠের সামনে বটগাছটার সামনে। মাঠ পেরুলেই স্কুল। এসো।
(অন্যদিকে বাজারের রাস্তায় রহমত কাউকে দেখতে পেয়ে ডাকছে। রহমত তার ঝোলা নিয়ে হাঁক দিতে দিতে যাচ্ছিল। দূর থেকে কাকে যেন দেখতে পায়। লোকটাকে জোরে জোরে ডাকে।)

রহমত : হেই বাবু, হেই বাবু, পালাবেন না। হেই বাবু—

লোকটা: (উগ্রভাবে এসে দাঁড়ায়) কি হলো? অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? বলো কি বলবে?

রহমত : কেয়া বলেগা? মেরা রুপাইয়া কাঁহা?

লোকটা: ও টাকা! ভারি তো পাঁচ হাজার টাকা... আমি আগামী মাসে দিয়ে দেব। এভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমায় বাজারের সামনে ডাকবে না কিন্তু। আমি পুলীন বসাক, বাপ সনাতন বসাক। এই অঞ্চলে বসাক বাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে। বলছি তো দিয়ে দেবো। আগামী মাসে আমার ছেলে কাজে জয়েন করছে, জয়েনিং-এর আগে এক মাসের মাইনা এডভান্স পাবে, তখন দিয়ে দেবো! হোলো?

রহমত : কাভি নেহি! আজিব বাত। দোসাল কাটিয়ে গেল পাঁচ হাজার উধার নিয়েছেন। একই বাত বলে চলেছেন। আগলা মাহিনা... দো বরস খতম হয়ে গিল। নেহি,

আজই দেনা হোগা। (হাত চেপে ধরে) দেনা হোগা। (দু চারজন লোক জড়ো হয়েছে।)

জনৈক পথচারী : কি হয়েছে মশাই?

লোকটা: আরে আমি বসাক বাড়ির ছেলে পুলীন। দুই ভাই একসঙ্গে থাকি না, তবু সবাই চেনে আমার দাদাকে। আমার দাদা রথীন বসাক। অত বড় কাপড়ের দোকান, বসাক ক্লোদিং স্টোর— মাছ বাজারের পাশে । ঠেকায় পড়ে কিছু টাকা এই কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম। বলেছি সুদ সমেত দিয়ে দেব। আর এখন হাত চেপে কিভাবে ধরেছে দেখুন।

রহমত : নেহি। রুপিয়া কা লিয়ে নেহি, কিউ তুম ঝুট বোলা?

পুলীন : কি, কি ঝুট বলেছি?

রহমত : তোমহারা বড়া ভাই কা দুকান কা বগলমে তুম রুপাইয়া লিয়া। দো মাহিনা বাদ ভাইকো বোলা তুম সব বাপস দে দিয়া। কিউ ঝুট বোলা, কিউ?

পুলীন : দেখুন, দেখুন একটা সুদখোর বেজন্মা বেজাত... এদেশে এখনো এদের রোয়াব দেখেছেন!— ওরে এদেশে মাথা নীচু করে থাকবি। হাত ছাড় (জনগণের উদ্দেশ্যে) পিছনে সবাই দেখছেন তো, মা শীতলার মন্দির।

জনৈক : ঠিক আছে ওর দাদাকে তো চেনো। দিয়ে দেবে, দিয়ে দেবে।

রহমত : নেহি, উয়ো হর রোজ ঝুট বোলতা ...

পুলীন : খানের বাচ্চা, যা খুশি তাই বলছে। বলছি তো দিয়ে দেবো। দেখুন, দেখুন তবু হাত ছাড়ছে না বজ্জাতটা।

আরেকজন : ছোড় দাও, ভাই, ছোড় দাও। বলছে তো—

রহমত : নেহি, তুমহারা ভাইকা দুকান মে চলো চলো, উয়ো তুমহারা মাফিক নেহি আছে, (টানতে থাকে) উসকো তুম ঝুট বোলা কিঁউ? চলিয়ে।

পুলীন : আপনারা দেখছেন তো? একটা বেজাত খানের বাচ্চা বাজারের শীতলা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য কিছু টাকার জন্য—

রহমত : নেহি, হামি পাঠান। ঝুট কভি নেহি বোলতা। আফগানগা কাবুলি ঝুট নেহি বোলতা।

জনৈক : (খবরের কাগজ হাতে এগিয়ে আসে) অ্যাঁ কাবুলি? মানে fresh from kabul? এইতো আজই কাগজে খবর করেছে আফগানিস্তানের ঘটনা, ছবিও দিয়েছে। আফগানিস্তানের তালিবানদের কীর্তি। এই তো দেখুন! নিষেধ অমান্য করে কাবুলে একটা মেয়েদের হাইস্কুলের সামনে হঠাৎ তালিবান মৌলবাদীরা মেয়েদের আক্রমণ করেছে, ধরে নিয়ে রেপ করেছে— ছবি দিয়েছে, দেখুন—

রহমত : (হাত না ছেড়েই বজ্রাহত হয়) কেয়া বোলা? ক্যায়া লিখা?

জনৈক : দেখ না কাগজটা, দেখ। তোমাদের মুলুকে এখন কি চলছে দেখ। তারপর ওকে ধরো।

পুলীন : আরে কি দেখবে ও ? - কি দেখবে ? যা হবার তাই হচ্ছে... কমিউনালদের সঙ্গে উগ্রবাদী আরো বড় কমিউনালদের সংঘর্ষ ! ওরে হাত ছাড়, ছাড়... হাত ছেড়ে দেখ খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, তুই সুদের জন্য ছটফট করছিস, ওদিকে রেপ করা হচ্ছে তোর বউ আর মেয়েকে। ওই ছবির মধ্যে নিশ্চয়ই তোর বউ আর মেয়েটাও আছে ! আছে আছে। ঐ তো মেয়ে আর বৌ।

রহমত : (রহমত রাগ সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে 'নেহি' বলে ঝোলা থেকে ছুরিটা বার করে পুলীনের বুকে বসিয়ে দেয়) নেহি, নেহি, কভি নেহি

পুলীন : (চেঁচিয়ে আর্তনাদ) মেরে ফেললো...মেরে ফেললো...(পড়ে যায়)
(সমবেত লোকজনদের ভীড় ও রহমতকে মারার চেষ্টার মধ্যে পুলিশ ইন্সপেক্টর রজত মুখার্জি ছুটে আসে পুলিশ সহ) সব্বাইকে সরিয়ে দুই পুলিশ ও এক ইন্সপেক্টর রহমতকে ধরে।

রজত : ওকে ছেড়ে দাও। এখানে মার্ডার হয়ে গেছে মনে হয়... সরুন... সরুন... এই থানায় চলো। আমি রজত মুখার্জি এখানকার থানার সেকেন্ড অফিসার। চলো...

সমবেত ২-৩জন : লোকটা খুনি ! জল্লাদ ! সামান্য কিছু টাকার জন্য বেজাত সুদখোরটা ... না, না, ওকে কিছুতেই জ্যান্ত ফিরে যেতে দেবো না।

রহমত : নেহি। ভুল বলছে, গলত বলছে বাবু। উয়ো পেপার মে হামারা লেড়কি নেহি আছে- ভুল দেখাচ্ছে বাবু।

রজত : (কনস্টেবলকে) ওকে নিয়ে চলো। এখানে টেনশন বাড়ছে। থানায় গিয়ে যা হবার হবে, আপনারাও সাক্ষী হিসেবে যারা পারবেন আসবেন প্লিজ।
(ছুটে আসেন অবনীশ ও তমালিকা)

অবনীশ : কি হয়েছে ? আমরা মিনি মানে মেয়ের স্কুলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এখানে ওকে দেখে... কি হয়েছে ?

রজত : ওকে চেনেন ?

অবনীশ : হ্যাঁ, ও তো রহমত। কাবুলিওয়ালা। আমাদের বাড়িতে সওদা বিক্রি করতে যায়।

তমালিকা : ভালো করেই চিনি ওকে। ও কিন্তু ...

রজত : এইমাত্র লোকটা এক পাওনাদারকে খুন করেছে। ঘটনাচক্রে যে খুন হয়েছে যার হাতে খুন হয়েছে তাই নিয়ে একটা ভয়ংকর কমিউনাল টেনশন। না এখন এখানে আর থাকা যাবে না। ও আপনারা ? মানে পরিচয়টা—

অবনীশ : আমি অবনীশ রায় স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করি।

তমালিকা : আমি তমালিকা, ওর স্ত্রী, গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা।

রহমত : আমি কিছু গুনাহ্ করিনি বাবুজি, কুছ নেহি কিয়া মাইজি। কুছ নেহি কিয়া বাবুজি।

বহত দিন ধরে দো বরস কা উধার মাঙছিলাম, হঠাৎ কাগজ দেখালো... বল্ল হামার বিবি ওউর বেটি নাকি... ঝুট... ঝুট.. (কাঁদতে থাকে)

অবনীশ : হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকের কাগজে একটা কাবুলের স্কুল যাবার রাস্তার ছবি বেরিয়েছে বটে, কিন্তু ওটা তো কাবুলের... তোমাদের বাড়ি তো বলেছো পেশোয়ার। তাহলে... কি করে ওই ছবিতে... একটু বিবেচনা না করে অতটা উত্তেজিত হয়ে কেন পড়লে রহমত?

রহমত : (কাঁদে) বারবার হামার বেটির নামে বলছিল।

ইন্সপেক্টর: আপনারা সন্ধ্যের মধ্যে একবার থানায় আসবেন প্লিজ। রক্তপাত, মানে possibly marder হয়েছে তো ... দাঙ্গা লাগার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। ওকে তো আজ থানায় ইন্টারোগেট করতে হবে। কাল কোর্টে পেশ করবো। আসবেন থানায় একবার প্লিজ।

রহমত : আমি পাঠান। ঝুট নেহি বোলতা, নেহি...নেহি...। খোঁকিকে বলবেন না মাইজি, দুখ পাবে, ভুল ভাববে। খোঁকিকে বলবেন না সাহাব... (পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে চলে যায়)

অবনীশ : চলো। কি যে হয়ে গেলো? রহমত কিন্তু কোন ঝগড়া করার লোক না।

তমালিকা: সত্যি এমন একটা পরিস্থিতি... যাক গে... সন্ধ্যায় একবার দুজনে মিলে থানায় যাব। ওদের ফ্যামিলির অবস্থা আমায় যা বলেছে, খুবই ট্র্যাজিক অবস্থা ওর ঠিকমত খোঁজখবর নিতে পারছে না অথচ... ঠিক আছে চলো। আগে মিনির স্কুলের দিকে এগুই।

অবনীশ : তমালিকা, কাল রাতেই তোমায় বলেছিলাম, আফগান লেখক খালেদ হোসেইনির একটা দুনিয়া কাঁপানো উপন্যাসের কথা The kite Runner ঘুড়ি ওড়ার ফেস্টিভ্যাল ... ও কাবুলে যা চলেছে, ভাবা যায় না। পড়ে দেখো, কাবুলিওয়ালার ট্র্যাজেডিটা আরো বুঝতে পারবে।

অবনীশ : বুঝি খানিকটা। মৌলবাদ কি ভয়ঙ্কর জিনিস রহমতকে নিয়ে তো এখানেও স্পষ্ট হয়ে গেল। চলো মিনির স্কুলের সময় প্রায় হয়ে গেল। শোন, মিনিকে কিন্তু এখন এসব বলা যাবে না। শুধু বলবো, মনে হয় কাবুলিওয়ালা হঠাৎ সুযোগ পেয়েই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। যা পরিস্থিতি,- বোঝাই যাচ্ছে, সহজে ছাড়া পাবে না; মার্ডার কেস... বহু বছর জেল খাটতে হবে।

তমালিকা: আর কি বলা যায় মিনিকে? (বিষন্ন) মিনির এত বড় স্কুলে ভর্তির খবরটাও দেওয়া গেল না রহমতকে। শোনো, বিকেলে কিন্তু দুজন মিলেই থানায় যাব। যা যা ওর হয়ে করতে পারি, বলতে পারি, বলব, করব।

অবনীশ : হ্যাঁ, রহমত যেন বোঝে, আমরা ওর সঙ্গে আছি। আর কি করতে পারি বল।

(বেদনার্থ হতাশায়)

তমালিকা : (বিষাদে) দেখো ছোট্ট মিনিকে সবটা জানালে, মিনি সবটা শুনলে, যা কান্নাকাটি করতো, তুমি আমি অনেক বড় হয়েও দুঃখে তাই কিন্তু করছি, খানিকটা হলেও তাই নিঃশব্দে করছি।

অবনীশ : তমালিকা, কি coincidence দেখো! (মলিন হাসি) আজই ক্লাসে পড়িয়ে এলাম শক্তি চ্যাটুজ্জের লাইন, "আসলে কেউ বড়ো হয় না, বড়োর মতো দেখায়!" (নেপথ্যে মিনির গলা- "কাবুলিওয়ালা! ও কাবুলিওয়ালা...)

(অন্ধকার)

(অবনীশদের বাড়ির বারান্দা। স্কুল ফেরৎ মিনি ও চারু)

মিনি : জানো, জানো পিসি, স্কুলে গিয়েই আমি টিচারদের আজ চমকে দিয়েছি। (হাসতে থাকে) ম্যামকে বললাম, আচ্ছা বলতো ম্যাম, যদি ভগবতী দুগ্গার দশটা মুখ হয়, তবে ভগবানের মুখ কটা?

চারু : (হেসে) সব শুনব। আগে যাও স্কুলের পোষাকটা ছেড়ে নাও। ব্যগট্যাগ টেবিলে রাখো, তা-র-প-র সব শুনবো।

মিনি : (হেসে ভেতরে যেতে গিয়ে) বাবা কই গো পিসি? আজ সামনে এল না তো—

চারু : একটা জরুরী কাজে বাজারে গেছে। ওই জেরক্স করাতে... তাই বাজারে ... এক্ষুনি চলে আসবে। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেলো (হাসে)।

মিনি : (যেতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়) কি আর বলব? (মাথায় হাত দেয়) ভেবেছিলাম এই প্রশ্নটা ম্যাম পারবে না কিন্তু জানো পিসি পারলো, বুঝলাম খুব easy প্রশ্ন!

(Xerox করা বেশ কিছু কাগজ নিয়ে অবনীশ ঘরে ঢোকে। মিনির শেষ কথাগুলো শুনে নিয়েছে অবনীশ)

অবনীশ : কি পারলো ম্যাম (হোসে)

মিনি : (উৎসাহে) ভগবতীর দশটা মুখ, ভগবানের চার মুখ। কি কি? পারলো ম্যাম। (হাসি)

অবনীশ : (টেবিলে কাগজগুলো রাখে) কি কি বলো, বলেই পোষাক টোশাক ছেড়ে চান-টান শেষ করবে! মা কিন্তু এক্ষুনি চলে আসবে। এসে যদি দেখে ...(মাথা নিচু করে কাগজ গোছাচ্ছে)

মিনি : যাচ্ছি বাবা। - শোনো ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব মহেশ্বর। বলো very good ...

অবনীশ : (মুখ তুলে হেসে) very good মিনি।

(মিনি ভেতরে যেতে গেলেই তমালিকা ঢোকে)

তমালিকা : এখনো চান হয়নি, school uniform এখনো ছাড়া হয়নি? যাও, যাও এখন আর পাগলামি নয় (হেসে) no more বাজে কথা!-

মিনি : (মুখ ঘুরিয়ে) বাবা, পাগলামি বলছে! সেদিন 'খাপছাড়া' কবিতাটা আমায় মুখস্ত করালে ওই যে "নিশ্চিন্ত জেনো তবে,/ একটাতে হো-হো রবে,/পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছসিয়া/তাই তারি ধাক্কায়/ বাজে কথা পাক খায়/ আওড় পাকাতে যাবে মগজেতে আসিয়া। (বাবা-মা দুজনই হেসে ওঠে) (যেতে গিয়ে হঠাৎ মাকে) মা এক মিনিট। আজ কিন্তু খবরটা আনবে বলেছিলে।

তমালিকা : কি?

মিনি : কাবুলিওয়ালা কবে আসবে? তুমি, যেখানে কাবুলিওয়ালা থাকে সেই নাখোদা মসজিদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়েছ? এতদিন তো, কাবুলিওয়ালা absent হয় না! ওর home task আর পড়া এক মাসেও রেডি হয়নি। কি হলো মা? কথা বল—

তমালিকা : (ব্যস্ত অবনীশের দিকে একবার তাকায়) হ্যাঁ মিনি, সব খবর নিয়েছি, সব খবরই পেয়েছি। সত্যিটা বলি। রহমত বাড়ির সব্বাইকে দেখতে বহুদিন পর সুযোগ পেয়েই অনেক দিনের জন্যই দেশে চলে গেছে। আমাদেরকে কিছু বলে যেতে পারেনি! এলে বকে দিও। শাস্তি দিও।

অবনীশ : হ্যাঁ এলে কঠিন শাস্তি দিও, এখন ইউনিফর্ম বদলে চান, খাওয়া দাওয়া... মিনি...

মিনি : (মাথায় হাত) ও চলে গেছে! হ্যাঁ, আসুক একবার কাবুলিওয়ালা! আমার পাগলামি কি করতে পারে বুঝিয়ে দেবো মা! (কেঁদে ফেলে) এক মাস ধরে আমায় ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ পগারপার... এলো না... ফেব্রুয়ারি মাস চলেই গেল... মার্চও চলে যায় মা (কাঁদে) গান ("চলে যায়, চলে যায়, মরি হায়")

অন্ধকার

বিরতি

বিরতি উত্তর দৃশ্য ১

(জেলখানায় রহমত। দীর্ঘ কারাবাসের ছাপ হঠাৎ মলিন বার্ধক্য পীড়িত চেহারায়, জেলখানার পোশাকে, সহবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রথমে সহবন্দীদের প্রভাতী আড্ডা পরে রহমত প্রবেশ করবে)

সহবন্দী ১ : কাল রাতে হিসেব কষে দেখছিলাম, আমায় আরো বছর দশেক থাকতে হবে (করুণ হাসি) বেরিয়েই বা কি করব, বেরিয়ে কোথায় যাবো গণেশ?

সহবন্দী ২ : (গণেশ) ভাবিস না মনসুর। বছর দুয়েকের মধ্যেই আমার ছাড়া পাবার কথা,- তবে আমার উপর ভরসা রাখিস! আবার এখানে ফিরে আসবো, (হাসি) চেনা জেল! চেনা interval (আশপাশের সবাই হেসে ওঠে)

সহবন্দী ৩ : হ্যাঁ, আমরা কি রহমতের মতো ভাগ্যবান? প্রথমেই জেলের মধেও বাগান করার কাজ। (হাসি) মুখ বুজে পরিশ্রম করে কত ফুল ফোটালো ভেবে দেখ।

জেলে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে।

সহবন্দী ৪ : হ্যাঁ ওর তো ডেরায় মানে জেলের বাইরে কেউ নেই, যাদের দেখে আবার মন খারাপ হবে কিছুক্ষণ আমাদের মতো,- তেমন কেউ নেই!- তাই কাজে ফাঁকি নেই। কারুর সঙ্গে কথা না বলে কোন কিছুর জন্য আফসোস হাহাকার না তুলে এক মনে খেটে যায়। রহমত কাবুলিওয়ালার ভাগ্যটা দেখেছিস, —

সহবন্দী ১ : (হাসে) হ্যাঁ এমনি ওর খাটনির জোর, খাটনির টান যে আমাদের এতজন লোকের মাঝেমধ্যেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ঠাট্টা তামাশা কিচ্ছু গায়েই মাখে না! (হাসি) আরে মহাবীর ছুটে আসছে কেন? (ছুটে আসে পাঁচ নম্বর বন্দি)

মহাবীর : গেছে (হাসি) ফুল দেখে, বাগান দেখে, একনাগাড়ে মুখ বুজে পরিশ্রম করা দেখে, জেলের সাব ওকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিল...কোয়ার্টারে দুটো ডিউটি... বাগান করা আর জেলার সাহেবের চঞ্চল বাচ্চা ছেলেটাকে একটু দেখাশুনা করা...

১২৩৪ : ভালোই তো চলছিল সব!

মহাবীর : আর ভালো! খবর পেয়ে গেছি, (হাসি) জেলারের বাচ্চাটার হাতের একটা সোনার আংটি কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জেলার সাহেবের বউ সন্দেহ করছে, রহমতই লুকিয়ে কোথায় রেখেছে।

১২৩৪ : (সোল্লাসে) বাহ ফিরে এসো চাঁদু! আমাদের বাদ দিয়ে একা একা! জেলার সাহেবের পেয়ার/ কেয়া হুঁয়া... আভি তুর ক্যায়া হুঁয়া?

গনেশ : অ্যাই, অ্যাই, চুপ। রহমত আসছে...এবার আমাদের সঙ্গেই দৈনিক ৫-৬ ঘন্টা গতরখাটা ... ফিরে এসো চাঁদু!
(রহমত মাথা নিচু করে ঢোকে সঙ্গে ওয়ার্ডেন)

ওয়ার্ডেন : (কড়া গলায়) রহমত, অনেকবার বলা হয়েছে তাই শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি,- স্যারের কোয়ার্টারের বাগান করা, চারপাশ দেখাশোনার সুযোগ নিয়ে ফ্যামিলির সবার যে বিশ্বাস অর্জন করেছিলে তাকে এইভাবে... ছি- ছি - ছি! বাচ্চা ছেলেটার একটা আংটির জন্য!- রহমত, দিয়ে দাও, তুমি জনো আমরাও তোমাকে সব্বাই ভালবাসতাম... ওটা দিয়ে দাও... আমি স্যারকে বলে...

রহমত : হামি কুছু নেইনি বাবু... ফির বলছি... হাজার বার বলবো... উও বাচ্চাকে হামি পেয়ার করি... বাগানে খেলি, ও গান শোনায়, শুনি, ওতো মেহনতে ফোটানো ফুল নষ্ট করতে গেলেই আমি মুখ বাড়ায়ে বলি, মারো হামায় মারো খোকাবাবু... ফুলকো মত মারো... বাচ্চাটা হামার কথা শুনে, হাসে। হামি ওর আংটি লিবো? কিউ লিবো? কিউ? (বেদনাহত গলায় মাতা নিচু করে)

ওয়ার্ডেন : একটু নীরব থেকে) হুম, তাহলে আমার আর কিছু করার নেই রহমত। অ্যাই, তোমাদের সঙ্গে একসাথে আজ থেকে রহমতও ম্যানুয়াল লেবার দেবে বুঝলে? (যেতে চায়, ফিরে এসে) রহমত, যে কোন কারণেই হোক, একটা ভুল করে

ফেলেছে!- ওর সাথে কোনরকম দুর্ব্যবহার যেন না হয়, বলে গেলাম। (চলে যায় ওয়ার্ডেন)

সব্বাই : আও রহমত, বাপস আও (সবাই হাসতে থাকে)
রহমত কথা বলে না। মাথা নিচু করে থাকে।

মনসুর : (সামনে গিয়ে) কোথায় রাখলি বলতো আংটিটা? এইতো জেলের পোষাক এর মধ্যে কোথাও রাখলি?

৩ নম্বর : আরে বডির মধ্যেই লুকিয়ে রাখার গোপন জায়গা আছে জানিস না? (সব্বাই হাসে) জেনানা হলে হার লুকিয়ে ফেলে ব্যাটা ছেলে হলে ছোট্ট আংটি (অশ্লীল ইঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে)

রহমত : (চেঁচায়) নেহি জরুর গলতি হচ্ছে। উও বাচ্চা ভি বলছে বাগানে কোথায় পড়ে গেছে উসকো মালুম নেহি, ও বাচ্চা ভি বহুত পেয়ার করে... উও কভি ঝুট বাত বলবে না!... লেকিন ম্যাডাম আমার গলতি ভাবলেন! হামার কাছে নাই, কোথ্থাও নাই... তুম সব হামারা ন'বরস কা দোস্ত.. ন'বরস অউর তিন বরস ম্যায় ইধার রহেগা... কিউ লিবো? ঝুট বলব কিউ? (প্রায় কেঁদে ফেলে)
(বাকিরা রসিকতা থামিয়ে সহানুভূতিশীল হয়)

এক : চল ভাই দেরি হয়ে যাচ্ছে... কোদাল দিয়ে প্রায় হাফ বিঘা জমি কোপাতে হবে। এখন তো রোদ্দুর বড় ভয়ংকর! চলো ভাই রহমত, চলো... ন'টা বাজে, একঘন্টা কোপানোর পর লবসি পাব চলো...

রহমত : (চোখ মুছে) চলিয়ে ভাই, কোদাল কাঁহা? চলিয়ে। (ওরা এগুতে যায়)

ওয়ার্ডেন : দাঁড়াও! দাঁড়াও রহমত। জেলার সাব সাত সকালে হঠাৎ অফিসে চলে এসেছেন, সঙ্গে ম্যাডামও আছেন। তোমায় তাঁর চেম্বারে ডাকছেন, চলো, আগে চলো, আমি বলে আসি, রহমত এক্ষুনি আসছে... জলদি (চলে যায়)
রহমত থমকে দাঁড়ায়

রহমাত : ফির ক্যায়া হুয়া?

সববন্দীরা: যাও ভাই হয়তো কোদাল বেলচা নয়, রহমত ভাই হয়তো আরো বড় শাস্তি... ম্যাডাম যা শুনেছি, খুবই হিসেবী, খুবই কড়া...

বিরতি উত্তর দৃশ্য ২

(জেলার সাহেবের অফিস চেম্বার। দুটো চেয়ারে জেলার সাহেব ও তার স্ত্রী বসে আছেন)

জেলার : আমি বার বার তোমায় বুঝিয়েছি,- পর্ণা ভুল হচ্ছে, নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে, বাপিকে রহমত ভীষণ ভালোবাসে... আমাদের ১০-১১ বছরের বাপি আমাদের যতটা ভালবাসে, বিশ্বাস করে, রহমতকে এর মধ্যেই তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। তবু তুমি বারবার একই কথা বলেছ।

পর্ণা : (বিষন্ন গলায়) কি করব! বাপি বললো বাগানে যখন খেলছে তখনও ওর হাতে আংটি ছিল... তারপর কোথায় যে গেল... আমি কি করবো... এখন হঠাৎ যখন... (রহমত ঢোকে)

রহমত : সালাম সাব, সালাম মাইজি! বিসওয়াস করুন হামার কুছু কসুর নাই।...

জেলার : রহমত, তোমর জন্য এই ঘরে একটা টুল আনিয়ে রেখেছি। ওটায় বোসো। (রহমত বিড়ম্বিত বোধ করে) বসো বলছি। (রহমত বসে) আমার স্ত্রী সুপর্ণাকে আমি ইচ্ছে করেই নিয়ে এসেছি রহমত। পর্ণা বল, মুখ তুলে সব বলো...

রহমত : মাইজি, ম্যাডাম, হামার কোই কসুর নাই। বাপি সোনা হামারাভি বহুৎ পেয়ার কা দোস্ত... ছোটা দোস্ত, আচ্ছা দোস্ত!

পর্ণা : (মুখ তুলে ক্রন্দিত গলায়) রহমত বাপির আংটিটা বাগানে গন্ধরাজ গাছটার নিচে খুঁজে পাওয়া গেছে... ধুলোর মধ্যে পড়েছিল, বাপি খুঁজে পায়নি, তুমিও পাওনি, আমারও প্রথম প্রথম খুঁজে না পেয়ে তোমায়... তোমায় অন্যায় ভাবে গালাগাল করেছি... দোষ দিয়েছি... বাপি বারবার বলছিল, তোমায় তো বাপি দোস্ত বোলে ডাকে, বলছিল, না, না দোস্ত কখনো নেবে না... আমার দোস্ত খুব ভালো লোক... এবারের জন্মদিনে পাওয়া আমার মায়ের দেওয়া ওই আংটিটার জন্য তোমার এতদিনের কাজ, কথা, হাবভাব সবকিছুকে ভুলে গিয়ে 'চোর' ভেবে বসলাম তোমায় ... ছি - ছি - ছি—

জেলার : শুধু ভেবে বসোনি, তোমার অনর্গল চাপে পড়ে আমিও তোমার প্রতি শেষ পর্যন্ত ভুল করে ফেলেছি। আংটিটা পাওয়া গেছে। তুমি আজ থেকে, এখন থেকে, আবার আমার কোয়ার্টারের বাইরের কাজ করবে। আমরা দুজন তোমার কাছে ভুল স্বীকার করে তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। ছোট্ট বাপি কাঁদছিল... আমরা বলে এলাম, দাঁড়া তোর দোস্তকে ফিরিয়ে আনছি।

রহমত : (অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে) নেহি সাব, গোশতাকি মাফ মাইজি... মেহেরবানী করুন, জেলখানার বাকি দোস্তদের সাথে কাম করতে দিন।

সুপর্ণা : (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) রহমত, publicly মানে প্রকাশ্যে তো পারবো না, তোমার কাছে ভুল স্বীকার করছি... বারবার... একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে আমার বাড়িতে কাঁদছে ...

রহমত : (আর্তস্বরে সোচ্চার হয়) মাইজি বহুৎ সাল হয়ে গেল মুলুক ফিরতে পারি না... শুনলাম মুলুকমে আভি জুলুমরাজ চলছে...

জেলার : হ্যাঁ রহমত, তুমি পুরো খবর রাখো না, আফগানিস্তানে কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়ার - বেশিরভাগ জায়গাতেই এখন তালিবানদের আধিপত্য... মার্কিন সৈন্যরা কেন কে জানে ওদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েই মানে মানে দেশে ফিরে গেছে। প্রায় সমস্ত দেশ জুড়েই এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব... পর্ণা, পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ আফগানিস্তান, সেখানে গরিবদের কাছ থেকেও 'জাকাত'

মানে ধর্মের নামে অন্যায় Tax আদায় চলছে। মেয়েদের উপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। বিশেষ করে যে মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আরো পড়াশোনা করতে চায় তাদের ওপর সব রকম নির্যাতন চলছে।

রহমত : (কেঁদে ফেলে) পেশোয়ার মে ভি আইসা জুলুম চলছে...

জেলার : হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরের আফগানরা তো ভিতর ঢুকতে পারছে না... খুন-খারাপি, ধর্ষণ-নির্যাতন...

সুপর্ণা : এইতো কালই খবরের কাগজে ছবি দেখলাম, পেশোয়ারেই তো স্কুল যাওয়া মেয়ে আর মায়েদের ধরে নিয়ে ওরা আটকে রেখেছে... নির্যাতন করছে...

রহমত : (চেঁচায়) নেহি... নেহি... (কাঁদে) মুলুক মে হামারি এক ছোটা লেড়কি আছে, আজিজা। ছোটা আজিজা, জেলের বাহার যখন ছিলাম ন'বরস আগে, আজিজা কা মাফিক এক ছোটা লেড়কি হামায় বহুত পেয়ার করতো, হামি ওর ডাক শুনতাম, কাবুলিওয়ালা অ কাবুলিওয়ালা, দূর থেকে মনে লিত আজিজা ডাকছে, বাপজান, মেরা বাপজান; (মাথা নিচু করে)

সুপর্ণা : মেয়ের ছবি মানে আজিজার কোন ছবি... আচ্ছা জেলে ঢুকবার আগে ফোনটা জমা দিয়েছো ?

রহমাত : নেহি মাইজি, শেষ যেবার মুলক ছেড়ে ইধার আসি, তখন দেশ জুড়ে বহুৎ গণ্ডগোল। বর্ডার ক্রস্ করার সময় মিলিটারি হামার ফোন; ফোন মে আজিজা কা তসবির, উস্কি মাই হামার বিবিজান গবিনাকা তসবির সব কেড়ে নিল... (কাঁদে) খুদা মেহেরবান ! ন'বরস আগে জেল কা বাহার মিনি অর আভি আপকা লেড়কা বাপি দোস্ত বনি গেল। বহুত ছোটা... হামার আজিজা কি মাফিক... (মাথা নিচু করে কাঁদে)

জেলার উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সুপর্ণা। জেলার রহমতের পিঠে হাত রাখে।

জেলার : ৫ মাস পরে ১৫ই আগস্ট ! প্রতিবছর জেল বন্দীদের মধ্যে যারা ভালো আচরণ করে তাদের শাস্তির মেয়াদ সরকার কমিয়ে দেয়,- দেখি তোমার জন্য কি করা যায়।

সুপর্ণা : তুমি কিন্তু মনে আর কিচ্ছু রাখবে না। সোজা আমাদের কোয়ার্টারে চলে আসবে। বাপিকে দেরাদুনে ভর্তির ব্যবস্থা পাকা... এ বছরই ও চলে যাবে। তার আগে ওকে আর আমাদের কষ্ট দিও না রহমত। প্লিজ

জেলার : এসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো, বাপিকে কথা দিয়ে এসেছি।

রহমত : আসছি হুজুর, বাপিজানকে বলুন আসছি। (ওরা দুজনে চলে যায় রহমত যেন অদৃশ্য আজিজাকে দেখতে পায়। চেঁচিয়ে ওঠে) আজিজা, আজিজারে, ৩ বরস ওমর যখন, তখন তুই হামাকে একটা সাদা কাগজ মে ভুসো কালি দিয়ে তোর

হাতের ছাপ আমায় দিয়ে বলেছিলি, বাপজান, আমি সঙ্গে থাকবো বাপজান। আজিজা হর রোজ তোমার সাথে থাকবে। এই ছাপ রেখে দাও।- ওটা কেউ কাড়তে পারেনি, কেউ খোঁজ পায়নি। জেলে ঢোকার সময় জমা দিয়ে এসেছি.. হামি আসছি রে আজিজা জরুর আসছি, তুর হাতের ছাপ নিয়েই আসছি। যেখানে যাই, তুকে পেয়ে যাই রে আজিজা। (কাঁদতে থাকে) (অন্ধকার)

(সামনে একটা আলো ঘোষককে ধরে। ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজে। ঘোষক ঘোষণা করে)

ঘোষক : শোনো, শোনো জেলবন্দীরা, সবাই মন দিয়ে শোনো, আজ ১৫ই আগস্ট ২০২২ সরকারি নির্দেশ মতো তোমাদের প্রত্যেককে আজ ফল মিষ্টি আর দুপুরে বিশেষ খাদ্য দেওয়া হবে। সরকার আরো ঘোষণা করেছেন যে এই জেল থেকে কারাবন্দী রহমত খানকে তার ব্যবহারের জন্য নিষ্ঠাসহকারে নিয়ম-কানুন পালনের জন্য ১২ বছরের জায়গায় আজ মানে দশ বছরেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। রহমত আজ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। (ঢং ঢং আওয়াজ সমবেত কোলাহল) দশ বছর পরের ঘটনা। সেই ঘর। অবনীশ তার ঘরে সেলফোনে কথা বলছে।

অবনীশ : হ্যাঁ হ্যাঁ । আমারই মেয়ে মিনি.. (হাসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি, আপনার মেয়েও সন্ধ্যার ফ্লাইটেই বোস্টন যাচ্ছে... ওরা তো অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যা ছ'টার ফ্লাইট। আমরা বিকেল চারটের মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাব, হ্যাঁ। হ্যাঁ, নমস্কার।

তমালিকা: (ব্যস্ত হয়ে ঢোকে) মিনির তো এখনো গোছানোই শেষ হয়নি। (হেসে) তাড়া দিলেই বলছে, আমি আর এখন আগের মতো ছোট নেই... আমাকে আমার মত (গুন গুন করে সুর ...

অবনীশ : (হাসে) এই বয়সের মেয়েরা একটু বেশি স্বাবলম্বী হতে চায় এখন। তোমাদের অতীত দিয়ে বিচার করো না। ওর হাতে এক্সট্রা কিছু ডলার দিতে হবে তমালিকা।

তমালিকা: হ্যাঁ কাল ব্যাংক থেকে দুজনেই তুলে আনলাম। কিন্তু আজ বুঝলাম, লাভ নেই। তোমার মেয়ে বলেছে সমস্ত খরচা ও ওখান থেকে স্কলারশিপে পাবে। যেটুকু অতিরিক্ত লাগতে পারে সে নাকি নিয়ে নিয়েছে। মেয়ে তোমার একটু বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে (হাসি)।

অবনীশ : (হাসি) তাও একবার মনে করিয়ে দিই এখন দেড়টা, আমরা ওকে নিয়ে ঠিক চারটেয় বেরোবো। (হাঁক দেয়) মিনি মিনি।

তমালিকা: (হেসে) এখন কেউ below 60 প্রৌঢ় হয় না, বৃদ্ধ তো অনেক পরে। তুমি কিন্তু... এই বয়সে বৃদ্ধ (হেসে) এভাবে ফোনে ডাকে

অবনীশ : (ফোন বাজে) দাঁড়াও মেয়েই ফোনে উত্তর দিচ্ছে। হ্যাঁ, বল মিনি, আমি বলছি চারটার সময় বেরোবো। তার মধ্যে রেডি হতেই হবে বলে দিলাম। ও.কে

তমালিকা: (হাসি)ভাবছি আমাদের উনিশ বছরের যুগটা কেমন বদলে গেল। উপরতলা নীচতলায় ফোনে ফোনে সংলাপ (হাসি)
নেপথ্যে জোরে ডাক । বাবুসাব, মাইজি—

অবনীশ : কে? এসো, কে? দরজা খোলা, কে এসো।

রহমত : খোঁকি খোঁকি বলতে বলতে (রহমত ঢোকে। এই কবছরে আরো বুড়ো হয়ে গেছে।)

অবনীশ : রহমত... এসো এসো।

তমালিকা: আজকের দিনে রহমত...? রহমত, এসো এসো বসো

রহমত : আমাকে পেহচানতে পারছেন বাবুজি? মাইজি?

অবনীশ : তোমায় ভুলে যাব! এই বাড়িটাকে এতগুলো বছর পরও তুমি ভুলতে পারোনি। এ পাড়ায় এই ক'বছরে চারদিকে এত বাড়িঘর, এতসব বিচিত্র দোকান...

তমালিকা: তবুও দেখ ঠিকই চিনে এসেছ আমাদের এই কাবুলিওয়ালা?

কাবুলি : এই মাকান হামার ভুল হবে? কভি নেহি। ইধার আমার খোঁকি আছে। কাল জেল থেকে বাহার এসেছি মাইজি।

অবনীশ : ওঃ সেই ঘটনা আমরা ঠেকাতে পারলাম না। এত চেষ্টা করলাম... সত্যি যতটা মিথ্যে তার থেকে হাজারগুণ বাড়িয়ে যা হলো সেদিন, ভাবা যায় না।

কাবুলি : আমার গুনাহ নাই বাবুজি। আমার মুলুকমে বেইমানি চালু ছিল না বাবুজি। এইসা ঝুট ভি চালু ছিল না। মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি, খুন হয়ে গেল, জেল হয়ে গেল, ১২ বরস কা জেল মিলল... লেকিন ...জেল কা সুপার সাবভি খুশ হয়ে রিপোর্ট পাঠায়ে হামায় মেহেরবানি করল... দো বরস আগে বাহার হয়ে এলাম। এবার মুলুক ফিরব। খোঁকি কই? খোঁকি? জেল থেকে সোজা বার হয়ে খোঁকিকে দেখতে চলে এলাম বাবুজি, খোঁকি খোঁকি...

তমালিকা: রহমত, কিছু মনে করো না আজ মিনির সঙ্গে দেখা হওয়া মুশকিল। কাল থেকে অবশ্য ও থাকবেও না।

রহমত : শ্বশুরবাড়ি যাবে খোঁকি? শ্বশুরবাড়ি? শ্বশুরকে হাম মারবে। খোঁকি কই? এক মিনিট ডাকুন বাবুজি।

তমালিকা: আঃ বোঝাতে পারছি না। রহমত একটু বুঝে দেখ ...১০ বছরে তোমার খোঁকি আর খোঁকি নেই...

অবনীশ : তমালিকা, প্লিজ ওর ব্যাকুলতাটা একটু ভাবো।

রহমত : দেখা হবে না বাবুজি? মুলুক মে ওয়াপস চলে যাবো বাবুজি। তার আগে...

দেখা হোবে না খোঁকির সাথ?

অবনীশ : (ফোন ধরে) মিনি একবার নেমে এসো মা... এক মিনিটের জন্য... হ্যাঁ নেমে এসো... জরুরি দরকার এসো।

তমালিকা: আসছে?

অবনীশ : হ্যাঁ, দাঁড়াও রহমত। তোমার খোঁকির সাথে দেখা করে যাও। (হেসে) ও কিন্তু এখন আর সেই তোমার...

(সালোয়ার কামিজ পড়া তরুণী মিনি সামনে এসে দাঁড়ায়) । রহমত দেখে কেমন হয়ে যায়। অপ্রস্তুতের হাসি হাসে রহমতও, চিনতে পারে না তার খোঁকিকে।

অবনীশ : তোমায় সেই গল্প বলতাম... ছোটবেলায় একজন আসতো। খুব ভালোোবসে তোমায়... ওই যে তোমার ঘরের টেবিলের ওপর ছোটবেলার album তাতে ওর অন্তত পঞ্চাশটা ছবি... জানি, তাড়া আছে এখন! তবু পারলে একবার দু এক পাতা দেখো...হয়তো– কি মনে পড়ছে না?

(মিনির অভিব্যক্তিতে বোঝা যায় ঠিক চিনতে পারছে না)

রহমত : খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে? (মিনি কেমন অপ্রস্তুত সলজ্জ বোধ করে)

তমালিকা: তোমার খোঁকি মানে মিনি অনেক বড় হয়ে গেছে রহমত। ও অনেক বড় কিছু পড়তে আজ বিদেশে চলে যাচ্ছে। পাঁচ বছরের জন্য যাচ্ছে।

অবনীশ : কিংবা হয়তো ওখানেই থেকে যাবে... মিনি, উনি আমাদের মতোই তোমার সত্যিকারের আপনজন।– প্রণাম করো। যখন মনে পড়বে, তখন হয়তো আর... নাও প্রণাম করো

রহমত : নেহি খোঁকি, নেহি খোঁকি (মিনি প্রণাম করে) এই মেওয়াটা লেও খোঁকি... লেও খোঁকি... (হাত বাড়িয়ে নেয়)

মিনি : আমি ভিতরে যাই বাবা (চলে যায়)

(অবনীশ তমালিকাকে কানে কানে কি যেন বলে। তমালিকা সম্মতি নিয়ে বার হয়ে যায়)

অবনীশ : অনেক বড় হয়ে গেল মেয়েটা। আমার মেয়ের মতো তোমর মেয়েও দেশে ফিরে দেখবে অনেক বড় হয়ে গেছে।

(রহমত অবনীশকে পকেট থেকে মেয়ের হাতের ছাপ দেখায়)

রহমত : খোঁকি হামকো পেহচান্তে পারলো না। হামার লেড়কি ভি পারবে না। বাবুজি আমার লেড়কি আজিজাভি আমাকে পেহচান্তে পারবে না।

অবনীশ : পারবে পারবে... যাও। এই ছাপটা দেখিও, ঠিক মনে পড়ে যাবে তোমার মেয়ের আর এই নাও, আগে যা দিয়েছো দিয়েছো, দাম নাওনি, আজ নিতেই হবে। রহমত তুমি বললে মুলুক ফিরবে, এটা আজ নিতেই হবে।

রহমত : নেহি নেহি বাবুজি। এটা আমি নিতে পারবো না। মাফি মাঙতা। হামি মুলুক বাপস যাচ্ছি। জেলে বসেই খবর মিলেছে সোজা রাস্তায় মুলুক যাওয়া এখন কঠিন, দেখি বাঁকা রাস্তা... লেকিন মেওয়া কে লিয়ে রুপাইয়া লিতে পারব না।

অবনীশ : বেশ নিও না, যাও মুলুক ফিরে যাও। যাওয়ার টাকা আছে তো রহমত? জেল থেকে তো সবে বেরুলে? সোজা - বাঁকা যে রাস্তা ধরেই যাও, অনেক টাকা তো লাগবে রহমত...

রহমত : নেহি বাবুজি, হোয়ে যাবে, দোস্তোকো পাস উধার মাঙ্গবো। দিবে। বাবুসাব, হমারা লেড়কি ভি পেহচান পারবে না। হামি যাব। (কাগজটা বের করে।) পারবি আজিজা বাপকে পেহচানতে পারবি? (কেঁদে ফেলে)

অবনীশ : (তমালিকাকে ডাকে) তমালিকা এসে একটা প্যাকেট দেয়।
এটা নাও রহমত। না, মেওয়ার দাম না। কিন্তু রহমত আমিও তো একজন বাবা, তমালিকাও একজন মা। তোমার মেয়ে তো আমাদের মেয়ের মতোই। তার জন্য সামান্য আশীর্বাদ আমরা দিতে পারি না? তুমি যেমন মেয়েকে আশীর্বাদ দিলে... মেওয়া দিলে... নাও, নাও রহমত। তোমার লেড়কিকে দেশে গিয়ে আমাদের কথা বলো। আমাদের আশীর্বাদ দিও।

তমালিকা: আমাদের মেয়েও চলে যাচ্ছে দূরে... বহু দূরে। তুমি গিয়ে আমাদের কষ্টের কথা বলো রহমত।

রহমত : (চোখ মুছতে মুছতে টাকাটা নেয়) জরুর বলব বাবুজি, জরুর বলব মাইজি। এই মেহেরবানি হামি লিব... আমি যাব, (যেতে যেতে) শুক্রিয়া। খোঁকি ভি বাপস আসবে। আমি যেমন বাপস যাচ্ছি মুলুক। বাবুজি, মাইজি সালাম, সালাম।
(বাইরে বার হতে যায়)
(কাঁদে। বুকের মধ্যে মেয়ের হাতের ছাপ চেপে ধরে)
(সামনে পৃথক আলোর জোন তৈরি হয়)

আবু বকর সিদ্দিক : আমি আবু, আবু বকর সিদ্দিকি, ক'বছর ধরেই রেডিও সাজ্জাদ থেকে বলছি, আগে আফগানিরা পাস্তুনদের সঙ্গে তাজিক আর হাজারাদের লড়াই চলছিল, তা এখন অনেকটাই বন্ধ! কারণ সব সম্প্রদায়ের মেয়েরাই এখন বিপন্ন। আফগানিস্তানের একটা শহরেই ৫৪৭ জন মহিলা ধর্ষিতা ও খুন হয়েছে। দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশে এখন জাকাতের নামে ইসলামিক ট্যাক্সের বোঝা চালাবার প্রস্তুতি... মার্কিন সেনারা নীরবে দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে... সারা দশে জুড়ে আইনকানুন বিচার সব বিপন্ন। আমরা দুনিয়ার কাছে বিচার চাইছি...
(Fade হয়ে যায়) (অবনীশদের দরজায় দাঁড়িয়ে রহমত কাঁদছে)

রহমত : মেরা লেড়কিজান আজিজা, বিবিজান গাবিনা, ম্যায় আতাহু... দশ বরস কা বাদ

ম্যায় আতাহু... কিধার হ্যাঁয়... ক্যায়সা হে তুম... (কাঁদতে থাকে)
(হঠাৎ উপরে থেকে ছুটে আসে মিনি)

মিনি : একটু দাঁড়াও কাবুলিওয়ালা... (সামনে আসে) মনে পড়ে গেছে... আমার অনেকটাই মনে পড়ে গেছে... তুমি আমায়... তুমি আমায়...আমরা তখন... (কেঁদে ফেলে) অ্যালবামের প্রথম পাতায় ছবির পাতায় শুধু তুমি, তুমি আর আমি... আমার তাড়া আছে। তুমি আমার.. তুমি কাবুলিওয়ালা, তোমার মেওয়া নিয়েই আমি আজ এয়ারপোর্টে যাব, তুমি যাবার সময় তোমার মেয়ের জন্য আমার এই আংটিটা নিয়ে যাও। এবার birthday তে পেয়েছি অনেকগুলো। একটা নাও, তোমার মেয়েকে দিও... বলো তোমার আরেক বহিন মিনি দিয়েছে... নাও...
(কাবুলিওয়ালা নিতে গিয়ে সংকোচ ভুলে কেঁদে ফেলে)

কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে,
কথার সে ভার নামা রে মন / নীরব হয়ে শোন দেখি শোন।
পাড়ের হাওয়ায় বিন বাজে কোন বীণার তারে।
অশ্রু নদীর সুদূর পাড়ে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।

।। পর্দা পড়ে ।।

লেখক : **চন্দন সেন, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যকার ।**
Playwright : **Chandan Sen, eminent Theatre personality of West Bengal.**

ভেলা

(অনু নাটক)

■ সৌমিত্র বসু

চরিত্র : বেহুলা, লোক, লখীন্দর।

(মঞ্চের পেছনে একটা উঁচু বেদী। সেটা আসলে একটা ঘাট। পুরণো, ভাঙাচোরা। অশত্থ গাছ উঠেছে। যদি কেউ তার পেছনে থাকে তবে দর্শক তাকে দেখতে পাবে না। সেই ঘাট থেকে উঠে আসে একটি মেয়ে। বেহুলা। কপালে চওড়া করে সিঁদুর, কিন্তু ঘেঁটে গেছে। পরণে বিয়ের সাজ, কিন্তু অবিন্যস্ত। খুব ক্লান্ত। পেছন দিকে তাকিয়ে বলে—)

বেহুলা : যাব না। কোথাও ছেড়ে যাব না তোমাকে। ভেলা তো ভাসিয়ে দিয়েছি, সে যেখানে নিয়ে যাবে, যেখানে হোক, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভেসে যাব আমি। একদিন না একদিন তো ওই ভেলা কোথাও একটা থামবে। থামতেই হবে। থামতেই হয়। তারপর উল্টোপথ। নিশ্চয় আছে উল্টোপথ। এই বিশ্বাস করেই তো বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এখন? শরীর যেন টলে যেতে চায়। মনে যেন— না, না ।ও সব কিছু না। আসলে বহু দিন ধরে একা একা দাঁড় ঠেলে যাচ্ছি তো, হাত পায়ের সাড় চলে গেছে। তাই একটু — মানুষ তো। কিন্তু মানুষ,যা পারে না, আমি তাই নিয়ে আসব। আনব। আনতেই হবে। কেন মনের মধ্যে সব অন্য রকম কথা জাগে। আঃ। এইখানে একটু বসি। এই ডাঙায়। একটু জিরিয়ে নি। (বসে আছে। অন্য দিক থেকে একজন ঢোকে। কাঁধে বস্তা বা প্লাস্টিকে জড়ানো একটা মৃতদেহ। বেহুলাকে দেখে থমকে যায়।)

লোক : কে? এইখেনে —

(বেহুলা চকিতে উঠে দাঁড়ায়)

বেহুলা : কে?

(বেহুলার সারা শরীর শক্ত হয়ে যায়। লোকটা বুঝতে পারে। আশ্বস্ত করার মত করে বলে—)

লোক : একটু বসি?

(বেহুলা কোনো কথা বলে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। লোকটা বসে। গামছায় ঘাম মোছে। বেহুলা মুখ ফিরিয়েই আছে। লোকটা ইতস্তত করে বলে)

লোক : এখানে শ্মশানটা কোথায় বলতি পারেন? (বেহুলা তাকায়। কোনো কথা বলে না।) এজ্ঞে। মড়া পোড়ানোর শ্মশান। আছে এখানে কোথাও? ও। জানা নেই, না? (বেহুলা ঘাড় নেড়ে না বলে। লোকটা মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করে) আমার মা। কাল বিকেলে মরে গেল। শহরে হাসপাতালে দিছলুম, কিছু হল না। মরে

গেল। আমি একা মানুষ কি করে নে যাই? খোঁজ করলাম, যদি গাড়ি পাওয়া যায়। তা সে এত দাম। বললুম দাদা গো, একটু কম করো, তা মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। হাসপাতালের লোক সব তারাও তো ডেরাইভারের বন্ধু। তারা বলে, ওর চেয়ে কম হবে নে। এই শহরে এই হল দস্তুর। কী আর করি, তাই একা একা কাঁধে করে—

বেহুলা : একা কাঁধে করে শ্মশানে?

লোক : আর কী করব? যা হুড়ো দিচ্ছিল। মরা মাকে তো হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারি না। তা একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করি। শ্মশানটা যে কোন্ দিকে? ও বলে এই দিকে তো ও বলে ওইদিকে। বলে সব হন হন করে চলে যায়। সকাল থেকে হাঁটছি তো হাঁটছি। আমারও দিক ভুল হয়ে গেছে। শহর তো চিনি না আমি। তবু যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। যে দিকে দু চোখ যায়। ওঃ, ঘাড়ে ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ভুলে গেছি তো। তবে, শ্মশান একটা পাবই। পাব না?

বেহুলা : কিন্তু নিজের বলতে আর কেউ নেই তোমার? একা একা বয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

লোক : কারে পাব? কেউ নেই গো মা?

বেহুলা : কেউ নেই? নিজের লোক বলতে—

লোক : নিজের লোক? আর নিজের লোক। নিজের লোক সব পর হয়ে গেছে গো। আমারে তো সব একঘরে করে রেখেচে।

বেহুলা : একঘরে? কেন? কী করেছিলে?

লোক : পাটির মিটিনে চাঁদা দিতে পারি নাই, বলল তোমার ধোপা নাপিত সব বন্ধ। তুমি একঘরে। কেউ যদি তোমার সঙ্গে কথা বলে তো তাকে দেখে নেওয়া হবে।

বেহুলা : পাটি? মিটিন? সে আবার কী?

লোক : তুমি কোথা থেকে এলে? এ সব কথার মানে জান না? মানে যাঁরা গাঁয়ের মাথা, যারা না বললে গাছের পাতাটি পজ্জন্ত পড়ে না, তাদের হুকুম।

বেহুলা : ও, বুঝেছি।

লোক : তাইলে বলো, কাকে আর ডাকব? কে আসতে সাহস পাবে? ওই, একা তো একাই সই।

বেহুলা : শহরে এসেছিলে কী করে তুমি?

লোক : সে আবার কী বলব মা। গাঁয়ের হেলথ সেন্টারে বলল শহরে বড় হাসপাতালে নে যা, তা না হলে তোর মা বাঁচবে না। তাই যা জমি ঘর ছিল সব বেচে দিয়ে— তখন হাতে ট্যাকা ছিল, গাড়ি করে নিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু আপনি? এমন বিজন জায়গায় একা মেয়েমানুষ? আপনারে দেখে তো—

বেহুলা : আমিও তোমার মত।

লোক : আমার মত ? মানে?

বেহুলা : আমিও বয়ে নিয়ে চলেছি।
লোক : বয়ে নিয়ে চলেছ? মড়া? (বেহুলা ঘাড় নাড়ে) কী বলছ গো। কার মড়া।
বেহুলা : আমার স্বামীর।
লোক : হায় হায়, কী বলছ তুমি? বেধবা হয়েছ?
বেহুলা : বিয়ের রাত্তিরে।
লোক : কী কপাল গো তোমার? তা তোমাকে কি তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর থেকে?
বেহুলা : না । আমি নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছি।
লোক : মানে? নিজের ইচ্ছেয় ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ? আবার সিঁদুর পরে আছ তো।
বেহুলা : আমার বাপের বাড়ির বংশের কূলগুরু বলেছিলেন, আমি জনম এয়োতি হব। না সেটা কথা নয়, আমি জানি, আমি তাঁকে ফিরেয়ে নিয়ে যেতে পারব। আবার তিনি প্রাণ ফিরে পাবেন। আমি জানি।
লোক : মানে? তুমি মরা মানুষকে—
বেহুলা : হ্যাঁ। সেই প্রতিজ্ঞা করেই বেরিয়েছি। যদি না পারি, ফিরব না।
লোক : তুমি কি পাগল? এ কখনো হয়?
বেহুলা : হ্যাঁ। আমি পাগল। এ হবে, হতেই হবে। যে করে হোক।
লোক : (একটু চুপ করে থাকে) মা গো, এমনটা হয় না। যে চলে গেছে তাকে কি ফিরিয়ে আনা যায়?
বেহুলা : যায়। যাবে। সাবিত্রি পেরেছিল সত্যবানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আমিও পারব।
লোক : সে হল গল্পকথা। তা কি কখনো সত্যি হতে পারে?
বেহুলা : পারে। বিশ্বাস থাকলেই পারে। আমি পারব। বিশ্বাস করি। বুকের এইখান থেকে।
লোক : (কথা বলে লাভ নেই বুঝে) সঙ্গে কে আছে? আর কাউকে দেখছি না তো?
বেহুলা : আমি একা।
লোক : একা? এই সোমত্ত বয়েস তোমার? একা? (বেহুলা ঘাড় নাড়ে) না মা। না, এরকম করো না। তোমার ঘর কোথায় বলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।—তুমি বুঝতে পারছ না। মেয়েমানুষ। পথে কত রকম বিপদ আপদ—
বেহুলা : জানি তো। সে সব কিছুর মধ্যে দিয়েই তো যাচ্ছি।
লোক : তাহলে?
বেহুলা : তাহলে বলে কিছু নেই। শোনো, আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি জানি আমি কী করছি, কেন করছি।

(বেহুলা মুখ ঘুরিয়ে বসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোক ওঠে। ঘাটের দিকে যাচ্ছে।)

বেহুলা : ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?
লোক : চান করব।
বেহুলা : চান করবে? কেন?
লোক : কেন মানে? এই দুপুর বেলা। আর তাছাড়া সারা গায়ে—(ঘাটের দিকে এগিয়ে

যায়) এ কী, ডিঙ্গিতে শুয়ে আছে ও কে?

বেহুলা : এই আমার বর।

লোক : এই বর?

বেহুলা : হ্যাঁ। মনসার অভিশাপ ছিল। বাসর ঘরেই তারে দংশেছে নাগিনী।

লোক : হায় ভগবান।

বেহুলা : এই, কাছে যাবে না।

লোক : না না, আমি ওই দিকটায় গিয়ে— ও মা, তাই তো। বরের বেশ পরে আছে। তা তুমিও কি শ্মশানের খোঁজে বেরিয়েছ? নদী ধরে যেতে যেতে— শ্মশান তো নদীর ঘাটেই পড়বে।

বেহুলা : না। শ্মশান নয়, আমি স্বর্গের দিকে যাব বলে পথে বেরিয়েছি। একা।

লোক : সে তো বটেই। আমিও তো আমার মাকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

বেহুলা : এ স্বর্গ সে স্বর্গ নয়। সত্যিকার স্বর্গ। যে করেই হোক, স্বামীর প্রাণ আবার ফিরে এনে দেব। দেবই। এই আমার প্রতিজ্ঞা। কোন ছোটবেলায় নাকি কূলগুরু গুণে গেঁথে বলেছিলেন, আমি সাবিত্রির মত, জনম এয়োতি হবো। সে কথার মান আমাকে রাখতেই হবে।

লোক : তোমার কথা আমি কিছু বুঝতেই পারছি না।

বেহুলা : আমিই কি বুঝি? কিছু বোঝার আগেই তো সব শেষ হয়ে গেল। সারারাত কত কথা বললাম মানুষটার সঙ্গে। কত কথা। অন্য একজন মানুষ। নতুন মানুষ। তার সব কিছু নতুন। তার সবটা জানতে হবে আমায়। নিজের সবটা জানাতে হবে। কোন কিছু লুকনো থাকবে না। দুজনে দুজনকে জানতে জানতে চিনতে চিনতে ভোরের দিকে চোখে একটু ঘোর লেগেছে, হঠাৎ চিৎকার। বেহুলা, বেহুলা বৌ, কালনাগ দংশন করেছে আমায়। খাট থেকে মাটিতে পড়ে গেছে স্বামী, মুখ দিয়ে সাদা সাদা কী যেন বেরিয়ে আসছে। মা গো।

লোক : থাক, থাক ও সব কথা।

বেহুলা : সবাই ছুটে এল। শ্বশুর পাথরের মত দাঁড়িয়ে, কোথা থেকে শাশুড়ি এসে ঝাপিয়ে পড়ল আমার ওপর। রাক্ষুসী। বউয়ের রূপ ধরে কালনাগিনী এসেছিস আমার ঘরে। আমার লখাইকে খেয়েছিস তুই, তুই। কেউ তাকে ছাড়াতে পারে না। হাত দুটি মুঠো করে চোখ বন্ধ করে আছি, আর তক্ষুণি চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই কূলগুরু। মা তো আমার জনম এয়োতি হবে গো। সাবিত্রীর মত। তাই হবে। স্বর্গ থেকে আমার স্বামীর প্রাণ ছিনিয়ে আনব আমি।

লোক : পাবে? স্বর্গের পথ খুঁজে পাবে?

বেহুলা : জানি না তো। শুধু এইটুকু জানি, যেতে হবে। প্রাণ ফিরে এনে দিতে হবে। যাই। অনেকদিন পর একজন জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলা হল। তুমি মানুষটা খুব ভাল। ভেসে আসতে আসতে যাদের সব দেখেছি। ওঃ। ভাল থেকো গো।

(উঠে দাঁড়ায়। ঘাটের দিকে যাচ্ছে)

লোক : একটা কথা বলব? (বেহুলা ফিরে তাকায়) মানে বলব বলে ভাবছি, কিন্তু ঠিক কী করে যে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। (বেহুলা আর একটু এগিয়ে যায়) বলছিলাম কী, আমার মাকে একটু ঠাঁই দেবে?

বেহুলা : কোথায়?

লোক : তোমার ভেলায়? আমি সত্যি করে বলি, এই মরা আর আমি বইতে পারছি না। মাথা ঘুরচে, পা টলছে। তা ছাড়া বাসী মড়া, গন্ধ ছড়াচ্ছে। কতবার যে পথের পাশে নামিয়ে বমি করেছি। কাকে আর বলব। তোমাকেই বললাম। কতবার ভেবেছি, আর পারব না, পথে কোথাও ফেলে দিয়ে চলে যাই। পরক্ষণেই মনে হয়েছে, চলে যাব? শ্যাল কুকুরের মুখের সামনে ফেলে দিয়ে চলে যাব? মাকে? তুমি, তোমার ওই ডিঙ্গিতে মাকেও নেবে? শুধু মাকে, শুধু এই মড়াটাকে। আমি পিছু পিছু সাঁতার কেটে যাব।

বেহুলা : কোথায়? স্বর্গে?

লোক : না না। অতদূরে যাবার ধক নেই আমার। নদীর ঘাটে ঘাটে যেতে যেতে কোথাও না কোথাও শ্মশান তো পাবই। সেইখানে আমি মড়া নামিয়ে নেব। একটু ঠাঁই যদি দাও। দেবে? দাও না গো।

বেহুলা : বেশ নিয়ে এসো তাহলে।

লোক : ভাল হোক তোমার ভাল হোক।

(প্লাস্টিকে বাঁধা সেই মৃতদেহ কাঁধে তুলে নেয়। তারপর ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। ঘাটের আড়ালে চলে যায়, বোঝা যায় জলের কাছে তলে এসেছে। হঠাৎ সেখান থেকে লোকের প্রবল চিৎকার ভেসে আসে, আর্তনাদ। পড়ি কি মরি ছুটে আসে। তারপরেই সেখান থেকে মঞ্চের ওপর ছিটকে এসে পড়ে প্লাস্টিকে বাঁধা মায়ের মৃতদেহ।)

বেহুলা : কী হয়েছে?

লোক : মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। হে ভগবান।

বেহুলা : কী বলছ?

(পেছন থেকে উঠে আসে লখীন্দর। বিকৃত পচে গলে যাওয়া মুখ, শরীর।)

লখীন্দর : (বিকৃত গলায়) যাঃ, চলে যা, চলে যা।

লোক : তুমি? তুমি? বেঁচে আছো?

লখীন্দর : না।

বেহুলা : আছো আছো। এই তো জীয়ন্ত রয়েছ তুমি। কালনাগ মৃত্যু দিতে পারেনি তোমায়। আমি যে জনম এয়োতি।

লখীন্দর : না, জীয়ন্ত হইনি আমি। কিন্তু হতে চাই। যেতে চাই জীয়নের দিকে। স্বপ্ন দেখি বেঁচে ওঠার। তুইও তো স্বপ্ন দেখিস। কিন্তু আমার সঙ্গে ও কেন? ওর তো কোন

স্বপ্ন নেই। কোন আশা নেই। জীবনকে জিতে নিতে হবে, এমন কোন বিশ্বাস নেই। ওর নেই, যে ওকে বয়ে নিয়ে চলেছে তারও নেই। ওই মড়া যদি এ ভেলায় ওঠে, এই মড়ার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও তো মরে যাব। যাঃ। চলে যা চলে যা।

(হঠাৎ পড়ে যায়। বেহুলা শক্ত করে ধরে তোলে। লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে না বলে। লোকটিও হ্যাঁ দেখায়।)

লখীন্দর : ভেলায় যাব। কোথায়, ভেলা কোথায়। আমি একা যাব । একা।

বেহুলা : তাই যাবে চলো, এসো।

(বেহুলা ধরে ধরে তাকে ঘাটের দিকে নিয়ে যায়। লোকটা চুপ করে বসে আছে। খুব কষ্ট করে ওঠে। মায়ের লাশটাকে কাঁধে তোলে। দর্শকদের বলে)

লোক : এখানে শ্মশানটা কোন্ দিকে হবে বলতে পারেন? মড়া পোড়ানোর শ্মশান?

(কোন উত্তর নেই। ক্লান্ত পায়ে সে চলে যায় অন্য পথে।

জনহীন মঞ্চে পর্দা নামে)

লেখক : **সৌমিত্র বসু - পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।**

Playwright: **Soumitra Basu, eminent Theatre personality of West Bengal.**

হুলুস্থুল

■ কুন্তল মুখোপাধ্যায়

গল্পসূত্র : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

গজপতি, সুচরিতা, সুরপতি, গোপাল, নন্দ, বগা, ঘনশ্যাম, দারোগা,
ডাক্তার বস, ম্যাডাম, জগা, তকাই, নীতা, শান্তনু

পর্ব এক

মুচকুন্দপুর, এক আধা শহর আধা গ্রাম। দুর্জন লোকেদের খুব ভয় এখানকার মানুষজনের, তাদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে চায় তারা। তবুও মাঝে মাঝে উৎপাত আসে, আর বাসিন্দারাও হয়ে ওঠে সন্দিগ্ধ। মন্দলোকের লোভ আর সজ্জনের ত্যাগ এই নিয়ে হুলুস্থুল মুচকুন্দপুর।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক ফেরিওয়ালা। (গায়ে গেরুয়া ফতুয়া আর পরণে খাঁকি প্যান্ট)

সে গাইছে - লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ,
কিনতে চাইলে বাবু-বিবি দরজা কোরো না বন্ধ।

গজু : এই যে লাল গানে নীল সুর-শোন-

ফেরী : বলুন বাবু । (গজুপতি তার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন)

গজু : এ কী কাণ্ড! তোমার কি গরম জামা-টামা নেই?

ফেরী : হি হি হি গরম জামা, আমার কি শীত গীরিষ্মি বলে কিছু আছে?

গজু : বল কী হে! এই পাথুরে শীতেও তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না।

ফেরী : আজ্ঞে! এই শীতকে তো শীত বলেই মনে হচ্ছে না।

গজু : পাগল একেই বলে , ইয়ে কি যেন নাম তোমার?

ফেরী : আজ্ঞে হুলুস্থুল। নামটা তো আপনারই দেওয়া।

গজু : ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। তো বাবা হুলুস্থুল তোমাকে আমি আমার পুরোনো একটা শোয়েটার দিতে পারি।

হুলু : না বাবু, ওসব কিছু লাগবে না। তা আজ কিছু নেবেন না বাবু? একটা টর্চবাতি আছে, দিয়ে যাই।

গজু : না-না, আজ কিছু নেব না। তুমি যে সেই একটি হুইসেল্ আমাকে গছিয়ে দিয়েছিলে সেটাতে তো কোনও শব্দই হয় না।

হুলু : ভুল আমারই গজুবাবু। আপনাকে বলা হয়নি,ওটা আসলে শব্দের হুইসল্ নয়, গন্ধের -গন্ধের হুইসল।

গজু : মানে ।

হুলু : ওটা বাজালে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোয়, আর বাড়িতে মশা মাছি থাকে না।

গজু : বলো কী হে, এইরকম হুইসলও পাওয়া যায় নাকি?

হুলু : আজ্ঞে দুনিয়ায় কত আজব জিনিস আছে বাবু,

গজু : হতেও পারে। সেদিন গিন্নী বলছিল নাকে একটা ধূপ কাঠির গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু কোথাও কোনো ধূপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে ওটা কি হুইসলের গন্ধ। আর ঠিক ত ঘরের ভেতরে মশা-মাছি নেই। কিন্তু —

হুলু : হুলুস্থুলকে বিশ্বাস করুন বাবু।

গজু : ঠিক আছে, ভেবেছিলাম হুইসলটা তোমায় ফেরৎ দেবো। তা থাক। আর কয়েকটা দিন দেখি। এই হুলু, তুমি তো হুইসলের দামটা এখনও নাওনি হে।

হুলু : দেবেন যখন খুশি। আজ বরং টর্চ বাতিটা রেখে দিন।

গজু : দাও। এই না, আমার তো টর্চ আছে।

হুলু : এটা সেই টর্চ না গজুবাবু, এ অন্য জিনিস।

গজু : কী করম হে?

হুলু : এটা আলো জ্বালাবার টর্চ নয় বাবু।

গজু : তাহলে এই টর্চ থেকে কি অন্ধকার বেরোয়?

হুলু : হিহিহিহি। আজ্ঞে তা ঠিক নয়, তবে এর থেকে একটা রশ্মি বেরোয়, তাতে অনেক কাজ হবার কথা।

গজু : রে গান নাকি হে বাপু? কিন্তু সে জিনিস তো তোমার কাছে থাকার কথা নয়!

হুলু : আমি কি ছাই ছায়েনস্ জানি। নানা জায়গা থেকে নানা জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনি। কোনটা কী কাজে লেগে যায়। তবে টর্চটা নিলে আপনি ঠকবেন না।

গজু : বলছো, বড় বিপজ্জনক জিনিস হে। কি থেকে কী হয়ে যায় কে জানে?

হুলু : তা ঠিক। তবে কিনা আপনার জবা গাছটায় একবার পরীক্ষা করে দেখলেও পারতেন। খানিকটা বিকিরণ ঢুকিয়ে দিলে, ফুল ফুটতেও পারে।

গজু : তাই। এই তুমি আমার জবা গাছটার কথা জানলে কি করে?

হুলু : কেন? গত বিষ্যুৎবারে আপনিই তো দুঃখ করে বললেন, ওহে হুলু, এত মেহনত বুঝি বৃথা গেল হে আমার জবা গাছটায় আর বুঝি কুঁড়িই হল না-

গজু : এসব কথা আবার কবে বললাম তোমায়?

হুলু : আপনি বলেন নি না, বড় ভুল হয়ে গেল। তবে বোধহয় ঘোষ পাড়ার নন্দবাবুই বলেছেন। যাই তাকেই দিয়ে আসি জিনিসটা।

গজু : খবরদার, এই কিপটে , মুখ্যু নন্দ এর মর্ম কি বুঝবে? টর্চটা আমিই নেবো। দামটা কত?

হুলু : পঞ্চাশ টাকা, তবে আপনি পঁচিশই দেবেন। আর তাড়াহুড়োর দরকার নেই। মাস পয়লা পেনশন পেলেই তবে দেবেন, (টর্চটা ঠেলা থেকে দেয়)

গজু : আচ্ছা, আর বেগড়বাই করলে, তুমি তো আছই।

হুলু : বেগড়বাই ও এর কাছে টিট হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবু আমি যাই।
(হুলু - লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ গাইতে গাইতে হুলু চলে যায়। আর প্রায় মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে সুরপতি, গজপতির বন্ধু)

সুর : ঠকলি তো। সকাল বেলায় ওই হতভাগার হাঁক ডাক শুনেই বুঝেছি, তোকে আহাম্মক পেয়ে নিশ্চয় কোনো অচল মাল গছিয়ে দিয়ে গেল। তা এটা কি টর্চ?

গজু : হ্যাঁ টর্চ, আবার ঠিক টর্চও নয়

সুর : তবে ওটা কি অ্যাটম বোমা না ডুবোজাহাজ? কত টাকা গচ্চা দিলি?

গজু : বকবকানিটা বন্ধ কর সুরপতি । টাকা এখনো দিই নি। কাজ না হলে ফেরৎ দেওয়া যাবে।

সুর : এরপরে দেখা হলেই ফেরৎ দিবি। আচ্ছা তুই এই বোকা বুদ্ধি নিয়ে কি করে ফিজিক্সের প্রফেসর হয়েছিলিস বলতো?

গজু : যেমন করে ওই ভীতুর ডিম হয়েও তুই পুলিশ অফিসার হয়েছিলিস।

সুর : পেশায় ঘষা দিসনি গজু। এখনও মুচকুন্দপুরের চোর-ডাকাত -পকেটমার - ছিঁচকেরা আমায় দেখলে এই ফুটপাথ ছেড়ে অন্য ফুটপাথে ওঠে—

গজু : সে তো তুই তাদের কাছে তোর বীরত্ব'র কথা শোনাস বলে- তুই আসলে-

সুর : বাঃ বাঃ গজু ভালো মনে তোকে সাবধান করতে এলাম, আর তুই গায়ে কাদা ছেটাচ্ছিস, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। (চলে যায়)।

গজু : আচ্ছা জবা গাছটার দিকে একবার তাক করে দেখি। (গজপতি, জবা গাছটার দিকে তাকে টর্চটা জ্বালান। প্রায় অদৃশ্য জবাগাছটা আলোকিত হয়। তার দুই ডালে তিনটে নীল জবা ফুটে আছে।)

গজু : জয় আইনস্টাইন, জয় নিউটন, (প্রায় নাচতে শুরু করেন। এমন সময় কে যেন বলে ওঠে-) মেশোমশাইয়ের কি শরীর খারাপ?

গজপতি: (আঁতকে ওঠেন) কে? কে আপনি?

গোপাল: আজ্ঞে আমি মাসীমার গোপাল।

গজপতি: অ গোপাল! তা বাপুরে, আমি ভুল দেখছি কিনা দ্যাখ তো, ওই জবা গাছটায় কি নীল ফুল ফুটেছে নাকি আমারই চোখের ভুল।

গোপাল: না মেশোমশাই, ভুল দেখবেন কেন? অলক্ষুণে জবাফুল, এরকম কুচ্ছিত জবাফুল জন্মে দেখিনি মেশোমশাই।

গজু : খবরদার এই ফুল পুজোর জন্য নয়। ফুল ছিঁড়লে কিন্তু কেটে ফেলবো।

গোপাল: না মেশোমশাই, নিশ্চিন্তে থাকুন, একে কালো, তার উপর কেমন পচা গোবরের গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই ফুল দিয়ে কি মা কালীর পূজা হয়?

গজু : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) ওই ফুলের মর্ম বোঝা তোর কর্ম নয়। যা বাপু নিজের কাজে যা।

গোপাল: তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু মেশোমশাই একটা কথা তো মানবেন।

গজু : কী কথা?

গোপাল: জবা গাছে লাল ফুল ফোটাই বিধির বিধান, আপনি খোঁচাখুঁচি করে ওই কেলেকুষ্টি ফুলগুলো আমদানী করলেন। ব্যাপারটা মাসীমাকে বলতেই হচ্ছে। শুনলেই শিকড় শুদ্ধু গাছটা উপড়ে ফেলবেন।

গজু : ওরে ও কাজ করিস না বাবা। আমার এত চেষ্টা, এত সাধনা, বিফলে যাবে।

গোপাল: তা আমি কি করব বলুন। উনি আমাকে চারদিকে, বিশেষ করে আপনার দিকে নজর রাখতে বলেছেন।

গজু : ওরে তোর মাসীমা তো ছায়েন্স বোঝে না। এ ফুলের মর্ম তো তার বোঝার কথা নয়।

গোপাল: বেশ তো এই কথাটাই বলি তাকে। মাসীমা আপনি তো ছায়েন্স জানেন না। কী করে বুঝবেন ।

গজু : ওঃ গোপাল তুই তো খুব ঘোড়েল লোক দেখছি। তোকে বরং কুড়িটা টাকা দিচ্ছি, খবরদার মাসীমার কানে যেন এই জবা ফুলের কথা না যায়। (গোপাল টাকা নেয়)

গোপাল: (মাথা চুলকে) কুড়ি টাকায় আজকাল কি হয় বলুন।

গজু : ঠিক আছে, তিরিশ টাকাই পাবি।

গোপাল: মেশোমশাই, টাকা পয়সার কথা কিন্তু আপনিই তুলেছেন। ঘুষ নেবার মত, ঘুষ দিতে চাওয়াটাও কিন্তু অন্যায় অপরাধ।

গজু : এই তুই ব্ল্যাকমেল করছিস আমাকে?

গোপাল: কি দরকার আমার ঝুট ঝামেলার, তার চেয়ে আমি বরং মাসীমার কাছে গিয়ে কথাটা নিবেদন করে আসি। আর আপনি যে টাকা দিয়ে আমার মুখটা বন্ধ করতে চাইছেন, সেটাও তাহলে বলি।

গজু: (আঁতকে উঠে) দাঁড়া বাবা দাঁড়া ওরে আমি কি আর সত্যিই তোকে পুলিশে দেবো বলেছি ।

গোপাল: তাই তো বললেন মেসোমশাই।

গজু : ওরে নারে না। ঠাট্টা করছিলাম আর কী! তাহলে ওই কথাই রইলো।

গোপাল: যে আজ্ঞে। দিন প্রতি তিরিশ টাকা-

(গোপাল টাকাটা নেয়। তারপর "কেষ্ট কেষ্ট বলে মন" গাইতে গাইতে চলে যায়। এমন সময় অন্দর থেকে নারী কণ্ঠে হম্বিতম্বি শোনা যায়, "বলি শুনছো, জলখাবার যে ঠান্ডা হতে চললো, কোথায় গেলে?" গজপতি বাধ্য স্বামীর মত "এই তো, আসছি" বলে অন্দরে চলে যান।)

পর্ব দুই

(ম্যাডামের আস্তানা। ম্যাডাম মিটিং করছেন। সামনে রয়েছে জগা, তকাই আর নীতা।)

ম্যাডাম: শোন। ওই গাড়ী নিবি না গাঁজা পাচারের দায়ে জেল খাটবি, এরকম বুলি চালিয়ে

ছুটকো ছিঁচকে চুরির দিন আর নেই। এখন মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার। (জগা-তকাই-নীতা, একসাথে বলে ওঠে " মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার" থাক্ এখন আর কোরাস গাইতে হবে না, তোরা কি রে? তোরা কি? জগাই চোর, তকাই চোর, নীতা চোর? আমাদের একটা ক্লিন ইমেজ আছে বুঝলি। তাতে পুরো গ্যামাক্সিন মেরে দিলি। আমি এখন বিগ্ বসের কাছে কি জবাব দেবো? বলতো

জগা : কি করবো? ওই বড়বড় রসালো ছানাবড়া আর জিভেগজা দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি।

ম্যাডাম: ঝামা ঘষে দিতে হয় অমন জিভে।

তকাই : অত বড় বড় ফুলকপি নৈনিতাল আলু আর টাটকা ভেটকী মাছ দেখে লোভটাকে আটকাতে পারিনি।

ম্যাডাম: লোভের জালে জড়িয়ে তখন ভেটকি মাছের মত মুখ ভেটকে যাবে।

নীতা : ফরেন লিপস্টিক, ফরেন সেন্ট, ফরেন সানগ্লাস

ম্যাডাম: ওই ফরেন- ফরেন করতে গিয়ে লোকে মরে, বুঝলে

জগা : তকাই-নীতা :আমাদের কি হবে ম্যাডাম। বাঁচার কি কোনো পন্থা নাই। হায় হায় হায়-

ম্যাডাম: তাই-তাই-তাই নাচতে গিয়ে মামাবাড়ীর লপসি খেয়ে এসো সবাই-

তকাই : তুমিই আমাদের মা-মাসী-মামী-পিসি।

জগা : তুমিই আমাদের রথের রশি।

নীতা : রাখতে হলে তুমিই রাখো, মারতে হলে তুমিই মারো, মোট কথা তোমার পদতল আমরা ছাড়ছি না। (তিনজনেই ম্যাডামের পায়ের কাছে পড়ে যায়। ম্যাডামের গলায় হেডরেস্ট বাঁধা তাই দেখতে পান না)

ম্যাডাম: কই? কোথায় গেলি তোরা?

গোপাল: আপনার পদপ্রান্তে ভূমিশয্যায় ঠাঁই নিয়েছে ম্যাডাম।
(ম্যাডাম -তাকিয়ে দেখেন)

ম্যাডাম : ওঠ-ওঠ, সবাই। কাজ চাই কাজ। এই হ্যাংলা গোপাল- বল কি খবর এনেছিস বল।

গোপাল: ম্যাডাম, বসের স্পেকুলেশন সঠিক। মুচকুন্দপুরে এক রহস্যময় ফেরীওয়ালার আবির্ভাব হয়েছে । তার ভাঙ্গা ঠেলায় হরেক কিসিমের মজার খেলনা। সে লোক বেছে বেছে জিনিস বিক্রী করে। কেউ নিতে না চাইলে সে কথার ছলে ভুলিয়ে ভালিয়ে গছিয়ে দেবে। দামের পরোয়া না করেই। কিন্তু ধরুন কেউ নিতে চাইছে, তখন ফেরীওয়ালার তাকে পছন্দ নয়। এমন দাম হেঁকে বসবে যে কারোর বাপের সাধ্য নেই সেই জিনিস ছুঁয়ে দেখে। একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড-
(গোপালের কথার মাঝেই বস ঢুকে পড়েছেন।)

বস : ওই হুলুস্থুলই আমাদের টার্গেট। পৃথিবীর কোন দেশ থেকে ও এসেছে, কিচ্ছুটি কেউ জানে না। কিন্তু আমি জানি ওর ওই ঝুড়িতে যা আছে, তা আলিবাবার গুপ্তধনের একশো গুণ বেশি। ওই ঝুড়ি কব্জা করতে পারলেই সসাগরা পৃথিবী আমাদের পায়ের তলায়। (বসকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।)

ম্যাডাম: আপনি নির্দেশ দিলে ঘৎনা বা হোঁৎকাকে দিয়ে ওই ঠেলা কালকেই তুলে নিয়ে আসছি বস।

বস : বেদের মেয়ে জোছনার মত কথা বলিস না ঘোড়াশশী পদী। বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে, তবেই দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে।

গোপাল: এমা, ম্যাডামও বকুনি খাচ্ছে।

ম্যাডাম: চোপ্-চোপ্-। হ্যাংলা গোপাল।

গোপাল: ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম।

বস : এই যে হ্যাংলা গোপাল। ভোলে ভালা রিটায়ার্ড প্রফেসার গজপতি বাবুকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে পয়সা কামাচ্ছিস কামা, কিন্তু আসল কাজটার কি হল?

গোপাল: মালটা বোধহয় আমার ফোরটুয়েন্টি গিরি ধরে ফেলেছে। আমাকে কোন মাল বেচতে চাইছে না।

বস : তুই একটু শক্তপোক্ত হ। নইলে তো ভোম্বল তোকে নেটে আটকে খবর করে দেবে।

জগা : কাজ কম, কথা বেশি।

তকাই : বেটা একটা ফাটা বাঁশের বাঁশি।

নীচা : আমাকে আবার একদিন লালসিং চাড্ডা দেখাবে বলেছিল,কেদ্দানি দেখে বাঁচি না।

ম্যাডাম: লাল সিং চাড্ডা - এখন নিজেই পড়েছো গাড্ডা।

গোপাল: গজুবাবুর নাতির জন্য একটা হুইসল দিয়েছিল। সেটা বাজে না, গন্ধ ছড়ায়, গন্ধে মশা-মাছি বাড়ি ছেড়ে পালায়।

ম্যাডাম: শব্দ ব্রহ্ম শুনেছি, এতো গন্ধব্রহ্ম।

নীতা : এতো সত্যিই হুলুস্থুল কাণ্ড।

বস : আর এই হুলুস্থুল কাণ্ড যে ঘটায় সেই হুলুস্থুলকে আমাদের কব্জা করতে হবে।

ম্যাডাম: গায়ের জোরে হবে না, লোভ দেখিয়ে, ঘুষ খাইয়েও হবে না, তবে হবে কি করে?

বস : ভালোবাসা দেখিয়ে, সহানুভূতির আদরের চাদড়ে মুড়ে ওকে কব্জা করতে হবে।

ম্যাডাম: গোপালকে দিয়ে হবে না

গোপাল: একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

নীতা : ওই বুড়োদের দিয়ে কিছু হত না, তবে যদি থাকতো ধানু মাসি বস - শোনো সবাই, আমাদের একজন সৎ ভালোমনের মানুষকে বাছতে হবে। সে সৎ, ভালোমনের

মানুষ, কিন্তু অভাবী। তার এই অভাবের সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে আমাদের কাজটা হাসিল করতে হবে।

ম্যাডাম: কিন্তু যদি রাজী না হয়।

বস : ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে তার মন জয় করতে হবে। তবে দেখো, বুদ্ধিটা যেন খোলা থাকে।

গোপাল: তেমন লোককে পাবো কোথায়?

বস : ক্যাংলা গোপাল, শুধু হ্যাংলামি করলেই চলবে? হুলুস্থুলের ঝুড়ি থেকে নন্দ একটা জিনিস পেয়েছিল। নন্দকে হাজত বাসের ভয় দেখিয়ে পুলিশ অফিসার ঘনশ্যাম পাকড়াশী মালটা তুলে নিয়েছিল। নগদ সতেরো লক্ষ টাকা দিয়ে ওটা আমি হাতিয়েছি।

সবাই : জিনিসটা কি?

বস : একটা আদ্যিকালের চশমা-

ম্যাডাম: চশমা-

বস : ধর, তুমি জানোই না যে, তোমার কোনো জিনিস হারিয়ে যাবে। সেটা হারানোর আগেই সেই জিনিসটা তোমায় দেখিয়ে দেবে, এমনকি হারানোর কারণ বা কেন হারালো তাও দেখিয়ে দেবে।

গোপাল: ধ্যাৎ, এতো রূপকথার গল্পের মত শোনাচ্ছে।

বস : লেখাপড়া তো ক্লাস এইট পাশ বুঝবি না। তা নইলে শেক্সপীয়র থেকে বলতাম- দেয়ার আর মেনি থিংস হোরাসিও

ম্যাডাম: সে তো বুঝলাম, কিন্তু এই চশমা দিয়ে আমরা কি করবো?

বস : যা দেখতে কোনও চশমা লাগে না, অন্য কিছু লাগে, সেটাই এটা দেখায়। আমি পেয়ে গেছি -

সবাই : কাকে?

বস : তাকে, যে লোকটা আমাদের হয়ে কাজ করবে, শোনো তাকে ভালোকথায় বুঝিয়ে, ভয় না দেখিয়ে, তার আত্মশক্তি , সেল্ফ কনফিডেন্স বাড়িয়ে, তাকে দিয়ে আমাদের কাজ করিয়ে নিতে হবে- (পকেট থেকে চশমা বের করে) এখন এসো সবাই। এই চশমার দিকে তাকাও, তাকাও। প্রথমে ঝাপসা, এরপরে এই দ্যাখো স্পষ্ট

শান্ : শান্তনু রায়- (সবাই শান্তনুকে দেখতে পায়)

পর্ব তিন

হাসপাতালের বাইরে অস্থির চিত্তে পায়চারী করছে শান্তনু। অসুস্থ বাবার চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারের অপেক্ষায়।

শান্তনু : ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার: ও আপনি। শুনুন আপনার বাবার ব্রেন টিউমার। বায়োপসি রিপোর্ট এখনও পাইনি, সুতরাং বিনাইন না মেলিগন্যান্ট বলতে পারছি না। কিন্তু যাই হোক অপারেশন মাস্ট। আপনি টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পারেন ক্যাশে জমা করে দিন। আমি আগামী বৃহস্পতিবার ডেট ফেলছি। ঠিক আছে। (ডাক্তার চলে যায়)
(জগা-তকাই-নীতা শান্তনুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। শান্তনু খেয়াল করে না। সে নিজের মনে কথা বলে।)

শান্তনু : পাঁচ লাখ। কোথায় পাই?

জগা : বাড়ীটা বেচে দাও।

শান্তনু : বাড়ীটা বেচে দিলে, মা, বোনকে নিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

তকাই : কিন্তু খালি হাতে বাড়ীই বা ফিরবে কি করে?

শান্তনু : হ্যাঁ, মা এক বুক আশা নিয়ে বসে আছে।

নীতা : তোমার আয় কেমন?

শান্তনু : জিম ইনস্ট্রাক্টরের বেতন, আর দুটো টিউশনী,

জগা : বাবার পেনশন।

শান্তনু : সেও তো খুবই অল্প।

নীতা : বাবার পেনশনের অ্যাগেইনস্টে ব্যাঙ্ক লোন পেতে পারো।

চকাই : তাতে তো ওর বাবার সই লাগবে-

জগা : হ্যাঁ, ওর বাবাতো হাসপাতালে-

নীতা : তাহলে কি হবে? (কি হবে, কি হবে বলতে বলতে ওরা মিলিয়ে যায়)

শান্তনু : উঃ আর ভাবতে পারছি না।
(এমন সময় গোপাল এসে শান্তনুর পাশে দাঁড়ায়)

গোপাল: আপনাকে ভাবতে হবে না, আমরা আছি তো

শান্তনু : আপনি কে? কি বলছেন?

গোপাল: চলুন , কথা আছে।

শান্তনু : কি কথা?

গোপাল: আপনার ভালোর জন্য কথা।

শান্তনু : কোথায় যেতে হবে?

গোপাল: ওই বটগাছ তলায়? বসের কাছে?

শান্তনু : (দূরে দেখে) উনি।

গোপাল: হ্যাঁ। ভয় পাচ্ছেন না তো?

শান্তনু : শুধু শুধু ভয় পাবো কেন? চলুন। (গাছের তলায় আসে)। সেখানে বস দাঁড়িয়ে আছে)

বস : গুড ডে শান্তনু। বাবা কেমন আছেন?

শান্তনু : হাসপাতালে যেমনটি থাকা যায়।
বস : অপারেশনের ডেট দিয়েছে?
শান্তনু : টাকা জমা করলে, বৃহস্পতিবার ও.টি.
বস : কত টাকা বলেছে?
শান্তনু : পাঁচ লাখ।
বস : ধরুণ, ওই টাকাটা আমি আপনার নামে হাসপাতালের ক্যাশ কাউন্টারে জমা করে দিলাম।
শান্তনু : এ'তো আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত শোনাচ্ছে।
বস : গল্পটা সত্যি হতে পারে?
শান্তনু : বদলে আমায় কি করতে হবে?
বস : বলছি। গোপাল- (একটা ব্যাগ দেয়)
দু'হাজার টাকার নোটে এক লাখ করে পাঁচ বান্ডিল আছে, সোজা ক্যাশে জমা করে দিয়ে আয়। (গোপাল চলে যায়)
শান্তনু : কিন্তু কেন?
বস : আমার একটা উপকার করতে হবে।
শান্তনু : কোনো অসামাজিক কাজ আমায় দিয়ে হবে না।
বস : সেটা জানি। ফিজিক্সে মাস্টার্স, ভালো খেলোয়াড়। ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়াও তাইকোন্ডোও জানা আছে।
শান্তনু : ওই জানা অবধিই। কোনোটাতেই আমি এক্সেল করিনি। আই অ্যাম আ বর্ন মিডিয়োকার।
বস : কিন্তু মূল্যবোধ খুব সজাগ।
শান্তনু : ওই জন্যই তো কিছু করে উঠতে পারছি না।
বস : এবার পারবেন।
শান্তনু : কি করতে হবে?
বস : একটা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা জিনিস নিয়ে আসতে হবে।
শান্তনু : কি জিনিস?
বস : কি জিনিস, কার কাছে আছে, কোথায় যেতে হবে সব গোপাল বুঝিয়ে দেবে। বাবার ব্যাপারে চিন্তা রাখবেন না। আমি আছি। নিন মোবাইলে এই গানটা শুনুন। গোপাল এলে ওকে মোবাইলটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। চলি,
(গোপাল আসে)
শান্তনু : কাজটা ঠিক কী?

গোপাল: মুচকুন্দপুরে একজন নতুন লোক এসেছেন, তিনি হরেক কিসিমের নতুন জিনিস পত্র প্রায় বিনি পয়সায় বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই জিনিসগুলোর মধ্যে ঠাসা রয়েছে অজানা বিজ্ঞান। তার সঙ্গে তোমার ভাব জমাতে হবে। এইরে তোমাকে তুমি বলে ফেললাম।

শান্তনু : ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করছি না। প্রশ্ন হল আমি চাইলেও উনি আমার সঙ্গে ভাব জমাবেন কেন?

গোপাল: উনি খুব সজ্জন, ভালো মানুষ। তোমার মত একজন ভালো মানুষকে পেলে, তোমার আগেই উনিই তোমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলবেন।

শান্তনু : তা তোমার সঙ্গে ভাব জমেনি?

গোপাল: আমি তো লোকটা তেমন ভালো না। উনি ভালো, কিন্তু বোকা নন।

শান্তনু : আচ্ছা।

গোপাল: বেশিরভাগ ভালো মানুষেরাই একটু বোকা হন। এই যেমন আমার মেশোমশাই, অবসরপ্রাপ্ত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, গজপতি বসু।

শান্তনু : জিবি, উনি তো আমারও মাস্টারমশাই। নমস্য ব্যক্তি।

গোপাল: তো চলুন আপনার নমস্য স্যারকে নমস্কার করে কটা দিন ওর বাড়িতেই কাটিয়ে দেবেন-

শান্তনু : এই প্রস্তাবটা সত্যিই ভালো।
নিন চলুন, বাসে উঠতে হবে- (দুজনে চলে যায়)।

পর্ব চার

" লাল গালে নীল সুর- হাসি হাসি গন্ধ" গাইতে গাইতে হুলু পথ চলেছে, হঠাৎ বগা এসে হুলুর গাড়ীর সামনে দাঁড়ায়)

হুলু : কি হোলো বগা ভাই

বগা : আচ্ছা সত্যি বলতো তুমি কে?

হুলু : ফেরীওয়ালা

বগা : না, তুমি আর পাঁচটা লোকের মত ফেরীওয়ালা নও।

হুলু : তবে আমি কে?

বগা : সেটাই তো রহস্য। তুমি ফেরী কর মানুষের ফেলে দেওয়া - বাতিল জিনিস।

হুলু : ফেলে দেওয়া বাতিলের মধ্যে থাকে কত অমূল্য সম্পদ। সবাই যে দ্রব্য ফেলে দেয়, তার মধ্যে আমি খুঁজে পাই অমূল্য ধন।

বগা : তুমি থাকো নদীর ধারে একটা প্লাস্টিকের ঝুপড়িতে- এটাই ত সন্দেহজনক।

হুলু : লোভের জ্বলজ্বলে চোখকে আমার বড় ভয়,তার চেয়ে পাঁচ জায়গায় ঘুরে কষ্টেশিষ্টে রোজগার করে দিনের শেষে মুখে কিছু দিতে পারলেই আমার শান্তি।

বগা : তোমার এই ভাঙা ক্ষয়ে যওয়া জিনিসগুলো কি কারোর কোনো কাজে লাগে?

হুলু : তেমন মানুষ, শুদ্ধ যার মন, সুন্দরের যে পূজারী- তার কাজে লাগে বৈকি-

বগা : (মাথা চুলকে)- এইসব ভালো ভালো কথা শুনলে পরে না, আমার পাপী মনটা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

হুলু : সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ওই ঝুড়িতে যে জিনিসটাই তুমি হাত দিয়েছো, সেটা তোমার হাতে যেতে চাইছে না।

বগা : ভাই হুলু, ঘাট হয়েছে। এই এক হাতেই নাক মলছি, কান মলছি। তোমার ঝুড়ির মাল তোমারই থাক। আমাকে রেহাই দাও ভাই।

হুলু : মনের কথা বলছো তো।

হুলু : তবে, বল, পুনর্বির্গত ভবঃ।

(বগা প্রথমে ভুল উচ্চারণে পরে সঠিক উচ্চারণে বলে। বগার হাত ঝুড়ি থেকে খুলে যায়)

বগা : ওরে বগারে- জোর বেঁচেছি প্রাণেরে- এবার পালারে পালারে। (বগা পালাতে যায়। হুলু তাকে ডাকে)

হুলু : বগা ভাই, বগা ভাই পালিয়ো না শোনো। ওটা গজুবাবু স্যারের হাতে তুলে দিয়ে এসো।

বগা : আমি একটা পকেট কাটা, সিঁদেল চোর, আমাকেই এই দায়িত্ব দিলে-

হুলু : তুমি কেমন লোভ জয় করতে পারো এটা তার পরীক্ষা

বগা : যদি পাশ না করি?

হুলু : আর একটা লাস্ট চান্স পাবে। তারপরে কিন্তু ফক্কা। আমারও দিন শেষ হয়ে এলো। এখান থেকে পাততাড়ি গোটাবার সময় এসে গছে-

বগা : ওমা পাততাড়ি গোটাবে কেন?

হুলু : তোমাদের এখানে ব্যবসাটা ঠিক চলছে না। একজনের অপেক্ষায় আছি। তার সঙ্গে বোঝাপড়া করেই পগাড় পার।

বগা : কোথায় যাবে?

হুলু : আমার মত ভবঘুরের কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে? বেড়িয়ে পড়লেই হল-

(লাল গালে নীল সুর, গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়)

বগা : গজু স্যারকে দেবার আগে লাট্টুটা একটু কাছে রাখি। দেখি যাদি কোনো ভেলকি দেখায় (যেতে চায়, কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়ায়, জগা-তকাই -নীতা)

নীতা : ছি ছি বগাদা। গোটা মুচকুন্দপুরে তোমার কত নাম ডাক শুনেছি

জগা : শেষে একটা ফেরীওয়ালার কাছে মাথা নীচু করলে-

তকাই : একটা রদ্দা কুস্তির প্যাচ মারতে পারলে না।

বগা : এই কে তোমরা?
নীতা : তোমার হিতাকাঙ্খী বোনটি
জগা : তুমি যাতে হাতে পাও ধনটি, তাই
তকাই : নিতে এসেছি তোমায় কলকাতায়
বগা : কেন কলকাতায় কেন? আমি এখানেই ভালো আছি
জগা : বগা ভাইরে, কলকাতা হল জোচ্চোরদের মক্কা-
তকাই : তোর মত গুণী লোকের কদর কলকাতাতেই
নীতা : সুখে দুঃখে লাজে- কলকাতাই রাখবে তোমার নিজের বুকের মাঝে-
জগা-তকাই-নীতা: চল, বগা- কলকাতায় চল-
বগা : ছাড়ো আমায়, আমি যাবো না।
জগা : দেখি বগাভাই লাট্টুটা-
তকাই : আমার কাছে লেত্তি আছে, দাও লাট্টু ঘুরিয়ে দেখাই-
নীতা : (গা ঘেঁষে) বগাদা প্লীজ- তোমায় লেডিকেনী আর ক্ষীরের দরবেশ খাওয়াবো-
বগা : না- এ লাট্টু গজু স্যারকে দিতে হবে-
(বগা দিতে চায় না। জগা-তকাই-নীতা ওর হাত থেকে নিতে চায়। কিন্তু বগার হাতের লাট্টুতে ওদের হাত আটকে যায়- ওরা কিছুতেই খুলতে পারে না। শেষ অবধি ওরা ভয় পায়)
জগা : ওরে বগা, নেবো নারে ভাই, তোর লাট্টু নেব না, হাতটা খুলে দে-
নীতা : বগাদা তোমায় দাদা বলে বলেছি, আমার পীড়ন কি তোমার সাজে?
তকাই : ছেড়ে দে ভাই বগা- তোর মুচকুন্দপুরে তুইই শের, আমরা সবকটা বাগ, বি.ইউ.জি বাগ-
বগা : তবে বল আর এখানে কোনো ঝঞ্ঝাট করবে না।
জগা : নীতা-তকাই- না-না- আর কখনো না।
বগা : কথার খেলাপ হলেই কিন্তু ভ্যানিশ-
জগা-নীতা-তকাই-সে আর বলতে-
বগা : "পূর্ণ বিগতঃ ভব"- (জগা-নীতা-তকাইয়ের হাত খুলে যায়। ওরা পালায়) হুঃ বগা বীরের সঙ্গে টেক্কা দিতে আসা?
(বাইরে গলা পাওয়া যায়- " বগা কাজ ফাঁকি দিয়ে কোথায় গুলতানি মারছিস")
বগা : এইরে নন্দবাবু। ওর বাগানে কোদাল চালানোর কথা ভুললি কি করে বগা? (নিজের গালে এক চড় মারে) যাই নন্দ বাবু- (চলে যায়)

পর্ব পাঁচ

(গজপতি বাবুর বাড়ির রোয়াকে দাবা খেলছেন, গজুবাবু আর তার বন্ধু রিটায়ার্ড পুলিশ

অফিসার সুরপতিবাবু।)

গজপতি: এই বোড়ে দিয়ে খেলাম তোর ঘোড়া।

সুর : আর এই গজ দিয়ে খেলাম তোর মন্ত্রী।

গজপতি: এই না না -

সুর : না, না, কী , মন্ত্রী যদি বাঁচাতে চাস, তো তোর ঘোড়াটাকে কিন্তু বাঁচাতে পারবি না।

গজু : কোনো পন্থা নাই-

সুর : না, নাই, যেমন বোকামো তেমনি ফল।

গজু : আসলে তোর বোড়েটা পাকা ফলের মত এমন টুসটুসে দেখাচ্ছিল যে আমি লোভ সামলাতে পারিনি।

সুর : লোভ দেখানোর জন্যই তো চালটা দিয়েছিলাম রে। তুই ফাঁদে পা দিলি কেন? যাঃ এই দানটাও তুই হারলি।

গজু : দাবা আবার একটা খেলা হল নাকি? অকারণে মাথায় ট্যাক্সেশন।

গজু : কথা হল ইনডোর গেমে আমি একটু কাঁচা, আউটডোর গেমে আয়, আর আমার ল্যাবে, ক্লাসরুমে গুনে গুনে ছ গোল খাওয়াবো।

সুচরিতা: ক্লাসরুমের বাইরে উনি একেবারে ভোম্বল। ওই কে একটা ফেরীওয়ালা জুটেছে যখন খুশী আসছে আর যাচ্ছে তাই সব জিনিস গছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হুইসল কিন্তু শব্দে বাজে না, টর্চ কিন্তু আলো জ্বলে না। রাজ্য সুদ্ধু লোক ওকে ঠকাচ্ছে।

গজু : ওগুলোর অন্য গুণ আছে । খুবই কাজের জিনিস।

সুচরিতা: কি গুণ, বল শুনি।

গজু : দেখ সুরপতি তুই দাবা ভালো খেলিস , চোর চোর ধরা-ছাড়াতেও তুই খুব ওস্তাদ ছিলিস, আমি জানি, মানিও কিন্তু এসব তুই বুঝবি না।

সুচরিতা : দুনিয়া সুদ্ধু মানুষ জানে হুইসল বাজালে শব্দ হয়, টর্চ জ্বালালে আলো হয়, আর তা যদি না হয় তাহলে ওগুলো কাজের জিনিস হল কি করে?

গজু : ও তুমি বুঝবে না। অনেক ব্যাপার আছে।

সুচরিতা: কি বুঝবো না। এই, তোমাকে ধাপ্পা দিয়ে আরো কোনো কিছু গছিয়েছে নাকি, ওই ধাপ্পাবাজটা-

গজু : আরে না না, লোকটা মিস্টিরিয়াস, তবে ধাপ্পাবাজ নয়।

সুর : মিস্টিরিয়াস? তাহলে তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার। হ্যারে গজু তুই কোনো স্মাগলার বা টেররিস্টের পাল্লায় পড়িসনি তো,

সুচরিতা: ওমা আমার কি হবে।

গজু : আরে না- না সেরকম কিছু নয়। তাকে মিস্টিরিয়াস বলছি কেন জানো-

সুর : কেন?

গজু : এই বাঘা শীতেও সে একটা ফতুয়া পরে ঘুরে বেড়ায় গায়ে গরম জামা দেয় না।

সুচরিতা: আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কিছু চেপে যেতে চাইছো।

গজু : (একটু তুতলিয়ে) না-না-চাপবো কেন?

সুর : তুই কিন্তু নার্ভাস হয়ে পড়ছিস গজু। ব্যাপারটা খুলে বল। ভুলে যাসনি, আমি পুলিশের লোক, রিটায়ার করলেও পুলিশের ট্রেনিং তো যায়নি।

গজু : (উঠে দাঁড়ায়। হাত পা নেড়ে একটু ব্যায়াম করে নেয়। তারপর) একটা কথা বলবো-হঠাৎ শোনা যায় "লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ" সবাইকে অবাক করে দিয়ে দাওয়ায় ঢোকে হুলুস্থুলু)

হুলু : কথাটা না হয় আমিই বলি। মা জননী আপনাদের বাড়িতে গত তিনদিনে কোনো মশামাছি দেখেছেন?

সুচরিতা: হঠাৎ মশা-মাছির কথা কেন?

হুলু : না এই বলছিলাম আর কি?

সুর : আশ্চর্য বিষয়, হুঃ আমাদের বাড়ীতেও গত দু-তিনদিন কোনো মশা-মাছি নেই! কেন?

হুলু : কিন্তু গোটা বাড়ি জুড়ে একটা গন্ধ-

সুচরিতা: হ্যাঁ কেমন একটা জুঁই -বেলের মিষ্টি গন্ধ-

হুলু : তাহলে শুধুশুধু আপনারা গজু কাকুকে বকছেন কেন?

সুচরিতা: গন্ধের জন্য বকি নি তো।

সুর : হ্যাঁ, গজু আসলে একটু আহাম্মক, ডরপোক তো, তাই একটু বকাবকি-

হুলু : কি বলছেন পুলিশ কাকু, গজু কাকুর লেখা "দি নেচার" পত্রিকায় ছাপা হয়, গজু কাকুর গবেষণার উপর ভিত্তি করে নাসায় একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। আর দেশে -বিদেশে কাকুর কত কৃতি ছাত্র ছড়িয়ে আছে।

সুর : না, না, সে কথা কে অস্বীকার করে। গজু আমাদের খুবই জ্ঞানী -গুণী মানুষ।

হুলু : গাছেরও যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার হয়। গজু কাকু ছাড়া আপনারা আর কে কি, ভাবেন বলুন-

গজু : এই, কি হচ্ছে। আমার লজ্জা করছে।

সুচরিতা : শোনো বাবা, তোমার কাকুর জ্ঞান-বুদ্ধি-গবেষণা, এসব নিয়ে তো আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে বাবা আমায় তো সংসার চালাতে হয়, সেখানেই কোনো হুঁশ নেই,

হুলু : ওই হুঁশ বেশী হয়ে পড়লে , যে এদিকটা কম পড়ে যাবে জননী। জ্ঞান চর্চায় উনি, সংসার খরচায় আপনি।

সুচরিতা : তুমি কি একটু চা খাবে- বাবা

হুলু : না মা জননী, আমায় একটু অনুসন্ধানে যেতে হবে-

সুর : কিসের অনুসন্ধান- আমি যাবো?

হুলু : নানা পুলিশ কাকু- আপনি সঙ্গে থাকলে অনুসন্ধানের ঘাড়ে সর্বনাশ। আমি একাই খুঁজে নেব।

গজু : কি হারালে বাবা হুলু-

হুলু : একটা লাট্টু, আপনাকে দেবো বলেই আনছিলাম, পথের মাঝে বগার সঙ্গে দেখা, দেখি ওর কাছে যদি থাকে। আসি মা জননী।

সুচরিতা : শোনো বাবা, চা তো খেলে না, রাতে এসে এখানে দুটি খেয়ে যেয়ো।

হুলু : আচ্ছা মা জননী- (লাল গানে নীল সুর গাইতে গাইতে চলে যায়)

সুচরিতা : এটা কী হলো জগুর বৌ, চেনা নেই শোনা নেই ওই ফেরীওয়ালাকে রাতে খেতে বলে দিলে?

সুচরিতা : আপনারও নেমতন্ন সুরপতিদা।

সুর : আজকের মেনু কী?

সুচরিতা : শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তাই ফুলকপি আর কড়াইশুঁটি দিয়ে সোনামুগের ডাল আর গোবিন্দভোগ চালের খিঁচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। খেতে বসলে পাতে গরম গরম বেগুনী ভেজে দেব। (গোপাল শান্তনুকে নিয়ে ঢোকে)

গোপাল : মাসীমার আমার অন্নপূর্ণার সংসার, বলেছিলাম কী না বল

সুচরিতা : তুই হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলিস রে গোপাল?

গোপাল : আজ যুবভারতীতে বছরের প্রথম ডার্বি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা ছিল মাসীমা।

সুর : রেজাল্ট কি? জিতল কে?

গোপাল: ড্র-গোলশূন্য।

সুর : ওঃ আজ যদি বলরাম টিমে থাকতো, আর মঙ্গল পুরকায়স্থ।

গজু : আমাদের জার্নাল থাকলে ওই হাফলাইনেই থমকে যেতিস।

সুর : গোলপোষ্টের এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল-

গজু : সুর-

সুর : গজু- পাঁচ গোল ভুলিস না।

গোপাল: নারদ-নারদ-লেগে যা, লেগে যা লাগ্ ভেলকি লাগ-

গজু : নাউ ইফ জাস্ট ওয়ান্স আই সি ইউ গ্লেয়ার
অর ট্রাই মায় পেসেন্স ইফ্ ইউ ডেয়ার
ওর ওয়ান্স এগেন আই হিয়ার ইউ ব্রল
লাইক দ্যাট ফর নো এক্সকিউজ অল"

সুচরিতা: ওমা আমার কী হবে? তুমি হঠাৎ ইংরেজিতে বলতে শুরু করলে কেন?

সুর : রেগেছে-রেগেছে-গজপতি রেগে গেছে। রাগলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব বাঙালী ইংরেজি বলে।

শান্তনু : (এগিয়ে এসে বলে) স্যার ভালো আছেন।

গজু : (তাকিয়ে দেখেন) আরে শান্তনু-তুমি-
(শান্তনু, গজপতি, সুচরিতা, সুরপতি সবাইকে প্রণাম করে) আরে এ আমার ছাত্র। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র।

গজু : গবেষণাটা চলছে তো-

শান্তনু : না স্যার সব বন্ধ। বাবার অসুখ আর সংসারে অভাবের তাড়নায় সব বন্ধ।

গজু : সেকী? পলিউশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তোমার কাজটা কিন্তু বেশ অনন্য ছিল। আমি তো আমার ফিডব্যাক দিয়ে ইউ এইচ কে রিপোর্ট করেছিলাম-

শান্তনু : স্যার ওনারা খুবই সহৃদয়। আমারই দোষ, আমিই কনটিনিউ করতে পারিনি।

সুর : ঠিক আছে এসে যখন পড়েছ গজুর আস্তানায়, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে-

সুচরিতা : হ্যাঁ, আগে ঘরে এসে মুখে একটু মিষ্টি জল দাও তো।
(দূরে "নীল গানে লাল সুর" শোনা যায়, গোপাল শান্তনুকে ইশারা করে)- শোন শান্তনু গানটা শোন।

গোপাল: মাসীমা, আপনারা ঘরে যান আমি শান্তনুকে একটু জায়গাটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।
(গোপাল শান্তনুকে নিয়ে বাড়ির সামনে আসে। সুরপতি, গজপতি, সুচরিতাকে দেখা যায় না। শান্তনু এগিয়ে যেতে চায়- হঠাৎ সামনে হাজির হয় বস আর ম্যাডাম। শান্তনুর দিকে এগিয়ে দেয় একটা গান)

শান্তনু : এটা কী?

ম্যাডাম: আ গান ম্যান।

শান্তনু : ওটার দরকার হবে না ।

ম্যাডাম: চালাতে জানো না বুঝি!

শান্তনু : ওটা থাকলে বেশী ঝুঁকি হয়ে যাবে।

বস : তুমি তো মরালিস্ট নও। বি প্র্যাকটিকাল। পিস্তলে কাজ হয় বেশি- ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার -

শান্তনু : বলছি তো কাজে লাগবে না।

বস : শান্, মাই ডিয়ার বাবার অপারেশনটা কিন্তু হয়নি এখনো

শান্তনু : জানি বৃহস্পতিবার- আর দুদিন বাকী।

বস : মঙ্গলে উষা, বুধে পা - যথা ইচ্ছা তথা যা-

ম্যাডাম : শান্ ডার্লিং- টেক দিস গান- অ্যান্ড রান-

গোপাল: হ্যাঁ- ওই শোনা যায় গান- (লাল গানে নীল সুর শোনা যায়)

বস ম্যাডাম: রান- রান-রান -শান-

(শান্তনু দৌড় শুরু করে)

(আলো কমে আসে)

পর্ব ছয়

বাজারের প্রান্তে একটি পরিত্যক্ত ঝুপড়ির সামনে বসে আছে বগা, হাতে একটা মুড়ির ঠোঙা - বগা খাচ্ছে আর বিড় বিড় করে বলছে - ও বগা তোর কপাল মন্দ- মনে নেই আনন্দ- কাজ করালে ছ'টি ঘন্টা- পয়সার বেলা লবডংকা-শালা নন্দ- দূর ছাই - শুকনো মুড়ি শুধুশুধু খাওয়া যায়,

(নেপথ্যে নন্দবাবুর গলা শোনা যায়) বগা -এই বগা- (নন্দর হাঁকডাক শুনে বগা হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে। নন্দ এসে দ্যাখে-বোঝে)

নন্দ : ওরে ব্যাটা হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা বের করাচ্ছি তোর। (বগাকে ঠেলে দেন, বগা পড়ে গড়াতে গড়াতে অন্য জায়গায় চলে যায়, নন্দ সেখানেই যায়)

নন্দ : বেটা ফাঁকিবাজ, বেটা জোচ্চর, মুখ তুলে চা, আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন। (বগা উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়)

বগা : কী বলবেন বলুন-

নন্দ : বলি কাজ ফেলে পালিয়ে এলি যে।

বগা : মন বিদ্রোহ করলো, তাই চলে এলাম।

নন্দ : উঃ বেটা আমার বাপ-ঠাকুর্দার আমল হলে না, এই কথার খেলাপের জন্য তোকেই উনুনে ভাজা ভাজা করা হতো।

বগা : গরীবের উপর জুলুম করা ছাড়া তো আর কিছু জানেন না।

নন্দ : তুই যে লোক ঠকিয়ে বেরাচ্ছিস, তার জন্য তো তোর পিঠে জুতোর ঘা মারা উচিত।

বগা : আমি আবার কাকে ঠকালাম?

নন্দ : আজ সকালে আমার নাতির হাতে একটা চকচকে লাট্টু তুলে দিয়ে তুই বৌমার কাছ থেকে সাইতিরিশ টাকা নিসনি।

বগা : তিন টাকা এখনো বাকী আছে-

নন্দ : চিটিংবাজী ছাড় বগা। তোর লাট্টুটা তো নট নড়ন চড়ন, ঘোরেই না। একটা শিশুকে ঠকালি, কাঁদালি হারামজাদা কোথাকার।

বগা : শিশুর কান্না থামাতেই তো দিয়েছিলাম লাট্টুটা। তা ওটা যে ঘোরে না তা কি করে জানবো?

নন্দ : ভালো মানুষ সাজিস না বগা, এ লাট্টুটা যে ঘোরে না তুই সেটা জেনে শুনেই নন্দ চাকলাদারের নাতিকে ঠকালি।

(হুলস্থুল আসে, নন্দর হাত থেকে লাট্টুটা নেয়)

হুলু : ঘোরাতে জানলে এই লাট্টুটাও ঘোরে, কিন্তু তবে একবার ঘুরলে আর থামে না কিনা। ঘুরতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে।

নন্দ : সে কিরকম?

হুলু : এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আমাদের পৃথিবীর মতন।

নন্দ : ফচকেমে হচ্ছে-

হুলু : আজ্ঞে না সত্যি । তবে এটা চালাতে গেলে শুদ্ধ মনের অধিকারী হতে হবে।

বগা : এই তুমি পাগল না পান্তাভাত বলো দিকি। লাট্টু কখনও অনন্ত কাল ধরে ঘোরে? দম ফুরোলেই পটকে পড়বে।

হুলু : এটা ঠিক লাট্টু নয়।

নন্দ : তবে এটা কি?

হুলু : ঠিক জানি না । তবে শুনেছি, এটা যত ঘোরে তত বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে যায়।

নন্দ : এ আবার কি আজগুবি ছায়েন্সের কথা-

হুলু : আমায় দিন, আমি দেখাচ্ছি-

বগা : ফাঁকিবাজী করলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে- দেখা দিকি-

(হুলু লাট্টুটা নেয়। লাট্টুটা ঘোরায়। নন্দ-বগাও ঘুরতে থাকে)

বগা : মার কাটারি, মার কাটারি, জাদুই লাট্টু, জাদুই লাট্টু। মঙ্গলগ্রহ থেকে আমদানী। ওয়ান পিস, শুধু একটাই দেখে যাও দেখে যাও সবাই- (আস্তে আস্তে লোক জমতে শুরু করে। সবাই লাট্টুর চারদিকে ঘুরতে থাকে।, জগা-তকাই-নীতাও আসে- ঘুরতে থাকে। শুধু হুলু-আর লাট্টু স্থির)

জগা : এর ভেতরে নিশ্চয় মেশিন আছে, নইলে ঘুরছে কি করে-

তকাই : আরে নানা, এটা ব্যাটারিতে চলছে মনে হয়-

নীতা : আমি এইচ.এসে বিজ্ঞানে তেষট্টি পেয়েছিলাম। আমি বলছি এটা সোলার এনার্জিতে চলছে-

জগা : চিনে জিনিস- বাগরি মার্কেট-

তকাই : না, গড়িয়াহাট বা হাতি বাগানে-

নীতা : মনে হচ্ছে শেয়ালদা চোরা বাজার থেকে কেনা-

জগা : এই বগা- পঞ্চাশ টাকায় দিবি ভাই-

তকাই : আচ্ছা না হয় একশো তেত্রিশ-

নীতা : আমি চারশো বিশ অবধি উঠছি- দিবি ভাই-

বগা : গুণে গুণে দশ হাজার- আমি বগা- কতদিন যে ভালো করে একটু মাংস ভাত খাইনি। গায়ে একটুকরো সাবান মাখিনি। কতদিনের সখ হিরোকে দিয়ে একটু

গা ম্যাসাজ করাবো। সব করবো ওই দশ হাজারে- দশ হাজার-দশ হাজার- এক পয়সাও কম নয় । (ইতিমধ্যে হুলু হঠাৎ করে এদের ঘোরার বৃত্তের মধ্যে ঢুকে, লাট্টুটা নিয়ে চলে যায়। বগা চিৎকার করে ওঠে- পালালো পালালো চুরি করে পালালো। সবাই চোর- চোর বলে বগার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে- বগা মাটিতে পড়ে যায়- তার উপরে সবাই পড়ে- সমস্বরে চিৎকার চলতে থাকে। ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় ঘনশ্যাম দারোগা। ঘনা দারোগা ভীড়ের মধ্যে থেকে বগাকে টেনে তোলে- জগা-তকাই- নীতা পালিয়ে যায়।)

ঘনা : আরে এতো বগা- তোকে গত মাসে শিশির কুঞ্জে ঠাকুরের বাসন চুরির জন্য ধরেছিলাম না। বল ব্যাটা আবার কি চুরি করলি?

বগা : আমি চুরি করিনি দারোগাবাবু।

নন্দ : ও একটা চোরাই মাল নিয়ে এসে জোচ্চুরি করছিল-

ঘনা : চোরাই মাল কোথা থেকে ঝাড়লিরে বগা?

বগা : আজ্ঞে ওই ফেরাওয়ালার কাছ থেকে, মা কালীর দিব্যি ঝাঁপিনি, নগদ সাত টাকা সাতচল্লিশ পয়সা দিয়ে কিনেছি।

ঘনা : বটে, তো মালটা কই, দেখি?

নন্দ : মাল নিয়ে পগাড় পার-

ঘনা : কে ?

বগা : যার মাল তার- ওই ফেরীওয়ালা-

ঘনা : ও, তবে তো ঝামেলা মিটে গেল-

নন্দ : আজ্ঞে না দারোগাবাবু- ওই ফেরীওয়ালাটা কিন্তু একটু অদ্ভুত খ্যাপাটে আছে-

ঘনা : কি রকম:

নন্দ : জিনিস ফেরী করে, কিন্তু দাম নিতে চায় না। শুধু বলে শুদ্ধ মনের অধিকারী হও।

ঘনা : শুদ্ধ মন! কোনো আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট নাকি?

নন্দ : তা জানিনা, তবে ওর ঠেলায় ঝুড়িতে সব ভাঙাচোরা জিনিস, অকেজো বেহালা, ফেঁসে যাওয়া তবলা ডুগি, ফাটা বাঁশি

বগা : জং ধরা হাতুনি,বাতিল যন্ত্রপাতি এইসব-

ঘনা : কেসটা তো বেশ রহস্যজনক-

নন্দ : আর মুখে অদ্ভুত গান লাল গানে নীল সুর - হাসি হাসি গন্ধ
(বাইরে গানটা শোনা যায়- হুলু গাইছে, লাল গানে নীল সুর-হাসি হাসি গন্ধ)

নন্দ ও বগা: ওই ওই -শুনুন দারোগাবাবু-

ঘনা : হুঃ দাঁড়া তোর গন্ধ বের করাচ্ছি- এই এই হাসি হাসি গন্ধ- দাঁড়া দাঁড়া বলছি-
(ঘনা দারোগা দ্রুত ছুটে যায়। বগা, নন্দ তাকে অনুসরণ করে)

পর্ব সাত

পথে চলেছে হুলু-মুখে গান- "লাল গানে নীল সুর- হাসি হাসি গন্ধ" - এমন সময় গোপাল শান্তনুকে নিয়ে হুলুর পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

হুলু : কি ব্যাপার, গোপাল ভায়া- এই সাঁঝের বেলায়-

গোপাল: তোমাকে দেখাতে-

হুলু : আমাকে?

গোপাল: আমাদের ঘরে নতুন অতিথি ।

হুলু : কেন? আমি চিড়িয়াখানার জন্তু না মিউজিয়ামের ফসিল?

গোপাল: কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরও তো হয়ে পারো

হুলু : হ্যাঁ মন্দিরের হাড়িকাঠ-

গোপাল: তবে বলি দেওয়ার জন্য আনিনি-

হুলু : শান ভাই এই হুলু আমাদের এখানে এসে একেবারে হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছে-

শান্তনু : নমস্কার আমার নাম

হুলু : শান্তনু। আমি জানি।

গোপাল: তুমি জান?

হুলু : হ্যাঁ ওনার আসার প্রতীক্ষায়ই তো আছি-

গোপাল: শান ভাই এর প্রতীক্ষায়-

হুলু : হ্যাঁ গোপাল ভাই- তোমার শান ভাই আধার হিসাবে যোগ্য আধার। জ্ঞানী-বিনয়ী-শক্তিধর- কিন্তু দম্ভ আস্ফালন কিছু নেই। সুযোগ পেলেই ও আরো জ্ঞানী হয়ে উঠবে-

শান্ত : আমি একজন মিডিওকার। গবেষণার ইচ্ছা ছিল অভাবের চাপে তাও হয়নি-

হুলু : হবে শান্ত ভাই -হবে। সেজন্যই তো আমার এখানে আসা-

শান্ত : শুধু আমার জন্য -

হুলু : না শুধু তোমার জন্য নয়,তোমাদের এই অঞ্চলটাও আমায় খুব টানে- এই শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্বপ্নিল ছবির মত, বারোমাসে তেরো পার্বণ, যেখানে গান গেয়ে বাউল নাচে, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা, ওঠে জীবন যুদ্ধের গান, যেখানে মানুষের মুখে অকৃত্রিম হাসি- সেই মুচকুন্দপুরে বিপদের সংকেত এসে পৌঁচেছে, আর তা পৌঁচেছে তোমাকে আশ্রয় করে-

গোপাল: শান ভাইকে আশ্রয় করে?

হুলু : হ্যাঁ লোভের - হিংসার - ক্ষমতার একটা কালো দৈত্য শান্তনু'র পিছু পিছু আসতে চাইছে-। ভয় পেয়োনা- আমি আর শান্তনু দুজনে মিলে সেই দত্যিটাকে হারিয়ে দেবো- কি পারবো না শান্তনু-

শান্তনু : কী জানি,কী হল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর
একী কারাগার ঘোর-
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

হুলু : বাঃবাঃ (ছুটে শান্তনুকে জড়িয়ে ধরে)

শান্তনু : আচ্ছা তুমিই কী সেই ভানুসিংহ, আমার স্বপ্নের মধ্যে যার নিত্য আসা -যাওয়া
(ঘনা দারোগা, নন্দ আর বগাকে নিয়ে ঢোকে)

ঘনা : ও ভানু -টানু যেই হওনা কেন, তুমি ইউ আর আন্ডার এরেস্ট। (হুলুর হাতে হাতকড়া পরায়)

শান্তনু : কেন ওর কী অপরাধ?

ঘনা : ওর এই ঝুড়িতে চোরাই মাল রয়েছে- একটা লাট্টু, ফুটো ডুগডুগি, এগুলি সবই সন্দেহজনক-

শান্তনু : এগুলো তো ভাঙা চোরা খেলনা-

ঘনা : এই ভাঙাচোরা খেলনাগুলোই তো বিপজ্জনক।
(গজপতি - আর সুরপতি আসেন)

সুর : তুমি লোকটা ক্রমশ:ই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছ হে ঘনশ্যাম।

ঘনা : স্যার আপনি-

সুর : শুধু শুধু একটা নিরীহ ফেরীওয়ালাকে এরেস্ট করছো- আর ওদিকে যে কেষ্ট গরু চুরি করলো তার বেলা-

ঘনা : সে যদি হাসপাতালে শুয়ে থাকে, তবে তাকে ধরবো কি করে স্যার?

গজু : ওসব বিতর্ক থাক, দারোগাবাবু। বলছিতো ও কোনো অপরাধ করেনি। শুধুশুধু সন্দেহের বশে-

সুর : হ্যাঁ কোনোও কগ্নিজেবল অফেন্স না থাকলে ওকে তো অ্যারেস্ট করতে পারো না, ঘনশ্যাম , খুলে দাও হাতকড়ি। (ঘনশ্যাম খুলে দেয়)

ঘনা : ঠিক আছে স্যার- আপনি যখন বলছেন তখন ছেড়েই দিচ্ছি। তবে স্যার পকেট থেকে যখন একবার হ্যান্ডকাফ বের করেছে তখন তো তাকে ধরতেই হবে, রিটায়ার্ড হলে কী হবে, আপনি তো জানেন, অলিখিত আইন হ্যান্ডকাফ একবার বের করলে খালি খালি তা পকেটে ভরা যায় না। তো কাকে ধরবো স্যার-

সুর : এই তো, গোপাল সামনেই আছে। ওকেই ধরো, রোজ বাজারে গিয়ে গজুর পকেট থেকে একশো-দেড়শো সরায়-

গজু : গোপাল-

গোপাল: যাই মাসীমা ডাকছে। মেশোমশাই মাসীমা কিন্তু খাবার সাজাচ্ছে, দেরী করবেন না। যাই মাসীমা - (বেরিয়ে যায়)

ঘনা : এই যাঃ চলে গেলো তো-

সুর : তো এই বগা বা নন্দকে ধরো। একটা জোচ্চুরি করে অন্যটা লোককে মাঙনা খাটিয়ে নিয়ে গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেয়-

বগা : ও গো নন্দ খুড়ো - তুমি তো শান্ত বুড়ো

নন্দা : দারোগা করলো তাড়া- বলি থাম এখটু দাড়া।
(বগা নন্দর কোলে উঠে পড়ে, দুজনে পালায়)

ঘনা : পালালো পালালো চোর পালালো । (ওদের পেছনে ছোটে)

সুর : হ্যাঁ খিঁচুড়ি ঠাণ্ডা করে খাওয়ার কোনো মানেই হয় না, এসো হে বাবারা-

হুলু : গজুবাবু স্যার এই লাট্টুটা আপনি নিয়ে যান।

শান্ত : তোমার বিপদে ভয় নেই-

হুলু : নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি। আর তোমাদের কবিই তো বলেছেন- " বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/বিপদে আমি না যেন করি ভয়" (চলে যায়)

শান্ত : আচ্ছা- এমন শান্ত নিরীহ একটা মানুষকে মারতে চাইছ কেন? ওতো ডন বা গুপ্তচর নয়।

ম্যাডাম: তুমি কি বুদ্ধু না বুদ্ধ? এমন একটা সুযোগ পেলেন? পিস্তলটায় সাইলেন্সার লাগানো আছে। জড়িয়ে ধরলে যখন,তখন ট্রিগারটা টিপে দিলেই তো খেল খতম।

শান্ত : আপনারা কি সবসময় আমাকে ফলো করছেন নাকি?

ম্যাডাম: দায়টা যে আমাদের শান্তনু বাবু। যাও শান্তনুবাবু ডিনার শুনলাম রেডি, এনজয় খিঁচুড়ি এন্ড ইলিশ মাছ ভাজা।

শান্ত : এরকম একটা গরীব, জানটাকে মারতে চান কেন আপনারা? লোকটার তো কিচ্ছু নেই। অলমোস্ট বেগার।

ম্যাডাম: ওটা ক্যামোফ্ল্যাজ। মাই ডিয়ার শান। লোকটা আসলে ধুরন্ধর। ওর সঙ্গে একটা ডিল করতে চেয়েছিলাম। ও তাতে রাজী নয়। কয়েক কোটি টাকার অফার ও রিফিউজ করেছে।

শান্তনু : কিসের ডিল, জানতে পারি-

ম্যাডাম: দ্যাট ইজ গন অফ্ ইয়োর বিজনেস। বেশি কৌতুহল বস পছন্দ করেন না। যাও খিঁচুড়ি খেয়ে কাজটা সেরে ফেলো। মনে রেখো তোমার বাবার অপারেশন এখনও হয়নি- (চলে যায়। শান্তনু হতাশায় মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে)

শান্তনু : ছিন্ন মুহূর্তের সেই ভস্ম হওয়া জ্বালা সেদিন লুকিয়ে ছিলে, আজ আমার পালা?
(চলে যায়)

পর্ব আট

গজপতি বাড়ির রোয়াকে একটি টুলে বয়স্ক লোকের ছদ্মবেশে বস বসে সুচরিতা দেবীর সঙ্গে কথা বলছেন।

বস : মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠা কি সহজ কথা মা।

সুচরিতা: ঠিক, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কী? অমন ভুবন জোড়া নামী বিজ্ঞানী গজপতি বসু। জগদীশ বসু, সত্যেন বসুর পরেই গজপতি বসু- দি গ্রেট।

সুচরিতা: দি গ্রেট ভুলুবাবু- সংসারের কাজে ভুলভাল, সাধারণ জ্ঞান কিচ্ছুটি নেই, জিরো-শূন্য।

বস : কিন্তু কত বড় বিজ্ঞানী। মাধ্যাকর্ষণ, রিলেটিভিটি কত কী আবিষ্কার করেছেন-

সুচরিতা: আপনি নরহরি গুপ্তর পুঁথি পড়েছেন।-

বস : না মা- স্টিফেন হকিংস পড়তে গিয়ে ওটা আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

সুচরিতা: নরহরির বিজ্ঞান কী বলছে জানেন আগে নাকি মাধ্যাকর্ষণ বলে কিছু ছিল না, তখন সাধারণ মানুষ, গরু, কুকুর, ছাগল, মায় গাছপালা অবধি গ্যাস বেলুনের মত ভেসে ভেসে বেড়াত, তারপর উঁচুতে উঠতে উঠতে উঠতে স্বর্গে গিয়ে ঠেকত। তাইতো স্বর্গের লোকেরা ভারী জ্বালাতন করে উঠলো। স্বর্গে গাদাগুচ্ছের মানুষ, গরু, ছাগল, ঢুকে পড়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থা। ওদিকে পৃথিবী ফাঁকা পড়ে আছে, সৃষ্টি রসাতলে যাচ্ছে। তখন নাকি সৃষ্টি বাঁচাতে ব্রহ্মা একটা রাক্ষুসে চুম্বক মাটির নীচে পেতে দিলেন। ব্যাস সেই থেকে সব আমরা আটকে আছি-

বস : এটা ছাপা হলে আপনার বঙ্গশ্রী পুরস্কার রোখে কে!

সুচরিতা: চা খাবেন?

বস : না মা, আমার চা খাওয়া বারণ। তা বলছিলাম কী মা জননী, গজপতি বাবুর ল্যাবরেটরী একবার দেখা যায় না-

সুচরিতা: নিশ্চয়ই যায়। উনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। আসুন তারপর দেখবেন।

বস : বলছিলাম কী মা গজুবাবুর ল্যাবরেটরীতে কয়েকটা বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে-

সুচরিতা: কিন্তু আমি শুনেছি, জেনেছি ওগুলো নাকি খুবই উপকারী জিনিস-

বস : ভুল শুনেছেন মা, ওগুলো খুবই ক্ষতিকর। বাড়িতে ওই ভয়ানক জিনিসগুলো রাখলে আপনাদের ক্ষতি হয়ে যাবে মা।

সুচরিতা: তাহলে ওগুলো ফেলে দিতে হবে, তাই তো।

বস : আপনার কিচ্ছুটি করতে হবে না মা, আমাকে একবার গজপতি বাবুর ল্যাবে যেতে দিন, আমি নিজের হাতে ওই আবর্জনা পরিষ্কার করে, আপনাদের বাড়ি বিপদমুক্ত

করবো।

সুচরিতা: তার মানে বলে কয়ে আপনি ওগুলো চুরি করবেন।

বস : পরাস্বাপহরণকে চুরি বলে, কিন্তু ওগুলো তো গজপতিবাবুর নিজস্ব নয়, ওই দুষ্টু ফেরীওয়ালাটা গজুবাবুর ঘাড়ে ওগুলো গছিয়ে আপনাদের বিপদে ফেলতে চাইছেন।

সুচরিতা: ও মা কত মহৎ পরোপকারী মানুষ আপনি, একটু অপেক্ষা করুন, বাজারের থলেয় ভরে আমি ওগুলো নিয়ে আসছি। কতবড় বিপদ থেকে আপনি বাঁচালেন আমাদের - হতচ্ছাড়া শয়তান দাঁড়া তোর একদিন কী আমারই একদিন-

বস : (ঘাবড়ে গিয়ে) মা জননী-

সুচরিতা: ওই ফেরীওয়ালাটাকে বললাম, আপনি বসুন-

(সুচরিতা চলে যায়। বস একটু রিলাক্স করে গুন গুন করে গেয়ে ওঠে- এক খানেতে রাজা উজির দুই খানেতে আম্বানী-আদানি তিন খানেতে...সুচরিতা একটা ঝাঁটা দিয়ে বসকে পেটাতে শুরু করেন, 'তিন খানেতে ঝাঁটা পেটানি"।

সুচরিতা: হারামজাদা, পরস্বাপাহরক, মিথ্যেবাদী, ভণ্ড, ঝেঁটিয়ে তোর বিষ যদি না ঝেড়ে দিই তবে আমিও গজু গিন্নী নয় (মারতে থাকেন, বস- বাবাগো, মাগো বলে নিজের ছদ্মবেশ খুলে পালিয়ে যায়) ঠিক এই সময়ই গজু-সুর-শান্তনু ঢোকে)

গজু : কি হোলো, কি হোলো ?

সুর : এমন মা চামুণ্ডার মত রণরঙ্গিনী মুর্তি কেন?

শান্তনু : কি হয়েছে কাকীমা?

সুচরিতা: একটা ভণ্ড জোচ্চুর তোমার ল্যাবরেটরী থেকে হুইসেল, আর টর্চটা চুরি করতে এসেছিল । দিয়েছি ঝাঁটাপেটা করে বেটার বিষ ঝেড়ে।

সুর : বাবাঃ এতো মারাত্মক কাণ্ড। আমাদের মুচকুন্দপুর যে কলকাতার মত হয়ে উঠল।

শান্তনু : কাকীমা আপনি ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন।

গজু : হ্যাঁ, একটু বিশ্রাম নাও। আর শোনো এই লাট্টুটা ল্যাবরেটরীতে টর্চ আর হুইসেলের পাশে রেখে দাও।

সুচরিতা: ঠিক আছে, একটু বিশ্রাম নিয়ে আমি খিঁচুড়ি চাপাচ্ছি। না খেয়ে যাবেন না সুরপতিদা।

(সুচরিতা ভেতরে যান। গজপতি, সুরপতি, শান্তনুকে বসতে বলে নিজেও বসে)

গজু : একটা কথা তোমাদের বলি শান্ত, সুরপতি

সুর : কি কথা?

গজু : কথাটা বিজ্ঞানের শান্তনু বুঝবে, কিন্তু তুমি?

সুর : বুঝবো না কেন মনে হচ্ছে তোমার?

গজু : আসলে সুচরিতা, তুমি আমার মতামতকে তেমন গুরুত্ব দাও না, ভুলে যাও আমি একজন রিটায়ার্ড সায়েনটিস্ট।

সুর : আমিও রিটায়ার্ড ডি আই জি।

শান্ত : স্যার, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন-

গজু : এই যে ফেরীওয়ালা হুলু। ও হয় নামকরা বিজ্ঞানী

সুর : নয় বিরাট বড় স্মাগলার-

শান্তনু : (সুরপতির দিকে তাকিয়ে) তা বোধহয় নয়।

গজু : হ্যাঁ ঠিক আমি এটাই বলতে চাইছি। এই যে হুইসল বাজালে শব্দ হয় না কিন্তু গন্ধ বের হয় আর তাতে মশা মাছি বিষাক্ত পোকা সব ভ্যানিশ, টর্চের আলোয় পৃথিবীরদূষণ কমে যায়, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, জবা গাছে ফুল ফুটতে, লাট্টুটা ঘুরছে এখনও ঘুরছে আমি দেখেছি, সেটাতে পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়। এগুলো বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

শান্তনু : ঠিক, এগুলো চিনে তৈরী কোনও খেলনা নয়, কোনও ম্যাজিক আইটেমও নয়। এরকম জিনিস যে আবিষ্কার করেছে, তার উচিৎ জিনিসগুলোর পেটেন্ট নেওয়া এবং আবিষ্কারটা ঘোষণা করা। তাতে সে কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারে। এমন কি নোবেল প্রাইজ অবধি পেতে পারে।

সুর : বলো কী হে হুইসেল, টর্চ আর লাট্টু আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ।

গজু : আমার তো মনে হয় তার চেয়েও বড় সম্মান তার প্রাপ্য।

সুর : এগুলো সায়েন্স ফিকশন নয় তো?

শান্তনু : যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাকে ফিকশন বলি কেমন করে।

গজু : ঠিক, আমি রিটায়ার করেছি বটে, কিন্তু নিয়মিত সায়েন্স জার্নালগুলি পড়ি। ইন্টারনেট থেকে পয়সা খরচ করে ডাউনলোড করি, হালফিল বিজ্ঞানের খবর রাখার জন্য। আমি জানি এরকম কোনও জিনিস আবিষ্কার হয়নি। আমার অন্তর দিয়ে এটাও বুঝতে পারি যে এগুলিই আগামী বিজ্ঞান। পৃথিবীর দূষণ মুক্ত করতে পরিবেশকে হিউম্যান ফ্রেন্ডলি করে তোলার নিমিত্তে এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

সুর : কী রকম সাহায্য?

গজু : হুলুর দেওয়া এই জিনিসগুলো আমরা জীবন দিয়ে রক্ষা করবো।

শান্তনু : স্যার, আমার মনে হয় ও কোনো কারণে আপনার হেফাজতে জিনিসগুলো রাখতে চায়, যাতে এগুলোর সদ্ব্যবহার হয়।

গজু : ঠিক-আমি জিনিসগুলো আমার ল্যাবে নিয়ে গিয়েছি, তুমি শুনলে অবাক হবে শান্তনু। টর্চ আর হুইসেলটার আমি একটা এক্সরে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রঞ্জনরশ্মি

ও দুটোর বডি পেনিট্রেট করতে পারেনি।

সুর : তুমি দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের এটা জানাও।

গজু : জানাবে শান্তনু, আমি থাকবো পাশে।

শান্তনু : স্যার হুলু ফেরীওয়ালার নিরাপত্তাটাও জরুরী।

গজু : ওটাইতো সুরকে দেখতে বলছি, ওর পুলিশী ইন্টিলিজেন্স দিয়ে-

(সুচরিতা ছুটে আসে। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে)

সুচরিতা: ওগো সর্বনাশ হয়ে গেছে , তোমার ল্যাবরেটরীর দরজা হাট করে খোলা আর ওই বিদঘুটে তিনটি জিনিসও উধাও-

গজপতি: সে কী? (হতাশ ভঙ্গীতে বসে পড়েন)

সুচরিতা: আর গোপালকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুরপতি: আমি তখনই বলেছিলাম গোপালটাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

গজপতি: সে ভাবনা পরে, কিন্তু ওই দুর্মূল্য জিনিসগুলো কি উদ্ধার করা যাবে?

শান্তনু : স্যার আমি একটু হুলুর ডেরা থেকে ঘুরে আসছি।

সুচরিতা: এত রাতে-

শান্তনু : সময়টা যাতে হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে না যায়, তাই আমায় এক্ষুণি যেতে হবে-

গজপতি: হুঁশিয়ার থেকো শান্তনু-

সুচরিতা: সাবধানে যেও

(শান্তনু ছুটে বেরিয়ে যায়। সবাই সেদিকে তাকিয়ে থাকে)

পর্ব নয়

হুলুস্থুলুর প্লাস্টিকের ইগলুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গোপাল, কাঁধের ব্যাগে লাট্টু, টর্চ আর হুইসল। গোপালের খুব আনন্দ। গোপাল - তাইরে নাইরে ভাইরে- চিন্তা আর নাইরে- তাধিন-ধিনা-তাধিন ধিন- হাতে এলো এক-দুই-তিন।

(তিনটে জিনিসই ব্যাগ থেকে বার করে। হুইসল বাজায় সশব্দে হুইসল বেজে ওঠে। হতাশ হয়। টর্চ জ্বালে টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে। আরো হতাশ হয়। লাট্টুটা ঘোড়ায় লাট্টু ঘোরে না। খুবই হতাশ হয়ে পড়ে গোপাল)

গোপাল: (প্রায় কাঁদতে বসে) এই কি হচ্ছে কি? হুইসল গন্ধ না ছড়িয়ে বেজে চলেছে, টর্চ আলো ছড়াচ্ছে, লাট্টু তো ঘুরছেই না। কী সর্বনাশ, এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

(হুলু এসে দাড়ায়)

হুলু : এমনই হবার কথা। এ বিজ্ঞান অনেক উন্নত বিজ্ঞান। অযোগ্য আধারে সবই বাতিল হয়ে যায়। মুচকুন্দপুরে একমাত্র গজপতি বাবুর হাতেই এগুলো সজীব, সচল, যার মন লোভে -মোহে- মাৎসর্থে বদ্ধ তার হাতে এগুলো অকেজো জিনিস।

(গোপাল পরপর হুইসল, টর্চ আর লাট্টু হুলোর দিকে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু সেগুলো

হুলু স্পর্শ করে না। গোপাল ক্ষেপে যায়)

গোপাল: দাঁড়াও বস-আর ম্যাডামকে নিয়ে এক্ষুণি আসছি, তোমার রহস্যের পর্দা ফাঁস করবোই করবো। (চলে যায়)

হুলু : না, এখানে, আমার ব্যবসাটা চললো না। এখনো এরা তৈরি হয়নি। দু-একজন ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সব নারী পুরুষ লোভ-হিংসা-ক্ষমতার মোহে বদ্ধ। স্বার্থশূন্য ভালোবাসার পরিবেশ যখন তৈরি হবে। তখনই নতুন উন্নত এই বিজ্ঞান এখানে কার্যকরী হয়ে উঠবে, তার আগে নয়। দেখি আবার নতুন কোন কল্পে গিয়ে বিজ্ঞান ফেরী করি। (এমন সময় হুলু হুলু চিৎকার করতে শান্তনু এসে হাজির হয়। সামনে হুলুকে দেখে বলে ওঠে-)

শান্তনু : তুমি ঠিক আছ? তোমার কোন ক্ষতি হয়নি তো?

হুলু : আমি ঠিক আছি বন্ধু। তুমি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার বাবার অপারেশন ভালো মতোই হবে। আর বাবার ব্রেণের টিউমারটা বি-নাইন।

শান্তনু : তুমি-

হুলু : আমি জানতে পারি বন্ধু। আর তুমি তো জানো মিথ্যে আমি বলি না।

শান্তনু : তুমি এত ভালো- আর আমি আমি-

হুলু : আমি জানি বন্ধু ওরা তোমাকে আমায় মারতে বলেছে -

শান্তনু : আমি তোমায় মারতে চাই না বন্ধু, আমি কাউকে মারতে চাই না। আমার বাবার অসুখের জন্য আমায় এই সুপারিটা নিতে হয়েছে।

হুলু : তোমার আগে আমাকে জগা-তকাই-নীতা মারতে এসেছিল- ওরা লোভী- ওরা হিংস্র, তাই ওরা উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তুমি তো তা নও পিতৃসত্য পালনের জন্য তুমি আমায় মারতে এসেছ। এসো বন্ধু আমার ঘরে এসো। দেরী করে লাভ কী? পিস্তলটা তোলো- চালিয়ে দাও আমার বুকে গুলি। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌবল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

(হুলু ইগলুর কাছে যায়- দরজার সামনে দাঁড়ায় শান্তনু গুলি করে। হুলু প্রায় উঠে গিয়ে ঘরের ভেতরে পরে। শান্তনু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। গুলির শব্দে গোপাল-ম্যাডাম-বস ছুটে আসে)

ম্যাডাম : কোথায় সেই ফেরীওয়ালা?

গোপাল: কোথায় কোথায়?

শান্তনু নি:শব্দে ইশারায় ঘরের ভেতরটা দেখিয়ে দেয়। সবাই ছুটে যায়। শুধু বস থামে-

বস : তোমার বাবার পোস্ট অপারেটিভ খরচের টাকাও ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। (ভেতরে যায়)

(বস-ম্যাডাম-গোপাল তিনজনে হুলুর ইগলু ঘরে ঢোকার পর ঘরের মধ্যে

আলো-শব্দ এর নানাবিধ খেলা শুরু হয়। প্রায় মিনিট খানেক পরে গান বেজে ওঠে- গানের তালে নাচতে বস-ম্যাডাম-গোপাল বেরিয়ে আসে- তিনজনে মিলে বলতে থাকে-

" হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী, তিন জনেতে জটলা করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি"

শান্তনু : (অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে) ওরা আহ্লাদী হয়ে গেছে, আহ্লাদী হয়ে গেছে। (ওরা তিনজন শান্তনুর দিকে অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকায়)

বস : এই মনে কর রোদ পড়েছে ঘাসেতে

ম্যাডাম: চাঁদের আলো পড়ল তারি পাশেতে।

গোপাল: এরই মধ্যে হাই তোলবার আছে কী?
আকাশপানে তাকাস খালি, যাচ্ছে কথা কানে কি?
(তিনজনে চলে যায়। শান্তনু কাঁদতে থাকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে হুলু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।)

হুলু : তুমি দুঃখ পেয়ো না বন্ধু। তোমার সত্য রক্ষা তো হয়েছে। তুমি তো আমাকে গুলি করেছ। আমি যদি না মরি, সেটা তো আর তোমার দোষ নয়। তোমার সব দেনা শোধ বোধ। এবার নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও।

শান্তনু : এই পিস্তলটা?

হুলু : আমায় দাও। (শান্তনুর কাছ থেকে নেয়) আজ থেকে বহু বছর পরে যখন মানুষ আর অস্ত্রের ব্যবহার করবে না, তখনকার সময় এটা পুরোনো জিনিস হয়ে যাবে। আমি তখনকার মানুষকে এটা বিক্রী করবো। তারা এটা শোকেসে সাজিয়ে রাখবে, আর দেখে ভাববে, এক সময়ে মানুষ কত হিংস্র ছিল। (কথা বলতে বলতে-হুলু -আকাশে মিশে যায়। আকাশে -বাতাসে আনন্দধ্বনি বেজে ওঠে- তার মধ্য থেকে গান ভেসে আসে- " রাত পোহালো- শারদ প্রাতে")

লেখক : **কুন্তল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যকার।**

Playwright: **Kuntal Mukhopadhyay, eminent Theatre personality of West Bengal.**

হনন

■ বারীন চক্রবর্তী

চরিত্র : মোহিত পাণ্ডে, শ্রুতি খট্টর, পুলিশ অফিসার।

(প্রথম দৃশ্য)

(জনবহুল মেট্রোপলিটন শহরে মধ্যবর্তী অঞ্চলে চৌমাথার মোড়। মোড় থেকে ডানদিকে বা বাঁদিকের রাস্তায় পা রাখলেই, পুরাণো বাড়ি ভেঙে রাস্তার দু'দিকে গড়ে উঠেছে সারিবদ্ধ বহুতল আল্ট্রামডার্ন অ্যাপার্টমেন্ট। সেই অ্যাপার্টন্টেগুলির মাঝখানে পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ একটি তিনতলা প্রাচীন বিশাল কারুকার্য করা অট্টালিকা।অট্টালিকার দেওয়াল এবং থামগুলিতে ফাটল ধরিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাতাযুক্ত ডালপালা সহ বিশাল বটগাছ। ডালপালার ঝুরি চতুর্দিক থেকে অট্টালিকার দেওয়ালের সাথে জড়াজড়ি করে শরীর বেয়ে নেমে এসে মাটিতে গেঁথে গিয়ে নিজেরাই হয়ে উঠেছে একেকটি বিশাল কাণ্ড। দেখে মনে হয় পরস্পরের বন্ধু।

তিনতলা অট্টালিকার ছাদে আছে একটি মাঝারি ধরণের চিলেকোঠা। এবার এই নাটকের মঞ্চসজ্জায় আগোছালো চিলেকোঠার ভিতরের অংশ দৃশ্যমান। বটগাছের ডালাপালা চিলেকোঠার দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বটের ঝুরি মেনে এসেছে ছাদ থেকে। মাকড়সার জাল চিলেকোঠার আনাচে কানাচে। প্রতি মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা। তবুও দীর্ঘদিন ধরে এই চিলেকোঠায় কেউ বসবাস করেন। দেওয়ালের একদিকে কয়েকটি আঁকাবাঁকা মরচে ধরা লোহার শিক লাগানো কাঠের খোলা বড় পাল্লাহীন জানালা। শেই জানালা থেকে রাস্তার এপার ওপার দেখা যায়। জানালার দিকের দেওয়াল চিলোকোঠা থেকে সোজা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। আয়তন অনুযায়ী জানালায় লোহার শিকের সংখ্যা খুব কম। একজন মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। দিনের বেলা সেই খোলা জানালা থেকে নীল আকাশ এবং গগনচুম্বী সারিবদ্ধ বহুতল আল্ট্রামডার্ণ অ্যাপার্টমেন্টগুলি দেখা যায়। রাত্রিবেলা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং এবং ট্রাফিক লাইটের নিয়ন রঙিন আলোয় শহরের আকাশ ঝলমল করতে থাকে। আবার সেই আলোর কিরণ জানালা থেকে চিলেকোঠার ভিতরে এসে মায়াজাল তৈরি করে। ভেসে আসে পারিপার্শ্বিক কোলাহল এবং যানবাহনের শব্দ। চিলোকোঠার ডানদিকে দেওয়ালের গা ঘেষে ছবি আঁকার কাঠের ষ্ট্যাণ্ডে বা ইজেলের ওপর বোর্ডে টাঙানো আছে হাতে আঁকা বড় মাপের হ্যান্ডমেড সাদা ড্রয়িং শিটের ওপর জলরং করা অট্টালিকার বহির্ভাগের দৃশ্যের ছবি। সেই ছবি দেখে নাটকের বর্ণনা অনুযায়ী অট্টালিকার বর্তমান পরিস্থিতি বোঝা যায়। দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরত্বে রাখা আছে একটি

পুরাণো সাদা মলিন মোটা ফিতে দিয়ে তৈরি মাঝারি ধরণের ক্যাম্প খাট। সেই খাটের ওপর স্তূপীকৃত অব্যবহৃত জিনিসপত্র। বাঁদিকের উইংসের পাশে অ্যালুমিনিয়ামের ক্লোদ ড্রাইং স্ট্যাণ্ডের এপর রাখা যাবতীয় কাপড়চোপড়। মঞ্চের সম্মুখে ডানদিকে টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা আছে বহু পুরণো টাইপরাইটার এবং কিছু রঙিন কভার যুক্ত ছেঁড়া ফাইল। খাবার জলের বড় প্লস্টিকের পাত্র। হাতলযুক্ত চেয়ারে রাখা আছে হাত মোছার রঙিন টাওয়াল। টেবিলের পাশে বসার জন্য কাঠের তৈরি একটি ছোট গোল টুল। অন্যদিকে মঞ্চের বাঁদিকে বেশ কিছু মোটা মোটা ইংরেজি বইপত্র রাখা একটি উঁচু রেক। তার ওপর রাখা আছে বিভিন্ন মাপের প্লাস্টিকের জার। যেগুলোর ভিতরে বিভিন্ন ধরণের মুখরোচক খাবার রাখা আছে। খাবারের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরণের বিস্কিট, চিড়েভাজা চানাচুর এবং ভাজা ছোলা।

বাঁদিকের দরজা চিলেকোঠার প্রবেশপথ এবং ডানদিকের দরজা চিলেকোঠা সংলগ্ন রান্নাঘর। রান্নাঘরে ঢোকার মুখে দেওয়ালে একটি আয়না ঝোলানো।

সময় গভীর রাত্রি। নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে ভেসে আসে যানবাহনের কর্কশ হর্নের শব্দ অথবা রাস্তায় জেগে থাকা কুকুরের ডাক।

দরজার তালা খোলার শব্দ। মঞ্চ মৃদু আলোকিত হওয়ার পর দরজার বাইরে পুরুষ মানুষের গলা শোনা যায়। নাম মোহিত পাণ্ডে। বয়স ষাটোর্ধ্ব।)

মোহিত : (বাইরে থেকে) কিরে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ঘুম তো আসবেই। রাত যে অনেক হয়েছে। ফিরতে ফিরতে আজও দেরী হয়ে গেল!

(গলার আওয়াজ শুনে ক্যাম্প খাট সামান্য নড়ে ওঠে। বাদুর উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। বাইরে থেকে মোহিতের আওয়াজ শুনে সেই খাটে কেউ যেন উঠে বসে এবং ধীরে ধীরে দর্শকদের দিকে যখন সে মুখ ঘোরায়, তখন তাকে দেখে মনে হয় সে শিশুর মত দেখতে একটি পুতুল। পুতুলের গলায় যান্ত্রিক আওয়াজ শোনা যায়, "আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ!! আই লাভ ইউ!!!" এই তিনটি শব্দ বলে ধীরে ধীরে পুতুলটি আবার চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

তালা খুলে মোহিত পাণ্ডে ঘরের বিতর পা রাখেন। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালিয়ে ঘরের চতুর্দিকে ঘোরাতে থাকেন। এক সময় চাবি দেওয়ালে ঝুলিয়ে পুরাণো টাইপ মেশিনের পাশে টেবিলের ওপর রাখা মাঝারি ধরণের কোরোসিনের ল্যাম্প জ্বালান।

মঞ্চে আলোর উজ্জ্বলতা সামান্য বৃদ্ধি পায়। মোহিত পাণ্ডের পোষাক সেই আলোয় ভেসে ওঠে। মলিন পোষাকের মধ্যে হাল্কা হলুদ জামার ওপর তাপ্পি লাগানো কালো কোট, সাদা ঢিলেঢালা ট্রাউজার ধরে রাখার জন্য কাঁধের এপর সাসপেণ্ডারস বেল্ট এবং পায়ে কালো ছেঁড়া জুতো । কথা বলার সময় মাঝে মাঝে ট্রাউজারের সাথে লাগানো সাসপেণ্ডারস বেল্ট দুহাত দিয়ে টানতে থাকেন। ডান হাতে সাদা ডায়ালের পুরাণো হাতঘড়ি। বগলে

মোটা ফাইল। হাতে ঝোলানো খাবার। স্নান না করা দীর্ঘদিনের আগোছালো ঝাঁকড়া চুল, মুখে ছোট ছোট করে সাদাকালো দাড়ি, হলুদ দাঁত, চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের চশমা। মাথায় কালো রঙের পুরাণো বাকেট হ্যাট, চোখের নিচে কালি। সেই চোখের ভাষা আলাদা।

বাইরে থেকে নিয়ে আসা খাবার টেবিলের ওপর রাখেন। তারপর জুতো খুলে দরজার একপাশে রেখে আসেন। কোট খুলে ক্লোদ ড্রাইং স্ট্যাণ্ডের ওপর রেখে টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারের ওপর বসে পড়েন। টেবিলের হাতলে রাখা টাওয়াল দিয়ে মুখ মোছেন। মুখ মোছার সময় গালে হাত দেন। ব্যাথা অনুভব করেন।

মোহিত : আমি জানি তুই ঘুমোস নি! জেগে শুয়ে আছিস। একটু জিরোতে দে, তারপর একসঙ্গে বসে রাতের খাবার খাব।

(টেবিলের ওপর রাখা খাবার জলের বড় প্লাস্টিকের পাত্র নিয়ে গলায় জল ঢালতে থাকেন। তৃপ্তি সহকারে ঢক ঢক করে জল খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে গিয়ে টর্চ জ্বেলে নিজের মুখমণ্ডল দেখতে থাকেন)।

মোহিত : (ক্যাম্প খাটের দিকে তাকিয়ে পদচারণা করতে করতে বলতে থাকেন) আজ আমার দিনটা খুব খারাপ গেল বুঝলি? কোর্টের বাইরে আজ আমাদের পাড়ার একজন বহু পরিচিত অ্যাডভোকেট আমার গালে এমন একটা থাপ্পর মেরেছে, ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল! তারপর সেই রক্ত বরফ লাগানোর পর বন্ধ হয়েছে। আমার দোষ কি ছিল জানিস? আমি কেন ধর্ষিতার স্বপক্ষে কথা বলেছি। কারণ ঐ অ্যাডভোকেট ধর্ষিতা হওয়া নিজের ক্লাইন্টকে পয়সার লোভ দেখিয়ে কেস উইদড্র করতে বলেছিলেন। টাইপ করতে করতে অ্যাডভোকেটকে আমি বললাম, স্যার আপনি কি করছেন? আপনি তো অন্যায় করছেন।

(রেকের ওপর রাখা একমুঠো ভাজা ছোলা নিয়ে খেতে থাকেন। খেতে অসুবিধা হয়। খাওয়া বন্ধ করে, মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসেন)।

মোহিত : এভিডেন্স হিসাবে ধর্ষণ হওয়া মেডিকেল রিপোর্টকে আপনি অস্বীকার করছেন, স্যার? একজন অপরাধীকে কঠিন সাজা না দিয়ে, অপরাধীর অ্যাডভোকেটের সাথে হাত মিলিয়ে ঐ গরীব মেয়েটিকে এবং তার মা বাবাকে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে কেস উইদড্র করতে বলছেন? আমার কথা শুনে, আমাদের পাড়ার অ্যাডভোকেট অতুল জুনেজা ঐ মেয়েটিকে এবং মেয়েটির মা বাবাকে কোর্টের প্রেমিসেস থেকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসে সবার সামনে আমাকে যাচ্ছেতাই ভাবে গালিগালাজ করতে থাকল। বলল, আমার ক্লাইন্টের সামনে তুই আমাকে অপমান করলি? অ্যাডভোকেট আমি না তুই? আমি বললাম, আপনি একজন রিনাউণ্ড অ্যাডভোকেট হয়ে যদি অ্যাকিউজড বা অপরাধীর অ্যাডভোকেটের

সাথে হাত মিলিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন, তাহলে তো অপরাধীরা আরো সাহস পেয়ে যাবে। বিচার-ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকবে না, স্যার! তারপরেই উনি আমার গালে সপাটে চড় মারলেন। হাত লাগিয়ে দেখি, আমার ঠোঁটের কোন ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভীড় বাড়তে থাকল, বুঝলি? তাকিয়ে দেখি সবাই আমার দিকে অসহায় ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আমার প্রতি অ্যাডভোকেটের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখে সবাই হতভম্ব। ঠোঁটের কোনে রক্ত দেখে আমার পাশে বসে থাকা দীর্ঘদিনের পরিচিত একজন টাইপিস্ট বন্ধু দোকান থেকে বরফ নিয়ে এসে মুখে চেপে ধরল। রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আমি কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। লজ্জায় অপমানে নিজেকে তখন কি মনে হচ্ছিল জানিস? কুত্তা!কুত্তা! রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার কুড়িয়ে খাওয়া ঘেয়ো কুত্তা। (একটু থেমে) তবে ঐ থাপ্পড় খাওয়ার সাথে সাথে আমার কি মনে হয়েছিল জানিস? মনে হয়েছিল, পাতার পর পাতা টাইপ করার পর যে মোটা লম্বা সুঁচ দিয়ে কাগজগুলোকে ফুঁটো করে সুতলি পড়াই, সেই মোটা সূঁচটা ঐ অ্যাডভোকেটের বুকের পাঁজরে গেঁথে দি। (চোখেমুখে বীভৎসতা ফুটে ওঠে) না না না, একথা তখন মনে এলেও, আমি একাজ কখনোই করতে পারতাম না! আমি যে ভীষণ ভীতু রে! আমাকে এমন একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে, ওঁর এই অ্যাডভোকেট হওয়ার লাইসেন্স যাতে বাতিল হয়ে যায়, সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে। এই অপমানের বদলা শেষ অবধি আমি নেব রে! (আবার ক্যাম্প খাটের সামনে এগিয়ে যান) ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? (হাতঘড়ি দেখতে দেখতে) রাত অনেক হয়েছে! না না আর দেরি করব না! (খাবারের প্যাকেটে হাত রাখেন) এখনও গরম আছে! তুই চিকেন চাউমিন খেতে ভালোবাসিস বলে নিজে দোকানে দাঁড়িয়ে থেকে গরম গরম বানিয়ে নিয়ে এলাম। নে। এবার উঠে বোস আমি ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্য দুটো থালা নিয়ে আসি।

(টেবিলের ওপর থেকে ল্যাম্প নিয়ে মোহিত রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান।মঞ্চে আলোর পরিবর্তন হয়। শিশুর মত দেখতে উদ্ভট পুতুলটি ক্যাম্প খাটের ওপর উঠে বসে। ধীরে ধীরে দর্শকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে থাকে, "আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ!! আই লাভ ইউ!!!" মঞ্চের সব আলো ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পুতুলটিকে শুধু দেখা যায়। আলোর ছোট বৃত্তের মধ্যে পুতুলটি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মঞ্চে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে)।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(সময় ভোর। স্যাতস্যাতে আলো-আঁধারির মধ্যে চিলেকোঠায় হাল্কা আলোছায়ার সমাবেশ। বাইরে পাখির কোলাহল। নিস্তব্ধ চিলেকোঠায় ভিতরে শুধু টাইপমেসিনের খটখট শব্দ।

মোহিত পাণ্ডে টেবিলের সামনে বসে টাইপমেশিনের পাশে রাখা কাগজ দেখে দেখে টাইপ করছেন। ঘোলাটে ম্যাগনিফাইং চশমায় চোখদুটো বড় লাগছে। ট্রাউজারের সাথে কাঁধের ওপর সাসপেণ্ডার্স বেল্ট লাগান আধোয়া সেই মলিন পোষাক। পায়ে ছেঁড়া তাপ্পি দেওয়া চপ্পল। টাইপ মেশিনের পাশে নেভান কাঁচের ল্যাম্পে কালো কালির প্রলেপ দৃশ্যমান।)

মোহিত : (টাইপ করতে করতে মুখ থেকে শব্দ বেরোতে থাকে।) থার্ড রিমাইণ্ডার। কপি টু স্টেট বার কাউন্সিল। মিনিস্ট্রি অব ল অ্যাণ্ড জাস্টিস। (টাইপ শেষ করে পেটে হাত বোলাতে বোলাতে টাইপ করা কাগজ মেশিন থেকে বের করে পড়তে থাকেন। অথচ উচ্চারণের সেই ক্ষীণ শব্দ দর্শকদের কানে পৌঁছায় না।) পনেরো দিনের মধ্যে এটা হলো থার্ড রিমাইণ্ডার। অতুল জুনেজা, আমি তোমাকে অত সহজে ছাড়ব না বাছা! মনে রেখ, আমার নাম মোহিত পাণ্ডে! তোমার মত রিনাউণ্ড অ্যাডভোকেটের অহংকার .... (আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে) যাই এবার একটু হালকা হয়ে আসি।

(চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সাসপেণ্ডাস বেল্ট দপ'হাত দিয়ে টানতে থাকেন। তারপর হাই তুলতে তুলতে চিলেকোঠার প্রবেশ পথের দরজা খুলে মোহিত পাণ্ডে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে একজন যুবতী চিলেকোঠায় প্রবেশ করে। নাম শ্রুতি খট্টর। পরণে সাদা ট্রাউজারের ওপর মেরুণ রঙের টি-শার্ট। পায়ে কালো জুতো এবং খাকি রঙের মোজা। হাতে মোবাইল। চুলের বিনুনি দিয়ে মাথায় গোল মত খোঁপা করা। চিলেকোঠায় ঢুকে সে চতুর্দিকে তাকিয়ে ঘুরতে থাকে। রান্নাঘরে একবার উঁকি মারে। কয়েকবার "হ্যালো হ্যালো" বলে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বাইজেলে লাগানো বোর্ডের ওপর জলরং দিয়ে আঁকা ছবির কাছে এগিয়ে যায়। ছবির ওপর হাত রাখে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ক্যাম্প খাটের দিকে নজর যায়। ক্যাম্প খাট নড়ে উঠল মনে হয়। বিছানায় কি কেউ চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে? চাদর সরানোর জন্য হাত বাড়াতেই হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে। মোবাইলে নাম দেখতে দেখতে প্রবেশ পথের দরজার কাছে এগোতেই মোহিত পাণ্ডের মুখোমুখি হয়। মোহিত পাণ্ডের হাতে ইংরেজি পত্রিকা। যুবতী চমকে ওঠে। মোহিত পাণ্ডেকে দেখে মোবাইল অন করতে ভুলে যায়।)

মোহিত : (দরজা ভেজিয়ে রাখতে রাখতে) দেখুন, কার ফোন?

শ্রুতি : (চমকে ওঠে। মোবাইল তাড়াহুড়ো করে অফ করে দেয়) আপনি?

মোহিত : (পত্রিকা টেবিলের ওপর রাখেন) এই প্রশ্নটা কি আমার আগে করা উচিৎ ছিল না? কোথায় থাকেন?

শ্রুতি : এই পাড়াতেই। চৌমাথার ডানদিকে। নাম শ্রুতি খট্টর।

মোহিত : (শ্রুতিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে) আমি মোহিত পাণ্ডে।

(মোহিত এবং শ্রুতি পরস্পরের প্রতি হাত প্রসারিত করে এবং করমর্দন করে)

মোহিত : কুড আই আস্ক ইউ আ কোইশ্চেইন? আপনি হঠাৎ এই অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট হলেন কি করে?

শ্রুতি : অনেকদিন ধরে কৌতূহল ছিল, সময় করে একদিন এই বিশাল বাড়িটাকে দেখতে আসব। আজ সময় হলো, তাই চলে এলাম।

মোহিত : দীর্ঘদিন পরে এই ভগ্ন অট্টালিকায় অচেনা একজন যুবতীকে দেখে, আপনার থেকে আমার কৌতূহল আরো বেশি হয়েছে।

শ্রুতি : কেন?

মোহিত : আপনার সাহস দেখে।

শ্রুতি : আপনি কি এখানে একাই থাকেন?

মোহিত : দেখে কি মনে হচ্ছে?

শ্রুতি : আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে, আপনি একাই থাকেন। তবুও কেন জানি, আমার মনে হচ্ছে আপনার সাথে আরো একজন কেউ থাকেন!

মোহিত : থাকে তো! তবে সে নিজের পরিচয় দিতে পারে না। জড় পদার্থ!

শ্রুতি : ঠিক বুঝলাম না!

(মোহিত ক্যাম্প খাটের দিকে এগিয়ে যায়। বিছানা থেকে পুতুলটি তুলে শ্রুতির দিকে ঘুরিয়ে ধরে। তারপর সে পুতুলটিকে আদর করতে থাকে। মোহিতের ব্যবহার দেখে শ্রুতি কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব এবং বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।)

মোহিত : (পুতুলটিকে বলতে থাকে) নটি বয়! দেখ তোমরা ঘুমানোর ভান করে কেমন শুয়ে আছে! আমি যেন কিছু বুঝি না! তাই না? দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ কে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। একজন ম্যাডাম! নাম শ্রুতি কট্টর!

শ্রুতি : তার মানে, এই বয়সে আপনি পুতুল নিয়ে খেলা করেন?

মোহিত : পুতুল নিয়ে খেলা করা কি অন্যায়?

শ্রুতি : না না অন্যায় কেন হবে? আপনার মত বয়সের কাউকে কোনদিন পুতুল নিয়ে খেলা করতে চোখে দেখিনি তো, তাই আর কি!

মোহিত : এখন দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?

শ্রুতি : আই কান্ট এক্সপ্লেইন!

মোহিত : (শ্রুতির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পুতুলটিকে দু'হাতে ধরে মোহিত মঞ্চের সম্মুখে এগিয়ে আসে।) ও! আই কান্ট? আমি আপনাকে এক্সপ্লেইন করছি ম্যাডাম। আমার হাতে এই পুতুলটিকে দেখে প্রথমে আপনি আশ্চর্য হয়েছেন! তারপর ভয় পেয়ে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঠিক বলেছি? (শ্রুতি চুপ করে থাকে) এটা একটা টকিং ডল! ওর ইতিহাস হলো, আজ থেকে প্রায় ন'মাস আগে ওকে আমি এই মেট্রোপলিটন শহরের রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ধড় থেকে ওর মাথাটা আলাদা হয়ে রাস্তায় পড়েছিল। কোথায় পড়েছিল জানেন?

পুলিশমন্ত্রীর বাড়ির পিছনে। ডাস্টবিনের পাশে। মাটি থেকে কোলে তুলে নিলাম। মাথাটা কুড়িয়ে ধড়ের সঙ্গে জোড়া লাগাতেই আমাকে কি বলল জানেন? "থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ!" পুতুলটিকে দেখে খুব মায়া হলো! একটি শিশুর মুখে এই ধরণের কথা শুনলে কার না মায়া হবে ম্যাডাম? যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি এই পুতুলটির ডি এন এ পরীক্ষা করিয়ে জানতে চেষ্টা করতাম, কে ওকে রাস্তায় ডাস্টবিনের পাশে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলে দিয়েছিল? (শ্রুতির ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল)

মোহিত : মজার ব্যাপার হলো কি জানেন, পুতুলটিকে কুড়িয়ে পাওয়ার আগের দিন কে বা কারা ঐ পুলিশমন্ত্রীর অফিসঘরে ঢুকে সেক্রেটারিকে কণ্ঠনালি কেটে সিলিংফ্যানে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল!কোর্টের কলিগরা বলছিল মন্ত্রীর সেক্রেটারি ঘুষ না নিয়ে জনগণের জন্য কোন কাজ করতেন না।

শ্রুতি : সেক্রেটারি ঘুষ নিত বলে নৃশংসভাবে হত্যা করবে?

মোহিত : দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ জন্তুর মত হিংস্র হয়ে যায়। সবাই যে হিংস্র হয়ে উঠবে তাও নয়। আচ্ছা বলুন তো, আমাদের দেশে এইভাবে মানসিক অত্যাচার অবিচার মানুষ কতদিন সহ্য করবে বলতে পারেন? (পুতুলের দিকে তাকিয়ে) ওকে তাহলে শুইয়ে দি, ম্যাডাম?

শ্রুতি : সে আপনার ইচ্ছা । পুতুলের সাথে খেলতে ইচ্ছে করলে খেলতে পারেন। (পুতুলটিকে নিয়ে মোহিত আবার বিছানায় শুইয়ে দেয়)।

শ্রুতি : আচ্ছা, আপনার ঘরে ইলেট্রিসিটি নেই?

মোহিত : ছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে ইলেকট্রিসিটির বিল জমা করিনি বলে বিদ্যুতের অফিস থেকে লাইন কেটে দিয়ে গেছে। আজকালের মধ্যে জমা করে দেব ভাবছি।

শ্রুতি : এইভাবে অন্ধকারে থাকতে আপনার ভালো লাগে? আমি কিন্তু অন্ধকার একদম পছন্দ করি না।

মোহিত : থাকতে থাকতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনার অসুবিধা হলে, ল্যাম্প জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করি?

শ্রুতি : না, এখন আর প্রয়োজন নেই।

(শ্রুতি কথা বলতে বলতে দেওয়ালের গা ঘেষে ছবি আঁকা বাইজেলের ওপর বোর্ডে লাগান জলরং দিয়ে আঁকা ছবির কাছে এসে দাঁড়ায়)।

শ্রুতি : ওই ছবিটা কি আপনি এঁকেছেন?

মোহিত : হ্যাঁ! এই ছবিটা অট্টালিকার বাইরের অংশ। মানে রস্তায় দাঁড়িয়ে আপনি যেভাবে দেখে থাকেন, তারই প্রতিরূপ। তবে সময়ের অভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে আছে।!

(মোহিত হঠাৎ টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে ছবির ওপরে গোল আলোর প্রতিফলন ঘটায়। শ্রুতি ঘাবড়ে যায়)।

মোহিত : এবার বোধ হয় আপনার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্রুতি : না না তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি টর্চ বন্ধ করুন।
(শ্রুতি ছবিতে হাত বোলাতে থাকে।)

শ্রুতি : জলরঙে আঁকা এই ছবিটা কিন্তু বেশ হয়েছে! যে দেখবে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে!

মোহিত : ধন্যবাদ!

শ্রুতি : তিনতলার ওপরে এই বাড়ির চিলেকোঠায় আপনি কতদিন ধরে আছেন?

মোহিত : উত্তরাধিকারসূত্রে এই ধরুন জন্ম থেকে।

শ্রুতি : তার মানে এই বিশাল অট্টালিকার একমাত্র উত্তরাধিকার হলেন আপনি?

মোহিত : কোর্টের কাগজপত্র তো তাই বলে!

শ্রুতি : আত্মীয় স্বজন?

মোহিত : না নেই!

শ্রুতি : এই বিশাল অট্টালিকা রিনোভেট করার কথা মনে হয়নি আপনার?

মোহিত : কখনোই না।

শ্রুতি : কেন?

মোহিত : মায়ের মুখে শুনেছি, আমার পূর্বপুরুষেরা নাকি যতদিন বেঁচেছিলেন, সবাই উশৃঙ্খল এবং দুর্নীতিপরায়ড় জীবনযাপন পালন করেছেন! তখন এই বাড়িটিকে দেখিয়ে পাড়ার লোকজন নাকি বলত, বাঈজীবাড়ি! বাঈজীরা অবশ্য স্থায়ীভাবে এখানে কেউ থাকত না। বেলাল্লাপনা করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নিয়ে আসা হত। সেই সময়টুকু অবশ্য আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ধীরে ধীরে আর্থিক দূরবস্থা আমাদের গ্রাস করল। এখন সেই বংশের আর্থিক দূরবস্থার শেষ নিদর্শন হলাম আমি।

শ্রুতি : প্রমোটার বা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা আপনাকে অফার করছে না?

মোহিত : এই অট্টালিকা ভেঙে কবে চাপা পড়ে মরব তার অপেক্ষা করছে। এরা বুঝতে পেরেছে, টাকা পয়সার প্রতি আমার মোহ নেই।

শ্রুতি : এই প্রথম শুনলাম, একজন ব্যক্তির কাছে টাকাপয়সার প্রতি কোন মোহ নেই! আচ্ছা, এই কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে?

মোহিত : তাতে আমার কিছু যায় আসে না। শুধু বেঁচে থাকার জন্য তিনবেলা দু'মুঠো খেতে পেলেই হলো। আসলে কি জানেন, বিক্রি করার থাকলে এতদিনে আমি মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে প্রমোটারের হাতে তুলে দিয়ে এই শহর ছেড়ে চলে যেতাম। বিক্রি করতে পারিনি এইজন্য, আমি ছাদে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত নীল আকাশের ডাক শুনতে পাই বলে। শুনতে পাই পাখির কলরব। খোলা ছাদে দাঁড়ালে নির্মল হাওয়া আমার শরীরকে সতেজ করে তোলে বলে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখতে পাই, সবুজ বটগাছের সাথে এই বিশাল অট্টালিকার বন্ধুত্ব। কতদিন ধরে ওরা পরস্পরকে গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বলুন তো? বলতে কি, একজন তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আমি ওদের এতটাই ভালবেসে ফেলেছি যে, আজীবন

ওদের সাথেই থাকতে চাই।

শ্রুতি : তারপর আপনার এই জমি নিয়ে বারোভূতেরা লুটেপুটে খাবে। (শ্রুতি কথা বলতে বলতে বইয়ের রেকের কাছে যায়। রেক থেকে একটি ইংরেজি বই তুলে নিয়ে দেখতে থাকে)।

শ্রুতি : ইচ্ছে করলে সরকার হেরিটেঝ বিল্ডিং ঘোষণা করতে পারে।

মোহিত : ইচ্ছে করলেই হলো? আমার কি ইচ্ছে, কেউ জানার চেষ্টা করেছে?

শ্রুতি : আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে আপনি ভালোই পড়াশোনা করেছেন। তবে কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছেগুলো জানা কি অত সহজ মোহিতবাবু? গণতান্ত্রিক দেশ! নিজেকেই সেই ইচ্ছাপূরণ করতে হয়।

(শ্রুতি হাতে তুলে নেওয়া বই রেকের ওপর রেখে দিয়ে মোহিতের কাছে এগিয়ে আসে।)

মোহিত : আচ্ছা ধরুন, ইচ্ছেটা আমার, কিন্তু পূরণ করছে অন্য কেউ! তা কি সম্ভব?

শ্রুতি : একেবারেই না!

মোহিত : যদি বলি সম্ভব!

শ্রুতি : হেঁয়ালি করছেন?

মোহিত : হেঁয়ালি করছি না ম্যাডাম! সম্ভব কিনা সেই ব্যাপারে আলোচনা করছি।

শ্রুতি : এইসব আলোচনার কি কোন গুরুত্ব আছে?

মোহিত : আমার কাছে আছে। এই যেমন— ধরুন, আপনি এই বয়সে যৌন হেনস্থার শিকার হলেন। লজ্জায় আপনি থানায় "এফ আই আর" করলেন না। আইনের সাহায্য নিলেন না। বাড়িতেও কাউকে বললেন না। অথচ দিনের পর দিন প্রতিহিংসার ইচ্ছেটাকে আপনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন কোন কিছুতেই আপনার মন লাগছে না। মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন, যৌনহেনস্থাকারীকে কেউ বাড়ির ভিতরে পেট্রোল দিয়ে স্নান করিয়ে শরীরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। অথবা রোড রেজের শিকার হয়েছেন। মানে তুচ্ছ কারণে ট্রাফিক লাইটে কেউ গাড়ির কাঁচটা খুলে সোয়া দু'ইঞ্চির বুলেট যৌনহেনস্থাকারীর বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। (কথা বলতে বলতে এক ধরণের কূটিল হাসি লক্ষ্য করা যায়। হাসি দেখে শ্রুতি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়।)

শ্রুতি : আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই!

মোহিত : এই খবরটা জানার পর এবার আপনি হয়তো মনে মনে খুব খুশী হলেন! মানসিক যন্ত্রণা থেকে কিছুটা রেহাই পেলেন। অথচ আপনার মনের কথা কেউ জানতে পারল না।

শ্রুতি : পাপ করলে ফল ভোগ করতেই হবে!

মোহিত : (জোরে হাসতে থাকেন) আমার তো উল্টোটাই মনে হয়। আমাদের মত এই গণতান্ত্রিক দেশে যারা পাপ করছে, তারাই আইন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যারা অল্প চাহিদার মধ্যে, আইন ব্যবস্থার

প্রতি আস্থা রেখে এই দেশকে ভালবাসে, তাদেরকেই বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অ্যাম আই রাইট অর রঙ, ম্যাডাম? (প্রসঙ্গ পাল্টে) এই দেখুন, আপনাকে বসতে না বলে আমি আপনার সাথে বকবক করে যাচ্ছি।

(মোহিত পাণ্ডে টেবিলের পাশে রাখা চেয়ার শ্রুতির কাছে এগিয়ে দেয়।)

মোহিত : এখানে এই চেয়ারে বসুন।

(শ্রুতি খট্টরের মোবাইল বেজে ওঠে মোহিত পাণ্ডে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শ্রুতি মোবাইলঅফ করে চেয়ারে এসে বসে পড়ে।)

শ্রুতি : এর কোন সমাধান?

মোহিত : কিসের?

শ্রুতি : এই যারা আইন ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখে দিয়েছে।

মোহিত : আইন ব্যবস্থার ভিতরে থেকে যারা কাজ করছেন, তারাই যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, তাহলে সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল ম্যাডাম। এবার আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি?

শ্রুতি : অত তাড়াহুড়ো কিসের? আপনার হাতের তৈরি চা না খেয়ে আমি যাব না।

মোহিত : বিস্কুট খাবেন? চিড়েভাজা? চানাচুর বা ভাজা ছোলা? আমার কাছে সব আছে। এই দেখুন! এই দেখুন! (মোহিত রেকের ওপরে রাখা জিনিষগুলো এক এক করে শ্রুতিকে দেখাতে থাকেন) এই যে, এটা হল ভাজা ছোলা। এটা হল বাদাম দিয়ে চিড়েভাজা! আর এটা হলো ....!

শ্রুতি : আমার একটুও সখ নেই, সকাল সকাল ছোলাভাজা, চিড়েভাজা খাবার! আপনি ওগুলো ছেড়ে এদিকে আসুন তো। আপনিও বসুন।

(মোহিত টেবিলের পাশে রাখা টুলের ওপর বসে পড়ে)

শ্রুতি : যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

মোহিত : আমি তো চাই আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন।

শ্রুতি : কতদূর পড়াশোনা করেছেন?

(শ্রুতি টেবিলে রাখা নিউজ পেপার দেখতে থাকে।)

মোহিত : এই আর কি, যতদূর সম্ভব হয়েছে। এম এস সি কেমিস্ট্রি অনার্স। ইচ্ছে ছিল ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের হয়ে ইনভেস্টিগেশনের কাজ করব অথবা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করব। তা আর হলো না। সখ করে এই শহরের বিখ্যাত শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলাম। কাজে লাগাইনি। বাবা ছিলেন কোর্টের মুহুরী। বাবার শারীরিক অবস্থা দেখে আমি টাইপ শিখতে শুরু করলাম। তখন অবশ্য আজকের মত কম্পিউটারের রাজত্ব ছিলনা। টাইপ শিখে কোর্টে বাবার পাশে বসে রোজগার করতে শুরু করলাম।

শ্রুতি : এটাই তাহলে আপনার পেশা?

মোহিত : অগত্যা।
শ্রুতি : কত বছর হলো?
মোহিত : হবে প্রায় কুড়ি/ পঁচিশ বছর।
শ্রুতি : অবসর সময়ে?
মোহিত : বই পড়ি। বিশেষ করে ক্রাইম এবং ইনভেস্টিগেশনের ওপরে লেখা বইগুলো।
শ্রুতি : বিয়ে করেছেন?
মোহিত : হ্যাঁ। বাবা মা জীবিত থাকাকালীন।
শ্রুতি : কোন মহিলাকে তো আপনার ঘরে দেখতে পাচ্ছি না?
মোহিত : থাকলে তো দেখতে পাবেন।
শ্রুতি : মানে?
মোহিত : বিয়ে করার সময় কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মত একজন ব্যোহেমিয়ানের বিয়ে করা উচিত ছিল না।
শ্রুতি : সন্তান?
মোহিত : তাঁকে আমি কোনদিন স্পর্শ করিনি। এবার আপনার জন্য আমি চা করে নিয়ে আসি?
শ্রুতি : বললাম তো, আপনার হাতে চা না খেয়ে যাব না।
মোহিত : কি জানি, আপনাকে চা না খাওয়ানো পর্যন্ত আমি অন্য কিছু ভবতে পারছি না।
শ্রুতি : আমাকে চা খাওয়ানোটা আপনার কাছে ভীষণ ইম্পরটেন্ট?
মোহিত : আপনি খেলে আমি খেতে পারি, এই আর কি! এই চিলেকোঠায় পাড়ার কেউ পা রাখে না। কে কবে শেষ এসেছিল, মনে পড়ছে না। আপনার মত অতিথিকে হাতের কাছে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।
শ্রুতি : বন্ধু বান্ধব?
মোহিত : ছিল! এখন নেই!
শ্রুতি : কারণ?
মোহিত : আচ্ছা আমাকে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে, মানুষ আমাকে কাছে টেনে নেবে? সুখ দুঃখের গল্প করবে? শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করবে? আমাকে নিয়ে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াবে?
শ্রুতি : দোষ মানুষের না আপনার?
মোহিত : অবশ্যই আমার। আসলে আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, আমি অন্যায়কে সহ্য করতে পারি না।
শ্রুতি : আপনি বলতে চাইছেন, একমাত্র আপনিই হলেন দোষত্রুটিহীন ব্যক্তি? আর বাকিরা সব বোধবুদ্ধিহীন মানুষ?
মোহিত : এখানে বোধবুদ্ধিহীন মানুষদের সাব-হিউম্যান বললেই ভালো হয়। আচ্ছা আপনি কখনও এই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন?

শ্রুতি : করেছি হয় তো, মনে পড়ছে না।

মোহিত : বৃহত্তর স্বার্থে করলে আপনার মনে থাকত। তাই না? কিন্তু আমার মনে আছে, আমি কোথাও কোথাও কম্প্রোমাইজ না করে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে, মানে এই সমাজের কথা ভেবে প্রতিবাদ করেছি। আপনি হয়তো জানেন না, শুধুমাত্র এই পাড়ার জন্য, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, রাস্তাঘাটে দিনের পর দিন হিউমিলিয়েশন সহ্য করেছি। তবুও, এই বয়সে এসেও আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি।

শ্রুতি : আচ্ছা আপনি বোধহয় আমাদের পাড়ার রিনাউণ্ড অ্যাডভোকেট অতুল জুনেজাকে চিনতেন?

মোহিত : চিনব না কেন?

শ্রুতি : আপনি কি জানেন, গতকাল ভোররাতে ওনাকে কেউ খুন করেছে!

মোহিত : (চমকে ওঠে) খুন! তাই নাকি? খুন করার উদ্দেশ্য?

শ্রুতি : আমিও বুঝতে পারছি না! গতকাল রাতে আমার জানাশোনা একজন ল'ইয়ার বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম, কোর্টে পাতার পর পাতা টাইপ করার পর যে মোটা লম্বা সূঁচ দিয়ে কাগজগুলোকে ফুঁটো করে সুতলি পড়ান হয়, আততায়ী সেই মোটা সূঁচটা অ্যাডভোকেটের বুকের পাঁজর লক্ষ্য করে গেঁথে দিয়েছিল। আজ নিউজপেপারে সেই খবরটা বেরিয়েছে দেখলাম।

মোহিত : আশ্চর্য! কই দেখি!

(শ্রুতি টেবিলে রাখা নিউজ পেপার মোহিতের হাতে তুলে দেয়। মোহিত টেবিলে রাখা চশমা চোখে লাগিয়ে কাগজ খুলে দেখতে থাকেন।)

শ্রুতি : খবরটা পাঁচ নম্বর পাতায় বেরিয়েছে।

মোহিত : আচ্ছা! (মোহিত পাঁচ নম্বর পাতা খুলে পড়তে থাকে)

শ্রুতি : পনেরো দিন আগে ওনার ব্যাপারে কেউ স্টে বার কাউন্সিল এবং মিনিস্ট্রি অব ল অ্যাণ্ড জাস্টিসের কাছে কমপ্লেইন করেছিল। সেই চিঠির রিমাইণ্ডার পাঠান হয়েছিল।

মোহিত : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই সেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

শ্রুতি : আপনি?

মোহিত : হ্যাঁ, আমি!

শ্রুতি : কি ছিল সেই চিঠিতে?

মোহিত : (টেবিল থেকে টাইপ করা থার্ড রিমাইণ্ডারের কাগজ শ্রুতির সামনে তুলে ধরে।) এই দেখুন, আমি থার্ড রিমাইণ্ডার হিসেবে আজ ভোরে ঐ চিঠি আবার টাইপ করেছি।

শ্রুতি : (মোহিতের হাত থেকে কাগজ নিয়ে শ্রুতি দেখতে থাকে।) ইন্টারেস্টিং! কিন্তু কেন?

মোহিত : কারণ, আপনাদের ঐ অতুল জুনেজা ছিলেন একজন দুর্নীতিপরায়ণ রিনাউণ্ড অ্যাডভোকেট।

শ্রুতি : প্রমাণ?

মোহিত : অ্যাডভোকেট অতুল জুনেজা ধর্ষিতা হওয়া নিজের ক্লাইন্টকে পয়সার লোভ দেখিয়ে কেস উইদড্র করতে বলেছিলেন। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তার বদলে উনি আমাকে কোর্টে সবার সামনে থাপ্পর মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার হাতে রাখা থার্ড রিমাইণ্ডার হিসেবে আমার টাইপ করা ঐ কাগজের মধ্যে সবকিছু লেখা আছে। পড়ে দেখুন।

(শ্রুতির মোবাইল আবার বেজে ওঠে। মোহিতের দিকে তাকায় সে।)

মোহিত : আপনার ফোন।

(শ্রুতি মোবাইল অফ করে দেয়।)

মোহিত : আপনি বার বার মোবাইল অফ করছেন কেন? কথা বলুন। অসুবিধা থাকলে আমি বাইরে যেতে পারি।

শ্রুতি : না না তার কোন প্রয়োজন হবে না। এমন কোন জরুরী ফোন নয়।

মোহিত : যদি একজনের ফোন বার বার এসে থাকে তাহলে আপনার রেসপন্স করা উচিত।

শ্রুতি : রেসপন্স করার থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই করতাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি? আচ্ছা, আমাদের পাড়ার এই যে অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলো ঘটে চলেছে, সেগুলো সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

মোহিত : যেমন?

শ্রুতি : গত মাসে এই পাড়ায় কাউন্সিলর মনমোহন ধিংড়াকে রাস্তার ধারে ম্যানহোলের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছিল সেটা জানেন তো?

মোহিত : হ্যাঁ জানি। মনমোহন ধিংড়ার মাথাটা ম্যানহোলের ভিতরে ছিল, পা দুটো আকাশের দিকে।

শ্রুতি : কিন্তু ম্যানহোলের ঢাকনা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মোহিত : তার কিছুদিন আগেই ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়ে গিয়েছিল বলে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল, সেই কবর রাখেন কি? শিশুটি ছিল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। আমাদের এই কাউন্সিলরকে দু দুবার রিমাইণ্ডার পাঠিয়েছিলাম। চিঠিতে লিখেছিলাম, ম্যনহোলে ঢাকনা না থাকার জন্য একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এই ঘটনা যেন না ঘটে, তার ব্যবস্থা করুন। উনি আমার চিঠির উত্তর না দিয়ে বা যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে একদিন লোকাল পার্টি অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই পার্টি অফিসে পাড়ার দশজন পার্টি সদস্যের সামনে আধঘন্টা

ধরে জুতোপেটা করেছিলেন। সেই চরম অপমান হজম করে বেরিয়ে এসে চিফ মিনিস্টার, এম পি এবং এম এল এ-র কাছে কাউন্সিলরকে দেওয়া রিমাইণ্ডারগুলো অ্যাটেচড করে চিঠি লিখে পাঠাই। থানায় গেলাম, "এফ আই আর" নিল না।

দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর কারো উত্তর না পেয়ে আমি হতাশ হয়ে যাই। হঠাৎ শুনলাম, কে বা কারা ওনাকে মেরে পুরুষাঙ্গ কেটে ম্যনহোলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

শ্রুতি : আপনি সব খবরই রাখেন দেখছি!

মোহিত : (হাসতে হাসতে) জানে সবাই, কিন্তু আমার আর আপনার মত এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ক'জন করে? এই যে আমাদের এই পাড়ায় আল্ট্রামডার্ণ অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে মানুষেরা বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে কতজন আছেন আপনার মত আলোচনা করেন? সবাই ভোগে ডুবে আছে, ভোগে! দূরে দাঁড়িয়ে সবাই উপভোগ করে!

শ্রুতি : একজনের মৃত্যুর সাথে উপভোগের কি সম্পর্ক?

মোহিত : ইংরেজিতে "দ্য লাভ অব গেজিং" বলে একটি ছোট সেন্টেন্স আছে। জানেন তো? ঐ সেন্টেন্সটির মানে হলো, মানে যাকে এক কথায় বলে, দেখার আনন্দ বা তাকিয়ে থাকার আনন্দ। এই যে আমরা বিভিন্ন ঘটনা দেখছি বা শুনছি, কিংবা আমরা যাহাই দেখছি বা শুনছি না কেন, দেখতে বা শুনতে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। আবার কিছু কিছু ঘটনা ভাল লাগছে কিনা, সেটাও বুক বাজিয়ে কেউ বলতে পারছি না! তবুও দেখছি! অথচ দেখুন, আমাদের জীবনে এই "স্পেকটেকলগুলো" যদি না থাকে তাহলে কি আমাদের এই জীবন নিরামিষ হয়ে যাবে ? সেই রকম সমাজে অমানবিক অত্যাচার দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে এখন মূক দর্শক হয়ে থাকাটাই বোধহয় আমাদের কাছে প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। তবে এতদিন এই যে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে, যতক্ষণ না আপনার নিজের ওপর আঘাত আসবে, আপনি ততক্ষণ সজাগ হবেন না বা যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবেন না!

(কথা বলতে বলতে মোহিতের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হয়)

মোহিত : এই যেমন, পাড়ার অনেকেই আমাকে বোকা এবং বোধবুদ্ধিহীন মানুষ ভেবে থাকে। কিন্তু আমি আমার কাজে অনড়। এই সমাজের বা পাড়ার ক্ষমতাবানরা যদি ভেবে থাকে, যা ইচ্ছে তাই করবে, কেউ কিছু বলার সাহস পাবে না, তাহলে সে মূর্খের জগতে বাস করছে। আর কেউ না হোক, অন্তত আমি ছেড়ে কথা বলব না। ভুল দেখলেই প্রতিবাদ করব।

শ্রুতি : ক্ষমতাবানদের পিছনে লাগতে আপনার ভয় করে না?

মোহিত : কিসের ভয়? মৃত্যুর? তবে ভয় যে আপনারও নেই, তার প্রমাণ তো আপনি স্বয়ং ম্যাডাম!

(মোহিত জোরে হাসতে থাকে)

শ্রুতি : কি করে বুঝলেন?

(শ্রুতির পরনে খাকি রঙের পায়ের মোজার দিকে তাকিয়ে থাকে মোহিত। শ্রুতির নজর এড়ায় না। সে নড়ে চড়ে বসে।)

মোহিত : আপনার এখানে আগমন দেখেই আমি বুঝেছি। চুল কি আর এমনি এমনি পেকেছে, ম্যাডাম? আপনার উদ্দেশ্য আমি ধরে ফেলেছি।

(শ্রুতি ভয় পেয়ে যায়। কথা জড়িয়ে যায়।)

শ্রুতি : আপনার কি মনে হয়, এখানে আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি?

মোহিত : (মজার ছলে) বলব কেন? (প্রসঙ্গ পাল্টে) এতক্ষণ আপনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, আমি সব প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর আপনাকে দিয়েছি। এবার কিন্তু আপনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তার আগে, আপনি একবার জানালার দিকে সোজাসোজি তাকিয়ে দেখুন? ঐ যে আল্ট্রামডার্ণ অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটগুলি দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হলো স্যানড্রেলা অ্যাপার্টমেন্টের এলাকা। ঐ অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলায় একজন সুন্দরী মহিলা থাকতেন। সদ্য বিবাহিত। স্বামী বিদেশে এয়ারলাইন্সের পাইলট। বেশ কিছুদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছিলাম, একটি কিশোর রোজ সকালে এসে ব্যালকনিতে বসে ঐ মহিলার সাথে গল্প করত। গল্প করতে করতে কিছুক্ষণ পর ঐ মহিলা কিশোরের হাতে একটি প্লাস্টিকের ছোট বাক্স তুলে দিতেন। বাক্সটি হাতে নিয়ে কিশোরটি চলে যেত। কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। একদিন রাস্তায় বেরিয়ে কিশোরটিকে হাতেনাতে ধরে ফেললাম। জিজ্ঞেস করলাম কি নাম তোমার? কোথায় থাক? কোন স্কুলে পড়? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিশোরটি ছিল খুব স্মার্ট! কথা শুনে তো মনে হলো ভালো স্কুলেই পড়ে। আমি সেদিন কথা বলতে বলতে বাক্স হাতে ওর ছবিটা মোবাইলে তুলে ফেলি। কিশোরটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকেন? আমি নিজের বাসস্থানের কথা উল্লেখ না করে জিজ্ঞেস করলাম, যাবে আমার সাথে? জিজ্ঞেস করা মাত্র কিশোরটি কোন উত্তর না দিয়ে, প্লাস্টিকের বাক্সটি নিয়ে দে ছুট! ট্রাফিকের মধ্যে সে মিশে গেল! তারপর থেকে ছেলেটি মহিলার বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল! আমার সন্দেহ যেন বাড়তে থাকল। খুব সতর্কতার সাথে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, ঐ সুন্দরী মহিলা চকোলেটের মধ্যে কম মাত্রায় কোকেনের পাউডার ঢুকিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করতেন।

শ্রুতি : জানাজানি হতেই প্রশাসন এবং স্কুলগুলো সতর্ক হয়ে গেল এবং কিছুদিন পর

মহিলার উলঙ্গ দেহ খালের জলে ভেসে উঠল।

মোহিত : (মুখে কুটিল হাসি) আপনি দেখি সব খবরই রাখেন। আপনি অবগত আছেন কিনা জানি না, মহিলার স্তন দুটোর ওপর কে যেন দাড়ি কাটার ব্লেড দিয়ে ফুল এঁকে দিয়েছিল।

শ্রুতি : (মোহিতের কথা শুনে শ্রুতিকে ভীত মনে হয়।) স্টপ ইট নাউ! স্টপ ইট! ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলে আপনি নিজেকে কি জাহির করবার চেষ্টা করছেন, মোহিতবাবু? এট পাড়ার ঘটনা। কে না জানে?

মোহিত : তারপর ঐ কিশোর বালকটির পরিবার এই পাড়া থেকে নিমেষের মধ্যে বেপাত্তা হয়ে গেল। আপনি কি জানেন, তারপর আমাকে চরম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

শ্রুতি : কি রকম?

মোহিত : (টেবিলে রাখা ফাইল তুলে শ্রুতির হাতে তুলে দেন।) এই ফাইলে রাখা চিঠিগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। স্টেট এডুকেশন বোর্ড, এই এলাকার থানার ডিসিপি, বিভিন্ন স্কুলের প্রিন্সিপাল, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাছে এই চিঠিগুলো দেওয়া মাত্র আমাকে ওরা টার্গেট করল। রাস্তায় আমার মুখ লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা। চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি ছোড়া! আমাকে শেষ করলেই যেন ওদের শান্তি! শেষে একদিন বাড়ি ঢোকার সময় দলবদ্ধভাবে কিছু ছেলেমেয়ে আমাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে গণপিটুনি দিয়েছিল, যাদের দেখে মনে হয়েছিল কেউ আমাদের পাড়ায় বা এই শহরে থাকে না। সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে আমি আবার রিমাইণ্ডার দেওয়া শুরু করে দিলাম। তবে এত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এই অট্টালিকার মধ্যে আপনি ছাড়া আর কারো ঢুকতে সাহস হয়নি।

শ্রুতি : আশ্চর্য লাগছে, যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে আপনি সোচ্চার হয়েছেন, তাঁরা সবাই মৃত! কিন্তু এখনো পর্যন্ত আততায়ী দরা পড়ল না!

মোহিত : ধরা কেন পড়ল না, তা নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত তাই না?

শ্রুতি : তাহলে তো আমাদের দেশে বিচারব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই।

মোহিত : প্রয়োজন কেন থাকবে না? আমি জানি না, "লাইসেন্স টু কিল" সম্পর্কে আপনি কতটুকু খবর রাখেন! আপনি কি জানেন, আর্মি এবং পুলিশের স্পেশাল সেলে এমন কয়েকজন অফিসার থাকেন, অলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তাদের কাজ হলো, যে ব্যক্তি সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করবে, তাকে দিনের পর দিন ধরতে না পারলে, অথবা ধরার সময় যদি অপরাধী হাতে অস্ত্র নিয়ে রেজিস্ট করে, তাহলে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়?

শ্রুতি : "লাইসেন্স টু কিল" সম্পর্কে আমায় বোঝাবেন না। অলিখিত কোন কিছুই হয় না। লিখিতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা কখনোই মান্যতা দেবে না, যে কেউ নিজের ইচ্ছামত আইন হাতে তুলে নেবে।

মোহিত : কিন্তু আপনি যখন বুঝতে পারছেন, প্রমাণ যোগাড় করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিলেও, তার কোন সুরাহা হচ্ছে না, অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে না, তখন আপনি কি করবেন? ন্যায় চাইতে কার কাছে যাবেন?

শ্রুতি : আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতেই হবে। রাখতেই হবে। রাখতেই হবে। এই আমার শেষ কথা। (শ্রুতি উত্তেজিত হয়ে পড়ে।)

শ্রুতি : (মোবাইল দেখতে দেখতে) সরি! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আপনার ছাদে যাওয়ার রাস্তা কোনটা?

মোহিত : ছাদে যাবেন? ঐ তো! সিঁড়ির ডান পাশে সোজা চলে যান, বিশাল ছাদ দেখতে পাবেন। (বিনয়ের সুরে) এবার আপনার জন্য চা বসাই?

শ্রুতি : নিশ্চয়ই!

(দরজার দিকে এগোতেই শ্রুতির মোবাইল বেজে ওঠে।)

মোহিত : আবার আপনার ফোন এসেছে। আমি যাই তাহলে? আপনার জন্য চা বানিয়ে নিয়ে আসি?

(শ্রুতি মোবাইল হাতে মোহিত পাণ্ডেকে "হ্যাঁ" সূচক মাথা নাড়ায়। মোহিত রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান। বাজতে থাকা মোবাইল হাতে নিয়ে ক্যাম খাটের কাছে এগিয়ে যায় সে। বিছানার ওপর ঝুঁকে চাদর সরিয়ে শ্রুতি যখন দেখার চেষ্টা করে, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুতুলটি দু'হাত দিয়ে শ্রুতির গলা চেপে ধরে। বিছানার ওপব. শ্রুতির সাথে পুতুলের ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে থাকে। শ্রুতি বিছানার মধ্যে শুয়ে গোঙাতে থাকে। মোবাইল বাজতে বাজতে হাত থেকে পড়ে যায়। মোহিত রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন। কিছুতেই সে দুজনকে ছাড়াতে পারে না। এইভাবে কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হওয়ার পর পুতুলটির মাথাটি মোহিতের হাতের মধ্যে চলে আসে। পুতুলের দেহটা শ্রুতিকে ঝাপটে ধরে থাকে। শ্রুতি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে বসে। পুতুলটিকে দেহ থেকে ছাড়িয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। ইতিমধ্যে একজন পুলিশ অফিসার দরজা ঠেলে চিলেকোঠায় প্রবেশ করে। সে রিভলবার হাতে নিয়ে সবাইকে সতর্ক করে।)

অফিসার: আপনারা কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়বেন না। যে যেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন। (অফিসার এগিয়ে আসেন) ম্যাডাম আপনি সরে যান। ভয় নেই, আমরা এই বিশাল বাড়ির চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছি।

(শ্রুতি নিজের মোবাইল অফ করে। ভয়ে পুতুলের থেকে দূরে সরে যায়। কাঁপতে থাকে সে। পুলিশ অফিসার ধীরে ধীরে রিভলবার কোমরের ক্যাপে রেখে পুতুলের ধড়হীন দেহটা দেখার জন্য মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। দর্শকদের দিকে মুখ করে পুতুলটিকে মাটিতে

বসায়। মোহিত পাণ্ডে পুতুলের মাথা নিয়ে পুলিশ অফিসারের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। মুখে অস্ফুট আওয়াজে বলতে থাকেন)

মোহিত : অফিসার, ও কি করে চিনতে পারল বলুন তো, ম্যাডাম শ্রুতি খট্টর একজন ইনভেস্টিগেশন অফিসার?

(মোহিতের কথা শুনে পুলিশ অফিসার অবাক হয়ে যান এবং মোহিতের দিকে মুখ তুলে তাকান।)

মোহিত : এই যে ওর মাথাটা।

(পুতুলের মাথা দেখে পুলিশ অফিসারের হাত কাঁপতে থাকে। কিছুক্ষণ পর মোহিতের হাত থেকে মাথাটা নিয়ে ধড়ের ওপর বসিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ পুতুলটি বলতে থাকে, "আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ!!!". ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। শুধু ছোট বৃত্তের মধ্যে পুতুলটিকে আলোকিত হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়)

লেখক : **বারীণ চক্রবর্তী, নাট্যকার, দিল্লী।**
Playright : **Barin Chakraborty, eminent Theatre personality of Delhi.**

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any mesns, electronic, mechanical, photocopying, stage performance, recording of otherwise, without the prior permission of the publisher.

পিঁপড়া

■ আকতারুজ্জামান

চরিত্রলিপি

ডা. নূরুল আফসার : ডাক্তার।। মকবুল হোসেন: রোগী ।। আবুল : রোগীর সহযোগী সহকারী : ডাক্তারের সহকারী ।।

(ডাক্তারের চেম্বার। ডাক্তারের রোগী দেখার সময় প্রায় শেষ। তাড়াহুড়ো করছে কত দ্রুত এখান থেকে বেরুতে পারবে। সহকারী প্রবেশ করে।)

সহকারী : স্যার

ডাক্তার : আমি তাহলে যাই-

সহকারী : একজন রোগী আছে স্যার।

ডাক্তার : আমি না তোমাকে বলেছি আজ পনের জনের বেশী রোগী নিবেনা। আমার জরুরী কাজ আছে।

সহকারী : বলেছেন- কিন্তু স্যার- রোগী বহুদূর থেকে এসেছে। এত রিকোয়েস্ট করেছে না করতে পারিনি। গ্রামের রোগী তো স্যার-

ডাক্তার : কি বললে?

সহকারী : গ্রাম থেকে আসছে।

ডাক্তার : অউফ- (স্বগতঃ) গ্রামের রোগীদের আমি একদম পছন্দ করিনা। তাড়াতাড়ি পাঠাও। যাও-যাও-যাও-
(সহকারী চলে যায়)

ডাক্তার : অউফ- বউয়ের জন্মদিনে উপস্থিত না থাকলেও কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্যালিকার জন্মদিনে উপস্থিত না থাকলে সংসার টিকবে? একজন রোগী আছে, তাও আবার গ্রাম থেকে এসেছে। গ্রাম থেকে আসা রোগীদের আমি একদম পছন্দ করি না। এরা হয় বেশী কথা বলবে, না হয় একেবারেই কথা বলবে না। তার উপর ভিজিটের সময় এলে দরদাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলাতে কচলাতে বলবে কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব? যত্তসব-
(রোগী মকবুল ও সথে সহযোগী আবুল-এর খুবই ধীর গতিতে প্রবেশ)

আবুল : আসবো স্যার?

ডাক্তার : আসুন। আরে তাড়াতাড়ি আসুন। আমার জরুরী কাজ আছে।
(কিন্তু রোগী মকবুল লুঙ্গি, ফতুয়া ধরণের শার্ট, হাতে ঘড়ি পরা খুবই ধীর গতিতে আসতে থাকে। এটা দেখে ডাক্তার মনে মনে আরও ক্ষুন্ন হয়।)
(দর্শকদের) বলেছিলাম না! এজন্যই এদের আমি এত অপছন্দ করি। দেখুন দেখুন লোকটার চেহারা কেমন নির্বোধের মত - দেখুন। কী রকম ধীরলয়ে

হাঁটছে। এই ধরণের লোক নিজের অসুখটা পর্যন্ত ঠিকমত বলতে পারে না। অন্য লোকের সাহায্য লাগে। বিশ্বাস না হলে দেখুন।

(এর মধ্যে রোগী ও সহযোগী এসে বসে)

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে। আরে চুপ করে আছেন কেন?

(রোগী যথারীতি গলা খাঁকারী দিয়ে তার সহযোগীর দিকে তাকায়। ডাক্তার রোগীর আপাদমস্তক দেখে) আশ্চর্য! রোগী আপনি তো- নাকি!

(রোগী মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়) তাহলে কথা বলছেন না কেন? কি সমস্যা আপনার। অদ্ভুত কান্ড তো-

গরু - ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয় । আপনি তো আর গরু-ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? নাম কী আপনার?

আবুল : উনার নাম মকবুল। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।

ডাক্তার : নামটাও অন্য আরেক জনকে বলে দিতে হয়। আপনি কি কথা বলতে পারেন, না - পারেন না?

মকবুল : পারি।

ডাক্তার : কী নাম আপনার ?

মকবুল : মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।

ডাক্তার : বয়স কত?

মকবুল : বায়ান্ন,

ডাক্তার : আপনার সমস্যা কী?

(রোগী মকবুল মাথা নীচু করে ফেলে। কোন কথা বলে না।)

ডাক্তার : (স্বগতঃ) কোন গোপন রোগ নাকি?

আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এক্ষণি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।

(রোগী গলা খাঁকারি দেয়)

আবুল : উনার অসুখ কিছু নাই।

ডাক্তার : অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?

আবুল : উনারে পিঁপাড়ায় কামড়ায়।

ডাক্তার : কী ! কী বললেন?

আবুল : উনারে পিঁপড়ায় কামড়ায়। পিপীলিকা-

(ডাক্তার রাগে ক্ষোভে আর বসে থাকতে পারে না। কোনরকম নিজেকে কন্ট্রোল করে। তবু রাগত স্বরে বলে।)

ডাক্তার : পিঁপড়ায় কামড়ায় মানে কী?

(রোগী মকবুল পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দেয়।)

মকবুল : চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।
ডাক্তার : কার চিঠি?
মকবুল : কাশেম সাহেবের।
ডাক্তার : কাশেম সাহেব কে?
মকবুল : এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুবই ভালো ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনার ছাত্র।
(ডাক্তারের চিঠি খুলতে খুলতে ভাবে)
স্যার চিনেছেন?
(ডাক্তার চিনেনি তবুও বলেন)
ডাক্তার : হ্যাঁ-মানে-। কী লিখেছে দেখি।
মকবুল : উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।
ডাক্তার : আচ্ছা দেখছি- (লম্বা চিঠি দেখে বিরক্ত হয়)
(স্বগতঃ) এরা কোন জিনিস সংক্ষেপে লিখতে পারে না। দেড় হাত লম্বা একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে। (চিঠি পড়ে)

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজি পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল সাহেব এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর কয়েক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না কিন্তু অন্য কোনো নামও পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিঁপড়ায় কামড়ায়। বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও তাই মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে। আমি নিজে লক্ষ্য করেছি মকবুল সাহেব কোথাও বসলেই সারি বেঁধে পিঁপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আদি ভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। আমি কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
আবুল কাশেম
ব্লু স্টার ফার্মেসী, নান্দাইল, কেন্দুয়া

: (রুগী পাথরের মত মুখ করে বসে আছে। ডাক্তার কী বলবেন বুঝতে পারছেন না।)

ডাক্তার : পিঁপড়া কামড়ায় আপনাকে?

মকবুল : জি স্যার কোনো এক জায়গায় বসে থাকলেই পিঁপড়া এসে ধরে।

ডাক্তার : (স্বগতঃ) আপনি কি রসগোল্লা না- কি যে পিঁপড়া ছেঁকে ধরবে?

মকবুল : বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভালো করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকব। টাকা পয়সা কোন ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।

ডাক্তার : আপনার কি অনেক টাকা?

মকবুল : জি স্যার।

ডাক্তার : কি পরিমাণ টাকা আছে আপনার?

(মকবুল বলতে ইতস্তত করে, সহযোগী বলে)

আবুল : মকমকবুল ভাইয়ের কাছে টাকা পয়সা কোন ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতের ময়লা।

(ডাক্তার বেশ অবাক হয়ে মকবুলের দিকে তাকায় এবং নিজে মনে মনে ভাবে)

ডাক্তার : (স্বগতঃ) অদ্ভুত কান্ড। নির্বোধের মতো এই লোকটার কাছে নাকি লাখ দুই লাখ হাতের ময়লা।

সারা জীবন সকাল সন্ধ্যা কাজ করে মাত্রা এগার লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছি। আর এই লোকটা এসব কি বলছে!

(মকবুল ডাক্তারের কাছে এসে ক্ষীণ স্বরে বলে)

মকবুল : রোগটা যদি সারিয়ে দেন-

ডাক্তার : এটা কোন রোগ না। আমি এমন কোন রোগের কথা জানি-না যে রোগে দুনিয়ার পিঁপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনের। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি- তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যাএই সমাধান আমার কাছে নেই।

(ডাক্তার কথা শেষ না করতেই লক্ষ্য করেন রোগী মকবুলের দিকে তিন সারি লাল পিঁপড়া এগুচ্ছে। মকবুল সরে দাঁড়ায়।)

অদ্ভুত কান্ড! পিঁপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে।

- এই পিঁপড়াগুলো কি আপনার দিকে আসছে।

(মকবুল বিভিন্ন অঙ্গ থেকে পিঁপড়া ছাড়ায়)

মকবুল : জী স্যার।

ডাক্তার : বলেন কী?

মতহুস : পায়েও পিঁপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসতে পারি না স্যার।

(ডাক্তার ভালো করে লক্ষ্য করে নিজে পা উঠিয়ে বসলেন। মকবুল পিঁপড়ার

আঘাতে বিরক্ত।)

ডাক্তার : মকবুল সাহেব।

মকবুল : জী স্যার।

ডাক্তার : আমার একটা জরুরী কাজ আছে, চলে যেতে হচ্ছে। শ্যালিকার জন্মদিন। স্ত্রীর জন্মদিন হলেও এতটা জরুরী ছিল না। আপনি কি কাল একবার আসবেন? (শরীর থেকে পিঁপড়া মারতে মারতে কথা বলে)

মকবুল : অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাত্রে ঘুমাতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে যায়।

ডাক্তার : আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।

মকবুল : জি আচ্ছা স্যার। (মকবুলের নাকের ভিতর পিঁপড়া ঢুকছে। আর সহ্য করতে পারে না। মকবুল হঠাৎ উন্মাদ হয়ে উঠে। মকবুলের চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পায়। মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পায়ে মকবুল হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, মেঝেতে দুইহাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মুখে নানা রকম শব্দ করছে এবং উঁচু গলায় বলছে, হারামজাদা, হারামজাদার বাচ্চা। চিৎকার চেঁচামেচি দেখে ডাক্তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সহযোগী আবুল ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। নির্বিকার। কারণ সে অভ্যস্ত। সে বরং ডাক্তারকে হাত তুলে আশ্বস্ত করে। ডাক্তারের সহযোগী দৌড়ে আসে । ডাক্তার দাঁড়াতে বলে হাতের ইশারায়। সকলেই বিস্ময় নিয়ে মকবুলের অবস্থা দেখছে। মকবুল হঠাৎই শান্ত হয়।)

মকবুল : স্যার মনে কিছু নিবেন না। এই পিঁপড়ার ঝাঁক আমার জীবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিঁপড়া!
এক গেলাস ঠান্ডা পানি দিবেন।
(পাগলের পাগলামি দেখে ডাক্তারের সহকারী দ্রুত এক গ্লাস পানি এনে দেয়। মকবুল পানি খায়।)
যেখানে যাই সেখানেই পিঁপড়া, কী করব কন। যে খাটে ঘুমাই সে খাটের পায়ার নিচে বিরাট মাটির সরা। সরা ভর্তি পানি তাতেও লাভ হয় না।

ডাক্তার : লাভ হয় না?

মকবুল : জি না স্যার। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিঁপড়া উঠে। ঘন্টায় ঘন্টায় চাদর বদলাইতে হয়।

ডাক্তার : বলেন কী!

মকবুল : সত্যি কথা বলতেছি জনাব। এক বর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।
(ডাক্তার নির্বিকার তাকিয়ে আছে)

চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখি নাই জনাব। কেরোসিন তেল কর্পুর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাখছি যাতে গন্ধে পিঁপড়া না আসে। প্রথম দুই একদিন লাভ হয়, তারপর আর হয় না। পিঁপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলছে মাখছি। একবার একজন বলল বাদুরের গু শরীরে মাখলে আরাম হইব। বাদুরের গু পাওয়া কি সোজা কথা? বহু কষ্টে বহু খুঁইজা সেই বাদুরের গুও মাখলাম, কোন কাম হয় নাই। এর চেয়ে জনাব আমার মরণ ভাল।
(ডাক্তার ঘড়ি দেখে সহকারীকে বলে)

ডাক্তার : বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে।

সহকারী : জ্বী স্যার। (প্রস্থান)

ডাক্তার : (মকবুলকে) আচ্ছা আপনার কি মনে আছে কিভাবে এটা শুরু হলো , মানে প্রথম কখন পিঁপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হলো?
(মকবুল ডানে-বামে তাকায়)

মকহবুল: ঘটনাটা একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।

ডাক্তার : গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?

মকবুল : জ্বী আছে

ডাক্তার : বেশ। গোপনেই বলবেন।

আবুল : ডাক্তার সাব, সবচেয়ে বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।

মকবুল : তুমিই বল।

আবুল : এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়া সবচেয়ে বেশি আসে। মকবুল ভাই করলেন কি সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোন পিঁপড়া আসে নাই।

মকবুল : সাতদিন না পাঁচ দিন।

ডাক্তার : পাঁচ দিন পরে আবার পিঁপড়া আসা শুরু হলো?

মকবুল : জ্বী।

ডাক্তার : পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।

মকবুল : জ্বী, নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিনদিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিনে পিঁপড়া ধরল।

ডাক্তার : সেখানে পিঁপড়া গেল কিভাবে?

মকবুল : জানি না জনাব, অভিশাপ!

ডাক্তার : কীসের অভিশাপ?

মকবুল : আপনারে গোপনে বলতে চাই।
(ডাক্তার নিজের ঘড়ি দেখলেন ও একটু অস্বস্তি বোধ করছেন)

ডাক্তার : (স্বগতঃ) না আজ আর শালীর জন্মদিনে যাওয়া হবে না।
জীবনে এত রোগী দেখেছি কিন্তু কোন রোগীর প্রতি এমন কৌতুহল হয়নি। অবশ্য এই লোকটিকে রুগী বলতে বাঁধছে। কারণ কাউকে পিঁপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

মকবুল : (আবুলকে) তুমি একটু বাইরে যাইয়া বসো।
(আবুল মিয়া চলে যায়)

মকবুল : জনাব, আপনারে আমি আগেই বলছি আমি টাকা পয়সাওয়ালা লোক। আমাদের টাকা পয়সা আইজ কাইলের না। ব্রিটিশ আমলের। আমার দাদাজানের বাবা পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতি ছিল,একটার নাম ময়না, অন্যটির নাম সুরভি, দুইটাই মাদি হাতি।

ডাক্তার : ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিঁপড়ার প্রসঙ্গে থাকুন।

মকবুল : আসতেছি, আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশী থাকলে মানুষের স্বভাব -চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারো ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র-দোষ বলেন তাই হইল। মাশাল্লা পনেরো ষোল বছর দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে বউরা ছিল। পাড়া -প্রতিবেশী। আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে, লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে। পুরা গ্রাম চলছে আমার টাকার গরমে। সরকারী দল, বিরোধী দল, থানা পুলিশ, সবসময় পকেটে থাকত। আমার চেয়ে ক্ষমতাবান কেউ ছিল না। এখনও নাই।

ডাক্তার : আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন নি?

মকবুল : জি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানাদিও আছে। স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে-শাদী করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই-

ডাক্তার : আপনি আসল জায়গায় আসুন।
আজেবাজে কথা বলে বেশী সময় নষ্ট করছেন।

মকবুল : জ্বি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ-পনেরো বছর বয়স। গায়ের রং একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা'র মেঝেতে ঘুমায়। এতকিছু কইরাও লাভ হইলো না। এক রাতে এক ঘটনা ঘটে গেল।

ডাক্তার : কী বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?

মকবুল : জ্বি।

ডাক্তার : আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা

ব্যাপার।

মকবুল : জিনিসটা তুচ্ছই। কিছুই না। হে হে হে।

ডাক্তার : হাসবেন না। হাসির কোনো ব্যাপার না।

মকবুল : জি আচ্ছা।

তারপর কী হলো- ঐ বজ্জাত মা সেই মেয়েটারে ইঁদুর মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে দড়ি নিয়া বাড়ির পিছনে একটা আম গাছে ফাঁস দিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম। দুইটা মৃত্যু সোজা কথা না। থানা-পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।

ডাক্তার : আপনি খুন করেননি।

মকবুল : আরে না। খুন করব কী জন্য। আর যদি খুন দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়া ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর ভইরা চুন মাখায়ে চার-পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায় দিতে হয়। এই জন্মের জন্য নিশ্চিন্ত। কোনো সম্মুন্ধির পুত কিছু জানব না।

ডাক্তার : আপনি খুন করেছেন?

মকবুল : জি না। দরকার হয় নাই। যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনেন। ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম খবরদার লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। যে রকম আছে সেরকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানার ওসি সাহেবেরে আনতেছি। ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব।

থানা আমার বাড়ী থাইকা পনেরো মাইল দূরে। পানসি নৌকা নিয়া রওনা দিলাম। দারোগা সাহেব আর থানার স্টাফদের জন্য দশ হাজার টাকা নজরনা নিয়া গেলাম। গিয়া দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়াছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিনদিন।

বর্ষাকালে গরমের দিন । তিনদিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে মনে হইতেছে মাগীর সারা শইলে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।

ডাক্তার : আপনি তো খুব বদ লোক।

মকবুল : জ্বি না, আমার মতো টেকা পয়সা আর ক্ষমতা যারার থাকে, তারা আরো বদ হয়। আমি একটু কম বদই আছি।

ডাক্তার : এটাই কম!

মকবুল : তারপর কি হইল বলব?

ডাক্তার : হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন-

মকবুল : আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ল। মনে হলো যেন একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলো পিঁপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব খাইয়া ফেলছে, জায়গায় জায়গায় হাড্ডি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়া নাক চেপে ধরে বললেন মাবুদে এলাহি! তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়া বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়াগুলিও বাইরে আসল, মনে হইল আমারে খুঁজতাছে। সেই থাইক্যা শুরু। যেখানে যাই পিঁপড়া আর পিঁপড়া। জনাব- জনাব আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই। আমার খুবই উপকার হয়।

ডাক্তার : হ্যাঁ- এখন তো বাইরের লোক নেই- খেতে পারেন।
(মকবুল দ্রুত সিগারেট ধরায়। তার মুখ বিষন্ন। সে আনাড়িদের মতো ধূঁয়া ছাড়ছে। খুক খুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়া বলে)

মকবুল : আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিঁপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত আসে। আর আসে মরা পিঁপড়া।
(ডাক্তার হতভম্বের মত তাকিয়ে দেকে। কোন কথা বলে না। মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দেয়।)

মকবুল : সিগারেট খাইতেছি যাতে ভালো মতো কাশি উঠে । কাশি উঠলে কাশির সথে পিঁপড়া আর পিঁপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি নিজের চোখে দেখবেন। আমি ঘোষণা দিচ্ছি- যে আমারে পিঁপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ পাঁচ লাখ ট্যাকা দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি, আপনে আমারে বাঁচান।
(ডাক্তার মকবুলের শরীরের দিকে পিঁপড়া ধেয়ে আসা দেখে।)
দেখেন দেখেন জানোয়ারের বাচ্চাগুলান কিভাবে আমার দিকে আসতেছে।
(ডাক্তার তবু নিশ্চুপ)

মকবুল : ডাক্তার সাব- ও ডাক্তার সাব- আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?

ডাক্তার : হ্যাঁ ঠিক।

মকবুল : আমি জানতাম আমার মরণ পিপঁড়ার হাতে। দেখেন-দেখেন- ডাক্তার সাব জানোয়োরের বাচ্চাগুলান কিভাবে আমার দিকে আসছে।

নে খা - খা- খা আমারে- একদম শেষ কইরা দে-

দেখেন- দেখেন ডাক্তার সাব- নিজে থাইক্যা খাইতে দিলে ওরা কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলাপরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার সাব উঠতেছে না।

(ডাক্তার তাকিয়ে দেখে)

দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই-এক মিনিটে শলাপরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব।

এই জানোয়ারের বাচ্চা গুলান থাইক্যা আল্লা আমারে বাঁচাও। আমি আর পারতেছি না। নে খা- খা- আমারে- আমারে মাইরা ফালা- আমি আর বাঁচতে চাই না। আল্লাগো তুমি আমারে কেমন পাপের শাস্তি দিলা।

(মকবুল উন্মাদের মতো মেঝেতে গড়াগড় দেয় আর চিৎকার করতে থাকে।)

ডাক্তার : পিঁপড়ার দল সারি বেঁধে মকবুলকে চারিদিক থেকে ঝাপটে ধরছে।

পিঁপড়ার দল কখনো এত সারি করে না- এক সারিতে হাঁটে। কিন্তু এখানে অনেক সারি। একদল পিঁপড়ার মুখে ডিম। এরা কি চায়? কে তাদের পরিচালিত করছে? কে সেই সূত্রধর।

যেই হোক। ধর্ষকের শাস্তি এমনই কঠিন হওয়া উচিত।

গল্পসূত্র - **হুমায়ূন আহমেদ**।

লেখক ঃ **আখতারুজ্জামান, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, ঢাকা, বাংলাদেশ।**

Playwright : **Akhtarujjaman, eminent Theatre personality of Bangladesh**

শতবর্ষে রক্তকরবী : একটি নাট্য-আলেখ্য

■ শান্তনু দাস

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়...
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরালে, জানি জানি, পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখ দিনের রক্ত কমল তোমার করুণ পায়ে।"

(গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলে একটি ডাক ভেসে এল)

বক্তা ১ : নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী—
এই ডাকের জন্ম ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে শিলং পাহাড়ে। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এই পাণ্ডুলিপির অনেকগুলি সংশোধন করে প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় অর্থাৎ ইংরেজী ১৯২৪ সালে, প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর নাটক রক্তকরবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।

কিশোর : নন্দিনী ! নন্দিনী ! নন্দিনী !

নন্দিনী : আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাইনে ?

কিশোর : শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার ? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী : যা, যা, এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিসনে।

কিশোর : সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী : ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর : তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী : আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর : অমন কথা বোলো না, নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন

থেকে তোমাকে আমি ফুল যোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী : কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর : সেই ব্যথায় আমার ফুল আরও বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় মানুষের দুঃখের ধন।

নন্দিনী : কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী-করে!

কিশোর : কীসের দুঃখ! একদিন তোমার জন্যে প্রাণ দেব, নন্দিনী— এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী : তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো কিশোর!

কিশোর : এই সত্যটি কর্, নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী : আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর : না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

(প্রস্থান। অধ্যাপকের প্রবেশ)

অধ্যাপক : নন্দিনী যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী : কী অধ্যাপক?

অধ্যাপক : ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না-হয় সাড়া দিয়েই-বা গেলে। একটু দাঁড়াও দুটো কথা বলি।

নন্দিনী : আমাকে তোমার কীসের দরকার?

অধ্যাপক : দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো! আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন— সোনা। কি সুন্দর, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে!

নন্দিনী : বারে বারে ওই একই কথা বল। আমকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কীসের অধ্যাপক?

অধ্যাপক : সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে, সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই-বা এখানকার কথা কী ভাবছ, বলো দেখি।

নন্দিনী : অবাক হয়ে দেখছি। সমস্ত শহর মাটির তলার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক : আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

বক্তা ২ : রবীন্দ্রগবেষক অশ্রুকুমার সিকদার লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রনাট্যে তত্ত্বগত বিচারে বিষয়বস্তু একটিমাত্র, জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির বিরোধ এবং পরিণামে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ। জড়ত্ব ও প্রাণের বিরোধ তাই বন্ধন ও মুক্তির বিরোধে রূপান্তরিত এবং সেই বিরোধের ফল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির মহৎ প্রকাশে।

নন্দিনী : পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—
আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তোর ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।
দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায়, হায় হায় ।
তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো? খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে : আমি মাঠে যাব? কোন কাজে লাগব?

নন্দিনী : মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে : সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে? যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী : অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত! আচ্ছা, রাজা বলো তো— পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে : কেন, ভয় কীসের?

নন্দিনী : পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক

চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না?— এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে।

নেপথ্যে : অভিসম্পাত?

নন্দিনী : হাঁ, খুনোখুনি-কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে : শাপের কথা জানিনে। এ জানি যে, আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিনী?

নন্দিনী : ভারী খুশি লাগে। তাই তো বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

বক্তা ৩ : রক্তকরবী-র আগে লেখা নাটকগুলিতে যে-ধরণের সময়, স্থান ও চরিত্রের সমাহার দেখতে পাই, তারই পরিণততর ব্যঞ্জনাময় রূপ হিসাবে এই নাটকের পটভূমি হয়ে এল এক শহর যক্ষপুরী। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ এই নাটক লিখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। এই বিশ্বযুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সচেতন করে তুলেছিল আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে। দুয়ের দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ব্যক্তিগত ও দেশজ বিষয়কে ছাড়িয়ে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে মনোযোগী হচ্ছেন।

বক্তা ৪ : এর অন্যতম কারণ নিশ্চয় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি, নিরন্তর বিদেশ ভ্রমণ বা যুদ্ধের অভিঘাত। বিশেষ করে যে মানবতার লাঞ্ছনা সংঘটিত হল তা রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদীর পক্ষে আলোকিত হওয়া খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। এই মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি বা অস্ট্রিয়ার প্রাচীন রাজতন্ত্রগুলির পতন ঘটেছে, কিন্তু তার সাথে সাথে একনায়কতন্ত্রেরও প্রসার ঘটেছে।

নন্দিনী : আজ তোমার কী হয়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন?

নেপথ্যে : মিছিমিছি ভয়? জান না আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী : হঠাৎ তোমার এ কী ভাব! লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারী খুশী হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলবো? রাগ করবে না?

নেপথ্যে : কী বলো দেখি।

নন্দিনী : ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!

নেপথ্যে : কী বলছ, নন্দিনী?

নন্দিনী : এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে : তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! এত দিন যা কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশ-করা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী : তার পরে কী?

নেপথ্যে : তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। ডালিমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের হয়, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও এখনই পালিয়ে যাও, এখনই।

নন্দিনী : এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পারো, করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন?

নেপথ্যে : আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনও আর্তনাদ শোননি?

নন্দিনী : শুনেছি, কীসের আর্তনাদ?

নেপথ্যে : সৃষ্টিকর্তার চাতুরি আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকিয়ে আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই— সেইসব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী : কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে : আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়া করতে পারিনে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী : ওকি! অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন?

নেপথ্যে : আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

বক্তা ৫ : ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ গেলেন জাপান ভ্রমণে। প্রাচ্যের দেশ জাপানে বহুদিন ধরে ঐতিহ্যমান রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৮৬৭ সালে মেইজি সম্রাট মুৎসুহিতোর সময় থেকে জাপান আধুনিক শিল্পায়নের দিকে ঝুকতে থাকে। ১৯১২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত সম্রাট জোসিহিতোর রাজত্বকালে জাপান সামরিক ক্ষমতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি শক্তির অন্যতম হয়ে ওঠে। এরপরই রবীন্দ্রনাথ গেলেন

আমেরিকায়। ঊনিশ শতকের মধ্যপর্বে গৃহযুদ্ধের থেকেই আমেরিকা ইউরোপ-বাসীর জন্য দরজা খুলে দেয় এবং তাদের সমবেত মেধায় এই দেশে শিল্পবিপ্লব ব্যাপক উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই দেশের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। যে-যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে নষ্ট করে দেয় তার সম্পর্কে গভীর আপত্তি ছিল তাঁর। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই উন্নতি যে-সাম্রাজ্যবাদের দিকে নিয়ে যাবে সে-কথাও মনে করিয়েছেন।

Human society grew more and more into a marionette show of politicians, soldiers, manufacturers and bureaucrats, built by wire arrangements of wonderful efficiency.

নন্দিনী : তারপরে আবার তোমাদের রাজাকেএই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ, পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক : আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী : এসব তোমাদের বানিয়ে তোলা কথা।

অধ্যাপক : বানিয়ে তোলাই তো। উলঙ্গের কোন পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে — তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী : তোমাদের খোদাইকর যেমন খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?

অধ্যাপক : আমরা নিরেট-নিরবকাশ গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি। তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী : না না, এখন না— আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক : সে থাক জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী : আমি জালের বাধা মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক : জান নন্দিনী?— আমিও আছি একটা জালের পিছনে। মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী : আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?

অধ্যাপক : সব জিনিসকে টুকরো আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু, তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও?

বক্তা ৬ : রবীন্দ্রনাথ আরও বলছেন "এই বাণিজ্য ব্যাধটাও হাঁস ফাঁস করতে করতে এক এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, তার শব্দই বা কী। লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরালনে হজম করছে এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎ জোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।" ১৯২০-২১ সালে দীর্ঘদিনের জন্য ইউরোপ এবং আমেরিকা ঘুরে তার সামনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা সামগ্রিক ছবি ভেসে ওঠে। এর সাথে সাথে চিন, জাপান বা মুসোলিনির ইতালি তাঁকে দেখাল ফ্যাসিবাদের কঙ্কাল চেহারা। এই সভ্যতা নিয়ে তাঁর বিতৃষ্ণার কথাও জানিয়েছেন— "My experience in the West, where I have realised the immense power of money and of organised propaganda, working everywhere behind screens of camouflage, creating an atmosphere of distrust, timidity and antipathy."

ফাগুলাল: আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা : ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?

ফাগুলাল: আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেইসঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা : বল কী! ওরা কী ঠাকুরদেবতা মানে?

ফাগুলাল: দেখনি? ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির, একেবারে গায়ে গায়ে।

চন্দ্রা : তা, ছুটি পেয়েছ বলে মদ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল: বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা : কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল: ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?

চন্দ্রা : কেন বন্ধ?

ফাগুলাল: আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোন মুনাফা নেই।

চন্দ্রা : আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগোনো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ? ফালতু কিছুই নেই?

ফাগুলাল: আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই

দরকার। যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় ক্ষুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমনকি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে।— ওই যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা : কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গা খুলে গেছে।

ফাগুলাল: তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা : ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে— সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল: তাতে আর অশ্চর্যটা কী?

চন্দ্রা : না, আশ্চর্য কিছু নেই। ওগো, সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনি মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল: বিশুর বিপদ আজ ঘটেনি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা : বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়? গান শোনাবার লোক এখানেও এক আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

(বিশুর প্রবেশ ও গান)

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে!
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরাণ চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা : তবে তো আশা নেই, আমরা যে বড়ো কাছে।

বিশু : আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে।

বক্তা ৭ : ১৯২০-২১ সালে লেখা চিঠিগুলিতে ব্যবহৃত উপমা অবশ্য রক্তকরবীর সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত বলা চলে। যে-বিশালতায় দুর্গপ্রাকারের কথা বলা হচ্ছে তা তো রাজার প্রাসাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিপরীতে ফুলের মতো ফুটে ওঠা শান্তিনিকেতনের ছবির সঙ্গে শুধু যে চরিত্রদের সংলাপে বলা গ্রামের স্মৃতিকেই মিলিয়ে দেয় তাই নয়, এই নাটকে ফুলের ব্যবহারও একটা অন্য

মাত্রা এনে দেয়। Monstar of Arithmetic রক্তকরবীতে হয়েছে সংখ্যাদৈত্য; রাজার সংলাপেও এসেছে মরুভূমির উপমা, চিঠিতে লেখা আতশকাঁচের চোখ দিয়েইে তৈরি হয়ে উঠেছে যক্ষপুরী।

ফাগুলাল: এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কীসের জন্যে? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু : ফাগুলাল খেপ্‌লে আর রক্ষে নেই। চুপ, চুপ!

চন্দ্রা : ইহকাল পরকাল তুমি দুই-ই খোয়াতে বসেছ! তোমার গতি হবে কী! এমন মতি তোমার আগে ছিল না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই : যাই বলো সর্দার, কী সরলতা! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার : বুঝেছি বৈকি। এও বুঝেছি, উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও-পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতিরা যেন একটু খিট্‌খিট্ শুরু করছে।

গোঁসাই : কোন্ পাড়া বললে সর্দার বাবা?

সর্দার : ওই যে টে-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ওই পাড়ায় শেষ।

গোঁসাই : বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনও নড়্ নড়্ করছে মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরও একটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেন না, নহংকারাৎ পরো রিপুঃ । ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা : প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই : ভয় নেই, মা লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(প্রস্থান)

সর্দার : ওহে ৬৯ঙ তোমাদের ও- পাড়ার মেজাজটা যেমন কেমন দেখছি।

বিশু : তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম অবতার বলেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়! কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা : বিশুবেয়াই একটু থামো। সর্দার-দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার : কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনে রাখব।

বক্তা ৮ : প্রাত্যহিক বাস্তবতার অতীতের পটে রবীন্দ্রনাথ ধরতে চান তাঁর নাটকের কাহিনি। সেক্ষেত্রে উপমা হিসেবে যে-কথাগুলো মনে হয়েছিল, তা-ই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে তাঁর সামনে, যে মনোভাব বা তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে এইসব উপমার

আবির্ভাব, তারা আলো দিতে থাকে আড়াল থেকে।

বিশু : যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী : পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু : সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

(গান)

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া!
এল, আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো।
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী : বিশু-পাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া'?

বিশু : তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দ্যুতি। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ শুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী : তোমাকে একটা কথা বলি পাগল! যে দুঃখটির গান তুমি গাও আগে আমি তার খবর পাইনি।

বিশু : কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী : না। দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের ভুরুর মাঝখানে তির মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশু : (গান)

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার
দুঃখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি
এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় নিয়ে গেলে
কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী : সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনল?

বিশু : একজন মেয়ে। হঠাৎ তির খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধূলোর মধ্যে এনে ফেলেছে। আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী : তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে?

বিশু : তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানালা দিয়ে আমি দেখেছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখেছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, "ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।" আমি স্পর্ধা করে বললুম, "যাব নিয়ে।" আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী : আমি এসেছি, এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু : তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ তখন তোমাকে ঠেকাবে কীসে?— আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী : এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু : কীরকম দেখলে?

নন্দিনী : দেখলুম— মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু : ঘরে ঢুকে কী দেখলে?

নন্দিনী : ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে অঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ভয় করে না?" আমি বললুম, "একটুও না।" তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু : তোমার কেমন লাগল?

নন্দিনী : ভালো লাগলো। কীরকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু : তার পরে ও কী বললে?

নন্দিনী : এক সময় ঝেঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, "আমি তোমাকে জানতে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, "জানবার কী আছে? আমি কি তোমার পুঁথি।" সে বললে, "পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানিনে।" তার পরে কীরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, "রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কী রকম ভালোবাস?" আমি বললুম "জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।" মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?" আমি বললুম, এখ্খনি।" ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, "কখ্খনো না!" আমি বললুম, "হাঁ পারি।" "তাতে তোমার লাভ কী?" বললুম, "জানিনে।" তখন ছট্ ফট্ করে বলে উঠল, "যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।" মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু : সব কথার স্পষ্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী : পাগল ভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু : যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী : না, না তুমি জানো না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কীরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু : ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে—জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী : ওই দ্যাখো পাগল ভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনছে।

বিশু : এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলার জো কী!– সর্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী : ওর মত মরা জিনিস দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিক্‌লিক্ করছে,

বিশু : প্রাণকে শাসন করার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী : চুপ করো, শুনতে পাবে।

বক্তা ৯ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বিস্তার ঘটেছিল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির। যুদ্ধের ঠিক আগে ১৯০৮ সালে টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানী স্থাপিত হয়—ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা। ১৯১১ সাল থেকে এই কোম্পানী উৎপাদন শুরু করে। ১৯১৮-১৯ সাল থেকেই বিভিন্ন স্তরে শ্রমিকদের সচেতনতা এবং অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল। ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন, "১৯১৮-১৯ সালের ধর্মঘটের ঢেউয়ের যে ধাক্কাটা সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পক্ষেত্রে সমানভাবে গিয়ে আছড়ে পড়ল তা নজিরবিহীন।" ১৯১৮ সালে আমেদাবাদে শ্রমিকদের এক মাসের ধর্মঘট ও আংশিক জয়, এর অল্প পরেই মাদ্রাজের বাকিংহাম আর কর্ণাটক মিলে ধর্মঘট, ১৯১৮-১৯-এ বোম্বাইয়ের সূতিকাপড় কল আর বাংলার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, মাদ্রাজেই ওয়াদিয়া ও চাক্কারাই চেট্টিয়ারের নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন, ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ের কাপড় কলে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত দু লাখেরও বেশি শ্রমিকের ধর্মঘট, ১৯২০ সালে জামশেদপুরে টাটার লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট বা ওই বছরই জামালপুরে রেল ধর্মঘটের কথা মনে রাখতে হবে। জামালপুরে এই আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ১৫জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হন ২৩জন। ১৯২১ সালে ভারতে মোট ৩৯৬টি ধর্মঘট হয়। যাতে যোগ দেন মোট ৬ লাখ শ্রমিক। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, এমন ভাবার কোন কারণ নেই, বরং রক্তকরবী-র বিষয় ও কাহিনি বয়নে এইসব ঘটনার প্রভাব থাকা সম্ভব বলেই মনে হয়।

(সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ)

সর্দার : না, এ-পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতেই আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল : ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার : তা, কী হল?

মোড়ল : কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, "হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।"

সর্দার : অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী?

মোড়ল : সে চেষ্টা করা হেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়-ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হোহো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, "গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।"

সর্দার : ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন?

মোড়ল : দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল— খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে; বললে, "আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।"

সর্দার : খোদাই নৃত্য? তার মানে কী?

মোড়ল : রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বললে, "মাদল পাই কোথায়?" ও বললে, "মাদল না থাকে, কোদাল আছে," তালে-তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি! বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, "এ কেমন তোমার কাজের ধারা?" রঞ্জন বললে,"কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।"

সর্দার : লোকটা পাগল দেখছি।

মাড়ল : ঘোর পাগল। বললুম, "বললুম কোদাল ধরো।" ও বলে, "তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।"

সর্দার : তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে?

মোড়ল : কী জানি প্রভু! শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার : ও কী! ওই না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল : তাই তো! কখন গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে! ভেল্‌কি জানে।

সর্দার : যাও, এই বেলা ধরো গে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতেই মিলতে না পারে।

মোড়ল : দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

(ছোট সর্দারের প্রবেশ)

সর্দার : কোথায় চলেছ?

ছোট সর্দার : রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার : তুমি কেন? মেজো সর্দার কোথায়?

ছোট সর্দার : ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, "আমরা সর্দাররা কিরকম অদ্ভূত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।"

সর্দার : শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোট সর্দার : ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার : ওকে বল গে, রাজা ওর নন্দিনীকে দেবদাসী করে রেখেছে।

ছোট সর্দার : কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার : কিছু ভাবতে হবেনা। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি।

বক্তা ১০ : রক্তকরবী নাটক ও প্রযোজনা প্রসঙ্গে শাঁওলী মিত্র বলেছিলেন— "কিন্তু আমাদের চারপাশে যে সমাজব্যবস্থা, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তারা যে-প্রক্রিয়ায় চলেছে তাতে আমাদের সেই উন্মুখ দর্শকদের চিত্তবৃত্তিকে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করছে। যাতে কারও মনে কোনো নীতির প্রতি কোনো মর্যাদাবোধ না থাকে। যাতে স্বার্থের ওপরে কোনো মহৎ কিছুতে কারও কোনো বিশ্বাস না থাকে। তবু আশ্চর্য লাগে দেখে যে, এখনও পারেনি তারা সম্পূর্ণ নষ্ট করতে। এখনও ভালো সৃষ্টিকে বোধ দিয়ে গ্রহণ করবার ভালোত্ব রয়েছে অনেক মানুষেরই মধ্যে। এখনও, এই সমাজে মানুষের অন্তঃস্থিত যে অসাধারণ প্রাণশক্তি তা এখনও তাকে রক্ষা করে যাচ্ছে। কিন্তু ভয় হয় যে, কতদিন আর? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র, আমাদের চাকুরিব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র, আমাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে অশুভচক্র, যাতে প্রতি মুহূর্তে মানুষেরা হীন হয়, নীচ হয়। সেই অশুভচক্রদের সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষ বড়ো তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। যে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্ত নিয়ে বাঁচবার জন্যেই ডিমোক্র্যাসির স্থাপনা, সেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র মানুষদের আজ আমাদের দেশের ডিমোক্র্যাসির মধ্যে প্রতিপদে লাঞ্ছনা, অপমান আর নিরাপত্তার অভাব। যতক্ষণ না সে কোনো দলে ঢুকে পড়তে পারছে, যে-দলের হাতে অনেক লাঠি, পিস্তল ও বোমা ইত্যাদি আছে, এবং এসবই হচ্ছে সেই ডিমোক্র্যাসির নাম করে।—তাই ভয় .... সংগঠিত শক্তির সামনে ব্যক্তিগত মানুষের অবমাননা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর যক্ষপুরীতে। তিনি আশা করেছিলেন যে, মানুষের অদম্য প্রাণশক্তিই তাকে বাঁচাবে।

নন্দিনী : রাজা এইবার সময় হলো।

রাজা : কীসের সময়?

নন্দিনী : আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমর সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা : আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী : তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র

নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা : তাহলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমারে সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিনী।

নন্দিনী : কোথায় যাবো?

রাজা : আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমরাই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না। সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক : মহারাজ, একি কাণ্ড! একি উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন!— আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজাদণ্ড! পূজারদিনে কী মহাপাতক!— চল্ সর্দারদের খবর দিই গে।

(প্রস্থান)

রাজা : এখনও অনেক ভাঙা বাকি। তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী : যাব আমি।

(ফাগুলালের প্রবেশ)

ফাগুলাল : বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—
এ কে! এই বুঝি রাজা! ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনি!

রাজা : কী হয়েছে তোমাদের? কী করতে বেরিয়েছ?

ফাগুলাল : বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা : ফিরবে কেন? ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন— আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল : নন্দিনী, ভালো বুঝতে পারছিনে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করে, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী : ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল : নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে চলো।

নন্দিনী : আমি তো সেজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দ্যাখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল : সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী : নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনও মরতে পারে না!

ফাগুলাল : হায় রে, নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে!

নন্দিনী : ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।—
চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল?

ফাগুলাল : সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস—
কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝনি তো? আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা : হাঁ, আমারই বন্দিশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল : সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা : তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল : সৈন্যরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা : একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল : জিততে পারবে?

রাজা : মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি—বেঁচেছি।

ফাগুলাল : রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা : ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী-করে সম্ভব হল? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমি জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল : আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছোল না।

রাজা : সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী : মনে ছিল, বিশুপাগলাকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না?

রাজা : উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখিনি।

ফাগুলাল : তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী : একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে।—
সর্দার! সর্দার! — দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রং করে দিয়ে যাব।— সর্দার!— আমাকে দেখতে পেয়েছে। — জয় রঞ্জনের জয়!

বক্তা১০: এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়টা আজও একশত বছর পরে আমাদের কাছে সত্যমূলক লাগে কারণ সারাদেশে সংগঠিত অংশের তুলনায় অসংগঠিত অংশ

দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই অসংগঠিত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর অবস্থার কথা মনে করলে যক্ষপুরীর মজদুরদের কথা— বিশেষ করে রাজার এঁটো হয়ে ছিবড়ের মতো যে মানুষগুলো বেরিয়ে আসে— তাদের কথা মনে হয়। সেই কারণেই গাড়ীর গ্যারেজ, ঢালাইয়ের কারখানা বা চায়ের দোকানের ছেলেরা যখন বারো ঘন্টা করে খেটে মরে— মাঝে মাঝে তাদের মুখে আমরা কিশোরের মুখটাকে দেখতে পাই। শহরে ময়লা ফেলার ছেলেটি বা গ্রামের ভাগাড় থেকে মরা গরুর ছাল কেটে নিয়ে যাওয়া ছেলেটির মুখেও কি ফাগুলালের মতো অনাবিল হাসি শুনিনি? নাকি তাদের নেশা করে খুশি হতে দেখিনি ফাগুলালেরই মতো?

বক্তা১১: আসলে পৃথিবীর ধনী দেশগুলো তাদের স্ফীতকায় 'থাকা-টা আরও বাড়িয়ে যাবার জন্যে সমস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেবলই কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা করে নানা ক্ষেত্রে হাত মুচড়ে দেবার চেষ্টা করে, দরিদ্র দেশের মধ্যে বিভেদ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাতে তারা দুর্বল ও দরিদ্রই থাকে। আর এই গরীব দেশের উপরতলার মানুষেরা তাদের থাকা-টা বাড়ানোর জন্যে যতদূর সম্ভব চাপ দেয় সবচেয়ে নীচুতলার মানুষের উপরে। এমন কি, আমাদের ক্রমবর্ধমান যে ব্যাপক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাদেরও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, এই অসংগঠিত শ্রমজীবীদের কথা কারও ভাববার সময় নেই। সংগঠিত ইউনিয়নবিহীন বিশু-ফাগুলালদের খুব একটা দূরের মানুষ বলে আমাদের মনে হয় না।

সকলে : পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায় ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। *রক্তকরবী* — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। *নাটক রক্তকরবী* — শম্ভু মিত্র
৩। *রক্তকরবী অন্য ভাবনায়* — সৌমিত্র বসু
৪। *রবীন্দ্র রচনাবলী* — একাদশ খণ্ড, প্রবন্ধ
৫। *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ* — শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
৬। *রক্তকরবী পত্রিকা* — তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

লেখক : **ড. শান্তনু দাস, অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।**

Writer : **Dr. Santanu Das, Professor, Drama Deptt. Rabindra Bharati University.**

ন্যায়ের খোঁজে

বের্টোল্ট ব্রেশট

জার্মান মূল নাটক - Rechtsfindung (১৯৩৪ সালে প্রকাশিত)

ইংরেজি অনুবাদ - In search of Justice - Eric Bentley

বাংলা রূপান্তর - **নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য**

চরিত্রলিপি

১নং বিচারক - প্রদোষ অধিকারি, পুলিশ ইন্সপেক্টর - শিবনাথ বক্সী, সরকারি উকিল - মৈনাক গুপ্ত, প্রদোষ অধিকারির পি এ - সুনীল চৌধুরি, প্রদোষ অধিকারির বাড়ির চাকর - শম্ভু, ২ নং বিচারক - অভিষেক চ্যাটার্জি।

(জানলা দিয়ে জানুয়ারি মাসের ধোঁয়াশে সকাল দেখা যাচ্ছে। বিচারকের ঘরে আলো জ্বলছে। বিচারক প্রদোষ অধিকারি তাঁর বিচারকের পোষাক পড়ছেন। দরজায় আওয়াজ শোনা যায়।)

প্রদোষ : ভেতরে আসুন।

(পুলিশ ইন্সপেক্টর শিবনাথ বক্সী ভেতরে ঢোকে।)

বক্সী : গুড মর্ণিং স্যার।

প্রদোষ : গুড মর্ণিং ইন্সপেক্টর বক্সী। আমি তোমাকে জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভর- এর কেসটা আলোচনা করার জন্য ডেকেছিলাম। সত্যি বলতে কী এই ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

(বক্সী কোন কথা বলে না)

কাগজপত্র ঘেঁটে আমি যা বুঝলাম তা হল এই যে ঘটনাটা রশিদ হাসানের গয়নার দোকান যার নাম 'জেবর' সেখানে ঘটেছে। রশিদ হাসান নিশ্চয়ই মুসলমান?

(বক্সী এবারও কোন কথা বলে না)

আর জনার্দন, বিক্রম, বিশ্বম্ভর নারায়ণ সেনার ঠ্যাঙারে বাহিনীর তিনজন সদস্য।

(বক্সী মাথা নাড়ে)

তার মানে নারায়ণ সেনা ওই তিনজনকে সংযত করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। (বক্সী মাথা ঝাঁকায়)

ওই তল্লাটে এ নিয়ে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে নারায়ণ সেনার নেতারা ওখানে গিয়ে কোন খোঁজ - খবর নিয়েছে? (বক্সী কাঁধ ঝাঁকায়)

বিচার শুরু হবার আগে আমাকে যদি তুমি সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা জানাও তবে আমার পক্ষে রায় দিতে সুবিধে হবে। পারবে বলতে কী ঘটেছিল সেদিন?

বক্সী : (যান্ত্রিকভাবে গড় গড় করে বলতে থাকে) গতবছর ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখ সকাল সওয়া এগারটার সময় নারায়ণ সেনার তিনজন সদস্য- জনার্দন সরকার,

বিক্রম সমাজপতি আর বিশ্বম্ভর দাস রেলপুকুর রোডে রশিদ হাসানের 'জেবর' নামের দোকানের দরজা ভেঙে দোকানে ঢুকে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে। তারপর চুয়ান্ন বছর বয়সি রশিদ মিয়ার পিছন দিকে আঘাত করে ওকে আহত করে। ওরা দোকানের কিছু ক্ষয়ক্ষতিও করে যার আর্থিক মূল্য পাঁচ লাখ পঁইত্রিশ হাজার টাকা সাব্যস্ত করা হয়েছে। ডিসেম্বরের সাত তারিখ যে পুলিশ তদন্ত করা হয়েছে তা থেকে দেখা গেছে ...

প্রদোষ : শোন বক্সী , ওসব তো রেকর্ডেই আছে।
(বিরক্ত হয়ে প্রদোষ অপরাধের বিবরণ যা মাত্র একটা পাতায় লেখা আছে সেটা দেখায় ইন্সপেক্টরকে) এত সংক্ষিপ্ত আর এত দায়সারা গোছের লেখা অভিযোগের বয়ান এর আগে আমি কখনো দেখিনি আর গত কয়েকমাসে আমাকে এ নিয়ে কোন নতুন তথ্যও জানানো হয়নি। আমার মনে হল তুমি হয়ত ঘটনার প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু নতুন তথ্য জানাতে পারবে।

বক্সী : অবশ্যই স্যার। এ কেসের কোন ব্যাকগ্রাউন্ডই নেই।

প্রদোষ : তুমি কি বলতে চাও যে কেসটা খুব সিধে সাধা গোছের?

বক্সী : (দাঁত বের করে) না না, তা নয়।

প্রদোষ : রেকর্ডে বলা হয়েছে যে ওই ঘটনার সময় কিছু গয়নাপত্র উধাও হয়ে গেছে। ওগুলো উদ্ধার হয়েছে?

বক্সী : সেরকম কিছু শুনিনি আমি।(বিচারক কঠিন দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকান) আমার একটা পরিবার আছে স্যার।

প্রদোষ : আমারও পরিবার আছে, বক্সী।

বক্সী : ঠিক। (একটু সময় কেউ কোন কথা বলেনা)
রশিদ হাসান মুসলমান সেটাতো জানেন?

প্রদোষ : ওটাতো নাম থেকেই বোঝা যায়।

বক্সী : ঠিক। ওই এলাকায় মানে রেলপুকুর রোডে একটা গুজব ছড়াচ্ছে। এটাকে রিভার্স লাভ জিহাদ বলতে পারেন।

প্রদোষ : তাই? কে রয়েছে এর মধ্যে?

বক্সী : রশিদ মিয়ার মেয়ে নাসিমা খাতুন বয়স উনিশ, শুনেছি সুন্দরী।

প্রদোষ : এটা নিয়ে কোন তদন্ত করা হয়েছে?

বক্সী : না, সেরকম কিছু হয়নি। গুজবটা কিছুদিন পরে আর শোনা যায়নি।

প্রদোষ : কে ছড়িয়েছিল গুজবটা?

বক্সী : দোকানটা যে বাড়িতে রয়েছে সেই বাড়ির মালিক । সুব্রত কুন্ডু ।

প্রদোষ : ও কি মুসলমানের দোকানটা ওর বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিতে চাইছিল?

বক্সী : আমাদের সেটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় শেষে ও সেই ভাবনা থেকে দূরে সরে আসে।

প্রদোষ : যা হোক, এ থেকে কি বোঝা যায় যে ওই এলাকায় রশিদ হাসানের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জেগে উঠেছিল? হয়ত নারায়ণ সেনা দলের ওই তিনজন হিন্দুত্ব বাদের উত্তেজনা বশত ওই আক্রমণটা করেছিল।

বক্সী : (দৃঢ়তার সঙ্গে বলে) আমার সেরকমটা মনে হয় না স্যার।

প্রদোষ : কী মনে হয় না তোমার?

বক্সী : জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভর ওই রিভার্স লাভ জিহাদ নিয়ে মাথা গরম করবে।

প্রদোষ : কেন?

বক্সী : ওই ছেলেটার নাম জানা যায়নি। ভগবান জানে কে ছিল ওই ছেলেটা । নারায়ণ সেনা ওটা নিয়ে কোন অভিযোগ তোলেনি। তাছাড়া ওটাতো নারায়ণ সেনার চিন্তা ভাবনার বিপরীত নয়।

প্রদোষ : তাহলে ওটা আমাকে তুমি বলতে গেলে কেন?

বক্সী : বললাম কারণ আপনি বলেছেন আপনারও পরিবার আছে। আপনি যাতে ওটা নিয়ে কোর্টে সওয়াল জবাব না করে বসেন সেইজন্য বললাম। তবে ওই অঞ্চল থেকে যেসব সাক্ষী আসবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেই পারে।

প্রদোষ : বুঝলাম। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক কিছু আছে যা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

বক্সী : আপনাকে একটা কথা বলব স্যার? এই কেসে যত কম বুঝবেন ততই ভাল।

প্রদোষ : তোমার পক্ষে এরকম কথা বলা সহজ, কিন্তু আমাকে তো রায় দিতে হবে।

বক্সী : (বিড়বিড় করে) তা তো বটেই।

প্রদোষ : আরেকটা সম্ভাবনা হচ্ছে রশিদ মিয়া নারায়ণ সেনার ওই তিনজনকে নিজেই উস্কে দিয়েছিল আপত্তিকর কোন মন্তব্য করে। তাছাড়া এ ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা যায় না।

বক্সী : আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে স্যার।

প্রদোষ : তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় নারায়ণ সেনা সদস্যদের কীভাবে উস্কে দেওয়া হয়েছিল?

বক্সী : ওদের বয়ান অনুযায়ী ওদের উস্কে দিয়েছিল রশিদ আর ওর একজন ভাড়া করা দিনমজুর যে তখন দোকানে বাইরে ঝাড়ু দিচ্ছিল। ওই তিনজন মনে হয় চা খেতে যাচ্ছিল আর ওরা যখন দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল লাটু নামের ওই দিনমজুর আর রশিদ ওদের গালাগালি দিয়েছিল।

প্রদোষ : কিন্তু তোমার কাছে কি কোন সাক্ষী আছে ওই ঘটনার?

বক্সী : হুম। বাড়ির মালিক সুব্রত কুন্ডু ওর জবানিতে বলেছে যে ও লাটুকে নারায়ণ সেনার লোকদের গালাগালি দিতে শুনেছে । উপরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখেছে

ওটা। রশিদের পার্টনারের নাম কৃপানাথ শিকদার। ওইদিন বিকেলে ও গিয়েছিল নারায়ণ সেনার অফিসে। জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভর তিনজনই তখন ওখানে উপস্থিত ছিল। কৃপানাথ স্বীকার করেছে ওদের সামনে যে রশিদ হাসান সবসময়ই নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আসছে।

প্রদোষ : তাহলে রশিদের একজন পার্টনার আছে আর ও হিন্দু?

বক্সী : ঠিক তাই। ও কি কোন মুসলমানকে পাঠাবে ওর হয়ে কথা বলতে?

প্রদোষ : কিন্তু পার্টনার হয়ে ওর বিরুদ্ধে কথা বলবে কেন কৃপানাথ?

বক্সী : (মুচকি হেসে) তা তো বলতে পারব না স্যার।

প্রদোষ : (বিরক্ত হয়ে) কী বলছ তুমি? গয়নার দোকান ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না যদি এটা প্রমাণ হয় যে জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরকে রশিদই আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছিল।

বক্সী : আপনি কি করে জানলেন কৃপানাথের কোন আগ্রহ আছে ক্ষতিপূরণের?

প্রদোষ : আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। ও -তো রশিদের পার্টনার, তাই নয় কি?

বক্সী : একদম ঠিক।

(প্রদোষ অবাক হয়ে মাথা চুলকোন)

আমরা এটা জেনে গেছি যে কৃপানাথ নারায়ণ সেনার অফিসে যাতায়াত করে- প্রকাশ্যভাবে নয় কিন্তু গোপনে আর সে কারণেই হয়ত রশিদ ওকে পার্টনার করেছিল। কৃপানাথ একবার একটা অদ্ভুত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল- নারায়ণ সেনা একবার একজনকে খুব হেনস্থা করেছিল কিন্তু পরে দেখা গেল ওরা ভুল লোককে ধরেছিল, পরে সেটা সামাল দেওয়া খুব কঠিন কাজ হয়ে পড়েছিল। আমি অবশ্য এটা বলতে চাইনা যে কৃপানাথ নিজেই এ কেসটায় , ... যা হোক, আপনাকে ওর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। একটু আগে আপনি আপনার পরিবার নিয়ে বলছিলেন। আমি আশা করব আপনি এ ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।

প্রদোষ : (মাথা ঝাঁকিয়ে) আমার মাথায় এটা ঢুকছে না কৃপানাথের কী মতলব থাকতে পারে যে দোকানটার পাঁচ লাখ টাকার উপরে ক্ষতি হয়ে যাক?

বক্সী : গয়নাপত্র যা গেছে তা তো গেছে কিন্তু জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরের কাছে ওই গয়না নেই। ওরা ওটা বিক্রিও করেনি।

প্রদোষ : আচ্ছা?

বক্সী : রশিদ যখন নারায়ণ সেনার লোকদের আক্রমণ করতে উস্কে দিয়েছিল দেখা গেছে তখন স্বভাবতই কৃপানাথ আর ওকে পার্টনার হিসেবে রাখবে এটা আশা করা যায় না। ক্ষয়ক্ষতি যা কিছু হয়েছে দোকানে রশিদকেই এখন ভরপাই

করতে হবে। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি?

প্রদোষ : তা তো স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছি।

(চিন্তিতভাবে বক্সীকে দেখতে থাকেন বিচারক। বক্সী ভাবলেশহীন, নির্বিকার দৃষ্টিতে সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে থাকে।)

তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম- রশিদ মিয়া নারায়ণ সেনার লোকদের প্ররোচিত করেছিল আক্রমণ করতে। আপাতদৃষ্টিতে ও সব জায়গায়ই নিজেকে অপ্রিয় করে তুলেছিল। তুমি একটু আগে বললে না ও ওর পরিবারে যে স্ক্যান্ডালটা চলছিল তার ফলে বাড়ির মালিককে কমপ্লেন করার মত একটা পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছিল? ঠিক আছে, আমি জানি ওটা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না, কিন্তু এটা তো পরিষ্কার যে তাড়াতাড়ি রশিদ ওর বাড়ি ছাড়লে সুব্রত কুন্ডু খুশিই হবে। অনেক ধন্যবাদ বক্সী। তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করলে।

(প্রদোষ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে বক্সীকে একটা সিগারেট দিলেন। বক্সী বাইরে চলে গেল। দরজায় বেরোবার মুখে ওর সঙ্গে দেখা হল সরকারি পক্ষের উকিল মৈনাক গুপ্তের সঙ্গে।)

মৈনাক : (প্রদোষকে) এক মিনিট কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?

প্রদোষ : (দেরাজ থেকে একটাআপেল বের করে ছুরি দিয়ে ছুলছিলেন প্রদোষ। বলো।

মৈনাক : জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরের কেসটা নিয়ে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

প্রদোষ : (আপেল ছোলায় ব্যস্ত) বলো।

মৈনাক : আমি যতদূর বুঝতে পাচ্ছি কেসটা খুবই সিধে সাধা ধরণের।

প্রদোষ : আচ্ছা? সত্যি বলতে কী আমি বুঝতে পাচ্ছিনা তোমরা এই কেসটা খুললে কেন।

মৈনাক : কেন? রেলপুকুর অঞ্চলে এই কেসটা অনেকের মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। এমন কী শাসক পার্টির নেতারাও চান কেসটার তদন্ত হোক।

প্রদোষ : আমার কী মনে হয় জান মৈনাক? এটা শুধু মুসলমানদের উস্কে দেওয়ার ব্যাপার আর কিছুই না।

মৈনাক : একদম বাজে কথা, প্রদোষবাবু। আমাদের অপরাধের ফিরিস্থিতে ছোটখাট ত্রুটি থাকতেই পারে কিন্তু আপনার ওগুলো ভালভাবে দেখা উচিৎ। অত সোজাভাবে নেবেন না কেসটা। একটু সামনে চোখ মেলে তাকান আপনি। ভুলচুক করে বসবেন না যেন, নইলে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আপনার বিচারকের পোষাক খুলে বসবার আগেই আপনাকে বদলি করে দেওয়া হবে নাগাল্যান্ড বা মিজোরামের কোন জেলা আদালতে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে ওখানে খুব একটা আরামে থাকবেন না আপনি।

প্রদোষ : (ঘাবড়ে গিয়ে আপেল খাওয়া স্থগিত রাখেন) আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। তুমি কি বলতে চাইছ? রশিদ হাসানকে ছেড়ে দিতে চাও তুমি?

মৈনাক : (টাইয়ের নট ঠিক করে গম্ভীরভাবে) যদি বলি তাই? ও ওদের উস্কে দিতে চায়নি। আপনার কি মনে হচ্ছে মুসলমান বলে আমাদের দেশে সুবিচার পাবে না ও? প্রদোষবাবু, আপনার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরাফেরা করে।

প্রদোষ : (অসন্তুষ্ট হয়ে) আমার মাথা ঠিকই আছে মৈনাক। আমি শুধু ভাবছিলাম জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরকে খুঁচিয়ে দেওয়ায় ওরা দোকানের উপর আক্রমণ করেছিল।

মৈনাক : রশিদ মিয়া খোঁচায়নি, খুঁচিয়েছিল ওই দিনমজুরটা। কী নাম যেন ওর ... হ্যাঁ লাট্টু।

প্রদোষ : তোমাদের অপরাধের ফিরিস্তিতে কিন্তু ওর ব্যাপারে একটাও কথা বলা হয়নি ।

মৈনাক : অবশ্যই ওর নাম ছিলনা আমাদের অপরাধের বিবরণীতে। প্রসিকিউটারের অফিসে যা জানানো হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে নারায়ণ সেনার লোকেরা রশিদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা আমাদের কর্তব্যের দায়ে মাথা গলাই এই ব্যাপারে। যদি ধরুন বাড়ির মালিক সুব্রত কুন্ডু সাক্ষী হিসেবে কোর্টে গিয়ে বলে যে পুরো ঘটনাটা ঘটার সময় রশিদ কখনোই রাস্তায় ছিল না বরঞ্চ ওই দিনমজুরটা- কী নাম যেন ওর, হ্যাঁ লাট্টু- ওই লাট্টু গালাগালি করেছিল ওদের তবে আমাদের সেটা মনে রাখতেই হবে।

প্রদোষ : সুব্রত কুন্ডু কি ওরকম বিবৃতি দেবে? কিন্তু ও-তো ওই বাড়ির মালিক। ও চায় রশিদ মিয়াকে বাড়ি ছাড়া করতে। ওর স্বপক্ষে বিবৃতি দেবেনা সুব্রত কুন্ডু।

মৈনাক : সুব্রত কুন্ডুর বিরুদ্ধে আপনার কী বলার আছে? গীতা ছুঁয়ে শপথ নিয়ে ও কেন মিথ্যে বলতে যাবে? আপনি হয়ত জানেন না সুব্রত কুন্ডুর সরকারি মহলের উপর তলার লোকজনের সঙ্গে অনেক জানাশোনা আছে। দেখুন প্রদোষবাবু আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি ওকে একটু সমীহ করে চলুন।

প্রদোষ : ঠিক আছে, তাই হবে। যে দিনকাল পড়েছে তাতে কেউ যদি নিজের বাড়িতে কোন মুসলমানের দোকান না রাখতে চায় তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মৈনাক : (উদারতা দেখিয়ে) হ্যাঁ, যতদিন কেউ ভাড়াটা গুনে যাচ্ছে....

প্রদোষ : (সতর্কভাবে) আমাকে যা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় ও একবার রশিদ হাসানের বিরুদ্ধে ...

মৈনাক : তাহলে আপনি তো জেনেই গেছেন। কিন্তু সুব্রত কুন্ডু যে রশিদকে বাড়ি ছাড়া করতে চাইছে সেটা আপনার ভুল ধারণা। বিশেষত ওই অভিযোগটা তুলে নেওয়ার পর। এটাই কি মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় যে ওরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিয়েছিল? দেখুন প্রদোষবাবু, বেশি সহজ সরল হতে যাবেন না আপনি।

প্রদোষ : (এবার সত্যি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে) দেখ মৈনাক ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমি

আশা করেছিলাম রশিদের পার্টনার ওকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে, কিন্তু সে-ই ওকে ফাঁসাতে চাইছে আর বাড়ির মালিক যে ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিল সে-ই ওকে বাঁচাতে চাইছে। এবার আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

মৈনাক : আমরা মাইনে পাই কী জন্য?

প্রদোষ : খুব জটিল ব্যাপার। সিগারেট খাবে?

(মৈনাক সিগারেট নিয়ে ধরায়। দু'জনে নীরবে সিগারেট টানতে থাকে। তারপর প্রদোষ বলতে থাকেন বিষাদাচ্ছন্ন, চিন্তিতভাবে)

প্রদোষ : কিন্তু কোর্টে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে রশিদ নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে কিছু হলে ওদের উস্কে দেয়নি তবে ও চটজলদি নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে ওর দোকান ভাঙাচোরার জন্য মামলা দায়ের করতে পারে।

মৈনাক : নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে মামলা করার মুরোদ নেই ওর। বেশির বেশি জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতে পারে ও। কিন্তু ওদেরতো ফুটো কড়িও নেই। এখন যদি ওই দিনমজুর - কী যেন নামটা ওর, ওঃ লাট্টু- ওই লাট্টুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে। তাছাড়া নারায়ণ সেনার সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার আগে ও একশোবার চিন্তা করবে।

প্রদোষ : রশিদ এখন কোথায়?

মৈনাক : হাসপাতালে।

প্রদোষ : আর লাট্টু?

মৈনাক : পুলিশের হাজতে আছে ও।

প্রদোষ : (স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে) এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে রশিদ নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না আর লাট্টুও নিজেকে নির্দোষ বলে পার পাবে না। কিন্তু মুসলমান লোকটা যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে আসে তবে নারায়ণ সেনাতো খুশি হবে না।

মৈনাক : কিন্তু কোর্টে তো এটা উঠে আসবে যে নারায়ণ সেনার তিনজন সদস্যকে গালাগালি দিয়ে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। ও মুসলমান না কম্যুনিস্ট তা নিয়ে কোর্টের কোন মাথাব্যথা নেই।

প্রদোষ : (এখনও সন্দেহান্বিত) এটা কিন্তু একদম ঠিক নয়। লাট্টুর সঙ্গে নারায়ণ সেনার লোকদের কথা কাটাকাটি হবার সময়ই গয়নার দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই নারায়ণ সেনা এর সঙ্গে অনেকটাই জড়িত।

মৈনাক : আপনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে সব কিছু হবেনা আর সবাইকে ন্যায় দেওয়াও সম্ভব নয়। দেখুন প্রদোষবাবু আপনার দেশাত্মবোধই আপনাকে বলে দেবে কার পক্ষে রায় দেবেন আপনি। একটা জিনিস আমি জোর দিয়ে বলতে চাই- নারায়ণ

সেনার শীর্ষস্থানীয় লোকেরা আমাকে জানিয়েছে ভারতীয় বিচারকদের মেরুদন্ড আরেকটু সিধে করা উচিৎ।

প্রদোষ : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যাই বল মৈনাক কোনটা সঠিক তা বোঝা এত সহজ নয়। এটা তোমার স্বীকার করতেই হবে।

মৈনাক : অবশ্যই । কিন্তু আমাদের আইনমন্ত্রী সেদিন একটা দারুণ মন্তব্য করেছেন যা আপনার মনে রাখলে উপকার হবে। 'যাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ হয় সেটাই ঠিক।'

প্রদোষ : (বেজার মুখে) হ্যাঁ তাতো বটেই।

মৈনাক : মন খারাপ করবেন না প্রদোষবাবু। (উঠে দাঁড়ায়) ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে গেলেন এখন আর কোন অসুবিধা হবে না আপনার। পরে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। (কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। বিচারক প্রদোষ অস্বস্তিবোধ করেন। উনি জানলায় গিয়ে দাঁড়ান, তারপর টেবিলে এসে বেল বাজান। পি এ সুনীল চৌধুরী এসে দাঁড়ায়।)

প্রদোষ : সাক্ষীদের কামরা থেকে ইন্সপেক্টর শিবনাথ বক্সীকে ডেকে দাও। দেরী করো না (সুনীল বেরিয়ে যায়। ইন্সপেক্টর বক্সী আবার এসে ঢোকে।)
শোন বক্সী, আমার কপাল ভাল যে তোমার কথায় কান দিইনি আমি। তুমি বলেছিলে রশিদ উস্কে দিয়েছিল ওদের। এখন শুনছি সুব্রত কুন্ডু শপথ নিয়ে প্রমাণ দেবার জন্য তৈরি আছে যে ওই দিনমজুর লাট্টুই প্ররোচিত করেছিল নারায়ণ সেনার সদস্যদের, রশিদ নয়।

বক্সী : (ভ্রু কুঁচকে) একদম ঠিক স্যার।

প্রদোষ : একদম ঠিক? এখন কী বলতে চাইছ তুমি?

বক্সী : ওই লাট্টুই গালাগালি দিয়েছিল ওদের।

প্রদোষ : এটাই সত্যি তাই না?

বক্সী : (রাগতভাবে) স্যার, ঠিক হোক কিংবা বেঠিক আমরা তো .....

প্রদোষ : (দৃঢ়ভাবে) শোন এবার মন দিয়ে। তুমি ভারতের এক ন্যায়ালয়ে দাঁড়িয়ে আছ এখন। লাট্টু কি স্বীকার করে নিয়েছে যে ও নারায়ণ সেনার লোকদের গালাগালি দিয়েছিল না দেয়নি?

বক্সী : আমি নিজে ওর সেলে যাইনি স্যার। তদন্তের যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে দেওয়া আছে লাট্টুর কিডনির কোন সমস্যা আছে। রিপোর্টে আছে যে ও স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু ....

প্রদোষ : তাহলে ও স্বীকার করে নিয়েছে। আবার কিন্তু কিসের?

বক্সী : ও একসময় আর্মিতে জওয়ান ছিল। কারগিলের যুদ্ধে গলায় গুলি লাগে ওর আর

রশিদ মিয়ার পার্টনার কৃপানাথ সই করে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে ও জোরে কথা বলতে পারে না। দোতলা থেকে সুব্রত কুন্ডু ওকে নারায়ণ সেনার লোকদের গালাগালি দিতে শুনবে সেটা কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

প্রদোষ : কাউকে 'শালা-বাঞ্চোত , কুত্তার বাচ্চা ভাগ এখান থেকে' এসব বলে খিস্তি মারতে চড়া গলার দরকার হয়না। চোখ মুখেরও ভাষা আছে। আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে সরকারি পক্ষ চায় যে এই কেসে নারায়ণ সেনাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য একটা ছিদ্র রেখে দেওয়া হোক। স্পষ্ট করে বললে সেটাই চায় ওরা।

বক্সী : ঠিক বলেছেন স্যার।

প্রদোষ : রসিদ হাসান কী বলে?

বক্সী : ও বলেছে ও ওখানে ছিলই না। সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে ওর। এর থেকে বেশি কিছু ওর কাছ থেকে বের করতে পারবেন না আপনি।

প্রদোষ : মনে হয় লোকটা নির্দোষ, ভাগ্যচক্রে জড়িয়ে পড়েছে।

বক্সী : হতেও পারে সেরকমটা, স্যার।

প্রদোষ : আর নারায়ণ সেনাও খুশি হবে যদি ওদের লোকরা নির্দোষ সাব্যস্ত হয়, তাই না?

বক্সী : ঠিক বলেছেন স্যার।

প্রদোষ : মোসাহেবের মত বার বার আমাকে 'স্যার' বলতে হবে না তোমাকে।

বক্সী : আচ্ছা স্যার।

প্রদোষ : তুমি আমাকে কি বোঝাতে চাও? আমাকে ভুল বুঝনা বক্সী। তোমার বোঝা উচিৎ আমি একটু নার্ভাস ফিল করছি। তুমি একজন সৎ, দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার কিন্তু তুমি যখন আমাকে উপদেশ দিলে তখন নিশ্চয়ই তোমার মনে কিছু ছিল যা আমি বুঝতে পারিনি।

বক্সী : (খুশি হয়ে মেরুদন্ড সিধে করে) আচ্ছা স্যার, আপনার কি মনে হয়নি যে সরকার পক্ষের উকিল মৈনাক গুপ্ত আপনার চাকরি খাবার তালে আছে আর তাই আপনাকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে? এরকম কেস এখন আর অস্বাভাবিক নয়। আচ্ছা, ধরুন স্যার আপনি মুসলমান লোকটাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন। ও ওই লোকগুলোকে উস্কে দেয়নি, এমনকি ও ওখানে উপস্থিত ছিল না। অন্য লোকদের মারামারির মধ্যে পড়ে গিয়ে এ্যাক্সিডেন্টালি চোট লাগে ওর মাথার পিছনে ফুটো হয়ে গেছে। আর তার কিছু সময় পরেও দোকানে ফিরে এসেছে। ওর পার্টনার কৃপানাথ ওকে আটকাতে পারেনি আর দোকানে ভাঙাচোরা হওয়ায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু রশিদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবী করতে না পেরে ও ক্ষতির কিছুটা অংশ পূরণ করছে। কৃপানাথের মত লোককে আমি চিনি।

ও এখন নারায়ণ সেনার কাছে আবেদন জানাবে ক্ষতিপূরণের জন্য। অবশ্য ও নিজে যাবে না ওদের কাছে কারণ ও একজন মুসলমানের সঙ্গে কারবার করছে আর ওকে ওরা 'মুসলমানের চ্যালা' হিসেবে চিহ্নিত করবে। কিন্তু ও র সঙ্গে অন্য লোক আছে। তখন লোকে বলবে দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নারায়ণ সেনা গয়নাটা আত্মসাৎ করেছে। এবার কল্পনা করুন নারায়ণ সেনা আপনার রায় সম্পর্কে কী বলবে। সাধারণ লোক কিছুই বুঝতে পারবে না। হিন্দুত্ববাদের এই আবহাওয়ায় একটা মুসলমান কী করে নারায়ণ সেনাকে ভুল প্রতিপন্ন করবে বলুন?

(কিছুক্ষণ থেকে পিছনথেকে একটা আওয়াজ আসছিল,সেটা এখন বেশ বেড়ে গেল)

প্রদোষ : এই ভয়ঙ্কর আওয়াজটা কিসের? একটু দাঁড়াও বক্সী।

(উনি বেল বাজান। পি এ সুনীল এসে ঢোকে।)

সুনীল : আদালত একদম ভরে গেছে স্যার। ভেতরে ঢোকার রাস্তাগুলোতে এত লোক দাঁড়িয়ে জ্যাম করে দিয়েছে যে কোন লোক বাইরে থেকে ঢুকতে পাচ্ছে না। নারায়ণ সেনার কিছু লোক চেঁচাচ্ছে যে ওরা ঢুকতে পাচ্ছেনা আদালতে। ওদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

(সুনীল বেরিয়ে যায়। বিচারক প্রদোষ অধিকারিকে ভীত দেখায়)

বক্সী : (বলতে থাকে) আপনার পিছনে লোক লেলিয়ে দেবে ওরা, সেটা বুঝতে পাচ্ছেন? আমি আপনাকে স্ট্রংগলি এ্যাডভাইস করব স্যার আপনি শুধু রশিদের ব্যাপারটা মাথায় রাখুন আর নারায়ণ সেনাদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবেন না।

প্রদোষ : সেটাই আপনাকে আমি করতে বলছি স্যার।

(বক্সী চলে যায়। প্রদোষ বেশ কষ্ট করে উঠে দাঁড়ান, তারপর বেশ জোরে বেল বাজান। সুনীল ভেতরে ঢোকে।)

প্রদোষ : বিচারক অভিষেক চ্যাটার্জিকে গিয়ে বল উনি যদি কয়েক মিনিটের জন্য এসে দেখা করতে পারেন আমার সঙ্গে।

(সুনীল চলে যায়। প্রদোষের বাড়ির বয়স্ক চাকর শম্ভু ঢোকে লাঞ্চের ব্যাগ নিয়ে)

শম্ভু : আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে বড় কর্তা। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা বাইরে! আজ কী ভুলে গেছেন দেখুন। একটু ভালভাবে চিন্তা করুন- আসল জিনিষটা। (শম্ভু লাঞ্চের ব্যাগটা প্রদোষের হাতে তুলে দেয়।) লাঞ্চ ব্যাগ! এটা না পেলে আপনি বাইরে থেকে ওই বাজারের ছাই ভস্ম আনাবেন কাউকে দিয়ে আর তারপর গত সপ্তাহের মত পেটের ব্যথায় কোঁকাবেন। আপনি কিন্তু আপনার শরীরের একদম খেয়াল রাখছেন না বড় কর্তা।

প্রদোষ : ঠিক বলেছ শম্ভু।

শম্ভু : ভিতরে ঢুকতে পাচ্ছিলাম না আমি। কী ভিড় বাব্বা ! পুরো আদালত নারায়ণ

সেনাতে ছয়লাপ হয়ে গেছে, সব বিচার শুনতে এসেছে। আজ ওরা জব্দ হবে, তাই না বড় কর্তা? মাংসের দোকানে লোকেরা বলাবলি করছিল 'আমাদের কপাল ভাল, এখনও দেশে আইন কানুন কিছুটা আছে। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীকে এভাবে পেটানো! পুরো মহল্লা জানে নারায়ণ সেনার অর্ধেক লোক জেল খাটা কয়েদি। আদালত আর বিচারকরা না থাকলে ওরা তো গির্জা আর মসজিদগুলো এতদিনে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলত। সোনার আঙটিগুলো হাতাবার জন্য ওরা এই কাজ করেছে। ওদের একজন, বিক্রম বিয়ে করতে যাচ্ছে এমন একটা মেয়েকে যে ছ'মাস আগেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরত। লাট্টুতো সেই কত বছর আগে কারগিলের যুদ্ধে গলায় গুলির চোট নিয়ে ফিরে এসেছিল। ওর মত গরীব, খেটে খাওয়া লোকটাকে ধরে পিটিয়েছে ওরা। ও-তো তখন রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছিল, সবাই দেখেছে সেটা। ওরা এখন খোলাখুলি করে এসব। পুরো মহল্লায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে ওরা। আর কেউ যদি কিছু বলে ওরা রাতের অন্ধকারে এসে এমন প্যাদানি দেয় যে বেচারা মুখ থুবড়ে পড়ে, আর উঠে দাঁড়াতে পারে না।

প্রদোষ : ঠিক আছে শম্ভু এবার তুই বাড়ি যা।

শম্ভু : আমি মাংসের দোকানে বলেছি ' বড় কর্তা ওদের টুটি চেপে ধরবেন।' ঠিক বলেছি কিনা বড়কর্তা? ভালো লোকেরা তো সব আপনার পক্ষেই, তাই না বড় কর্তা? আপনি শুধু খাবারটা তাড়াতাড়ি গিলবেন না, ওটা আপনার সহ্য হবেনা আর ওটা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে একবারেই ভাল নয়। আমি আর দাঁড়াব না এখন, বড় কর্তা, আমি চলি। আপনাকে তো এখন আদালতে যেতে হবে, একদম উত্তেজিত হবেন না। আপনি না হয় এখনই খেয়ে নিন। কয়েক মিনিটইতো লাগবে খেতে, তাতে কোন ফাঁরাক পড়বে না। কিন্তু উত্তেজনায় পেট গরম হয়ে গেলে খেতে পারবেন না আপনি। নিজের খেয়াল রাখবেন বড় কর্তা। আপনার স্বাস্থ্যই আপনার সবচাইতে বড় সম্পদ। আমি এবার চলি। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি আদালতে যাবার জন্য আপনি উস্‌খুস করছেন, তাই না? আমাকে এবার মুদির দোকানে ছুটতে হবে। (শম্ভু বেরিয়ে যায়। ২ নং বিচারক অভিষেক চ্যাটার্জি বেশ বয়স্ক, প্রদোষ অধিকারির বন্ধুও। উনি ঢোকেন।)

অভিষেক : কি ব্যাপার?

প্রদোষ : আপনার হাতে একটু সময় থাকলে একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতাম দাদা। আজ দুপুরে একটা ভয়ঙ্কর কেস হ্যান্ডল করতে হবে আমাকে।

অভিষেক : (বসে পড়েন) জানি, নারায়ণ সেনার ব্যাপার।

প্রদোষ : (হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন) কে বলল আপনাকে?

অভিষেক : ওটা নিয়ে কথা হচ্ছিল কাল বিকেলে। বেশ ঝামেলার কেস।

(প্রদোষ কামরায় পদচারণা করতে থাকেন)

প্রদোষ : কী বলছিল ওরা?

অভিষেক : কেউ আপনাকে হিংসে করছে না এই কেসটা পাবার জন্য। কী করতে যাচ্ছেন আপনি?

প্রদোষ : (মাথা ঝাঁকান) জানি না। তাছাড়া আমি জানতাম না যে কেসটা সম্পর্কে এত লোক জেনে গেছে।

অভিষেক: (অবাক হয়ে) তাই নাকি?

প্রদোষ : ওরা বলছে এই পার্টনার কৃপানাথ লোকটা খুব বিপজ্জনক টাইপের মানুষ ।

অভিষেক: সত্যিই তাই। কিন্তু সুব্রত কুন্ডুও কোন ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

প্রদোষ : ওর সম্পর্কে কী বলছে সবাই?

অভিষেক: অনেক কিছু। ওর অনেক খুঁটির জোর আছে। (সাময়িক স্তব্ধতা)

প্রদোষ : উঁচু মহলে গুটি নাড়াবার ক্ষমতা?

অভিষেক: একদম। (আবার স্তব্ধতা)

(সতর্কভাবে) আচ্ছা মুসলমান লোকটাকে যদি এই কেসে বাইরে করে দেওয়া যায় ও আর জনার্দন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরকে রেহা করে দাও এই যুক্তিতে যে ওদের ওই দিনমজুরটা উস্কে দিয়েছিল আর ও তারপর ছুটে গিয়েছিল দোকানের ভেতর, তবে নারায়ণ সেনা সন্তুষ্ট হবে না? এটাতো বোঝাই যাচ্ছে যে রশিদ হাসান নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তুলবে না।

প্রদোষ : (বিচলিত) আপনি রশিদের পার্টনারকে ভুলে যাচ্ছেন। ও নারায়ণ সেনার কাছে যাবে চুরি করা জিনিষগুলো উদ্ধার করতে আর তারপর নারায়ণ সেনার হর্তাকর্তা ব্যক্তিরা আসবে আমার টুঁটি চেপে ধরতে।

অভিষেক: (যুক্তিটা ভালভাবে চিন্তা করেন, তারপর অবাক হয়ে) কিন্তু আপনি যদি মুসলমান লোকটাকে ছেড়ে দেন সুব্রত কুন্ডু নির্ঘাত আপনার ঘাড় ভাঙবে। আপনি হয়ত জানেন না ওর ব্যাঙ্কের খাতায় কী আছে। ও মুসলমানটাকে আঁকড়ে আছে যেমন ভেসে যাওয়া লোক খড়কুটো আঁকড়ে ধরে ঠিক তেমনি।

প্রদোষ : (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) ব্যাঙ্কের খাতা? (দরজায় আওয়াজ)

অভিষেক: এস

সুনীল : স্যার আমি বুঝতে পাচ্ছিনা কিভাবে আমি সিনিয়র প্রসিকিউটর আর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্রেসিডেন্টের জন্য সিট আগলে রাখব। আপনারা যদি বলে দেন কী করব আমি।

অভিষেক : (প্রদোষ নির্বাক থাকায়) দুটো সিট খালি রাখ আর আমাদের এখানে বিরক্ত করতে এসো না। (সুনীল বেরিয়ে যায়)

প্রদোষ : এটাই বাকী ছিল।

অভিষেক: সুব্রত কুন্ডু কোন অবস্থায়ই রশিদকে ছেঁটে ফেলবেনা ওর সর্বনাশ হতে দেবে না। ওর প্রয়োজন আছে রশিদকে।

প্রদোষ : (ক্ষুন্নভাবে) দুধেল গাইয়ের মত।

অভিষেক: আমি কিন্তু সেরকম কথা বলিনি প্রদোষ। কী করে ভাবলে আমি ওকম কথা বলব? আমি স্পষ্ট করে আবার বলছি সুব্রত কুন্ডুর বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলিনি। আই এ্যাম সরি যে এটা তোমাকে বার বার বলতে হচ্ছে আমাকে।

প্রদোষ : (উত্তেজিত হয়ে) কিন্তু আপনি ওভাবে নেবেন না কথাটা দাদা। আমাদের সম্পর্কটা ভুলে যাবেন না।

অভিষেক : সম্পর্ক বলতে কী বোঝাতে চাইছ তুমি? আমি তোমার কেসে মাথা গলাতে পারিনা। তুমি আইন মন্ত্রীর গুড বুক্সে থাকতে চাও কিংবা নারায়ণ সেনার সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। সত্যিত্য বলতে কী যে দিনকাল পড়েছে এখন তাতে নিজের চরকায় তেল দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রদোষ : আমি সেটাই করতে চাইছি, শুধু জানিনা কীভাবে সেটা করতে হয়।
(দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে কোলাহলের শব্দ শোনেন)

অভিষেক: একটা জঘন্য পেশায় ঢুকে পড়েছি আমরা।

প্রদোষ : ঈশ্বর জানেন আমি যে কোন কাজ করতে রাজি আছি। আমাকে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন দাদা। আপনি পুরোপুরি পাল্টে গেছেন। ওরা যেটা চায় তাইতো করতে হয় আমাকে, কিন্তু এটুকুতো আমাকে জানতে হবে ওরা কী চায়। যখন সেটা আমি জানিনা তখন ন্যায় বলে আর কিছু থাকে না।

অভিষেক: তোমার জায়গায় আমি হলে প্রদোষ আমি চেঁচাতাম না যে ' ন্যায় বলে আর কিছু রইল না।'

প্রদোষ : আবার আমি কী বললাম? আরে আমিও তো ওটা বলতে চাইনি, আমি শুধু বলতে চেয়েছি... এরকম কনট্রাডিকশন থাকলে ...

অভিষেক : আমরা তো আমাদের নিজেদের একটা ভ্রাতৃগোষ্ঠির মধ্যেই থাকি নাকি?

প্রদোষ : নিশ্চয়ই, আমি কখনোই অন্যরকম কিছু বলিনি। আমার প্রত্যেকটা কথাকে ওভাবে ওজন করে দেখতে যাবেন না আপনি, প্লিজ।

অভিষেক: কেন করব না? আমি তো বিচারক।

প্রদোষ : (ঘর্মাক্ত হয়ে) দেখুন দাদা প্রত্যেক বিচারকের প্রতিটি কথা যদি কেউ নিক্তি দিয়ে তুলে ... আমি পুরো কেসটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, নৈতিক মানদণ্ড বজায় রেখে বিচার করতে প্রস্তুত কিন্তু আমাকে জানান উচিৎ কোন রায়টা উপর মহলের কর্তাব্যক্তিদের স্বপক্ষে যাবে। আমি যদি ওই মুসলমান লোকটাকে দোকানে

থাকতে দিই, স্বাভাবিকভাবেই বাড়ির মালিক অসন্তুষ্ট হবে ... না না, মালিক নয়, আমি বলতে চাইছি রশিদ হাসানের পার্টনার ... ওহ্ কীরকম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর যদি ওই দিনমজুরটা ওদের খেপিয়ে দিয়ে গোলমাল বাঁধিয়ে থাকে ... তবে বাড়ির মালিক - কী নাম যেন ওর? সুব্রত কুন্ডু ...না না আমাকে ওরা নাগাল্যাণ্ড মিজোরামে বদলি করতে পারেনা। আমার গলব্লাডারের অপারেশন হয়েছে কিছুদিন আগে আর নারায়ণ সেনার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। দাদা আমার তো একটা পরিবার আছে। গিন্নি তো বলেই খালাস আমি শুধু খুঁজে বের করব সত্যি কী ঘটনা ঘটেছিল সেদিন নইলে হাসপাতালে গিয়ে জ্ঞান ফিরবে আমার। আমি কি আক্রমণের কথা বলব? নাকি উস্কানি দেবার কথা বলব? ওরা কী চায় আমার কাছ থেকে? এটাই তো স্বাভাবিক যে নারায়ণ সেনার বিরুদ্ধে রায় দেব না আমি, রায় দেব এক হয় ওই মুসলমানটার বিরুদ্ধে নয়তো বেরোজগার দিন মজুরটার বিরুদ্ধে। কিন্তু ওদের মধ্যে কে? কী করে মজুর আর মুসলমানের মধ্যে কাকে দোষী সাব্যস্ত করব সেটা ঠিক করব আমি? পার্টনার আর বাড়ির মালিকের মধ্যেই বা কাকে ফাঁসাব আমি? সে যাই হোক আমি নাগাল্যান্ড মিজোরাম যাব না দাদা, কিছুতেই না। তার থেকে বরঞ্চ জেলে যাব আমি। আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না দাদা- আমি আসামী নই। আমি যেকোন কাজ করতে রাজি আছি।

অভিষেক : শুধু চাইলেই সব হয় না ভাই (উনি দাঁড়িয়ে পড়েন)

প্রদোষ : তাহলে কে ঠিক করবে কে দোষী আর কে দোষী নয়?

অভিষেক: বিচারকের অন্তরাত্মাই সেটা তাকে বলে দেয় প্রদোষ। মনে রেখ কথাটা। বিদায়।

প্রদোষ : একদম ঠিক কথা বলেছেন। জ্ঞান আর অন্তরাত্মা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোনটাকে নেব। আপনি কী বলেন দাদা?

(অভিষেক ততক্ষণে বেরিয়ে গেছেন। প্রদোষ দাঁড়িয়ে ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। টেলিফোন বেজে ওঠে। উনি টেলিফোন তুলে নেন।

হ্যাঁ তৃপ্তি। কী বললে ওরা আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে আসতে পারবেনা? কে জানাল তোমাকে? এটর্নি শুভঙ্কর সেন? কে বলল ওকে? আমি কী বলতে চাইছি? এখন আমি কথা বলতে পারব না, আমাকে এক্ষুণি আদালতে গিয়ে একটা কেসে রায় শোনাতে হবে।

(ফোন রেখে দেন। সুনীল ভেতরে আসে। জনতার কোলাহল কানে আসে আরেকবার)

সুনীল : গোবর্ধন, বিক্রম আর বিশ্বম্ভরের কেসে শুনানি শুরু হবে স্যার।

প্রদোষ : (কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়ে) আসছি।

সুনীল : প্রেস টেবিলে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্রেসিডেন্টকে জায়গা করে দিয়েছি। উনি খুব খুশি হয়েছেন কিন্তু সিনিয়র প্রসিকিউটর বিচারকের টেবিলে বসতে রাজি হননি কেননা তাহলে আপনার ডাকে উঠে কেসের বিচার করতে হবে, স্যার। (নিজের অজান্তেই অসংলগ্নভাবে হেসে ওঠে সুনীল।)

প্রদোষ : কোন অবস্থাতেই আমি তা করব না।

সুনীল : দরজাটা ওদিকে স্যার। যে ব্রিফকেসে আপনার কেসের কাগজপত্র রাখা আছে সেটা কোথায় রেখেছেন আপনি?

প্রদোষ : (হতবাক হয়ে) হ্যাঁ ওটাই আমার চাই। ওটা না পেলে আমি জানতেই পারব না কে আসামী, ঠিক বলেছি? তা সিনিয়র প্রসিকিউটরকে কোথায় বসাব আমরা?

সুনীল : এই নিন আপনার ব্রিফকেস, স্যার। (বিচারকের হাতে ধরিয়ে দেয় ব্রিফকেসটা। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিচারক প্রদোষ অধিকারি অন্যমনস্কভাবে আদালতে প্রবেশ করেন।)

লেখক : **নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, দিল্লীর বিশিষ্ট নাটককার।**
Playwright : **Nalinaksha Bhattacharjee, distinguished playwright, Delhi.**

একক নাটক

প্রসন্ন- প্রহর অন্তে

■ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

রণজয় সান্যাল

নাটক সম্পর্কিত ঘোষণার পর পর্দা খোলে। আলো-আঁধারী মঞ্চ, বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যায়- মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। মঞ্চে একটি সোফা, একটা কোণে একটা চেয়ার টেবিল। টেবিলের উপর জলের বোতল, একটা কফি মগ, ফ্লাস্ক এবং মোবাইল। একক চরিত্রাভিনেতা রণজয় সান্যাল সোফায় বসে শুনছে দেবব্রত বিশ্বাস গীত রবীন্দ্র সংগীত -" শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায় ... " গানটি ধীরে ধীরে ফেড হয়। রণজয় ওই গানটিই আবৃত্তি করতে করতে জানলার দিকে যায় তারপর সেখান থেকে ফিরে দর্শকের মুখোমুখি হয়-

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়
সাথী হারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্য ছায়াতলে।। (হঠাৎ থেমে যায়)

শ্রাবণের এই অঝোর ধারা ঘরবন্দী মানুষের মনে অনেক রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, আসলে ---- (টেবিলের উপরে রাখা মোবাইল বাজে)

হ্যালো ইয়েস রণজয় সান্যাল স্পিকিং- প্লিজ প্লিজ, আই অ্যাম বিজি নাউ। প্লিজ মিট মি ইন মাই অফিস টুমরো ওকে- ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ, ইয়েস টুমরো- এনি টাইম - ওকে। (ফোন রাখে) উফ, রাত বিরেতেও শান্তি নেই। মানুষের তো নিজেকে নিয়েও থাকার একটা সময় থাকবে, এরা সেটাও বোঝেনা।

যেটা বলছিলাম, আসলে পৃথিবীতে চূড়ান্ত ক্ষণস্থায়ী জিনিষ হলো , বর্তমান, যা ক্ষণে ক্ষণে অতীত হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে আমার অতীত, যাকে বলে ফ্রেম টু ফ্রেম, ইভন তার খুঁটিনাটি পর্যন্ত ফুটে উঠছে।

ইয়েস, যেটা বলা হয়নি, আমি রণজয় সান্যাল। মূলতঃ অ্যাড ফিল্ম মানে বিজ্ঞাপন ভিডিও বানাই। অবশ্য গত পাঁচ বছরে গোটা চারেক শর্ট ফিল্মও বানিয়েছি- বেশ প্রশংসাও পেয়েছি। একটু আধটু নাম-টামও হয়েছে। মুম্বাই শহরে এই ন'তলার ফ্ল্যাটই আমার মাথা গোঁজার জায়গা। ১৮০০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট, তিনটে ঘর- একসময় বেশ সাজানো গোছানো ছিল। এখন কিছু নেই, সব, সব দূর করে দিয়েছি। একটা বেডরুম, এই ড্রইংরুম, কিচেন আর ওয়াশরুম ছাড়া সব ঘর তালা দিয়ে রেখেছি। জীবনের সব স্মৃতি চিহ্নগুলো স্তুপীকৃত হয়ে রয়েছে তালা দেওয়া ঘরগুলোতে। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকি, এই এই ড্রইং রুমটাই আমার প্রিয় জায়গা আর ততোধিক প্রিয় সোফাটা। (সোফায় বসে)

উত্তর কলকাতার সিকদার বাগানের পিকলু, এই মুম্বাই শহরে ফিল্মমেকার 'রণো'। একটা দীর্ঘ জার্নি ঠিকই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় আমার কোন শেকড় নেই- আমি শেকড় ছেঁড়া। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সস্টিটিউট থেকে যখন পাশ করে বেরুলাম, চোখে তখন কত স্বপ্ন, একটু একটু করে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। আমার দুনিয়াটা আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগলো। বছর তিন চার পর আচমকাই জেনিথ এন্ড মরিসন কোম্পানির একটু বিগবাজেটে অ্যাডভাইজিং ফিল্ম বানাবার অফার পেয়ে চলে এলাম এই শহরে। সাফল্য, আরও সাফল্য পেতে পেতে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম সিকদার বাগানের সব স্মৃতিগুলো কেমন যেন আবছা হয়ে আসছিল। বাবা মা সেই সিকদার বাগানেই- দিদির বিয়ে হয়েছিল ঠিক পাশের বাড়ির তন্ময়দার সঙ্গে। ফলে বাবা মার প্রতিদিনকার জীবনের দেখা শোনা দিদি আর তন্ময়দাই করত। আর আমার দায়িত্ব বলতে ছিল মাসের প্রথমে এই মোবাইল থেকে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করা। দিনে দিনে রণজয় সান্যালের পায়ের তলার মাটি যেভাবে শক্ত হচ্ছিল মুম্বাই শহরে তাতে এর বেশি কিছু করা সম্ভবই হতো না। তবে হ্যাঁ, বছরে একবার অন্তত দিন কয়েকের জন্য বাবা মার মুখোমুখি হতাম- (একটু চুপ করে থেকে) - এখন বুঝি, সেই মুখোমুখি হবার মধ্যে কোথাও যেন একটু যান্ত্রিকতা ছিল। আসলে কাজের নেশা ধীরে ধীরে আমার শিকড়টাকে ছিঁড়ে দিচ্ছিল। নিজের মানুষগুলোর সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। তাদের চোখে আমি অচেনা হয়ে যাচ্ছিলাম।

(সোফা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টিকে ছুঁতে চায়। আবার দর্শকের মুখোমুখি)

একটা সত্যি কথা কি জানেন- এই শহর আমায় দিয়েছে অনেক কিছু। আবার অনেক কিছুকেই গিলেও খেয়েছে।

প্রায় প্রতি রাত্তিরেই বসি নিজের মুখোমুখি। ওই ওই যে নাইট ল্যাম্পটা, ও নিঃশব্দে একবার আমার দিকে একবার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন যেন ফিসফিস করে বলে— হেরে গেলে? আমি সতর্ক হই, কেন, কেন এমন বলছো। এখানে জেতা হারার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? জীবনটা তো একটা লড়াই, আমরা গালভরা শব্দে বলি 'জানি'- আসলে তো দীর্ঘ লড়াই। সেখানে ঝড় ঝাপটা সামলেই তো এগুতে হবে। আমার জামাইবাবু তন্ময়দা আবৃত্তি করতো-

যদি কখনো সত্যের মাঝে ভীরুতা আশ্রয় নেয়
তবে তোর আলতাহীন চপ্পলহীন
পা দু'টো ছুঁড়ে মারিস
তোর হৃদয়ে আমি বসন্তের চলকানো দিন আনবই।

কবিতাটা মনে পড়লেই বুকে একটা অন্য জোর ফিরে পাই। সমস্ত দেহের ভার বিছানার ওপর ছেড়ে দিয়ে তলিয়ে যাই ঘুমের অতলে। কত প্রশান্তির সে ঘুম। রণজয় সান্যাল জানতো না তার কাজের দুনিয়ায় এক প্রবাসী বাঙালী নারী ফিল্ম জার্নালিস্ট মনামী

গুহ কীভাবে যেন তার অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।সেই অনুরাগের ছোঁয়ায় রণজয় একদিন সংসারী হলো। এই ১৮০০ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট, তার সাজসজ্জা সব সব মানসীর ভাবনা প্রসূত। সাংসারিক জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দের পথটা দিনকে দিন উছলে পড়েছিল। ভালোবাসার বীণায় মাত্র দুটি তার,তাতেই সপ্তসুরের ঝঙ্কার। কাজের মাঝে মাঝেই দুজনে চলে যেতাম ওয়ান ডে আউটিং -এ। শহর থেকে অনেকটা দূরে একটা নদীর ধার আমাদের দুজনেরই খুব প্রিয় জায়গা ছিল।

একটা ঘটনা বলি, শরৎকালের এক অকাল বৃষ্টির দিনে লং ড্রাইভে আমরা গেলাম সেখানে। অঝোরে বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে পড়ছে চারপাশের গাছপালায়, নদীর বুকের পরে কাশ ফুলের বনে, - সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কোথাও ঘন হয়, কোথাও হাওয়ার তোড়ে ঢেউ তুলে দিয়ে বৃষ্টির ধারা চলতেই থাকলো। অদ্ভুত এক তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করে দেখি, মনামী দূরে নদীর দিকে তাকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে এক চমৎকার রামধনু। দেখা যাচ্ছে নদীর ওপর বাঁকানো ধনুকের মতো। আমি বললাম -তোমার মনে আছে ওই ওইখানে কুল আর বাবলা গাছের ডালে কত পাখির বাসা ছিল? মনামী মিষ্টি হাসলো। সেদিনও দেখলাম কুল গাছে একটা পাখির বাসায় দুটো ডিম। আমি হাত দিয়ে ডিম দুটো তুলে নিয়ে বললাম- মন, খেয়ে দেখলে হয় না কেমন খেতে। মনামী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল- না, না, একি করছো! আহারে, তুমি ডিম দুটো যেমন ছিল তেমনি রেখে দাও। মা পাখিটা এসে যেন দেখতে পায়। মনামির সেই মমতাবোধ আমায় সেদিন মুগ্ধ করেছিলো। সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়লে বড়ো বিস্ময় জাগে। সেই সংবেদনশীল মনামীও ....। (একটা আড় বাঁশির সুর ঢোকে)।

আমাদের বিয়ের আগের বছরই মা চলে গেছিলেন। তারপর থেকেই দিদির মুখে শুনেছি বাবার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল। বস্তুবাদী মানুষটার মনে কোথাও যেন অবসাদ বিস্তার করেছিল। বেশ কয়েকবার বাবার মুখোমুখি হলেও কোনদিন এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করিনি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে কোনও মানুষেরই ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যক্তিগত পরিসরে তাকে তার মতো করেই বাঁচতে দেওয়া উচিত। এ ধরনের অনেক ঔচিত্যবোধ সযত্নে আমার মধ্যে লালিত হতো।

কিন্তু আমার সেই ঔচিত্যবোধও একসময় বিরাট ধাক্কা খেলো- (একটা দীর্ঘশ্বাস) - যাকগে, যাক্ সে কথা পরে হবে।

তো, মা চলে যাওয়ার বছর সাতেক বাদে এক ভোরে দিদির ফোন। বাবা কোমায় চলে গেছে, তাড়াতাড়ি আয়। দিদির গলা শুনেই বুঝলাম অন্তিম সংবাদটা দিদি আসলে কোমা শব্দ দিয়ে আড়াল করল। আমাদের সন্তান রিভু তখন দেড় বছরের। আমার তখন মনের যা অবস্থা, তাতে খুব বেশি কথাবার্তা চালাতে ভালো লাগছিল না। ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অপরাধবোধ কাজ করছিলো। সামান্য দু-চারটে কথাতেই বুঝলাম মনামী কলকাতা যেতে চাইছে না। কেন'র উত্তর জানা বা খোঁজার অবস্থায় ছিলাম না। জামা-কাপড়

গোছানো, প্লেনের টিকিট বুক করা অনেকটা সময় গেল। এরই মধ্যে মনামীর এক কলিগ, আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু রাঘবন, পি. রাঘবন ফোন করল- রণো , ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব মনামী অর প্রেসারাইজ হার। রাইট নাউ শি ইজ নট ইন এ পজিশন টু লিভ মুম্বাই। শি হ্যাজ বিন অ্যাসাইন্ড উইথ এ স্পেশাল জব।

হুঁঃ , স্পেশাল জব ! সেই অবস্থাতেও হাসি পেল।

আমি অল্প কথাতেই রাঘবনকে আশ্বস্ত করলাম, না, আমি কোনমতেই মনামীকে ডিসটার্ব করব না। কেন জানি না হঠাৎ সেই মুহূর্তে , পচা পাঁকে যেমন হঠাৎ বুদবুদ ভেসে ওঠে তেমন করেই আমার মনের মধ্যে 'ফল্গুধারা' শব্দটা জেগে উঠল। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম- কেন এমন হলো।

(সোফায় বসে কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতে মাথার চুলগুলোকে খামচে ধরে। নিজেকে যেন কিছুটা ধাতস্থ করতে চায়। একটা হালকা আবহ ভাসে।)

যা ভেবেছিলাম তাই। বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, হাসপাতাল থেকে ডেডবডি বাড়িতে চলে এসেছে।

আমার সামনে কটিবস্ত্র পরিহিত যে মানুষটি শবাসনে শুয়ে আছে তাকে আপাত দৃষ্টিতে দীনহীন দরিদ্র মনে হলেও সে নিরীহ, শান্ত, ভদ্র, সভ্য। বাইরের জগতের কাছে সে অপরিচিত হলেও আমার কাছে সে মহাত্মা। কেননা, মানুষটা ভুঁইফোড় কিংবা দু, চারদিনের চুলে জটা ধরা যোগী নয়। তার পেছনে একটা লম্বা ইতিহাস আছে। দীর্ঘদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষটা নানা মানুষজনের , তথাকথিত বড় মাপের মানুষজনদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে, এতদিনে বুঝে ফেলেছে, সমাজে যাঁদের খুব বড় মাপের মানুষ বলে ভাবা হয় তারা সব সময়ই বড় মাপের কাজ করেন না। কোন কোন মুহূর্তে হয়তো একটা বড় কাজ করে ফেলেন। আর বাকি সময়টা তাঁরা পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো ষড় রিপুর তাড়নায় জর্জরিত থাকেন। এই মানুষটি জানতেন, এ কালের দ্রোণাচার্যরা তাদের মতো একলব্যদের অনন্ত কাল না হলেও বেশ কিছুকাল এইভাবেই শোষণ করবে এবং সেটা তাদের মেনে নিতে হবে এবং অন্যেরা যাতে মেনে নিতে পারে সে বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশও একলব্যদেরই তৈরি করতে হবে, (একটু থেমে)- বাবাও আর রইলেন না।

বাবার কাজ মিটে যাবার পরের দিনই ফিরে এলাম। সিকদার বাগানের বাড়িতে কিন্তু আমার দমবন্ধ হয়ে আসেনি, আমি ঠিকই ছিলাম- কিন্তু, প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমার কেরিয়ার নিয়ে হিমালয় সদৃশ্য উচ্চাশার কারণেই তো এই শহর, আমার পরমাত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। সেই যন্ত্রণাটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বার বার মনে হচ্ছিল এটাই তো আমার জন্মস্থান, এখানেই একটা সংসারের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকলেই তো ভালো হতো। তাহলে তো আজ এতো --------।

আসার আগে দিদি এসে দাঁড়ালো। থমথমে চোখ মুখ। আমার বুকে একটা হাত রেখে বলল- পিকলু, সময় করে একবার গয়ায় যাস, দুজনের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করে আসিস। আমি মাথা নেড়ে চলে এলাম।

রণজয় সান্যাল আবার ডুবে গেল কাজের মধ্যে । কিন্তু তার মনের গভীরে একটা সুক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরা পড়ছিল একটা ছবি। রিভুকে মাঝখানে রেখে আর মনামীকে জড়িয়ে ছিল একটা দীর্ঘ লতানো গাছ- যার নাম ভালোবাসা। সেই লতাটার একটা একটা করে পাতা যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। গত ছ আট মাস মুম্বাই- এর যাবতীয় ফিল্ম ম্যাগাজিনে মনামীর কোনও লেখা ছাপা হয়নি, কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত মনামীর ল্যাপটপ খোলা থাকত। অদ্ভূত এক উদাসীনতা ধীরে ধীরে ঘিরে ধরেছিল মনামীকে । (নীরবতা)

গয়ায় আমি গেছিলাম। দিদি বলেছিল বলে নয়, নিজের ইচ্ছেতেই, বাবার মৃত্যুর প্রায় একবছর পর। আসলে, একটা শর্ট ফিল্ম বানাতে বানাতেই ভাবনাটা মাথায় এসেছিল। একটা গ্রামীণ জীবনের গল্প। একটি মা মরা মেয়ে সৎমার সংসারে বহু অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য মাথায় করেই বড়ো হচ্ছিল। প্রত্যেক দিন দুপুরে সে যা খেতো তার থেকে অল্প কিছু সরিয়ে একটা মাটির ভাঁড়ে লুকিয়ে রাখত। সূর্যাস্তের ঠিক আগে সেই মাটির ভাঁড়টা নামিয়ে রেখে আসত বাড়ির পিছন দিকের একটা পুকুর ধারে। কুকুর বেড়ালেই হয়ত ভাঁড় খালি করে দিত। কিন্তু মেয়েটির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আঁধার নামলেই মায়ের ক্ষুধার্ত আত্মা আসে। এভাবেই সবার অজান্তে বিষয়টা চলছিল। কিন্তু গ্রামের মোড়ল সেই পুকুর বুজিয়ে তৈরি করতে শুরু করল ইট ভাটা-এরপর মেয়েটির যন্ত্রণা এবং আরো অনেক বিষয়- এই সব নিয়েই ফিল্মটা। তখনি মনে হয়েছিলো -------।

তো সেই গয়ায় এসে পৌঁছালাম। গয়ার পাণ্ডাটি বেশ কড়া প্রকৃতির মানুষ। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল- আপকা পিতা মাতা চাওল খাতে থে ইয়া চাপাটি?

আমি বললাম : চাপাটি কিউ, চাওল, চাওল খাতে থে।

আবার প্রশ্ন : আপ ব্রাহ্মণ হ্যায় ?

আমি মাথা নেড়ে বললাম : হ্যাঁ

আব তুম ইয়ে মিট্টিকা কটোরিমে চাওল বানাও।

আমি বেশ কড়া গলায় বললাম : চাওল পাকানা নেহি আতা হ্যায়। যো করনা হ্যায় আপ হি কিজিয়ে। পয়সা মিল জায়েগা।

সে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজেই কটোরিতে জল চাল দিয়ে আগুন ধরালো। আমি গিয়ে বসলাম একটা গাছের ছায়ায়।

কেন জানিনা প্রথম থেকেই সেখানকার পরিবেশটা আমার মনে ধরেনি। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম- বোঝা মুস্কিল কতজন পিণ্ডদান করতে এসেছে আর কতজন ভিখারি। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে, কয়েকটা বুড়োবুড়িও এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ভাতের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এই তো আমাদের দেশ। চারপাশ থেকে অদ্ভূত একটা গন্ধ এসে নাক থেকে বুক হয়ে যেন পেটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে মুক্তি পাব কে জানে।

পাণ্ডা নিজেই চাল সিদ্ধ করে কয়েকটা দলা পাকিয়ে রাখল। দলাগুলোর উপর কালো রঙের কী একটা ছিটিয়ে দিল। তারপর সেই গম্ভীর স্বরেই বলল- পহেলে আপনা

পিতা আউর মাতাকো নাম লেলো, মতলব উনলোগোকি আত্মাকো বুলাও। আমার শরীরে হঠাৎ কেমন একটা গা ছমছম করা অনুভূতি হলো। পাণ্ডা বলে চলেছে--

অব এক এক করকে উঠাও আউর হামারা সাথ মন্ত্রপাঠ করো।

একটা দলা তুলে নিয়ে দুহাতের তালু জোরা করে ধরলাম-

আব বোলো গয়া য়াম

আমি বললাম গয়া য়াম

গয়া শিরে দিয়ত্রে, গয়া শিরে দিয়ত্রে, কোলাহল পর্বতে উপদিষ্টতে, মগধ দেশে অন্ধতামো নিবারণার্থম, প্রেতনাম দীপম, প্রেতনাম দীপম, মুখাবাসনার্থম অহম দিয়ত্রে, মুখাবাসনার্থম অহম দিয়ত্রে , তাম্বুলম, তাম্বুলম, অহম, অহম

এক এক করে সব দলা হাতে নিয়ে সেই একই মন্ত্রপাঠ। শেষ দলাটা নিয়ে মন্ত্রপাঠ করে গেলাম ফল্গুর জলে পিণ্ড ভাসিয়ে দিতে। হঠাৎ পা টা একটা পাথরে লেগে হোঁচট খেলাম। পিণ্ডের দলাটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে সেই ফল্গুর জলেই পড়ল। কেমন যেন মনে হলো বাবা আর মা-র আত্মা তৃপ্ত হলো তো? কেন এমন হলো? (নীরবতা)

(হতাশার হাসি হেসে) পরে জেনেছিলাম, ঠিক ওই সময়েই রিভু আর মনামীকে নিয়ে রাঘবনের ফ্লাইট টেক অফ্ করেছিল মুম্বাই এয়ারপোর্ট ছেড়ে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের একটি দেশের উদ্দেশ্যে। পার্মানেন্টলি, হ্যাঁ, একেবারের জন্য।

এই, এই সোফার উপরেই পড়ে ছিল মনামীর সই করা দু'সেট ডিভোর্স ফর্ম আর ছোট্ট একটা চিরকুট- মনামীর হাতের লেখা 'হারিয়ে গেলাম', মনে রেখো না, ছেলে বড় হলে তার ইচ্ছাকেই মর্যাদা দেব'।

আমার ধারণা ছিল, বরং বলা ভালো আমার বিশ্বাস ছিল আমার আর মনামীর সম্পর্কটা শুধু দাম্পত্যের নয়। সামথিং মোর দ্যান এনি রিলেশান। একটা বিশ্বাসের সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। (নীরবতা)

কবি শঙ্খ ঘোষের সেই উচ্চারণ বার বার মনে পড়ে- তুমি যে নেই আজ সেটাই স্বাভাবিক/ তুমি যে ছিলে সেটা অভাবনীয়।

আমি এখন একা, ভীষণ রকমই একা, নির্মমভাবে একা। আমার জীবনে কোনও অবিন্যস্ততাকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিইনি- তবু আমি একা। একা, একা।

(ধীর পায়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।। মঞ্চে খুব নরম আলো। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে শোনা যায়- " এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে" গানটি।

যন্ত্রানুসঙ্গ বাদ দিয়ে গানটি হলে ভালো হয়

অথবা

আমার যে দিন গেছে চলে)

আবার, আবার সেই রবিঠাকুরের গানটিই মনে আসে।

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়

সাথিহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূর কালের অরণ্য ছায়া তলে।

ওই যে বলেছিলাম না, বার বার, আমার মনে হয় আমি শিকড় ছেঁড়া, তা একদিন হঠাৎ মনে হলো আমার শিকড় তো শুধু সিকদার বাগানেই নয়- কুসুমপুর, কুসুমপুর তো আছে। মানে মূল ব্যাপারটা বলি- বর্ধমান জেলার একটা প্রত্যন্ত গ্রাম কুসুমপুর- সেটাই তো বাবার এবং আমার দিদির জন্মস্থান। ছিল এক যৌথ পরিবারের গণ্ডি। কলকাতায় আসার ব্যাপারে আমার মায়ের মনের মধ্যে দুটো বিষয় কাজ করেছিল- প্রথমত: দিদিকে শহুরে সভ্যতা শহুরে শিক্ষায় বড়ো করে তোলা, আরেকটা ব্যাপার হলো তেরঙা ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে ইউনিয়ন আন্দোলনে পরিশ্রান্ত বাবার শরীরের প্রতি নিয়মিত যত্ন দেওয়া।যৌথ পরিবারে কোনও আপত্তির ঝড় ওঠেনি, কারণ সেটা তো সেই যাকে বলে পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসা তা নয়। একটা আপোস আলোচনার মধ্যে দিয়েই বাবা মা ও দিদির গ্রাম ছেড়ে শহরে পা রাখা। অবশ্যই বাবা একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সে কথায় পরে আসা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম- যাব কুসুমপুর। একটা লম্বা চিঠি লিখলাম জেঠিমাকে। তারপর ফোনে ফোনে অনেক কথা।

[আবহে কয়লার ইঞ্জিনে চলা ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়]

বাবা মা দিদির সঙ্গে বেশ কয়েকবার সেই গ্রামে গেছি। (একটু চিন্তা করে) শেষ যেবার সেই ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়ে গেছিলাম, তখন আমার বারো বছর বয়স।

তার মানে প্রায় তিরিশ বছর বাদে আবার গেলাম। রেল স্টেশন থেকে ভ্যানরিক্সায় চেপে বড় পুকুর ধার- সেটাই তো গ্রামে ঢোকার মুখ। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেই বড়পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ঘুরে ঘুরে চারপাশে চোখ বোলালাম- এতো আমার পিতৃভুমি, আমার তো জন্মভূমি নয়- ভাবনাটা মাথায় এলো ঠিকই, কিন্তু শরীরটার মধ্যে অদ্ভূত একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি , একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরুলো। আমি তো এখানে আগন্তুক নই, অনাহুত নই- উত্তরাধিকার সূত্রে এই মাটি, এই বাতাস, এই গাছগাছালির গন্ধ, পাখিদের কলকাকলি এ সবই তো আমারও। এই মাটি খুঁড়লে নিশ্চয় আমার শেকড়েরও সন্ধান মিলবে।

আর দাঁড়ানো নয় । শুরু হল হাঁটা। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, হাঁটার গতি ক্রমশ: কমে আসছিল। চোখ ঘুরছে চেনা কিছুর সন্ধানে, অথচ যা নজরে পড়ছে সবেতেই যেন অচেনার ছোঁয়া।

এই তো এখানে হারাণ কাকার দোচালা ছিল, কিন্তু এতো তিনতলা বাড়ি। বাড়ির বাইরে সেই ইট বাঁধানো বেদি সমেত নারকেল গাছটাও উধাও। কী করে যেন বাড়ির সামনে দিয়ে বাগদী পাড়ার দিকে যাবার সোজা রাস্তা বাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা এগুতেই নজরে এলো ডাক্তার জ্যাঠার সেই বিশাল বাড়িটা চুন পলেস্তারা খসে পড়ে

ইটগুলো কেমন যেন হাঁ করে চেয়ে আছে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে বটগাছের ছড়িয়ে পড়া শিকড়গুলোই যেন গাঁথনিটাকে ধরে রেখেছে। ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল, দুর্গাপূজায় কীভাবে আমপাতা দেবদারু পাতা আর কলাগাছ দিয়ে সেজে উঠত বাড়িটা। সঙ্গে থাকত বড় বড় শোলার ফুল। আর কিছুটা এগুলেই গ্রামের প্রাচীন বটতলা। বটতলাটা আধুনিক টাইলস দিয়ে বাঁধানো। পাশেই চণ্ডিমণ্ডপটা ঠিক সেই আগের মতই আছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। এপাশ, ওপাশ দু-চারজন চলে গেল, তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে। আমার চোখ সরছে না চণ্ডিমণ্ডপ থেকে- কত স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে- এই চণ্ডিমণ্ডপেই তো প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার সময় যাত্রা হতো, কবিগান হতো। কাকার মুখটা মনে পড়ে গেল, দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলাম না। যাত্রার মূল উদ্যোগ তো ছিল কাকারই - কত সামাজিক পালা, ঐতিহাসিক পালা- কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা- মনে পড়ে গেল শেষ যেবার এসেছিলাম সেবারও কত মজা হয়েছিল কাকার সঙ্গে।

কেউ কেউ আসে পৃথিবীতে অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র হয়ে, হয়তো হারিয়ে যাবে বলেই এত বর্ণময়তা নিয়ে আসে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই দেখি ডাক্তার জ্যাঠার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন একজন - পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, গলায় মোটা একটা সোনার চেন- গায়ের রং কালো আর মাথার চুল গুলো ধবধবে সাদা।

হ্যাঁ, আমি তো চিনি এই মানুষটাকে - ডাক্তার জ্যাঠার ছেলে। একটু এগিয়ে গিয়ে আমি কিছুটা আমতা আমতা করেই বললাম- সোনাদা না? আমায় চিনতে পারছেন?

জবা ফুলের মতো লাল টকটকে চোখ দুটো দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জলদগম্ভীর গলায় বললেন— কে তুমি?

দাদা, আমি পিকলু, গোকুল সান্যালের নাতি আমি।

আচ্ছা, আচ্ছা, তার মানে তুমি অম্বরিশ কাকার ছেলে, তা এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন, কী ব্যাপার?

দাদা বহুকাল বাদে গ্রামে এলাম তো, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বহুকথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

কী বলব, সোনাদা যেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো। সত্যি কথা বলছি- আমার কিছুটা অস্বাভাবিক লাগলো।

হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন

বহুকাল পরে এলে, কিন্তু কেন এলে?

কোথায় যেন একটা হতাশার সুর। তবুও আমি বললাম

দাদা, আপনি তো কাটোয়ায় বাড়ি করে থাকবেন।

গলার স্বরটা অনেকটা নামিয়ে কেমন যেন স্বগোতক্তির মত বললেন-

হ্যাঁ থাকতাম, আর থাকি না। এখন শ্মশান আগলাচ্ছি। তা বাড়ির দিকে যাবে তো, যাও যাও---

বলতে বলতেই হাঁটা লাগালেন সোনাদা। কিন্তু আমি কেমন যেন স্থবির হয়ে গেলাম। সোনাদার কথাগুলোর মধ্যে যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে, শ্মশান আগলাচ্ছি- এ কথার মানে কি?

ডানদিকে ঘুরে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ সোনাদা পিকলু পিকলু বলে ডাকতে ডাকতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমি বললাম - হ্যাঁ দাদা, বলুন।

তুমি তো এখন বোম্বের ফিল্মস্টার?

আমি বলি- না দাদা, ফিল্মস্টার নই, তবে আমি ফিল্ম বানাই।

ফিল্ম বানাও

বাঃ বাঃ বেশ বেশ। তা কদিন আছো তো এখানে, একবার এসো, তোমায় একটা ভালো গল্প শোনাবো। কি আসবে তো?

বলেই আর দাঁড়ালেন না। আমিও হাঁটতে শুরু করলাম।

আবারও সেই পরিবর্তনগুলো নজরে পরতে লাগলো। বসন্ত মাঝি, বিমলদের মাটির বাড়িগুলো সব দোতলা পাকা বাড়ি হয়ে গেছে। এখানেই বাঁদিকে একটা বড় বাগান ছিল- সবাই বলত রাখাল কামারের বাগান- দেখলাম সেই জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস, বেশ ঝাঁ চকচকে একটা দোতলা বাড়ি।

আর একটু এগুতেই মনটা হঠাৎ করে খুব ভালোলাগায় ভরে উঠলো। আমাদের বাড়ির সামনে সেই ছোট্ট পুকুরটা এখনও আছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম- সেই ছোট্টবেলায় স্মৃতি মনে পড়ে গেল- সেই তিনটে রাজহাঁস যদি এসে পড়ে, আমি সেই চৈ চৈ করে ওদের তাড়া করব। আর ওরা তিনটিতে একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তখন আমার যেন স্বপ্নের ঘোর।

হঠাৎ পিছন থেকে এক নারী কণ্ঠ কানে এলো

মা দেখুন, পিকলুবাবু পুকুরধারে কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি পিছন ঘুরে দেখি,কী বলব , প্রায় দুর্গাপ্রতিমার মত সুন্দর এক নারী। আমার গলায় তখন উচ্ছাস,

-বড় বৌদি?

- তা নয়তো কী- কিন্তু তুমি একা কী ব্যাপার?

ভাগ্যিস বড় মা, মানে জেঠিমা এসে জড়িয়ে ধরলেন, তাই বাকি কথাটা চাপা পড়ে গেল। অবশ্য যে'কটা দিন ছিলাম বিভিন্ন কৌশলে বাকি কথাটা চাপা দিয়েই রেখেছিলাম।

তো সেই বড়মা জড়িয়ে ধরার পর একটু অনুভূতি হলো, মায়ের বুকের উষ্ণতা তো এমনই ছিল।

[একটা বাঁশির সুর ঢোকে]

বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলাম- পূর্বমুখী মাটির দোতলা বাড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে। অদ্ভুত ব্যাপার বাড়িটার ওপর নীচে জানলা দরজাগুলো একটাও নেই- বাড়িটাকে কেমন খণ্ডহর খণ্ডহর বলে মনে হচ্ছিল। তবে, দক্ষিণমুখো মাটির বাড়িটা দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছে।

বড়মা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসালেন। বারান্দার দেওয়ালে দেখলাম দাদু, জ্যাঠা আর বাবার তিনটে বাঁধানো ছবি। ছবিগুলোতে নিয়মিত পরিচর্যার ছাপ স্পষ্ট। আবার কাকার কথা মনে পড়ল - আসলে কেউ তো নিশ্চিত নয়, কী হয়েছে তার পরিণতি- তাই হয়তো--

বড়দা স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। অনেক রাত অবধি দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্প আর গল্প। যার বেশির ভাগটাই খবরের আদান প্রদান। কে কেমন আছে, কোথায় আছে- এই সব আর কি। সেই সব আদান প্রদানেই, ওই যে বলছিলাম না খণ্ডহর - সেই খণ্ডহরের রহস্য ভেদ হলো।

ছোড়দা দাঁইহাটে ওষুধের দোকান করেছে, তার শ্বশুর বাড়ির পাশেই। এ বাড়িতে প্রায় আসে না বললেই চলে। বাড়িও করেছে। মাটির বাড়ির সব শাল কাঠের দরজা জানলাগুলো সেখানেই নিয়ে গিয়ে বাড়িটাকে খণ্ডহর বানিয়ে গেছে। অবশ্য পাকা বাড়ির সবটাই বড়দার দায়িত্বেই হয়েছে।

একটা বিষয়ে আমার চোখ পড়ল - বড়দা ছিল অনেকটা আমার হারিয়ে যাওয়া কাকার মতো- তারমধ্যে উচ্ছাসটা অনেকটা বেশি বেশিই ছিল। কিন্তু এখন যে বড়দা আমার চোখের সামনে, সে মানুষটা যেন অনেকটা অন্তর্মুখী। কেমন যেন অচেনা অচেনা।

রাত্রিবেলায় অনেকেরই যেটা হয় জায়গা পরিবর্তন হলে, কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না- আমারও সেই অবস্থা। খালি এপাশ আর ওপাশ করছি। দক্ষিণের বারান্দার সেই দীর্ঘ আলোচনাগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে আসছে। আমার অনুভূতিগুলোই বলে দিচ্ছিল এই সংসারে অনেকগুলো ফাঁক আছে। ছোড়দার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া বড়মা নিঃসন্তান বড়দা বৌদিকে খুবই আঘাত দিয়েছে। যে যেখানে আছে সেই অবস্থাতেও সংসারটায় একটা নিজস্ব সুর থাকতে তো পারত- কিন্তু-

আমার মা একটা কথা প্রায়ই বলত- 'মানুষের চাওয়া পাওয়াগুলো বড্ড বেমানান রে।' মা আজ চলে গেছেন, বাবাও। কিন্তু যতদিন তারা বেঁচে ছিলেন আমি জ্ঞানত তাঁদের দীর্ঘশ্বাস ফেলার কোনও সুযোগ দিইনি- প্রবাসী সন্তানের জন্য একটা অভাববোধ তাদের বুকের মাঝে কাজ করত ঠিকই। কিন্তু দুঃখী বলতে যা বোঝায় সে অর্থে দুঃখী তাঁরা ছিলেন না। যেমন এখানে কাউকে জানতে বুঝতে দিইনি, বাবা মা যদি আজও থাকতেন তাদেরও আঘাত দিয়ে বলতে পারতাম না মনামী আর আমার সন্তান রিভু এখন আমার নয়- অন্যের। (আবহ)

গ্রামে আসার আগেই আমি জানিয়ে রেখেছিলাম খুব বেশি হলেও আমি চার পাঁচ

দিনের বেশি থাকতে পারব না। তো সেই অল্প কয়েকটা দিনেই গ্রামের আনাচে কানাচে বড়দার সঙ্গে পায়ে পা মেলালাম। স্মৃতি আর বাস্তব মিলে মিশে এক অনুভূতি আমার বুকের মধ্যে।

আজকের ভারতবর্ষ তিনটি- একটা ক্রমশঃ ছুটে চলেছে, দ্বিতীয়টা অতীত আর বর্তমানের সমস্ত সংস্কার নাকি কুসংস্কার মিলিয়ে কিছুটা যেন স্থবির আর তৃতীয়টা সত্যি বলতে কী অনেক অনেক পিছিয়ে। সেখানকার নৈরাশ্য, হাহাকার, যন্ত্রণা, চোখের জলের সামান্যতম আঁচড় পড়ে না তথাকথিত টেকস্যাভি আধুনিক ভারতে। প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তরে মোবাইল ফোন, মুদির দোকানে ঝুলন্ত পোটাটো চিপসের প্যাকেট আর শ্যাম্পুর ছোট ছোট স্যাসেই আটকে আছে আধুনিকতা অথচ ভিতরে ভিতরে অনেক গরল- অনেক সংস্কারের জটিল আবর্ত।

[রণজয় জানলার গরাদ ধরে বাইরে বাইরে তাকিয়ে থাকে। একটা মানানসই আবহ। আবার চেয়ারে বসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেতে খেতে]

আমি বুঝিনি, ওই সোনা মুখুজ্জে, মানে সোনাদা কি পাগল? মধ্যরাতে বাড়ির ছাদে উঠে চারিদিকে টর্চের আলো ফেলে সে কী খোঁজে? সত্যি কি মানুষটা শ্মশান আগলে বসে আছে।

ছেলে শ্যামল এক নীচু জাতের মেয়েকে কোন কালিবাড়িতে বিয়ে করে ঘরে তুলেছিল। খবর পেয়ে সোনাদা সস্ত্রীক কাটোয়া থেকে ছুটে এসেছিল। সাতদিনের মাথায় গ্রামের শ্মশানে দুটি মৃতদেহ চিতায়ওঠে। শ্যামলের নতুন বউয়ের লাশটা ভেসে উঠেছিল বড় পুকুরের জলে আর শ্যামলের মায়ের দেহটা ঝুলছিল দোতলার দালানে শাড়ির ফাঁসে। শ্যামলও এরপর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এটাই কি তাহলে সোনাদার সেই গল্পের প্লট?

বসন্ত মাঝির ছেলেটা বিয়ের একবছরের মাথায় ফুড পয়জনিং হয়ে মারা গেছে। তার ছাব্বিশ বছরের বউটা বৈধব্যের যন্ত্রণার সাথে ডাইনি অপবাদ মাথায় নিয়ে চোখের জলে দিন কাটাচ্ছে, ভাবা যায়! গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ নাকি সেই অপবাদকে মান্যতা দিয়েছে।

কথাগুলো বলতে বলতে বড়মার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামে। মাথা-নিচু করে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চশমা মুছতে লাগলেন। আমি বোঝাতে পারিনি সেই ঊনআশি বছরের বৃদ্ধাকে যে, মানুষ কত ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করার নেশায় মেতে উঠছে তাদের বুকের মধ্যে তত তৈরি হচ্ছে ক্ষত। সেই ক্ষত নিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে মানুষ ভুলে যাচ্ছে নতুন কিছু স্বপ্ন দেখতে। দিনে দিনে সমাজ, শ্রেণি বিভাজিত হতে হতে কোথায় পৌঁছবে কে জানে। কোনও মানবিকতা নয়, অর্থ শুধু অর্থের লালসা। আর তার সঙ্গে ভুরি ভুরি কুসংস্কার। এই কি আমার গ্রামভারত?

অবশেষে, আমার দিন ফুরালো। ভালোয় মন্দয় মিলিয়ে হলেও একাকীত্বে দমবন্ধ হয়ে আসা মনটা কটা দিনের জন্য তো স্নিগ্ধ বাতাস পেল। সম্পর্কের উষ্ণতা পেল। হারিয়ে

যাওয়া অতীতের পেলব স্পর্শ পেল। শেকড় তাহলে একেবারে ছেঁড়েনি রণজয়, তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে রেশটুকু টিকিয়ে রাখার। কিন্তু পারবে কি রণজয়? নিজেই নিজের মুখোমুখি হই সেই মুহূর্তে কোন উত্তর মেলে না।

বিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের সেই বিখ্যাত উক্তি নিজের মনে মনেই উচ্চারণ করলাম- তুমি যখন নিজের যন্ত্রণা অনুভব করবে, জানবে তুমি জীবিত। তুমি যখন অন্যের যন্ত্রণায় কাতর হবে, তখন তুমি হবে প্রকৃত মানুষ- সামাজিক মানুষ। একাকীত্বের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে সামাজিক মানুষ হবার চেষ্টায় কতজন মানুষ সফল হয় আমি জানি না, কিন্তু, আমার ভাবনার গতিমুখটা বুঝি কিছুটা বাঁক নিল। আমার ভিতর থেকেই কে যেন খোঁচা দিতে লাগল- বাড়াও, বাড়াও, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রসারিত কর।

[ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। টেবিল থেকে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ যেন তাকে পর্যবেক্ষণ করে]

ফিরে আসার আগের রাতে সেই দক্ষিণের বারান্দায় সবাই একসঙ্গে খেতে বসা হলো। বড়মাই প্রসঙ্গটা তুললেন । বহু বছর বাদে এলি । আমাদের মনটা ভারি ভালো হলো। এখন কথা হলো এখানে যা কিছু দেখছিস, এতে তো তোরও অংশ আছে। তুই কিভাবে কী নিবি বল।

একটু থেমে আবার বললেন

- একজন কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে, আরেকজনের তো তুই আছিস। তোর আসার চিঠিটা পাবার পর থেকেই কথাগুলো আমার বার বার মনে হয়েছে। এখন তুই-ই বল।

আমিতো স্তম্ভিত। কোথাও যেন একটু ধাক্কা খেলাম। বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো সেই তিনটে ছবির মধ্যে বাবার ছবির দিকে একবার তাকালাম- কিন্তু আমি কি বলব? বড়মার চোখের দিকে তাকালাম। সেই দুটো চোখও উৎসুক হয়ে আমার চোখে চোখ রেখেছে, আবারও আমার ভিতর থেকেই কে যেন উচ্চারণ করল- কী হবে ওসবে?

অদ্ভূত নিস্তব্ধতা, কারোমুখেই কোন শব্দ নেই। [নীরবতা]

বড়দাই মুখ খুলল- বড়কাকাকে লেখা দাদুর সেই চিঠিটার কথা তুই বোধহয় ভুলতে পারিসনি, তাই না?

সিকদার বাগানের সবকিছুই তো আমার কাছে আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেছে- বড়দা কেন আবার.....

কারোর কোনও কথার উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। হাত মুখ ধুয়ে বড়দার সামনে দাঁড়িয়ে খুব নিচু গলায় বললাম

- কাল সকালে বৌদি লুচি ভাজবে আর সেই গরম গরম লুচি খেতে খেতে বাকি আলোচনা করব। কী বৌদি তাইতো?

সেই প্রতিমার মত মুখমণ্ডল খুশিতে উদ্ভাসিত হলো।

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম- দাদুর চিঠি- না ,আমি তো তা মনে রাখতে চাইনি আর এখনও চাই না। সে তো ছিল শুধুই বাবার বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ,

না বিযোদ্গার। বাবা তো স্বেচ্ছায় কাকার লেখাপড়ার খরচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কাকা হারিয়ে যাবার বহুদিন পর গ্রামের এক বন্ধুর মুখে দুঃসংবাদটা বাবা জানতে পারেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে বাবা মাসে মাসে যে টাকা মানিঅর্ডার করতেন তার সই করা রিসিপ্ট ঠিক পৌঁছে যেত সিকদার বাগানে- শুধু কাকার খবরটা ছাড়া। কেউ খবর রাখেনি, কলকাতা শহরের এক সওদাগরী অফিসে কাজ করতে করতে তিন তিনবার ছমাস আটমাস লক আউটের ঝড় সামাল দিয়ে কীভাবে সংসার নিয়ে টিকে আছে অম্বরীশ সান্যাল। সেই তীব্র অর্থকষ্টের দিনেও মানুষটা গ্রামের বাড়ির নিজস্ব চাষের চাল আলু কিংবা সরষের অংশ তো দাবি করেননি কখনও। কীভাবে সংসারের শতছিন্ন কাঁথাটাকে সেলাই করে টিকিয়ে রেখেছিল মানুষটা সে সন্ধান তো কেউ কোনওদিন করেনি। আমার বেশ মনে আছে পাশে যোগ্য সহধর্মিনী হতে মায়ের দুহাতে শাঁখা ছাড়া আর সবই চলে গেছিল গয়নার দোকানে। কেউ , কেউ জানতেও পারেনি সেই যন্ত্রণার দিনগুলোতে সব চলে যাবার কথা।

[সোফায় গিয়ে বসে। আবার সেই নিজের চুল খামচে ধরে অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রকাশ]

আমি ময়ের জন্য দুগাছা বালা আর একটা গলার হার তৈরি করিয়েছিলাম- না , পারিনি মায়ের হাতে তুলে দিতে। তার আগেই হঠাৎ করে মা..... [চুপ করে বসে থাকে]

সেই বালা জোড়া আর হারটা আমার কাছেও নেই। থাকলে অন্তত এক আধবার ছুঁয়ে নিজেকেই বলতে পারতাম- এগুলো আমার মায়ের। মনামীর অরনামেন্ট বক্সে ঢুকে তারাও আজ অন্যদেশে।

[চা নিয়ে খায়। একটা হাল্কা আবহ চলে]

পরদিন সকালে দেখি যাকে বলে এলাহি ব্যবস্থা। লুচি তরকারি আর সঙ্গে বৈরাগী কাকার দোকানের রসগোল্লা। তিরিশ বছর পর - সেই একই স্বাদ। আবার কবে পাব জানি না।

খেতে দিয়ে বৌদি ঢুকলো পুজোর ঘরে আর বড়মা বৃহস্পতিবারের পূজো সেরে একগ্লাস চা নিয়ে বসলেন আমাদেরই দুই ভাইয়ের পাশে।

বেশ বুঝতে পারছিলাম দুজনেরই চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। বড়দাই বলল- তো তো সাড়ে পাঁচটার ফ্লাইট, তার মানে বারোটার মধ্যেই রওনা হতে হবে।

আমি সেকথার কোন উত্তর দিলাম না। বড়মার হাতে হাত রেখে বললাম-

আমার যতদূর মনে পড়ে শেষ যেবার গ্রামে এসেছিলাম তখন আমি বারো বছরের পিকলু। তিরিশ বছর পর এলাম। কেন এলাম জানো? এলাম পিতৃভূমির গন্ধটুকু নিতে। তোমাদের সঙ্গে আত্মার বন্ধনটুকু ঝালিয়ে নিতে। আবার কবে আসব বা আবার আসতে পারব কিনা জানি না। তবে তোমাদের স্নেহস্পর্শের জন্য আমার কাঙাল মনটা ছটফট করবেই। আবারও হয়তো সেই স্পর্শগুলোর লোভে আসব। অন্তত চেষ্টা তো করবই। তাই বলি কী, অংশীদারীত্বের কাঁটা বিছিয়ে আমার আসার পথটা বন্ধ করো না বড়মা।

হঠাৎ ঠাকুর ঘর থেকে ভেসে এলো বৌদির উলুধ্বনির শব্দ। উত্তর দিকের আমড়া গাছের ডালে বসা এক জোড়া শালিক উড়ে গেল- কোথায় গেল কে জানে, কিন্তু যাবার পথটা বাতাসে মিলিয়ে গেল- ঠিক যেমন করে রিভু মনামীর যাবার পথটা ....

মধ্য আকাশে প্লেন, উইন্ডো সিটই পেয়েছিলাম। উইন্ডো গ্লাসের বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। প্লেনের ভিতরের স্নিগ্ধ আলোর প্রলেপ পড়ে উইন্ডো গ্লাসগুলো যেন কিছুটা অস্বচ্ছ আয়না। সেদিকে তাকাতেই দেখি আরেকটা আমি।

সেই প্রতিবিম্ব বলে উঠল - অনেকগুলো প্রসন্ন প্রহর কাটিয়ে এবার মন চল নিজ নিকেতনে,তাই তো?

এপারের আমি বলি হ্যাঁ, তাইই।

সে আবার বলে - শেকড়ের যে রেশটুকু রেখে এলে তাকে তো লালন করতে হবে।

- হ্যাঁ করব, নিশ্চয় করব।

আবার তার প্রশ্ন- প্রবাসে কি সেই ভাবনার মধ্যে বাঁচবে? নাকি আর কিছু আছে? তুমি তো নির্মমভাবে একা....

এপারের আমি যেন কিছুটা উন্মনা,কিছুটা চিন্তিত। সত্যিই কি কিছু নেই? একাকীত্ব তো পারট অফ মাই লাইফ। না না,আছে। আমার বাঁচার রসদ আছে, আমার দিন যাপনের রসদ আছে, আমার সেরিব্রাল এক্সারসাইজের রসদ আছে, মনের আনাচে কানাচে লালন করব সেই শেকড়, আর বাঁচব কয়েকটি শব্দ নিয়ে-

লাইট-সাউন্ড-রোল কামেরা-অ্যাকশন
কাট।

লেখক : **দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, সম্পাদক- গ্রুপ থিয়েটার, কলকাতা।**

Author : **Debasis Bondyopadhyay, distinguished Theatre personality, Editor: Group Theatre, Kolkata.**

চোরা বালি

■ শিবংকর চক্রবর্তী

চরিত্র : সত্যভূষণ, মন্টু, দিনদয়াল, সৌমেন, হরিবাবু, লোকটা, শান্তিলতা।

(একটা মধ্যবিত্ত ঘর। ড্রয়িং কাম বেডরুম বলা চলে। টেবিল, চেয়ার- একটা ছোট তক্তোপোষ। সময়টা সকাল। ছেলে মন্টু টেবিলে আয়না রেখে দাড়ি কাটছে। ভিতর থেকে মঞ্চে এসে ঢোকেন বাবা সত্যভূষণ)

সত্য : কি ব্যাপার সকালেই দাড়ি কাটতে বসেছো?

মন্টু : একটু বেরুবো।

সত্য : কোথায়?

মন্টু : একটু বাগরি মার্কেট যেতে হবে। সামনে পূজো, এখনই সব গুছিয়ে নিতে না পারলে—

সত্য : কিন্তু আজ তোমার মামাবাড়ি থেকে মনীষাকে নিয়ে আসার কথা ছিল না?

মন্টু : ফেরার পথে মামাবাড়ি হয়ে বোনকে নিয়ে ফিরবো।

সত্য : দেখো বেশী রাত করো না। রাত বিরেতে কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে থাকে।

মন্টু : না - না- রাত হবে না। বাগরিতে ক'টা মহাজনের সাথে মিট করতে হবে। কিছু অ্যাডভান্স দেওয়ার ব্যাপারও আছে।

সত্য : হুঁ - ব্যবসা করতে গেলে চাপ তো নিতেই হবে। তা তুমি কি এখুনি বেরুবে?

মন্টু : কেন বলো তো?

সত্য : একটা ব্যাপারে তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।

মন্টু : কি কথা—জরুরী?

সত্য : জরুরী তো বটেই— কিন্তু তোমায় কিভাবে বলবো এটা ঠিক করতে না পেরেই—

মন্টু : অস্বস্তির কোনও কারণ থাকলে না বলাই ভালো।

সত্য : না- মানে - কাল রাতে আমি এমন একটা ঘটনার মধ্যে পড়ে গেলাম—

মন্টু : বাবা - তুমি কি ঠোঙা বানানো ঐ মেয়েটার কথা বলবে? কি যেন নাম - মালতী?

সত্য : মলতী কাল রাতে আমারই স্কুলের ক্লাস টেনের ঘরে কিছু বদমায়েসের হাতে—

মন্টু : জানি— ঘটনাটা আমি আমার শোরুমে বসেই শুনেছি। তুমি মেয়েটাকে বাঁচিয়েছো— থানায় নিয়ে গেছো— তারপর তোমার চাপে পড়ে থানা কেস্‌টা টেক-আপ করেছে— সবই জানি।

সত্য : কিন্তু এটা জানো কি মেয়েটাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। তাকে উদ্ধার করেছি মাত্র। একটা কুমারী মেয়ের যা কিছু সম্পদ তা সবই মেয়েটা কাল রাতে খুইয়েছে।

মন্টু : ছেড়ে দাও বাবা— ওদের সোসাইটিতে এসব নরম্যাল ব্যাপার। হয়তো মেয়েটা

ওদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কিছু পয়সার লোভে। তারপর তোমার হাতে ধরা পড়ে—

সত্য : না- মন্টু - ঘটনাটা অতো সহজ নয়। তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। কিন্তু এটা জেনো মেয়েটা যে নষ্টা প্রকৃতির নয়— তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

মন্টু : বেশ তো তোমার যদি মনে হয় মেয়েটার জন্য কিছু করা দরকার— করো। কেউ তো বাধা দিচ্ছে না – দেবেও না। দেশে আইনের শাসন আছে। তুমি ঠিক জায়গাতে মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েছো। এবার নিশ্চয়ই ঘটনা তার খাতে বইবে।

সত্য : আমার সন্দেহ আছে। এখানকার থানার ও.সি. সৌমেন আমার প্রাক্তন ছাত্র— ইয়ং ম্যান, সাহসী—তা সত্বেও কাল ও যেভাবে কেসটা নিয়ে হেসিটেট করছিল তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে মেয়েটা আদৌ সুবিচার পাবে কিনা।

মন্টু : ঐ ধরণের মেয়েদের জন্য তুমি ঠিক কি ধরণের সুবিচার আশা করো বাবা? আজ যদি সত্যিই যারা মেয়েটার উপর অত্যাচার করেছে তারা ধরাও পড়ে— তাতে ঐ মেয়েটার কোন লাভ হবে কি? মাঝখান থেকে ব্যাপারটা প্রচার হয়ে গেল— মেয়েটার না হবে বিয়ে— না পাবে কোন কাজ।

সত্য : তার মানে তুমি বলতে চাইছো ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমি ভুল করেছি?

মন্টু : অবশ্যই না— থানায় না নিয়ে গেলে — ওর ঠিক মতো ট্রিটমেন্টের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা অসুবিধে হয়ে যেতো। তবে এখন যেটা দরকার সেটা দোষীদের খুঁজে বার করার চেষ্টা নয় —মেয়েটার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

সত্য : সেটা কি করে সম্ভব?

মন্টু : প্রশাসন নিশ্চয়ই ওর জন্য কিছু করবে। তুমি তোমার কাজ করেছো—এবার তোমাকে এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না। এবার যা ব্যবস্থা করার সবটাই আইন আর প্রশাসন করবে। (নেপথ্যকে উদ্দেশ্য করে) মা- খাবার দাও—

মা : (নেপথ্যে) হয়ে গেছে বাবা—

মন্টু : ঠিক আছে বাবা। তুমি টেনশন নিওনা—সব ঠিক হয়ে যাবে (ভিতর দিকে চলে যায়। সত্য গম্ভীরভাবে চেয়ারে এসে বসেন। মা শান্তিলতা সত্যর খাবার নিয়ে ঢোকেন)

শান্তি : কি গো মন্টুকে মামাবাড়ি থেকে মনীষাকে আনতে ভালো করে বলে দিয়েছো তো? এখনও গম্ভীর হয়ে বসে আছো? বলছি না মাথা থেকে ওসব তাড়াও।

সত্য : আজ যদি আমাদের মনীষার উপর এমন একটা অত্যাচার হতো? তখন আমাদের কি অবস্থা হতো শান্তিলতা (খেতে শুরু করেন—কিন্তু খাওয়ায় মন নেই)

শান্তি : কি যে বলো না। দেশে হাজার হাজার মেয়ে দিনরাত রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মেয়ের ঘাড়েই কি ছেলেরা লাফিয়ে পড়ে? মেয়েরা খারাপ না হলে ছেলেরা ওসবে সাহস পায় ?

সত্য : মেয়েটা গরীব ঠিক— কিন্তু খারাপ সে খবর আমি পাইনি।

শান্তি : হ্যাঁ ও তোমার কানে কানে নিজেই বলে দেবে— আমি খারাপ মেয়ে গো। খারাপ না হলে অতো রাতে এক পাল ছেলের সাথে কি করতে গিয়েছিল ও ঐ অন্ধকার স্কুল ঘরে?

সত্য : ছেলেগুলো ওকে সস্তায় ঠোঙা বানানোর কাজ জোগাড় করে দিতো। কাল সন্ধেবেলায় ওরা মেয়েটাকে বোঝায় ওদের সাথে স্কুলে যেতে—সেখানে বিনে পয়সায় অনেক কাগজ পাওয়া যাবে।

শান্তি : আর অমনি ধিঙ্গি মেয়ে নাচতে নাচতে অতোগুলো ছেলের সাথে চলে গেল। ন্যাকা—

সত্য : গরীবের মেয়ে ঠোঙা বানিয়ে পেট চালায় । লোভ সামলাতে পারেনি।

শান্তি : তোমাদের ঐ এক সুবিধে—গরীব বললেই সাত খুন মাপ।

(ভিতর থেকে ব্যাগ হাতে মন্টু ঢোকে)

মন্টু : মা- চলি—

শান্তি : চলি বলতে নেই— আসি। দূর্গা দূর্গা (মন্টু বেড়িয়ে যায়)

শান্তি : আচ্ছা- আমরা কি খুব বড় লোক? আমার মেয়েকে অতোগুলো ছেলে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারতো?

সত্য : শান্তি ভুলে যেয়ো না মেয়েটা অশিক্ষিত। ছেলেদের থেকে কি ধরণের ভয় থাকতে পারে সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা হয়তো ছিল না।

শান্তি : তুমি কি যে বলো না— অশিক্ষিত বলে কি ওর নিজের শরীর সম্পর্কেও কিছু জানে না? ওদের মধ্যে বরং এসব জ্ঞান আরো ছোট বয়সেই জন্মায়। দেখো না কেমন ছোট্ট বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আর বছর বছর পাল পাল বাচ্চার জন্ম দেয়।

সত্য : সে সবের মূলেও তো অশিক্ষাই শান্তি। যাক্ কোন সাফাই গেয়েই মেয়েটার ক্ষতিটাকে তুমি ছোট করে দেখতে পারবে না। ওর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের স্রোতই প্রমাণ করেছে গতকাল সন্ধ্যে পর্যন্ত মেয়েটা কুমারীই ছিল। আর তার সেই সম্পদ সে খোয়াতে বাধ্য হয়েছে কাল রাতেই ঐ বদমায়েসগুলোর হাতে।

শান্তি : বেশ মানলাম— মেয়েটা সতী-স্বাধ্বী ছিল। তা এখন তুমি কি করবে? ঐ বদমায়েসগুলোর সাথে লড়তে বেরুবে? ওরা কি তোমার ছাত্র যে কষে দু'চার ঘা বেত মেরে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে?

সত্য : আমার ছাত্ররা অনেকে ওয়াগান ভাঙে-টাঙে, শুনেছি— ড্রাগ পাচার-টাচারও করে— কিন্তু আমারই স্কুলে আমারই সামনে একটা নিরীহ মেয়ের উপর অত্যাচার হবে— আর আমি মুখ বুজে চুপ করে বসে থাকবো? তা তো হতে পারে না। হ্যাঁ আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। যাও— থালাটা নিয়ে যাও—

শান্তি : আর খাবে না?

সত্য : ভালো লাগছে না।

শান্তি : তুমি এবার ঐ মেয়েটার শোকে নাওয়া-খাওয়াও ছেড়ে দেবে নাকি?
[থালা আর গ্লাস তুলে নেয়] যাক্ গে যা খুশি করো গে—। তবে যাই করবে - ভেবে চিন্তে করো - বুড়ো বয়সে হাত পা ভেঙে একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ো না। ও সব ছেলেরা যা খুশি তাই করতে পারে। রাত-বেরাতে বাড়ি ফোরো। মন্টুর দোকান বন্ধ করে ফিরতে কতো রাত হয়— মনীষার টিউশানী থেকে ফেরা— হঠাৎ কেউ একটা কিছু চালিয়ে দিলে? যারা একটা নিরীহ- গোবেচারী মেয়ের উপর— তারা তো — [বলতে বলতে ভিতরে চলে যায়। অপরাধীর মতো ঘরে এসে ধীরে ধীরে ঢোকে দীনদয়াল - ইস্কুলের দাড়োয়ান]

দীন : স্যার—

সত্য : দীনদয়াল— তুমি! তোমার সাহস হলো আমার বাড়িতে ঢুকতে?

দীন : স্যার- স্যার— আমি আমার দোষ মেনে নিচ্ছি। আমাকে মারুন— মেরে ফেলুন— আমার চাকরীটা কেড়ে নেবেন না বাবু।

সত্য : চাকরী? হুঁ - স্কুল খোলার পর ত্রিসীমানায় তোমায় যেন না দেখি। তোমার এতো বড় সাহস—

দীন : স্যার— বিশ্বাস করুন স্যার— আমি বুঝতে পারিনি।

সত্য : এতে বোঝাবুঝির কি আছে দীনদয়াল? স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে স্কুলের সব দায়-দায়িত্ব তোমার— সে কি তুমি জানো না? তুমি স্কুলের দারোয়ান— অথচ তুমি স্কুলের গেট খুলে- ক্লাস ঘরের দরজা বন্ধ না করে স্কুল থেকে চলে গেলে? কোথায় গিয়েছিলে? সিনেমা দেখতে?

দীন : না স্যার — আমি সিনেমা দেখতে যাইনি।

সত্য : তবে কোথায় গিয়েছিলে — বলো? আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে— ঐ অসভ্যগুলোর কাছে টাকা খেয়ে তুমি ওদের হাতে স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলে।

দীন : না স্যার বিশ্বাস করুন। দীনদয়াল অতোটা নেমকহারাম নয়। আজ বিশ বছর এই ইস্কুলের দারোয়ানী করছি। কোনও দিন খারাপ কিছু তো ঘটেনি— ঘটতে পারে একথাও আমার মনে আসেনি। ক'দিন থেকেই মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ইস্কুলটাও ছুটি- জন্মদিন - বিশ্বকর্মা পূজো— রবিবার। হাতে কাজ নেই। তাই কাল সন্ধেবেলা — আকাশটা একটু ধরে আসতে ভাবলাম যাই— মোড়ের মাতায় অনিলের দোকান থেকে একটু চা খেয়ে আসি। হঠাৎ যে এমন ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে সে তো ভাবিনি। ছাতাটাও নিইনি। এই অবেলায় ভিজবো—তাই ওখানেই একটু বসেছিলাম। বৃষ্টি ধরতেই আমি ইস্কুলে চলে এসেছি— এসেই শুনি এই কাণ্ড।

সত্য : আমার কিচ্ছু করার নেই। তোমাকে বাঁচানোর ইচ্ছে আমার নেই। আর থাকলেও সে ক্ষমতা এরপর হয়তো আমার আর থাকবেই না।

দীন : স্যার —

সত্য : তুমি বুঝতে পারছো দীনদয়াল— তোমার সামান্য একটা কাজের গাফিলতিতে আজ আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এতক্ষণে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে— সত্যভূষণ বাবুর স্কুলে ক্লাস টেনের ঘরে কাল সন্ধ্যেতে মালতী বলে একটা মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। ঘটনাটা আবিস্কার করেছেন স্বয়ং সত্যভূষণবাবু। হাজার রকমের সরস গল্প এখন লোকের মুখে মুখে ফিরবে। টি.ভি আর কাগজের রিপোর্টাররা গন্ধ শুঁকে চলে আসবে। তোমাকে আমাকে শ'এ শ'এ গা জ্বালানো প্রশ্ন করবে। ছবি তুলবে। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে খোশ গল্পে টি.ভি-র পর্দা, কাগজের পাতা ভড়িয়ে ফেলবে। দীনদয়াল এর পরেও কি আমি মাথা উঁচু করে স্কুলে যেতে পারবো? নিজেকে ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার বলে পরিচয় দিতে পারবো? স্কুল কমিটি মেনে নেবে? না - দীনদয়াল না— তোমাকে তো স্কুল থেকে যেতেই হবে— আমাকেও বোধহয় চাকরীটা ছাড়তে হবে।

দীন : এতো বড় একটা ক্ষতি যে হয়ে যেতে পারে - তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি স্যার। ভাবলে এ ভুলটা আমি করতাম না। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি স্যার— আপনি বিশ্বাস করেন—আপনার দীনদয়াল নেমক হারাম নয়।

সত্য : থাক - আর কান্না কাটি করে কি হবে— যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তুমি এখন যাও। কাজ যেমন করছিলে করে যাও। তারপর স্কুল কমিটির মিটিং হোক—সেক্রেটারী কি বলেন দেখি। পরিচালন কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে— তা তোমাকেও মানতে হবে— আমাকেও।

দীন : দেখবেন স্যার— এই বয়সে চাকরীটা চলে গেলে— বৌ বাচ্চা নিয়ে পথে বসবো। তবে আপনি ইস্কুলে না থাকলে আমিও থাকবো না। চলে যাবো কোথাও— অন্য কোনও কাজে। আপনাকে ছাড়া ইস্কুল- সেকি ইস্কুল থাকবে? যাই বাবু- [চলে যেতে গিয়ে ফিরে আসে] ও—যে জন্যে এলাম— সেটাই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। কাল আপনি ভুল করে এটা ইস্কুলে ফেলে এসেছেন। [হাতের রেশন ব্যাগ থেকে বার করে একটা ছাতা বাড়িয়ে দেয়]

সত্য : [চমকে ওঠেন] একি! এ তো আমার ছাতা— এটা তুমি কোথায় পেলে?

দীন : আজ্ঞে স্যার, ঐ ক্লাস টেনের ঘরে। আজ সকালে দেখি রক্তে মাখামাখি মেঝের উপর ছাতাটা পড়ে আছে। এ ছাতা তো আমার কত কালের চেনা তাই দিতে এলাম।

সত্য : তুমি ঠিক দেখেছো দীনু— এ ছাতা ক্লাস টেনের ঘরেই পড়েছিল।

দীন : হ্যা স্যার—

সত্য : [একটু থেমে] ঠিক আছে তুমি যাও—

দীন : স্যার—

সত্য : আ: ! তোমাকে যেতে বললাম না— [ধম্‌কে ওঠেন - দীনদয়াল একটু হক্‌চকিয়ে

চলে যায়। সত্য দরজাটা ধরে ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকে]

সত্য : এ ছাতা— এ ছাতা— শান্তি— শান্তিলতা— শুনছো— শুনতে পাচ্ছ— শান্তি— [শান্তিলতা ছুটে আসেন]

শান্তি : কি হলো? আবার কি হলো?

সত্য : সত্যি করে বলো তো কাল সন্ধেবেলা - একবার বেড়িয়ে আবার ফিরে এসে আমি যখন তোমর কাছে ছাতাটা চাইলাম— তখন তুমি কি বলেছিলে?

শান্তি : কি আবার বলবো— যা সত্যি তাই বলেছিলাম।

সত্য : সেই সত্যিটা কি?

শান্তি : ও— মেজাজ বিগরোলে সব ব্যাপারেই ধম্‌কানো।

সত্য : আ: - যা জানতে চাইছি সেটা বলো।

শান্তি : কাল যখন তুমি ফিরে এসে তোমার ছাতাটা চাইলে - আমি বললাম তোমার ছাতাটা নিয়ে মন্টু বেরিয়েছে। তুমি বরং মেয়ের ছাতাটা নিয়ে —

সত্য : থাক,- আমি কি বলেছিলাম সেটা আমার আর জানার দরকার নেই। তুমি যা বলেছিলে তা সত্যি?

শান্তি : মানে?

সত্য : মানে মন্টু সত্যি সত্যিই আমার ছাতাটা নিয়ে বেড়িয়েছিল কি?

শান্তি : হ্যা- ওর ছাতাটা কাকে জানি দিয়েছে- তাই তোমার ছাতাটা আমাকে বলে নিয়ে গেল— এতো দোষের কি হলো?

সত্য : তার মানে—তার মানে— উ: আমি ভাবতে পারছি না। শান্তি - শান্তি তুমি কি জানো মন্টু কোন জামাটা পড়ে কাল বিকেলে বেড়িয়েছিল।

শান্তি : হ্যা - ওর নীল জামাটা—

সত্য : সেটা একবার এনে দেবে?

শান্তি : কেন?

সত্য : আ: এনে দাও না।

শান্তি : সেটা যে তোমার কি দরকারে লাগবে। হুঁ - একটা পাগোলের সাথে সংসার করা।

সত্য : পাগোল এখনও হইনি শান্তিলতা। তবে এবার বোধহয় হবো। তুমি মন্টুর কাল রাতের জামাটা আমাকে এনে দাও। দোহাই।

শান্তি : বেশ মন্টুর জামাটা দেখে যদি তোমার মন শান্ত হয় তবে নিয়ে আসছি [শান্তিলাতা চলে যায়]

সত্য : না - না - এ হতে পারে না— নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল হচ্ছে। ছাতাটাও হয়তো হারিয়ে ফেলেছিল। ছাতাটা হয়তো কেউ ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে মন্টু ছাতাটা হারিয়ে ফেলেছিল— নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছিল না হলে মন্টু– আমাদের মন্টু– না - এ হতে পারে না। নিশ্চয়ই আমার ভাবনায় কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে।

[শান্তিলতা ভিতর থেকে আসে, হাতে একটা নীল জামা]

শান্তি : কল পাড়ে পরে ছিল। ভিজে টিজে গেছে— এটা নিয়ে—

সত্য : যাক্ - ভিজে যাক্ - পুড়ে যাক্— ওটা আমায় দাও— (তাড়াতাড়ি জামাটা নেন- উল্টে দেখেন—বোতামগুলো তুলে ধরেন— মাঝের দু'টো বোতাম নেই। সেদিকে তাকিয়ে সত্যভূষণ চিৎকার করে ওঠেন] শান্তি — এ আমি কি দেখলাম— কেন দেখলাম? হায় ঈশ্বর– আমার সন্তান– তোমার আমার সন্তান– সে একটা– আ: আ:[বুক চেপে ধরেন– নেপথ্যে আবহে ঝড়-বৃষ্টির শব্দ– তার মাঝে একটা মেয়ের করুণ চিৎকার। সত্যভূষণের বাক রুদ্ধ হয়ে যায়— টলতে থাকেন– হাত থেকে জামাটা পড়ে যায়। কাটা কলা গাছের মতো মেঝেতে পড়ে যান। শা- ন্তি—

শান্তি : কি হলো— কি হলো তোমার— ওগো শুনছো [সত্যের পাশে বসে মাথাটা কোলে তুলে নেন] অলোকের মা— অলোকের মা— আ - আ—
[নেপথ্যকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে ডাকেন। দ্রুত লয়ে নেপথ্য আবহ। আলো নেভে। আলো জ্বলে— দেখা যায় সত্যভূষণ খাটে শুয়ে আছেন। একপাশে শান্তিলতা অন্য পাশে লোকাল থানার ও.সি. সৌমেন।

শান্তি : সৌমেন এমন একটা দিনে এলে— তোমায় যে একটু চা খাওয়াবো—

সৌ : দুঃখ পাবেন না মাসিমা— পরে একদিন হবে। আমি আজ ডিউটিতে এখানে এসেছি। [নিজের পোষাক দেখিয়ে] দেখছেন না—। পরে একদিন না হয় আসবো। সেজেগুজে পাত পেড়ে আপনার প্রসাদ পাওয়ার লোভে।

শান্তি : ওরে ছেলে খুব যে কথা শিখেছো।

সৌ : যা শিখেছিলাম সবই ঐ স্যারে দয়ায়। এখন অবশ্য এই চাকরীতে এসে সবই ভুলতে বসেছি। কিন্তু মাসিমা আপনি তো বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। মন্টু, মনীষা- কেউ বাড়ি নেই— তার মধ্যে এরকম একটা বিপদ—

শান্তি : না - না - কোন অসুবিধে হবে না। দরকার হলে অলোকের মা আছে— ওকে নিয়ে পাশের বাড়ি থেকে কাউকে ডেকে নেবো।

সৌ : অবশ্য আমি আপাতত: কিছুক্ষণ আছি। স্যার একটু সুস্থ হলে— দু'চারটে কথা বলে যেতে হবে।

শান্তি : আর এ নিয়ে কথা বাড়িয়ো না বাবা। কাল রাত থেকে ঐ এক ব্যাপার নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছি।

সৌ : আসলে গতকাল উনি এতো উত্তেজিত ছিলেন আর আমার কথায় এতো রেগে গেলেন যে আমি আর ওঁকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। অথচ জানার বড় দরকার ছিল—হঠাৎ উনি ঐ বৃষ্টিতে স্কুলে গেলেনই বা কেন আর ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেনইবা কি করে?

শান্তি : আমাকে কাল রাতে ফিরে এসে সবই বলেছেন। উনি কাল সন্ধেবেলা বেড়িয়েছিলেন ওঁর স্কুলের ভূগোলের টিচার বৈদ্যনাথবাবুকে দেখতে— ভদ্রলোক ক'দিন থেকেই জ্বরে ভুগছেন। ছাতা ছাড়াই বেড়িয়েছিনে বৈদ্যনাথবাবুকে দেখে ফেরার পথে সর্টকাট হবে ভেবে ঐ স্কুলের পাশের গলিটা দিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু মাঝপথে বৃষ্টি এলো– ছাতা নেই। তাই মাথা বাঁচাতে ছুটেছিলেন স্কুলের ভিতর। টিচারস্ রুমের পাশে অপেক্ষা করার সময়ই উনি শুনতে পান মেয়েটির চিৎকার। চিৎকার শুনেই ছুটে যান ক্লাস টেনের ঘরে। ওনার পায়ের শব্দে- আর গলার আওয়াজে বদমায়েসগুলো পালিয়ে যায়। অন্ধকারে উনি কাউকে চিনতে পারেননি। তারপর লাইটের আলোয় মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে ঐ অবস্থাতেই রিক্সা ডেকে ওকে নিয়ে সোজা হাজির হন্ তোমার ওখানে।

সৌ : হুঁ - আসলে মুস্কিলটা কি হয়েছে জানেন— স্যারের সঙ্গে ও ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করাটা আমার পক্ষে অস্বস্তিদায়ক। তাছাড়া ওনাকে আমি কাল কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না— এ সব ঘটনায় এতো উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। সমাজ আছে- আর সামাজিক অপরাধ নেই— এটা কি হতে পারে? কিন্তু উনি এমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন এমন ঘটনা এই প্রথম শুনলেন।

শান্তি : ব্যাপারটা কি জানো সৌমেন— উনি পুরোনো দিনের লোক—নারীর ওপর অত্যাচার ওনার কাছে জঘন্যতম অপরাধ। তার উপর ঘটনাটা ঘটেছে ওনারই স্কুলের ভেতর। জানো তো স্কুলটাকে উনি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসেন।

সত্য : [আস্তে আস্তে জেগে ওঠেন— একটু অবসাদগ্রস্থ গলায় বলেন] শান্তি- শান্তি - আমাকে একটু জল দেবে? [শান্তিলতা টেবিলের থেকে জল এনে দেয়। হঠাৎই সৌমেনকে দেখতে পেয়ে] তুমি কতক্ষণ ।

সৌ : এই তো স্যার— একটু আগে এসেছি। আপনি উঠবেন না স্যার — ডাক্তার আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন।

সত্য : বিশ্রাম? না হে সৌমেন - আপাতত বিশ্রামের কোনও সুযোগ আমি দেখছি না। শান্তি তুমি ভিতরে যাও— সৌমেনের একটু চায়ের ব্যবস্থা করো। [বুঝা যায় উনি শান্তিলতাকে চলে যেতে বলছেন। শান্তিলতা চলে যায়]

সত্য : সৌমেন - গতরাতের কেসটার কোন হদিস করতে পারলে?

সৌ : থাক না এখন এসব কথা। আমি পরে বিকেলে না হয় আর একবার আসবো।

সত্য : যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

সৌ: না- স্যার— খোঁজ করছি। কিন্তু এখনও কোনও আশা দেখছি না। ঘটনার মোটিভ দেখে মনে হচ্ছে দাগী বদমায়েসদের কাজ এটা নয়। পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াদের কীর্তি। তাই চট্ করে ধরে ফেলা এখানে মুস্কিল। তাছাড়া আমার হাতে তো কোনও ক্লু নেই। ওই ওখানে পাওয়া সাধারণ মানের দুটো বোতল— আর গোটাকয় সিগারেটের

পোড়া টুকরো। ঐ দিয়ে কি আসামী ধরা যায়?

সত্য : মেয়েটার ষ্টেটমেন্ট নাও নি?

সৌ : মেয়েটা নাকি ওদের নাম জানে না। তবে দেখলে চিনতে পারবে। ছেলেগুলোকে ও চেনে অনেকদিন থেকেই কিন্তু নাম জানে না। দেখি মেডিক্যাল রিপোর্ট কি বলে।

সত্য : সৌমেন তোমাকে আমি যদি কোন প্রমাণ দিই— তুমি কি কেসটা নিয়ে এগুবে?

সৌ : চেষ্টা করতে পারি স্যার— তবে কতোদূর কি করতে পারবো এক্ষুনি বলতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছেন কতো রকম চাপের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়।

সত্য : রাজনৈতিক চাপের কথা বলছো তো? তা যদি আসেও তুমি পারবে না— এই কেসটা চালিয়ে যেতে? তোমার এই প্রাক্তন শিক্ষকের মুখের দিকে চেয়েও না?

সৌ : স্যার আপনি ছিলেন বলেই আমি ব্যাপারটাকে এতোটা গুরুত্ব দিচ্ছি। নযতো এরকম ঘটনা আমাদের হামেশাই দেখতে হয়। প্রথম প্রথম একটু আধটু চ্যাঁচামেচি হয়। তারপর পার্টিরা নিজেদের মধ্যেই আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং করে নেয়। কেস্ বেশিদূর এগোয় না। মাঝ থেকে এর মধ্যে নাক গলানোটা আমাদের কাছে গাধার খাটনি হয়ে দাঁড়ায়।

সত্য : আমি এতো কথা তোমার কাছে শুনতে চাইনি। আমার জিজ্ঞাস্য আমি প্রমাণ দিলে— তুমি কেসটা চালাবে কি?

সৌ : [একটু সময় নিয়ে] চালাবো স্যার—

সত্য : বেশ তবে তোমার মাসিমার কাছে গিয়ে গতকাল রাতে মন্টু যে জামাটা পড়ে বেড়িয়েছিল সেটা চেয়ে নাও—।

সৌ : স্যার—

সত্য : আ: যা বললাম তাই করো। [সৌমেন ভিতরে যায়]

[সত্যভূষণ আস্তে আস্তে উঠে— টেবিল থেকে জল নিয়ে খান—তিনি এখনও অসুস্থ বোঝা যায়। ভিতর থেকে উত্তেজিত শান্তিলতা ঘরে ঢোকে— হাতে মন্টুর নীল জামাটা পিছনে সৌমেন]

শান্তি : এর মানে কি? তুমি সৌমেনকে মন্টুর জামাটা নিতে বলছো কেন?

সত্য : মানেটা কি তুমি এখনও বুঝতে পারছো না? সৌমেন তুমি জামাটা নিয়ে যাও— এই জামার খোয়া যাওয়া দু'টো বোতামের সঙ্গে কাল ঘটনাস্থলে খুঁজে পাওয়া বোতাম দু'টো মিলে যাবে। আশা করি এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর তোমার দরকার নেই।

শান্তি : তার মানে তুমি কি বলতে চাও?

সত্য : শান্তি— তোমার আমার সন্তান— তোমার আমার সারা জীবনের শিক্ষা, সাধনা আর পরিশ্রমের ফল আজ একটা রেপিষ্ট।

শান্তি : না - না - এ হতে পারে না— না কিছুতেই না (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) মন্টু- আমার মন্টু— [দ্রুত ভিতরে চলে যায়]

সৌ : স্যার আমাদের বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে। এ ধরণের কমন বোতাম অনেক জামাতেই থাকতে পারে।

সত্য : থাকতে পারে— কিন্তু নিজের সন্তানের অবয়ব— গভীর অন্ধকারেও চিনে নেওয়া যায় সৌমেন। তাছাড়া আরো একটা প্রমাণ— আমার ছাতাটা— যেটা কাল মন্টু নিয়ে বেড়িয়েছিল, সেটাও আজ সকালে স্কুলের দারোয়ান দীনদয়াল ক্লাস টেনের ঘরে খুঁজে পেয়েছে। [ছাতাটা সৌমেনের দিকে বাড়িয়ে] এই নাও ছাতাটা। আর কিছু?

সৌ : স্যার এ সবই পরোক্ষ প্রমাণ। এ সব দিয়ে আমি কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারি — কিন্তু কোর্ট-এ প্রমাণ করতে পারবো না।

সত্য : মেয়েটা কিন্তু বলেছে সে সবাইকে চেনে— দেখলে চিনতে পারবে। ওকে অ্যারেস্ট করে মেয়েটাকে দিয়ে টি.আই. প্যারেড করালেই তো সত্যিটা সামনে এসে যাবে সৌমেন।

সৌ : স্যার আমি বরং বিকেলে আবার আসবো— তখন জামা আর ছাতাটা নিয়ে যাবো— আপনি একটু সময় নিন্– তারপর আপনার ষ্টেট্‌মেন্টটা নোট করাবেন।

সত্য : সৌমেন তুমি আমাকে ভাববার সময় দিতে চাইছো। ভাবছো নিজের সন্তানের কুকীর্তির কথা চাপা দেবার জন্যে নিজের স্ত্রীর সাথে শলা-পরামর্শ করবো? তুমি কি আজও আমাকে চেনোনি সৌমেন?

সৌ : না- স্যার – তা নয়। আসলে মন্টু এখনও ছোট– কতোই বা বয়েস। যাদি কোন ভুল করেও ফেলে বাড়িতেই তাকে শাসন করা যোতে পারে। বিশেষত: আপনি যখন আছেন।

সত্য : না — কোনও সুযোগ নয়— মন্টু যদি অন্যায় করে থাকে তার সাজা হোক— দেশের আইন অনুসারে সাজা হোক—এটাই আমি চাই। [দৌড়ে শান্তিলতা ঢোকেন]

শান্তি : ওগো— তুমি একটু ভাবো। মন্টু আমাদের একমাত্র ছেলে—আমাদের ভরোসা। একে এমন একটা কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে তোমার কি লাভ?

সত্য : মন্টু আমাদের একমাত্র ছেলে—তাই ওর সংশোধন আমাদের কাছে জরুরী। তুমি জামা আর ছাতাটা নিয়ে যাও সৌমেন— চেষ্টা করে দেখো যাতে কেস্‌টা কন্টিনিউ করা যায়।

সৌ : কিন্তু স্যার—

সত্য : সৌমেন আমি আর চাইনা তুমি আর এখানে বেশীক্ষণ থাকো।

সৌ : বেশ আমি যাচ্ছি— তবে বিকেলে আবার আসবো। [ছাতা আর জামাটা নিয়ে বেড়িয়ে যায়]

শান্তি : ওগো - এ তুমি কি করলে? জেনে শুনে নিজের ছেলেকে এতো বড় একটা কঠিন শাস্তির মুখে ঠেলে দিলে? ও ছোট– ও শিশু– ওকে তুমি শাসন করো– শুধরে

দাও– দোহাই পুলিশের হাতে তুলে দিয়ো না।

সত্য : একটা শিশুও যদি আগুনে হাত দেয় - আগুন তাকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দেয়। শিশু বলে তার হাতটা না পুড়িয়ে ছেড়ে দেয় না। আর মন্টু তো সাবালক। বি.এ. পাস করেছে। স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নে ব্যবসা শুরু করেছে। তার মনটা এতো নোংরা— এতো নীচ! ওকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবোই। শুধু তাই নয় ওর যাতে শাস্তি হয় তার সব ব্যবস্থা আমি করবো— আমি নিজে ওর বিরুদ্ধে কোর্টে সাক্ষী দেবো।

শান্তি : এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে তোমার লাভ?

সত্য : লাভ লোকসানের প্রশ্ন এটা নয় শান্তি। প্রশ্নটা ন্যায় এর—সত্যের। একটা লোক অন্যায় করে ছাড়া পেয়ে যাবে আর আমি সত্যটা জেনেও চুপ করে থাকবো?

শান্তি : হ্যা- থাকবে— দরকার পড়লে থাকতে হবে।

সত্য : আমার তেমন কোন দরকার নেই।

শান্তি : সব সময় পড়ার বই-এর উপদেশের মতো কথা বলো না তো। শুধু নিজের কথা চিন্তা করেই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে কোনও সমস্যাই থাকতো না।

সত্য : আমি শুধু নিজের কথাই চিন্তা করছি? সারা জীবন?

শান্তি : নিশ্চয়ই। ছেলে একটা ভুল করেছে— তাকে শাসন করো। তা না — উনি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে চল্‌লেন। কি লাভ হবে?

সত্য : বল্লাম তো আমি কোন লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করছি না।

শান্তি : আমি করছি। মা হয়ে আমাকে করতেই হয়। সারাজীবন পীঠের উপর দিয়ে এই সংসারটাকে বয়ে না বেড়ালে কি হাল হতো তোমাদের? কোন কালে তোমার ছেলে মেয়েদের খোঁজ নিয়েছো তুমি? ওদের লেখাপড়া, খাওয়া দাওয়া—অসুখ বিসুখ— কি করেছো তুমি? সারা জীবন তো ঐ ইস্কুল নিয়েই পড়ে আছো। আর আজ ছেলেকে সংশোধন না করে- জেলের ঘানি টানিয়ে- ধম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির— না বানালেই তোমার চলছে না— তাই না?

সত্য : তাহলে কি করবো আমি?

শান্তি : কি করবে সেটা কি আমাকে বলে দিতে হবে? সংসারের যাতে মঙ্গল হয়- তাই করবে। তোমার একাকে নিয়ে তো সংসার নয়। মন্টুর ব্যবসাটা দাঁড় করাতে হবে— মনীষার বিয়ে দিতে হবে। আজ যদি মন্টুর নামে এমন একটা দুর্নাম রটে যায় তুমি আর মনীষার বিয়ে দিতে পারবে? পারবে—পারবে মন্টু আর কোনও দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে?

সত্য : তার মানে এই বুড়ো বয়সে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে– মুখ বুঁজে অন্যায়কে মেনে নেবো?

শান্তি : হ্যা– নেবে– সংসারের প্রয়োজনে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, তোমাকেও মেনে

নিতে হবে।

সত্য : না— আমি তা পারবো না– যা দেখেছি– তাকে অস্বীকার করতে পারবো না। যে দোষী- তাকে প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে। প্রয়োজনে ঐ মেয়েটার পাশে কেউ না থাকলেও আমি থাকবো।

শান্তি : তা তো থাকবেই। মন্টু যে তোমার চক্ষুশূল। ওর সামান্য দোষও তুমি সহ্য করতে পারো না। ওর পান থেকে চুন খসলেই সেটা তোমার কাছে মহাপাপ। সামান্য একটা ব্যাপার–

সত্য : সামান্য একটা ব্যাপার ! একটা সরল নিষ্পাপ মেয়েকে মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে জোরে করে বলাৎকার করাটা তোমার কাছে সামান্য একটা ব্যাপার ? হায় ! শান্তিলতা সন্তান স্নেহে তুমি এতো অন্ধ ?

শান্তি : হ্যা অন্ধ— আমি অন্ধ– আর আমার মতো অন্ধের একমাত্র অবলম্বন আমার মন্টু। তাই আমার কাছে ওর করা অন্যায়টা কোনও অন্যায়ই নয়।

সত্য : শান্তিলতা ?

শান্তি : কেন অন্যায় তুমি করোনি ? জীবনে কোনও দিন অন্য কোনও মেয়েকে তুমি কামনা করোনি ? ঐ মন্টু হওয়ার সময় আমি যখন বাপের বাড়ি থাকতাম তখন দিনরাত এতো কী কথা থাকতো তোমার সাথে আমার বোন আশালতার ? বহুদিন– বহুবার– আমি তোমাকে একা ঘরে গুজ গুজ করতে দেখেছি– হাসা হাসি করতে দেখেছি ঐ আশালতার সাথে। কি এতো গোপন কথা তোমাদের থাকতো আমাকে লুকিয়ে ? আমি জানি না ভেবেছো ? ঐ আশালতার সাথে তোমার কু-সম্পর্ক ছিল।

সত্য : শান্তি– শান্তিলতা– তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছো। ২৫ বছর আগেকার– তোমার মনের মধ্যে থেকে যাওয়া সন্দেহটাকে আজ নতুন করে জাগিয়ে তুলে সমস্যাটা আরো জটিল করতে চেয়ো না। যাও– যা করার আমাকে করতে দাও।

শান্তি : না দেবো না– কিছুতেই দেবো না। আমি কিছুতেই মন্টুকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দেবো না। ওর কোনও দোষ নেই– ওকে আমি লুকিয়ে রাখবো। পুলিশের হাতে ওকে আমি তুলে দিতে দেবো না। কিছুতেই না। [উন্মাদের মতো ঘরের ভিতর ঢুকে যায় শান্তিলতা]

সত্য : শান্তি– শান্তিলতা [নেপথ্য আবহ] (আলো নেভে। মঞ্চে আলো জ্বলে। সত্যভূষণ মঞ্চে পায়চারী করছেন– ঘরে এসে ঢোকেন হরিবাবু – বয়সে সত্যভূষণের কাছাকাছি– তিনি স্কুলের সেক্রেটারী।)

হরি : মাষ্টার মশাই—

সত্য : হরিবাবু– আসুন– আসুন

হরি : এসব কি শুনছি মাষ্টার মশাই ?

সত্য : আপনি কি শুনেছেন– কতোটা শুনেছেন আমি তো তা জানি না।

হরি : যতোটা জানা সম্ভব– সবটাই জানি- আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়-এর স্কুল কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে যতোটা জানা দরকার– সবটাই জানি। আপনি নাকি কালকের রেপ কেসটার সাথে আপনার ছেলে মন্টু জড়িত বলে সন্দেহ করছেন?

সত্য : কে বললো আপনাকে?

হরি : দারোগার মুখে আমি সবটাই শুনেছি।

সত্য : সবটাই যখন শুনেছেন তখন এটা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন যে শুধু সন্দেহ নয়, মন্টু যে involved তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

হরি : ওগুলো কোনটাই প্রমাণ নয়, অনুমান মাত্র। ওই সব প্রমাণ দিয়ে কারো চরিত্র হনন করা যায়– কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

সত্য : শাস্তি দেওয়া যায় না?

হরি : না— যায় না। Benifit of doubt এ ছাড়া পেয়ে যাবে। তাছাড়া কোথাকার কোন haggard কাগজ কুড়ানো মেয়ে তার জন্য আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যত– আপনার পরিবারের সম্মান নষ্ট করবেন?

সত্য : haggard হোক– অসৎ হোক– এমন কি সে বেশ্যাও হয় তবু তাকে ধর্ষণ করাটা অপরাধ।

হরি : এটা ধর্ষণ নয়— এটা একটা accident.

সত্য : accident ? কে বললো আপনাকে?

হরি : এটা আমাদের synthesis. ওরা পরিবেশের শিকার। ক'টা অল্প বয়েসি সবে বড় হয়ে ওঠা ছেলে পরোপকারের ইচ্ছেতেই মেয়েটাকে নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেই সময়ই দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। অন্ধকার স্কুল ঘর– বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি– তার মাঝে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত ওমোন একটা মেয়েছেলে– ছেলেগুলোর পদস্খলন তো হতেই পারে। এতো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের দেবতারা পর্যন্ত এরকম পরিবেশের শিকার হয়ে কতো এরকম অঘটন ঘটিয়েছেন– সে তো আপনার অজানা নয়।

সত্য : আপনি ঘটনাটাকে অত্যন্ত তরল করার চেষ্টা করছেন।

হরি : ঘটনাটা তরলই। ওরা সরল ছেলে, ভালো ছেলে। ভুল করেছে– ভুল শুধরে দিতে হবে। এতো পেশাদারী দুস্কৃতির কাজ নয় যে দারোগা ডেকে এনে হাতকড়া পড়িয়ে গারদে ভরে দিতে হবে।

সত্য : তার মানে আপনি ওদের সাপোর্ট করছেন?

হরি : কখনোই নয়– ওদের যে শাস্তি দেওয়া দরকার- সেটা আমি - আপনি দেবো। আমরা ওদের তীব্র ভর্ৎসনা করবো। এ ভাবে চললে ওদের ব্যবসা যে দু'দিনে লাটে উঠবে– সেই ভয় দেখাবো। কিন্তু এখুনি শাস্তি না দিয়ে ওদের সংশোধনের একটা সুযোগ আমরা করে দেবো।

সত্য : আইনকে অস্বীকার করবেন?

হরি : নিশ্চয়ই নয়। হঠাৎ ভুল করেছে বলে ওদের গায়ে দাগী আসামীর স্ট্যাম্প না মেরে ওদের আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবো।

সত্য : অর্থাৎ shelter দেবেন?

হরি : কথাটা Political line এ এতো use হয়েছে যে - যে কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষের ভুলকে সংশোধন করার জন্যে কেউ এগিয়ে এলে সেটাকে Political shelter বলা হচ্ছে। আগেও হতো। হ্যা - আমার ইচ্ছে– আমাদের ইচ্ছে– ওদের আমরা shelter দিই। না– কোনও Political shelter নয়– আমরা ওদের shelter দেবো আপনার আমার পরিবারের স্বার্থে– সমাজের স্বার্থে– Above all আমাদের প্রিয় স্কুলের স্বার্থে।

সত্য : তারপর সমস্ত ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলে ওদের আপনারা use করবেন?

হরি : এটা একটা traditional কথা। আমাদের মনে হয়েছে এই মুহূর্তে ঘটনাটা চাপা দেওয়া দরকার। সেটা আমাদের স্বার্থে– আপনার স্বার্থে– স্কুলের স্বার্থে- so to say সমাজের স্বার্থে। ঐ ছেলেগুলোর সাজা হলে মেয়েটার কোনও লাভ হবে কি? মাঝখান থেকে ঐ মেয়েটা আর ছেলেগুলো সমাজের চোখে Black listed হয়ে যারে। সেটা কি ভালো?

সত্য : ভালো মন্দ বিচার করার দায়-দায়িত্ব কোনওটাই আমার নয় হরিবাবু। আমি সমাজ সংস্কারক নই– Political leader নই। আমি শিক্ষক। আমি জানি সমস্ত রকম অপকর্মের জন্যেই একটা সাজা হয়। পড়া না পারলে এক রকম- পরীক্ষায় নকল করলে অন্য আর এক রকম। ঠিক তেমনি দর্ষণ করলেও তার একটা সাজা হওয়া উচিৎ। আমি অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। তারা যা খুশি তাই করবে।

হরি : তাতে আপনার লাভ? বরং দেখছি তো লোকসানটাই ষোল আনা।

সত্য : লোকসান শুধু একা আমার? আপনার আগ্রহ দেখে সেটা তো মনে হচ্ছে না।

হরি : অবশ্যই লোকসান একা আপনার নয়। আমাদের সবার। সবাই মানে মন্টু আমাদের পার্টির একজন activist. হ্যা সেই পার্টির কর্মী যারা আমাকে এই ইস্কুলের সেক্রেটারী পদে বসিয়েছে। তাই আমিও তো নিজেকে দলহীন একটা নিরপেক্ষ মানুষ বলতে পারবো না। আর সেটা বলতে গেলে এই আমি একটা মুদি দোকান চালাই– যে মানুষটা ইস্কুল ফাইনালের গণ্ডি পেরুবার চেষ্টাই কোনও দিন করেনি। তাকে তো নিজের এই ইস্কুলের সেক্রেটারী পদটা সামলাতে হবে। তাই নিজের পদটা বাঁচাতে মন্টুর নামে কোনও অপপ্রচার হলে সেটা আমার পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। opposition party এটাকে encash করবে– চিৎকার করে দেশ মাথায় করবে। কিন্তু ultimately লাভ কিছুই হবে না। আপনার -আমার-এমন কি societyরও না।

সত্য : কিন্তু এতো কিছুর পরও ঐ মন্টুদের আমরা প্রশ্রয় দেবো?

হরি : প্রশ্রয় নয়– একটা সুযোগ দেবো। অনেক খারাপ ছেলেরাই– এমনকি খুনি গুণ্ডারাও সমাজে থাকে। আছে। অবশ্যই সংশোধিত হয়ে আছে। খারাপ কাজ এখন আর তারা করে না।

সত্য : এখন করে না– কিন্তু ভবিষ্যতে আবারও যে করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

হরি : গ্যারান্টি আমি– গ্যারান্টি আপনি। একটা সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ চেয়েও।সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গায়ে কালি লাগতে দেওয়া কি উচিৎ? সত্যবাবু আপনি ঘটনাটা দেখছেন একজন হেড মাষ্টারের চোখ দিয়ে। আর আমি দেখছি একজন স্কুলের সম্পাদকের চোখে, আমি কোনও ভাবেই আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গায়ে কালি লাগতে দেব না।

সত্য : আপনি আসল কথা এড়িয়ে নতুন বিতর্ক তৈরী করতে চাইছেন।

হরি : বিতর্ক আপনিই তৈরী করছেন। একজন সুস্থ চিন্তাশীল সমাজ মনস্ক মানুষকে অনেক কিছুই ভাবতে হয়— যে কাজটা সবচেয়ে বেশী লোকের উপকারে লাগবে সেটাই সব সময় করতে হয়। অবশ্যই সবার মনপসন্দ সেটা নাও হতে পারে। এ পৃথিবীতে সবাইকে খুশি করার মতো মানুষের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই।

সত্য : হরিবাবু - আমার মন, শরীর কোনটাই এখন ভালো নয়। আপনি এখন আসুন। আমি যা ভেবেছি– আমি তাই করবো। আমার মেয়ে যদি কারো দ্বারা ধর্ষিতা হতো তাদের আমি যে শাস্তি চাইতাম– মন্টুরও সেই শাস্তি হোক্ তাই আমি চাই– কারণ ঐ ধর্ষিতা মেয়েটারও বাবা মা আছে।

হরি : বেশ– আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। তবে এই স্কুলের সেক্রেটারী হিসেবে একটা কথা বলি– মনে রাখবেন একজন রেপিস্ট-এর বাবার কোনও স্কুলে প্রধান শিক্ষক হওয়ার নৈতিক অধিকার আছে কিনা সেটা অবশ্যই স্কুল কমিটিকে ভেবে দেখতে হবে। স্কুলের ভিতর একটা ধর্ষণের ঘটনা এবং সেই ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের ছেলে জড়িত এটা প্রকাশ্যে আসা কি আমাদের পক্ষে খুব স্বস্তির? আমার বা আপনার পক্ষে? বিদ্যালয়ের একজন সম্পাদক এবং একজন প্রধান শিক্ষকের পক্ষে? সবটা ভেবে দেখবেন। দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন– চলি [চলে যায়] ।

[উত্তেজিত সত্যবাবু - ছটফট করতে থাকেন। চেয়ার টেনে নিয়ে পেন কাগজ বের করে দ্রুত লিখতে থাকেন। শান্তি একগ্লাস ফলের রস নিয়ে ঢোকে] ।

শান্তি : এটা খেয়ে নাও।

সত্য : রেখে যাও—

শান্তি : আবার কি লিখতে বসলে? [শান্তির কথা শুনে বোঝা যায় সে ঘরের ভিতরে খুব কেঁদেছে– এখন সামলাবার চেষ্টা করছে] ।

সত্য : Resignation letter — স্কুল ছেড়ে দেবো।

শান্তি : তুমি স্কুল ছেড়ে দেবে?

সত্য : ছেড়ে না দিলে এ ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবার পর ওরাই আমাকে ছাড়িয়ে

দেবে। সে সুযোগে ওদের আমি দেবো না।

শান্তি : সবাই যেটা বলছে – সেটাই মেনে নাও না।

সত্য : কম্‌প্রোমাইজ?

শান্তি : নইলে ভবিষ্যতটা ভেবে দেখেছো? মনীষার বিয়ে দিতে হবে।মন্টু যতদিন না জেল থেকে ছাড়া পায় ততদিন তোমাকেই সংসারটা টানতে হবে।

সত্য : দরকারে অন্য কোথাও চলে যাবো। টিউশান করে তিনটে পেট চলবে না?

শান্তি : বেশ - তোমার যা ভালো মনে হয়– তাই করো। শুধু দেখো আমার ঐ কচি ছেলেটা যেন বিনা দোষে কঠিন শাস্তি না পায়। [মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে দ্রুত ভিতরে চলে যায়। ঘরে এসে ঢোকে সৌমেন।]

সৌ : স্যার বিরক্ত করতে আবার আসতে হলো।

সত্য : কেন– কি হলো?

সৌ : চাপ আসছে স্যার– ভীষণ চাপ আসছে।

সত্য : কেস্‌টা চেপে যাওয়ার জন্যে?

সৌ : আপাততঃ আমি যাতে কাউকে arrest না করি তার জন্যে।

সত্য : তারপর?

সৌ : ওরা বোধহয় চেষ্টা করবে ব্যাপারটা আপোসে মিটিয়ে নিতে।

সত্য : তার মানে?

সৌ : স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েত প্রধান, স্কুলের সেক্রেটারী সবাই মিলে দু পক্ষকে এক জায়গায় বসিয়ে একটা মিটমাট করে দেবে। এবার অভিযোগকারী থানায় এসে বলবে কোন ঘটনাই ঘটেনি।

সত্য : কিন্তু এক্ষেত্রে অভিযোগকারী তো আমি– আমি যদি কেস্‌টা তুলে না নিই– তুমি বাধ্য ওদের arrest করতে– caseটা continue করতে।

সৌ : কিন্তু মেয়েটাই যদি নিজেই স্টেট্‌মেন্ট দেয় যে তার উপর কোনও অত্যাচার হয়নি– তাহলে আপনি কি করবেন? মেয়েটার বিরুদ্ধে adultryর অভিযোগ আনবেন? আপনার স্কুলে গিয়ে মেয়েটা অসভ্যতা করতে গিয়েছিল বলে আমরা মেয়েটাকেই ক'দিন জেল হাজতে আটকে রাখতে পারবো। কিন্তু ছেলেগুলোর কিছু হবে না।

সত্য : ঠিক আছে। তোমার যেটুকু করার করো। না পারলে করো না। Local থানার উপরেও তো থানা আছে। আদালতও আছে। আমি আদালতে যাবো। এতো বড় অন্যায় আমি চুপচাপ কিছুতেই মেনে নেবো না।

সৌ : স্যার আপনি আমার শিক্ষাগুরু। আপনি চাইলে আমি যতোদূর সম্ভব যাবো। ওরা তো আমার চাকরীটা খেয়ে নিতে পারবে না। নিতান্তই transfer – সেটা তো মেনে নিতেই হবে। তাছাড়া আমি তো আইনের রক্ষক। আমিও তো আমার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষতঃ ঐ গরীব রিক্সাওয়ালা– সেও

তো আইনের নূন্যতম নিরাপত্তার আশা করতেই পারে।

সত্য : ঠিক এই কথাটাই আমার কাল থেকে বার বার মনে হচ্ছে। ওই নিরীহ রিক্সাওয়ালাটা– ওতো কোন দোষ করেনি। আজ আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম আমি কি চাইতাম না আমার মেয়ের উপর যারা এতো বড় অত্যাচার করলো তাদের উপযুক্ত শাস্তি? [ঘরে এসে ঢোকে নিরীহ গোবেচারা একটা মানুষ]

লোক : মাষ্টার বাবু—

সত্য : কে?— কে তুমি?

সৌ : স্যার ও হচ্ছে সেই হতভাগিনী মেয়েটার বাবা।

সত্য : ও— তা তুমি হঠাৎ ?

লোক : বাবু - ওরা বল্লো– আপনার সাথে দেখা করতে– তাই —

সত্য : কারা বললো?

লোক : ওরা—

সত্য : এরা কারা। সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোমার কথা নিশ্চই বঝতে পারবো। বলো কি বলবে?

লোক : বাবু— আমার একটা নিবেদন ছিল।

সত্য : বলো—

লোক : বাবু আমার মেয়ের যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এ নিয়ে আপনি আর পাঁচ কান করবেন না। তাহলে এ শহর ছেড়ে মেয়ে বৌ নিয়ে অন্য কোথাও আমাকে চলে যেতে হবে।

সত্য : তুমি ভয় পাচ্ছো?

লোক : বাবু– আপনারা বড়লোক। কলঙ্ক আপনাদের গায়ে লাগবে না– ধুয়ে যাবে– কিন্তু কলঙ্ক তো আমাদের মতো গরীবদের ছাড়বে না– শেষ করে দে যাবে। একটা খারাপ মেয়েরে– সমাজে কেউ ঠাঁই দেয় বলেন?

সত্য : এতো ভয় পাচ্ছো কেন? এসব অত্যাচারিত মেয়েদের জন্যে সরকারী হোম আছে– সেখানে তোমার মেয়ের জন্যে আমি ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি ভেবো না তুমি একা। তোমার পাশে আমি আছি— ঐ দারোগাবাবু আছেন। তুমি কি চাও না তোমার মেয়ের যারা সম্মানহানী করলো তাদের শাস্তি হোক।

লোক : বাবু– গরীবের আবার মান সম্মান। তাছাড়া ওতে আমার কি লাভ?

সত্য : ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিলেই বা তোমার কি লাভ?

লোক : অনেক আশা ছিল এট্টা ছোট্ট পান বিড়ির দোকান দেবো– এক কাঠা জমি পেলে বেটির জন্য একটা ঘর তুলবো। বুড়ো হচ্ছি– আর কতোদিন রিক্সা ঠেলবো বলুন তো?

সত্য : তার মানে?

লোক : ওরা আমাদের মোড়ের মাথায় নতুন দোকান ঘরগুলোর একটা দেবে বলেছে। সেলামী লাগবে না— শুধু ভাড়া– তাও দোকান চালু হলে দিলেই চলবে। যে জায়গাটায় ঘর তুলেছি– সেটার পাট্টা দিয়ে দেবে আমার মেয়ের নামে– সরকারী টাকায় সেখানে পাকা ঘর করে দেবে। আর এই নতুন জামা প্যান্টটা– মেয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তারেও এক জোড়া নতুন সালোয়ার কামিজ দেবে বলেছে।

সত্য : What?

সৌ : স্যার, আমি বলেছিলাম না, ওরা তলায় তলায় understanding করে নেবে।

সত্য : তুমি তোমার মেয়ের ইজ্জত বিক্রি করে দিলে?

লোক : আপনেরা দেন্ না মাষ্টারবাবু– নিজের ছেলেটার বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর লোভ দেখিয়ে একটা গরীব মেয়ের বাপের টাকায় ঘর তোলেন না? ফ্রিজ টিভি দিয়ে ঘর সাজান না? তাতে আপনাদের ইজ্জত যায় না? আমরা তো গরীব মানুষ– আমাদের অতো সাতপাঁচ ভাবলে চলে?

সত্য : থাক তোমার জ্ঞান শুনতে আমি চাই না। তোমার ভালোমন্দ তুমি বোঝ। আমার দরকার নেই। তবে কাজটা তুমি ভালো করলে না- বুঝলে- । সামান্য লোভের বশে কিছু অসভ্যকে প্রশ্রয় দিলে।

লোক : কি জানি বাবু– অতো শত চিন্তা আমি করিনি। তাছাড়া ওরা তো বল্লেন– ডাক্তারের রিপোর্ট বলেছে আমার মেয়েটার কোন ক্ষতি ওরা করতে পারেনি। তার আগেই আপনি পৌঁছে যাওয়ায় আমার মেয়েটা বেঁচে গেছে।

সত্য : তার মানে?

সৌ : স্যার মানেটা অত্যন্ত সহজ– যে মেডিক্যাল অফিসার মেয়েটিকে examine করেছে– সেও তো সরকারী চাকুরে। প্রমোশনের লোভ আছে– প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মোহ আছে– transfer র ভয় আছে।

সত্য : সৌমেন— আমাদের বোধহয় আর কিছুই করার রইল না।

সৌ : না– সত্যিই আর কিছুই করার রইল না।

লোক : বাবু— আমি বুঝেছি আপনি যা করেছেন তা আমার মেয়ের ভালোর জন্যেই। ওরা যা করছে তাতেও তো আমাদের ভালোই হচ্ছে। আমি ওদের করা ভালোটাই বেছে নিলাম। দারোগাবাবু ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। মাষ্টারবাবু আপনে দয়া করে কেস্টা তুলে নেন্– আমার ক্ষতি করে আপনের তো কোন লাভ নেই।

সত্য : ঠিক আছে– তুমি যাও—

লোক : ঐ কেস্টা—

সত্য : আ: তোমাকে যেতে বলছি না।

লোক : যে আজ্ঞে বাবু [নমস্কার করে চলে যায়]

সৌ : স্যার—

সত্য : সেই সকাল থেকে শুনে আসছি ঐ "ওরা"— এই ওরাটা কে সৌমেন?

সৌ : ঐ ওরা তো সব স্যার। ঐ ওরাই তো আমাদের সবাইকে চালায়। আমাকে- আপনাকে- মন্টুকে- হরিবাবুকে এমনকি ঐ রিক্সাওয়ালাকেও। রাজনীতি পাল্টায়- সরকার পাল্টায় - ওরা পাল্টায় না। ওরাই আমাদের সবাইকে ওদের মতো করে চালায়– আমাদের চলতে বাধ্য করে।

সত্য : আর ওদের বিরুদ্ধে যদি দাঁড়াতে চাই– তুমি - আমি?

সৌ : আমরা তখন একা– একক। ছক্কা - পাঞ্জার খেলা থেকে যে ভাবে কোর্ট থেকে ধাক্কা মেরে খেলুড়ের ঘুঁটিগুলোকে বার করে দেয়— ঠিক তেমনি ভাবেই আমাকে আপনাকে বার করে দেবে। আপনি ধর্ষণকারীর পিতা বলে বরখাস্ত হবেন— আমি ঘুঁষখোর রাজকর্মচারী এই অপরাধে বদলী হবো।

সত্য : হায় ঈশ্বর- তবে কি সত্যের কোন জায়গা নেই আজ— এ সমাজে?

সৌ : জানি না স্যার। শুধু জানি এর মাঝেও আমাদের টিকে থাকতে হবে। ঐ ওদের সামনে যতোটা পারি মানুষের ভালো করার চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ এখনও আমি আপনি নিজেদের মানুষ বলে ভাবি- ভাবতে চাই।

[শান্তিলতা এসে ঢোকে]

শান্তি : হ্যা-গো - ফলের রসটা এখনও খেলে না? [সত্য নিরুত্তর] কি গো ফলের রসটা খেয়ে নাও-এভাবে শরীর কি টিকবে?

সত্য : না- শান্তিলতা -না নিজেকে টেকাতেই হবে। কি বলো সৌমেন?

সৌ : স্যার—

সত্য : সৌমেন বাইরে থেকে মনে হবে সব ঠিক আছে। এই সমাজ-এই সংসার কতো সুন্দর- কতো সুশৃঙ্খল । অথচ একদল অশুভ কীট কুড়ে -কুড়ে ভিতর থেকে সব ফোঁপরা করে দিচ্ছে। দুটো হাত - দুটো পা মিলেমিশে এক হয়ে চারটে পা হয়ে যাচ্ছে। এই চোরাবালির উপর দাঁড়াতে গেলে আমাকে আরো শক্ত হতে হবে- হতেই হবে। দাও সৌমেন তুমিই আমার হাতে গ্লাসটা তুলে দাও। তুমিই তো আমার আশার আলো- আমার মতো অন্ধের যষ্ঠি।

[সৌমেন আস্তে আস্তে ফলের রসের গ্লাসটা নিয়ে সত্যভূষণ বাবুর দিকে এগিয়ে দেয়। শান্তিলতা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। নেপথ্য আবহ। পর্দা নেমে আসে]

অনুপ্রেরণা - ছোটগল্প : **দুলেন্দু ভৌমিক**

লেখক : **শিবংকর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ ।**

Writer : **Shibankar Chakraborty, popular playright, West Bengal.**

বেরনার্দার সংসার

ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা

(দি হাউজ অব বেরনার্দা আলবা)

অনুবাদ : **আদিত্য সেন**

ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার জন্ম ৫ই জুন ১৮৯৮ সালে আন্দনুসিয়ার শহর গ্রানাডার কাছে এক গ্রামে। লোরকা ছিলেন একজন বিপ্লবী ও বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণেই স্পেনে ১৯৩১-এর পরে রিপাবলিকান সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আর তখন থেকে গৃহযুদ্ধ। সেই সময় ফ্রাঙ্কো সরকারের ভাড়াটে সৈন্যরা লোরকাকে গুলি করে হত্যা করে ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৬ সালে। তখন তাঁর মোটে ৩৬ বছর বয়স। বিংশ শতাব্দীর মুষ্টিমেয় যে ক'জন কবি ও নাট্যকার বিশ্বকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যান লোরকা তাঁদের অন্যতম। 'রক্ত-বিয়ে' নামের কাব্যনাটকটি ১৯৩৩ সালে অভিনীত হলে দারুণ সাড়া পড়ে যায়। তখন তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বেরনার্দার সংসার (দি হাউজ অব বেরনার্দা আলবা) তাঁর লেখা শেষ নাটক (১৯৩৬)। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও সামাজিক বাধা-নিষেধের অন্ধকারে নারীরা যখন নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাদের এক মর্মান্তিক জীবনের ছবি এঁকেছেন লোরকা। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি গোটা স্পানিস রক্ষণশীল সমাজের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর শেষ চারটি নাটক অক্সফোর্ড ওয়ার্ল্ডস ক্লাসিকস্ বলে গণ্য। এ বছর সারা পৃথিবীতে লোরকার ১২৫তম জন্মদিন পালিত হচ্ছে।

—সম্পাদক

চরিত্র পরিচয়

বেরনার্দা (বয়স ৬০), মারিয়া খোসেফা (বেরনার্দর মা, বয়স ৮০), আঙ্গুসতিয়াস (বেরনার্দার মেয়ে, বয়স ৩৯), মাগদালেনা (বেরনার্দার মেয়ে, বয়স ৩০), আমেলিয়া (বেরনার্দার মেয়ে বয়স ২৭), মার্তিরিও (বেরনার্দার মেয়ে, বয়স ২৪), আদেলা (বেরনার্দার মেয়ে, বয়স ২০), পোন্সিয়া (বয়স ৬০), পরিচারিকা (বয়স ৫০), প্রুদেন্সিয়া (বয়স ৫০), ভিখারী মহিলা, ছোট্ট মেয়ে। মহিলা-১, মহিলা-২, মহিলা ৩, মহিলা-৪, রুদালিয়া মহিলাবৃন্দ

প্রথম দৃশ্য

বেরনার্দা বাড়ির ভেতরটা ধবল সাদা চাদরের মতো যেন ঝকঝক করছে। মঞ্চে ছায়াঘন এক সুগভীর নিস্তব্ধতা। যখন পর্দা উঠবে তখন দেখা যাবে মঞ্চে

কেউ নেই। ধীর গম্ভীর পরিচারিকা এল।

পরিচারিকা : ওই যে ঘন্টা বজছে মনে হচ্ছে যেন আমার মাথার মধ্যে বাজছে।

পোল্সিয়া : মসলা দেওয়া সসেজ হাতে পাউরুটি খেতে খেতে। দু-ঘন্টার বেশি সময় ধরে তারা গোঙ্গানি শুরু করেছে। চারপাশের গ্রাম থেকে ধর্মজাকরাএসেছেন। প্রথম বন্দনাগীত শেষ হবার আগেই মাগদালেনা অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরিচারিকা : ওর বাবার চলে যাওয়ায় ও-ই সবচেয়ে কষ্ট পাবে।

পোল্সিয়া : বাব তো ওকেই শুধু ভালোবাসত। আহ্ ভগবানকে ধন্যবাদ আমরা কিছুক্ষণের জন্য অন্তত একটু রেহাই পেয়েছি। কিছু একটা পাব বলে আমি ফিরে এলাম।

পরিচারিকা : যদি বেরনার্দা তোমাকে দেখতে পেত!

পোল্সিয়া : তিনি নিজে খাচ্ছেন না বলে তিনি চান আমরাও সব অনাহারে মরি। সবার ওপরে কর্তৃত্ব করবেন। আমি তাই ওকে আজ বোকা বানিয়েছি। ওর সসেজ-বয়ামে হাত দিয়েছে।

পরিচারিকা : (এক বিষাদ অপেক্ষার সুরে) আমার ছোট্ট মেয়েটার জন্য কিছু খেতে দিতে পার, পোল্সিয়া?

পোল্সিয়া : নিজেই তুলে নাও না, এক মুঠো ছোলা তুলে নাও। আজ তিনি তাকিয়ে দেখবেন না।

কণ্ঠস্বর : (ভেতরে) বেরনার্দা!

পোল্সিয়া : ওই সেই বৃদ্ধ মহিলা। তিনি বেরুতে পারবেন না ঠিক বলছ তো?

পরিচারিকা : আমি দরজায় দুটো করে তালা লাগিয়েছি।

পোল্সিয়া : তোমাকে দরজার আগলও দিতে হবে। ওর অঙুলগুলো পাঁচটা রামচাবির মতো।

কণ্ঠস্বর : বেরনার্দা!

পোল্সিয়া : (চিৎকার করে) ওই সে আসছে। (পরিচারিকাকে) সব পরিষ্কার করে রাখো। সব কিছু ঝকঝকে তকতকে না দেখলে আমার মাথার যেটুকু চুল আছে বেরনার্দা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেও তুলে নেবে।

পরিচারিকা : কী মহিলা বাপ রে!

পোল্সিয়া : ওর চারপাশে যারা থাকে সবার ওপরে লাঠি ঘোরায়। তোমার বুকের ওপর বসে তোমাকে দিয়ে সারা বছর কাজ করাবে।

পরিচারিকা : ডিশ মাজতে মাজতে আমার হাতে দেখো রক্ত উঠে গেল।

পোল্সিয়া : তিনি থাকবেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মহিলা। বেচারা স্বামী চিরশান্তি আদায় করে নিয়েছে। (ঘন্টাধ্বনি শেষ হল)

পরিচারিকা : সব আত্মীয়স্বজন কি এসে গেছে?

পোপ্পিয়া : মহিলাদের সবাই। স্বামীর ঘরের লোকেরা একে ঘৃণা করে। তারা মৃতদেহ দেখতে এসেছিল এবং শুধু একটু প্রার্থনা করে চলে গেছে।

পরিচারিকা : যথেষ্ট চেয়ার আছে তো?

পোপ্পিয়া : অনেক আছে। তাছাড়া মেঝেতেও বসতে পারে। বেরনার্দার বাবা মারা যাবার পরে লোকেদের আর কেউ এ বাড়িতে আসে না।

পরিচারিকা : তিনি তোমার সঙ্গে তো ভালো ব্যবহারই করেছেন।

পোপ্পিয়া : তার ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছি। রাতের পর রাত সেবা করেছি। আশেপাশের প্রতিবেশিরা কানায়ঘুষোয় কী বলে খিড়কি দিয়ে উঁকি মেরে সেসব গোপনীয় কথা, তার কর্ণগোচর করেছি। এমন কোনো গোপনীয় কথা নেই যা আমরা দুজনে জানি না। এখন নরকে গিয়ে জ্বলেপুড়ে ঝলসে মরুক।

পরিচারিকা : পোপ্পিয়া!

পোপ্পিয়া : দেখো, আমি একটা দারুণ কুকুর, যখন বলে আমি ঘেউ ঘেউ করে উঠি। যখন ভিখারিদের পেছনে ছুটতে বলে আমি খ্যাঁক করে কামড়ে ধরি। তারই জমিতে আমার ছেলেরা কাজ করছে। দু'জনেরই বিয়ে থা হয়ে গেছে। কিন্তু একদিন বুঝবে আমার সেদিন আর নেই।

পরিচারিকা : তারপর ...

পোপ্পিয়া : তারপর একটা ঘরে দরজা দিয়ে ওর সঙ্গে বসব আর সারা বছর ধরে সমানে ওর গায়ে থুতু ছিটাবো। পাঁচ পাঁচটি মেয়ের সে যে মা, পাঁচজন কুৎসিৎ মেয়ে। বড়জন আঙ্গুসতিয়াস ছাড়া। সে তার প্রথম স্বামীর মেয়ে। সে তবুও কিছুটা টাকা পয়সা পেয়েছে। বাকিরা সব অনেক ঝালর আর গুচ্ছের ফ্রিলওয়ালা পেটিকোর্ট আর সুতির কাপড়চোপড়, পাউরুটি আর আঙুর— এই তো এরা সব উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

পরিচারিকা : ওরা যা পেয়েছে আমি যদি সেগুলো পেতাম!

পোপ্পিয়া : আমাদের আছে জান, শুধু এই হাত দুটি আর ভগবানের পৃথিবীতে মস্ত বড় থাকবার একটা গর্ত।

পরিচারিকা : আমাদের মতো লোকেদের, যাদের কিছু নেই তাদের এরকম সব জমি দেয়।

পোপ্পিয়া : (আলমারি দেখিয়ে) আলমারির কাচটা বেশ নোংরা হয়ে গেছে দেখছি।

পরিচারিকা : সাবান বা ডিশ ধোবার ন্যাকড়া বা অন্যকিছু দিলেও ওসব ময়লা যাবে না। (ঘন্টা বাজতে থাকল)

পোপ্পিয়া : শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এল। আমি শুনতে ওখানে যাচ্ছি। ধর্মযাজকরা যেভাবে

গান করেন শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমার মায়ের শ্রাদ্ধে তিনি গান গেয়েছিলেন— ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর আত্মার শান্তি হোক। উনি যখন 'আমেন' বলে উঠলেন, মনে হচ্ছিল যেন একটা নেকড়ে চার্চের মধ্যে ঢুকে পড়ল। (তাঁকে নকল করে চিৎকার করে উঠে) আ-মে-ন। (গলায় খকখক কাশি শুরু হয়ে গেল)।

পরিচারিকা : তোমার কণ্ঠনালীতে ভীষণ চোট পড়ছে!

পোল্লিয়া : আমার শীঘ্রই অন্য কিছুতে চোট পড়বে!

(সে একটু হাসি দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে গেল। পরিচারিকা তখন পরিষ্কার করার কাজে আবার মন দিল। ওদিকে ঘন্টা বেজে চলেছে)

পরিচারিকা : (ঘন্টা সুরধ্বনি অনুসরণ করে) ডিঙ্গ, ডিঙ্গ, ডঙ্গ। ডিঙ্গ, ডিঙ্গ, ডঙ্গ। ভগবানের আশীর্বাদ পড়ুক কপালে।

ভিখারি মহিলা :(তার ছোট মেয়ে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ) সবই ঈশ্বরের কৃপা।

পরিচারিকা : ডিঙ্গ, ডিঙ্গ, ডঙ্গ। আরও অনেকদিন পরে আমরাও ও পথের যাত্রী হব। ডিঙ্গ, ডিঙ্গ, ডঙ্গ ।

ভিখারি মহিলা : (উচ্চকণ্ঠে, একটু রেগেমেগে) সবই ঈশ্বরের কৃপা।

পরিচারিকা : (ক্রুদ্ধভাবে) চিরকালই, চিরকাল ধরেই যেন তা হয়।

ভি মহিলা : আমি ফেলে দেওয়া খাবার নিতে এসেছি। (ঘন্টা বাজা বন্ধ হল)

পরিচারিকা : আমি আজ ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে যাব।

ভি মহিলা : এই দেখো, তোমাকে দেখবার একটা মানুষ আছে। আমরা একা, আমি আর আমার ছোট্ট মেয়ে।

পরিচারিকা : কুকুরেরাও একা, কিন্তু তারা ঠিক খাবার যোগাড় করে খায়।

ভি মহিলা : এরা তো সব সময় আমাকেই দেয়।

পরিচারিকা : এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এখানে আসতে তোমাকে কে অনুমতি দিয়েছে? (তারা চলে যায়। ও আবার পরিষ্কার করার কাজে লিপ্ত হয়।)

(মঞ্চের পেছন থেকে রুদালিয়া মহিলাবৃন্দ, দুজন করে একে একে আসতে শুরু করল।

পরিচারিকা : (বিলাপ ক্রন্দন শুরু করে) আহাঃ অ্যানতোনিও মারিয়া বেনাভিদেস, এই চার দেওয়ালের মধ্যে আর আপনি থাকবেন না, যত আপনার চাকর-বাকর আছে তার মধ্যে আমিই আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। (মাথার চুল ছিঁড়ে) আপনি চলে যাবার পরে আমার কি আর বেঁচে থাকা উচিৎ?

(রুদালিয়া মহিলাবৃন্দের উপস্থিতিতে মঞ্চ ভরে গেল, তখন এল বেরনার্দা ও তার পাঁচজন মেয়ে। বেরনার্দা একটা লাঠির ওপরে ভর দিয়ে ছিল)

বেরনার্দা : (পরিচারিকাকে) শান্ত হও।
পরিচারিকা : (কাঁদতে কাঁদতে) বেরনার্দা!
বেরনার্দা : অত কান্নাকাটি চলবে না, বেশি কাজ চাই। এখন এখান থেকে চলে যাও। এটা তোমার জায়গা নয়। (পরিচারিকা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল) গরীব যারা তারা সব এক একটা জন্তু! তুমি হয়তো ভাবতে পার এরা নানা উপাদানে গড়া এক একটা জীব।
মহিলা -১ : গরীবরা এইভাবেই শোক প্রকাশ করে।
বেরনার্দা : তাদের হাত ভরে ছোলা দিয়ে দাও, তাহলে তারা সব কিছু ভুলে যাবে।
মেয়েটা : (ভয়ার্ত স্বরে) না খেলে আমাদের জীবন বাঁচে না।
বেরনার্দা : তোমার যা বয়েস বড়দের সামনে তোমর মুখ বুজে থাকা উচিৎ।
মহিলা-১ : এই মেয়ে চুপ করে থাক।
বেরনার্দা : কোনটা কী আমি কখনও কাউকে জানতে দিইনি। তোমরা সব বসে বড়। (এরা সবাই বসে। অল্প নিস্তব্ধতা)
বেরনার্দা : (উচ্চ কণ্ঠে) মাগদালেনা, কেঁদো না। যদি কাঁদতে চাও বিছানায় গিয়ে কাঁদো। কথাটা কানে গেল কি?
মহিলা-২ : (বেরনার্দাকে) তুমি কি ধান-ভানা শুরু করেছো?
বেরনার্দা : লেমোনেড কি তৈরি আছে?
পোন্সিয়া : (বড় একটা ট্রে নিয়ে ছোট ছোট সাদা রঙের মগ নিয়ে এসে সবার হাতে হাতে তুলে দেয়) হ্যাঁ, বেরনার্দা।
বেরনার্দা : ছেলেদেরও দিও।
পোন্সিয়া : তারা উঠোনে বসে খাচ্ছে।
বেরনার্দা : যে পথে তারা এসেছিল সেই পথ দিয়েই যেন তারা বেরিয়ে যায়।
মেয়েটা : (আঙ্গুসতিয়াসকে) পেপে.এল. রোমানো চার্চের লোকেদের সঙ্গে এসেছিল।
আঙ্গুসতিয়াস: হ্যাঁ, সে এসেছিল।
বেরনার্দা : তার মা এসেছিল। সে মাকে দেখল। সে পেপেকে দেখেনি আর আমিও দেখিনি। আমি বলছি সেখানে কারা কারা ছিল। দারায়ালির সেই বিধবাটা এসেছিল। বসেছিল তোমার পিসিমার পাশে। আমরা এদের সব দেখেছি।
মহিলা-২ : (জনান্তিকে আস্তে করে) ও তো একজন বজ্জাত মহিলা, সত্যিই পাপিষ্ঠা।
বেরনার্দা : চার্চে একটিমাত্র পুরুষ আছে যার দিকে মেয়েরা তাকাতে পারে। তিনি হলেন ধর্মযাজক, কারণ তিনি ঘাগরা পরে থাকেন। তারা যখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন তখন তাঁরা হয়তো প্যান্ট পরা সুখটা খোঁজেন।
মহিলা-১ : (হলকা সুরে) হতাশাগ্রস্ত বৃদ্ধ টিকটিকি!

পোন্সিয়া : (বিড়বিড় করে) অদ্ভুত জোচ্চোর, চাইতে চাইতে চুলোয় গেছে সব।

বেরনার্দা : (সশব্দে লাঠিটা মেঝে ঠুকে) ঈশ্বরের গুণগান করো।
(সবাই, একজন আরেকজনের কাছে গিয়ে) আমরা চিরকাল যেন গুণগান করি আর যেন তাঁর আশীর্বাদ পাই। সেই চাবি নিয়ে যাকে দিয়ে সব তালা খোলা যায়, আর সেই হাত যে হাত সব দরজা বন্ধ করে।

সবাই : যেন সবাই শান্তিতে থাকেন। আমেন

বেরনার্দা : যারা আশীর্বাদে ধন্য মানুষ/ আর যারা জমিতে ফসল ফলায়।

সবাই : যেন সবাই শান্তিতে থাকেন। আমেন

বেরনার্দা : আমাদের সবাই যারা দরিদ্র-সেবার সঙ্গে যুক্ত।

সবাই : যেন সবাই শান্তিতে থাকেন। আমেন

বেরনার্দা : সেই সেবক অ্যানতেনিও মারিয়া বেনাভিদেসকে শান্তি-স্বস্তি দাও আর তাকে তোমার পবিত্র ঐশ্বরিক মুকুট পরিয়ে দাও।

সবাই : আমেন (তাই হোক)।

পোন্সিয়া : (একটা মানিব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করে) ছেলেদের তরফে এই মানিব্যাগ এসেছে, তার জন্য প্রার্থনা করতে।

বেরনার্দা : ওদের ধন্যবাদ দিয়ে গ্লাসে করে ব্র্যান্ডি দাও।

মেয়েটা : (মাগদালেনা, যার চোখ থেকে জল পড়ছে) চুপ।
(বেরনার্দো তার লাঠি ঠুকল মেঝেতে। সব মহিলারা প্রস্থান করল। তারা চলে গেলে সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল)- সবাই তোমরা তোমদের গুহায় ফিরে এসো। যা তোমরা আজকে দেখেছ তা সব ভুলে যাও।

পোন্সিয়া : তোমার আর অভিযোগ করার কিছু নেই। গোটা গ্রাম থেকে লোকজন এসেছিল।

বেরনার্দা : হ্যাঁ, তাদের দুর্গন্ধে, তেলচিটে কাপড়জামায় ও কথার বিষে তারা আমার বাড়িটাকে ভরে দিয়ে গেছে।

আমেলিয়া: মা, এখানে কথা বোলো না।

বেরনার্দা : নদীহীন এই নারকীয় জায়গার কথা এইভাবেই বলতে হয়—

পোন্সিয়া : চেয়ে দেখো, মেঝেটার ওরা কী দশা করে গেছে!

বেরনার্দা : তোমার মনে হতে পারে একদল ছাগল এখানে তচনছ করে গেছে। (পোন্সিয়া মেঝেটা পরিষ্কার করতে থাকে) এই মেয়ে, আমাকে একটা পাখা দাও।

আদেলা : এই নাও। (ও মাকে একটা গোলমতো পাখা দেয় যেটা লাল, সবুজ ফুলে সুন্দর করে সাজানো)

বেরনার্দা : (পাখাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে) একজন বিধবাকে কি এরকম একটা পাখা দিতে হয়? আমাকে একটা কালো পাখা দাও। বাবার স্মৃতিতে তোমার একটু

শ্রদ্ধা থাকা উচিত।

মাতিরিও : মা, আমারটা নাও।

বেরনার্দা : তোমার লাগবে না?

মাতিরিও : আমার গরম লাগছে না।

বেরনার্দা : ঠিক আছে, তুমি বরং আর একটা জোগাড় করে নাও কারণ তোমার দরকার হতে পারে। আমাদের সবার সামনে আট বছর যাবৎ শোকপালনের কাল পড়ে আছে। এই শোকাবহ সময়কাল যতদিন চলবে, রাস্তার কোন হাওয়া এ-বাড়িতে ঢুকবে না। এমন একটা ব্যবস্থা হবে যেন আমরা দরজা-জানালায় দেয়াল তুলে দিয়েছি। আমার বাবার বাড়িতে এভাবে শোক পালণ করা হয়েছিল তার আগে আমার ঠাকুরদার বাড়িতেও। নববিবাহিতদের জন্য পোষাক-আশাক সূঁচ-সূতো দিয়ে চিকেনের কাজ করে তোমরা সময়টা কাটাতে পার।

মাগদালেনা: আমি ওসব করতে পারব না।

আদেলা : তুই যদি সেগুলিতে এমব্রজারি করতে না চাস, সেগুলি এমনি সাদামাটা হয়ে থেকে যাবে। তোরটা দেখতে ভালো লাগবে।

মাগদালেনা: আমি নিজেরটাও করব না, তোদেরটাও না। বিয়ে আমার হবে না আমি জানি। আমি বরং মিলে বস্তা বয়ে নিয়ে যেতে রাজি আছি কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন কোন কাজ নেই শুধু বসে থাকা— ওটা আমার দ্বারা হবে না।

বেরনার্দা : মেয়ে হলে এছাড়া আর কিছু জোটে না।

মাগদালেনা: মেয়েদের তাহলে যেন মরণ হয়।

বেরনার্দা : যা আমি আদেশ করছি সেটাই এ বাড়িতে চলবে। তুমি যে বাবার কাছে ছুটে যাবে তা তো আর হবার নয়। মেয়েদের জন্য থাকবে শুধু সূঁচ ও সুতো আর ছেলেদের জন্য একটা খচ্চর ও একটা চাবুক। সমাজের যে স্তরে মানুষের জন্ম সেইভাবেই মানুষকে চলতে হবে। (আদেলার প্রস্থান)

কণ্ঠধ্বনি : বেরনার্দা, আমাকে ছেড়ে দাও!

বেরনার্দা : (চিৎকার করে) ওকে এখন ছেড়ে দিতে পার। (পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : ওকে ধরে রাখতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে। আশি বছর বয়স অথচ একটা ওক গাছের মতো শক্তি।

বেরনার্দা : এটা আমাদের বংশের ধারা। আমার ঠাকুমারও ওলকম ছিল।

পরিচারিকা : যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছে তখন একাধিকবার একটা খালি বস্তা দিয়ে এর মুখ চেপে রাখতে হয়েছে। কারণ ও তখন চিৎকার করে বলতে চেয়েছিল, আর কিছু না পার ডিশের ধোয়া একটু জল এনে দাও আর এক দলা কুকুরের মাংস। ও চিৎকার করে বলতে চাইছে ওটাই তো তুমি আমাকে দাও।

মাতিরিও : ওটা একটা বজ্জাত বৃদ্ধা মহিলা।

বেরনার্দা : ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য ওকে আঙ্গিনায় ছেড়ে দাও।

পরিচারিকা : ও তার একটি আংটি আর বেগুনী-রক্তাভ দামী পাথরের কানের দুলটি বাক্স থেকে বার করে বলতে লাগল, আমি বিয়ে করব। (মেয়েরা হেসে ওঠে)

বেরনার্দা : ওর কাছে চলে গিয়ে দেখো, ও যেন কোনোমতে কুয়োর ধারে কাছে যেতে না পারে। (পরিচারিকার প্রস্থান)

মার্তিরিও : এখন আমরা যাই, পরিস্কার হয়ে আসি।

বেরনার্দা : হ্যাঁ, তাই করো, তবে দেখো, মাথার স্কার্ফ যেন জলে ফেলো না। (আদেলার প্রবেশ) আঙ্গুসতিয়াস কোথায়?

আদেলা : (ব্যঙ্গাত্মক স্বরে) আমি ওকে দেখলাম গেটের ফাঁকফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ছেলেরা এক্ষুনি চলে গেল।

বেরনার্দা : আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কি করছিলে?

আদেলা : আমি দেখতে গিয়েছিলাম মুরগীগুলো ডিম পাড়ল কিনা।

বেরনার্দা : যারা অন্ত্যেষ্ঠি-অনুষ্ঠানে এসেছিল তারা নিশ্চয় এতক্ষণে চলে গেছে।

আদেলা : (ধারালো গলায়) কয়েকজন চারদিকে এদিক ওদিকে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

বেরনার্দা : (সক্রোধে) আঙ্গুসতিয়াস, আঙ্গুসতিয়াস!

আঙ্গুসতিয়াস : (প্রবেশ করে) হ্যাঁ মা, কি বলছ?

বেরনার্দা : ওভাবে তাকিয়েছিলে কেন? কাকে দেখছিলে?

আঙ্গুসতিয়াস : কাউকে না।

বেরনার্দা : তোমার মতো অভিজাত বংশের একটি মেয়ে তার বাবার অন্ত্যেষ্ঠি-অনুষ্ঠানের দিনে একজন পুরুষের পেছনে ছুটে ধাওয়া করা কি শোভা পায়? কাকে তুমি দেখছিলে? (স্তব্ধতা)

আঙ্গুসতিয়াস : আমি...

বেরনার্দা : হ্যাঁ, তুমি!

আঙ্গুসতিয়াস : কাউকে নয়।

বেরনার্দা : (লাঠি হাতে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে) ধাপ্পাবাজ, একটা চিনির ঢেলা, জোচ্চোর কোথাকার! (আঘাত করে)

পোন্সিয়া : (বেরনার্দার কাছে ছুটে গিয়ে) বেরনার্দা না, শান্ত হও!
(বেরনার্দা নিজেকে শান্ত করে। আঙ্গুসতিয়াস কাঁদতে থাকে)

বেরনার্দা : যাও, সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। (মেয়েদের প্রস্থান)

পোন্সিয়া : এরা কী করতে যাচ্ছে তা না বুঝেই করেছে। ও ভুল করেছে এটা ঠিক। ও উঠোনের দিকে গুটিগুটি সরে যাচ্ছে দেখে আমি বাস্তবিক আঘাত পেয়েছিলাম।

তারপর ও জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পুরুষদের কথাবার্তা শুনতে লাগল, এবং যা সাধারণত হয়, ওসব শোনার যোগ্য কথা নয়।

বেরনার্দা : এরা এজন্য অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে এসে থাকে! (কৌতুহল বশে) ওরা কী বিষয়ে কথা বলছিল?

পোন্সিয়া : ওরা পাকা লা তাসেতার বিষয়ে কথা বলছিল। কাল রাতে তারা স্বামীকে একটা গোয়ালঘরে বেঁধে রাখল মেয়েটাকে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে জলপাই বনের মাথায় নিয়ে গেল।

বেরনার্দা : মেয়েটা এ ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়েছে।

পোন্সিয়া : ও, সে কোনো আপত্তি করেনি। ওরা বলাবলি করছিল, মেয়েটা তার নগ্ন বুক দুটি বার করে চলছিল আর ম্যাক্সমিলিয়ানো তাকে এমনভাবে ধরেছিল যেন গিটার বাজাচ্ছে। ভয়ঙ্কর!

বেরনার্দা : তারপর কী হল?

পোন্সিয়া : কী ঘটতে পারে তুমি আশা করো। যখন তারা ফিরে এল তখন সকাল হয়ে গেছে। পাকা লা রোসেটা তার চুল পিঠে এলিয়ে দিয়েছে আর মাথায় শোভা পাচ্ছে মুকুটের মতো একগুচ্ছ ফুল!

বেরনার্দা : এই গ্রামাঞ্চলে ওই একমাত্র বদ মেয়ে মানুষ।

পোন্সিয়া : তার কারণ ও এখানকার মেয়ে নয়। অনেক দূর থেকে ও এসেছে। আর যেসব পুরুষ তার সঙ্গে এখানে এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরাও অন্য এলাকার লোক। এখানকার কোনো পুরুষ এরকম কাজ করবে না।

বেরনার্দা : না, কিন্তু তারা এসব দেখতে ভালোবাসে এবং এসব কথা বলতেও।

পোন্সিয়া : অন্য আরও অনেক জিনিস নিয়ে ওরা কথা বলছিল।

বেরনার্দা : (ভয়ার্ত চোখে চেয়ে) কী বিষয়ে?

পোন্সিয়া : যেসব জিনিস আমি বলতে বার বার লজ্জা পাচ্ছি,

বেরনার্দা : আর আমার মেয়ে সেসব কথা শুনেছে?

পোন্সিয়া : নিশ্চয় সে শুনেছে।

বেরনার্দা : ও ঠিক ওর পিসিদের মতো, ফ্যাকাশে এবং তেলচিটে ভাব। ভাল ব্যবহার আয়ত্ব করতে এবং সামান্যতম সুসভ্য আত্মসংযম দেখাতে কত যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আর কী পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়, তা যদি জানত।

পোন্সিয়া : তোমার মেয়েদের ভালো মন্দ বিচার করার বয়স হয়েছে। ওরা এমন কিছু করে না যা তোমাকে ভাবনায় ফেলে। আঙ্গুসতিয়াসের বয়স বোধ হয় ত্রিশ পেরিয়ে গেল।

বেরনার্দা : ঠিক করে বলতে গেলে ৩৯ বছরে পড়ল।

পোন্সিয়া : তবেই ভেবে দেখো, এখনও ওর কোন প্রেমিক জুটল না।
বেরনার্দা : (ক্রোধান্বিত হয়ে) না, এদের কারুর কখনও প্রেমিকের দরকার হয়নি। প্রেমিক ছাড়াও এদের বেশ চলে যাবে।
পোন্সিয়া : আমি তোমার মেজাজ খারাপ করতে চাইনি।
বেরনার্দা : এখানে একশো মাইলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিনা এদের মর্যাদার সমকক্ষ হতে পারে। এই অঞ্চলের পুরুষেরা সেরকম বংশজাত নয়। একজন কৃষকের হাতে আমার মেয়েদের তুলে দিই এটা কি তুমি চাও?
পোন্সিয়া : তোমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিল।
বেরনার্দা : ও, তাই বলো, বাজারে মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া, কেমন?
পোন্সিয়া : না, বেরনার্দা, আমি বলছিলাম, পরিবর্তনের জন্যে।
বেরনার্দা : তোমার ওই জ্বালামুখী মুখটা বন্ধ করবে!
পোন্সিয়া : তোমার সঙ্গে কথা বলা যায় না। আমরা পরস্পরের সঙ্গে কি খোলাখুলি কথা বলতে পারি না? পারি কি পারি না?
বেরনার্দা : না, পারি না। তুমি আমার কাজের মানুষ, আর তোমাকে আমি টাকা দিই। এটুকুই যা। (পরিচারিকার প্রবেশ)
পরিচারিকা : দন আর তুরো এসেছেন। তিনি উত্তরাধিকারের আইনসম্মত দায়ভার নির্দিষ্ট করতে এসেছেন।
বেরনার্দা : (পরিচারিকাকে) তুমি বাইরে গিয়ে চুনকাম করা শুরু করো। (পোন্সিয়াকে) যারা মারা গেছে তাদের সব কাপড়জামা তুমি গুছিয়ে আলমারিতে রাখো
পোন্সিয়া : কিছু কিছু জিনিস আমরা তো অন্যকে দিয়ে দিতে পারি।
বেরনার্দা : কোনোমতে নয়। একটা বোতাম পর্যন্ত নয়।
(লাঠিতে ভর দিয়ে বার্নাডা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। শ্যেনদৃষ্টিতে চাকর-বাকরদের একবার দেখে। ওরাও তার চোখের আড়ালে চলে যায়। (আমেলিয়া ও মার্তিরিওর প্রবেশ)
আমেলিয়া : তুই ওষুধ খেয়েছিস?
মার্তিরিও : আমার ওসবে বিশ্বাস নেই।
আমেলিয়া: খেয়েছিস কিনা আগে বল।
মার্তিরিও : ওসবে আমার বিশ্বাস নেই, তবে নিয়মিত ঘড়ির কাঁটা দেখে খাই।
আমেলিয়া: নতুন সেই ডাক্তার আসার পরে তোকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত লাগছে।
মার্তিরিও : আমি কিছু তফাৎ বুঝি না।
আমেলিয়া : তুই লক্ষ করেছিস? আদেলাইদা অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে আসেনি।

মার্তিরিও : ও যে আসতে পারবে না আমি জানতাম।

আমেলিয়া: বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুতবদ্ধ হওয়া ভালো কিংবা ও পথে না যাওয়াই ভালো—

মার্তিরিও : দুটোই একই রকম।

আমেলিয়া: মুশকিলটা কোথায় জানিস, এইসব লজ্জাজনক কেলেঙ্কারি যারা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের নিয়ে। এরা কখনও আমাদের ছেড়ে কথা বলে না।

মার্তিরিও : ও মাকে ভীষণ ভয় করে। ওর বাবার জীবনের প্রকৃত কাহিনী মা-ই একমাত্র জানে।

আমেলিয়া: ওই শয়তান পাষণ্ডটাকে জেলে আটকে রাখা হল না কেন?

মার্তিরিও : তার কারণ হল এই যে পুরুষেরা একজন অন্য জনের দোষ সব সময় ঢাকা দিয়ে চলে এবং তাই কোনো কিছু প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমেলিয়া: কিন্তু এর কোনটার জন্য আদেলাইদাকে দোষ দেওয়া যায় না।

মার্তিরিও : না, কিন্তু জানিস ইতিহাস ঘুরে ফিরে আসে।

আমেলিয়া : কী ভয়ানক অবস্থা !

মার্তিরিও : তবে পুরুষের প্রতি মন না দেওয়াই শ্রেয়। আমি ছোটবেলা থেকেই পুরুষদের বড় ভয় করে চলি। ভগবান আমাকে দুর্বল বানিয়েছেন এবং কুৎসিৎ, তাই তারা আমার ধারে কাছেও আসেনি।

আমেলিয়া: ও কথা বলিস না। এনরিক্ হিউম্যানস্ তোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

মার্তিরিও : ওটা নেহাৎ একটা গুজব। একবার আমি রাতের পোষাক পরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কারণ সে তার মেয়েকে দিয়ে— যে ওর সঙ্গে জমিতে কাজ করত— তাকে দিয়ে বলে পাঠাল আমার কাছ আসবে। সকাল হয়ে গেল তাও এল না । এসব হল স্রেফ কথার কথা। যে অন্য একটা বিয়ে করল, আমার চেয়ে যার বেশি টাকা।

আমেলিয়া: কী যাচ্ছেতাই সব পাপ।

মার্তিরিও : ভালো দেখতে কিনা ওসবে ওদের কিছু এসে যায়না। ওদের কাছ যার দাম বেশি তা হল জমি, এক পাল ষাঁড় আর একটি ছোট্ট বাধ্যের স্ত্রী যে কিনা ওদের খাবার তৈরি করে দেবে।

আমেলিয়া: (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) ও হো! (মাগদালেনার প্রবেশ)

মাগদালেনা: তোরা কী করছিস?

মার্তিরিও : কিছুই না। আমরা শুধু এখানেই আছি। এটুকুই।

আমেলিয়া: তুই কোথায় গিয়েছিলি?

মাগদালেনা: সারা বাড়ি ঘুরে এলাম।

আমেলিয়া: (মাগদালেনাকে) তোর জুতোর লেস খুলে গেছে,

ত্বাগদালেনা : তাই বুঝি?

আমেলিয়া: ঠিক করে বাঁধ, নয়তো পায়ে লেগে উল্টে পড়বি।

মাগদালেনা : একজন মানুষের খোরাক কমবে।

মার্তিরিও : আদেলা কোথায়?

মাগদালেনা : বেশ তাহলে শোন! ও সবুজ রঙের ড্রেসটা পরেছে যেটা ওর জন্মদিনের জন্য বানিয়েছিল। সেটা পরে বাইরের চত্বরে গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকল, 'মুরগী, মুরগী, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো।' আমি হেসে উঠেছিলাম।

আমেলিয়া: মা ভাগ্যিস ওকে দেখেনি!

মাগদালেনা : বেচারা আমাদের সবাকার ছোট্ট বোন। ওর এখনও স্বপ্ন বেঁচে আছে। ওকে খুশি করতে আমি অনেক কিছু দিতে রাজী।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। আঙ্গুসতিয়াস কয়েকটি তোয়ালে নিয়ে স্টেজের এদিক থেকে ওদিকে যাবে)

আঙ্গুসতিয়াস : এখন ক'টা বাজে?

আমেলিয়া: এখন বারোটার ঘন্টাধ্বনি শোনা যাবে।

মাগদালেনা : (জেনেশুনে) তোরা কি শুনেছিস? (আঙ্গুসতিয়াসের কথাটা উল্লেখ করে বলা)

আমেলিয়া: না।

মাগদালেনা : আহা, তা বলে ফেল না।

মার্তিরিও : তোরা কি বলছিলি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাগদালেনা : আমি যতটুকু জানি তার চেয়ে তোরা দুজনে অনেক বেশি জানিস। সব সময় ভেড়ার মতো দুটো মাথা এক করে রয়েছিস। যা তোরা জানিস সব গোপন রাখ। আমি পেপে এল রোমানোর কথা বলছি।

মার্তিরিও : ওহো।

মাগদালেনা : (ওকে নকল করে) ওহো, সমস্ত গ্রাম এখন জেনে গেছে যে পেপে এল রোমানো আঙ্গুসতিয়াসকে বিয়ে করতে চায়। গত রাতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওর হয়ে কথা বলতে কাউকে নিশ্চয় শীঘ্রই পাঠবে।

মার্তিরিও : আমি ভীষণ খুশি। ও খুব চমৎকার মানুষ।

আমেলিয়া: আমিও খুব খুশি। আঙ্গুসতিয়াসের অনেক কিছু দেবার ক্ষমতা আছে।

মাগদালেনা: তোমরা দুজনে কেউ খুশি নও দেখছি।

মার্তিরিও : মাগদালেনা, সত্যি নাকি।

মাগদালেনা : আঙ্গুসতিয়াসের মেয়ে হিসেবে তার গুণের জন্য যদি সে আকৃষ্ট হত তাহলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু ওকে আকর্ষণ করেছে তো ওর টাকা পয়সা।

মার্তিরিও : ওভাবে কথা বলিস না। আশা যে করে না তার কাছেই বাদ্য খোলে।

আমেলিয়া: এর থেকে নিস্তার নেই, ও ঠিক বলেছে। আঙ্গুসতিয়াসের পিতার অর্থ ও পেয়েছে। এ বাড়িতে ও একমাত্র ঐশ্বর্যশালী মেয়ে। আমাদের যখন বাবা মারা গেছে তখন এই সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হবে। তাই তারা ওর কাছে আসছে।

মাগদালেনা: পেপে এল রোমানোর বয়স হবে পঁচিশ আর মাইলের পর মাইল গিয়ে দেখবে এর মত পাত্র হয় না। আমেলিয়া বা ছোট আদেলার—যাদের বয়স মাত্র কুড়ি বছর, তোদের পেছনে যদি রোমানো ছোটে সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাড়ির সবচেয়ে দুঃখী মেয়ের কাছে যাবে যে কিনা ঘ্যানঘ্যানে সুরে কথা বলে, ঠিক ওর বাপের মতো।

মার্তিরিও : সেটাই হয়তো সে চায়।

মাগদানেলা: কি ভণ্ড তুই।

মার্তিরিও : ঈশ্বর যেন আমাদের রক্ষা করেন। (আদেলার প্রবেশ)

মাগদালেনা: মুরগীগুলো তোর দিকে ভালোভাবে তাকিয়েছিল তো?

আমেলিয়া: মা যদি তোকে দেখে তোর চুলগুলি উ পড়ে নেবে।

আদেলা : ওই পোষাকটাকে নিয়ে আমার যে কত স্বপ্ন জড়িয়ে আছে।

মার্তিরিও : হ্যাঁ, সত্যি এটা একটা দারুণ সুন্দর পোষাক।

আদেলা : এটা আমাকে এত মানায়। এটাই সবচেয়ে সুন্দর।

মাগদালেনা : ওই মুরগীরা এটা নিয়ে কি ভাবছে শুনি?

আদেলা : কতগুলি কীট আমাকে উপহার দিয়েছে যারা আমার পায়ের রক্ত চুষবে। (হাসি)

মার্তিরিও : যা তুই করতে পারিস ওগুলোতে কালো রঙ লাগিয়ে নে।

মাগদালেনা: রোমানোর সঙ্গে বিয়ের সময় তুই ওগুলো আঙ্গুসতিয়াসকে উপহার দিস।

আদেলা : (চাপা আবেগের সঙ্গে) কিন্তু পেপে এল রোমানো তো...

আমেলিয়া: তুই শুনিসনি?

আদেলা : না

মাগদালেনা: যাইহোক, এখন তুই জেনেছিস।

আদেলা : তার জন্যই কি অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের পরে ও চলে গিয়েছিল সোজা গেটের কাছে। (একটু থেমে) ওই মানুষটাও নিশ্চয় তখন এসেছিল।

মাগদালেনা: আসবে না কেন? ও কেন করবে না?

মার্তিরিও : আদেলা তুই কী ভাবছিস? (একটু থেমে)

আদেলা : আমি এটাই ভাবছি এই শোকার্ত সময়টা আমার জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে এল, যখন এটা আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

মাগদালেনা: অচিরেই তুই এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবি।

আদেলা : (রাগে-দুঃখে চোখে জল) না, না, আমি এতে কখনও অভ্যস্ত হতে পারব না। ঘরের মধ্যে আমি বন্দী হয়ে কিছুতেই থাকতে রাজি নই। আমি বাইরে যেতে চাই।

(আদেলা সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। একটু পরে সেও তার ঘরের দিকে দ্রুত চলে যায়। বেরনার্দা ও পোন্সিয়ার প্রবেশ)

বেরনার্দা : আইনী ব্যাপার-স্যাপার চুলোয় যাক গে।

পোন্সিয়া : আঙ্গুসতিয়াসের জন্য কত-না টাকা!

বেরনার্দা : হ্যাঁ, তাই।

পোন্সিয়া : আর অন্যদের জন্য অনেক কম।

বেরনার্দা : তুমি এর মধ্যে কথাটা আমাকে তিনবার বলেছ আর আমি তোমাকে জেনেশুনে উত্তর দিইনি। হ্যাঁ, খুবই কম, অনেক কম। বার বার আমাকে সেকথা বোলো না। (আঙ্গুসতিয়াসের প্রবেশ, তার মুখে অতিরিক্ত পাউডার লাগোনো)

বেরনার্দা : আঙ্গুসতিয়াস!

আঙ্গুসতিয়াস: বলো মা।

বেরনার্দা : মুখে পাউডার মাখার সাহস হল তোমার কোথা থেকে? বাবার যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছে তখনও সেই দিনটায়ও তোমার মুখ ধোবার সাহস হয়েছিল।

আঙ্গুসতিয়াস: তিনি আমার বাবা নন। আমার বাবা অনেকদিন আগে চলে ঘেছেন। তিনি এক সময়ে বেঁচে ছিলেন তুমি কি ভুলে গেলে?

বেরনার্দা : তোমার বোনেদের যিনি বাবা তার কাছ থেকেই তুমি অনেক বেশি পেয়েছ। তোমার নিজস্ব বাবার চেয়েও অনেক বেশি।

আঙ্গুসতিয়াস: তা এখনও প্রমাণ হওয়া বাকি।

বেরনার্দা : একটা সাধারণ ভদ্রতা, সাধারণ শ্রদ্ধা থাকলে এটা করা যায় না।

আঙ্গুসতিয়াস: মা, আমাকে ছেড়ে দাও।

বেরনার্দা : তোমাকে ছেড়ে দেব? তোমার মুখের পাউডার কি আমি কখনও মুছে দিয়েছি। মোলায়েম সুরে ভণ্ডামি করছ! বেহায়া! এক্কেবারে তোমার পিসির মতো। (তার রুমাল দিয়ে বিশ্রিভাবে মুখের পাউডার মুছে দেয়) এখন বেরিয়ে যাও।

পোন্সিয়া : বেরনার্দা, এত কঠিন হয়ো না।

বেরনার্দা : আমার মা হয়তো পাগল হয়ে গেছে কিন্তু আমার এখনও স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। আমি খুব ভালোভাবে জানি আমি কী করছি।

(অন্যান্য মেয়েদের প্রবেশ)

মাগদালেনা: কী হচ্ছে কি?

বেরনার্দা : কিছুই হচ্ছে না।

মাগদালেনা: আঙ্গুসতিয়াস, যদি তোরা উইল নিয়ে কথা কাটাকাটি করে থাকিস, তবে আমি বলি তুই আমাদের সবার চেয়ে বেশি টাকা পয়সা পেয়েছিস।

আঙ্গুসতিয়াস: আমি বলছি তোর মুখ বন্ধ রাখ।

বেরনার্দা : (লাঠি দিয়ে মেঝে ঠুকে) তোমরা কেউ স্বপ্নেও ভেবো না আমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু পাবে। আমি এ বাড়িতে যতদিন আছি, যা আমি বলব, আমার জন্য, তোমদের জন্য সেটাই হবে, অন্য কিছু নয়।

(উচ্চস্বর শোনা গেল। মারিয়া খোসেফা, বেরনার্দার মার প্রবেশ। ভীষণ বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু মাথাটা ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, বুকটাকেও)

মারিয়া : বেরনার্দা, আমার চুল কই? আমার কোন জিনিস তোমাদের আমি নিতে দেব না। বেরনার্দা আমার মুক্তের কণ্ঠ-হারটা দাও।

বেরনার্দা : (পরিচারিকাকে) এখানে আসতে দিলে কেন?

পরিচারিকা: (ভয়ে কেঁপে উঠে) আমাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এল।

মারিয়া : আমি বিয়ে করব বলে ছাড়িয়ে নিলাম। ছাড়িয়ে নিলাম কারণ সমুদ্র-পারের খুব সুন্দর দেখতে একটি মানুষকে আমি বিয়ে করব। এখানকার কোনো পুরুষেরই মেয়েদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই।

বেরনার্দা : মা, চুপ।

মারিয়া : না, না আমি চুপ করব না। আমি এই অবিবাহিত মেয়েদের আর দেখতে চাই না, এরা দেখি বিয়ে করার জন্য মরে যাচ্ছে, দুঃখে যন্ত্রণায় এদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। বেরনার্দা, আমি একটা সত্যিকারের মানুষ চাই যাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে পারি।

বেরনার্দা : ওকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখো।

মারিয়া : বেরনার্দা, আমকে যেতে দাও।

পরিচারিকা মারিয়া খোসেফাকে জোর করে ধরে ফেলে)

বেরনার্দা : তোমরা ওকে সবাই সাহায্য করো। (সবাই মিলে বৃদ্ধকে চেপে ধরে)

মারিয়া : বেরনার্দা আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। ওই যে সমুদ্রের ধারে, ওখানে আমি বিয়ে করতে চাই, ওই সমুদ্রে ধারে। (পর্দা পড়ে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেরনার্দার বাড়ির ভেতরের সাদা রঙের একটা ঘর। আদেলা ছাড়া বেরনার্দার সব মেয়েরাই একটা নিচু চেয়ারে বসে সেলাই করছে। পোর্সিয়া ওদের সঙ্গে রয়েছে।

আঙ্গুসতিয়াস : এই নিয়ে তিনটে চাদর কেটে দিলাম

মাগদালেনা : (ডাক দিয়ে) আদেলা, তুই আসছিস তো?

আমেলিয়া : আমার মনে হয় ও শুয়ে আছে।

পোন্সিয়া : ওই মেয়েটার কী যেন একটা গণ্ডগোল আছে। ওকে দেখলে মনে হয় ভীষণ অস্থির, যেন ওর বুকের মাঝখানে একটা টিকটিকি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

মার্তিরিও : ওই মেয়েটার যা গণ্ডগোল, ঠিক একই গণ্ডগোল আমাদের সবার মধ্যে।

মাগদালেনা : আঙ্গুসতিয়াস ছাড়া বাকি সবাই একই রকম

আঙ্গুসতিয়াস: আমি বেশ ভালো আছি। কারুর যদি সেটা ভালো না লাগে তবে সে জাহান্নামে যাক।

মাগদালেনা : এটা অবশ্য ঠিক তোর অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব আর সর্বক্ষণ তোর অনবদ্য ব্যবহার প্রত্যেকের মনে ধরে।

আঙ্গুসতিয়াস : সৌভাগ্যবশত, এই নরক থেকে শীঘ্রই আমি বেরিয়ে যেতে পারব।

মাগদালেনা : তুই বেরুতে পারলি না, এও তো হতে পারে।

মার্তিরিও : আয়, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমরা না হয় আলোচনা করি।

আঙ্গুসতিয়াস : আর একটা কথা বলছি তোকে। তুই হয়তো তোর মানিব্যাগে কিছু সোনা ভরে নিয়ে নিশ্চয় এগিয়ে যেতে পারিস। কিন্তু কালো হরিণ চোখ কখনই হবে না।

মাগদালেনা : আমি এক কান দিয়ে তোর কথা শুনছি আর অন্য কান দিয়ে বার করে দিচ্ছি।

আমেলিয়া : (পোন্সিয়াকে) তুমি কি বাইরের দরজাটা একটু খুলে দেবে, তাহলে আমরা হাওয়া পেতে পারি। (পোন্সিয়া দরজা খুলে দেয়)

মার্তিরিও : গরমের চোটে কাল রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি।

আমেলিয়া : আমিও ঘুমাতে পারি নি।

মাগদালেনা : আমি একটু ঠাণ্ডা হব বলে উঠে পড়লাম। আকাশে তখন কালো মেঘের ঝড় নেমে আসছে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন পড়ল।

পোন্সিয়া : রাত একটার সময়েও উঠে দেখলাম পৃথিবীটা তখনও শীতল হয়নি। আঙ্গুসতিয়াস তখনও জানলায় দাঁড়িয়ে পেপের সঙ্গে কথা বলছে।

মাগদালেনা : (শ্লেষাত্মকভাবে) অত দেরিতে ! ও কটার সময় গেছে?

আঙ্গুসতিয়াস : মাগদালেনা, তাকে যদি তুই দেখে থাকিস, তাহলে জিজ্ঞাসা করছিস কেন?

আমেলিয়া : মনে হল, ও যেন দেড়টার সময় চলে গেল।

আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ, ঠিক ওই সময়টায় চলে যায়। কিন্তু জানলি কি করে?

আমেলিয়া : ওকে কাশতে শুনলাম, পরে ওর ঘোড়ার চলে যাওয়ার শব্দ কানে এল।

পোন্সিয়া : কিন্তু আমি তো শুনলাম ও প্রায় চারটের আগে নড়েনি।

আঙ্গুসতিয়াস : তাহলে হয়তো অন্য কেউ ছিল।
পোন্সিয়া : আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও-ই হবে।
মার্তিরিও : আমারও মনে হয় তাই।
মাগদালেনা : বড় অদ্ভুত তো!
পোন্সিয়া : আঙ্গুসতিয়াস, ও যখন জানলায়প্রথমবার তোমার কাছে এসে দাঁড়াল,কী কথা বলেছিল তোমার সঙ্গে?
আঙ্গুসতিয়াস : সেরকম কিছু না। যদি ভাবতে পার কী বলেছিল- তবে বলেই ফেল না।
মার্তিরিও : এটা খুব অদ্ভুত লাগে ভাবতে দুজন মানুষ, যারা আগে কাউকে দেখেনি, তারা জানলার গরাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।
আঙ্গুসতিয়াস : কি জানিস, এসব জিনিস আমাকে অত ভাবায় না।
আমেলিয়া : এ ব্যাপারটা আমার কিরকম যেন লাগে।
আঙ্গুসতিয়াস : না, ওভাবে ব্যাপারটাকে নিস না। কারণ কোনো মানুষ যখন জানলার গরাদে এসে দাঁড়ায়, তার আগে অনেক লেনদেন ঘটে যায়। এটা সে নিয়ে আসে, ওটা সে নিয়ে যায়- এসব জেনে ধরতে পারে সবার কাছে ও গ্রহণযোগ্য।
মার্তিরিও : এসব তো ঠিক আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে ওর কাছে জিজ্ঞেস করতেই হবে।
আঙ্গুসতিয়াস: তো অবশ্যই।
আমেলিয়া : (কৌতুহল দেখিয়ে) তবে বল, ও তোকে কী জিজ্ঞাসা করেছিল?
আঙ্গুসতিয়াস: সেরকম বিশেষ কিছু না। 'তুমি জান, তোমার ব্যাপারে আমি আগ্রহান্বিত। আমি একজন খুব ভালো ও বিনম্র স্ত্রী চাই। তুমি যদি রাজী থাক তবে তোমাকেই আমার উপযুক্ত মনে করি।'
আমেলিয়া : এসব আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়।
আঙ্গুসতিয়াস : আমারও অস্বস্তি বোধ হয়। তবে এগুলোর মধ্য দিয়েই তো যেতে হবে।
পোন্সিয়া : আর কিছু বলেছে?
আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ, বেশি কথা-ও-ই বলেছে।
মার্তিরিও : আর তুই কি বলেছিস?
আঙ্গুসতিয়াস : আমার তো বলার কিছু নেই? জীবনে রাত্রিবেলা এই প্রথম আমি একজন পুরুষের সম্মুখীন হলাম।
মাগদালেনা : আর ওরকম একজন জমকালো মানুষের সঙ্গে!
আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ, দেখতে কুৎসিৎ মোটেই নয়।
পোন্সিয়া : ওটা তারাই পারে যাদের পেটে বিদ্যা আছে এবং জানে হাত নেড়েচেড়ে কীভাবে কথা বলতে হয় এবং কী বলতে হয়। আমার স্বামী এভারিস্ত দি ফিনচেস্ যখন প্রথমবার আমার জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল... হা-হা-হা।

আমেলিয়া : কি ঘটেছিল তখন?

পোপ্পিয়া : সেদিন ছিল অন্ধকার রাত্রি। আমি দেখলাম সে আসছে। সে আমার কাছে এসে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা', 'শুভসন্ধ্যা'। তারপর আধ ঘন্টা ধরে আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না। সারা গায়ে আমার ঘাম ঝরছিল। তারপর এভারিস্ত আরও কাছে, আরও কাছে আসতে লাগল, মনে হতে লাগল যে জানলার দরজা দিয়ে নিজেকে ছোট করে বার করে আনবে। ওভাবে এসে খুব মোলায়েম স্বরে বলল, 'আরও কাছে এসো, তোমাকে স্পর্শ করতে দাও।'
(সবাই হেসে উঠল। আমেলিয়া এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল। একটা দরজার দিকে সে তাকিয়ে রইল।)

আমেলিয়া : হা ঈশ্বর, আমি ভেবেছিলাম মা বুঝি এল।

মাগদালেনা: তাহলে আমাদের সবাকার গলা টিপে ধরত। (ওরা হাসতে থাকে)

আমেলিয়া : শশশ্! আমাদের শুনতে পারে।

পোপ্পিয়া : তারপরে মানুষটা নিজেকে সামলে নিয়েছিল। অন্য কিছু হাতে নেবার আগে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একই কাজ করে গেছে। ছোট ছোট এক ধরনের পাখির জন্ম দেওয়ার কাজ। তোমরা যারা অবিবাহিত মেয়ে তোমাদের জানা উচিত, বিয়ে হবার পনেরো দিনের মধ্যে মানুষটা বিছানা ছেড়ে টেবিলে বসে এবং টেবিল ছেড়ে সোজা চলে যায় শুঁড়িখানায়। মহিলারা যদি ও-পথে যেতে না পারে তবে সারা জীবন কোণায় বসে তাদের কেঁদে মরতে হয়।

আমেলিয়া : তুমি কি সেই পথে যেতে পেরেছ?

পোপ্পিয়া : আমি ওকে বশে রাখতে পেরেছিলাম ঠিকই।

মার্তিরিও : কখনও কখনও তুমি ওকে ধরে পিটোতে এটা কি সত্যি?

পোপ্পিয়া : হ্যাঁ, একবার তো খোঁচা দিয়ে ওর চোখ দুটো প্রায় বার করে ফেলেছিলাম।

পোপ্পিয়া : জানো তোমার মার সঙ্গে আমি একই স্কুলে পড়েছি। একদিন স্বামী আমাকে কী একটা বলেছে আর আমি রেগে গিয়ে নুড়ি দিয়ে তার বেশ কিছু পাখি মেরে ফেলেছিলাম।

মাগদালেনা : (ডাক দিয়ে) আমার প্রিয় আদেলা, এগুলো শুনতে দারুণ লাগছে। তুই কিন্তু সব মিস করছিস। (একটু পরে মাগদালেনার প্রস্থান)

আমেলিয়া : আদেলা!

মাগদালেনা : আমি গিয়ে ওকে ধরে আনছি।

পোপ্পিয়া : ওই মেয়েটা খুব একটা ভালো নেই।

মার্তিরিও : এটা ঠিক, রাতেও একটু ঘুমাতে পারে কি না সন্দেহ,

পোপ্পিয়া : তাহলে ও কী করে?

মার্তিরিও : কী করে তা আমি কি করে জানব?

পোন্সিয়া : আমি যতটুকু জানি তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি জান, ওর ঘরের পাশে তোমার ঘর।

আঙ্গুসতিয়াস : হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

আমেলিয়া : বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলিস না।

আঙ্গুসতিয়াস : ওর চোখ দুটো দেখলেই তো বুঝতে পারবি। একটা পাগল মহিলার মতো ওর চেহারা হয়ে উঠছে।

মার্তিরিও : পাগলামির কথাটা কখনও বলিস না। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে পাগল কথাটা কখনও উচ্চারণ করা চলবে না।

(মাগদালেনা ও আদেলার প্রবেশ)

মাগদালেনা : তাহলে তুই ঘুমুচ্ছিলি না?

আদেলা : (জোর দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে, আমাকে একা থাকতে দে। আমি ঘুমোই না ঘুমোই তাতে তোদের কি এসে যায়? আমার এই দেহ আমার নিজের, আমি এটা নিয়ে যা ইচ্ছে, তাই করব।

মার্তিরিও : তা নিয়েই আমাদের দুঃশ্চিন্তা।

আদেলা : দুঃশ্চিন্তা কিংবা কৌতুহল?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : বেরনার্দা, তোমাকে ডাকছে। লেসের লোকটা এসেছে।

(ওরা চলে যায়। মার্তিরিও আদেলার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকায়)

আদেলা : আমাকে চোখ রাঙ্গাস না। তুই যদি চাস তোকে আমি আমার তারুণ্যের উজ্জ্বল চোখ দুটি উপহার দিতে পারি। (মার্তিরিওর প্রস্থান)

পোন্সিয়া : আদেলা, ও তোমার এমন একজন বোন যে তোমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে।

আদেলা : যেখানে আমি যাব সেখানেই ও গিয়ে উপস্থিত হয়। আসলে, ওর একটা ভুল ধারণা, আমি যাকে পছন্দ করব তাকেই আমি আমার দেহটি উপভোগ করতে দেব।

পোন্সিয়া : (অর্থবহ কিন্তু হালকা চালে) তুমি নিশ্চয় এসব কথা পেপে এল রোমানোকে বলতে চেয়েছ, নয় কি?

আদেলা : (স্তম্ভিত হয়ে) তুমি এমন কথা বলছ কেন?

পোন্সিয়া : আদেলা, আমি যা বলেছি তুমি নিশ্চয় শুনেছ?

আদেলা : চুপ করে থাকো।

পোন্সিয়া : (বেশ উচ্চকণ্ঠে) তুমি কি মনে করো আমি কিছু লক্ষ করিনি?

আদেলা : অত উঁচু স্বরে কথা বোলো না।

পোন্সিয়া : ওসব চিন্তার গলা টিপে মেরে ফেলো।

আদেলা : তুমি কতটুকু জান?

পোন্সিয়া : আমার মতো বৃদ্ধ মানুষেরা দেয়াল ভেদ করে দেখতে পায়। রাতে উঠে তুমি কোথায় যাও?

আদেলা : তুমি অন্ধ নও এটাই বড় দুঃখের।

পোন্সিয়া : কী যে তুমি করতে চাও তা আমার পক্ষে অনুমান করা শক্ত হয়ে পড়ে। তোমার বোনের সঙ্গে দ্বিতীয় দিন যখন পেপে কথা বলতে এল, তখন তুমি আলো জ্বালিয়ে একেবারে নগ্ন হয়ে খোলা জানলায় কেন এসে দাঁড়িয়েছিলে?

আদেলা : এটা সত্য নয়।

পোন্সিয়া : একজন বাচ্চার মতো ব্যবহার বন্ধ করো। তোমার বোনকে যা ও পারে একা করতে দাও। তবে যদি তুমি পেপে এল রোমানোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে থাক, তাহলে নিজেকে সংযত করো। (আদেলা কেঁদে ফেলে) কে বলেছে ওর তুমি স্ত্রী হতে পারবে না? তোমার বোন আঙ্গুসতিয়াসের শরীর অতটা মজবুত নয়। প্রথম বাচ্চা দিতে গিয়েই ও শেষ হয়ে যাবে। তারা সবচেয়ে অল্প বয়সী ও সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে নেয় এবং তুমি তো সুন্দরী আছই। সেই আশা পোষণ করে বেঁচে থাক আর ওকে তোমার মন থেকে এখন একেবারে মুছে ফেল। কিন্তু দৈব-শক্তির যা নিয়ম তার বিরুদ্ধে যেও না।

আদেলা : একবারে চুপ।

পোন্সিয়া : আমি চুপ করে থাকব না।

আদেলা : ওহে নষ্টের গোড়া, বিশ্বাসঘাতক ও বজ্জাত কুত্তি, তোমার নিজের কাজে মন দাও তো।

পোন্সিয়া : তোমার ল্যাজ হয়ে আমি থাকব, ঠিক যেন ছায়ার মতো।

আদেলা : বাড়ি ঘরদোর পরিস্কার করে রাতে শোবার আগে তোমার যারা আত্মীয়স্বজন গত হয়েছেন, তাদের জন্য প্রার্থনায় না বসে তুমি বীজবপকের মতো অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছ। দেখতে চাইছ পুরুষ আর মহিলার মধ্যে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে।

পোন্সিয়া : আমি তীক্ষ্ম নজর রাখি যাতে কিনা এই ঘর পেরিয়ে যাবার সময় কেউ থুতু ছিটিয়ে না যায়।

আদেলা : হঠাৎ দেখছি ওই বোনের প্রতি তোমার দরদ উথলে উঠছে।

পোন্সিয়া : আমি তোমাদের কাউকেই বেশি দেরি দেখাতে পারি না। কিন্তু আমি সম্ভ্রান্ত

একটা বাড়িতে থাকতে চাই। এই বৃদ্ধ বয়সে কালিমালিপ্ত হতে চাই না।

আদেলা : তোমার পরামর্শ তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও। এখন কারুকে পরামর্শ দেবার ব্যাপারে বড় বেশি দিরে করে ফেলেছো। তুমি এ বাড়ির শুধু একজন চাকরানী । তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আমার পায়ে আর মুখে যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, সে আগুন মা ও নেভাতে পারবে না।

পোন্সিয়া : আমাকে তুমি প্রতিরোধ কোরো না, আদেলা, আমাকে তুমি অমান্য কোরো না। আমি ত্রাস সঞ্চার করতে পারি।

আদেলা : এই আঙিনার দেয়ালগুলিতে চারপাশে তুমি চার হাজার দবদবে আলো জ্বেলে দিতে পার। কিন্তু যা হবার তা হবেই, কেউ তা রুখতে পারে না।

পোন্সিয়া : সত্যি তোমার কাছে ওই মানুষটা এত বড় হয়ে গেল!

আদেলা : ভীষণভাবে। আমি যখন ওর চোখের দিকে তাকাই আমি অনুভব করি, আমি আস্তে আস্তে তার যেন রক্ত পান করছি।

পোন্সিয়া : তোমার কথা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আদেলা : তাহলে তুমি আমার কথা ঠিক শুনবে। তোমাকে আগে আমি ভয় করতাম। এখন আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

(আঙ্গুসতিয়াসের প্রবেশ)

আঙ্গুতিয়াস : একইরকম তক্কাতক্কি এখনও চলছে?

পোন্সিয়া : তুমি কী আশা করতে পার বলো? এই গরমে ও চায় আমি দোকানে গিয়ে এক অভাবনীয় জিনিস নিয়ে আসি। সেটা যে কী তা ঈশ্বরও জানে না।

আঙ্গুতিয়াস : তুমি কি আমার জন্য সেই আতরের বোতল এনে দিয়েছিলে?

পোন্সিয়া : সবচেয়ে দামী জিনিস এনেছি তোমার জন্য। আর পাউডার। তোমার ঘরের টেবিলে ওগুলো রেখে এসেছি। (আঙ্গুসতিয়াসের প্রস্থান)

আদেলা : এক্কেবারে মুখ বন্ধ, বুঝলে!

পোন্সিয়া : আমরা সেটা ভেবে দেখব। (মার্তিরিও, আমেলিয়া আর মাগদালেনার প্রবেশ)

মাগদালেনা : (আদেলাকে) তুই লেসগুলি দেখেছিস?

আমেলিয়া : আঙ্গুসতিয়াসের বিয়ের কাপড়চোপড় যে পছন্দ করে এনেছি তা এত সুন্দর যে কী বলব।

আদেলা : (মার্তিরিওকে - যে হাতে ধরে আছে কতগুলি লেস) এগুলি কিসের জন্য?

মার্তিরিও : এগুলি আমার, আমার পেটিকোটের জন্য।

আদেলা : (বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে) তোর একটা রসিকতাবোধ থাকা দরকার।

মার্তিরিও : (সুনির্দিষ্টভাবে) এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। নিজেকে অন্য কারুর সামনে

তুলে ধরার তাগিদ আমার নেই।

পোন্সিয়া : পেটিকোট পরা কোন মেয়েকে কেউ দেখতে চায় না।

মার্তিরিও : (নির্দিষ্টভাবে আদেলার দিকে তাকিয়ে) কখনও কখনও তারা দেখে। আমি যদি বড়লোক হতাম তবে সবসময় হল্যাণ্ডের সবচেয়ে চমৎকার লাইলেন দেওয়া আণ্ডারওয়ার পরতাম। আমার পক্ষে এটাই এতদিন আনন্দের ব্যাপার ছিল, যা এখন নেই।

পোন্সিয়া : বাচ্চাদের জন্য ফিতেওয়ালা টুপি বানাতে বা গাউন পরাবার কাজে লেস খুবই কাজে লাগে। টাকা পয়সার অভাবে আমি তা কখনও ব্যবহার করতে পারিনি। এখন দেখব আঙ্গুসতিয়াস যদি ওর নিজের জন্য ব্যবহার করে। তাছাড়া ওর যদি বাচ্চা হয়, তখন তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমরা শুধু কাপড়জামাই সেলাই করতে থাকবে।

মাগদালেনা : সেলাই করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

আমেলিয়া : অন্য ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে কত কম সময় লাগে। ওই তো গলির দিকের মেয়েদের দেখো। মাত্র চারজন ছিঁচকাদুনে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

পোন্সিয়া : তোমাদের চেয়ে তারা অনেক ভালো আছে। তারা অন্তত হাসতে জানে।

মার্তিরিও : তাহলে তুমি বরং ওখানে গিয়ে ওদের কাজ করো।

পোন্সিয়া : না, আমি আমার বিছানা এখানেই পেতেছি।

(চারিদিকের মোট দেয়াল ভেদ করে ছোট ঘন্টার শব্দ ভেসে আসে)

মাগদালেনা : পুরুষেরা কাজে ফিরে যাচ্ছে।

পোন্সিয়া : এখন ঠিক তিনটে বাজার ঘন্টা শুনলাম।

মার্তিরিও : এই এত গরমেও!

আদেলা : (বসে গিয়ে) আহা, ওদের মতো আমরা যদি মাঠে যেতে পারতাম।

মাগদালেনা: (বসার পর) আলাদা শ্রেণীর আলাদা কাজ, তা ওদের করতেই হবে।

মার্তিরিও : (বসতে বসতে) এটাই হয়ে আসছে!

পোন্সিয়া : বছরের এই সময়টাও মাঠে যেতে যত আনন্দ, আর কোনো সময় তা নয়। গতকাল ফসল কাটিয়েরা এসেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সুন্দর দেখতে ছেলে।

মাগদালেনা: এ বছর এরা কোথা থেকে এল?

পোন্সিয়া : অনেক দূর থেকে। সেই পাহাড়ের ওদিক থেকে। খুব মজার। আমি আলাদা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলাম। যা ছেলেটি মেয়েটির সঙ্গে রফা করল, তার চোখ দুটি সবুজ রঙের আর শরীরটা ঠিক যেন কাটা শস্যের এক আঁটি গম।

আমেলিয়া : মেয়ে হয়ে জন্মানো মানে সবচেয়ে বড় অভিশাপ।
মাগদালেনা: আমাদের চোখ দুটোও যেন আমাদের নয়।
(দূর থেকে গান ভেসে আসছে, আরো প্রখর হচ্ছে)
পোন্সিয়া : ওরা গাইছে, কী সুন্দর যে ওরা গায়।
কোরাস : ফসল কাটতে চলেছে ওরা।
হঠাৎ হৃদয় হারালো বুঝি এই
সোনালী দিনে এইটুকুই বুঝি- বা চাওয়া
আমেলিয়া : এই দারুণ গরম কি তাদের গায়ে লাগে না?
মার্তিরিও : উজ্জ্বল রোদ্দুরে তারা শস্য কাটে।
আদেলা : আমি একজন গম কাটাইয়া হতে চাই। তাহলে আমি যখন-তখন যাওয়া আসা করতে পারব।
মার্তিরিও : তুই কী এমন পেয়েছিস যা ভুলতে চাস?
আদেলা : আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দুঃখ আছে।
মার্তিরিও : (বিপুল গভীরতায়) ঠিক তাই, আমাদের সবার।
পোন্সিয়া : শাশশ্। চুপ!
কোরাস (দূর থেকে ভেসে আসছে)
হাট করে একেবারে খুলে দাও সহ
এইতো সেই সুসময়, যার অপেক্ষায় ছিল গ্রামের মেয়েরা।
গাঁয়ের মধ্যে নেমে আসুক গুচ্ছু গুচ্ছ ফুলের বৃষ্টি
মাথার টুপিতে ভরে থাক বর্ণময় গোলাপ
পোন্সিয়া : কী সুন্দর গান!
মার্তিরিও : (স্মৃতিবেদনায়)
হাট করে একেবারে খুলে দাও সব
এই তো সেই সুসময়, যার অপেক্ষায় ছিল গ্রামের মেয়েরা।
গাঁয়ের মধ্যে নেমে আসুক গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের বৃষ্টি
মাথার টুপিতে ভরে থাক বর্ণময় গোলাপ
আদেলা : গাঁয়ের মধ্যে নেমে আসুক গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের বৃষ্টি
মাথার টুপিতে ভরে থাক বর্ণময় গোলাপ
(গান দূরে মিলিয়ে যায়)
পোন্সিয়া : এখন ওরা এদিক থেকে ঘুরে অন্যদিকে যাচ্ছে।
আদেলা : আমার ঘরের জানলা দিয়ে চলো এদের দেখি গিয়ে;
পোন্সিয়া : দেখো যেন দরজাটা বেশি খুলে দিও না, কারা দেখছে তা জানার জন্য হয়তো

ওরা দরজাটাকে ধাক্কা দিতে পারে।

আদেলা : (তার কাছে গিয়ে) কী হল তোর:

মার্তিরিও : এই গরমে আমি কেমন যেন অসুস্থ বোধ করি।

আমেলিয়া : এটাই সব না, না আরও কিছু?

মার্তিরিও : নভেম্বর মাস কবে আসবে আমি শুধু ভাবছি। কবে বৃষ্টি পড়বে, কবে বরফ পড়বে। কিন্তু এই গরমের দিনগুলি যেন ফুরুতে চায় না।

আমেলিয়া : এও ঠিক চলে যাবে, আবার ঘুরেফিরে আসবে।

মার্তিরিও : আমি জানি! (একটু থেকে) কাল তুই কখন শুতে গিয়েছিলি?

আমেলিয়া : আমি জানি না। আমি একটা কাঠের মতো হয়ে পড়ে থাকি। একথা কেন জিজ্ঞেস করছিস?

মার্তিরিও : কোনো কারণ নেই তবে আমি যেন উঠোনে কারো গলা শুনতে পেয়েছিলাম।

আমেলিয়া : গলার স্বর?

মার্তিরিও : শেষ রাতে।

আমেলিয়া : তুই কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলি?

মার্তিরিও : না, আমি যেন তাদের গলা শুনেছি যাদের গলা আগের রাতেও শুনেছি।

আমেলিয়া : আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে। চাষবাসের কোনো হাত নয় তো?

মার্তিরিও : চাষবাসের লোকেরা ছয়টার সময় আসে।

আমেলিয়া : হয়তো এমন ঘোড়া যারা পুরো শাসনে নেই।

মার্তিরিও : (খুব নিদিষ্টভাবে উচ্চারণ করতে করতে) ঠিক বলেছিস। ঘোড়াগুলো যেন কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

আমেলিয়া : প্রত্যেককে আমাদের সাবধান করে দিতে হবে।

মার্তিরিও : না, না কাউকে কিছু বলিস না। আমার মধ্যে এটা হয়তো এক বিচিত্র আবেগ।

আমেলিয়া : হয়তো- বা হবে। (বিরতি, আমেলিয়ার প্রস্থান)

মার্তিরিও : আমেলিয়া।

আমেলিয়া : (দুয়ারের কাছে) কী বলছিস? (বিরতি)

মার্তিরিও : কিছু না। (বিরতি)

আমেলিয়া : আমাকে ডাকলি কেন? (বিরতি) যা, কিছুক্ষণ শুয়ে থাক।

আঙ্গুসতিয়াস: (ভীষণক্রুদ্ধ হয়ে মঞ্চে ফেটে পড়ল। আমার বালিশের নিচে পেপের যে ছবিটা রেখেছিলাম তোদের মধ্যে সেটা কে উঠিয়ে নিয়েছিস?

মার্তিরিও : কেউ নেয়নি।

আমেলিয়া : যিশুর প্রিয় বাণী প্রচারক সেন্ট বার্থলোমিউ যদি পেপে হত, তাও তাঁর ছবি

কেউ নিতাম না।

(পোন্সিয়া , মাগদালেনা ও আদেলার প্রবেশ)

আঙ্গুসতিয়াস : ওই ছবিটা গেল কোথায়?

আদেলা : কোন ছবি?

আঙ্গুসতিয়াস : তোদের কেউ ওটাকে নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছিস।

মাগদালেনা : একথা বলার তোর স্পর্ধা হল কী করে?

আঙ্গুসতিয়াস : ওটা আমার ঘরে ছিল, এখন সেখানে নেই।

মার্তিরিও : তোর কি মনে হয় না রাত্রিবেলা ওঠা উঠোনে গিয়ে হাজির হয়েছে। চাঁদের রাতে পেপে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে।

আঙ্গুসতিয়াস : আমার সঙ্গে চমকদার কথা বলার চেষ্টা করিস না। ও এলে ওকে আমি বলে দেব।

পোন্সিয়া : ওটি কোরো না। ছবিটা নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বে। (আদেলার দিকে তাকিয়ে)

আঙ্গুসতিয়াস : তোদের মধ্যে ওটা কে পেয়েছে আমি জানতে চাই।

আদেলা : (মার্তিরিও-এর দিকে তাকিয়ে) কেউ নিশ্চয় নিয়েছে। তবে আর যাই হোক আমি নই।

মার্তিরিও : (নির্দিষ্টভাবে) না, কোনোমতেই না।

বেরনার্দা : (লাঠি হাতে প্রবেশ) অপরাহ্নের এই বেলায় যখন গরমের দাপটে চরাচার নিস্তব্ধ তখন আমার বাড়ীতে এ কী হুলুস্থূলু কান্ড? শোনার জন্য পাড়াপড়শিরা নিশ্চয় দেয়ালে কান লাগিয়ে রেখেছে।

আঙ্গুসতিয়াস : আমার হবু বরের ছবি এরা নিয়ে নিয়েছে।

বেরনার্দা : (হিংস্রভাবে) কে, কে নিয়েছে?

আঙ্গুসতিয়াস : নিশ্চয় এদের মধ্যে কেউ!

বেরনার্দা : তোমাদের মধ্যে কে নিয়েছে বলো? (নীরবতা) উত্তর দাও (নীরবতা, পোন্সিয়াকে) যাও এদের সবাকার ঘরে খুঁজে দেখো। (পোন্সিয়ার প্রস্থান) বেশি আধিপত্য দেখালে বোধকরি এরকমই ঘটে। কিন্তু আমি তোমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। (আঙ্গুসতিয়াসকে) তুমি ঠিক বলছ তো?

আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ।

বেরনার্দা : সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ কি?

আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ, মা।

(এরা সব লজ্জাকর নিস্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আছে)

বেরনার্দা : আমি আমার জীবনের শেষে এসে পৌঁছেছি। সবচেয়ে বড় বিষের জ্বালা তোমরা তোমাদের মাকে ভোগ করতে বাধ্য করছ।

পোন্সিয়া : এই দেখো সেই ছবি।
বেরনার্দা : এটা কোথায় পেলে?
পোন্সিয়া : এটা যেখানে...
বেরনার্দা : খুলে বলো, ভয় পেয়ো না।
পোন্সিয়া : (ইতস্তত গলায়) মার্তিরিওর বিছানার নীচে।
বেরনার্দা : (মার্তিরিওকে) এটা কি সত্য?
মার্তিরিও : হ্যাঁ , এটা ঠিক।
বেরনার্দা : (মার্তিরিওকে কাবু করে এবং একটা লাঠির বাড়ি বসিয়ে) নারকীয় ওই চোখ দুটি গণ্ডগোল পাকাতে ওস্তাদ। ধূর্ত ফন্দিবাজ কোথাকার।
মার্তিরিও : মা, আমাকে মেরো না।
বেরনার্দা : আমি যত ইচ্ছা তোমাকে মারব।
মার্তিরিও : আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ। ফিরে যাও।
পোন্সিয়া : মাকে অশ্রদ্ধা কোরো না।
আঙ্গুসতিয়াস : (বেরনার্দাকে ধরে থেকে) ওকে দয়া করে ছেড়ে দাও।
বেরনার্দা : তোমার চোখে সামান্য একটু জল পর্যন্ত ঝরল না।
মার্তিরিও : তোমাকে খুশি করতে আমি কাঁদতে বসব না।
বেরনার্দা : তবে ওই ছবিটা নিয়েছিলে কেন?
মার্তিরিও : আমি আমার বোনের সঙ্গে কখনও কি একটু মজা করতে পারি না। নয়তো কীসের দরকার ছিল আমার ওই ছবির।
আদেলা : (হিংসায় জ্বলে উঠে ফেটে পড়ে) এটা মজার খেলা তো মোটেই নয়।
মার্তিরিও : চুপ করে থাক। আমাকে কথা বলে বাধ্য করিস না। আমি যদি কথা বলতে শুরু করি তবে দেয়ালগুলি পর্যন্ত লজ্জায় কুঁকড়ে যাবে।
আদেলা : একজন বজ্জাত লোকের মুখে মিথ্যের অভাব হয় না।
বেরনার্দা : আদেলা!
মাগদালেনা : তুই পাগল, তোরা দুজনেই তাই।
আমেলিয়া : তোদের মনের বাজে চিন্তাগুলো আমাদের ওপরে চাপাতে চাইছিস।
মার্তিরিও : এমনও লোক আছে যারা আরও অনেক বেশি পেজোমি করে।
আদেলা : তারা জঘন্য কাজ করতেই থাকে যতক্ষণ না তারা নিজেদের নগ্ন করে ছাড়ে আর নদী এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
বেরনার্দা : সব বিকৃতরুচির জীব।
আঙ্গুসতিয়াস : রোমানো যে আমাকে পছন্দ করেছে সেটা নিশ্চয় আমার দোষ নয়।
আদেলা : তোর টাকার জন্য।

আঙ্গুসতিয়াস : মা দেখো।
বেরনার্দা : চুপ করো।
মার্তিরিও : কথাটার মধ্যে সত্য আছে।
বেরনার্দা : ঠাণ্ডা হও, আমি বলছি। আমি জানতাম ঝড় বয়ে আসছে কিন্তু এত শীঘ্র আসবে, তা আমি বুঝিনি। অ্যাই! তোমাদের ঘৃণার বিরাট একটা ঝড় কি আমার হৃদয় পর্যন্ত বইয়ে দিলে। এখনও আমি বৃদ্ধ হইনি, তোমাদের পাঁচজনের শেকল আমাকে বাঁধতে হবে আর রক্ষা করতে হবে আমার বাবার দেওয়া এই বাড়ি। যাতে কিনা বাড়ির ওই ঘাসটিকেও আমার কোনো গ্লানি সহ্য করতে না হয়। এখন এখান থেকে সব বেরিয়ে যাও।
(ওরা সবাই বেরিয়ে গেল। বেরনার্দা অসহায়ভাবে বসে পড়ল। লাঠি মেঝেতে ঠুকে বলল-)
বেরনার্দা : আমার হাত যে কত শক্ত এ কথা আমি ওদের বুঝিয়ে ছাড়ব। (স্বগতোক্তি) বেরনার্দা, মনে রেখো সেটাই আমার কর্তব্য।
পোন্সিয়া : আমি কি এখন কথা বলতে পারি?
বেরনার্দা : বলো। আমি দুঃখিত এসব অনেক কথা তুমি শুনতে পেলে।
পোন্সিয়া : যা আমার দেখার আমি দেখে নিয়েছি।
বেরনার্দা : আঙ্গুসতিয়াসের বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার।
পোন্সিয়া : ঠিক বলেছ। ও এখান থেকে যাতে অবিলম্বে চলে যেতে পারে।
বেরনার্দা : ও নয়, সে।
পোন্সিয়া : ঠিক, তাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া জরুরী।
বেরনার্দা : আমি চিন্তা করছি না। এমন অনেক জিনিস আছে যা নিয়ে চিন্তা করা যায় না, চিন্তা করা ঠিকও নয়, সে। আমি শুধু নির্দেশ দিই।
পোন্সিয়া : তুমি কি মনে করো সে এখান থেকে যেতে রাজী হবে।
বেরনার্দা : (উঠে পড়ে) তোমার মাথায় তাহলে এখন কি ঘুরছে?
পোন্সিয়া : তাই, তো আঙ্গুসতিয়াকে সে বিয়ে করবে!
বেরনার্দা : চালিয়ে যাও। আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি। তুমি আমার জন্য তোমার ছুরিটাকে আরও ধারালো করে তুলছ।
পোন্সিয়া : আমি খুন করার কোনো সাবধানবাক্য কখনও শুনব সেটা আমি আশা করিনি।
বেরনার্দা : তুমি কি এমন কিছু জেনেছ যে বিষয়ে তুমি আমাকে সাবধান করতে পার?
পোন্সিয়া : বেরনার্দা, কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমার নেই। আমি শুধু এটুকুই বলি: চোখ খুলে দেখ তুমি নিজেও দেখতে পাবে।
বেরনার্দা : আমি কী দেখব শুনি?

পোম্পিয়া : তুমি যা দেখতে পাও দুরন্ত তার গতি। মাইলের পর মাইল দূরে থেকে তুমি সব সময়ে দেখতে পেয়েছ। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদর ব্যাপারে তুমি একেবারে অন্য মানুষ। এ ব্যাপারে তুমি একেবারে অন্ধ।

বেরনার্দা : তুমি কি মার্তিরিও -এর কথা বলছ?

পোম্পিয়া : আচ্ছা ধরে নাও মার্তিরিও... (অনুসন্ধানের ভঙ্গিতে) ও কেন ওই ছবিটা নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল?

বেরনার্দা : (তার নিজের মেয়েকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে) ও বলেছে ওটা নিয়ে ও একটা মজার খেলা খেলেছে, বলেছে কিনা, আর কি কারণ হতে পারে?

পোম্পিয়া : (ব্যঙ্গ করে) এটাই কি ঘটনা, তুমি কি সেটাই বিশ্বাস করো?

বেরনার্দা : (জোর দিয়ে) শুধু যে বিশ্বাস করি তাই নয়,তবে এটাই সত্যি!

পোম্পিয়া : ঠিক আছে। তোমার মেয়েকে নিয়ে আমরা কথা বলছি। মনে করো এ যদি ওই রাস্তার মেয়েটার কথা হত, তাহলেও কি তুমি এই একই কথা ভেবে নিতে?

বেরনার্দা : তুমি এখন আমাকে তোমার ছুরি বসিয়ে দিতে চাও।

পোম্পিয়া : (নিরন্তর নিষ্ঠুর) না, বেরনার্দা, সত্যি এখানে একটা খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না তবে তুমি তোমাদের মেয়েদের কখনও স্বাধীনতা দাও নি।

বেরনার্দা : (দৃঢ়তার সঙ্গে) আমি আবার করব, হাজার বার করব। যতিদিন আমি বেঁচে আছি আমার রক্ত কখনই উমানেস-এর রক্তের সঙ্গে মিশতে দেব না। ওর বাবা একজন কৃষক ছিল।

পোম্পিয়া : জাঁক আর পরিশীলিত ভাব দেখাবার ফল তুমি হাতেনাতে পাচ্ছ।

বেরনার্দা: আমি জাঁক দেখাই কারণ আমি জাঁক দেখাবার ক্ষমতা রাখি। তুমি দেখাতে পার না কারণ তুমি জান তুমি কোথা থেকে এসেছ।

পোম্পিয়া : (ঘৃণার ভাব নিয়ে) আমাকে এসব কথা মনে করিয়ে দেবার কোনো অর্থ নেই। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তুমি যে আমাকে চিরকাল রক্ষা করে এসেছ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বেরনার্দা: (টান টান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) তার তো কিছু পরিচয় পাচ্ছি না।

পোম্পিয়া: (ভেতরে ঘৃণা, বাইরে মিষ্টি ভাব দেখিয়ে) মার্তিরিও একদিন এসব কথা ঠিক ভুলে যাবে।

বেরনার্দা: ও যদি ভুলতে না পারে সেটা হবে ওর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

পোম্পিয়া: আমি সে ব্যাপারে খুব সুনিশ্চিত নই। এই গ্রামের মধ্যেই এমন মানুষ আছে যারা দূর থেকে মানুষের গোপনীয় চিন্তার হদিশ দিতে পারে।

বেরনার্দা: আমাকে আর আমাদের মেয়েদের বেশ্যাবাড়ির পথে নিয়ে যেতে পারলে তুমি

বেশী খুশি হবে?

পোপিয়া : কী আমাদের ভাগ্যে আছে আমরা তা কেউ জানি না!

বেরনার্দা : আমার ভাগ্যে কি আছে তা আমি বেশ ভালোভাবে জানি।

পোপিয়া : (নির্মমভাবে) বেরনার্দা, আমার মায়ের স্মৃতিকে সম্মান দিও।

বেরনার্দা : তাহলে তুমিও তোমার কুচিন্তা দিয়ে আমাকে জ্বালাতন কোরো না। (বিরতি)

পোপিয়া : এসব থেকে দূরে থাকাই আমার পক্ষে সমীচীন হবে।

বেরনার্দা : তোমার সেটাই করা উচিত। তোমার কাজ তুমি করে যাও আর মুখটা সব সময় বন্ধ রাখবে।

পোপিয়া : আমি পারি না। তোমার কি মনে হয় না পেপেকে মার্তিরিও-এর সঙ্গে বিয়ে দিলে অনেক বেশি তারা সুখী হত অথবা হ্যাঁ, ঠিক- আদেলার সঙ্গে কেন নয়?

বেরনার্দা : না, আমি তা বলি না।

পোপিয়া : (নির্দিষ্টভাবে) আদেলা, ও যেন পেপ-এর পরিপূরক হয়ে জন্মেছে।

বেরনার্দা : আমরা যেভাবে চাই সেভাবে ঘটনা ঘটে না।

পোপিয়া : প্রকৃত অনুভব ও চিন্তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করা ওদের পক্ষে খুবই দুরূহ কাজ। আমার নিজের কাছে মনে হয়।

বেরনার্দা : আবার তুমি তোমার মতো কথা বলছ। চুপিচুপি আমার মধ্যে ঢুকে তুমি প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করো।

পোপিয়া : পৃথিবী তাতে শেষ হয়ে যাবে না।

বেরনার্দা : আমি ভাগ্যবান, আমার মেয়েরা আমাকে কেউ অশ্রদ্ধা করে না।

পোপিয়া : এটা সত্যি । কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি ওদের ওপর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে ওরা সোজা ছাদে গিয়ে উঠবে।

বেরনার্দা : আর আমি তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারব যতক্ষণ তারা নীচে নেমে না আসে।

পোপিয়া : সত্যি তুমি অপরাজিত।

বেরনার্দা : অর্ধেক করে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতি আমি কখনও নই।

পোপিয়া : এটা খুব মজার ব্যাপার যদিও গতকাল আমার বড়ো ছেলে বলল, ও যখন শেষ রাতে সাড়ে চারটার সময় মেয়েদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখতে পেয়েছে আঙ্গুসতিয়াসরা তখনও কথা বলছে।

বেরনার্দা : সাড়ে চারটের সময়? (আঙ্গুসতিয়াসের প্রবেশ)

আঙ্গুসতিয়াস : না, ওটা সত্যি নয়।

পোপিয়া : আমাকে এটাই বলা হয়েছে।

বেরনার্দা : (আঙ্গুসতিয়াসকে) আরে, তাই নাকি?

আঙ্গুসতিয়াস : এক সপ্তাহের বেশি হলে পেপে রাত একটার সময় চলে যাচ্ছে। আমি যদি

মিথ্যা বলে থাকি ভগবান আমাকে যেন মেরে ফেলেন। (মার্তিরিওর প্রবেশ)

মার্তিরিও : আমিও রাত চারটের সময় তার যাবার আওয়াজ পেয়েছি।

বেরনার্দা : তুমি কি নিজের চোখে দেখেছ?

মার্তিরিও : আমি নিজেকে দেখাতে চাইনি। যে জানলা দিয়ে তুমি কথা বলো, সেটা দিয়ে বাইরের গলিটা পর্যন্ত দেখা যায়, সেটা দিয়েই তো?

আঙ্গুসতিয়াস : আমি আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে কথা বলি। (আদেলাকে দরজায় দেখা যায়)

মার্তিরিও : তাহলে কিভাবে ...

বেরনার্দা : এখানে কি হচ্ছেটা কি?

পোন্সিয়া : তোমার ওসব খুঁজে বার করার মধ্যে না গেলেই ভালো?

বেরনার্দা : তুমি এ ব্যাপারে একেবারে সুনিশ্চিত।

পোন্সিয়া : এ জীবনে কেউ কোনো কিছু সুনিশ্চিতভাবে জানে না।

আদেলা : মা, এর কথা শোনো না। ও আমাদের সবাইকে শেষ করে দিতে চায়।

বেরনার্দা : তুমি দেখো আমি ঠিক সত্য কথাটা বার করে নেব।

মার্তিরিও : আমি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই।

পোন্সিয়া : আর এখানে কিছু একটা ঘটছে।

বেরনার্দা : কিছুই ঘটছে না। আমি অন্ধ হয়ে জন্মাইনি। এখন থেকে আমার মরণকাল পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব যাতে কিনা এরা সব খোলা মনে সজাগ থাকে।

আঙ্গুসতিয়াস : আমার জানার অধিকার আছে।

বেরনার্দা : যা তোমাকে করতে বলা হয় সেটুকু ছাড়া আর কিছু করার কোনো অধিকার তোমার নেই। (পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : ওই উঁচু রাস্তার ওপরে লোকের মস্ত ভিড় হয়েছে। সব প্রতিবেশিরা তাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

বেরনার্দা : (পোন্সিয়াকে) দৌড়ে যাও, দেখে এসো কি ব্যাপার। যাও উঠোনে, সবাই মিলে যাও। (তারা সব বেরিয়ে যায়, বেরনার্দাও। দূর থেকে গলার স্বর শোনা যায়?) (মার্তিরিও আর আদেলার প্রবেশ। তারা দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে কিন্তু দরজা থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখার সাহস পায় না।)

মার্তিরিও : আমি যে চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি জেনে রাখিস এটা তো সৌভাগ্য।

আদেলা : আমিও অনেক কিছু বলতে পারি।

মার্তিরিও : তুই কি বলতে পারিস। চাওয়া এক জিনিস, করে ওঠা অন্য ব্যাপার।

আদেলা : যে মহিলা একটা রাস্তা পেয়ে সে পথ দিয়ে চলে যেতে পারে, তাকে বলে করে পাওয়া। তুই চেয়েছিলি ঠিকই কিন্তু করে উঠতে পারিস নি।

মার্তিরিও : তুইও আর বেশি দূর এগোস না।
আদেলা : আমিই শুধু তাকে পাব।
মার্তিরিও : আমি তোকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব।
আদেলা : (অনুরোধের সুরে) মার্তিরিও, দোহাই আমাকে একা থাকতে দে!
মার্তিরিও : কিছুমাত্র আশা আছে নাকি!
আদেলা : ও আমাকে নিয়ে থাকতে চায়।
মার্তিরিও : আমি নিজের চোখে দেখেছি তোকে কীভাবে ধরে ছিল।
আদেলা : আমি তাকে আমার কাছে আসতে দিতে চাইনি, আমি অনুভব করলাম, একটা দড়ি যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
মার্তিরিও : আগে তোর আমি মরা মুখ দেখতে চাই।
(মাগদালেনা ও আঙ্গুসতিয়াসের প্রবেশ। জনগণের হৈ-হট্টগোল বাড়তে থাকে। পোন্সিয়া ও বেরনার্দার প্রবেশ)
পোন্সিয়া : বেরনার্দা!
বেরনার্দা : কী ঘটছে ওখানে?
পোন্সিয়া : লিব্রাদারের যে মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি , তার একটা বাচ্চা হয়ে গেছে। কেউ জানে না তার বাবা কে।
আদেলা : একটি বাচ্চা!
পোন্সিয়া : সেই লজ্জা লুকোতে গিয়ে বাচ্চাটাকে সে মেরে ফেলে কতগুলি পাথরের নীচে রেখে দেয়।
বেরনার্দা : ভালো হয়েছে, ওরা সবাই কোদাল আর জলপাইয়ের কাঠের খণ্ড নিয়ে আসুক। এসে মেয়েটাকে শেষ করে দিক।
আদেলা : না, না, ওকে মেরো না।
মার্তিরিও : হ্যাঁ, চলো আমরা সবাই বেরিয়ে গিয়ে ওদের দলে যোগ দিই।
বেরনার্দা : ওর নিজের মর্যাদা পায়ের নিচে পিষে ফেলার জন্য ওকে ভুগতে দাও।
(বাইরে থেকে একজন মহিলার আর্তনাদ শোনা গেল আর প্রচণ্ড হট্টগোল)
আদেলা : ওকে যেন এরা ছেড়ে দেয় ।
মার্তিরিও : (আদেলার দিকে তাকায়ে) ওকে ওর কৃতকর্মের ফল ভুগতে দাও।
বেরনার্দা : (খিলানে এসে) পুলিশ আসার আগে ওকে শেষ করে দাও। পাপের জায়গায় গলগলে কয়লার আগুন ছড়িয়ে দাও।
আদেলা : (নিজের পেটটাকে আঁকড়ে ধরে) না! না!
বেরনার্দা : ওকে মেরে ফেলো, ওকে খুন করে ফেলো। (পর্দা পড়বে)

তৃতীয় দৃশ্য

বেরনার্দার বাড়ির ভেতরের উঠোনটায় চারটে সাদা দেয়াল। এখন রাত। যেখানে

বেরনার্দা ও তার মেয়েরা খেতে বসেছে। পোন্সিয়া তাদের পরিবেশন করছে, প্রুদেন্সিয়া একটু দূরে বসে আছে। (পর্দা উঠবে একটা গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে) । শুধু শোনা যাচ্ছে ছুরি চামচ ও কাঁটা চামচের ঠুনঠান আওয়াজ)

প্রুদেন্সিয়া :আমি এখন যাব। অনেকক্ষণ হয়ে গেল এসেছি। (সে উঠে পড়ে)

বেরনার্দা : এখনই যেও না প্রুদেন্সিয়া। আমাদের তো ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়।

প্রুদেন্সিয়া : সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনাসভার ঘন্টাধ্বনি কি বেজে গেল। (প্রুদেন্সিয়া আবার বসে)

পোন্সিয়া : এখনও ঘন্টা পড়েনি।

বেরনার্দা : তোমার স্বামীর আজকাল দিনকাল কেমন কাটছে?

প্রুদেন্সিয়া : একইরকম।

বেরনার্দা : তাকেও আজকাল দেখি না।

প্রুদেন্সিয়া :ও কেমন ধারার মানুষ তুমি তো তা জান। যখন থেকে ওর ভাইদের সঙ্গে উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তারপর থেকে ও সামনের দরজা দিয়ে উপরে যায় না। একটা সিঁড়ি নিয়ে উপরে ওঠে আর দেয়াল বেয়ে উঠোনে।

বেরনার্দা : এই হল গিয়ে প্রকৃত একজন মানুষ। তোমার মেয়ের খবর কি?

প্রুদেন্সিয়া : ও এখনও মেয়েকে ক্ষমা করেনি।

বেরনার্দা : ঠিকই করেছে।

প্রুদেন্সিয়া : আমিও বুঝতে পারি না এ ব্যাপারে আমি কী করি। এটা আমাকে বিষন্ন করে তোলে।

বেরনার্দা :যে অবাধ্যের মেয়ে সে আর মেয়ে থাকে না,সে হয়ে ওঠে শত্রু।

প্রুদেন্সিয়া : আমি ঘটনাগুলোকে নিজের গতিপথে ছেড়ে দিই। (ধুপ করে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হল, মনে হল দেয়ালে কে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে) ওই আওয়াজটা কিসের?

বেরনার্দা :ওটা হল প্রজননের মদ্দা ঘোড়া। ওটাকে আটকে রাখা হয়েছে, তাই দেয়ালে পা ঠুকে আঘাত করছে। (চিৎকার করে) ওকে বেঁধে উঠোনে ছেড়ে দাও। (নিচু স্বরে) ও নিশ্চয় গরম হয়ে গেছে।

প্রুদেন্সিয়া :তুমি কি নতুন মাদি ঘোড়াটাকে ওর কাছে পাঠাতে চাও?

বেরনার্দা :এটা যেমন খরচসাপেক্ষ, তেমনি অপ্রীতিকর।

পোন্সিয়া : (মঞ্চে হঠাৎ দেখা দিয়ে) ওর যেসব জন্তু জানোয়ার আছে কয়েক মাইলের মধ্যে কারুর নেই। কিন্তু খুবই দুঃখের খুব কম দাম পাওয়া যায়।

বেরনার্দা : একটু চিজ ও মধু নেবে? (আর একবার আওয়াজ হল)

প্রুদেন্সিয়া : আমার খিদে নেই।

পোন্সিয়া : ভগবানের দোহাই।

প্রুদেন্সিয়া : ওই শব্দটা আমার ভেতর পর্যন্ত নাড়া দিচ্ছে।
বেরনার্দা : (প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে) আমার কি সব কথা দু-বার করে বলতে হবে?
(বেরনার্দা টেবিলে ফিরে আসে এবং বসে পড়ে) কী একটা জীবন রে বাবা।
প্রুদেন্সিয়া : একজন পুরুষের মতো অনবরত যুদ্ধ করা।
বেরনার্দা : ঠিক বলেছ। (আদেলা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে) তুমি কোথায় যাচ্ছ?
আদেলা : একটু জল খেতে।
বেরনার্দা : (চিৎকার করে) এক মগ ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসোতো।
প্রুদেন্সিয়া : আঙ্গুসতিয়াসের বিয়ে কবে ঠিক হল?
বেরনার্দা : আর কয়েকদিনের মধ্যে ওরা এসে ওর হাত চাইবে।
প্রুদেন্সিয়া : তুমি নিশ্চয় ভীষণ খুশি।
আঙ্গুসতিয়াস : হ্যাঁ, নিশ্চয়।
আমেলিয়া : (মাগদালেনাকে) তুই দেখি লবণের পাত্র থেকে লবণ ছড়িয়ে দিলি।
মাগদালেনা: তবুও বলি, তোর ভাগ্য এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না।
আমেলিয়া : এটা সব সময় একটা অশুভ ইঙ্গিত।
বেরনার্দা : থাক, যথেষ্ট হয়েছে।
প্রুদেন্সিয়া : (আঙ্গুসতিয়াসকে) তোমাকে কি আঙটি পরিয়ে দিয়েছে, দেখি।
আঙ্গুসতিয়াস : এই দেখো। (ও আঙটি খুলে দেখায়)
প্রুদেন্সিয়া : খুব সুন্দর। তিনটে মুক্তো। আমাদের সময়কালে মুক্তোর মানে ছিল চোখের জল।
আঙ্গুসতিয়াস : কিন্তু এখন সে দিনকাল তো পালটে গেছে।
আদেলা : আমি তা মনে করি না। যে জিনিসের যে রেওয়াজ তার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিয়ের আঙটি মানে হীরের আঙটি।
প্রুদেন্সিয়া : ওটাই বেশ চলতি।
বেরনার্দা : মুক্তো হোক বা না হোক, যাকে যেমনভাবে তুমি তৈরি করবে সেটা তেমনিই হবে।
মার্তিরিও : কিংবা ঈশ্বর চাইলে তা বাতিল হয়ে যায়।
প্রুদেন্সিয়া : আমি শুনেছি ফার্নিচারগুলি যা কেনা হয়েছে তা অতি সুন্দর।
বেরনার্দা : তার দাম পড়েছে ১৬ হাজার রিয়ালস।
পোন্সিয়া : (আবার দেখে) আয়না লাগানো ওয়াডরোপটা সবচেয়ে পছন্দের হয়েছে।
প্রুদেন্সিয়া : আমি ওরকমটা কখনো দেখিনি।
বেরনার্দা : আমাদের আগে ছিল শুধু একটা সিন্দুক।

প্রুদেন্সিয়া : সব ঠিকঠাক হয়ে যাক সেটাই আমরা চাই।
আদেলা : আর সেটার ব্যাপারেই কেউ তেমন করে ঠিক বলতে পারে না।
বেরনার্দা : সব ঠিকঠাক হবে নাই বা হবে কেন। (দূরে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়)
প্রুদেন্সিয়া : ওই শেষ ঘন্টা বাজল। (আঙ্গুসতিয়াসকে) আমি আর এক সময় আসব তখন তোমার কাপড়জামা দেখে যাব কেমন।
আঙ্গুসতিয়াস : যখন খুশি চলে এসো।
প্রুদেন্সিয়া : শুভরাত্রি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।
বেরনার্দা : বিদায়, প্রুদেন্সিয়া।
বেরনার্দা : তাহলে এটাই আমাদের রাতের খাওয়া হয়ে গেল।
আদেলা : একটু খোলা হাওয়া নিতে আমি গেট পর্যন্ত হেঁটে আসি।
আমেলিয়া : আমি তোর সঙ্গে যাব।
মার্তিরিও : আমিও সঙ্গী হতে চাই।
আদেলা : (চাপা একটা ঘৃণার সঙ্গে) আমি হারিয়ে যেতে চাই না।
আমেলিয়া : রাত্রিবেলা একসঙ্গে যেতে ভারি ভালো লাগে। (ওরা বেরিয়ে যায়। বেরনার্দা বসে থাকে আর আঙ্গুসতিয়াস টেবিলটা পরিস্কার করতে থাকে।)
বেরনার্দা : এই যে তোমার বোন মার্তিরিও-এর সঙ্গে তুমি কথা বলছ না, তোমাকে আমি বলি, এটা কিন্তু বন্ধ হওয়া দরকার।
আঙ্গুসতিয়াস: আমাকে ও ভালোবাসে না, তুমি সেটা জান নিশ্চয়।
বেরনার্দা : আমাদের ব্যক্তিগত যা চিন্তা ওটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যদের চিন্তাভাবনার মধ্যে আমি তো নাক গলাই না। কিন্তু আমি চাই পরিবারের সংহতি ও পরিচ্ছন্ন একটা চেহারা।
আঙ্গুসতিয়াস: হ্যাঁ।
বেরনার্দা : তাহলে এটা ঠিক হয়ে গেল, কেমন?
মাগদালেনা : (ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে) যাইহোক তুই তো এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবি। (আবার ঘুমিয়ে পড়ে)
বেরনার্দা : গত রাতে ওর সঙ্গে তুমি কতক্ষণ কথা বলেছিলে?
আঙ্গুসতিয়াস : রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত।
বেরনার্দা : কী কথা বলে পেপে?
আঙ্গুসতিয়াস: আমার সব সময় মনে হয় ওর মনটা এখানে নেই। এমনভাবে ও আমার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়, ও যেন অন্য কারুর কথা ভাবছে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি , তোমার কি ব্যাপার, ও বলে, 'পুরুষের অনেক সমস্যা, তুমি ঠিক বুঝবে না।'

আঙ্গুসতিয়াস: এমন অনেক জিনিস আছে মা যা ও আমাকে বলে না।

বেরনার্দা : ও গুলো কী বা কেন , তা কখনও জানবার চেষ্টা কোরো না। ওকে কোনোরকম প্রশ্ন কোরো না। আর একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না, তুমি কাঁদছ এ যেন ও কখনও দেখতে না পায়।

আঙ্গুসতিয়াস : আমার খুশি হবার কথা কিন্তু আমি খুশি হতে পারছি না।

বেরনার্দা : ব্যাপারটা তো একই।

আঙ্গুসতিয়াস : জানলার খিলান দিয়ে যখন দেখি পেপের দিকে ক্রুঢ় দৃষ্টিতে দেখি, ও আমার কাছে যেন অস্পষ্ট আবছা হয়ে আসে।

বেরনার্দা : শরীর দূর্বল হলে মানুষ ওরকম সব জিনিস দেখতে পায়।

আঙ্গুসতিয়াস: ধরে নিচ্ছি তুমি ঠিকই বলছ।

বেরনার্দা : আজ রাতে সে কি আসছে?

আঙ্গুসতিয়াস: না। মার সঙ্গে ও শহরে গেছে।

বেরনার্দা : তাহলে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারব। আদেলা!

আঙ্গুসতিয়াস: ও ঘুমিয়ে পড়েছে। (আদেলা, মার্তিরিও এবং আমেলিয়ার প্রবেশ)

আমেলিয়া : আজ কী ভয়ানক অন্ধকার।

আদেলা : তোর মুখের কাছে হাত রাখলেও তুই দেখতে পাবি না।

মার্তিরিও : ডাকাত বা আর কেউ তাদের পক্ষে এটা স্বাগত রাত্রি।

আদেলা : সাদা রঙের ঘোড়াটা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখ, মনে হচ্ছে যেন দ্বিগুণ বড়। অন্ধকারে তাকে আবছা দেখা যাচ্ছে।

আমেলিয়া : ঠিক তাই। বেশ ভয়ার্ত ব্যাপার। একটা ভূত যেন দেখছি।

আদেলা : আকাশে অনেক তারা দেখা যাচ্ছে যারা তোর হাতের মুঠোর চেয়ে বড়।

মার্তিরিও : এই তারাটা ওদের দিকে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাকাচ্ছিল ।

আদেলা : তাহলে তোকে কি এরা অন্য কিছু অর্থ বলে না।

মার্তিরিও : ছাদের ওপরে যারা আছে তাদের নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এই সংসারে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে ভাববার বিস্তর অবকাশ।

আদেলা : তোর এটা মার্কমারা কথা।

বেরনার্দা : ওর পথ যেমনি আলাদা, তেমনি তোমার।

আঙ্গুসতিয়াস: শুভরাত্রি।

আদেলা : তুই কি এখনই শুতে যাচ্ছিস?

আঙ্গুসতিয়াস: হ্যাঁ, পেপে আজ রাতে আসছে না। (আঙ্গুসতিয়াসের প্রস্থান)

আদেলা : মা, যখন কোনো তারা খসে পড়ে বা আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তখন ওরা কেন বলে: আশীর্বাদধন্য সেন্ট বারবারা ধারে কাছে থেকো?

বেরনার্দা : আগের দিনে ওরা অনেক কিছু জানত যা এখন আমরা ভুলে গেছি।
আমেলিয়া : আমি চোখ বন্ধ করে থাকি যাতে ওসব না দেখতে হয়।
আদেলা : আমি তা করি না। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যখন হঠাৎ চারিদিকে ছোটাছুটি পড়ে যায়, তখন সেটা আমার দেখতে দারুণ ভালো লাগে।
মার্তিরিও : আকাশের পরিধিতে যা ঘটে আমাদের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।
বেরনার্দা : ওসব কথা না ভাবাই ভালো।
আদেলা : কী সুন্দর রাতটা।
বেরনার্দা : কিন্তু এখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে , মাগদালেনা।
আমেলিয়া : এক্ষুণি সে চলে গেল।
বেরনার্দা : তোমরা দুজনেও যেতে পার।
মার্তিরিও : আঙ্গুসতিয়াসের তরুণ যুবক আজ রাতে আসবে না কেন শুনি?
বেরনার্দা : সে বাইরে গেছে।
মার্তিরিও : (আদেলার দিকে তাকিয়ে) আহা!
আদেলা : সকালে দেখা হবে। (আদেলার প্রস্থান)
পোন্সিয়া : এখনও তুমি এখানে রয়েছো?
বেরনার্দা : চারপাশে যে শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তা আমি প্রাণভরে উপভোগ করছি।
পোন্সিয়া : বেরনার্দা, ও নিয়ে আমরা নাই - বা কথা বললাম।
বেরনার্দা : এ বাড়িতে কিঁচ-ক্যাঁচ কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আমার হুঁশিয়ারিতে সব কিছু এখন নিয়ন্ত্রণে।
পোন্সিয়া : এখানে কিছু দেখবারও নেই, শুনবারও নেই। এটা সত্য কথা। তোমার মেয়েরা এমনভাবে বেঁচে আছে মনে হয় যেন একটা আলমারির তাকে সব যেন সাজানো।
বেরনার্দা : আমার মেয়েরা যথেষ্ট শান্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে।
পোন্সিয়া : তুমি এদের মা, এটা তোমার ব্যাপার। তোমার সংসারের অনেক কিছুই আছে যা আমাকে দেখতে হয়।
বেরনার্দা : এখন দেখছি তুমি কিছু বলবে না বলেই স্থির করেছ।
পোন্সিয়া : আমি আমার জায়গায় আছি আর সেটাই আমার দেখার কথা।
বেরনার্দা : আসল কথাটা এই যে তোমার আর কিছু বলবার নেই।
পোন্সিয়া : তুমি যতটা ভাব তার চেয়ে বেশি আমি চুপচাপ থাকি।
বেরনার্দা : তোমার ছেলে কি পেপে-কে এখনও রাত চারটে পর্যন্ত কথা বলতে দেখে? এ বাড়ির সম্বন্ধে সে কি এখনও জঘন্য গল্পগাছা উড়িয়ে বেড়ায়?

পোন্সিয়া : কেউ আর কিছু বলে না।

বেরনার্দা : এই জন্যে বলে না কারণ তারা বলার মতো কিছু পায় না।

পোন্সিয়া : বেরনার্দা, আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ আমি শঙ্কিত হয়ে থাকি কিছু একটা করে বসবে। অতটা নিশ্চিন্ত থেকো না বা নিজেকে নিরাপদ ভেবো না।

বেরনার্দা : আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছি।

পোন্সিয়া : কোনোরকম পূর্বাভাস না দিয়েই মাথায় বাজ পড়তে পারে। হঠাৎ করে মাথায় রক্ত উঠলে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বেরনার্দা : এখানে সেরকম কিছু ঘটবে না। যেসব জিনিস নিয়ে তুমি ভেবে মরো সেসব জিনিসের ব্যাপারে আমি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছি।

পোন্সিয়া : সেটা তোমার পক্ষে খুবই ভালো।

বেরনার্দা : আমিও সেটাই ভাবি। (পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচালিকা: আমি খাবার প্লেটগুলি ধুয়ে রেখেছি, আর কিছু করার আছে, বেরনার্দা?

বেরনার্দা : (উঠে পড়ে) না, আর কিছু নেই। আমি শুতে চললাম।

পরিচারিকা: কটার সময় তোমাকে ডেকে দেব?

বেরনার্দা : ডেকো না। আজ রাতে আমি অনেকক্ষণ ঘুমোতে চাই। (বেরনার্দার প্রস্থান)

পোন্সিয়া : তুমি যদি ভাঁটা বন্ধ করতে না পার তবে বাঁচার সহজ উপায় হল পেছন ফিরে তাকিও না আর কিছু দেখো না।

পরিচারিকা: তিনি এত অহঙ্কারী যে তিনি তার চোখ দুটোকে বেঁধে রাখেন।

পোন্সিয়া : আমার কিছু করার সাধ্য নেই। আমি তোমাকে বলছি প্রত্যেকটি ঘরে ঝড়ের আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। যেদিন ঝড় ভেঙ্গে পড়বে আমাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমার যা বলার বলে দিয়েছি, সেটাই হল আসল কথা।

পরিচারিকা: বেরনার্দা মনে করে প্রত্যেককে মোকাবিলা করার সে ক্ষমতা রাখে। যে বাড়িতে শুধু মেয়েদের প্রাধান্য , সেখানে একটা পুরুষের যে কত শক্তি, বেরনার্দা সেটা জানে না।

পোন্সিয়া : এর সবটা পেপে এল রোমানোর দোষ নয়। কিন্তু আমার মনে হয় আর বেশি উস্কানি না দিয়ে ওর জায়গায় ফিরে আসা উচিত। পুরুষ বলে কথা।

পরিচারিকা: কিছু লোকের ধারণা আদেলার সঙ্গে কথা বলতেও অনেক রাত কাবার করে দেয়।

পোন্সিয়া : সেটাই ও করেছে। (গোপনে কথা ফাঁস করে দেবার সুরে) আর অন্য কাজও।

পরিচারিকা: এখানে কী ঘটবে সে কথা ভেবে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠছি।

পোন্সিয়া : সংসারের এই যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি যদি সমুদ্রের

ওপারে চলে যেতে পারতাম।

পরিচারিকা: বেরনার্দা বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তাহলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

পোন্সিয়া : ব্যাপারটা এখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। এটা যেন বন্ধ না হয় আদেলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অন্যরা দিন-রাত তাদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে।

পরিচারিকা: মার্তিরিও কি তাই?

পোন্সিয়া : সে তো আরও জঘন্য। সে তো বিষে ডুবে আছে। ও জানে কোনোকালে রোমানোকে পাবে না, তাই যদি পারে ও পৃথিবীটাকেই ডুবিয়ে দিতে চায়।

পরিচারিকা: কী ভয়ানক অপদার্থ এরা।

পোন্সিয়া : আসল কথা, এরা সব পুরুষ ছাড়া মহিলা। সেটা যখন ঘটে তখন রক্তের বন্ধনও কাজে লাগে না। শ্যাশশ্। (সে শোনে)

পরিচারিকা : ওটা কি?

পোন্সিয়া : (দাঁড়িয়ে উঠে) কুকুরেরা ডাকছে।

পরিচারিকা: কেউ হয়তো গেটের পাশ দিয়ে চলে গেল।

(আদলো একটা সাদা পেটিকোট ও বডিস পরে ভেতরে ঢুকল)

পোন্সিয়া : তুমি এখনও ঘুমোতে যাওনি?

আদেলা : আমি জল খেতে চাই। (টেবিলে রাখা গ্লাসটা হাতে নিয়ে জল খায়)

পোন্সিয়া : আমি ভাবলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

আদেলা : এত জল পিপাসা পেয়েছিল যে জেগে গেছি, তোমরা দুজনে কি শুতে যাচ্ছ? (আদেলার প্রস্থান)

পরিচারিকা: আমরাও যাচ্ছি।

পোন্সিয়া : চলো।

পরিচারিকা : আমরা ঠিক একটু বিশ্রাম করে নিতে পেরেছি। বেরনার্দা, সারাদিন আমাকে দিয়ে কাজ করায়, বসবারও একটু সময় পাই না।

পোন্সিয়া : বাতিটা নিয়ে চলো।

পরিচারিকা: কুকুরগুলো পাগল হয়ে গেছে।

পোন্সিয়া : ওরা আমাদের জাগিয়ে রাখতে চায়।

মারিয়া খোসেফা : ছোট্ট ভেড়া, আমার কোলের সন্তান,
ওই যে সমুদ্রের তীর ওখানে আমরা চলে যাব।
নেকড়ে -মুখো বেরনার্দাকে আমরা ছেড়ে চলে যাব।
(সে গান গেয়ে গেয়ে যেতে থাকে)

(আদেলার প্রবেশ। সে একটা চোরা চাউনি দিয়ে দরজা দিয়ে সোজা উঠোনের দিকে বেরিয়ে যায়। মার্তিরিও আর একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

মার্তিরিও : দিদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

মারিয়া : তুমি আমাকে কি দরজাটা খুলে দেবে? তুমি কে?

মার্তিরিও : তুমি এখানে এলে কি করে?

মারিয়া : আমি পালিয়ে এসেছি। তুমি কে?

মার্তিরিও : শুতে যাও।

মারিয়া: : তুমি মার্তিরিও, তাই তো। তোমাকে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি।

মার্তিরিও : তুমি ভেড়াটাকে কোথায় পেলে?

মারিয়া : আমি জানি এটাই ভেড়া। একটা ভেড়া কেন বাচ্চা হতে পারেনা? একেবারে বাচ্চা না থাকার চেয়ে একটা ভেড়া বাচ্চা থাকা তো অনেক ভালো কথা। বেরনার্দা- ও নেকড়ে চেহারা। আর মাগদালেনা একটা হোঁদড়।

মার্তিরিও : গলার আওয়াজ অত উঁচু কোরো না।

মারিয়া : ঠিক বলেছ। সব কেমন যেন অন্ধকার। কিন্তু দেখো আমার পাকা চুল আছে বলে তুমি ভাব আমার বাচ্চা হতে পারে না। আমি বলছি, হতে পারে।

মার্তিরিও : শাশাশ্, চুপ করো এখন।

মারিয়া : যখন আমার পড়শির একটি বাচ্চা হল, আমি তার জন্য চকলেট নিয়ে যেতাম। তারপর সে আমার জন্য চকলেট আনতে লাগল, এভাবে বার বার চলতে লাগল। পেপে এল রোমানো হল একটা দৈত্য। তাকে তোমরা সব ভালোবাসো। কিন্তু সে তোমাদের প্রত্যেককে গপ্ করে গিলে ফেলবে কারণ তোমরা যে সব দানা-শস্য।

মার্তিরিও : (সজোরে) এসো, বিছানায় যাবে এসো। (সে তাকে ধাক্কা দিয়ে পাঠায়)

মারিয়া : ঠিক আছে, কিন্তু আমারে যেতে দেবে তো, দেবে কি না বলো।

মার্তিরিও : নিশ্চয় দেব।

মারিয়া : ছোট্ট ভেড়া, আমার কোলের সন্তান,
ওই যে সমুদ্রের তীর ওখানে আমরা চলে যাব।
দরজার কোণ থেকে পিঁপড়ে আমাদের দেখবে
আমি তোমাকে দুধ খাওয়াবো, তোমার মুখে রুটি দেব।

মার্তিরিও: (খুব নরম সুরে) আদেলা। (একটু বিরক্ত। সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। উচ্চস্বরে) আদেলা (আদেলা এসে দাঁড়ায়। তার চুলগুলি যেন একটু আলুথালু)

আদেলা : আমার খোঁজ করছিস কেন?

মার্তিরিও : ওই লোকটার থেকে দূরে থাকতে বলছি।

আদেলা : কী করতে হবে না হবে তুই বলার কে?

মার্তিরিও : অভিজাত কোনো মেয়ের পক্ষে ওটা একেবারেই যোগ্য স্থান নয়।

আদেলা : তুই কি ওখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হসনি।

মার্তিরিও : (উচ্চস্বরে) আমার মুখ খোলার সময় হয়েছে।

আদেলা : এ তো সবে শুরু। ঘটনা ঘটাবার শক্তি আমার আছে। যে সাহস ও উদ্দীপনা আমার আছে তা তোর নেই। এই বাড়ির ছাদে আমি মৃত্যু দেখেছি কিন্তু তাও আমার যা প্রাপ্য, আমার যেটা জিনিস, তা পাবার জন্য আমি পা বাড়িয়েছি।

মার্তিরিও : ওই পশুটা অন্য একজন মহিলার জন্য এসেছিল। তুই তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিস।

আদেলা : সে চেয়েছিল ওর টাকা কিন্তু বরাবর তার চোখ ছিল আমার ওপর।

মার্তিরিও : তাকে ছিনিয়ে নিতে আমি তোকে কিছুতেই দেব না। সে আঙ্গুসতিয়াসকেই বিয়ে করবে।

আদেলা : ও যে তাকে ভালোবাসে না, আমার চেয়ে তুই তা আরও বেশি করে জানিস।

মার্তিরিও : তা অবশ্য সত্যি।

আদেলা : আমাকেই শুধু সে যে ভালোবাসে সেটা তুই জানিস, কারণ আমার সঙ্গে তুই তাকে দেখেছিস।

মার্তিরিও : (হতাশ সুরে) সেটা ঠিক।

আদেলা : (ওর আরও কাছে এসে) সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমাকেই শুধু ভালোবাসে।

মার্তিরিও : তুই যদি চাস আমার বুকে তবে ছুরি বসিয়ে দে তাও তুই ও কথা আমার সামনে আর উচ্চারণ করিস না।

আদেলা : ওর কাছে যাওয়া আমি বন্ধ করে দিই, তুই সেটাই চাস। কিন্তু সে যদি আমাকে তার বুকে টেনে নেয়, সেটা তুই সহ্য করতে পারিস না, কারণ তুইও তাকে ভালোবাসিস, তুই তাকে গভীরভাবে ভালোবাসিস।

মার্তিরিও : (নাটকীয়ভাবে) হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি। আমি সত্যনিষ্ঠ হয়ে বলতে চাই, আমি সত্যি তাকে ভালোবাসি।

আদেলা : আদেলাকে জড়িয়ে ধরে মার্তিরিও, ও আমার মার্তিরিও, তার জন্য তো আমি দায়ী নই।

মার্তিরিও : আমাকে তুই স্পর্শ করিস না। আমাকে যাচাই করার চেষ্টা করিস না। আমাদের দুজনের মধ্যে একই রক্ত বইছে না। আমি তোকে আমার বোন বলে স্বীকার করতে চাই কিন্তু তুই এখন আমার কাছে অন্য এক মহিলা।
(সে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়)

আদেলা : এরপর থেকে পার পাবার অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের দুজনের মধ্যে একজন ডুববে, অন্যজন সাঁতার কাটবে। পেপে এল রোমানো একান্ত আমার।

মার্তিরিও : না, হতে পারে না।

আদেলা : ওর ওই মুখের স্বাদ গ্রহণ করার পর, আমি এই বাড়ির আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশ আর যেন সহ্য করতে পারছি না। ও যা চায় তাই আমি করব। আর আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় কাঁটার মুকুট পরে নেব। কোনো বিবাহিত পুরুষকে ভালোবাসলে কোনো মহিলার যা অবস্থা হয়।

মার্তিরিও : চুপ কর।

আদেলা : হ্যাঁ, (নরমভাবে) হ্যাঁ, ঠিক। চল, আমরা শুতে যাই আর আঙ্গুসতিয়াসকে ও না- হয় বিয়ে করে নিক। আমি ওসবে আর পরোয়া করি না। আমি চলে যাব, ছোট্ট একটা বাড়িতে আমি থাকব। ও যখন চাইবে আমার কাছে চলে আসতে পারবে।

মার্তিরিও : আমার শরীরে যদি একফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট থাকে তাহলে এটা আমি হতে দেব না।

আদেলা : না, তুই বড় দুর্বল, তুই আমাকে বাধা দিতে পারবি না।

মার্তিরিও : তুই গলা চড়াস না, প্রবল এক শক্তিতে সে আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

আদেলা : ওরা আমাদের বলেন, আমাদের বোনেদের ভালোবাসা উচিত। ঈশ্বর আমাকে বোধহয় অন্ধকারে ঢেকে রেখে চলে গেছেন। কারণ তোর দিকে যখন তাকাই, মনে হয় তোকে কোনোদিন আমি দেখিনি। (একটা শিসের আওয়াজ শোনা যায়। আদেলা উঠোনের দরজার দিকে দৌড়ে যায় কিন্তু মার্তিরিও তাকে বাধা দেয়)

মার্তিরিও : কোথায় যাচ্ছিস তুই?

আদেলা : দরজা থেকে সরে যা।

মার্তিরিও : তুই যদি যেতে পারিস তবে যা। (ওরা দুজনে ধস্তাধস্তি করে)

আদেলা : সরে যা।

মার্তিরিও : (চিৎকার করে ডেকে ওঠে) মা, মা!

(বেরনার্দা এসে পড়ে। তার পেটিকোট পরা, গায়ে একটা কালো রঙের শাল)

বেরনার্দা : তোমাদের দু-জনকেই বলছি, ওসব বন্ধ করো। তোমরা বড় অসহায় হয়ে উঠেছ দেখছি। হায়রে, আমার হাতে যদি একটা বজ্রাস্ত্র থাকত।

মার্তিরিও : (আদেলাকে দেখিয়ে) ও তার কাছে গিয়েছিল। ওর পেটিকোটের দিকে তাকিয়ে দেখো, ওর সারা গায়ে খড়কুটো লেগে আছে।

বেরনার্দা : ওটা বেশ্যাদের বিছানা। (প্রচন্ড ক্রোধাগ্নি নিয়ে আদেলার কাছে যায়)

আদেলা : (দাঁড়িয়ে উঠে মাকে বলে) এই জায়গাটা আমার কাছে বহুদিন আগে থেকেই একটা কারাগার বলে মনে হত। (আদেলা তার মায়ের লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে দু-খণ্ড করে ফেলে) যে অত্যাচারী তার দম্ভ আমি এভাবে ভাঙ্গি। আর বেশি এগিয়ো না। পেপে ছাড়া অন্য কেউ আমাকে কিছু বলে পার পাবে না।

(মাগদালেনার প্রবেশ)

মাগদালেনা: আদেলা (পোন্সিয়া ও আঙ্গুসতিয়াসের প্রবেশ)

আদেলা : আমি হলাম তার মহিলা, (আঙ্গুসতিয়াসকে) তোর মাথার মধ্যে এটা আগে ভালো করে ঢুকিয়ে নে। তারপর বাইরের উঠোনে গিয়ে এটা ওকে বলে আয়। এ বাইরের প্রত্যেকের ওপর ও শাসন করবে। ও ওখানে আছে, সিংহের মতো নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

আঙ্গুসতিয়াস: হায় ভগবান!

বেরনার্দা : বন্দুক!বন্দুক! কোথায়? (সে ছুটে যায়)
(আমেলিয়া মঞ্চের পেছনে এসে দাঁড়ায়। সে দেয়ালে মাথা দিয়ে আতঙ্কে তাকাতে থাকে) (মার্তিরিও-এর প্রস্থান)

আদেলা : কেউ যেন আমাকে বাধা না দেয় । (সে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে)

আঙ্গুসতিয়াস: (ওকে বাধা দিয়ে) তোর ওই বিজয়ী ছোট্ট শরীরটা নিয়ে বেরুতে পারবি না। এই বাড়ির মুখে তুই কলঙ্ক লেপে দিয়েছিস।

মাগদালেনা : ওকে চলে যেতে দে, আমরা ওকে আর কখনও দেখতে যাব না।
(বাইরে একটা গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ এল)

বেরনার্দা : (মঞ্চে প্রবেশ) যদি সাহস থাকে এখন যাও ওর কাছে।

মার্তিরিও : (মঞ্চে প্রবেশ) পেপে এল রোমানোর এই হল শেষ।

আদেলা : পেপে, হায় ভগবান, পেপে। (সে ছুটে চলে যায়)

পোন্সিয়া : তুমি কি তাহলে ওকে মেরে ফেললে।

মার্তিরিও : না, ও ওর ঘোড়া নিয়ে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল।

বেরনার্দা : আমারই ত্রুটি। মহিলাদের বন্দুকের নিশানা ঠিক যেন না হয়।

মাগদালেনা : তবে তখন ওই কথা বললে কেন?

মার্তিরিও : ওই মেয়েটার জন্য। আমি ওকে রক্তে স্নান করাতে চাই।

পোন্সিয়া : তুমি একটা শয়তান।

মাগদালেনা : ওর ওপর অপদেবতা ভর করেছে।

বেরনার্দা : তাও, এটাই ভালো ব্যবস্থা। (ধূপ করে একটা শব্দ হল)

বেরনার্দা : আদেলা, আদেলা।

পোন্সিয়া : (দরজায় দাঁড়িয়ে) দরজা খোল!

বেরনার্দা : দরজা খুলে দাও! ভেব না, দেয়াল তোমার লজ্জা ঢেকে দেবে।

পরিচারিকা: (প্রবেশ করে) পাড়াপড়শিরা সব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে।

বেরনার্দা : (খুব মৃদু স্বরে) দরজা খোল, নয়তো আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলব।
(একটু বিরতি। কোনো আওয়াজ নেই) আদেলা, (সে দরজা থেকে সরে আসে) একটা হাতুড়ি নিয়ে এসো তো! (পোন্সিয়া ভারি জিনিস দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। কিন্তু আর্তনাদ করে বেরিয়ে আসে।)

বেরনার্দা : কী হল?

পোন্সিয়া : (ও দু-হাত দিয়ে ওর গলা টিপে ধরেছে) ভগবান করুন ওভাবে যেন ওর মৃত্যু না হয়।

(বোনেরা ভয়ে পেছনে সরে দাঁড়াল। পরিচারিকা আদেলার ওপর দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল)

(বেরনার্দা আর্তনাদ করে উঠল। এগিয়ে গেল।)

পোন্সিয়া : ভেতরে যেও না।

বেরনার্দা : না, আমি ভেতরে যাব না। পেপে, তুমি ছাড়া পেয়ে পপলার গাছের অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছ কিন্তু তোমারও একদিন কাল আসবে। ওকে মেরে ফেললে। আমার মেয়ে নিষ্কলঙ্ক মরেছে। ওকে ওর ঘরে টেনে নিয়ে যাও। এমনভাবে ওকে সাজিয়ে দাও মনে হবে ও যেন অপাপবিদ্ধ কুমারী। কেউ যেন কিছু বলতে না পারে। ও নিস্পাপ কুমারী অবস্থায় মরেছে। ওদের বলে দাও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন দুবার ঘন্টাধ্বনি বাজানো হয়।

মার্তিরিও : আহ্, ও খুব খুশি ছিল। পেপেকে পাওয়া যে কী জিনিস ও বুঝে গেছে।

বেরনার্দা : আমি কোনো কান্না দেখতে চাই না। মৃত্যুর মুখোমুখি আমরা দাঁড়াতে চাই। নিস্তব্ধ। (একজন মেয়েকে) শান্ত, আমি বলছি শান্ত হয়ে থাক। (আর একজন মেয়েকে) যখন একা থাকবে তখন চোখের জল ফেলো। আমরা সবাই এক শোকাচ্ছন্ন সমুদ্রে ডুবে থাকব। তবে বেরনার্দা অ্যালবার ছোট মেয়ে নিষ্পাপ কুমারী অবস্থায় মরেছে। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? আমি বলছি, নিস্তরঙ্গ, সব শান্ত। (পর্দা পড়বে)

লেখক : **আদিত্য সেন,** দিল্লীর বিশিষ্ট ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা উন্মুক্ত উচ্ছাসের সম্পাদক।
Writer : **Aditya Sen, editor of Magazine 'Unmukta Ucchash', Delhi,**

পারিবারিক

■ মৈনাক সেনগুপ্ত

চরিত্র : মা ও ছেলে

(একটি মধ্যবিত্ত বাড়ি, আসবাবপত্র দামী, আধুনিক কিন্তু ভাঙ্গাচোরা ও মলিন। সময় সকালবেলা, একজন প্রৌঢ় মাটিতে বসে চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো। আর মা বিছানায় বসে আনাজ কাটছেন, দরজায় বেল বাজে।)

ছেলে : দরজাটা খোলো।

মা : আমি পারব না। দেখছিস না কাজ করছি।

ছেলে : আমিও।

মা : সকালবেলা খবরের কাগজটা তো তুই-ই এনে দিস।

ছেলে : আমার ভাল লাগে না।

মা : জানি, আজকাল কাগজে একটাও মন ভাল করা খবর থাকে না।

ছেলে : নিজেরা খবর হতে না পারলে এই খবরগুলোই পড়ে যেতে হবে।

মা : কী বলিস বুঝি না বাপু। চারপাশে যা যা ঘটছে জানতে ইচ্ছে করে। সময়টাও কাটে। কাগজটা এনে দে।

ছেলে : বললাম তো পারব না। নিজের কাজ নিজে করো না।

মা : তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনও ..

ছেলে : আমার বয়সও থমকে নেই।

মা : তাই বলে তুই আর আমি! আজ আছি, কাল নেই।

ছেলে : সে কথা কেউ বলতে পারে না।

মা : তুই আমাকে আজই মরতে বলছিস!

ছেলে : না। বলিনি।

মা : বয়স হয়েছে বলে এত গঞ্জনা। সামান্য খবরের কাগজটা এনে দিতে বললাম।

ছেলে : রোজই তো এনে দিই। অভ্যাসটা একটু পাল্টাও না।

মা : এটা বিশ্রাম নেওয়ার বয়স। তাও যদি সেটা ঠিকমত আমার কপালে কোনোদিন জুটত! এই বয়সে নতুন অভ্যেস কী কাজে লাগবে আমার?

ছেলে : কখন কোনটা কাজে লাগবে কে বলতে পারে! কাগজটা নিয়ে এসে একটু চা চাপিও।

মা : ওহ্! আজ চা-টাও নিজে বানিয়ে খেতে হবে!

ছেলে : হাত পা তো ঠিকই আছে, অসুবিধেটা কোথায়?

মা : সারা জীবন এত পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, বাত কামড় বসানোর সুযোগ পায়নি।

ছেলে : চা-টা খাওয়া হয়ে গেলে এখানে এসে একটু বসবে।

মা : তুই খাবি না?

ছেলে : আমি সকালেই খেয়ে এসেছি নিচের দোকান থেকে।

মা : ও এখন মায়ের বানানো চা আর মুখে রোচে না!

ছেলে : শেষ কবে আমাকে চা বানিয়ে খাইয়েছিলে। বলো, বলো না। নিজেই মনে করে বলো। (মা উঠে যায়)

ছেলে : কী হল! উত্তর দিলে না যে!

মা : আজকাল মনে থাকে না কিছু।

ছেলে : ঠিক থাকে। যা যা ভুলে যেতে চাও, সেগুলোই ভাল বল কেবল।

মা : তোর আশ্রয়ে আছি বলে এত কথা শোনাবি।

ছেলে : তুমি নও, আমি। বাড়িটা তোমার। বাবার পেনশনটাও তোমার নামে আসে। ফ্যামিলি পেনশন, আর সরকারি ডেফিনেশনে আমি অন্তত পঁচিশ বছর আগেই তোমার ফ্যামিলি মেম্বার নই। (মা চা নিয়ে আসে)

ছেলে : এই কাজগুলো একবার দেখবে।

মা : (কাগজগুলোতে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে) এসব দেখে আমি কী করব। আমি বুঝব না।

ছেলে :একসময় একটা আধা-সরকারি চাকরি করতে তো। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টেই।

মা : সে বহুযুগ আগের কথা। বিয়ের পর তোর ঠাকুমা আমাকে চাকরিটা করতে দেয়নি।

ছেলে : তোমার ক্ষোভটা তখন একবার অন্তত ঠাকুমার মুখের ওপর জানাতে তো, এখন হাজারবার বললেও কোন লাভ নেই।

মা : তখনকার সময়টাই ওরকম ছিল।

ছেলে : সময়কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজের কথাগুলো নিজেকেই বলতে হয়। ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে ।

মা : তুই পেরেছিস?

ছেলে : কাগজগুলো দেখে নাও।

মা : বললাম তো এসব আমি আর বুঝব না।

ছেলে : সাঁতার, সাইকেল আর অ্যাকাউন্টেন্সি কেউ একবার শিখলে আর ভোলে না।

মা : এখন আমার আর কোনটারই প্রয়োজন নেই।

ছেলে : প্রয়োজন বড় আপেক্ষিক শব্দ মা।

মা : কতদিন পরে আমায় "মা" বলে ডাকলি।

ছেলে : বিকল্প কোন সম্বোধন জানা নেই বলে। আসলে আমরা দুজনে একটা বন্দোবস্তের মধ্যে রয়েছি, যেখানে তুমি আমায় আশ্রয় দেবে। আমি তোমার

দেখাশোনা করব।

মা : এভাবে বলছিস কেন?

ছেলে : তিক্ত হলেও এটাই যে সত্যি মা। সেই ছোটবেলা থেকে তুমি চেষ্টা করে গেছ। আর আমি কখনোই তোমার মনের মত হয়ে উঠতে পারিনি।

মা : তুই তো আমার মনের মতই।

ছেলে : না মা। এই বয়সে এসে আর নিজেকে লুকিও না। তোমার একটা চোরা প্রতিযোগিতা ছিল, তোমার আত্মীয়দের সাথে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে। আর সেই লড়াই-এ তোমার একমাত্র হাতিয়ার ছিলাম আমি। সেই বয়সেই আমি বুঝতাম। চেষ্টা করতাম। আপ্রাণ চেষ্টা। পেরে উঠতাম না।

মা : বুঝতিস? সবটা বোধহয় না।

(ছেলের মোবাইলে একটা ফোন আসে, সে না তাকিয়েই ধরে)

ছেলে : (ফোনে) হ্যাঁ। কী বলছেন? লোন দেবেন? পার্সোনাল লোন? বাহ্ দেবেন। হ্যাঁ, আমার নেবার খুব দরকার। ইন্টারেষ্ট রেট নিয়ে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ফেরত দিতে পারব না। আমি তো চাইনি। আপনি তো ..... কেটে দিল।

মা : আমার ফোনটায় ব্যালেন্স ভরিয়ে দিস।

ছেলে : নিজে লিখে নাও।

মা : এ বয়সে কত কিছু শিখব নতুন করে।

ছেলে : মোবাইল ব্যবহার করতে তো শিখেছ দিব্যি।

মা : ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে ল্যাণ্ডফোন ছিল। তোদের বাড়িতে এসে পাইনি।

ছেলে : তাহলে তো তোমার আরও ভাল করে পারা উচিত।

মা : তোদের বাড়ির নামে কিছু বললেই তোর গায়ে যেন ফোসকা পড়ে।

ছেলে : এই বাড়িটা আমার হওয়ার দু'বছর আগে থেকেই তোমার হয়েছিল।

মা : হয় না। পর কখনওই পুরোপুরি আপন হয় না।

ছেলে : ফোন, ফোন করে মাথা খারাপ করে। তোমার সেই আপনজনরা কেউ তোমাকে ফোন করে একবারও খোঁজ নেয়?

মা : সবার বয়স হয়েছে, যে যার নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

ছেলে : বাকিরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। যাওয়া - আসা আছে। কেবল তুমি খেলা থেকে বাদ পড়ে গেছ।

(মা চুপ করে থাকে)

ছেলে : কেন জানো? (মা তখনও চুপ) আসলে আজকাল সবকিছু টাকা পয়সা দিয়ে মাপা হয়। আত্মীয়তা, দাম্পত্য সব। অর্থের দৌঁড়ে আমরা হেরে গেছি মা। তাই সব জায়গা থেকে আমাদের ছেটে ফেলা হচ্ছে।

মা : তোর কষ্টটা আমি বুঝি।

ছেলে : আমার এখন আর কোন কষ্ট হয় না। ঠিক বললাম না হয়ত। একটা কষ্ট হয়। ভয়ঙ্কর একটা কষ্ট।

মা : ঋজু কেমন আছে?

ছেলে : ফোন ধরে না আর।

মা : ওর মা-এর কাছে তো খোঁজ নিতে পারিস।

ছেলে : পাশের টেবিলে তোমার ওষুধটা রাখা আছে। খেয়ে নাও। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে এগুলো নিজে মনে রাখার চেষ্টা করো।

মা : এটুকু পারবি না আমার জন্য? তোর আর সারাদিনে কি-ই বা কাজ!

ছেলে : অনেক কাজই করতে হত। অনেক, অনেক, এখন নেই। আর তার জন্য আমি ..

মা : আর একটা চেষ্টা তো করতেই পারতিস।

ছেলে : করছি। করে যাচ্ছি। বেশিরভাগ চেষ্টাই আসলে কোন রেজাল্ট দেয় না।

মা : তবু চেষ্টা করে যেতে হয়।

ছেলে : বাবা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন আমার বয়স ছয়। তোমার বত্রিশ। বিকল্প খুঁজে পাওনি কেন?

মা : খোঁজার চেষ্টা করিনি বলে?

ছেলে : বাবার মৃত্যু আমার সমবয়সীদের চেয়ে আমাকে রাতারাতি অনেকটাই বড় করে দিয়েছিল মা। তোমারও কাউকে কাউকে ভাল লাগত। আমি বুঝতাম।

মা : বুবুন !

ছেলে : তুমিও অনেকদিন পরে আমার ছেলেবেলার নাম ধরে ডাকলে। অবশ্য যখনই ডাকতে তখনই এরকম রাগ রাগ গলাতেই।

মা : তুমি কী বলছ তুমি জান না।

ছেলে : যা বলছি জেনেই বলছি। আর তুমি যা করেছিলে তার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। যদিও এটা আমার এই বয়সের রিয়ালাইজেশন। সত্যি বলতে কী, তখন খারাপ লাগত, বেশ খারাপ লাগত, বন্ধুরাও ...

মা : কী এমন করেছিলাম আমি?

ছেলে : নাহ। কিছু করোনি, যদি করতে তাহলে আজ হয়ত আমি একটু হলেও গর্বিত হতাম। না তুমি, না অচিন্ত্যমামা, কেউই গতানুগতিকতার বাইরে বেরোতে পারলে না।

মা : এর মধ্যে অচিন্ত্য আসছে কোত্থেকে?

ছেলে : বাবা চলে যাওয়ার পরেই হঠাৎ করে তোমার এক সহপাঠীর আবির্ভাব হল বলে।

মা : তুমি তোমার বাবাকেও অপমান করছ বুবুন, অচিন্ত্য তোমার বাবারও বন্ধু ছিলেন।

ছেলে : বাবা যে কোন ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। বরাবরই, কেবল, আমাকে শিখিয়ে গেছিলেন,"কাকু নয় অচিন্ত্যকে মামা বোলো"।

মা : (প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে)- বুবুন ।

ছেলে : তুমি রেগে গেলে এখনও ভয় পাই মা,এক মুহূর্তের জন্য হলেও। রাগ কোরো না মা, আমি কোনো অভিযোগ করছি না। বাবা চলে যাওয়ার পরে আমাদের পাশে কেউ ছিল না। তোমার বাড়ির লোকদের সময় ছিল না। আমার বাড়ির লোকেদের সামর্থ্য ছিল না

(মায়ের ফোনটা বেজে ওঠে)

মা : আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। কেটে দে।

ছেলে : কতদিন পরে তোমার ফোনের এ প্রান্তে বাজনা বাজছে গো, ফোনটা ধরো।

মা : বললাম তো না।

ছেলে : (ফোনটা নিয়ে) মেজমামা,

মা : বলে দে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

ছেলে : এই সকালে। (ফোনে)- হ্যাঁ মামা, বলো, মা-কে দেখতে আসবে? চলে এসো। যে কোন দিন। মা তো সারাদিন বাড়িতেই থাকেন। কোথায় আর যাবেন? কী? কী বলছ? টি.ভি-তে একটা ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে? চালিয়ে দেব? মা টি.ভি দেখতে ভালবাসেন না, উনি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চান। রক্ত মাংসের মানুষ। যাঁদের সঙ্গে ওনার রক্তের বা আত্মার যোগ আছে তেমন মানুষ। যাহ, রেখে দিয়েছে। অচিন্ত্য মামা কিন্তু এই মেজমামারই ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। অথচ, সেই সময় আমার মনে আছে, আমাদের বাড়িতে একবার অচিন্ত্য মামার সঙ্গে মেজমামার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। মেজমামা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছিল।

মা : কে আর যেচে ঝামেলায় জড়াতে ভালবাসে?

ছেলে : অচিন্ত্যমামা কিন্তু জড়িয়েছিল।

মা : ঝামেলা মনে করেনি বলেই বোধহয়

ছেলে : সম্পর্কটা নিয়ে ভাবতে পারতে।

মা : আজ এতদিন পরে? থাকনা।

ছেলে : আজই তো প্রথম। এর পরে সুযোগ পাওয়া যাবে কী যাবে না! সম্পর্কটাকে আর একটু গুরুত্ব দিলে না কেন?

মা : তোর কথা ভেবে।

ছেলে : সবটা সত্যি নয় বোধহয়। আমিই কি সবটা ছিলাম?

মা : সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তো ছিলিই।

ছেলে : একদিন, স্কুলে তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছিল। দরজাটা ভেজানোই ছিল, ওভাবে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই বেরিয়ে গেছিলাম। ফিরেছিলাম অনেক রাত্রে।

মা : তুই বুবুন, তার মানে ....

ছেলে : তোমার বয়সটায় ওটা অস্বাভাবিক ছিল না মা। তবে তখন আমার বয়সটা অন্যরকম ছিল তো। দূরে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা বোধহয় তখনই শুরু হয়েছিল।

মা : বিশ্বাস কর বুবুন ....

ছেলে : এখন আমি কাউকে বিশ্বাস করি না মা। (একটু থেমে) অবিশ্বাসও না। ওসবের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। বিয়েটা করে নিলেই পারতে।

মা : সমাজ মেনে নিত না।

ছেলে : সমাজ কি তোমাদের বন্ধুত্বটাই মেনে নিয়েছিল? বিদ্যাসাগর মশাই তো সেই কবেই—

মা : তোর কি মনে হয়, সমাজ তাঁর সময় থেকে আজ অবধি এক কদমও এগিয়েছে? ইদানিং খবরের কাগজ পড়লে তো মনে হয় আমরা আরও পিছিয়ে যাচ্ছি।

ছেলে : তাহলে তুমি অচিন্ত্যমামাকে ব্যবহার করেছিলে।

মা : (তীব্রভাবে) না। (কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে) না, না, না।

ছেলে : বাবার পেনশনের সামান্য কটা টাকা আর তোমার সদ্য খোলা সেলাই-এর ইস্কুল— এই নিয়ে তো নিজেই লড়াই করে যাচ্ছিলে, একা তাহলে অচিন্ত্যমামাকে দরকার হত কেন?

মা : এই সমাজ একজন মেয়েকে একা লড়াই করার সুযোগটুকুও দিত না বলে। এখনও দেয় না বোধহয়।

ছেলে : সঙ্গে কোন আত্মীয় পুরুষ থাকলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেটাই বেশি হয়।

মা : তবু পুরুষ তো।

ছেলে : তুমিও। কেবল পুরুষ বলেই।

মা : আমি তো সেই অর্থে কোনোদিনই নারীবাদী ছিলাম না।

ছেলে : তাহলে বাবার মৃত্যুর পরে কম্প্যাশেনট কোটার চাকরিটি নিলে না কেন?

মা : পুরুষ বা নারী বলে নয়। সে চাকরিটা আমার যোগ্যতায় পাচ্ছিলাম না, আমার চাকরি কারোর মৃত্যুর বিনিময়ে পাচ্ছিলাম। আমার সবচাইতে প্রিয় মানুষটার মৃত্যুর বিনিময়ে।

ছেলে : বাবাকে তুমি ....

মা : সবচাইতে বেশি ভালোবাসতাম। বোধহয় তোর থেকেও।

ছেলে : কিন্তু বাবা তো কখনও

মা : বলতে পারেননি। আমার ভালোবাসার ধরণটা এমন। কাউকেই বুঝিয়ে উঠতে পারি না, না তোর বাবাকে, না তোকে, না .....

ছেলে : অচিন্ত্যমামাও একদিন হঠাৎ হারিয়ে গেলেন।

মা : আমাকে বলেই গিয়েছিলেন।

ছেলে : তুমি চিরটাকাল নিজের মতই রয়ে গেলে। নিজের মত করে ভেবে গেলে।

মা : কেটেও তো গেল জীবনটা।

ছেলে : অন্যরকম ভাবেও তো কাটতে পারত। যদি তুমি বাবার চাকরিটা নিতে— তাহলে আমরা আরও অনেক স্বচ্ছলভাবে কাটাতে পারতাম।

মা : আমার তোর উপর ভরসা ছিল। জানতাম একদিন তুই ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি।

ছেলে : আজ যেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছি!

মা : দোষ তো তোর নয়। কাগজে তো দেখছি। রোজ কত কত মানুষের চাকরি চলে যাচ্ছে।

ছেলে : সে কথা তো আমার পেট শুনবে না মা।

মা : একজন মানুষের খেতে আর কতটুকু লাগে?

ছেলে : তোমার দায়িত্ব আমাকে কখনও নিতে হয়নি। কিন্তু তা ছাড়াও তো আমরা তিনজন ছিলাম।

মা : সময় হয়ত আবার সব ফিরিয়ে দেবে।

ছেলে : সময় অনেক কিছু কেড়ে নেয় মা, যা আর কোনদিন ফিরে আসে না। এই, এইখানটায় আমি আর ঋজু ক্রিকেট খেলতাম। বল গিয়ে পড়ত তোমার ঠাকুরের আসনে, রেশমীর রান্নাঘরে, রান্নাঘরটা একটা অদ্ভুত জায়গা মা। সবাইকে কখনও কখনও যেতে হয়, কিন্তু কারোরই বোধহয় ভাল লাগে না।

মা : আমার তো ভালোই লাগত।

ছেলে : তাহলে এখন জল গরম করা থেকে ভাত উপুড় করা সব আমাকে করতে হয় কেন?

মা : তোর খানিকটা সময় কাটে।

ছেলে : এভাবে সময় কাটাতে আমি চাইনি। আর তোমার সময় নিয়েই বা তুমি কী করো?

মা : একটা বয়সের পরে মানুষের শরীর মন বিশ্রাম চায়।

ছেলে : তার আগেও একটা বয়স থাকে যখন মানুষ কাজ করতে চায়। মনের মত কাজ।

মা : সবটা মনুষের নিজের হাতে থাকে না।

ছেলে : তুমি তো কোনদিনই ঠাকুর-দেবতা, ভাগ্য-অদৃষ্ট এসবে বিশ্বাস করতে না!

মা : এখনও করি না।

ছেলে : তাহলে?

মা : কর্মফল।

ছেলে : কার কর্মফল? বড় হয়ে একটা ভাল চাকরি করব, বাড়ি-গাড়ি, আরও যা যা কিছু ভাল আছে।

মা : মানে পয়সা দিয়ে যা যা কেনা যায়—

ছেলে : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই, কারণ বেঁচে থাকতে গেলে, সমাজে মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে গেলে পয়সার কতটা প্রয়োজন সেটা আমি শৈশবেই বুঝেছিলাম, আর তাই অন্য বন্ধুরা যখন মাঠে ফুটবল খেলত কিংবা সাইকেল নিয়ে মেয়েদের পিছনে ঘোরাঘুরি করত তখন আমি বাড়ির কোনে বই-এ মুখ গুঁজে বসে থাকতাম। মাছের চোখের মত কেবল ক্যারিয়ারটা দেখে গেছি। আর তুমি আমাকে কর্মফলের কথা বলছ?

মা : তোমার কর্মফলের কথা বলিনি।

(ছেলের মোবাইলে একটা ফোন আসে, ছেলে ফোনটা কেটে দেয়, আবার আসে)

মা : ফোনটা ধর।

ছেলে : (ফোনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও) হ্যাঁ ঋজু, বলো, জানি কোন দরকারেই ফোন করেছ। আমার বা ঠাম্মার শরীর কেমন আছে জানতে ফোন করনি। ভুল বলছ, আমি তোমায় ফোন করি, করতাম, শেষ তিনবারই তুমি আমার ফোন ধরোনি, কেটে দিয়েছিলে। তাই আর করি না। এই মাসের টাকা তোমার মায়ের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছি। কী! নতুন মোবাইল? এই তো ক'মাস আগেই। ওটা অবসোলিউট হয়ে গেছে! আমার ফোনটা আমি চার বছর ধরে চালাচ্ছি। কী বললে! আমাকে সভ্য সমাজে বেরোতে হয় না! যে সমাজ ফোন দিয়ে সভ্যতা মাপে সেই সমাজের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। (ফোনটা কেটে দেয়)।

মা : কর্মফল।

ছেলে : তখন থেকে কী "কর্মফল", "কর্মফল" করে যাচ্ছ!

মা : নিজের জীবন দিয়ে বুঝছ না! কেউ তার নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। কারুর মনে খুশি নেই, সবাই আরো বেশি চাইছে, আরও।

ছেলে : তাহলে এ আমার একার কর্মফল নয়?

মা : না, আমাদেরও, সবার। কেউ দায় এড়াতে পারে না।

ছেলে : আর যারা এই দৌঁড়ে পিছিয়ে যায়? হেরে যায়?

মা : এ দৌঁড় তো চলতেই থাকে। কারুরই পুরোপুরি জেতা হয়ে ওঠে না।

ছেলে : যারা থমকে যায়? ছিটকে পড়ে ট্র্যাকের বাইরে?

মা : ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়।

ছেলে : চারদিকে ধূলো উড়ছে মা, ধূলোর ঝড়। বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকা যায় না।

মা : কাল রাতে তুই ড্রিংক করছিলি?

ছেলে : জানো তো ইদানিং মাঝে মাঝে করি। কেউ নেই, কিছু নেই। মদ খেলে অন্তত নিজের সঙ্গে কথা বলাটা সহজ হয়।

মা : বিচ্ছিরি উৎকট গন্ধ পাচ্ছিলাম।

ছেলে : সস্তার মদ সুগন্ধ ছড়ায় না।

মা : সারা জীবনে কোনদিন ছুঁয়ে দেখলি না, এখন এই মাঝবয়সে এসে

ছেলে : ওটা অন্য জীবন ছিল মা। অন্য আমি। তখনও একটা সুড়ঙ্গ ছিল, কিন্তু তার অন্য পার থেকে একটা আবছা আলো ভেসে আসত। এখন কেবল সুড়ঙ্গটাই রয়ে গেছে।

মা : এখন তো আর আমার কথা শুনবি না। খেতে মানা করলেও খাবি।

ছেলে : সখ করে খাই না। খেতে বাধ্য হই।

মা : তাহলে একটু ভাল কিছু খাস অন্তত, গন্ধটা একটু কম লাগে।

ছেলে : ঠাট্টা করছ? দাম জানো?

মা : আমি কী করে জানব? চাকরিটা যতদিন করেছিলি কিছু তো জমিয়েছিলি?

ছেলো : খুব সামান্য।

মা : বসানোর সময়েও তো থোক দিয়েছিল।

ছেলে : সুদ দিন দিন কমছে। সিনিয়র সিটিজেনের নামে রাখলে কয়েকটা টাকা বেশি পাওয়া যায়। আর সেই কারণেই তো .. ...

মা : জানি

ছেলে : তার মধ্যে যতদিন বেঁচে থাকব ঋজুর খরচ দিয়ে যেতে হবে। ভাল জিনিস খাব কোত্থেকে? দিয়ে থুয়ে কত থাকে তুমি জানো না?

মা : না, জানি না।

ছেলে : আমি অনেক বার জানাতে চেয়েছি। সব দায় আমার একার নয় (চারপাশে ছড়ানো কাগজগুলো দেখিয়ে)— দেখে নাও, বুঝে নাও।

মা : একটা বয়সের পরে মানুষ আর নতুন করে দায়িত্ব নিতে পারে না। তোকে এর আগেও অনেক বার বলেছি।

ছেলে : পারে, যখন কোন উপায় না থাকে তখন অবশ্যই পারে।

মা : আমার তো উপায় আছে।

ছেলে : আমি?

মা : হুম।

ছেলে : আমার নিজের জীবনের কোন অর্থ নেই। কেবল তোমার সেবা করার জন্য বেঁচে থাকা! এত স্বার্থপর তুমি?

মা : দশমাস পেটে ধরেছি। একা হাতে বড় করেছি তোকে, এখন আমি এটুকু চাইতে পারি না?

ছেলে : তোমার কাছে যেটা অতটুকু, আমার কাছে সেটা সবটা, আমার গোটা জীবনটায় আর কিছু নেই, শুধু তোমার দেখভাল করা ছাড়া।

মা : তোর চাকরি চলে যাওয়া, তোর বৌ ছেড়ে যাওয়া— এগুলোর জন্য তো আমি দায়ী নই। (ছেলে চুপ করে যায়)
আমি এভাবে বলতে চাইনি।

ছেলে : রেশমিকে আটকাতে পারতে তো?

মা : তোর সঙ্গে সম্পর্কটা ভেঙে গেছিল, আমি আটকাতে পারতাম?

ছেলে : ভেঙেছে? কে জানে হয়েছিল কিনা কোনদিন?

মা : মেয়েটা কিন্তু খারাপ ছিল না।

ছেলে : আমিও ওকে দোষ দিই না। আসলে সবটাই আলাদা ছিল, ও মেলানোর চেষ্টা করেছিল শুরু শুরুতে। আমিও করেছিলাম। পুরো সময়টাই।

মা : তাহলে?

ছেলে : মনের কথা মুখে কীভাবে আনতে হয়, জানতাম না। ধরে নিতাম, কাছের মানুষরা সবটা বুঝে নেবে।

মা : মেয়েরা কিছু কিছু কথা শুনতেও চায়।

ছেলে : ছোটবেলা থেকে তুমিই মেয়েদের সাথে মিশতে মানা করতে।

মা : তুমি তো ছেলেদের সঙ্গেও মিশতে পারো না।

ছেলে : ক্লান্ত দুপুরে ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। টগর গাছে ঘুরতে আসা ফড়িংগুলো ছাড়া আমার কোন সঙ্গী ছিল না। ভুল বললাম, আমাকে আজীবন সঙ্গ দিয়ে এসেছে হীনমন্যতা। কথা বলা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাও একটা শিল্প, সেটা কোনদিনই রপ্ত করতে পারিনি।

মা : বাপের থেকে পেয়েছিলে।

ছেলে : কতটুকু পেয়েছি বাবাকে?

মা : রক্ত। রক্ত যাবে কোথায়?

ছেলে : তুমি তো সবার সঙ্গে মিশতে। গোটা পাড়ার লোকজন তোমাকে ভালবাসত।

মা : আমার থেকে তো তুমি কিছুই পাওনি। কিংবা হয়ত আমিই তোমাকে কিছু শেখাতে পারিনি।

ছেলে : দুটো আলাদা জীবন মা।

মা : কিন্তু শুরুটা তো আমার থেকেই।

ছেলে : কারুরই পুরুটা নিজের হাতে থাকে না মা।মাঝের পথটাও না। শেষটা হয়ত থাকে। বা রাখা যায়।

মা : কী বলতে চাইছিস?

ছেলে : চা খাবে?

মা : আমার তো খাওয়ার সময় হল। এখনও স্নানও হয়নি।

ছেলে : রোজ তো নিয়মমাফিকই চলো। আজকের দিনটা আর কখনও ফিরে আসবে না, চলো, একটু নিয়ম ভাঙি না হয়।

মা : কোন দিনই আর একটা দিনের মত হয়ে আসে না, যা যায়, তা চিরদিনের জন্যই যায়।

ছেলে : যেমন গেছে। আমার পরিবার, আমার চাকরি, আমার আইডেন্টিটি।

মা : এমন হুতাশ নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকবি তুই!

ছেলে : কাগজগুলো একবার ভাল করে বুঝে নাও মা, বাবার, তোমার, আমার যাবতীয় সঞ্চয়। এই পাতাটাতে সব ফোন নম্বর লিখে রেখেছি। এজেন্টদের। ওরা কেবল এজেন্ট নয়, আমার বন্ধু। তোমার যে কোন বিপদে ওরা তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। একটা ফোন করবে শুধু।

মা : আমার জন্য নতুন কোনো বিপদ আর অপেক্ষা করে নেই তাই।

ছেলে : আমার নামটাও আমার নিজের নয় মা। বিভূতিবাবু বা সত্যজিৎ রায় থেকে ধার করা।

মা : তোর নামটা তোর বাবা রাখেননি। আমি এখনও "পথের পাঁচালি"দেখিনি।

ছেলে : পড়োওনি।

মা : আমার বাবা বলতেন,মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। তাই পাড়ার বই-এর বাইরে কিছুই পড়া হয়নি।

ছেলে : তারপর, তোমার বাবা যা যা চাইতেন আর তুমি যা যা হতে পারো নি, সেই সব চাপিয়ে দিতে চেয়েছ আমার ওপরে।

মা : প্রতিটি প্রাণী তার মত করে কষ্ট সহ্যের পরেও সন্তান জন্ম দেয় কেন জানিস, সে নিজেকে দীর্ঘায়ু দেখতে চায় কিংবা অমর।

ছেলে : কিন্তু যাকে জন্ম দেওয়া হয়, তার কথা কেউ জানতে চায় না। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তোমার কথাও কেউ জানতে চায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে সময় নষ্ট করার মত সময় খুব কম। একজনের চলে যাওয়া যেমন জরুরি তেমনই আর একজনের থেকে যাওয়া।

মা : তোর বাবা মরে যাওয়ার পরেও তো আমি বেঁচে আছি।

ছেলে : রেশমি চলে যাওয়ার পরেও আমি আছি। ঋজুকে দেখতে না পাওয়ার পরেও ছিলাম।

মা : সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ছেলে : এই ওষুধটা খালি পেটে খাবে। এটা জলখাবার খাওয়ার পরে। আর এগুলো রাতে।

মা : আমাকে দেখাচ্ছিস কেন? তুই-ই তো দেখিস।

ছেলে : আমারও তো না দেখার সাধ হয় মা। সব গুছিয়ে রেখেছি। আমি না থাকলেও যাতে সব বুঝে নিতে পারো।

মা : কোথায় যাবি তুই?

ছেলে : পাহাড়ে, জঙ্গলে বা সমুদ্রে। আমিও যে কোথাও আমার মত করে থাকতে চাই। কিংবা ডুবে যেতে।

মা : এভাবে বলছিস কেন? এতটা বড় হলি কী করে?

ছেলে : প্রকৃতির নিয়ম, যেভাবে কোন প্রাণী বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু আপাতত এসব কথা বলার সময় আমার নেই। এমনিতেই আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মা : দেরি! তোর? কোথায় যেতে হয় তোকে? সারাদিন তো এই চার দেওয়ালের মধ্যেই

ছেলে : চার দেয়াল ছাড়াও ওপরে আর নিচে দুটো জায়গা আছে মা। আমরা সেটা নিয়ে ভাবি না তাই। ভাবলেই কিন্তু যাওয়া যেতে পারে। (সামনের কাগজগুলো দেখিয়ে) —আমার আর তোমার যাবতীয় ভবিষ্যৎ। বিজুকে বলে রেখেছি। ও আসবে কাল, সব বুঝিয়ে দেবে তোমাকে।

মা : বিজু?

ছেলে : আমার বিজু। মনে নেই?

মা : হ্যাঁ, তোর ছেলেবেলার বন্ধু।

ছেলে : কোন অসুবিধে হবে না তোমার। আমার জায়গায় কোন পেশাদার মানুষ থাকবেন। সময়ে সময়ে ওষুধ, খাবার, জল, স্নান, বাথরুম।

মা : আর তুই?

ছেলে : এর বাইরে একটা বিরাট পৃথিবী আছে।

মা : সেই পৃথিবীতে চলে যাবি তুই?

ছেলে : না, অন্য পৃথিবীতে। সেই পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলেও পয়সা লাগে। পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকা বড় ঘেন্নার মা।

মা : তাহলে, তুই?

ছেলে : বেঁচে থাকার বর্ম জুটিয়েছি মা, এতদিন ধরে, এই দেখো।

মা : এইসব ওষুধ। এগুলো খেলে তো .. ...

ছেলে : তুমি তো তোমার শেষের কটা দিনের জন্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও।

মা : কী বলিস তুই?

ছেলে : এখনও নিজের কথাই ভাবছ তো? তোমার কোন অসুবিধে হবে না। শর্তহীন আনুগত্য চেয়েছিলে জীবনভর। সেটাই পাবে। আমি দায়িত্ব থেকে করতাম। আমার বদলে যিনি আসবেন তিনি কর্তব্যের জন্য। আসলে দুজনেই পেটের টানে। (ছেলে ওষুধগুলো মুঠো করে খেতে যায়, মা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ছেলের ফোন বেজে ওঠে) আমার জীবনে কোন কাজ বাধাহীনভাবে করতে পরিনি।

মা : ফোনটা ধর।

ছেলে : সেই তো কোন কাজেরই কথা। যার মধ্যে কোথাও আমি নেই, অন্যের জন্য শুধু। (ফোনটা আবার বাজে, ছেলে খুব বিরক্ত হয়ে ধরে) তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না রেশমি। অন্তত এই মুহূর্তে না। কী? ঋজু ঘুমের ওষুধ খেয়েছে! ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ? কোন হাসপাতাল?

মা : কোথায় যাচ্ছিস? ঋজুর কী হয়েছে?

ছেলে : কাগজগুলো দেখে রেখো। ওষুধগুলো বুঝে নিও। (বেরোতে যাওয়ার আগে নিজের ওষুধগুলো দ্রুত পকেটে ভরে নেয়) বিজু আসবে। ওকে বলা আছে। তুমি চিন্তা.. থাক, আসছি আমি ...

লেখক: **মৈনাক সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট নাট্যকার, পশ্চিমবঙ্গ।**
Writer : **Mainak Sengupta, distinguished playwright, West Bengal.**

হবু রাজার দেশে

■ গায়ত্রী চৌধুরী

(মঞ্চ সজ্জার আয়োজন চলছে। আসবাবপত্র দেওয়াল সব ঠিক আছে কিনা তা দেখছে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্পী, আলোক শিল্পী কোথায় কোন Light-এগুলো দেখছে, নাট্য শিল্পীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা, কেউ এসে চা দিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, নির্দেশক নির্দেশ দিচ্ছেন, কেউ শেষবারের মত script পড়ছেন। কেউ বা মঞ্চের সামনের দিকে সরে এসে মোবাইল কানে কথা বললেন।)

কুশীলবগণ :

রাজা - হবুচন্দ্র, মন্ত্রী গবুচন্দ্র, মহারানি : সখী (২) পারিষদবর্গ- (১) পণ্ডিত, (২) বদ্যি, (৩) পারিষদবর্গ- ১- পণ্ডিত, (২) বদ্যি, (৩) সেনাপতি, (৪) কারাধিপতি, (৫) খাদ্য মন্ত্রী, (৬) প্রহরী, (৭) গুপ্তচর, (৮) দূত - ১, (৯) দূত-২, গ্রামবাসী: ১,২,৩, নৃত্যে - ছেলে-মেয়ে-১,২,৩ .....

বুদ্ধিজীবী,

রাজসভার দৃশ্যে কুশীলবগণ মধ্যে হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র, মহারানি ছাড়া প্রতিটি চরিত্র তাসের দেশ চিত্রনাট্য অনুসারে হাঁটাচলা করবে, অর্থাৎ পুতুল-নাচের মত Movement করবে।

প্রথম দৃশ্য

১) এই তাড়াতাড়ি কর - ৬:৩০ কাটায় কাটায় শুরু করবে।

২) আরে দাঁড়ান- এটা তো ডেমো শো, একটু এদিক ওদিক কোন ব্যাপার না।

৩) হুঁ, তোদের সব কিছুতেই খামখেয়ালি।

৪) না-না, এরকম করলে হবে না, Meeting - এ কী কথা হল?

৫) বলেছে না Stage বিহার্সাল মানে final

৬) এই গবুচন্দ্র তোর দাঁড়ি ঠিক কর, দেখিস দাঁড়িতে তা দিতে গেলে দাঁড়ি যেন হাতে চলে না আসে। (সবাই হাসি)

৭) ওমা একি এখনো dress পরা হয়নি? (জামার ভেতর রাজার (পোষাক) অভিনয় করে দেখায় : "শোন গো গবুরায় - মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়"

৮) দিদি হারুদা ডাকছে - (নেপথ্যে - হ্যাঁ আসছি)

৯) (প্রবেশ করে দিদি-)

১০) আপনি zone দেখেন, এর বাইরে যাইবেন না, চকের বাইরে গেলে কিন্তু অন্ধকারে

পইরা থাকবেন, তখন আমি জানি না, (হারু চাটার্জি পান চিবোতে চিবোতে কথা বলে।)
(অপর একজন)- চাটার্জিদা আমারটা ঠিক আছে? চাটার্জিদা আরেকটু, বা দিকে যান। চক দিয়া mark কইরা দিছি নিচের দিকে চাইয়া দেইখ্যা লইবেন।
(অপরদিকে দিদি Script পড়ছেন)
১) দিদি Script রাখ, সারাক্ষণ Script হাতে- রাখ, (দিদি ম্লান হাসি দিয়ে আবার Script -এ মনোযোগ দেয়।)
২) হ্যাঁ Script পড়ে, তোমরাও তো পড়তে পার, আগে একটু কথাবার্তা গল্প বন্ধ রাখ,
৩) মহিলা Artist : যে যার Dress পরে তৈরি হয়ে নিয়েছ? আর, শোন গ্রীন-রুমে যার যার পোষাক, জল আলাদা আলাদা রাখবে, কেউ কারো কোন কিছুতে হাত দেবে না
৪) এটা সবাই লক্ষ্য রাখতে হবে, তপনদা তো গ্রীন-রুমেই থাকে।
৫) হারু তোর শেষ - তপন তোমার make-up আর কে কে বাকি?
৬) প্রহরী, আর দূত আইয়।

২) চাটার্জিদা মনে আছে তো - এক একটা দৃশ্য শেষ হবার পর পুরো মঞ্চে Light off হয়ে গেলেও Dim light- মানে foot light zero power জ্বালানো কথা।
৩) এই যে মশাই ভুলবেন না, এখন নাটকের অভিনয়ের আঙ্গিক অনেক পাল্টেছে।
৪) আন্টি - Sir সবাইকে ডাকছে prayer এ আসতে
৫) সবাই চল এই রাজা মন্ত্রী- কোটাল সবাই prayer এ চল।
(মঞ্চের সামনের দিক খোলা রেখে আর্ধ-চন্দ্রাকৃতি করে সবাই দাঁড়ায়)
৬) ঘড়িতে এখন ৬ বেজে .....
পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের নাটক ('রাজা হবুচন্দ্রের রাজসভা'। যদিও আমাদের আজ stage রিহার্সেল, তবুও আমরা ভাবব এটাই final show. অনেক ঝুঁকি এবং টাকা পয়সা খরচ করেই আমরা আজ Dress, light, মঞ্চ, সব-সহযোগে অভিনয় করব, সবাই যথাসাধ্যে নিজের best performance দিতে চেষ্টা করবে। বাকিটা Asistant Director বলবেন - best of luck.
2) Director - আমি জানি সবার খুব ভাল হবে আজ। একটা কথা বলছি— মঞ্চকে ভয় করার কোন কারণ নেই, মঞ্চে যখন তুমি উঠেই গেছ, তখন মঞ্চ তোমার, তুমিই রাজা। Boldly অভিনয় করবে, কোন কারণে সহ অভিনেতা Dialogue ভুলে গেলে বুদ্ধি করে manage করবে, আর এই জন্য আমরা অন্যের মানে যারা আমাদের সাথে মঞ্চে থাকবে তাদের সবার Dialogue মুখস্ত রাখি। Mobile switch off বা silent mode-এ রাখ। নীরবতা পালনের পর আমরা 'অসতো মা সদ্‌গময়' বলে universe-এর কাছে আশীর্বাদ চাইব।
(নীরবতার জন্য ঘড়ি দেখে Director নিজে)
'অসতো মা সদ্‌গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যুমামৃতং গময়
আবিরাবির্ময়েধি'।।

২য় দৃশ্য

(মঞ্চে জাঁকজমক দৃশ্য, সিংহাসন (রাজা ও রাণির), বিউগল বাজছে।)

ঘোষক : রাজসভায় মহারাজা হবুচন্দ্র পদর্পণ করিতেছেন .....।
সবাই রাজা হবুচন্দ্রের কথায় yes sir, yes boss বলিবে,অন্যথায় নিপাত যাবে- এ -এ- -
বাদ্য : ডুম ডুম ডুম - - - - - - - - - - - - -।

গান :- চল সমান পথে, চল সমান পথে, চল নিয়ম মতে
(প্রবেশ করে রাজা হবুচন্দ্র)
পারিষদবর্গের action- চল সামনে পথে - - - - - - - -।

হবু : শোন গো গবুরায়-
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়!

গবু : তাই তো মহারাজ! তাই তো মহামান্য!
স্বয়ং দেবতার শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ অর্পিত হবে।
তা না হয়ে মলিন মৃত্তিকা কেন সুকোমল কমলপদযুগল স্পর্শ করার আস্পর্ধা পাবে।

পারিষদ ১ : এত সাহস!

পারিষদ ২ : শুধু সাহস বলে কথা, দুঃসাহস!

গবু : জরুরী সভার ডাক দিন রাজামশাই!
পাত্র - মিত্র - সভাসদ সবাই মিলে একত্রে মস্তিস্ক - গবেষণা করলে একটি সুরাহা হতে পারে,

রাজা : Ok, no problem, no problem !
সভায় রাজা ঢোকার সাথে সাথে পাত্র-মিত্র সবাই পুতুল নাচের মত march করে, (৩নং ছাড়া) সাধারণ মানুষের মত চলন বলন করছে বলে অন্যরা মুদ্রা করতে করতে ৩নং কে এক একবার ধাক্কা দেয়, তাকে সোজা হয়ে চলতে, তাদের মত হতে চোখ পাকায়, ৩নং নিজের মত চলে)

হবু : গবু, রাজকর্মচারীদের মাসোহারাতে রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে। আর সামান্য ধূলা! তাহার সমাধান কেউ করিতে পারিতেছে না!

পারিষদ ১ : মহারাজ! প্রণাম জানাই! রাজপণ্ডিত, বদ্যিরাজ, অন্তপুরবাসিনী, মাতা, ভগ্নী সবাইকে আহ্বান করুন মহামান্য!

রাজা : Ok, no problem, no problem !

পারিষদ ২ : সত্যি তো রাজ্যের এত বড় সমস্যা ! সামান্য ধূলা বাগে আনা যাচ্ছে না, disgusting!

৩) মহারাজ ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি !

রাজা : Ok, no problem,
রাজ্যের সাধারণ জনতার মধ্যেও প্রচুর বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী আছেন। সুযোগের অভাবে বিকশিত হচ্ছে না, তাদের সবাইকে ডাকুন স্যার,
বলা যায় না কার মাথা থেকে কখন কী আসে ?

রাজা : Ok, no problem, no problem !

৪) : রাজসভায় গড়ে হরিবোল সবাইকে প্রবেশ করতে দিলে মূর্খরা প্রশ্রয় পাবে মন্ত্রীবর।

৫) : দূর থেকে তাদেরকে প্রশ্ন ছুড়ে দিন।

৬) : তাছাড়া অপদার্থগুলোর সাথে আমাদের status মিলবে না,

১) : শুনুন মহামান্য পিতা : মূর্খদের মস্তিষ্ক থেকে বুদ্ধির প্রাবল্য নিসৃত হলে তাদের অহংকার বেড়ে যাবে।

৫) : ছোটলোকগুলো সুযোগ বুঝে, মোটা টাকা চাইতে পারে, বলবে বক্‌শিষ চাই !

রাজা : (এদিক ওদিক তাকায় মাথায় হাত)

গবু : না না কিছুতেই না। বক্‌শিষ দেওয়া যাবে না। ব্যাটাদের বোঝাতে হবে রাজার সমস্যা মানেই রাজ্যের সমস্যা, রাজা মাই বাপ,দেওতা !

রাজা : (দেবতার মত আশীর্বাদ, হাত উপরে ওঠায়)

রাজউপদেষ্টা : রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজাবর্গ বিনা স্বার্থে, বিনা শর্তে, পরিশ্রম প্রদান করবে, অর্থ প্রদান করবে।

৬) : দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বিদেশী শত্রু- মোকাবিলায় প্রজাসমূহ প্রয়োজনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে উপবাস থেকে রাজকোষ নিমিত্তার্থে রাজসমীপে অর্থ, উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করবে, অপিচ- স্বীয় কর্তব্য পালনার্থে প্রাণাতিপাত করতেও দ্বিধা করবে না।

গবুচন্দ্র: ঠিক আছে- যে বিষয়ে আজকের সভা তার আলোচনায় আসুন,
হ্যাঁ ঠিক— বলছিলাম মূর্খগুলোকে সভায় আসতে দিলে .....

৭) উপরন্তু মূর্খগুলি সবাই নিজেদেরকে আমাদের সমকক্ষ ভাববে !

২) : disgusting!

১) : বরণীয় অমাত্যবৃন্দ, আমরা সবাই জানি রাজনীতি বড়ই জটিল, স্বয়ং ঈশ্বর রাজার রূপ ধারণ করে মর্তভূমিতে অবতরণ করেন।

২) : তাই তো ! রাজ-ধমনীতে প্রবাহিত রক্তিম স্রোত সাধারণ মানুষের রক্তের সাথে তুলনা দিলে তা হবে নিছক মূর্খামি, নতুবা উন্মাদস্য কাকবেদনা।

৩) : হ্যাঁ এমন দুর্ঘটনা— না ঘটুক— রোগশয্যায় মহারাজের রক্তের দরকার পরলে

সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, যারা আপনাদের মত ওজন মেপে কথা বলতে জানে না তারা রক্তদান করলে হবে? না কি আপনারা স্বর্গের দেব-সভায় কোন আত্মীয় থেকে আনিয়ে নেবেন, (প্রত্যেকের কথায় রাজা ঘাড় হেলিয়ে একবার এদিক ওদিক তাকায়)

৬) : শুনুন মশাই- আপনার কাজ রাজার প্রতিটি সুকর্মের কীর্তন করা, ব্যর্থতা ঢেকে মহাধীশের কথা তাঁর অন্নে প্রতিপালিত প্রজা সমক্ষে প্রচার করা। আপনি তো দেখছি মশাই .....

৩) : শুনুন মন্ত্রীবর— গুস্তাফি মাপ করবেন, প্রজাপালনই রাজধর্ম। শাস্ত্রে আছে যে রাজা প্রজার সুখে সুখী, প্রজার দুঃখে দুঃখী তিনিই প্রজাবর্গের পিতা এবং মাতা। ব্যক্তিস্বার্থ না দেখে রাজ্যের সমস্যার কথা ভাবুন মহারাজ। সমাধান নিয়ে আলোচনা হোক। মুকুট পরা সহজ রাজা! মুকুট রক্ষা করা সত্যিই অনেক কঠিন।

রাজা : (মহারাজ অবাক হয়ে তাকায়)

২) : disgusting! দেখুন সভার আরম্ভ প্রাক্কালে আপনাকে বলা হয়েছে রাজ কক্ষে রাজকার্য পরিচালনা কালে রাজ-বিপক্ষে যার এমন প্রলাপ বাক্য যেন কস্মিনকালে আপনার মুখ থেকে নির্গত না হয়।

রাজা : গবুচন্দ্র! মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়?

৩) : মহামান্য! আমি বলতে চাইছি রাজা মানেই সন্তানের মঙ্গলার্থে শাসন,অন্তরে মায়ের কোমল মূর্তি! শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী হতাশায় আত্মহননের দিকে যাচ্ছে। নিম্নবিত্তের অবস্থা করুণ!

৪) : মশাই অনেকদিন অনেকভাবে আপনাকে বলা হয়েছে মুখ বন্ধ রাখুন।

১) : আপনাকে মনে হয় আর বাঁচাতে পারছি না।

রাজা : ও! এত কথায় মলিন ধূলার সমস্যা মিটছে না তো! গবু - গবুচন্দ্র .....

গবু : মহারাজ— এসব তর্ক-বিতর্ক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সভা মুলতবি বুদ্ধিমানের কাজ। সাপটাও মারা গেল, লাঠিটাও ভাঙ্গল না।

রাজা : (এদিক ওদিক অসহায়ের মত তাকায়)
(হঠাৎ করে)— আজকের সভা এখানে মুলতবি।
(রাজা মহারানি মহারনি ডাকতে ডাকতে প্রস্থান)
গান চলে : চল সমান পথে
কোরিওগ্রাফি চল নিয়ম মতে

নাচ গান (ক্রস করে) (৩নং পারিষদ নাচ-গানে অংশ নেবে না, অন্যদিকে প্রস্থান করবে)

তৃতীয় দৃশ্য

(ফুল বাগানে মহারানি পাখিদের সাথে, গাছের সাথে কথা বলছে)

মহারানি : ও পাখি— বল তো পাখি ডানা মেলে তোরা কতদূর যাস? ঐ আকাশে ভাসতে

ভাল লাগে খুব! তাই না রে! জানিস আমারও ইচ্ছে—ডানা মেলে তোদের সাথে যেতে। (মহারানি - ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে রাজা)

রাজা : মহারানি নির্জনে কাহার সাথে বাক্যালাপ করিতেছ? মহারানি তুমি ঠিক আছো তো?

মহারানি : কি হয়েছে তোমার আজ মহারাজ? এই অসময়ে রাজকার্যে বিরতি কেন দিলে!

রাজা : মহারানি আমার তো সমস্যার ব্যামো!

মহারানি : ওম! সেকি! কি হল! কতদিন ধরে বলছি মহারাজ, অমাত্যবর্গের ওপর রাজ-দায়িত্বভার ভাগ করে দাও। সবাইকে স্বাধীনতা দাও মহারাজ, সবাই ভাল কাজ করবে, প্রজার মঙ্গলার্থে এই সিদ্ধান্ত নাও মহারাজ!

রাজা : মহারানি- আচ্ছা তুমি তো বুদ্ধিমতি, বলতো "মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়?"

মহারানি : ও! আর পারছি না! কতদিন বলেছি তোমায় প্রজার কাছে রাজা পিতাসম, দেবতা নয়! আচ্ছা চল তো ঐ নদীর তীরে গিয়ে আমরা পাখিদের কথা শুনি, ঐ দেখো রাজা কি সুন্দর প্রজাপতি! আর ঐ ধূলোর মধ্যেই শুয়ে শুয়ে ভালোবাসার গান গাইছে ঐ যে ছেলে-মেয়ে দুটো!

রাজা : তোমার মুখটা কি সুন্দর লাগছে রানি! এই গোধূলি বেলায় সূর্যের শেষ রশ্মির ছায়া! এত সুন্দর! এটা কি ফুল রানি?

রানি : বুনো ফুল রাজা।

রাজা : আমার প্রাসাদের মালি আসে এখানে?

রানি : মহারাজ - তাও জান না, এরা স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে বলেই এত সুন্দর, ধূলা-ভরা জীবন বলেই এত পবিত্র।

ফুল বলে ধন্য আমি
ধন্য আমি মাটির পরে
ফুল বলে

(ধূলোর ফুল কুড়িয়ে রাজা রানির খোঁপায় দেয়)

(Light off)

চতুর্থ দৃশ্য

(Light on)

(নিজেদের মধ্যে শিল্পীদের আলোচনা)

১) : কথা ছিল প্রতিটি দৃশ্যের পর আলোচনা হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভুলগুলো ঠিক কর।

বি : হারু তুই বুঝেছিস তোর কোন্ জায়গাটা অন্ধকারে পড়ে আছে? spot --- কাঁপল কেন?

হারু : কাঁপত না কেরে— হের ত মন কেমনে তাড়াতাড়ি সাইরা লাইত।

২) : কার কোথায় dispute হয়েছে নিজেরাই বল, অপু তুমি বল—

অপু : Sir, dialogue ভুলে গেছি— এক জায়গায় কি বলতে কি বলেছি— নিজের কাছে নিজে বড়ো হওয়াই আসল ধর্ম এই জায়গায় বলছি— আসল বর্ম (অন্যেরা হাসে)।

বি. : ওমা অন্যের ভুলে হাসি! নিজের দিকে দেখ, (প্রত্যেকে দেখে একজনকে) আরম্ভ হয়ে গেছে, অথচ তোমার ঢুকতে late হল কেন? ঘুমিয়ে গিয়েছিলে?

৪) শিল্পী : দিদিকে বার বার বলি script রেখে দিতে। দিদি কেবল script পড়ে।

বি. : শিখা তোমার ব্যাপার কী?

শিখা : দাদা .....

দিদি : তোমাকে আমি বলছিলাম না; চল আমাদের জায়গাটা আলাদা ভাবে করি।

সবিতা : হ্যাঁ, তুমি কী বলছিলে
দিদি লাগত না, পাইরালামু,

দিদি : জানত সব কিছুই অনুশীলন নির্ভর, কল্পনায় victory-stand-এ উঠা যায় না।

শিখা : (নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে)।

স্যার : দিবাকরের কি হল?

সাগর : স্যার দিবাকর wings এর ভেতর দাঁড়িয়ে নাটক দেখায় মগ্ন।

স্যার : বাঃ ! চমৎকার emotion ভাল, তবে have no control, performance emotion দিয়ে চলে না, perfection-এ ধ্যান রাখবে।

৯). : এই যে তুমি— তোমার সাথে কি কথা হয়েছিল? কিভাবে বলবে তুমি? সুরে সুরে কথা বল কেন? তুমি তো সাধারণ নাগরিকের একজন হয়ে আছ, তুমি কথাগুলো natural বলবে, রাজসভায় আছ!

চা গরম চা— চা গরম গরম — (চা নিতে নিতে আলোচনা মাইমে) ঠিক আছে— সবাই প্রস্তুত? তোমদেরকে বলছি, একটা কথা— মনে রাখবে, দর্শকরা আমাদের ঈশ্বর, প্রাণের আকুতি অভিনয়ে ঢেলে দেবে, তবেই দর্শকরূপী ঈশ্বর তৃপ্ত হবেন। ঠিক আছে— best of luck.

শিল্পী : (মঞ্চের একদম সামনের সিঁড়িতে প্রায় হারুকে নামিয়ে নিয়ে) হারুদা আমি ঢোকার আগেই light দিলেন কেন?

হারু : Music দিল কেন? (Light off)

৫ম দৃশ্য

Light on

(বিউগল বাজনা— রাজার জয়ধ্বনি .....)

রাজার প্রবেশ : (সকলে) মহারাজ হবুচন্দ্রের জয় হোক!

রাজা : গবুচন্দ্র! রাজ্যের খবরাখবর সব ভালো তো!

গবু : মহারাজ আপনার মত দেবতার রাজ্যে সর্বদাই তো পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

রাজা : আঃ! মহারানি, মহারানি! তুমি কেন অন্তঃপুরে? দ্যাখ দ্যাখ রাজ্যের সর্বত্র প্রজারা মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছে।

(বি উগলে রাজসভায় মহারানির প্রবেশ)

গবু : প্রজাবর্গ শান্ত, বিনয়ী, সম্মোহিত কোন উৎপাত নেই!

৪). : বেটাদের সাবুদ করে দিয়েছি মহারাজ! প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা কত দেখিয়ে দিয়েছি।

রানি : মন্ত্রীমশাই, সেনাপতিজি আপনাদের ক্ষমতা অপব্যববহার হচ্ছে না তো!

(একসাথে সবাই) না রানি মা—

রানি : দেখবেন এমন যেন শুনতে না হয় "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি"

(দূতের প্রবেশ)

দূত : মহারাজের জয় হোক!

রাজা : (হাসি দিয়ে) বল দূত কী সমাচার

(দূত- পত্র - পণ্ডিতের হস্তে প্রদান করে)

পণ্ডিত: মহারাজ! রাজ্য প্রতিপালনে আপনার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করে সম্রাটের নিকট থেকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

রাজা : (এদিক ওদিক চায়) মহারানি!

গবু : উপরন্তু বিভিন্ন রাজ্যসমূহ আপনার জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করিবেক।

পণ্ডিত : মহারাজ! (আহ্লাদে গদগদ) মহারাজ ! স্বয়ং সম্রাট আপনাকে তার প্রাসাদে আহ্বান করেছেন!

সবাই : (Expression দেয়) (সাথে সাথেই একজন একজন করে দাবি জানায়)

৬). : মহারাজ! আগেই বলে রেখেছিলাম সেবাকার্যের ভার আর কারও উপর দেওয়া যাবে না, অতএব আপনার বিদেশ যাত্রায় আমাকেই সাথে যেতে হবে।

রাজা : হ্যাঁ তাইতো! আমার সেবাকার্য কে করিবে, আমার পদযুগলে মলিন ধূলার সমস্যা সমাধান কে করিবে ??

বলতো হে বদ্যি মশাই— তোমার ছাড়পত্র পাইলেই আমি বিদেশ গমনে তথা সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইবার আয়োজন করিতে পারি।

বদ্যি : আপনার দেহে কখন কোন্ সমস্যা হয়, তার জন্য জরিবুটি কি দরকার তা তো আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। আপনার বিদেশ যাত্রায় আমাকেই যেতে হবে, রাজা মশাই।

রাজা : তাই তো! তাই তো!

আচ্ছা সভাপণ্ডিত আপনার আশীর্বাদে স্বদেশ-বিদেশ সর্বত্র আমি সম্মানিত, পাজি-পুঁথি অনুসারে যাত্রার শুভকাল নিরুপণ করিয়া আমাকে বাধিত করুন।

পণ্ডিত : মহারাজ! প্রবাসে সম্রাটের দরবার কক্ষে আপনার বুদ্ধিদীপ্ত-সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ

তৈরী করা উপরন্তু বিদগ্ধ-সমাজের উপযুক্ত সংলাপ রচনা করিয়া আপনার মান রক্ষা করা আমার কর্তব্য, নিজের আনন্দের চাইতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনার সুশাসন, গরিব-কল্যাণ, প্রজা সেবা বিষয়ে সম্রাটের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা আমাকেই চিন্তা করিতে হইবেক।

রাজা : তাইতো! তাই তো!

রানি : মহারাজ! কোন কিছুতেই অতি উৎফুল্লিত হবার কারণ দেখি না, সুখে দুঃখে সমদর্শিতা যোগীর লক্ষণ, স্বীয় আনন্দ অপেক্ষা মহারাজ যদি প্রজার সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে ভাবেন তাহলেই হবে প্রকৃত সুশাসন, গরিব-কল্যাণ।
(মহারাজ হতাশ নয়নে মহারানির দিকে তাকায়)

৩). : মহারাজ! মহারাজ! দেখছি রাজকর্তব্যের চাইতে বিদেশ ভ্রমণে সবাই উৎসুক, তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতে রাজ্যে আকস্মিক কোন সমস্যার মোকাবিলা কে করবেন?

রাজা : তাই তো, এটা তো ভারি চিন্তার বিষয়, কী করা যায় বলতো?

২) : সব কিছুতেই আপনার এত বাড়াবাড়ি কেন মশাই?
Disgusting!

১) : আচ্ছা; রাষ্ট্রবিপ্লবের এই আগমন বার্তাটি আপনি পেলেন কোথায় মশাই? সব আলোচনাতেই সমালোচনা করাটাই আপনার ধর্ম? তাই না?

(প্রবেশ করে রাজদূত-২)

দূত : মহারাজের জয় হোক!

রাজা : বলো হে দূত! কি সমাচার! আবারও কোন উপঢৌকন কোন রাজ্য থেকে এসেছে?

দূত : না — মহারাজ উপঢৌকন নয়— দুঃসংবাদ।

রাজা : এ্যাঁ —— কী, কী বললে দুঃসংবাদ কি হয়েছে? বিদেশী আক্রমণ? কোন রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে? আমার সোনার রাজ্য!
(রাজা থতমত খেয়ে সিংহাসন থেকে নেমে আসে)
মহারানি! মহারানি! — কি করব এখন!
(পাত্র মিত্ররা এক এক করে)
উদ্বেগ করবেন না মহারাজ, বিপদে মস্তিষ্ক শীতল রাখা বাঞ্ছনীয়, আমরা আছি তো!

গবুচন্দ্র : গুপ্তচরদের ডাকা হোক মহারাজ!

রাজা : হ্যাঁ গুপ্তচর! গুপ্তচরেরা কোথায়? ডাকা হোক! সত্যিই তো! তাদের নিমিত্ত মাসোহারা দিতে গিয়ে রাজকোষ শূন্যপ্রায়!

৩) : কর্মচারীদের বেতনের খোটা দেবেন না মহারাজ! তারা খেটে খায়, আপনার এবং

আপনার রাজসভার সদস্যদের কারণে অকারণে বিলাসবহুল জীবনের হিসাবে খাতাটি কোথায় সরজমিনে তদন্ত হোক।

৪) : ও! আপনি চুপ করবেন মশাই! দূর্দিনেও আপনার বাহুল্য বাক্যালাপ সত্যিই রাজসভায় উপদ্রপের বিষয়

রাজা : মহারানি! মহারানি! আপৎকালে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা মহারানি! কে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! আমিতো কখনও বলিনি।

রানি : উত্তেজিত হবেন না মহারাজ! এতক্ষণ সব বিষয় না শুনেই অস্থির হয়েছেন। আগে দূতের মুখে সব শুনুন!

রাজা : বলো হে দূত—

দূত : রাজামশাই, শিক্ষিত প্রজারা অন্য সবাইকে সচেতন করে চলছে।

গবুচন্দ্র : কী!

দূত : বিভিন্ন অধিকার বুঝে নিতে চাইছে।প্রতিনিধিরা আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

রাজা : মহারানি! মহারানি! গবুচন্দ্র, পণ্ডিত .. ..(রাজার চেহারায় উদ্বেগ প্রকাশ)

২) : মহারাজ আপনার ঘরের শত্রু বিভীষণ

রাজা : অ্যাঁ বিভীষণ? বিভীষণ! (ডাকে চিৎকার দিয়ে) কোথায় বিভীষণ? তাকে শূলে চড়াও।

(রাজা উঠে সভায়— পদচারণ; আস্ফালন করে)

প্রবেশ করে দূত-৩

গবু : আবার কী? তুমি আবার কোন আর্জি এনেছ? কী আছে কাগজে? (ধমকের সুরে)

রানি : মন্ত্রী মশাই— ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না, আগে দেখুন, শুনুন—কি জন্যে এসেছে? এরা জনপ্রতিনিধি, এদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির উপর এই রাজসভার অস্তিত্ব, এদেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্তম্ভে।

গবু : পণ্ডিতমশাই এ পত্র পাঠ করে শোনান।

পণ্ডিত পাঠ করে—

মহারাজ! প্রার্থনাপূর্বক নিবেদনমেতৎ— মহারাজাধিরাজ - সকাল সন্ধ্যায় আপনার রথ আপনাকে নিয়ে নানা কর্মে নগর পরিক্রমা করে। বিশেষ করে সকাল ৯-৩০ থেকে ১০-৪৫ ঘটিকা উদ্বেগ কাল! মহারাজ ঐ সময় বিদ্যার্থী, শিক্ষক শিক্ষিকামণ্ডলী এবং রাজ্যের অন্যান্য বিভাগীয় রাজকর্মচারী স্বীয় কর্মস্থানে যায়। মহারাজের রথের জন্য তারা পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি দিতে বাধ্য হয়।

১) : রাজ্য যার অধিনস্থ তাঁর গতিবিধি উল্লেখ করার ধৃষ্টতা তোমাদের কে দিল?

২) : উদ্ধতপনা!

পণ্ডিত : (কাগজ পড়ে) মহারাজ আপনাকে সম্মান দেখানের খেসারত দিতে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে কর্মচারী বৃন্দের বিলম্ব হয়। শাস্তি স্বরূপ তাদের কপালে লাল কালিতে রক্ত তিলক এঁকে দেওয়া হয়, এটি তাদের নিকট অত্যন্ত অপমানকর।

২) : Disgusting!

৩) : মহারাজ আমজনতার দ্বিতীয় প্রার্থনা— শ্রবণ করুন (সমস্বরে)— আরও প্রার্থনা

পণ্ডিত : মহারাজ যে সমস্ত রাজ-কর্মচারী শিল্প-সংস্কৃতির সাথে জড়িত থেকে সমাজের সার্বিক বিকাশের কাজটি নিঃস্বার্থভাবে (পণ্ডিত দেখছে বা দূত পড়ছে- অন্যরা রাগ হচ্ছে) (রাজা মাথায় হাত, গবু চোখ বড় করে) ৩নং নির্বিকার। অন্যজন উঠে দূতকে ধমকায়) করছে তাদেরকে বৎসরে অন্তত: ১২দিন বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

পরিষদ: (পারিষদের মধ্যে কেউ একজন উল্টো করে শ্বাস টানবে) .... এ্যাঁ! .....

৩ : হ্যাঁ কাবণ overtime-এ সবাই টাকা পায়, compenstory পায় এরা পাবে না কেন?

দূত : মহারাজ! অভিযোগ আরও আছে (সবাই সমস্বরে) — আরও!

দূত : মহারাজের সভায় নারী জাতীর সংখ্যা বাড়িয়ে সমান সমান করতে হবে।

পণ্ডিত : ঘোর কলিকাল! ধ্বংস অনিবার্য!

পরিষদ২: Yes Disgusting!

রাজা : গবু বল কিছু?

গবু : (চিন্তায় আছে, হঠাৎ করে গোপন পরামর্শ করে) মহারাজ প্রজাদের নিজেদের মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিন। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দিলে আপনার রাজকার্যের উপর দৃষ্টি দিতে সময় পাবে না, তাকে বলে Divide and rule policy; রাজনীতিতে এর চাইতে মোক্ষম দাওয়াই আর হয় না।

রাজা : গবু— এই না হলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী! (আহ্লাদে গদ গদ)

৫) : মহারাজ বুঝে বুঝে কিছু কাউকে ডেকে এনে সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিন। এই system-এ গোটা বিশ্ব হাতে আনা যায়।

রাজা : (তাকায়— অসহায়ের মত) আনা যায়!

৩) : ও! তাই নাকি! (বিদ্রূপাত্মক সুরে)

দূত : আরও আছে মহারাজ! মেধাভিত্তিতে যোগ্যতার মূল্য দিতে হবে।

গবু : তোমরা কী চাইছ বলত? এমন রত্ন বিশেষ মহারাজকে সিংহাসন চ্যুত করা হোক!

রাজা : অ্যাঁ গবুচন্দ্র ....

গবু : ঘাবড়াবেন না রাজাধিরাজ— আমরা আছি তো!

৩) : (বিদ্রূপের সুরে) আমরা আছি তো! (হা হা হা ..... হাসি)

দূত : মহারাজ! জাতপাত নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তৃতা বন্ধ করে সবাইকে সমান চোখে দেখুন। রাজ্যের এবং দেশের ভবিষ্যতের মঙ্গলের কথা ভেবে; এছাড়া আর উপায় নেই। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করুন রাজা মশাই।

১) : মহারাজ ওদের সব কথায় সায় দেবেন না,

২) : আরে ধ্যুৎ— অভাব এদের নিত্যসঙ্গী, একটা না একটা Demand এদের থাকবেই।

৩) : প্রভু, আমি বলি কি ওরা রাজসমীপে আসতে চাইলে আসতে দিন। বলতে চাইলে বলতে দিন!

৪) : কি বলছেন? রাজভাণ্ডার স্বয়ং রাজকূল লক্ষ্মীমাতার অধিগত, এই ধন-সম্পদ শুধু রাজপরিবারের এবং রাজকর্মে উচ্চ পদাধিকারিদের সৌজন্যে ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩) : আরে মশাই বুদ্ধি রাখুন। প্রজা আসবে রাজার কাছে মনের কথা শোনাতে। অবশ্যই তাদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনবে। তারপর .... (হাসি)।

১) : বুঝেছি— চলে গেলেই (বুড়ো আঙ্গুল দেখায়) (সবাই হাসে)

৬) : কতদিন আসবে? জুতোর শুকতলি যাক্ (আবার হাসি)

২) : আসা বন্ধ! (হিন্দী স্টাইলে)

৫) : মহারাজ নিজের বুদ্ধি অন্যের কাছে বন্ধক রাখবেন? প্রাসাদের বাইরে আপনার সম্পর্কে কী সব ভাষা প্রয়োগ হয় জানেন?

৪) : থাক্ আপনার ভাষণ রাখুন মশাই। 'পেছনে রাজাকে শালা বলে' এটা নূতন কিছু নয়।

রাজা : অ্যাঁ, তাই বলে শালা (কাঁদো কাঁদো) (রাজাকে সান্ত্বনা দেয় পারিষদ। একজন এসে কানে কানে কথা বলে)
(রাজার মুখে হাসি ভাব)

৩) : ওমা! শালা তো আপনার জন। মধুর সম্পর্ক!

৫) : (বিদ্রূপের সুরে) হ্যাঁ প্রিয়তম! সখা মোর!

রাজা : আমার মন্ত্রীপরিষদ! খাসা!

৬) : মহারাজ, মুখে বললে হবে না। ফিস্টি দিতে হবে।

২) : (রাজার কানে গবু কি যেন বলে যায়)

রাজা : OK, No problem!
মঞ্চের (অন্য কোনে মুজরা নাচ ..... 'ঝুমকা গিরা রে .....) (অপরদিকে পারিষদদের সুরাপান, ঢলাঢলি, রাজা মুক্তার মালা খুলে বাঈজির গলায় পরাতে যায়। গবু .....

৫) : (তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

রানি : একি রাজা তোমারও পরিবর্তন! আটপৌরে ভাষায় নতুন বেশে নতুন রাজা!

রাজা : রানি! কি হয়েছে তোমার?

রানি : তুমি কিছু বলতে চাও? প্রাণ খুলে বল সখা, এখনই তো সময়, মনের আগল খুলে

দাও রাজা।

রাজা : রানি কি করব বলে দাও।

রানি : দ্যাখো! সূর্যস্নাত চন্দ্রস্নাত ধরণী তার সন্তানকে কোলে নিতে আঁচল বিছিয়েছে!

রাজা : এ্যাঁ কোথায়?

রানি : দেখবে সখা চলো যাই— ঐ আকাশতলে মাটির পৃথিবী মাঝে।
(রাজা রানি - জোন পরিবর্তন করে (লাইট-এর আভা পরিবর্তন)

রাজা : ওমা কি সুন্দর! এটাই তোমার স্বর্গ বুঝি!

রানি : হ্যাঁ রাজা— রাজত্ব তুলে দাও— আসল মালিকের হাতে— হৃদয়-দেবতার আর্তনাদ শোন সখা। (দূরে ফসলের মাঠে একদল যুবক যুবতী— নৃত্য গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে) "আপন হতে বাহির হয়ে / বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে/বিশ্বলোকের পাবি সাড়া" কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে ভেসে হবে (প্লুতস্বর দিয়ে)।
রাজা জানালার কাছে যায়, তাকায়!

রাজা : আঃ কী অপূর্ব! ও মেয়েরা! ওগো! ও ছেলেরা! তোমরা কারা? ওগো! কোথা থেকে পেয়েছ এই সুর?

ছেলে মেয়েরা : (একজন একজন করে বলে)
হ্যাঁ রাজা, আমরা বুকের ভেতর থেকে পেয়েছি এ সুর .....

অপরজন : তোমার বুকেও আছে রাজা .....

: হ্যাঁ তোমার বুকেও আছে .....

গান : "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া /বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া"

রাজা : (রাজা বুকে হাত দেয়)
ও ছেলে মেয়েরা কোথায়? আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না— তোমরা আমায় বলে দাও! (কাঁদো সুর করে) খুঁজে দাও তোমরা!
(একজন একজন করে বলবে)

ছেলে মেয়েরা : পাবেগো রাজা ঐ প্রাণের অলিন্দেই যেখানে ভালোবাসা, ভাললাগার ঘর বেঁধেছে নীল আকাশের গায়ে, মেঘলা বাতাসে, আর মাটির সোঁদা গন্ধ ভরা সবুজ বনে। আর পথের ধুলোর পাগল পারায়।

রাজা : ওমা! তাই বুঝি! সে কি তোমরা ধুলোমাটির মধ্যে এত আনন্দ কর কী করে? এতো মলিন ধুলো।

ছেলে মেয়েরা : তাও জানো না রাজা! মাটিই তো আদি প্রাণের উৎস।
(অন্যদিকে পারিষদরা বেরিয়ে মুখ চাওয়া- চাওয়ি করে। ভাবে রাজার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে) (রাজা ফিরে আসে নৃত্য-গীতরত ছেলে মেয়েদের সাথে)
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা

মনে মনে

রাজা : (নাচে, গানে অংশ নিতে যায়)

" আমায় নয় আমাদের এই রাজপুরি তোমাদের পেয়ে কেমন নূতন প্রাণ পেয়েছে দ্যাখ ..... (রাজা চিৎকার করে) গবুচন্দ্র, পণ্ডিত মশাই, বদ্যিমশাই, কতোয়ালজি আসুন সবাই —

রানি : (হাতে যাদুকাঠি) আমার যাদুকাঠি দিয়ে চল সবার মধ্যে প্রেমের স্পর্শ, মানবতার স্পর্শ দিয়ে দিগন্তের নব ঊষাকে স্বাগত জানাই।

নাচতে নাচতে ছেলে মেয়েরা মঞ্চে একে একে আসা পারিষদের হাত ধরে,

(রাজা সবার সাথে মিশে আনন্দে মাতোয়ারা)

কোরিওগ্রাফি :

নাচ- আমরা সবাই রাজা
আমাদেরি
রাজার রাজত্বে
নইলে মোরা রাজার সাথে
মিলব কি শর্তে
আমরা সবাই রাজা

গ্রন্থঋণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 'তাসের দেশ', 'গীত বিতান'

লেখিকা : **গায়ত্রী চৌধুরী, রাজ্যের বিশিষ্ট অভিনেত্রী।**

Playwright : **Gayatri Chowdhury, eminent Actress of Tripura.**

জয়মন্ত্রধারানাম

■ সুদীপ্ত দত্ত

চরিত্র

রায়তী, সুহোত্র, রিক, সুনন্দা, বসুনন্দা, রেবতক, মাধবসেন, চন্দ্রগুপ্ত, কুমার, বপ্প, জ্যালুক, যুবক ১, যুবক ২, যুবক ৩, চিত্রার্থ, বীরসেন, কালিদাস

(অভিনয়সত্ত্ব সংরক্ষিত)

(রায়তী একটা মোবাইলে খুটখুট করতে থাকে। একটা ফোন আসে)

রায়তী : হ্যাঁ বল। কোথায় আবার? মিডিয়া হাউসের বাইরেই ওয়েট করছি। সুহোত্র প্রডিউসারের সাথে কথা বলতে গেছে। আরে প্রায় ঘন্টা খানেক হলো ভেতরে গেছে। আমার টেনশন হচ্ছে রে। ও কাজটা নিয়ে ওত প্যাশনেট হয়ে গেছে। হাউসের সাথে ঝামেলা না বাঁধিয়ে বসে। প্রোডিউসার তো শুনেছি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লোক। সুহোত্রর প্রজেক্টটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে বাঁচি।
(সুহোত্র ফাইল, ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করে। তরুণ থমথমে মুখ।)
মনে হচ্ছে কেলো একটা বাঁধিয়েছে গোঁয়ার গোবিন্দ। তুই রাখ। আমি পরে রিং ব্যাক করছি। (ফোন কাটে) কি হলো?

সুহোত্র : কি হতে পারে বলে ভেবেছিলি?

রায়তী : হাউস স্যাটিসফায়েড না?

সুহোত্র : ওরা আমার পয়েন্ট অব ভিউ মেনেই নিতে পারছে না। ব্রাহ্মণ্যবাদের হেজিমনির সাথে গণশাষণব্যবস্থার পতনের বা বলা ভালো ধ্বংসকরণের যে একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে সেটা জাষ্ট উড়িয়ে দিচ্ছেন। ডেয়ারসি বললেন স্ক্রিপ্ট থেকে এ অংশটা বাদ দিতে হবে।

রায়তী : তোর ডিরেক্টর ডিফেন্ড করেননি?

সুহোত্র : করেছেন। মিনমিন করে। ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার্সের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যতটা করা যায়। তার ওপর সেক্রেটারির টেনিউর শেষ আগামী মাসে। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এ সময় কেউ কর্তাদের বিরাগভাজন হতে চায়? ডিরেক্টরও বললেন স্ক্রিপ্টটার পার্সপেক্টিভ পাল্টে ফেলতে।

রায়তী : তুই কি বললি?

সুহোত্র : কিছু বলিনি। ফাইলপত্তর গুছিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

রায়তী : তোর স্ক্রিপ্ট? তোর গবেষণা ? তোর এতদিনের পরিশ্রম?

সুহোত্র : আমি ঠিক করেই নিয়েছি আমিই সিনেমাটা বানাবো। বরং এটাই ভালো হবে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রিলিজ করব। সেন্সর বোর্ডের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ছবিটা

বরং মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। এই কাজটা মানুষকে দেখানো আমার একটা পার্সোনাল এজেন্ডা।

রায়তী : পার্সোনাল এজেন্ডা ?মানে?

সুহোত্র : একটা সিগারেট খাওয়া?

(রায়তী সিগারেট দেয়। দুজনেই ধরায়)

সুহোত্র : আমার নাম কী?

রায়তী : হোয়াট আ সিলি কোশ্চেন?

সুহোত্র : বল না,

রায়তী : সুহোত্র

সুহোত্র : পুরোটা বল।

রায়তী : সুহোত্র রস্তোগী।

সুহোত্র : তোর?

রায়তী : মানে? ওকে- রায়তী। ওক্কে বাবা, রায়তী অগ্রবাল।

সুহোত্র : মস্তিস্কের ঘন্টায় কোনও রিং হল না।

রায়তী : কী বলছিস?

সুহোদ্র : সর্বক্ষত্রাবিস্কৃত বীর -শব্দ-জাতোৎসেকানা যৌধেয়ানাং। শক মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ।

রায়তী : সো?

সুহোত্র : আজ থেকে প্রায় আঠারোশ বছর অগে হলে আমি হতাম যৌধেয় আর তুই যৌধয়ানী।

রায়তী : হোয়াট?

সুহোত্র : ইয়েস, তুই আমি দুজনেই আর্যাবর্তের শেষ গণশাষণব্যবস্থা যৌধেয়দের উত্তরসুরী-ডিরেক্ট অ্যানসেষ্টার। যৌধেয়নাং বহুধান্যকানাং । যৌধেয় গণস্য জয়ঃ।

(দৃশ্যান্তরে দেবী সুনন্দা এবং সহচরীগণ। সুনন্দা গীতরতা।)

সুনন্দা : ক্বশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগোন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চত্রে জনকতনয়াস্নানপুন্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং

বপ্রক্রীড়াপরিণগতজপ্রেক্ষনীয়ং দদর্শ।।

বসুনন্দা : সখী, মহাকবি কালিদাসের এই কাব্য যতবার তোমার সুললিত কণ্ঠে শ্রবণ করি, ততবার মন আমার উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু সখী এতো বিরহী যক্ষর মনোবেদনার প্রকাশ। বিরহিনী যক্ষিণীর কথা তো এ কাব্যে মহাকবি বলেন নি সুনন্দা?

সুনন্দা : তুমি তো প্রেমের গমনাগমন সম্পূর্ণ অবগত বসুনন্দা। ভ্রাতা রেবতকের সঙ্গে তোমার প্রণয়দিনের কথা কি তুমি বিস্মৃত হলে? তোমার কি মনে হয় না সত্যকার প্রেমে বিরহী এবং বিরহিনী একাত্ম হয়ে যায়? মেঘদূতের যক্ষর বিরহ যে পৃথিবীর সমস্ত মিলনেচ্ছায় ব্যাকুল প্রেমীদের মনের কথা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে। এইজন্যই তো তিনি মহাকবি। এ যৌধেয়ভূমির প্রতি গৃহে কবিবর কালিদাসের এত সমাদর।

বসুনন্দা : আমার কিন্তু অভিযোগ আছে তাঁর প্রতি। মেঘের অলকাপুরী যাওয়ার পথেই তো আমাদের যৌধেয়ভূমি। স্বর্গাপেক্ষা গরিয়সী এই অগ্রদকা নগরী। কই মহাকবি তো একবারও উল্লেখ করলেন না এই ভূমির কথা! অলকা কি আমাদের এই যৌধেয়ভূমির থেকেও বেশী সুন্দর?

সুনন্দা : কোনো স্থানের সৌন্দর্যের বিচার যদি সে স্থানে থাকা মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাকে নিয়ে হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত বসুনন্দা সমগ্র আর্যাবর্তে যৌধেয় ভূমির তূল্য সুন্দর স্থান কোথাও নেই।

(রেবতকের প্রবেশ)

রেবতক : সঠিক নিরীক্ষণ দেবী সুনন্দা। আমি অতীতে ভ্রাতা কুমারের সাথে প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত ভ্রমণ করেছি। পূর্বে পাটলিপুত্র থেকে পশ্চিমে গান্ধার রাজ্যের পুরুষপুর পর্যন্ত। অবন্তীর উজ্জয়নীতে যেমন গিয়েছি তেমনি হিমালয়ে উৎসব সংকেতেও পরিভ্রমণ করেছি। কিন্তু সত্য বলছি আমাদের যৌঘেধয় বা কুনিন্দ বা অর্জুনায়ন গণশাষণে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যেরূপ আনন্দে জীবন অতিবাহিত করে, সেরূপ কোথাও দেখিনি। বিশেষত: রাজশাষণে নারীগণের অবস্থা দেখলে তো চক্ষে জল আসে।

সুনন্দা : ঠিক বলেছো ভ্রাতা রেবতক। কুমারের মুখে শুনেছি পাটলিপুত্রের অন্তঃপুরের কথা। পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের অন্তঃপুরে সহস্রাধিক রাণী। প্রত্যেকেরই অবস্থা বৃক্ষাশ্রিত লতার মতো, আত্মপ্রত্যয়হীন।

রেবতক : ভ্রাতা কুমার আমাকে যবন ও রোমক দেশের কথাও বলেছে। যদিও সেখানে জনগণ রাজার জীবনযাত্রার ওপরে সামান্য হলেও অঙ্কুশ লাগাতে পেরেছে। রাজা সেখানে একাধিক বিবাহ করতে পারেন না বটে তবে সেখানেও ক্ষমতা

ও বৈভবের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে শত নারীকে পরিচারিকারূপে রেখে। বলাই বাহুল্য তাদের স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না।

সুনন্দা : ভ্রাতা রেবতক কুমারের কোনো সন্ধান পেলে?

রেবতক : না দেবী। সিংহলে গিয়ে শুনেছি ভ্রাতা কুমার সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন।

সুনন্দা : কোথায়?

রেবতক : সেটা কেহই বলতে সক্ষম হননি। কিন্তু ভিক্ষু কুমারের প্রতি সিংহলবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমি অবলোকন করেছি। এমনকি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শ্রেষ্ঠী সার্থবাহরা পর্যন্ত ভদন্ত কুমারের ধর্মোপদেশের অনুরাগী ছিলেন।

বসুনন্দা : না জানি ভিক্ষু জীবনের কৃচ্ছসাধন ভ্রাতা কুমারের স্বর্ণশরীরে কিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

রেবতক : আশ্বস্ত থাকো বসু। কাষায় চীবর পরিধান, দিনান্তে অন্নগ্রহণ আর মুণ্ডিত মস্তকও কুমারের যৌধেয় কান্তিশোভায় কিছুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারেনি।

বসুনন্দা : তুমি কি করে নিঃসন্দেহ হলে?

রেবতক : কুমারের সিংহলি ভক্তদের মধ্যে মহিলাবৃন্দের প্রাধান্য এই অনুমানকেই দৃঢ় করে প্রিয়তমা। তবে তার জন্য দেবী সুনন্দার বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আমি ভ্রাতা কুমার ঠুলি পরা অশ্বের ন্যায় একদিকে চলতেই অভ্যস্ত।

সুনন্দা : আমি আমার জন্য বিচলিত হই না ভ্রাতা, আমি উদ্বিগ্ন আমাদের গণের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কুমার নিজে নির্বাণ লাভ করার জন্য শ্রমণের জীবন যাপন করছে— এই তথ্য আমাকে বিস্মিত করছে!

রেবতক : এত শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ো না দেবী। আমি নিশ্চিত কুমারের লক্ষ্য আরও বৃহত্তর। আমার অশ্বগুলিকে একটু জলপান করাও বসু। কুমার তথাগতর অনুরাগী হলেও সে তার মাতৃভূমির ঋণশোধ করতে কখনো পিছপা হবে না। সে সর্বপ্রথমে যৌধেয়। স্বাধীনচেতা।

(প্রৌঢ় বপ্প প্রবেশ করেন। বসুনন্দা প্রণাম জানিয়ে প্রস্থান করে)

বপ্প : কিন্তু আজ আমাদের স্বাধীনতাও অতি বড় প্রশ্নের সম্মুখীন রেবতক।

রেবতক : প্রণাম আর্য বপ্প। কিন্তু যৌধেয়ভূমিতে যেখানে সর্বত্রই শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান সেখানে যৌধেয়গণের মহারাজ মহাসেনাপতি পুরস্কর্তা স্বয়ং আর্য বপ্পর মনে এরূপ সংশয় উদিত হওয়ার হেতু কী?

বপ্প : মহারাজ- মহাসেনাপতি ! তোমার কি জানা নেই রেবতক যে গত গণপরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মহারাজ শব্দটি বর্জন করে কেবলমাত্র যৌধেয় গণপতি সম্বোধনটি গৃহীত হয়েছে?

রেবতক : আমায় ক্ষমা করবেন আর্য। আমি গত সভায় অনুপস্থিত ছিলাম। আপনারই

আদেশে কুমারের খোঁজে সিংহল ভ্রমণ শেষে আমি আজই অগ্রদকা প্রত্যাগমন করেছি।

সুনন্দা : হ্যাঁ ভ্রাতা, গণপরিষদের সভায় আর্য বপ্প অকাট্য যুক্তি সহকারে বিবৃত করেছেন যে গণশাষণ রাজতন্ত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। মহারাজ শব্দটি এক অতি কুৎসিত অসাম্যের প্রতীক। তাই গণপরিষদ শব্দটিকে চিরতরে পরিহার করেছে। আমাদের এই নগরী থেকে যমুনা খুব বেশী দূর নয়। তার ওপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যায় রাজশাষণের লাম্পট্য, কামুকতা আর অন্যের স্বাধীনতা হরণের কী উদগ্র বাসনা!

বপ্প : সঠিক বলেছ সুনন্দা। পাঞ্চাল- কুরুগণ অনেক পূর্বেই তাদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছে। কোশল, চেদী, বৎস, লিচ্ছবিগণের ইতিহাসও আজ পরাধীনতার লজ্জায় আবৃত। আর্যাবর্তে আমাদের যৌধেয়গণেই এখনও গণশাষণ ব্যবস্থা টিকে আছে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব সংশয় আমায় অস্থির করে তুলেছে।

রেবতক : যৌধেয়য়ানাম জয়মন্ত্রধারানাম। কী বলছেন আর্য, যাদের তরবারির আঘাতে দেবপুত্রশাহী কুষাণরা শতুদ্র পার হয়ে গেছে, এমন কি গান্ধার ও যবনদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যসমাবেশ করেও কুষাণরা এই ভারতভূমিতে আজ পাদস্পর্শ করতে পারে না, যাদের উৎপত্তি অজেয় উসিনারাদের থেকে, শক মহক্ষত্রপ রুদ্রদামন যাদের আয়ুধের আঁচে বিদ্ধ হয়েছেন, আপনি সেই যৌধেয়দের পরাজয়ের আশঙ্কা করছেন!

(চিত্রার্থ প্রবেশ করে।)

বসুনন্দা : আর্য বপ্পর আশঙ্কা অমূলক নয় আর্য। সেনাপতি চিত্রার্থ কী বার্তা এনেছেন শোনো।

চিত্রার্থ : প্রণাম গণসেনাপতি বপ্প। নিজভূমে স্বাগত মিত্র রেবতক।

বপ্প : কী সংবাদ চিত্রার্থ?

চিত্রার্থ : দূর মারফত খবর পেয়েছি পাটলিপুত্রে যুবরাজ রামগুপ্ত নিহত হয়েছেন কিন্তু তার মহিষী ধ্রুবস্বামিনী এখন পরমভট্টারিকা রাজমহিষী।

রেবতক : কে হত্যা করল যুবরাজ রামগুপ্তকে? পাটলিপুত্রে এখন সিংহাসনে কে?

চিত্রার্থ : শ্রীগুপ্ত কুলস্য মহারাজাধিরাজ-পরম ভট্টারক শ্রী শ্রী চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

(সকলে প্রবল বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। দৃশ্যান্তর ঘটে। চন্দ্রগুপ্তর দরবার। সমবেত রব ওঠে— "জেদু জেদু ভট্টা।" প্রবেশ করেন চন্দ্রগুপ্ত।)

বীরসেন : জেদু জেদু পরম ভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

চন্দ্রগুপ্ত : বীরসেন যে কাজে তুমি সিংহল গিয়েছিলে সেখান থেকে প্রত্যাগমন শেষে কোনো শুভসংবাদ কি তুমি আমায় শোনাতে পারো?

বীরসেন : আপনার অনুমান সত্য পরম ভট্টারক। ভট্টারক কুমার সিহহলেই বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি চৈত্যপর্বতে যেখানে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র কালাতিপাত করেছেন, ভট্টারক কুমার সেই গুম্ফাতেই বাস করতেন।

চন্দ্রগুপ্ত : করতেন? কুমার এখন সিংহলে নেই!

বীরসেন : না পরমভট্টারক । এক বৎসরকাল পূর্বেই তিনি সিংহল ত্যাগ করেছেন। অভয়গিরি মহাবিহারের মহানায়ক স্থবির সুমন আমাকে তেমনটাই জানিয়েছেন।

চন্দ্রগুপ্ত : এক বৎসরকাল? তার অর্থ আমি সিংহাসনে আরূঢ় হওয়ার ঠিক পরেই। বীরসেন আমি কুমারকে যতটা চিনি, এ মহাবিশ্বে কেহই সে বিষয়ে ততটা পারঙ্গম নয়। আচার্য বসুবন্ধুর প্রিয় ছাত্র কুমার। তথাগতর পাদকমলে তদ্‌গতচিত্ত। তার সাথে পূর্ণসাক্ষাৎ সময়ের অপেক্ষামাত্র। তুমি রণিবাসে যাও বীরসেন। রাজমহিষী দেবী ধ্রুবস্বামীনিকে সংবাদ দাও। তার মাতুল ভট্টারক কুমার যৌধেয়র সাথে প্রার্থিত সাক্ষাৎ সমাসন্ন। দেবী পরম ভট্টারিকা যেন কুমারের জন্য যথোপযুক্ত সমাদর ও উপহারের ব্যবস্থা করেন। এই পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে কুমার আমার অপেক্ষা কিছু কম বরণীয় নহে। যাও।

(বীরসেন প্রস্থান করে)

চন্দ্রগুপ্ত : আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তুমি অপরিহার্য কুমার। আচার্য কৌটিল্যের গুণমুগ্ধ অনুসরণকারী আমি। তাঁরই দেখানো পথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মত এক বিরাট ও অখন্ড আর্যাবর্ত গড়ে তুলবো আমি, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তুবি হবে আমার বলাধিকৃত, মহাসেনাপতি। "বুদ্ধিযস্য বলং তস্য নির্ধেস্ত কুতো বলম। বনে সিংহো মদোন্মত্তো জম্বুকেন নিপাতিতঃ"। তোমার যৌধেয় শক্তির সাথে সাথে তোমার ধী, তোমার বুদ্ধি আমার প্রয়োজন কুমার।

(কালিদাস প্রবেশ করে)

কালিদাস: অন্য একটি উপদেশে কোটিল্য চাণক্য কিন্তু বলেছেন-

আত্মবর্গ পরিত্যাজ্য পরবর্গ সমাশ্রয়েৎ
স্বয়মেব লয়ং যাতি রাজ্যম যাতি ধর্ম্মতঃ

আত্মজনকে ছাড়ি যে
পরজাতির শরণ লহে
ধর্ম যায়, মান যায়
বে-ইমান তারে লোকে কহে

ভন্তে, কুমার ভট্টারকের দেহে স্বাধীন গণের রক্তের প্রবাহ। যৌধেয় গণকে পরিত্যাগপূর্বক তিনি কি আপনার অধীনস্থ হবেন?

চন্দ্রগুপ্ত : মহাকবি কালিদাস! আমার রাজ্যসভার নবরত্নের শ্রেষ্ঠ মাণিক্য। প্রীতি জানবে মিত্র। তোমার অন্তরপুষ্পে যে সংশয় কীটসদৃশ আবির্ভূত হয়েছে সেই দ্বিধাস্বরূপ প্রশ্ন আমাকেও বিদ্ধ করেনি এমনটা বললে সত্যের অপলাপ হবে মিত্র। কিন্তু তুমি তো জানো আমার পিতা পরমভট্টারক সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজমহিষী দত্তাদেবী ছিলেন একজন যৌধেয়ানী। আমি এবং মাতুল কুমার দুজনেই তাঁকে আজ্জুকা বলে সম্বোধন করতাম। আজ্জুকা এক ক্রোড়েই আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া। এক আসনে উপবেশন। এক থালায় অন্ন পরিগ্রহণ। আমি এবং কুমার একসাথেই ভারত পরিভ্রমণ করেছি। দাক্ষিণাত্য থেকে হিমালয়ের উৎসব সংকেত। এই রাজপ্রাসাদে মাতুল তথা ভ্রাতা কুমারের যেমন অধিকার, মাতুলালয় যৌধেয় ভূমিতে আমারও তদৃশ । আমি নিশ্চিত কুমার আমার প্রস্তাবে বিমুখ হবে না।

কালিদাস : ক্ষমা করবেন পরভট্টারক। কিন্তু আপনার পিতার কালে যৌধেয়রা ছিল স্বাধীন এক করদ রাজ্য। তাদের দেয় সামান্য করেই সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত খুশী ছিলেন তাই নয়, বরং অপরিমিত উপহার উপায়নে তার বেশীটাই যৌধেয়দের ফিরিয়ে দিতেন। সেই স্থলে আপনি চাইছেন প্রশ্নহীন আনুগত্য। আয়ুধজীবি গণতন্ত্র যৌধেয়রা কি বশ্যতা স্বীকার করবে?

চন্দ্রগুপ্ত : মিত্র আমি গণশাষণের উপর শ্রদ্ধাশীল। পিতা সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন লিচ্ছবিগণের দৌহিত্র। মাতা দত্তাদেবী যৌধেয়ানী। আমার রাজমহিষী ধ্রুবস্বামিনী মালবগণের কন্যা-মালবিকা। আমার ধমণীতেও যৌধেয় রক্তের প্রবাহ। কিন্তু মিত্র তাদের অবস্থা দেখো - নেতৃত্বের অভাবে দিশাহীন, খণ্ডবিখণ্ড। আবার অন্যদিকে দেবপুত্রশাহী কুষাণ এবং শকক্ষত্রপরা শক্তিক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায়। বিদেশী যবন, ম্লেচ্ছদের উচ্ছেদ করে এক অখণ্ড আর্যাবর্ত গড়ার এই প্রকৃষ্ট সময়। কুমার নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করবে।

কালিদাস : রাজনীতি আপনি আমার থেকে অনেকগুণ বেশী বোঝেন ভন্তে। আমিও স্বীকার করি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এখন উদীয়মান রবি। তাইতো অবন্তীর উজ্জয়িনী ত্যাগ করে আমি আপনার পাদপদ্মে সমর্পিত। "ভুবা মহাবরাহ দংস্ট্রায়াং" বলে এক শ্লোক আমি রচনা করেছি।

চন্দ্রগুপ্ত : অহো অহো মহাকবি কালিদাস! বীরসেন। (বীরসেন প্রবেশ করে) ভুবা মহাবরাহ দংস্ট্রায়াং। রাজসভার প্রধান মাথুর শিল্পীকে নির্দেশ দাও এই শ্লোকের অন্তর্ভাব পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ করতে হবে। মহাবরাহর মস্তক হবে বরাহর কিন্তু শরীর ও অলঙ্করণ হবে আমার- চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের। আর মহাবরাহ দন্তে তুলে ধরবেন রাজমহিষী ধ্রুবস্বামীনিরূপা বসুন্ধরাকে। যাও বীরসেন শীঘ্র প্রস্থান কর।

অসাধারণ মহাকবি। রাজাকে এতটা বৃহৎ করে তুলতে হবে যাতে রাজা স্বয়ং তার নাগাল না পান। যাও মিত্র তোমার রঘুবংশম কাব্য সত্ত্বর শেষ কর। আমার কর্ণ রঘুবংশম শ্রবণের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রত।

(কালিদাস প্রস্থান করে)

ভুবা মহাবরাহ দংস্ট্রায়াং।

(বৃদ্ধের ত্রিশরণ মন্ত্রের দৃশ্যান্তর হয়। অবন্তীর বৌদ্ধ বিহার। অষ্টাঙ্গিক চিত্রহস্তে শ্রমণের দল। কুমার দণ্ডায়মান)

শ্রমণরা : নমো তস্যো ভগবতে অরহতো সম্মা সম্বুধ্যস্য

কুমার : নির্বাণ লাভকারী ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করি

শ্রমণরা : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

কুমার : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম

শ্রমণরা : ধম্মং শরণং গচ্ছামি

কুমার : আমি ধর্মের শরণ নিলাম

শ্রমণরা : সংঘং শরনং গচ্ছামি

কুমার : আমি সংঘের শরণ নিলাম

শ্রমণরা : দুতিয়স্পি সংঘং শরণং গচ্ছামি

কুমার : দ্বিতীয়বার সংঘের শরণ নিলাম

শ্রমণরা : ততিয়স্পি শরণং গচ্ছামি

কুমার : তৃতীয়বার সংঘের শরণ নিলাম

আমি সহস্রবার সংঘের শরণ নিলাম

এক কৌমজীবন যাপনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আমার তথাগত শরণে আসা। অবলোকিতেশ্বরের মত শুধুমাত্র মস্তকে নয় হৃদয়েও ধারণ করে থাকব ভগবান বুদ্ধকে। এক অপ্রমেয় শান্তিকে। " ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম্ শান্তি, শান্তি্ শান্তি"।

(মাধবসেন প্রবেশ করে)

মাধবসেন: ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সাধকেরমুখে উপনিষদের বাণী? আমি বিস্মিত আর্যকুমার।

কুমার : মিত্র মাধবসেন, আমি যে তথাগতর চতুরার্য সত্যের সাথে উপনিষদের এই বাণীর মিল পাই। পূর্ণ থেকে উৎপন্ন যাহা, তাহাও পূর্ণ। এক সাম্যের দিকনির্দেশ আছে।

মাধবসেন: তবে কি ধরে নিতে পারি, যে নব্য গো-ব্রাহ্মণ ধর্ম তথাগতকেও অবতারদের ছকে বাঁধতে চাইছে যৌধেয় কুমার তাকেও সমর্থন করছে?

কুমার : না মিত্র। মগধে থাকতে আচার্য বসুবন্ধুর নিকট ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেছি। আমার স্মরণে আছে তথাগতর উপদেশ— "অয়ং ভিক্ষবে? কেবলো পরিপুরো বালধম্মোঃ। আত্মার অবিনশ্বরতা এক বালসুলভ বিশ্বাস। অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমার জীবনের সত্য। আমি শুধু খুঁজে নিতে চাইছি যে ত্রিশরণ মন্ত্র গত প্রায় - হাজার বছর ধরে পৃথিবীকে শান্তি আর দিশা দেখিয়েছে, তা কি করে এতটা ভঙ্গুরদশাপ্রাপ্ত হলো?

মাধবসেন: তুমি কি ইঙ্গিত করছো আমার হৃদয়াঙ্গম হচ্ছে না কুমার।

কুমার : মিত্র, অবশিষ্ট পৃথিবীকে ভারতবর্ষের সেরা উপহার কী জানো? তথাগত। তথাগতর অনাত্মবাদ।তথাগতর সহজ, সরল, যুক্তিপূর্ণ ধর্মাচরণ। আমি দীর্ঘ বৎসর সিংহলে শ্রমণজীবন অতিবাহিত করেছি। দেখেছি সংঘযাপণের ওপর কী তাদের অপরিমিত শ্রদ্ধা। কিন্তু জম্বুদ্বীপে, তথাগতর জন্মভূমিতেই আজ তা বিনষ্ট হওয়ার পথে।

মাধবসেন : কিন্তু এখনও এই ভূমিতে শুধু কেন যবদ্বীপ- সিংহল- গান্ধারসহ চৈনিকদেশেও তথাগত সর্বপূজ্য, সর্বমান্য।

কুমার : কিন্তু দিগন্তে যে ঘূর্ণাবর্ত একটু একটু করে শক্তি বাড়াচ্ছে তা দেখতে পারছো না মাধবসেন? এই অবন্তীর মহাবিহারেও শ্রমণরা আর বিনয়পিটকের সুত্তগুলিকে মান্য করে না। বিহার ও চৈত্যগুলি মহাসম্পদের ভারে স্থবির। শ্রমণদের মধ্যে অনেকেই কৌমজীবন , সংঘবদ্ধ সহজ যাপণ ত্যাগ করে প্রভূত সম্পদের সৃষ্টি করেছেন। জাতকের কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে বৈদিক আত্মার ধারণা পুনঃ প্রবেশ করছে। তন্ত্রমন্ত্রের আবর্জনায় ক্রমশঃ অস্পষ্ট হচ্ছে তথাগতর সৌম্য দর্শন। মাথাচাড়া দিচ্ছে নতুন গো-ব্রাহ্মণ ধর্ম। আর গো-রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দাক্ষিনাত্যে বাকাটক রাজবংশ আর উত্তরাপথে স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত।

মাধবসেন : কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তো তোমার আবাল্যের সখা? তোমরা একসাথে যৌবনে উপনীত হয়েছো মগধের রাজপ্রাসাদে।

কুমার : সেইজন্যেই তো আমি জানি তথাগতর দিক্‌নির্দেশিত গণশাষণ ব্যবস্থা নতুন সহস্রাব্দের সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখে। আমার আশংকা এই সুকঠোর ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার বিচার একদিন মরুঝড়ের মত বালুকারাশি দিয়ে পূর্ণ করে দেবে বৈচিত্র্যময় এই জম্বুদ্বীপকে। চন্দ্রগুপ্ত বশ্যতা চায় মিত্র। কেবল প্রশ্নহীন আনুগত্য। আর তার এ পথে প্রধান বাধা গণগুলি, যেখানে বিরুদ্ধস্বর উচ্চারিত হতে পারে বিনা বাধায়।

মাধবসেন : তোমার আসল উদ্দেশ্য কি মিত্র? তুমি তো শুধুমাত্র উপসম্পদা আর ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য বিহারে বসে নেই।

কুমার : ব্যক্তিনির্বাণলাভই যদি আমার মোক্ষ হত, তাহলে সিংহলের মহাবিহারেই আমি জীবন অতিবাহিত করতাম মাধবসেন।

(এক শ্রমণ প্রবেশ করে)

শ্রমণ : ভদন্ত মাধবসেন বিহার অধ্যক্ষ স্থবির অরুণাংশু আপনাকে স্মরণ করেছেন।

মাধবসেন: আমাকে? এই অসময়ে? কেন?

শ্রমণ : তা তিনি আমায় বলেননি। শুধু বলেছেন আপনাকে একথা বলতে যে তিনি আপনার জন্য পাঠগৃহে অপেক্ষা করছেন।

মাধবসেন: আমি আসছি মিত্র। আমাদের আলোচনা অর্ধ সমাপ্ত থাকবে না।

(মাধবসেন বেরিয়ে যায়)

কুমার : এবার তোমার শ্রমণবেশ পরিত্যাগ করতে পারো চন্দ্র।

(শ্রমণ বেশ ত্যাগ করলে চন্দ্রগুপ্ত পরিস্ফুট হয়)

চন্দ্রগুপ্ত : তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলাম না কুমার।

কুমার : ভেবেছিলে?

চন্দ্রগুপ্ত : নিজের ছদ্মবেশ ধারণ ক্ষমতার উপর ক্ষীণ গর্ব ছিলো।

কুমার : কুড়ি বছরের প্রতিক্ষণের সাথী আমরা। তোমার নিঃশ্বাসের শব্দও আমার পরিচিত চন্দ্র, নাকি পরমভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য?

চন্দ্রগুপ্ত : আমরা শুধুই মাতুল ভাগিনেয় নয়, চিরকালের বন্ধু কুমার। তুমি আমার অগ্রজও বটে। গর্ভ আলাদা হলেও আমরা আজ্জুকারই সন্তান।

কুমার : কিন্তু তোমার হস্ত অগ্রজর রক্তে রঞ্জিত চন্দ্র।

চন্দ্রগুপ্ত : উপায় ছিল না কুমার। পিতা পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াণের পর শক মহাক্ষত্রপ মগধ আক্রমণ করেন। কাপুরুষ যুবরাজ রামগুপ্ত সন্ধির শর্ত হিসাবে রাজকুললক্ষ্মী ধ্রুবস্বামিনী দেবীকে হাতে তুলে দিতে স্বাক্ষর করেন। গুপ্তঘাতকের বশে আমিই শকক্ষত্রপের বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করি। এবং সেই একই ছুরিকা ভীরু, অপদার্থ রামগুপ্তের বক্ষে হানতেও আমি দ্বিধাবোধ করিনি।

কুমার : সেই শত্রুর রাজ্যেই তুমি একাকী ছদ্মবেশে উপস্থিত! তোমার দুঃসাহস আমায় স্তম্ভিত করছে।

চন্দ্রগুপ্ত : তুমি তো জানো মহামতি আমার আরাধ্যা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতোই আমি তাঁর তন্বিষ্ঠ শিষ্য। এই উজ্জয়িনীর প্রতিটি কোণে আমার গুপ্তচরেরা নিয়ত সক্রিয়। মহাকালেশ্বর মন্দিরের পেছনের অরণ্যের শিপ্রা নদীর কাশবনের আড়ালে মগধের সহস্রাধিক সৈন্য অপেক্ষারত। আমি সুরক্ষিত।

(দীর্ঘ নৈঃশব্দ বিরাজ করে)

আমি পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্রতট পর্যন্ত এক অখণ্ড আর্যাবর্ত গড়ে তুলবো

কুমার। সুমাত্রা- যবদ্বীপ থেকে যবন-পারসিকদের সাথে সমগ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে রাজকুলশ্রেষ্ঠ গুপ্তবংশ। আমার পাশে মহাসেনাপতি হিসাবে তোমার থাকা নিয়তিনির্দিষ্ট কুমার। মগধে প্রত্যাবর্তন করো। নিজ হস্তে সেনানায়ক পদে তোমায় অভিষিক্ত করব আমি আর চন্দনচর্চিত হস্তে তোমার কপোল লেপন করবেন স্বয়ং ধ্রুবস্বামীনি। সে তার মাতুল ভট্টারকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদ্‌বিগ্নমনা।

কুমার : তোমার স্বপ্নের অখণ্ড শাষণের মধ্যেই পড়ে যৌধেয়ভূমি।

চন্দ্রগুপ্ত : তুমি যৌধেয়শ্রেষ্ঠ। আমার ধমণীতেও যৌধেয় রুধির। আমি নিশ্চিত তারা বিরোধিতা করবে না। টুকরো টুকরো গণশাষণ নয়, এক নিশ্চিদ্র কেন্দ্রাতিগ শাষণব্যবস্থা সময়ের দাবী কুমার।

কুমার : আমি তথাগতর শরণাগত। তাঁর জন্ম শাক্যগণে, মৃত্যু মল্লগণে। তাঁর বিনয়পিটক লিচ্ছবিগণের নিয়মানুসারী। পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিদ্রৌহিত্র। তুমি তোমার পিতার মুদ্রায় উৎকীর্ণ "লিচ্ছবীয়" অবলুপ্ত করে প্রচলন করেছো বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তীর।

চন্দ্রগুপ্ত : অস্বীকার করছি না। রাজা যে অপরাজেয়, রাজা যে তুচ্ছ মনুষ্যজীবন অতিক্রমপূর্বক এক দিগন্তপ্রসারী অতিকায় পুরুষ সেটা জনমানসে প্রোথিত করতে চাই। এমন এক রাজবংশ পত্তন করতে চাই যা হাজার বছর ধরে এই ভূমি শাষণ করবে। আমার প্রচারিত কিংবদন্তীগুলি প্রজার মনে ভীতি ও সম্ভ্রমের সঞ্চার করেছে। শত্রু অতিদূর কল্পনাতেও আনতে পারবে না যে আমার পরাজয় সম্ভব।

কুমার : পৃথিবীতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল।

চন্দ্রগুপ্ত : তবু এক অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে চাই।

কুমার : তথাগতর শান্তি ও প্রেমের ধর্মকে উৎপাটন করে?

চন্দ্রগুপ্ত : রাজা সর্বজ্ঞ, রাজা সব দেখেন, রাজা সব জানেন এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কুমার : অর্থাৎ সমষ্টি নয়। এককের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা।

চন্দ্রগুপ্ত : অর্থাৎ রাজা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত।

কুমার : বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ তবে তোমার রাজ্যে ইতিহাস?

চন্দ্রগুপ্ত : বহুজনের সুখসমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারে যিনি সর্বচ্চো ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ আমি। সো অহম।

কুমার : প্রজার অধিকার থাকবে না রাজার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে?

চন্দ্রগুপ্ত : না। বিজয়ী শাষক হবেন অতুল ক্ষমতার অধিকারী। সর্বেশ্বর। "স ঘা বীরো ন রিস্যতি"। বীরের মৃত্যু নেই।

কুমার : "বিপ্র রুতস্য বাহসা"। আর্যাবর্তের বীরের প্রয়োজন নেই। জ্ঞানীর প্রয়োজন যিনি সত্যের প্রচারক।

চন্দ্রগুপ্ত : সত্য এক ছলনাময়ী নারী কুমার। তাকে অধিকার করতে হয়।

কুমার : তাকে যোগ্য হয়ে আবাহন করতে হয়। প্রগতির পথে। সভ্যতার পশ্চাতে পদচারণ করে নয়। আমার জীবন গণের নিরাপত্তায় উৎসর্গীকৃত। আর তুমি চাও স্বাধীন চেতনার বিনাশ। আমাদের পথ ভিন্ন পরম ভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

চন্দ্রগুপ্ত : আজ্জুকা মারা যাওয়ার পূর্বে শুধু তোমায় দেখতে চেয়েছিলেন। পিতা তোমার খোঁজে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদের পাঠিয়েছিলেন। পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ তোমার অপেক্ষায় থাকবে কুমার। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। শেষ পর্যন্ত।

(পূর্বের শ্রমণ বেশ গ্রহণ করে চন্দ্রগুপ্ত নিষ্ক্রান্ত হয়। মাধবসেন প্রবেশ করে।)

মাধবসেন: কী আশ্চর্য! শ্রমণ বলে গেলেন বিহার অধ্যক্ষ পাঠগৃহে অপেক্ষা করছেন। অথচ পাঠগৃহ শূন্য। সেই শ্রমণ কোথায় গেলেন?

কুমার : তিনি শ্রমণ ছিলেন না।

মাধবসেন: মানে? কে ছিলেন?

কুমার : চন্দ্রগুপ্ত।

মাধবসেন: চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।

কুমার : নিজভূমে ফেরার সময় হয়ে এলো। আমি আজ রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরেই যৌধেয়ভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করব মাধবসেন।

মাধবসেন: আমিও যাবো তোমার সাথে মিত্র।

কুমার : না মিত্র। তুমি তোমার গণে ফিরে যাও। গণশাষণকে দৃঢ় করার কাজে ব্রতী হও।

মাধবসেন: আমাদের মালবগনণের আর কোনো আশা নেই। আমাদের গণ আজ বণিকদের করায়ত্ত। তারা জামাতারূপে চন্দ্রগুপ্তকে পেয়েছে। আমাদের পুরস্কর্তার গোপন আশা তিনি জামাতার সাহায্যে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করবেন। এই মুহূর্তে যৌধেয়রাই গণতন্ত্র উজ্জীবিত রাখার একমাত্র বাজী। আমি তোমার সাথে কুনিন্দ ও অর্জুনায়ণ গণকে নিয়ে গণমহাসংঘ প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলায় সাহায্য করতে চাই।

কুমার : বেশ রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে প্রস্তুত থেকো। আমাদের ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে। চন্দ্রগুপ্তের চর সর্বত্র।

মাধবসেন: যৌধেয়গণস্যঃ জয়ঃ।

কুমার : সর্বগণস্যঃ জয়ঃ।

(দৃশ্যান্তরে রায়তী ও সুহোত্র প্রবেশ করে)

রাতী : তোর কী মনে হয় আর কদিন লাগবে শ্যুট শেষ করতে?

সুহোত্র : ইনডোরের কাজ তো প্রায় হয়ে এলো। বড়জোর তিনদিন। এরপরে আউটডোরে একটা চাঙ্ক রয়েছে। ব্যাস তারপরেই পোষ্ট প্রোডাকশানে যাব।
(ক্যামেরা হাতে রিক ঢোকে)

রিক : সিন্ ফোরটিন শট নাম্বার এইটে একটা ড্রোন ডিমান্ড করছে রে সুহোত্র। পার্সপেক্টিভ ভালো ধরতে পারতাম। লং শটে কুমারের ঘোড়া ছোটানোটা এস্টাবলিশ করে নিয়ে ক্লোজ আপে - গেলে সিনটা দাঁড়িয়ে যেত রে।

সুহোত্র : ইমপ্রোভাইজ কর রিক। ড্রোন ভাড়া নেওয়ার পয়সা নেই। শালা ঘোড়া ছোটানোকে ড্রোনে ধরবে! আমার ঘোড়ারোগ কে সারাবে তার ঠিক নেই।

রিক : ঘোটালামার্কা স্ক্রিপ্ট ধরতে গেছো কেন ডিরেক্টর? চাড্ডি গরমাগরম গান ঢুকিয়ে দাও প্রোডাকশনের পয়সা উঠে আসবে।

রায়তী : এটা ভালো বলেছিস। ধর চন্দ্রগুপ্তর রাজসভায় একটা চুন্নিমুন্নির নাচ আর উজ্জয়িনীর শক রাজসভায় বেশ একটা জমজমাট ফিউশান ক্ল্যাসিকাল ঝিকিমিকি।

সুহোত্র : সঙ্গে খাজুরাহো স্টাইলে ঝিঙ্কু মামণিগণ।
(সবাই হেসে ওঠে)

সুহোত্র : আমি জানি সিনেমাটা রিলিজ করলেই হ্যাশট্যাগ বয়কটের বাণ ডাকবে।

রায়তী : চাপ নিস না। আমরা আছি কি করতে? হ্যাসট্যাগ বয়কট দ্য বয়কটার্স রেডি আছে। ফেসবুক ইনষ্টা সব ছাপিয়ে দেবো।

রিক : তবে তুই ভাই রেফারেন্স রেডি রাখিস। হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সুহোত্র : দেখ আমাদের মূল গল্পটা রাহুল সাংকৃতায়ন থেকে নেওয়া জয় যৌধেয়। রাহুলজীর মত ভারতীয় ইতিহাসের পণ্ডিত হাতে গোণা। আমাদের পয়সা নেই মানছি কিন্তু বিবলিওগ্রাফি বেশ লম্বা চওড়া।

রায়তী : তবে হিন্দুইজমের চেগে ওঠার সাথে গণের বিলুপ্তির সম্পর্কটা কিন্তু খুব বিতর্কের।

সুহোত্র : বেগ ইয়োর পার্ডন ম্যাডাম। ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দটা অনেক পরের। অষ্টম শতাব্দীতে অ্যারাবিয়ান ইনভেশানের পর। আমরা ডিল করছি ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ে। যখন চতুর্থ শতাব্দীতে গো-রক্ষা নিয়ে শাষক মাথাব্যথা করছে তখনও সাধারণ ‘হিন্দুর’ বাড়িতে অতিথি সৎকার হতো গোমাংস আর মধুপর্ক দিয়ে।

রিক : মধুপর্ক কেসটা কি ? মধু দিয়ে পর্ক ? মানে তখন শুয়োর গরু এক পাতে খেতো ‘হিন্দুরা’। ইন্টারেস্টিং।

রায়তী : মধুপর্ক মানে আজকের শিরনি জাতীয় খাদ্য, পঞ্চামৃত।

সুহোত্র : তবে তুই ঠিকই বলেছিস গরু আর শুয়োর দুটোই অচ্ছুত ছিল না অন্তত উত্তরাপথের চতুর্থ শতাব্দীর মানুষের কাছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই গর্ভবতী নারীদের গোমাংস ভক্ষণের পরামর্শ রয়েছে।

রিক : কেলো করেছে। তুই কি ছবিতেও এসব দেখাবি না কি?

সুহোত্র : না আমি এসব বলে হাওয়া গরম করতে চাইছি না। আমার উদ্দেশ্য ভারত ইতিহাসের একটা প্রায় অনালোচিত অধ্যায় তুলে ধরা। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক স্বাধীনচেতা স্বর এই ভারতবর্ষেই প্র্যাকটিসে ছিলো। নজরদার সর্বভূক রাষ্ট্রব্যবস্থাই বরং অর্বাচীন। আজকের সার্ভাইল্যান্ট ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমি একটা প্রামাণ্য রেফারেন্স রাখতে চাইছি। ব্যাস। দ্যাটস ইট।

(নেপথ্যে- "শট রেডি")

ওকে কামিং।

সাউন্ড

রেডি

রোল ক্যামেরা

রোলিং

অ্যাকশন

(দৃশ্যান্তর। অগ্রোদকা নগরী। কুমার, মাধবসেন ও বপ্প)

বপ্প : সমগ্র যৌধেয়ভূমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল বৎস কুমার। এক ঘোর অমানিশা আমাদের গণশাষণের সম্মুখে উপস্থিত। এ তমিস্রাজালকে ছিন্ন করার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব তুমিই কুমার।

কুমার : সিংহল সহ সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করেছি ভদন্ত। রাজশাষণের কুফল সর্বত্র। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা অপরিমেয় সম্পদে নিজেদের কোষাগার ভরিয়ে তুলেছে। সাধারণ মানুষ ক্রীতদাসের মত জীবন নির্বাহ করছে। তথাগতর ধর্ম অস্তাচলগামী সূর্য। তার স্থলে এক সর্বব্যাপী আচার ও জাতপাতসর্বস্ব ধর্ম ক্রমশঃ কালসর্পের মত উদ্যতফণা। আমি আমার অভিজ্ঞতা সব যৌধেয়দের সম্মুখে বিবৃত করতে চাই মাননীয়।

বপ্প : নিশ্চয়ই । আমি কল্যই গণপরিষদের সভা আহ্বান করেছি। কুনিন্দ ও অর্জুনায়ন গণের প্রতিনিধিরাও সেখানে থাকবেন। তুমিও থাকবে মাধবসেন। মালবগণের অভিজ্ঞতার কথাও আমরাও শ্রবণে ইচ্ছুক।

মাধবসেন: শিরোধার্য আর্য বপ্প।

বপ্প : বহুপথ পাড়ি দিয়ে এসেছো। বিশ্রাম নাও। কল্য প্রাতে দেখা হবে।

(বপ্প বেরিয়ে যায়)

কুমার : চলো মাধবসেন। ভ্রাতা রেবতক ও দেবী বসুনন্দা আমাদের জন্য অপেক্ষারত। দু-এক চষক মৌরেয় পানে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হবে না।

মাধবসেন: কিন্তু যার কথা তোমার কাছে এত শুনেছি, তোমার বহু বিনিদ্র রজনীর সেই মহানায়িকার সাথে তো সাক্ষাৎ হলো না?

কুমার : তিনি বোধহয় আমার আগমনের প্রতীক্ষায় হাল ছেড়ে অন্য কোনো যৌধেয় যুবকের বক্ষলগ্না হয়েছেন। যৌধেয়গণে যোগ্য প্রেমিকের কোনো অভাব নেই মাধব। আমিও তো তার আকাঙ্খার কোনো পরিপূরণ করতে পারিনি। তিনি যৌধেয়ানী। স্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনা করার সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে। চলো লোহিতবর্ণা সুরা পান করাতে পারব না। কিন্তু আমাদের মেরয় বেশ উত্তেজক।

(মাধবসেন ও কুমার গমনোদ্যোত হতেই বিপরীত দিক থেকে চেহারা আচ্ছাদিত এক আততায়ী অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জন তুলে। মাধবসেনের কাছ থেকে চকিতে অস্ত্র নিয়ে কুমার তা প্রতিহত করে। আক্রমণ - প্রতিআক্রমণ শেষে আততায়ীকে ধরাশায়ী করে কুমার।)

কুমার : আমি তো ভেবেছিলাম দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস শেষে আমার জন্য পুষ্পসজ্জা অপেক্ষা করছে। আর সেখানে অস্ত্র সম্ভাষণ! এটা কি উচিৎকর্ম দেবী সুনন্দা? (মুখাবরণটি খুলে দেয়)

মাধবসেন: দেবী সুনন্দা! ভ্রাতা মাধবসেনের প্রীতি গ্রহণ করবেন।

সুনন্দা : করেছি ভ্রাতা। আপনি মনে কোনো সংশয় রাখবেন না। যৌধেয়ীরা স্বাধীনচেতা ঠিকই কিন্তু যত্রতত্র প্রেমিক খুঁজে বেরায় না।

(কুমার হাসতে থাকে। মাধবসেন বিড়ম্বনায় পড়ে)

মাধবসেন: এ আমার মিত্রের ভারী অন্যায় দেবী। অনুচিত উচ্চারণ। কিন্তু তা বলে একেবারে অস্ত্রাঘাত।

(রেবতক ও বসুনন্দা প্রবেশ করে)

বসুনন্দা : এটা অনেকটা জনক তনয়ার অগ্নীপরীক্ষার মত। যৌধেয় ভবিষ্যৎ যার হাতে সমর্পিত হতে যাচ্ছে তিনি তার যোগ্য আর আছেন কি না নাকি-

সুনন্দা : ভিক্ষুর জীবনযাপন করতে করতে অধিকার লড়ে নেওয়ার লড়াইটা আর পাবেন কি না?

রেবতক : ফলে কী প্রকাশ পেল?

বসুনন্দা : সে ফলের বিশ্লেষণ ভার আপাতত ভ্রাতা আর সখী সুনন্দার হাতেই অর্পণ করা যাক। এই জ্যোৎস্নাতাড়িত রাত্রে তারাই এর উত্তর খুঁজুক। আমরা কেন মৌরেয়

বিনা এমন ঐন্দ্রজালিক রাত্রি বৃথা যেতে দেব ভ্রাতা মাধব? চলুন পাত্র ভরা সুরা প্রস্তুত আছে।

মাধবসেন: উত্তম প্রস্তাব। চলুন দেবী।

রেবতক : ফলপ্রকাশে অধিক বিলম্ব কোরো না। তোমার উপস্থিতি ছাড়া আসর জমবে না ভ্রাতা কুমার।

(বসুনন্দা, মাধবসেন ও বেরতক বেরিয়ে যায়)

কুমার : নন্দা।

সুনন্দা : আমি মগধের অন্তঃপুরিকা নই। যৌধেয়ানী। আমাকে প্রণয় ভাষণে তুষ্ট করো না কুমার।

কুমার : সে চেষ্টাই আমি করছি না নন্দা। শুধু তোমায় এক প্রিয় কবির কথা বলতে চাই।

"কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমিক্রমেন"

সুনন্দা : সুখ বা দুঃখ কখনো
চিরকালের নয়
রাতের পর দিবস যেমন–
চক্রবৎ হয়।

মহাকবি কালিদাস।

কুমার : চরের মুখে খবর পেয়েছি খুব শীঘ্রই তিনি যৌধেয়ভূমিতে পদার্পণ করবেন।

সুনন্দা : এ তো অত্যন্ত আনন্দের খবর। আমরা তাঁর সামনে তাঁরই নাটিকা অভিনয় করে তাঁর মনোরঞ্জন করব।

কুমার : অভিজ্ঞানমশকুন্তলম?

সুনন্দা : দুষ্যন্তর সাথে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছো বুঝি?

কুমার : বেচারা দুষ্যন্তর প্রতি মিছে রোষ কোরো না। সে কর্তব্য আর অভিশাপের পাল্লায় পড়ে প্রিয়াকে ভুলেছিল। স্বইচ্ছায় নয়।

সুনন্দা : স্বীকার করছি তোমার প্রব্রজাগ্রহণ আমাকে হতাশ করে তুলেছিল। ভেবেছিলাম ব্যক্তি নির্বাণ লাভই তোমার মোক্ষ। গণের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি উদাসীন।

কুমার : আমি শ্রমণ হয়েছিলাম সংঘজীবনের নিয়ম অনুশীলনের জন্য। ব্যক্তিস্বার্থ মুক্ত হয়ে কীভাবে সমষ্টিগত উন্নয়নের শরিক হওয়া যায় তার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখতে গিয়েছিলাম সিংহল।

সুনন্দা : আজ কর্তব্যের কথা থাক কুমার। দীর্ঘ বৎসর পর তুমি নিজভূমে ফিরেছো। যৌধেয় তরুণ তরুণীরা চষকের পর চষক মৌরেয় পান করে উদ্বেল হয়ে আছে তাদের কুমারের সাথে নৃত্যগীতে অংশ নেবে বলে। ঐ শুনতে পারছো না

ভ্রাতা রেবতকের বীণায় আনন্দের তুফান উঠছে।

কুমার : কাল প্রত্যুষে গণপরিষদের সভা। অনেক কাজ সম্মুখে। তার আগে শরীর ও মনকে সতেজ করে নিই চলো। বাদ্যের তাল তোমার শরীরেও হিল্লোল তুলছে দেখতে পারছি নন্দা।

(দ্রুত গতির পাখোয়াজের সাথে সুনন্দার নৃত্যরতা শরীর দৃশ্যান্তর ঘনিয়ে আনে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে টুকরো দৃশ্যের অবতারণা হয়।)

জ্যালুক : না না আর্য বপ্প আমি আজকের পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে একমত নই।

বপ্প : কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ একমত হয়েছেন। সুতরাং সকলকেই মেনে নিতে হবে। আপনাকে জ্যালুক।

জ্যালুক : কিন্তু আমি একজন বরিষ্ঠ বণিক। পরিষদের কোষাগারে যথেষ্ট দিনার জমা করি। এই সিদ্ধান্ত মানলে তো বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে।

বপ্প : অশ্ব ছাড়া অন্যকিছুর বাণিজ্য করুন।

জ্যালুক : আমি চারপুরুষ অশ্ব ব্যবসায়ী। গান্ধার থেকে, পারস্য থেকে উন্নতমানের অশ্ব এনে রাজবংশের কাছে বিক্রয় করাই আমার পেশা। এই মুহূর্তে একটি পারসিক অশ্ব মগধে পাঁচগুণ বেশী দামে বিক্রয় করা যাচ্ছে। ভাবতে পারছেন মুনাফার পরিমাণ? আর কুমার প্রস্তাব দিলো অশ্ব বিক্রয় করা যাবে না, আপনারা মেনে নিলেন? না না এ আমার সমূহ ক্ষতি।

বপ্প : বিক্রয় করলে গণের সামূহিক ক্ষতি জ্যালুক। মুনাফা অনেক করেছেন। এবার গণের কথা ভাবুন। যুদ্ধ সমাসন্ন। চন্দ্রগুপ্ত যে কোন সময় আঘাত হানবে। এ সময় তাকে অশ্ব বিক্রয় করা মানে গণের বুকে ছুরিকাঘাত করা।

জ্যালুক : বেশ আমি না হয় লক্ষ দিনার গণকোষাগারে দান করব।

বপ্প : দিনারের পাহাড় জমিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। মুনাফার লোভে আপনার চক্ষু চক চক করছে। আপনি নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য বিপদ দেখতে পারছেন না। আপনার যাবতীয় সম্পত্তি এবং আস্তাবলের সমুদয় অশ্ব এখন থেকে গণপরিষদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(অন্যস্থানে যুবকগণ অস্ত্র অভ্যাসরত)

যুবক ১ : ভ্রাতা কুমারের আদেশ প্রত্যহ দুঘন্টা অশ্বচালনা, একঘন্টা সন্তরণ আর একঘন্টা অসিচালনা। আমার এখন তিনগুণ ক্ষুধা পাচ্ছে রোজ।

যুবক ২ : আমি তো রোজ বলদগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেই হাল চষছি। শরীরে শত হস্তীর বল অনুভব হচ্ছে। একাই মনে হয় মগধের পাঁচশো সৈন্য খতম করে দেব।

যুবক ৩ : আমার দ্বারা ভাই এসব হবে না। প্রত্যুষে আমার নিদ্রাভঙ্গই হয় না।

যুবক ১ : ভ্রাতা কুমারকে বলতে হবে তোমার দ্বারা যখন শরীরচর্চা হবে না আস্তাবলে অশ্বের দেখভাল করতে।

যুবক ৩ : না ভাই। অশ্বের পিছন পায়ের লাথি খেয়েছি দুবার। এখনও উরুতে ব্যথা। আমি উরুভঙ্গ দুর্যোধন হতে চাই না।

যুবক ২ : তাহলে গন্ধশালী ধান্যের অন্ন আর ঘৃতের নেশা ছেড়ে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করো। যুদ্ধ লাগলো বলে।

যুবক ৩ : কিন্তু মগধের পরাক্রমশালী লক্ষাধিক সৈন্যের সামনে আমরা কি প্রতিরোধ করতে পারবো মিত্র?

যুবক ১ : যুদ্ধ সৈন্য জেতায় না। জেতায় সৈন্যের মানসিকতা। শত যৌধেয় সহস্রী মাগধী সৈন্যের সমতুল।

(অন্যস্থানে কুমার ও রেবতক)

রেবতক : মগধে আমাদের গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ আয়োজনের প্রস্তুতি পুরোমাত্রায় শুরু করে দিয়েছে।

কুমার : তবে আমার মনে হয় শীতকালে সে যৌধেয় ভূমিতে প্রবেশ করবে না। আবার বর্ষায় যমুনা পার হওয়াও ঝুঁকির। সুতরাং শীতের শেষেই তার আগমন আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

রেবতক : অর্থাৎ হাতে মাত্র অর্ধবৎসর সময়।

কুমার : আমাদের প্রস্তুতি কেমন চলছে?

রেবতক : প্রতিটি যৌধেয় গৃহ এখন শরীরচর্চা আর অস্ত্রশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নিয়ম করে শিকার, অশ্বদৌড় প্রতিযোগিতা আর অস্ত্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেক যৌধেয় তরুণ তরুণী তাদের ভ্রাতা কুমারে নির্দেশে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বণিক যারা আছে তারা অবশ্যই চন্দ্রগুপ্তের সাথে নিঃশর্ত সন্ধিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভয়ে তারা নিশ্চুপ।

কুমার : তাদের নজরে রেখো। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা গণের বিপরীতে যেতে পারে।

রেবতক : মিত্র মাধবসেন সে দায়িত্ব নিয়েছে।

কুমার : আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার পিতৃপুরুষের জমি গণপরিষদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। আরো কয়েকজন ভূস্বামী আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এখন থেকে সেইসব জমি একত্র করে যৌথ চাষ হবে। সবাই সবার সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রম দেবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের ভাগ পাবেন। পরিশ্রম নিজেদের করতে হবে। যৌধেয়ভূমিতে কোনো দাস থাকবে না।

রেবতক : উত্তম প্রস্তাব। আমিও সঙ্গে আছি।

কুমার : মহাকবি কালিদাস কি ভ্রমনান্তে গৃহে ফিরেছেন?

রেবতক : হ্যাঁ ভ্রাতা। এবং দেবী সুনন্দা নিজের অস্ত্রাভ্যাসের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়ে তাঁরই সেবা করে যাচ্ছেন। আমাদের সান্ধ্য আসর এখন মেঘদূতম আর কুমারসম্ভবমের কাব্যরসে ভেসে যাচ্ছে। ঐ যে তিনি এদিকেই আসছেন। আমি যাই। তরুণদের অস্ত্রশিক্ষার সময় হয়ে এলো।

(কালিদাস প্রবেশ করে)

কুমার : মহাকবি যৌধেয়ভূমি দর্শনে আপনি হতাশ হন নি তো?

কালিদাস: হতাশ? আমার সমগ্র জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে এই ভ্রমণ। মানুষে মানুষে যে প্রেম, যে সৌভ্রাতৃত্ব শুধুমাত্র আমার কবি কল্পনায় ছিল, তার বাস্তবরূপ দর্শনে আমি বাক্‌হারা মিত্র। যে মানবতার সন্ধান করেছি কাব্যের শ্লোকে তার মৃন্ময়ী মূর্তি দেখে আমি বিস্মিত কুমার। স্বাধীনতা আর মুক্ত চিন্তা, একত্র যাপনের যে অভ্যাস তোমরা গড়ে তুলেছো তা জম্বুদ্বীপ আশার প্রদীপ প্রজ্বলন করবে। কিন্তু একইসাথে আমি ভীত মিত্র কুমার।

কুমার : ভীত! কেন?

কালিদাস: তুমি বুদ্ধিমান। তোমাকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই চন্দ্রগুপ্তর সভাকবি কেন এই যৌধেয়ভূমে পদার্পণ করেছে।

কুমার : আমি জানি মহাকবি। কিন্তু যৌধেয়রা তাদের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না।

কালিদাস : জানি। আমিও কোনো দৌত্যকর্মে ইচ্ছাপ্রকাশ করছি না। কিন্তু যৌধেয়ভূমে এই ভ্রমণ আমাকে আমার প্রতিবিম্বের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নিজের স্বরূপ দর্শনে বারংবার শিউরে উঠছি। বিবমিষা হচ্ছে। তীব্র ঘৃণা হচ্ছে নিজের প্রতি।

কুমার : নিজের প্রতি অকারণ রূঢ় বাক্য ব্যবহার করবেন না মহাকবি।

কালিদাস: মহাকবি? না কুমার আমি নেহাতই শব্দের কারিগর। বাল্মিকী, অশ্বঘোষ, ভাস, সৌমিল্লর ছায়ামাত্রও নই। আমার কাব্যলক্ষ্মী সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে, মেঘদূতমের কবিকে এখন রঘুবংশম লিখতে হচ্ছে শুধুমাত্র চন্দ্রগুপ্ত ও তার বংশের স্তুতি করার জন্য। যে হস্তে প্রেমের চিরগাথা অঙ্কিত করেছি সে হস্তে লিখেছি

প্রজানামের ভুত্যর্থ স তাভ্যোবলিমগ্রহীত
সহস্রগুণমুস্ত্রস্টুমাদত্তে হি রসং রবি।।

হায়রে কী সর্বৈব মিথ্যাভাষণ! প্রজার মঙ্গলের জন্যই নাকি রাজারা তাদের ওপর কর ধার্য করে।

কুমার : সত্যকথা লিখুন কবিবর। রাজতন্ত্রের কলুষের কথা, তাদের লাম্পট্য আর

অত্যাচারের গাথা লিখুন।

কালিদাস: আর সম্ভব নয় মিত্র। শুধুমাত্র যশোলাভের জন্য উজ্জয়িনী ছেড়ে, অস্তাচলগামী শক রাজ্য ত্যাগ করে চন্দ্রগুপ্তের শরণে গিয়েছি। এখনা আমার উচ্চাশা, আমার অর্থলিপ্সা আমাকে তার নিজের মধ্যে গিলে খেয়েছে। আমি এখন নিত্য মদিরাসেবী। কিন্তু মদিরা সেবনে তৃপ্তি নেই, মদির মদিরক্ষেণাদের আলিঙ্গনে তৃপ্তি নেই। আমি সত্যকে হারিয়ে ফেলেছি আমার জীবন থেকে।

কুমার : শান্ত হোন মিত্র।

কালিদাস: শান্তি যে আমাকে ছেড়ে নীলাকাশে তার ডানা মেলেছে। তবে কল্যরাত্রে আমি এক নতুন শ্লোক রচনা করেছি। রঘুবংশের জন্য। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো পাঠক হৃদয়াঙ্গম করবে এই কালিদাস যা করেছিলো তা চায়নি।

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।।

(সুনন্দা প্রবেশ করে)

সুনন্দা : বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে
মন্দ কবিযশ চায় সেই দশা তাহারও কপালে।

কালিদাস: ভগিনী বিদায়ের সময় হয়ে এলো। নিজেকে কিছুটা কুড়িয়ে পেলাম তোমাদের অঙ্গনতলে। জয় হোক তোমাদের কৌমজীবনের। সাবধানে থেকো কুমার। চন্দ্রগুপ্ত তোমাকে বড্ড ভালোবাসে। তার প্রথম পুত্রের নামও কুমার।

কুমার : তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তার রাজ্যলিপ্সাকে। আপনি নিশ্চিন্ত যাত্রা করুন কবি। যৌধেয়রা প্রস্তুত আছে।

(কালিদাস বেরিয়ে যায় । রণবাদ্য বেজে ওঠে। অশ্বের হ্রেষা, হস্তির বৃংহন শোনা যায়। অনেক মানুষের আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। মঞ্চে দণ্ডায়মান কুমার ও সুনন্দা ক্রমশঃ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হতে থাকে । সুনন্দা নিষ্ক্রান্ত হয়। বিভিন্নজন যুদ্ধসংবাদ দিতে থাকে কুমারকে)

১ : কুরুগণের দুর্গাধিপ খরর পাঠিয়েছে চন্দ্রগুপ্তর বাহিনীতে পাঁচশত হস্তী রয়েছে।

কুমার : অষ্টমী তিথির নিশাকাল। আজ রাত্রেই হস্তীবাহিনী যমুনা পার হবে। রেবতকের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ ভল্ল ও ধনুর্বাণ নিয়ে যৌধেয়রা যেন প্রস্তুত থাকে।

২ : কুনিন্দ গণের সেনাপতি জানিয়েছেন মগধ বাহিনীর রথগুলি হস্তিনাপুর ঘাটে ঘাঁটি গেড়েছে।

কুমার : এই অঞ্চলের সমস্ত জলযান আমাদের দখলে। সবগুলিকেই সন্ধ্যার আগেই সলিল সমাধি দিয়ে দাও। মাধবসেন যেন সতর্ক থাকে।

৩ : চন্দ্রগুপ্তর পদাতিক ৩ অশ্বারোহী সৈন্য ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট সন্নিবেশিত হয়েছে।

কুমার : আমি নিজে যাব ইন্দ্রপ্রস্থে চন্দ্রগুপ্তকে চরম শিক্ষা দিতে। আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে ঐ অঞ্চলে সমাবেশ ঘটাও।

৪ : মহাসেনাপতি কুমার দুঃসংবাদ আছে, মথুরা অঞ্চলে মগধের একদল অশ্বারোহী প্রবেশ করেছিল। সেখানে আমরা অরক্ষিত ছিলাম। শুধুমাত্র যৌধেয়ানীরা ছিলো আহতদের শুশ্রূষায়। তারা প্রচণ্ড সংগ্রাম করে মাগধীদের হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেবী সুনন্দা বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

(শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসে)

কুমার : আমারই ভুল হয়েছে। তাদের তরোয়ালের ধারের ওপর চলতে শিখিয়েছিলাম কিন্তু ভাবিনি হাতের বলয়-কঙ্কন খুলে ফেলে তারা তরবারি তুলে নেবে। সুনন্দার আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হও। যৌধেয়গণস্য জয়ঃ

সকলে : যৌধেয়গণস্য জজয়ঃ

কুমার : সর্বগণস্য জয়ঃ

সকলে : সর্বগণস্য জয়ঃ

(রণবাদ্যের সাথে যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। নেপথ্যে শব্দ শোনা যায়)

নেপথ্যে সুহোত্র : সেই যুদ্ধে যৌধেয়রা পরাজিত হয়। তাদের মহাসেনাপতি কুমার শহীদের মৃত্যুবরণ করে। গুপ্তবাহিনী যৌধেয়ভূমিতে প্রবেশ করে সেটি শ্মশানে পরিণত করে। রোহিতকি, অগ্রোদকা, খণ্ডিলা, পৃথুদকার মত সমৃদ্ধ নগর উজাড় হয়ে যায়। যদিও যৌধেয়রা হাল ছাড়েনি। রণাঙ্গন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। গুপ্তসৈন্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিআক্রমণের আশঙ্কায় দিন গুণতো। গুপ্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি যৌধেয় তরুণ তরুণী সুপ্ত আশা পোষণ করত কোন না কোনোদিন নিশ্চয়ই তারা যৌধেয়ভূমিতে ফিরে যাবে। সেই যুদ্ধ কি এখনো চলছে না? কোনো না কোনোদিন আমাদের স্বপ্নের সংঘজীবনে, সাম্যের জীবনে আমরা যৌধেয়রা ফিরে যাব। যাবই।

কুমার : যৌধেয়ানাং জয়মন্ত্রধারানাম

সকলে : যৌধেয়ানাং জয়মন্ত্রধারানাম

(রণবাদ্য ক্রমঃ উচ্চগ্রামে পৌঁছায়।)

লেখক: **সুদীপ্ত দত্ত, নাটককার, পশ্চিমবঙ্গ।**

Playwright : **Sudipta Datta, Theatre activist of West Bengal.**

ঝড়

■ মনুজেন্দ্র কুন্ডু

উৎসর্গ : নাটকটি লেখা হয়েছিল বছর বিশেক আগে, মরিতানিয়া নিয়ে একটি চ্যানেলে (ডিসকভারি না ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, মনে নেই) তথ্যচিত্রে দেখে। আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা মরুভূমির পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মরিতানিয়ার একটি ছোট্ট জনপদ চিঙ্গেটি, যা বার বার চলে গিয়েছে সাহারার বালি'ঝড়ের গ্রাসে এবং বার বার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে মানুষের অদম্য প্রয়াসে। ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রাচীন বাহক সেই জনপদটির ক্ষয়ধারা আজও অব্যাহত। এখানকার বহু মানুষ তাই বাধ্য হয়েছেন তাঁদের আবাস ছেড়ে চলে যেতে। তবু এখনো কিছু কিছু মানুষ নিলয়ের পথে প্রতিবাদ-স্বরূপ হয়ে দৃঢ়প্রোথিত রেখেছেন তাঁদের গৃহীত সঙ্কল্প ও প্রার্থনাগুলি। এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' - এর সমান্তরালেই চলতে থাকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিসঞ্জাত ঘৃণা প্রবণতাগুলিও। সেই চিঙ্গেটি আর তার মানুষ, যাঁরা নিজেদের ঐহিক ঘুর্ণবাত আর প্রকৃতির রোষানলে নিরন্তর আবর্তিত, তাঁরাই এই নাটকের অনুপ্রেরণা । সাম্প্রতিক কিছু পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন -সহ এই কথোপকথনমালা তাঁদেরই প্রতি নিবেদিত।

পাঠকের প্রতি : নাটকটির কাঠামো এটি উল্টানো ত্রিভুজের মতো। বাকিটা- পাঠকের বিবেচনা ব্যাখ্যা আর স্বাধীনতা। এখানে যত সংখ্যক লোকের কথা বলা আছে উপস্থাপনার অসুবিধা বা লোকাভাবের জন্য সেই সংখ্যার ইতরবিশেষ ঘটানো যেতেই পারে। ঝুলন্ত দু'জনের জন্য কাউকে না পাওয়া গেলে ম্যানিকিন (Mannequin) জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের মুখনি:সৃত শব্দ প্রক্ষেপণের জন্য প্রযুক্তির সাহায্য আবশ্যিক।

প্রথম দৃশ্য

[একটি ঝড়ের রাত। খোলা মাঠের ধারে একটি দোদুল্যমান জীর্ণ কুঁড়েঘর। চারদিক থেকে অনবরত শোঁ শোঁ হাওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কুঁড়ের ভিতরে অনেক লোক।]

উপবিষ্ট দল

১জন : চলুন, ভাইরা সব, একটা গান গাওয়া যাক। অনেকক্ষণ বসে আছি। একভাবে বসে থাকতে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

২ জন : হোক, হোক। কিছুটা সময় অন্তত কাটবে।

৩,৪,৫,৬,৭ জন : [এক যোগে] : বেশ , বেশ।

৭ জন : কিন্তু কী গাইব? এমন হওয়া চাই যে গান সবাই জানবে। তবে তো হবে।

৬ জন : তা বটে, তা বটে।

১জন : [সবাইকে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে] : এই গানটা বার কয়েক আউরে নিন,

তবেই হবে। [খানিক পরে] হ'ল তো?

উপবিষ্ট সবাই : হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই আর কী, সব কি আর এত তাড়াতাড়ি হয়?

৪ জন : হ্যাঁ , সে তো বটেই।

৩ জন : ও, ঠিক হয়ে যাবে।

২ জন : হ্যাঁ, হ্যাঁ। অত ভাববেন না। আর কে-ই বা অতশত দেখতে যাচ্ছে।

১ জন : ঠিক ঠিক। বেশ ধরুন এবার। দু'একজনের ভুল হ'লে ক্ষতি নেই। ও আপনিই শুধরে যাবে।

[গান, বেশ কিছু ভুল-সহ সঙ্গতভাবেই]

আমরা ঘর ভুলেছি ঝড়ের মুখে
তার প্রেমের মোহন গানে।
মোদের সকল পথই গেছে যে
তার অভিসারের পানে।
ঘরের যে সব পথ ছিল গো, হারিয়েছে সব,—
আমরা পথের মায়া ভুলে গেছি
খোলা মাঠের গানে।
আমরা সব খুয়েছি, সব পেয়েছি—
ঝড়ের কলতানে।

দণ্ডায়মানের দল

১ জন : আঃ! অত শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গাইছেন কেন বলুন দেখি? আপনি [উপবিষ্টের কোনো একজনের প্রতি] তো আমার গায়ের ওপরে এসে পড়লেন। এবার আমি অন্যদের গায়ে গিয়ে পড়ব যে!

২জন : অ্যাঁ ঃ ঝড়বৃষ্টিতে ভিজেকুটে লেবড়ে যাচ্ছি, আর বাবুরা বসলেন গলা সাধতে!

৩ জন : শালার তিতিয় পহরের শিয়াল হুক্কা হুয়া ডাক ছাড়ছে রে।

দণ্ডায়মানের দল: [এক যোগে] হাঃ, হাঃ, হাঃ, হ্যাঃ।

৪ জন : ব্যাঙ্গায় ডাকিছে ব্যাঙ্গানিরে/ আহা, ব্যাঙ্গানিরে, বাদলে শীত করে /দে গরম ক'রে।

দণ্ডায়মানের দল: [এক যোগে] হাঃ, হাঃ, হাঃ, হ্যাঃ।

উপবিষ্টের দল

৭জন : ছি, ছি: কী ইতরামো!

৮ জন : ভদ্রভাবে কথা বলুন। এ কী ধারার রীতি!

১ জন : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ইত্রামোর একশেষ!

৩ জন : শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে যা হয়।

দণ্ডায়মানের দল

১২ জন : শোনো হে, শোনো তোমরা। ঠাণ্ডায় -শীতে দাঁড়াতে পারছি না। আর তেনারা এলেন শিক্ষা দিতে।

২০ জন : আমরাও কিছু কিছু শিক্ষে-দীক্ষে পেয়েছি। অত পালিশ করে 'প্রেমের গান', 'অভিসার' করলেই ভদ্রতার নমুনা দেওয়া হয় না। নিজেরা তো কথা বলেন ইনিয়ে-বিনিয়ে, পিঠ বাঁচিয়ে। শ্যামটাও রইল, আর কেউ বলতেও পারবে না কুলখেকো।

৩ জন : শালারা, মেনিমুখোর বাচ্চা।

(বাঁশের মাচায়) ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

১ জন : ওফ্! [উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মানের দলের দিকে ইঙ্গিত করে, পাশের জনকে আস্তে আস্তে] আবার হাঁউ কাউ শুরু করল। উফ্!

২জন [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] : হুঁ।

৩ জন পাশের জনকে : একটু স্যাইরে বসেন না। এইখানে জল[১] পড়ে তো।

৪ জন : কোথায় সরব?

৩ জন : [অসন্তুষ্টভাবে নড়াচড়ার চেষ্টা করে]

৫ জন : আহ্ ঠেলাঠেলি করছেন কেন?

৩জন : গায়ে জল পড়ে তো।

৬ জন : তা, আমরা কী আর শুকনা আছি![২]

৭ জন : ওঃ, রসের যা ধারা দেখিচি!

৮ জন : নীচে উপরে একই ধারা।

[৩য় জন ছাড়া ১-৪০ জন একযোগে হাসে। উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মানের দল মাচার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।]

উপবিষ্টের দল

১জন [উপরে তাকিয়ে]: ওখানে আবার কীসের তামাসা চলছে?

৫ জন [দণ্ডায়মানদের প্রতি ইঙ্গিত করে]: এখন তো আর কোনো অসুবিধে হবে না!

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

১৩ জন : মোরা তো অসের নাগর । তাই অসে লুটোপুটি খাতিছি। [সকলের হাসি] মোরা গাতি পারি না, তাই হাসতিছি। মোদের গায়ে তুমাদের ছুয়া লাগছে গো, ছুয়া লাগছে।[৩]

উপবিষ্টের দল

৭ জন [জিজ্ঞাসু]: মানে ?

দণ্ডায়মানের দল

৩ জন : ছোঁয়া? কীসের ছোঁয়া?

উপবিষ্টের দল

১ জন : আমরা কী যক্ষ্মা না বসন্ত? [উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিজের শরীর এগিয়ে দিয়ে প্রতিরোধের ভঙ্গি আনার চেষ্টা করে]

দণ্ডায়মানের দল

১ জন : কী হল?

২ জন : চুপ করে আছিস কেন?

৩ জন : বল্।

৪ জন : বল।

১৪. জন : কী রে, কী হল ...

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

৩৩ জন [ভ্যাবাচ্যাক্যা এবং কিছুটা শঙ্কিত দশা] : সেটা কিছু লয় গো, বাবুরা। সেটা কিছু লয়। [দন্ত বিকশিত করে।। তারপর ১৩ জনকে শাসনের গলায়] না জাইনে, না বুইঝে রা কাড়বিস্ নাই। এখন সুগুম মাইরে আছিস্ ক্যানে?

[১৩ তম জন গোবেচারা ভাবে চুপচাপ বসে রইল। বাইরে হাওয়ার বেগ বেড়ে উঠল। কুঁড়েটি খানিকক্ষণ আগের তুলনায় বেশি জোরে দুলতে লাগল। বাঁশের মাচায় মড়মড় ধ্বনি উঠল। ঘরের চালা থেকে নেমে আসা দড়িতে ২ জন লোক ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো উর্ধ্বপাদ হয়ে ঝুলেছিল। চালায় যেখানে দড়ি বাঁধা ছিল, সেখানেও মচমচ শব্দ শোনা গেল।]

২২ জন : বাপু হে, পড়ি যাইবার ধইচ্ছি। যা[৪] বাতাস ছাড়িছে, এলায় পরাণ যাবার ধইচ্ছে, বাপ্পৈস রে!

৪০ জন : **[গান]**

প্রাণ যাইবে, ঘর গিয়াছে।
ভাবনা কী আর আছে?
বলি, ভাবনা কি আর আছে?

৩৫ জন : উয়ারে ধাক্কা দিয়া নামায়ে দাও। উয়াগো [উপবিষ্টদের দেখিয়ে] লগে গিয়া বসুক।

২৫ জন : নেবে না, নেবে না। ওকে নেবে না।

৩৭ জন : দাঁড় কাক ময়ূরপুচ্ছ লাগালে ময়ূর হয় কি? হয়েছে কখনো?

৩৫ জন : তয় উয়ার মুখ চাইপ্যা ধর্।

২৫ জন : আহ্ অত চটো কেন? ওর কথার [২২ তমের দিকে ইঙ্গিত করে] উত্তরে না হয় দুটো কথাই বলেছে সুর করে।

৩০ জন : আর যা^ দশা ! তা কলিই কী, আর না কলিই বা কী! সত্য ঐ কয়েছে। তবে যা-ই কও বাবা, সাবধানে কথাটথা কয়ো। যা দ্যাখ্‌লাম্...

৩১ জন : [আগের কথার খেই ধ'রে]: আর বারবার ওই কথা বললে মনে বল পাওয়া যায়। তখন একটা কিছু ঠাহর করতে ইচ্ছা করে। সাহস আসে।

৩৫ জন : [অসন্তুষ্টভাবে] : তয় আর কী! চিল্লাও...

উপবিষ্টের দল

১ জন [উপরে তাকিয়ে]: উপরে বসে ভালই ফূর্তি লুটছে। পড়লে কিন্তু শালারা আমাদের ঘাড়েই পড়বে।

৬ জন : নীচে যা ঠাণ্ডা । মাচার উপরে দিব্যি আছে।

দণ্ডায়মানের দল

১৬ জন [উপবিষ্টদের প্রতি]: কেন আমাদের ঘাড়টা আছে না? আপনারা তো তা -ও দূরে আছেন। মাচাটা তো আমাদেরই মাথার উপরে। পড়লে আমাদের ঘাড়টা যাবে আগে। দু'একটা আপনাদের দিকে ছিটকে টিটকে পড়ে গেলেও যেতে পারে।

২০ জন : ততক্ষণে সামলে নেবে ওরা।

উপবিষ্টের দল

১ জন : যাই বলুন, আমাদের বা আপনাদের ঘাড় ... পড়বে তো সেই মানুষের ঘাড়েই। ওদের শরীর মাটি ছোঁবে না।

৩ জন : গদির ওপরে তেনারা দেহ রাখবেন।

দণ্ডায়মানের দল

১১ জন ব'লে : আর, দেখুন কাণ্ডটা— অতগুলি লোক ওইটুকু মাচায় চেপেছে। কাণ্ডজ্ঞান আছে কিছু! কোনোদিন ভার মানে এত লোকের? একে তো বাঁশ....

উপবিষ্টের দল

২ জন : নীচে থাক্ । তা না। নীচে থাকলেও থাকত ভাল। তখনই বললাম, অতগুলি লোক ওপরে যাবেন না। কিন্তু কে শোনে কার কথা !

দণ্ডায়মানের দল

১৭ জন : শুরুতেই আপনারা এসে যেভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন ... আমরাই দাঁড়াতে পারছিলাম না। ওরা আর কী-ই বা করবে? তা-ও তো দুটো ওপরে ঝুলছে [ওপরের দুজনকে ইঙ্গিত করে]।

উপবিষ্টের দল

৫ জন : [সস্মিত]: আমরা না বসলে তোমরা বসতে এ ... [পাশের ৪র্থ জনের চোখ ঠারা দেখে চুপ ক'রে যায়। বাইরে দেখতে চেষ্টা করে]।

৪ জন : অত বসার খোঁটা দিচ্ছ যে, বসলে বুঝতে আমাদের পেছনটা পুরো ভিজে সপ্

সপ্ করছে। [সবাই সম্মতি জানায়।]

একেই বিস্টি -বাদলের রাত। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা না লেগে যায়।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

[একটি শিশু ককিয়ে ওঠে।]

২৬ জন : তোমরা এট্টু চুপ যান তো! চেক্কারের জ্বালায় মোর ছাওয়ালডা চমকি চমকি ওটে।[৬]

দণ্ডায়মানের দল

১৯ জন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু থামান এবার।

১২ জন : আরে থামো তো তুমি। চিৎকার কি আর এমনি আসে? ওই ওদের জন্যই তো যত্তো ঝামেলা। [মাচার দিকে তাকিয়ে] আরে, বাচ্চাটা কাঁদছে তো মাই দিলেই তো পারে। [কয়েকজনের মুখে পাতলা হাসির রেখা দেখা যায়।]

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

২৬ জন : তা কী ক্যরব না ক্যরব, তা কি তোমার কাছে শিখতি হবে নাকি? তোমারে আবার গত্তে ধত্তি পারি, তা জান! ভাব্ খান অ্যামন দ্যাখাতিছেন, য্যান আমাদের জ্বালায় মরি গ্যালেন গো। আমরা কি আর সাধে উঠিছি হেথা? পড়ি গ্যালে তো আমাদেরও লাইগবে, নাকি?

৩৫ জন : ঠিক কইছস, নারাইন্নার মা, ঠিক কইছস্। অগো লাইগাই ত্তো আমরা এইখানে আইয়া বইছি। [আগের মতো হাওয়ার বেগে ঘরটা দুলে ওঠে।]

৪০ জন : গেল গেল, গেল গো!

[দণ্ডায়মানের দল শঙ্কিত ভাবে ওপরের দিকে তাকায়। উপবিষ্টের দল থেকে দু'একজন উঠে দাঁড়ায়। ঝুলন্ত দু'জন গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করে। যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সতর্কভাবে একটু এদিক সেদিক দেখে আবার বসে পড়ে।]

[গান]

প্রাণ বুঝি আজ তবে গেল গো—
গেল গো, গেল গো, গেল গো।
আজ দেওয়া নেওয়ার পালা এল,
এখন কোলাহলে লাভ কী বল—
গেল গেল গেল,
প্রাণ বুঝি আজ গেল।
দেবার বেলা দিতেই হবে, ভাবনা কী আছে,
এসো পাশে, এসো সাথে, যারা ছিলে দূরে কাছে
দ্বিধার নিগড় ছিঁড়ে ফেল

আজকে ছুটির দিন।

[চাঁটির শব্দ। মাথায় হাত দিয়ে] উফ্ ![পিছনে ফিরে তাকায়।]

৩৫ জন : তখন থিক্কা কইতাছি, চুপ কর্ চুপ কর্। দেখতাছস না পোলাটা ফাল পাড়ে। ঘুমাইতে পারতাছে না। যা গিয়া অগো লগে বয় ওইখানে। এইখানে চেচাবী না।

৪০ জন : তাই বলে তুমি গায়ে হাত তুলবে?

উপবিষ্টের দল

৫ জন : আহা! কী মধুর বিশ্রম্ভালাপ!

১ জন : ওরে, ওদের গৃহযুদ্ধ লেগেছে রে! উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মানের দল হেসে ওঠে।]

দণ্ডায়মানের দল

২ জন : ওকে গানে পেয়েছে। [অট্টহাসি]

৪ জন : না, না, দাদা, ওটা হল শীৎকার ধ্বনি।

[উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মানের দলভুক্ত বেশ কিছু জন আবার হেসে ওঠে।]

১ জন [জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ৪র্থ জনকে] : শীৎকার মানে কী?

৪ জন : তা-ও জানেন না? [হাসির দমক] ওই যে যেটা একটু আগে কোকাচ্ছিল, সেটাকে পয়দা করার জন্য বউয়ের সঙ্গে যা করতে হয়, তখন বউরা আর তাদের স্বামীরা যে আওয়াজ করে তাকে শীৎকার বলে।

উপবিষ্টের দল

৫ জন : সাধু, সাধু! কী ভাষা!

৪ জন : কী ব্যাখ্যা! [চটুল হাসি]

৩ জন : কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব!

১ জন : সাবাস! [সবাই আবার হেসে ওঠে।]

দণ্ডায়মানের দল

৭ জন : তবেই বুঝুন, দাদা, কাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

১ জন : সাক্ষাৎ প্রতিভা। [আবার দণ্ডায়মান ও উপবিষ্টের দলে সরস হাসি শোনা যায়।]

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

৪০ জন [একটু উঠতে চেষ্টা করে। মাচায় মড়মড় ধ্বনি শোনা যায়]: এসব কী হচ্ছে বলুন তো? এখানে মেয়ে, বাচ্চাটাচ্চারা আছে। এগুলো না বললেই নয়?

দণ্ডায়মানের দল

১২ জন : কেন? একটু আগেই তো আমাকে কে যেন গর্ভে ধরছিল না? তখন বুঝি মেয়ে, বাচ্চারা ছিল না? তখন কিছু বলিনি। এখন মুখ খোলাবেন না। নয়তো দেখতাম, কে কাকে গর্ভে ধরে, আর কে কার গর্ভ করে।

[ঝুলন্ত দু'জন গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে। একজন বিজড়িত গলায় চিৎকার করে কিছু বলতে থাকে। হাত পা নাড়ায় (ম্যানিকিন ব্যবহৃত হ'লে পুতুল নাচে যেভাবে সুতোর টানে অঙ্গ সঞ্চালন করা হয়, সেক্ষেত্রেও সেটাই সুবিধাজনক/ উপযুক্ত হ'তে পারে)। চালায় টান প'ড়ে মড়মড় ধ্বনি হয়। দণ্ডায়মান,উপবিষ্ট ও ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল সচকিত বিস্মিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মুখের ভাব দেখে বোঝা যায়, তারা কিছু বোঝার চেষ্টা করছে অথচ ঠাহর করতে পারছে না। তার কথা থেমে গেলে পর ...]

উপবিষ্টের দল

৬ জন [ওপরে তাকিয়ে ধীরে ও সভয়ে] : সাক্ষাৎ যমদূত!

দণ্ডায়মানের দল

১ জন : চিড়িয়াখানা, চিড়িয়াখানা!

১৫ জন : বহুৎ খুব, বহুৎ খুব! অর্ , উ ও দেখিয়ে চিড়িয়া উড় রহি হ্যায়
[হাসতে হাসতে ঝুলন্তদের দিকে ইঙ্গিত করে]।

৪জন : বেড়ে বলেছেন, মাইরি। আমাদের মধ্যে রসিকের অভাব নেই দেখছি।

উপবিষ্টের দল

২ জন : রসরাজ, রসরাজ। আমাদের কুলতলার রসরাজ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের রসের মতো। মাখো মাখো।

দণ্ডায়মানের দল

৪ জন মাথা উঁচিয়ে উপবিষ্টের দলের দিকে দেখবার চেষ্টা করে: কে,কে, দাদা? কুলতলায় কে থাকেন বললেন? আমিও তো ওখানেই থাকি। [অন্যদের সরিয়ে সেদিকে যাবার চেষ্টা করে, এগিয়ে যায়। অন্যরা বিরক্তিসূচক শব্দ করে]

১ জন : আস্তে আস্তে।

১৪ জন : জাতভ্রাতৃত্বের ঠেলা। একটু তো লাগবেই।
[সামনেই কোথাও মুহুর্মুহু: বাজ পড়ার শব্দ শোনা যায়। সবাই সন্ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চায়। কেউ কেউ ফোঁকর দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করে।]

১৮ জন : উফ্! [৪র্থ জনের পা তার পায়ে প'ড়ে যাওয়ায় ব্যথার উত্তেজনায় ৪র্থ জনকে ধাক্কা দেয় সজোরে। নিজের ডান পা উঠিয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে। ৪র্থ-সহ আরো পাঁচ-ছ'জন হুড়মুড় করে উপবিষ্টের দলে গিয়ে পড়ে। উপবিষ্টের দলের ৮ম জন দণ্ডায়মানের ৪র্থ জনকে সশব্দে চপেটাঘাত করে। দণ্ডায়মান দলের ১৩তম জন ও ৪র্থ জনকে সজোরে পদাঘাত করে ও বাকিরা তার উপরেই ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবার উদ্যোগ নেয়। ৪র্থ জন উঠে দাঁড়িয়ে উপবিষ্টের ৮ম জনকে মারতে উদ্যত হয়। উপবিষ্টদের ৩য় জন ৮ম

জনের সঙ্গে একযোগে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল উৎসুক দৃষ্টিতে এসব ঘটনা আনুপূর্বিক লক্ষ করে। দণ্ডায়মানের দু'একজন ৪র্থ জনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।]

৯ জন [উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে] : আহ্, কী শুরু করলেন আপনারা! এই ঘরে আসার পর থেকেই কী অশান্তিটা শুরু হয়েছে, বলুন দেখি!]

উপবিষ্টের দল

১ জন : আমরা আবার কী করলাম?

৭ জন : আমরা তো প্রথমে গানই গাইছিলাম। সেটা তো আপনাদেরই সহ্য হল না।

দণ্ডায়মানের দল

৯ জন : সে তো বটেই। তখন গাইলেন,আর এখন নাচছেন। [উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কিছুটা মৃদু স্বরে] এক দণ্ডও চুপ থাকতে পেরেছেন? যা-তা! আপনারা এত বয়স্ক লোকজন হয়েও ছেলেমানুষি কেন যে করেন! [গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে ধমকের সুরে] যান, যান, যে যার জায়গায় যান [উপবিষ্টের ৮ম জনের প্রতি] আর, আপনি কেন গায়ে হাত তুললেন? [৩য় জনের প্রতি] আপনারও বলিহারি, মশাই! কোথায় থামাবেন, তা না। উল্টে মারামারি করতে যান। একবার বয়সটা দেখুন নিজের!

উপবিষ্টের দল

৮ জন : কোথাকার আমার গৌতম বুদ্ধ এলেন রে! আমি কি একাই মেরেছি নাকি? [দণ্ডায়মান দলের ১৩তম জনের প্রতি নির্দেশ ক'রে] উনিও তো লাথি মারলেন, তার বেলা? আর অত উত্তেজনারই বা কি আছে? হুড়মুড় করে গায়ের উপরে এসে পড়া।

৩ জন : আপনাদের ওখান থেকে যে দলবাজি করে মারতে এল, তখন কী?

দণ্ডায়মানের দল

৯ জন [বিরক্ত] : উফ্! আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। চারদিকে ঝড়, জল। মাথায় দুর্যোগ। কোথায় একসাথে থাকবেন, তা না। নিজেরাই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছেন। ঘরটার একে তো এই অবস্থা— একটা উপায় বাতলাতে পারলে ভাল হয়। সেটা না করে নিজেরাই ঘরের ভিতরে ঝড় তুলেছেন।

উপবিষ্টের দল

৫ জন : আর আপনিও এই সুযোগে ভালই লেকচারটা দিয়ে দিলেন। থামুন দিকি। [খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ ব'সে, দাঁড়িয়ে, ঘাড় গুঁজে, ঝুলে থাকে নিজের নিজের জায়গায়। বাইরে বৃষ্টি আর বাতাসের যুগলবন্দির মধ্যে ঘুলিয়ে ওঠে দূর থেকে ভেসে আসা কিছু লোকের অস্পষ্ট পদধ্বনি, কণ্ঠস্বর। ভেতরে কেউ কেউ

নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথাবার্তা চালায়, যা দর্শকদের কাছে পৌঁছয় না। ক্রমে পদধ্বনি, তারপর সেই ধ্বনির বাহকদের গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসে।]

নেপথ্যে

১ জন - [দরজায় করাঘাত ক'রে]: দরজা খুলুন। দরজা খুলুন।

[বাইরে বহু মানুষের গুঞ্জন আর আর্তস্বর শোনা যায়।]

২ জন : দরজা খুলুন। ভেতরে কেউ আছেন?

[অন্দরে সকলেই শঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে বসে / দাঁড়িয়ে / ঘাড় গুঁজে/ঝুলে থাকে। দণ্ডায়মানের ৮ম জন দরজার দিকে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ নেয়। বাকিরা তাকে টেনে ধরে। উপবিষ্টের দলের দু'একজন শাসানো দৃষ্টিতে তাকায়। উদ্যত হাতে তাকে প্রতিরোধ করে।]

৩ জন : ১ ভাঙ্ না , ভাঙ্, দরজাটা।

বহুকণ্ঠ : ভাঙ্ শালার... ভাঙ্ দরজা... ভেঙে ফেলুন ... ভাঙো ভাঙো ... ভাঙ্গিয়া ফালান... আহ্, করেন কী...আশ্চর্য...ভেতরে কী কেউ নেই, নাকি... ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ... ব্যাড়ার ফুটায় চোখ লাগায় দ্যাখ্ কেউ আছে নাকি ...

[অন্দরে দুয়েকটি শিশু ককিয়ে ওঠে। পাশের মানুষজনেরা তাদের মুখ চেপে ধরে বা মায়েদের শান্ত করার জন্য উদ্বিগ্ন ইঙ্গিত করে। তাতে কোনো কোনো মহিলার চেহারায় ভয় বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। ইতিমধ্যে নেপথ্যে দু'তিনটি মুহুর্মুহুঃ বাজ পড়ার তীব্র শব্দ হয়। বৃষ্টির বেগ প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে।]

বহুকণ্ঠ : বাবা রে .. মাগোঃ.. ইশ্, ভিজ্জা গেলাম... পালা, পালা... দরজা খোলার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই ... পালা, পালা , পালা, পালা .. অ, বিন্তির মা, কই গেলি লো... এই যে আমি এইখানে, তুমি কই গ্যালা ... পালা, পালা, পালা, পালা...[শিশুর কান্না, বৃদ্ধের কোকানো] ... পালা রে, বাঁচতে হলে পালা...

অন্দর

উপবিষ্টের দল

১জন [হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে দেখে। তারপর একইভাবে স্বস্থানে যেতে যেতে হাত নাড়ে]: গেছেঃ!

৩জন : গেছে?

১জন : হ্যাঁঃ।

৫ জন : বাঁচা গেছে।

৭ জন : আরেকটু হলেই গেছিল।

দণ্ডায়মানের দল

১৫ জন : ঠিক সে দেখা হ্যায় না? সব গয়া তো?

উপবিষ্টের দল

১ জন : হ্যাঁ, হ্যাঁ। নেই, নেইঃ।

২ জন : খুব জোর বেঁচে গেছি। রক্ষেকালীর জয়। বাবা তারকনাথ, তোমার চরণে কৃপা লাগি।

[উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান এবং ঘাড়গুঁজে থাকাদের অনেকে একযোগে 'জয় বাবা তারকনাথ', 'রক্ষেকালীর জয়', ' মা, মা' বলে ওঠে। কেউ কেউ কপালে হাত ছোঁয়ায়। কেউ প্রণাম করে। কেউ কেউ আরেকটু জড়োসড়ো হয়ে গুটিয়ে বসার চেষ্টা করে।]

৬ জন [দণ্ডায়মানের ৮ম জনের প্রতি]: আপনি আবার দরজার দিকে যাচ্ছিলেন কেন, মশাই? দরজা খুলে দিতে নাকি?

দণ্ডায়মানের দল

৮ জন [খাবি খেয়ে]: না, না, ফোঁকর দিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম।

উপবিষ্টের দল

৬ জন : দরকারটা কী, মশাই?

দণ্ডায়মানের দল

৯জন : কোনো দরকার আছে এ সবের? দেখছেন, সবাই মানা করছে। যদি পড়েটড়ে যেতেন তো আবার আগের মতো হাঙ্গামা বেধে যেত। তাছাড়া ওরাও তো বুঝে ফেলতে পারত যে ভেতরে কেউ আছে। সব্বাই যখন চুপ করে আছে, তখন আপনার আবার .....

৮ জন [একটু বিরক্ত]: আরে , যাই তো আর নি...।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

১ জন : যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন।

উপবিষ্টের দল

৪ জন : বাইরে কী বিস্টিটাই না নেমেছে।

৫ জন : বাইরের লোকগুলো ভিজেই গ্যাছে বোধয়, ইশ্।

১ জন : ভাগ্যিস, ঘরের ভিতরে আসতে পেরেছিলাম ঠিক সময়ে। খুব জোর বেঁচে গেছি।

[আবার কেউ কেউ কপালে হাত ছোঁয়ায়। প্রার্থনার ভঙ্গিতে চোখ বোঁজে। কেউ কেউ প্রার্থনা সূচক বিড়বিড় করে।]

দণ্ডায়মানের দল

৫ জন : ঠিক বলেছেন।

১৩ জন : আরে, আসবি তো আয়, আর খানিক পরে আয়। তা না। এখনি বৃষ্টিটার আসতে হল। না হলে ঝড়টাই বা তখন কেন উঠবে। আর ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলে কী ছিল। বাড়ি পৌঁছে যেতাম। শালার ঝড়টা এসে লেজেগোবরে অবস্থা করে দিল।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

১৩ জন : মোরা তো তবু বাদলে তেমন ভিজি নাই। উয়ারা তো ভিজিয়া সারা!

উপবিষ্টের দল

৬ জন : হ্যাঁ, আমরা ভাগ্যবান। ভাবুন তো ওদের কথা। এই বৃষ্টিটাতে ভিজলে কী অবস্থাটাই না হ'ত।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

৪০ জন : ছোট ছোট বাচ্চা আর মহিলারা আছেন। ঝড় জলে সর্দি কাশি লেগে শরীর খারাপ করতে পারত।

দণ্ডায়মানের দল

৯ জন : যাক,যাক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন এখন ভালয় ভালয় বৃষ্টিটা যেন থেমে যায়। বাড়ি যেন ঠিকঠাক ফিরতে পারি।

[হাওয়ার বেগে কুঁড়েটি দুলে দুলে ওঠে। দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, ঘাড়গুঁজে থাকাদের কেউ কেউ প্রার্থনার ভঙ্গিতে চোখ বুঁজে থাকে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।]

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

২৬ জন : তোমরা কি কেউ কতি পারেন, তোমরা ক্যান্ ওই মাইনষিগুলারে ঘরের ভিৎরায় ঢুকতি দিলেন না? উয়ারা যা চেক্কারটা করল, ভয়ে তো মোর পরাণ শুখায়। মোর ছাওয়ালডাও কী যে ভয় পাছে! [সকলেই স্বস্থানে চুপচাপ।]

৩৫ জন : চুপ যা, নারান্নার মা। চুপ যা। অরা ঘরে আইলে আমরা য্যামনে আছি, ত্যামনে থাকতে পারতাম? ক, থাকতে পারতাম?

২৬ জন : ক্যানে, মোদের কিছু ঝামলা হ্যতো। চাপাচাপি করি ঠিকি হই যাইতো।

দণ্ডায়মানের দল

১২ জন : অতই যদি দরদ তো নিজে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জায়গা দিলেই তো হ'ত।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

৪০ জন : আহা, হাঃ.... কী যে বলেন! আচ্ছা ২৬তম জনকে আপনার কী আক্কেল বলুন তো? এমনিতে এই ঘরে থাকা যাচ্ছে না, তার উপরে....

২৬ জন : তোমরা ম্যালা প্যাচাল পারেন।

৩৫ জন : তুই ক্যান্ খান্দার পাকাইস?

২৬ জন : ক্যান্, আমি কী করছি?

উপবিষ্টের দল

৩ জন : মেয়েছেলের বুদ্ধি ....

৫ জন : বাচ্চাটা যদি এই ঝড় জলে ভেজে, তখন কী হবে, কে দেখবে? তখন আসবে ওই লোকগুলো দেখতে?

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

২৬ জন : আপনে ভিজেন গিয়া .... । [সন্তানকে আঁকড়ে ধরে]

উপবিষ্টের দল

৭ জন : সেই জন্যই তো বলছি, বেশি কথা বলো না। যা বলেছিলে, তাতে ওটাই হ'ত। বেশি পাকামি না করে যেখানে যেমন আছ, সেখানে তেমন করেই চুপচাপ বসে থাক।

৪ জন : আরে ছাড়ুন তো, মশাই। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়! আপনিও গেলেন ওর সঙ্গে কথায়। ওর কথার উত্তর দিতে...

৫ জন : ঠিক, ঠিকই বলেছেন। এই ছোটলোকগুলোর সঙ্গে কথা বলা, আর না-বলা দুই-ই সমান। উল্টো বুঝলি রাম করে শেষে নিজেরই মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তার চেয়ে ইগনোর করাই ভাল।

[বাইরে হাওয়ার বেগ দুঃসাধ্য রকমের বেড়ে উঠল। কুঁড়েঘরটি আশঙ্কাজনক ভাবে দুলতে লাগল।]

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

২৬ জন : না জানি। বড় ডর করে। [সন্তানকে আরো আরো জোরে চেপে ধরে]।

৪০ জন [উপবিষ্টের ৫ম জনের উদ্দেশ্যে, শান্ত গলায়, অনুযোগের সুরে]: এটা আপনি কী বললেন, দাদা? আমরা সবাই ছোটলোক? আমাদের কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?

৩৯ জন : কৈ কৈ, কখন বলল? খেয়াল করিনি তো! কে বলল, কে বলল?

৩৭ জন : কে কে... [কেউ কেউ সন্ধানীদৃষ্টিতে ৪০তম জনের দিকে তাকায়। কেউ নীচের দিকে চেয়ে খুঁজতে থাকে।]

২৩ জন : আমরা ছোটলোক? কোন ভদ্দরলোকের বাচ্চা বলল?

২৮ জন : [৪০তম জনের প্রতি] : কে বলল, বলুন। দেখি একবার। কে ভদ্দরনোক আর কে ছোটনোক, ফয়সালা হয়ে যাবে।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দলে একটা চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা দেখা যায়। কেউ কেউ মারমুখী হয়ে উঠে।

২১ জন : অনেকক্ষণ ধরে এদের ভ্যানত্যাড়ামি দেখছি। [৪০তম জনের প্রতি ধমকের সুরে] কে বলেছে, দেখান।

৩৪ জন : এঁঃ, এলেন আমার ভদ্রলোক সব। দু'চারটে পড়লেই বোঝা যাবে, কে ভদ্রলোক আর কে ছোটলোক। শালা, জাত তুলে কথা বলে!

২৮ জন [৪০ তম জনের প্রতি ধমকের সুরে]: বলবেন আপনি? নাকি ম্যাদা মেরে বসে থাকবেন? [ইতিমধ্যে উপবিষ্টের ৫ জনের চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব। কিছু বলার চেষ্টা করে, কিন্তু ভয়ে গুটিয়ে যায়।]

৪০ জন [আমতা আমতা করে] : না, মানে ...

৩৪ জন [ধমক ও মারমুখী সুরে] : কী না মানে , না মানে কী?

৪০ জন : বলছিলাম...

২১ জন : ওরে দিয়ে কিসু হবে না। শালার গান গায়। [২৮ তম জনের প্রতি] আপনি বললেন না, ম্যাদামারা? ও হছে ওই ম্যাদামারা মাল।

৪০ জন : আপনি আমাকে এভাবে বলতে পারেন না।

২১ [ভেঙিয়ে] : কেন, তাহলে কীভাবে বলতে হবে, বাবুকে?

৪০ জন : আপনি এইসব শব্দ ....

২০ জন : আপনে কইয়া দিলেই তো ঝামেলা মিট্যা যায়। কইতাসেন না ক্যান?

[এর মধ্যে দুয়েকজন উঠে পড়ার চেষ্টা করে এবং 'নীচে চল', 'নীচে চলুন' বলে নামার উদ্যোগ নেয় [কিন্তু নামে না।]

৪০ জন : বলছিলাম যে, উনি ঠিক বলেননি বলে আমি নিজেই তো বললাম। এখন, এই অবস্থায় আরো উত্তেজনা বাড়িয়ে কি লাভ আছে কিছু?

২১ জন : বললাম না, ম্যাদামারা মাল। [ভেঙিয়ে] 'আমাকে এভাবে বলতে পারেন না'।

৩৪ জন : জাত তুলে কথা বলে। এতবড় হিম্মত! শালা...

১৯ জন : ধ্যার্, একে দিয়ে কিসু হবে না। চলুন, নীচে গিয়ে সবক'টাকে ধরি। দুয়েকটা পড়লেই ঠিক বেরিয়ে যাবে, ভদ্রলোকটা কে।

[কয়েকজন উঠে পড়ার চেষ্টা করে। উপবিষ্টের ৫ম জন যারপরনাই সন্ত্রস্ত। অন্যান্যরাও শঙ্কিত। দণ্ডায়মানেরা সতর্ক।]

উপবিষ্টের দল

১ জন [ইতস্তত ভাবে] : দাদা, ভুল হয়েছে। [দুহাত জোড় ক'রে] যে বলেছে, তার পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। একটা বিপদের মধ্যে আছি। আর দয়া করে ঝামেলা বাড়াবেন না, আমিই ক্ষমা চাইছি।

ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল

৩৪ জন : আপনি যদি কিছু না করে থাকেন, আপনি কেন ক্ষমা চাইছেন? দেখিয়ে দিন, কে করেছে। বাকিটা আমরা বুঝে নেব।

[অন্যেরা সম্মতি জানায়। উপবিষ্টের ৫ম জন প্রচণ্ড ভীত, সন্ত্রস্ত।]

২৩ জন : আমরা ঝামেলা বাড়াচ্ছি? মুখ সামলে...

উপবিষ্টের দল

১ জন : না, না, তা বলতে চাইন। তা বলতে চাইনি। বলছিলাম যে, মাথায় একটা বড় বিপদ। ঘরটার অবস্থাও তো ভাল না। এখন একটা কিছু করতে কিছু হয়ে গেলে শেষে বিপদ আরো বেড়ে না যায়... ভুল বুঝবেন দয়া করে। আমি ক্ষমা চাইছি।

[উপবিষ্টের দলের অন্যরাও সমস্বরে সম্মতি জানায় এবং দুয়েকজন হাত জোড়ও করে।]

৫ জন : [উঠে দাঁড়িয়ে, সভয়ে]: আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি। আমি আসলে ওটা বলতে চাইনি। মুখ ফসকে ... রাগ করবেন না। [মাথা ঝুঁকিয়ে] আমি ক্ষমা চাইছি।

১ জন : কখন, কোথায় কী বলতে হয়, জানেন না। যেখানে সেখানে, যা-তা আজকাল আর বলা যায় না, সেই সামান্য বুদ্ধিটুকুও নেই?

[৫ম জন অপরাধীর মতো স্বস্থানে মাথা হেঁট করে বসে। 'বড় বাড় বেড়েছে', 'দেখে নিতাম',এত সহজে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হল না', 'ছাড়ান দেন, ক্ষমা তো চাইছে' ইত্যাদি মন্তব্যের মাধ্যমে ঘাড় গুঁজে থাকাদের দলের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমে প্রশমিত হয়। কিন্তু বাইরে প্রকৃতির অশান্তি বেড়েই চলে। সকলে আশঙ্কিত। কেউ কেউ প্রার্থনা করে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ধীরে কথাবার্তা চালায়। ঝুলন্ত লোকগুলি নেশাগ্রস্তের মতো পূর্ববৎ গোঁ গোঁ আওয়াজ করে। দূরে বহু লোকের আর্তরব শোনা যায়। উপবিষ্টরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। দণ্ডায়মানেরা আরো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় গুঁজে থাকাদের দল উৎকণ্ঠিত হয়ে মাথা তুলবার চেষ্টা করে। তাতে ঘরে চালায় উর্ধ্বচাপ লাগে। হঠাৎ মড়াৎ করে কুঁড়েটি ভেঙ্গে পড়ে। কুঁড়েচাপা মানুষের, শিশুর মানুষের, শিশুর আর্তধ্বনিতে খোলা মাঠ মুখরিত হয়ে ওঠে। চারপাশ মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতের ঝলকানিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আহত ও সুস্থদের মধ্যে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরি হয়। কেউ পালিয়ে যায়। কেউ অন্যদের টেনে তুলবার চেষ্টা করে। কেউ ব'সে বা দাঁড়িয়ে থাকে। ইত্যাদি ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলতে থাকে খানিকক্ষণ।]

শেষ দৃশ্য

[মঞ্চে যে কুঁড়েটি ছিল, তার ভিতরে আগের দৃশ্যে বসা, দাঁড়ানো , ঘাড় গুঁজে থাকা বা ঝুলন্ত অবস্থায় যারা ছিল, তাদের জায়গায় এখন সব অন্য লোকজন। আগের দৃশ্যে যারা কুঁড়ের ভিতরে ছিল, তাদের অনেকে এখন মঞ্চের একপাশে কুঁড়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে বা ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে। আগের দৃশ্যে দরজাটি নেপথ্যের দিকে ছিল বা দৃশ্যমান ছিল না। কিন্তু এবার মঞ্চের ডান বা

বাঁদিকে থাকবে। ফলত দৃশ্যমান হবে।]

১ জন : [দরজায় করাঘাত ক'রে] দরজা খুলুন। দরজা খুলুন।
(সমবেত গুঞ্জন বা আর্তস্বর শোনা যায়।)

২ জন : দরজা খুলুন। ভেতরে কেউ আছেন?
[অন্দরে সকলেই শঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে বসে/দাঁড়িয়ে/ঘাড় গুঁজে/ঝুলে থাকে। দণ্ডায়মানের একজন দরজার দিকে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ নেয়। বাকিরা তাকে টেনে ধরে। উপবিষ্ট দলের দু'একজন শাসানো দৃষ্টিতে তাকায়। উদ্যত হাতে তাকে প্রতিরোধ করে।]

৩ জন : ভাঙ্ না, ভাঙ্, দরজাটা।

বহুকণ্ঠ : ভাঙ্ শালার... ভাঙ্ দরজা... ভেঙে ফেলুন... ভাঙো ভাঙো ...ভাঙ্গিয়া ফালান... আহ্, করেন কী ... আশ্চর্য ... ভেতরে কি কেউ নেই নাকি... ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ... ব্যাড়ার ফুটায় চোখ লাগায় দ্যাখ কেউ আছে নাকি... [অন্দরে দুয়েকটি শিশু ককিয়ে ওঠে। পাশের মানুষজনেরা তাদের মুখ চেপে ধরে বা মায়েদের শান্ত করার জন্য উদ্বিগ্ন ইঙ্গিত করে। তাতে কোনো কোনো মহিলা ভীত বা অসন্তুষ্ট হন। ইতিমধ্যে মঞ্চে দু'তিনটি মুহুর্মুহুঃ বাজ পড়ার তীব্র শব্দ ও আলোর সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির বেগ প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে।]

বহুকণ্ঠ : বাবা রে... মাগোঃ... ইশ্, ভিজ্জা গেলাম... পালা, পালা..দরজা খোলার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই... পালা, পালা, পালা, পালা...অ, কেষ্টার মা, কই গেলি লো... এই যে আমি এইখানে, তুমি কই গ্যালা... পালা, পালা, পালা, পাল... [শিশুর কান্না, বৃদ্ধের কোকানো]... পালা রে , বাচতে হলে পালা ...

যবনিকা

রচনাকাল - ২০০৩

লেখক : **মনুজেন্দ্র কুনডু, Springer Nature-এর Performance Studies and Cultural Discourse in South Asia নামক গ্রন্থমালার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।**

Playwright : **Manujendra Kundu, distinguished theatre personality, W.B.**

....এবং নন্দলাল

গল্পকার : ভীষ্ম সাহানি

নাট্যরূপ: **অনির্বাণ পয়ড়্যা**

(নন্দলাল বসু, স্ত্রী, বাবা, মা, কাকা, নেতা নন্দলাল, নন্দলাল মণ্ডল (চোর), কনস্টেবল, মেজিস্ট্রেট, সরকারি উকিল, আসামি উকিল, কোরাস)

১ম দৃশ্য

থার্ড বেলের পর আবহের সঙ্গে মঞ্চে আলো আসে। মিড সেন্টারে অল্প আলোয় দেখা যায় চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ ইত্যাদি এমনভাবে রাখা আছে, যেন একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত মানুষের আশা ভালোবাসার আশ্রয় যেন কোনো এক শিকারীয় জালে ধরা পড়েছে। আবহে গান-

'বাবু সামঝো ইশারে, হরণ পুকারে পম পম .....'

শহরের রাস্তায় ভিড় চলেছে , খুড়োর কল মাথায় দিয়ে। ভিড়ের মধ্যে একটা লোক মাথায় কদম ছাঁট চুল, কপালে গেরুয়া তিলক গলায় উত্তরীয়, রঙিন সাজ পোশাকপরে একটি স্কুটার কিছুটা গড়িয়ে, কিছুটা চড়ে বেরিয়ে গেল। তার ব্যবহারে স্পষ্ট বোঝা গেল চুরি করে পালাচ্ছে। ভিড় হালকা হলে এক যুবক । নন্দলাল কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে ঢুকলো । খুঁজে না পেয়ে বলল-

নন্দলাল : কি মুশকিল, এখানেই তো রেখে গেছিলাম। আমার নীল রঙের স্কুটি, ... এখানেই তো রাখলাম, রেখে ওই দোকানে একটা সিগারেট টেনে এই হলটিতে নাটক দেখতে ঢুকলাম। একটা বোকা বোকা প্রহসন। বেরিয়ে দেখি স্কুটি নেই। অথচ চাবি আমার কাছে। মুশকিল হল। ও দাদা এখানে একটা নীল রঙের স্কুটি দাঁড়িয়েছিল, দেখেছেন?

(ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললো-)

জনৈক : দাঁড়িয়ে ছিল? দেখুন আসে পাশে কোথায় ঘুরতে গেছে। একা কতক্ষণ দাঁড়াবে।

নন্দলাল : মানুষের অসহায় অবস্থায় ঠাট্টা করা মানুষের স্বভাব।

(ভিড় চলতে থাকে সবাই প্রস্থান করে);

আমার নতুন স্কুটি , দু মাস ও হয়নি কিনেছি। পুরো চার বছর ধরে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে কিনেছি। চোখের পলকে উধাও। উধাও বলছি কেন? চুরি হয়ে গেল নাকি? সর্বনাশ-

ও দাদা দেখেছেন, এখানেই হলের সামনে নীল সাদা রঙের স্কুটি রেখেছিলাম।ও দাদা আপনি তো আমার পাশের সিটে বসে নাটকটা দেখলেন। এখানে যে

একটা স্কুটি ছিল সেটা দেখেছেন?
(দর্শকের মধ্য থেকে একজন বলে-)

জনৈক : তোমার কপাল ভালো।

নন্দ : কেন?

জনৈক : আমার কাছে বসেছিলে। স্কুটির ওপর বসলে স্কুটি শুদ্ধ তুমিও উধাও হয়ে যেতে।

নন্দ : ইস কি সহযোগিতা। আচ্ছা আপনারও কি মনে হয়, আমার স্কুটি চুরি হয়ে গেছে। (কোন উত্তর আসে না) চলে গেল নাকি? কি মুশকিল, এদিকে ভিড় ফাঁকা হতে শুরু করেছে। থিয়েটার দেখে সবাই ঘরে ফিরে যাচ্ছে। থিয়েটারের ভিড়টা একটু আলাদা রকম ভিড়, যেন পুরো একটা শহর। কিন্তু, সে যাই হোক আমার এত সাধের স্কুটিটা চুরি হয়ে গেল। এই স্কুটিটাকে নিয়ে আমি কতরকম স্বপ্ন দেখেছি। স্কুটি চড়ে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। চোখে সানগ্লাস, চুল উড়বে, ফুর ফুর করে। স্কুটি ছাড়া জীবনে কোনো মজা আছে নাকি? স্কুটির সামনে যুবক, পেছনে যুবতী। যুবকের কোমরে যুবতীর হাত। তার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। শহরের খটখটে নীরস রাস্তায় যেন রোমান্সের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।
(কোরাসে গান- গাড়ি বুলারাহি হ্যায়, সিটি বাজারাহি হ্যায়)
সব আশা জলে গেল। এখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে একবার ডানদিকে একবার বামদিকে দেখছি।
(দর্শকের মধ্য থেকে জনৈক বলে)

জনৈক : এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই । পুলিশে রিপোর্ট লিখিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

নন্দ : সেই ভালো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো। যাওয়ার পথে রিপোর্ট লিখিয়ে যাবো। একজন সাধারণ মানুষ প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখা ছাড়া আর কি বা করতে পারে । যাই-
(আবহে গান ভেসে আসে- গাড়ি বুলা রাহি হ্যায়.... চলনাহি জিন্দেগি হ্যায় .... প্রস্থান .... মিড সেন্টারে অল্প আলোয় দেখা যায়, কোরাস একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বসার ঘর সাজিয়ে দিয়েছে)
(বাবা ও মা উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে ঢোকে। বাবা রক্ষণশীল , মা কৃষ্ণ ভক্ত। কাকা, স্ত্রী ও এখানে উপস্থিত)।

বাবা : আমি তো আগেই বলেছিলাম, ওখানে স্কুটি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। চারিদিকে চোর চিটিংবাজে ভরে গেছে। থিয়েটারই বা বাদ যাবে কেন?

মা : আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটু শান্ত হও।

স্ত্রী : আমার মনে হয় তুমি চাবি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলে। স্কুটিতে যদি চাবি দেওয়া

থাকতো , তাহলে কেউ চুরি করতে পারতো না, তাই না বাবা?

নন্দ : চাবি তো আমার কাছে।

কাকা : তাতে কি হয়েছে? হ্যান্ডেল লক করেছিলে?

নন্দ : করেছিলাম মনে হয়।

বাবা : তোমার মনে হওয়াতে চোরের কি আসে যায়? বরং মনে না থাকলেই তো চোরের লাভ, তোমাদের এই জেনারেশনটা একেবারে কেয়ারলেস। গুরুজনকে কদর করে না, স্কুটি তো জড় পদার্থ।

মা : ও গো তুমি উত্তেজিত হও না। ছেলেটা এই মাত্র একটা বড়ো ধাক্কা পেয়েছে।

স্ত্রী : আমার মনে হচ্ছে , স্কুটিটা ওখানেই আছে। তুমি ভালো করে খুঁজে দেখোনি। তুমি তো চোখের সামনে জিনিস থাকলেও দেখতে পাও না।

কাকা : তুমি স্কুটিটা কারোর কাছে রেখে যেতে পারতে। আচ্ছা, ওখানে কি পার্কিং-এর ব্যবস্থা ছিল না? পার্কিং-এর লোকটাকে দশ, কুড়ি টাকা দিলেই পারতে। টাকা বাঁচানোর জন্য জিনিসটাকে অরক্ষিত ফেলে যাওয়া ঠিক হয়নি।

নন্দ : তার মানে বলতে চাইছো যে, স্কুটি চুরি হয়ে যাওয়ার পেছনে সব থেকে দায়ী আমি নিজে? (সবাই চুপ।)

মা : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আমার নন্দলাল যদি থাকেন, আমার ছেলে স্কুটিটা ঠিকই ফেরত পাবে। ভগবান যে জিনিস একবার দেয়, তা কি কখনও অন্যের কাছে যেতে পারে।

নন্দ : ভগবানের দরকার নেই মা, আমি পুলিশ রিপোর্ট লিখিয়ে এসেছি।

কাকা : তুমি কি মনে কর, যে পুলিশ তোমার স্কুটি খুঁজে দেবে? পুলিশ যদি এত দক্ষ হতো, তাহলে স্কুটিটাই তো চুরি হতো না। এখন স্কুটির কথা ভুলে বীমা কোম্পানীর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করো। আচ্ছা, বীমা করিয়েছিলে তুমি?

বাবা : তুই বলতে চাইছিস, পরিশ্রমের টাকায় কেনা জিনিসটাকে অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, তার ওপরে মানুষ আস্থা রাখবে না? যত সব অর্বাচীনের মতো কথা।

কাকা : দেখো দাদা, তুমি আমাকে অর্বাচীন বলতে পারো না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই যে প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়, সে কথা আজকাল মানুষ বুঝে গেছে।

বাবা : (মা'কে উদ্দেশ্য করে) দেখলে, মা-এর পেটের ভাইটাও আজকাল বড়োদের কথায় গুরুত্ব দেয় না।

মা : আচ্ছা, তুমি একটু শান্ত হও।

নন্দ : আমি এককাজ করি, কাল একবার বীমা কোম্পানীর অফিসে যাই।

বাবা : পুলিশ স্টেশন হয়ে যেও....

মা : হ্যাঁ বাবা, পুলিশ স্টেশন হয়েই যাস। তার আগে আমার নন্দলালকে প্রণাম করে যাস। দেখবি ভগবানের কৃপায় তোর জিনিস তোর কাছে ফিরে আসবে। (স্বামী কে) চলো ঘরে চলো, তোমার প্রেসারের ওষুধ খাওয়া হয়নি, টেবিলে পড়ে আছে... (বাবা কে নিয়ে চলে যান।)

স্ত্রী : স্কুটিটা চুরি হয়ে গেল? আমি মুখ দেখাব কি করে! (গজ গজ করতে থাকে)

নন্দ : কি?

স্ত্রী : সব তোমার জন্য হয়েছে। কেয়ারলেস মানুষ কোথাকার। ও বাড়িতে আমি কি বলবো?

নন্দ : কি মুশকিল, তুমি এ কথা বলতে যাবে?

স্ত্রী : মা কে তাহলে কি বলবো, তুমি খুব মহান কাজ করেছো, তাই তো-

নন্দ : না দেখো-

স্ত্রী : চুপ করো, ঘরে এসো, তোমার হচ্ছে। ফালতু লোক কোথাকার-
(স্ত্রী স্কুটি হারিয়ে ফেলার অভিমানে ঘরের ভেতর চলে যায়। কাকা এগিয়ে এসে বলে-)

কাকা : আড়ালে আড়ালে থাকি
নীরবে আপনা ঢাকি
সম্মুখে চরণ নাহি চলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

নন্দ : এটা কোন নাটকের সংলাপ!

কাকা : নাটক নয়, কবিতা, কামিনী রায়ের। তাহলে কি করবি ভাবছিস?

নন্দ : সকালে থানা, দুপুরে বীমা কোম্পানী , বিকেলে থিয়েটারের সামনেরটা খুঁজে দেখা, সন্ধ্যায় বাড়ি।

কাকা : কাজ করবি কখন?

নন্দ : কাজ? এখন এটাই তো কাজ।

কাকা :: একটি স্নেহের কথা
: প্রশমিতে পারে ব্যাথা-
: চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে-

নন্দ : এটাও কি ওই কবিতার লাইন?
(কাকা হাসে)

কাকা : চল, একটু ছাদের ওপর থেকে বেড়িয়ে আসি। ছাদের ওপর থেকে অক্সিজেন নিয়ে আসি, ফিরে এসে তো আবার তোকে আই সি ইউতে ঢুকতে হবে

(আবহে গান ভেসে আসে- বাবু সামঝো ইশারে হরন পুকারে— আলো নেভে)

২য় দৃশ্য

(পরের দিন মধ্যবিত্ত বাড়ির বসার ঘরে আলো এলে দেখা যায়। সন্ধ্যার আগে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, নন্দলাল বাড়ি ফিরছে, কাঁধে একটা ব্যাগ। স্ত্রী তাকে দেখে বেরিয়ে এসে বলে-)

স্ত্রী : কি হলো, স্কুটির কোনো খবর পাওয়া গেল

নন্দ : (অসহায়ভাবে তাকিয়ে থেকে বলে) এই একই কথাই আমি প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে পুলিশকে জিজ্ঞেস করে চলেছি। উত্তরে কখনো সবাই চুপ করে থাকছে, নয়তো রুক্ষ গলায় বলছে, - " পাওয়া গেলে খবর দেওয়া হবে, এখানে রোজ রোজ আসবেন না। "

স্ত্রী : এখন কি হবে? বীমা কোম্পানী কি বলছে, ক্ষতিপূরণ দেবে? তাহলেই তো একটা নতুন স্কুটি কেনা যাবে বলো? ওইটা বোধহয় আর পাওয়া যাবে না,

নন্দ : পাওয়া যাবে না বলছো কেন? আমার পরিশ্রমের টাকায় কেনা। দীর্ঘ চার বছর ধরে টিউশনের টাকা জমিয়ে কিনেছি। তুমিই তো বলেছিলে যে, বাপের বাড়ি আর বাসে চেপে যেতে পারবে না। বান্ধবীরা পিন দিচ্ছে, তোর বর একটা স্কুটি কিনতে পারে না? এখন তুমি কেন বলছো যে, স্কুটি আর পাওয়া যাবে না।

স্ত্রী : বাজে কথা বলো না। স্কুটিটা হারিয়েছো বলেই বলছি, যে না পাওয়া গেলে কিনতে হবে। আমি আবার সেই বাসে ধাক্কা খেয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারবো না। বীমা কোম্পানী কি বলছে?

নন্দ : কিছুই বলছে না। পুলিশ স্টেশনে যাই হোক আমার সাথে কথাবার্তা অন্তত বলে। আর ওখানে, বীমা কোম্পানীর আফিসে সারাদিন হেড ক্লর্কের সামনে বসে থাকি, তিনি কিছু জিজ্ঞেসই করেন না । আমি নিজে থেকে স্কুটির প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে বলেন, তদন্ত করতে হবে। আচ্ছা, আমি নিজেই যখন বলছি যে আমার নীল সাদা রং-এর স্কুটিটা চুরি হয়ে গেছে, তখন তাদের কি আছে?

স্ত্রী : সব চোরই তো আর তোমার মতো সত্য কথা বলে না, তাই তদন্ত করতে হয়। তা যাই হোক, এখন কি করবে ভাবছো?

(ছেলে বৌমার শেষের দিকে কয়েকটা কথা শাশুড়ি শুনে ফেলেছেন কথা প্রসঙ্গে বললেন-)

মা : মিষ্টি কথায় হবে না খোকা, আচ্ছা করে টাইট দিতে হবে। এক কাজ কর, তোর বাবাকে বলে কয়েকটি দরখাস্ত লিখিয়ে নে। তোর পিসেমশাইয়ের ছোটো

ভাইয়ের শ্বশুরমশাই তো কলকাতা পুলিশের সার্জেন। ওপর মহলে একটু যোগাযোগ না রাখলে, সব কাজই আটকে যায় বাবা। (কথার মাঝখানে শাশুড়িকে এইভাবে ঢুকে পড়তে দেখে স্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়ে ভেতরে চলে যায়।)
ও কি, বৌমা ওভাবে চলে গেল কেন? (স্বামীকে উদ্দেশ্য করে) ওগো শুনছো, খোকাকে একটা দরখাস্ত লিখে দাও .... এতক্ষণে কাকা বাড়ির বাইরে থেকে এসে দরখাস্ত লেখার কথাটা শুনতে পায়)

কাকা : এই দরখাস্ত দিয়ে যদি স্কুটি পাওয়ার কথা ভাবো, তবে আর তোমার ছেলেকে স্কুটি পেতে হবে না , বৌদি।
(মা এর ডাক শুনে বাবা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, ভাইয়ের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন-)

বাবা : তোমার এই থিয়েটারি জ্ঞান তোমার কাছেই রাখ। সারাদিন থিয়েটার করে এসেছো খিদে পেয়েছে নিশ্চই, নন্দর মা , 'যাও ওকে খেতে দাও।'

মা : তুমি এইভাবে কথা বলছো কেন?

কাকা : না বৌদি, দাদা ঠিকই বলেছে। আমি তো এই সংসারে কিছুই দেই না, তোমাদের পারিবারিক বিষয়ে আমি কথা বলার কে, কেউ না, কেউ না.....।

বাবা : এই যে শোনো, নাটকের সংলাপ নাটকেই বলো। বাস্তবটা অনেক কঠিন, এখানে কৌটো থেকে ঘি বার করতে হলে আঙ্গুলটাকে বাঁকাতে হয়। কাল দুটো চিঠি লিখে দেব, একটা পোষ্ট করে দিও, আর একটা চিঠি নিয়ে আসফ আলি রোডে পার্টি অফিসে যাবে। সেখানে একটা চিঠি লিখে দেবে, সেটা নিয়ে তারা পিঠ রোডের নন্দলাল বাবু'র কাছে যাবে। দেখো তারপর কাজ হয় কিনা। সঙ্গে নন্দুকে নিয়ে যাবে। চিঠিপত্রের দিন এত সহজে যাবে না, এইটা মনে রেখো....
(বাবা প্রস্থান করলে মা ও অনুসরণ করেন। নন্দলাল ও কাকার মুখে আলো আসে।)

নন্দ : কাকাই, এবার মনে হচ্ছে কিছু একাট নিশ্চই হবে, তাই না?
(উত্তরে কাকু মৃদু হাসেন)

কাকা : হবে বলছিস? দেখ কি হয়। খাবি যা। (বলে অন্য ঘরে চলে যায়)

নন্দ : বেশ একটা রোমাঞ্চ লাগছে। প্রথমে পোস্ট অফিস তারপর আসফ আলি রোড, তারপর তারাপিঠ রোড।
বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত চাকরির পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে অফিসে রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়াতে না পারলে ইট রেখে দিয়ে পাশে বসে আরাম করেছি। আমারই মতো বয়সের কত যুবক যুবতী এক সঙ্গে রাত জাগছে, ভোর বেলা ফর্ম তুলবে বলে। কত আশা, কত ভবিষ্যৎ ভাবনা-

কাল আবার দরখাস্ত নিয়ে নন্দলাল বাবুর কাছে- আচ্ছা বাবা কোন নন্দলালের কথা বললেন? (নেপথ্যে মা এর ডাক-)

মা : খোকা, খাবি আয়...

নন্দ : হ্যাঁ, যাই মা

(আবহে গান ভেসে আসে, আলোর পরিবর্তন হয় । কোরাসের দল স্টে চেঞ্জ করে, নন্দলালের অফিস ঘর। আলোর পরিবর্তন হয়, দুপুর বেলা অফিসের সামনে নন্দু দাঁড়িয়ে আছে, কাকার জন্য অপেক্ষা করছে, - রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে কাকা আসে-)

নন্দ : এত দেরি হল যে?

কাকা : আর বলিস না, ট্রেনটায় এত ভিড়, যে নামতে গিয়ে আবার চড়ে পড়ছিলাম। তারপর পেছন থেকে আর একটা ঢেউ এল দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। পোস্ট করেছিস? (এমন সময় অফিসের ভেতর থেকে একজন পার্টি কর্মী বেরিয়ে এসে বলে-)

কর্মী : স্যার, তোমাদের ডাকছে- (চলে যায়)

কাকা : কেস কি?

নন্দ : তোমার আসার আগেই আমি চিঠিটা দিয়ে দিয়েছি।

কাকা : চল, ভেতরে চল-

(দুজনে অফিসের মধ্যে ঢোকে- তাদের দেখে মোটা নন্দলাল বললেন-)

২য় নন্দ : তোমাদের মধ্যে নন্দলাল কে?

নন্দ : আজ্ঞে, আ-আমি।

২য় নন্দ : তোমার বাবা, স্কুলে আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতেন। সেই মাস্টার মশাইয়ের ছেলে হয়ে তোমাকে এত হয়রানি করাচ্ছে? দেখাচ্ছি মজা , এর খেসারত দিতেই হবে ব্যাটাদের। (টেবিলে থাকা টেলিপোন তুলে নেয়-)

নন্দ : কাকাই, ভয় করছে-

কাকা : আচ্ছা , বলছি যে টলিফোনে না বলে, আপনি যদি নিজে একবার যেতেন। তাহলে ভালো হতো, ওই বীমা কোম্পানির লোকেরা কোনো কথা শুনছে না।

২য় নন্দ : দেখাচ্ছি মজা, বীমা কোম্পানিকে, আমার মাস্টার মশাইয়ের ছেলেকে বার বার ফিরিয়ে দেওয়া - (আবার অন্য নাম্বারে ফোন করে বলেন-)

হ্যালো ... কি ভেবেছো তোমরা? ইয়ার্কি পেয়েছো? একজন তরুণ তরতাজা যুবকের স্কুটি হারিয়ে গেছে, আর তোমরা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছ না কেন?

(বাঘের মতো গর্জনের ফলেই হয়তো, বীমা কোম্পানীর অফিসার ফোনটা কানে নিয়ে, চেক বই সমেত এসে হাজির-)

অফিসার : (ফোনে কথা বলতে বলতে ঢোকে) একদম ভুল হয়ে গেছে স্যার। কোন ছেলেটা বলুন তো? ... ও আপনার মাস্টার মশায়ের ছেলে- আমি এই মাত্র আসছি স্যার- (ফোনটা কানে ধরেই নন্দলালের অফিসে ঢোকে-) বলুন স্যার, কি করতে হবে? (চেক বইটা এগিয়ে দেয়)

২য় নন্দ : আমরা বছরে তোমাদের কত কোটি টাকার বিজনেস দেই? আর আমার মাস্টার মশাইয়ের ছেলেকে মাসখানেক ঘোরাচ্ছো?

অফিসার : ভুল হয়ে গেছে স্যার, উনি যদি আগে আমাকে আপনার কথা বলতেন, তাহলে এত দিন দেরি হত না। আমি এক্ষুণি চেক লিখে দিচ্ছি স্যার। (চেক লিখে হাতে ধরিয়ে দেয়) স্যার, আর কি করতে হবে?

২য় নন্দ : অফিসে যাও - (চলে যায়) (চেকটা এগিয়ে দিয়ে) তাহলে নন্দলালবাবু, কাল থেকে নতুন স্কুটি---

নন্দ : কিন্তু আমার নীল সাদা রং- এর স্কুটিটা কি পাবো না?

২য় নন্দ : (তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলে-) দেখাচ্ছি মজা, (ফোন তুলে নেয়) তোমাদের লোকাল ওসির নাম টা কি যেন?

নন্দ : ওই তো কি যেন?

২য় নন্দ : দেখাচ্ছি মজা (উত্তেজিত হয়ে ফোন কানে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়, নন্দ ও কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে)

নন্দ : নন্দলাল তো সাক্ষাৎ দেবতা, তাই না কাকাই-

কাকা : আমার তো ঝামেলাবাজ বলে মনে হলো-

(দুজন পরস্পর কে দেখে হাসে। প্রস্থান করে। অল্প আলোয় কোরাসের দল আবহের সঙ্গে সেট চেঞ্জ করে। মধ্যবিত্ত বাড়ির বসার ঘর। আলো নেভে)

৩য় দৃশ্য

(সেই দিন সন্ধ্যেবেলা মধ্যবিত্ত বাড়ির বসার ঘরে আলো এলে দেখা যায় নন্দলাল তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে-)

নন্দ : যাক বেশ কদিন আরামে কাটানো যাবে, পকেটে ইনসিউরেন্সের টাকা। যে কোনো সময়ে আমি স্কুটিটা কিনতে পারি-

(মা ঈশ্বর নন্দলালের সামনে আরতি দিয়ে ঘন্টা নাড়াতে নাড়াতে পূজার থালা নিয়ে ঢুকলেন)-

মা : সবই নন্দলালের লীলা-

নন্দ : মোটা নন্দলালের লীলা মা-

মা : (মা একবার দেখে, বৌমা কটমট করে তাকিয়ে আছে-) সবই ভগবানের লীলা। মোটা নন্দলাল উপলক্ষ মাত্র। 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে-

(ঘন্টা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। ছেলে বৌ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে-)

স্ত্রী : তোমার মায়ের ব্যাপারটা কি বলো তো?

নন্দ : কেন?

স্ত্রী : আমরা যখন কথা বলবো, তখনই ওনাকে আসতে হবে।

নন্দ : উনি তো একা আসেন না, সঙ্গে ভগবান শ্রী কৃষ্ণও আসেন। ঘরে বসে ঘন্টায় ঘন্টায় শ্রী কৃষ্ণ দর্শন করছো, এ তো তোমার মহাপূণ্যের ফল।

স্ত্রী : সেই মহাপূণ্যটা কোনটা? তোমাকে বিয়ে করা?

নন্দ : তা তো বটেই....

স্ত্রী : বাজে কথা একদম বলবে না। বিয়ের পরে কি দিয়েছো আমায়? যখন যে জিনিস চেয়েছি, দেবো, দেবো বলে একটাও কিনে দাওনি। শুধু একটা স্কুটি ছিল, সেটাকে চোরের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে আছো।

নন্দ : না দেখো, চোরের সাথে তো আমার কোনো যোগাযোগ নেই, যে কবে ফেরত দেবে সেটা আমাকে বলবে। আমি অন্তত পুলিশের ওপর ভরসা রেখে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারি।

স্ত্রী : পুলিশের ওপর ভরসা রাখলে আমাকে আর বাপের বাড়ি যেতে হলো না।

নন্দ : কেনো? বাসে চড়েই তো যেতে পারো, পৌঁছে দিয়ে আসবো?

স্ত্রী : দেখো বাসের মধ্যে ভিড়ের ধাক্কা, তোমার স্কুটি হারানোর ধাক্কার থেকে বেশি লাগে।

নন্দ : আসল কথা হলো, তোমার বান্ধবীদের সামনে মাথা কাটা যাবে-

স্ত্রী : যাবেই তো, একটা অকর্মণ্য বেকার কোথাকার। তোমাকে বিয়ে করে জীবনের কোনো সখটাই পূরণ হলো না আমার। আমার কলেজের বান্ধবীর বর কাশ্মীর গেছে, সঙ্গে তাকেও নিয়ে গেছে। আর আমি কাশ্মীর তো দূরে থাক, বিকেল বেলা পার্কে যেতে পারি না তোমার জন্য।

নন্দ : স্কুটির জন্য-

স্ত্রী : হ্যাঁ! স্কুটির জন্য। আমার কালকেই স্কুটি চাই। তুমি কালকেই নতুন স্কুটি কিনবে।

নন্দ : নতুন স্কুটি কেনা যাবে না।

স্ত্রী : কেনো?

নন্দ : যার একটা স্কুটি চুরি যেতে পারে, তার দ্বিতীয় স্কুটিও চুরি যেতে পারে, বাবা বলেছেন।

স্ত্রী : যা খুশি করো- (প্রচন্ড রাগে অন্য ঘরে যায় - সিল্যুটে তাকে দেখা যাবে-)

নন্দ : চুমি ইনসোরেন্সের কাগজপত্র কোথায় রাখলে?

স্ত্রী : জাহান্নামে

নন্দ : বুঝলাম, বেড়ালের মুখে যেমন কাঁচা মাছের স্বাদ লেগে থাকে, আমার বউয়ের মুখে তেমনি স্কুটি চড়ার স্বাদ লেগে আছে।
শুনছো ....

স্ত্রী : (সিল্যুট থেকে) না শুনছি না,

নন্দ : একজন মধ্যবিত্ত মানুষ কতটাই বা পায় বলো, যে সে তার ভালোবাসার মানুষ টাকে সুখ কিনে দেবে-

স্ত্রী : তোমার কাব্য রাখবে- আমার মাথা যন্ত্রণা করছে-
নি:শব্দে কেটে যায় কিছুক্ষণ-নন্দ উঠে যায় ঘরের অন্যদিকে - আবহ ভেসে আসে,)

নন্দ : কাব্য আর কোথায় করলাম, সবই তো গদ্য, এখন তোমার মনে পড়ে, একসময় কলেজের বারান্দায় ভিড় ঠেলে দেওয়াল পত্রিকা দেখতে। সেদিন আমিও পারতাম কাব্য করে। আজ আর সব কথা বলা হয়ে ওঠে না। আমাদের বলতে না পারা কথাগুলো জমতে থাকে। শুধুমাত্র ভালো থাকার বিশ্বাসগুলো হয়তো বা টিকে যায়। আমার এক বন্ধু কবির লেখা গদ্য কবিতা শুনবে? (কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, নন্দ কবিতাটি বলে-)

আমাদের বলতে না পারা একটা অসুখ
শহরে একটিমাত্র হাসপাতাল
সেখানে আমাদের ভর্তি করা হলে তবেই আমরা
সুস্থ হতে পারি
কিন্তু সেই হাসপাতাল নিষিদ্ধ
ডাক্তার অভিযুক্ত চুরির দায়ে
আমরা চিকিৎসা ছাড়া প্রতিদিন একটু একটু করে মরছি
আমাদের চিৎকার কেউ শুনতে পারছে না
কেননা আমরা চুমু খেতে যাদের দিকে
ঠোঁট বাড়িয়েছিলাম
তারা কেটে নিয়ে চলে গেছে আমাদের গোটা জিভ।

(আবহে সুর ভেসে আসে । গান-)
শহরের উষ্ণতম দিনে,
পিচ গলা রোদ্দুরে, বৃষ্টির বিশ্বাস তোমায় দিলাম আজ.....
(গান শুনে স্ত্রী উঠে বসে- আবহের সাথে আলোয় পরিবর্তন হয়। ভোর হয়েছে, আলমোড়া ভেঙে স্ত্রী চৌকাঠের কাছে এসে দেখে একটা চিঠি পড়ে আছে, সে তুলে নিয়ে পড়ে- আনন্দে চিৎকার করে বলে-)

স্ত্রী : ওগো শুনছো...., থানা থেকে চিঠি এসেছে, স্কুটি খুঁজে পাওয়া গেছে বলে লিখেছে। আচ্ছা চিঠি পাঠালো কেন? তোমার ফোন নম্বর দাও নি ওদের?

নন্দ : (অন্যমনস্কভাবে) তিন দিন হলো ফোনের টকটাইম শেষ হয়ে গেছে।
(হঠাৎ ফিরে তাকায়, স্ত্রী চোখে চোখ পড়তেই, স্ত্রী বলে-)

স্ত্রী : তুমি না একটা; কি লিখেছে

নন্দ : (চিঠিটা পড়ে) আপনার স্কুটি নম্বর ... খুঁজে পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে সেটি শ্যামনগরে সড়ক নম্বর চারের দয়ারাম পাড়ায় রাখা আছে। গিয়ে শনাক্ত করুন এবং আপনি ফেরত নিতে চান কি চান না তা আমাদের জানান।
শুনছো, আমার নীল সাদা রঙের স্কুটি ফিরে পেয়েছি ....
আবার আমরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় স্কুটি চড়ে ঘুরে বেড়াব

স্ত্রী : তোমার চোখে রঙিন চশমা-

নন্দ : তোমার চুল উড়বে ফুর ফুর করে-

স্ত্রী : শাড়ির আঁচল ভাসবে হাওয়ার মতো করে

নন্দ : সামলে বসো, গাড়ির চাকায় তোমার আঁচল জড়িয়ে যাবে-
(আবহে গান ভেসে আসে- 'গাড়ি বুলা রাহি হ্যায়, সিটি বাজা রাহি হ্যায় ' স্ত্রী সিটি বাজায়, ওরা এখন শহরের রাস্তায় স্কুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে আরো দুটো কাপল- আবহ কমে , স্ত্রী বলে -

স্ত্রী : ফুচকা খাবো...
(কোরাস সবাই ফুচকা খেতে যায়-)

স্ত্রী : শাড়ি কিনবো (গাড়ি সে দিকে ঘোরে...)

স্ত্রী : সিনেমা... না না, গয়না .... (নন্দলাল ব্রেক কষে দাঁড়ায়)

নন্দ : এখন আমার নিজেকে স্কুটির ড্রাইভার মনে হচ্ছে -
(স্ত্রী খিল খিল করে হেসে জড়িয়ে ধরতে যায়- মা আসে-)

মা : কি হলো খোকা, সকাল সকাল আহ্লাদে আটখানা হচ্ছিস যে বড়ো -

নন্দ : পুলিশ আমার স্কুটি খুঁজে দিয়েছে মা-

মা : ভগবান ঠিকই দেখেন। আমি তো আগেই বলেছিলাম আমার ছেলের স্কুটি ঠিক পাওয়া যাবে-
ও গো শুনছো, আরে দূর এ লোকটাকে সব সময় ডাকতে হয় কেন, তোমার ছেলের স্কুটি পাওয়া গেছে, (হাঁক ডাক শুনে বাবা ও কাকা বেরিয়ে এলেন-)

বাবা : পাওয়া গেলো তো, চিঠি পত্রে কাজ হলো তো-

কাকা : কিন্তু, যে জিনিস মাস খানেক চোরের হাতে থাকে, তার কি কিছু বাকি থাকে? ওর হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেছে নিশ্চই।

বাবা : কথাটা অবশ্যই ঠিক, তাছাড়া এত দিন চোরের হাতে ছিল, ওর গায়ে অমঙ্গলের ছোঁয়া লেগেছে নিশ্চয়ই।

নন্দ : (স্ত্রী কে) কেসটা কি? বাবা ও কাকাই এক সুরে কথা বলছে, এ লক্ষণ তো সুবিধের নয়-

স্ত্রী : (ফিস ফিস করে) আমার কিন্তু স্কুটি চাই বলে দিলাম-

কাকা : আর তাছাড়া, তুই স্কুটি ফেরত নিবি কি করে, বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ তো উসুল করে নিয়েছিস-

নন্দ : ক্ষতিপূরণের আবার কি? সে তো ফিরিয়ে দিলেই হল-

কাকা : যদি বীমা কোম্পানী না দিতে চায়-

নন্দ : মোটা নন্দলাল আছে তো, তার কথা অস্বীকার করবে না, তাকে গিয়ে একবার বললেই হয়-

বাবা : ঠিক আছে, আগে গিয়ে দেখো স্কুটিটা কেমন আছে, তারপর ফেরত নিও-

মা : চিন্তা করিস না বাবা, আমার নন্দলালের কৃপায় তোর স্কুটির কিছুই হবে না।

(মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে পূজার ঘরে চলে যায় - আবহে কীর্তন শোনা যায়, আলো কমে , সবাই হা করে তাকিয়ে থাকে, আলো নেভে।)

৪র্থ দৃশ্য

(আবহের সঙ্গে পরের দিন দুপুরবেলা আলো আসে পুলিশের দেওয়া ঠিকানায়। দেখা যায়, উক্ত আউট হাউসের গায়ে ত্রিপল ঢাকা অনেক জিনিস পড়ে আছে। তার গায়ে কয়েকটি স্কুটি হেলান দেওয়া আছে। একটি সুসজ্জিত স্কুটি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। নন্দলাল চিঠির ঠিকানা মেলাতে মেলাতে ঢোকে-)

নন্দ : শ্যামনগর ৪ নং সড়কের দয়ারাম পাড়া। হ্যাঁ ঠিকানা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু, এটা কোন জায়গা! এখানে কি পুলিশের লোকেরা হারিয়ে যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে রাখে। কয়েকটি স্কুটি পড়ে রয়েছে দেখছি।...

আচ্ছা স্কুটিগুলো এখানে রাখার কারণ কি, থানায় রাখলে হতো না; আমাকে এতটা আসতে হলো। ... কাউকে তো কোথাও দেখছি না ভুলভাল জায়গায় এসে পড়লাম না তো?

(এমন সময় উল্টো দিকের ঘর থেকে সাদা কামিজ পরা একটি লোক বেরিয়ে এলো। তার হাতে পাঁচটা আংটি।)

নন্দ : (লোকটিকে দেখে, চট করে ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে-) মাপ করবেন আমি বোধহয় ভুল ঠিকানায় এসে পড়েছি।

(চলে যেতে উদ্যত হলে, লোকটি ডাকে)

লোকটি : দেখি একবার ঠিকানাটা-(হাত থেকে নিয়ে দেখে, নন্দকে একবার সর্বাঙ্গে দেখে দূরে দাঁড়ানো স্কুটির দিকে এগিয়ে যায়।)

নন্দ : (স্বগতোক্তি) আচ্ছা, ইনি কি বড় পুলিশ অফিসার! নিজের বাড়িতে উদ্ধার করা মালপত্র রেখে দিয়েছেন। কিন্তু, ইনি তো সাদা পোষাক পরে আছেন! তাতে কি, বড় বড় অফিসাররা বাড়িতে উর্দ্দি পরেন না। কিন্তু পুলিশ অফিসারের আঙুলে এতগুলো আংটি!

লোকটি : (দূরে দাঁড়ানো স্কুটির হ্যান্ডেলে রত্নময় আঙুল রেখে বলে-) এইটা আপনার স্কুটি, চিনতে পেরেছেন খুব যত্ন করে রেখেছি।

নন্দ : আপনি রেখেছেন, মানে?

লোকটি : এই স্কুটিটা শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যেই রেখেছিলাম; খুব যত্ন করে। এই যে এরিয়ালটা দেখছেন, এটা আমি লাগিয়েছি। মেকানিক বলেছিল স্কুটিতে এরিয়াল লাগানো যায় না। আমি বললাম, লাগানো যাবে না মানে? দেখাচ্ছি মজা।

নন্দ : (আঁতকে ওঠে) সর্বনাশ, এ তো মোটা নন্দলালের মতো কথা বলছে-

লোকটি : কি বলছেন, নন্দলাল? আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম নন্দলাল মন্ডল। কি করে জানলেন, চিঠিতে তো লেখা নেই।

নন্দ : না লেখা নেই, মনে হলো। আচ্ছা এ সবগুলোই কি উদ্ধার করা মাল?

লোকটি : নয়তো কি? লোপাট কি একখানাই করবো নাকি? (রেঞ্জ নিয়ে স্কুটির এরিয়েল খুলতে থাকে।)

নন্দ : (স্বগতোক্তি) আমার মাথা ঘুরছে। এই লোকটা চোর কি করে হয়! হাতে ছুরি নেই, দাড়ি গোঁফ, হিংস্র দাঁত নেই। অথচ দিনদুপুরে নিজের মুখেই স্বীকার করছে যে 'তোমার স্কুটি আমি চুরি করেছি'। (একটু জোরে) তাহলে কি আপনিই... না থাক। আলিবাবার ভাই কাসেম চোরের গুহায় ঢুকে বেঁচে ফিরতে পারেনি, থাক।

লোকটি : (এরিয়াল খুলতে না পেরে) না থাক, ভাবছি এরিয়েলটা স্কুটির সাথেই থাক। আমার ছোঁয়া লেগে থাকবে।

নন্দ : এই এত গুলো স্কুটি, এত জিনিসপত্র- এ সবই আপনার লোপাট করা?

লোকটি : নয়তো কি? স্কুটির এই আয়নাটা তখন লাগিয়েছিলাম। যে বার বৈষ্ণোদেবী যাত্রা করলাম। পাহাড়ী এলাকা তো, পেছন থেকে কে আসছে তার খবর দরকার। খুব তীব্র বাঁক। ঘরের লোক অনেক করে বলেছিল, তোমাকে স্কুটিতে যেতে হবে না, কিন্তু শুনলাম না। বললাম, দেবীর কৃপা থাকলে কোন ক্ষতি হবে না।

নন্দ : আপনি বৈষ্ণোদেবী গিয়েছিলেন!

লোকটি : হ্যাঁ। আমি তো প্রতিবছর একবার করে যাই। বছরে একবার তো দেবীর পায়ে

প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হয় বলুন?

নন্দ : তা তো বটেই, আচ্ছা আমার স্কুটি চড়ে আপনি আর কোথায় কোথায় গেছেন?

লোকটি : (কথায় কর্ণপাত না করে, স্কুটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে-)
একে তো আমার খুব পছন্দ, একে শুধু আমিই ব্যবহার করেছি... যদিও স্কুটি চড়তে আমি খুব একটা পছন্দ করি না।

নন্দ : বটেই, আপনার তো নিশ্চই ফিয়র্ড গাড়ি আছে, স্কুটি চড়া আপনার পক্ষে শোভা পায় না। (লোকটি মোসাহেবিতে খুশি হলো।)
পুলিশ জানতে চেয়েছে যে আমি স্কুটি ফেরত নিতে চাই কি চাই না। আপনি কি বলেন?

লোকটি : পিঠে হাত রেখে বলে) নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এটার ইঞ্জিন বেশ ভালো, তাছাড়া আমি খুব যত্ন করেই রেখেছি।

নন্দ : কিন্তু কিভাবে পাবো?

লোকটি : হস্তান্তর কিন্তু পুলিশরাই করবে। (একটু থেমে) তুমি তো বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিয়েছো, তাই না?

নন্দ : আপনি কি করে জানলেন যে, নিয়ে নিয়েছি।

লোকটি : আরে ভাই, এইটুকু খবর তো রাখতে হয় নাকি- থানায় চলে যাও, স্কুটি পৌঁছে যাবে। যাও যাও, দেরি করো না।
(পিঠে হাত চাপড়িয়ে প্রস্থান করে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নন্দলাল দাঁড়িয়ে থাকে।)
(আবহে গান ভেসে আসে, 'দূরন্ত ঘুর্নি এই লেগেছে পাক,
এই দুনিয়া ঘুরে বন বন বন বন'-
অল্প আলোয় দেখা যায় কোরাস সেট চেঞ্জ করছে। থানার দৃশ্য। আলো বাড়ে। আলো বাড়লে দেখা যায়, থানার একটা ঘরের সামনে নন্দ বসে আছে, আর মনে মনে বলছে-)

নন্দ : (স্বগতোক্তি) সত্যি তো ধাঁধাটি কোথায়। ওই নন্দলাল নিজের মুখে বলছে স্কুটি চুরি করছে, অথচ পুলিশ কাগজসহ তার কাছেই পাঠালো স্কুটি আনতে। লোকটার কপালে এতটুকু ভাঁজ নেই, আশ্চর্য! চোর কি কখনো লোকের কাছে স্বীকার করে যে সে চুরি করেছে?
(এমন সময় একজন কনস্টেবল এসে চাবিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে -)

কনস্টেবল : এই নিন চাবি, আপনি এখন আসতে পারেন। পরে কি করতে হবে জানানো হবে। (চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ নন্দ বলে)

নন্দ : ঠিক আছে, আচ্ছা, একটা কথা বুঝতে পারছি না স্যার; যে লোকটির পাঁচিলের ভেতরে স্কুটি রাখা ছিল। সে তো আমার কাছে স্বীকার করলো যে, স্কুটিটা সেই

চুরি করেছে। এমনকি আরও অনেক গাড়ি ও স্কুটি চুরি করেছে। তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন? (কনস্টেবল এমনভাবে তাকায়, যেন একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে-)

কনস্টেবল : সে নিজে আপনাকে বলল যে, সে চুরি করেছে ?

নন্দ : হ্যাঁ।

কনস্টেবল : আপনার কোনো সাক্ষী আছে?

নন্দ : আমি তো বলছি যে, সে নিজে আমাকে বলেছে।

কনস্টেবল: আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনার কোনো সাক্ষী আাছে?

নন্দ : পুলিশ তো জানে যে, সেই গাড়ি চুরি করেছে, না হলে আমাকে সেখানে আনতে পাঠাবে কেন?

কনস্টেবল: আমরা তার ওখান থেকে স্কুটার উদ্ধার করেছি।

নন্দ : তাহলে গ্রেপ্তার করেননি কেন?

কনস্টেবল: করা হয়েছিল। তারপর জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে। এবার মামলা হবে। (নন্দ চুপ), দেখো ভাই, পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে কিন্তু সাজা দিতে পারে না। সাজা দেওয়া আদালতের কাজ। এবার আদালতে মামলা পেশ হবে।

নন্দ : কিন্তু একে ছেড়ে দেওয়া হলো কেন?

কনস্টেবল: ভাই তোমাকে শিক্ষিত বলেই তো মনে হয়, স্কুটি চালাও। আইন কীভাবে চলে? আইন হল .... আইন সাহেব। আইনের চোখে মানুষ ততক্ষণ যাবৎ নিরপরাধ, যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে।
(তারপর মেঝেতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বলে-) আদালতে তোমাকেও ডাকা হবে তুমিও সাক্ষী দেবে। এমনকি তোমাকে তো স্কুটিটাও পেশ করতে হবে। নিয়ম মতো মোকদ্দমা চলবে, আদালত তদন্ত করবে।

নন্দ : পুলিশ কি করবে?

কনস্টেবল: পুলিশ, নিজেদের তরফ থেকে মামলার দেখভাল করবে। বুঝলে না, আইন হল ... আইন সাহেব। এটা তো আর হিটলারের শাসন নয়, যে যাকে খুশি ধরে এনে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আইন হলো... আইন...
(চলে যায়। এমন সময় থানার সামনের মাঠে একদল কনস্টেবল মার্চ করে চলে যায়। আবহে জাতীয়তাবাদী সুর, নন্দলাল থানা থেকে চলে আসার সময় কপালে পরম ভক্তিতে হাত ছোঁয়ায়। নিজের মনে মনে বিড় বিড় করতে থাকে-)

নন্দ : (স্বগতো) মানুষ ততক্ষণ নিরপরাধ, যতক্ষণ না তার অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে।
(আবহ বাড়ে, নেপথ্যে স্কুটি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ, আলো নেভে।)

৫ম দৃশ্য

(আবহের সাথে আলো আসে। আদালত চত্বরে মানুষের ভিড়। দেওয়ালে হেলান দিয়ে লোক। দরজায় লোক। কয়েকজন কালো কোট পরা উকিল, তাদের ঘিরে ধরেছে লোক। নন্দ প্রবেশ করে-)

নন্দ : বা- বা; এত লোক- মেলা, খেলা, জলসা সমাবেশেও এত লোক দেখিনি কখনো। সবাই সুবিচারের পথ চেয়ে বসে আছে। (দেওয়ালে টাঙানো লিস্ট পড়ে) (আদালতে ঘোষণা হয়-)

সেপাই : নন্দলাল প্রামাণিক, পিতা নন্দদুলাল প্রামাণিক হাজির .....।

(দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটি লোক তাড়াতাড়ি পুঁটলি নিয়ে চলে যায়, অন্যলোক জায়গা দখল করে -)

নন্দ : একি লিস্টে আমার নাম নেই কেন? (আবার দেখে -) কি মুশকিল, এতগুলো নাম আছে শুধু আমার নামটা নেই। কলেজ পাশ করার পর থেকেই লিস্টে নাম খুঁজছি, সে চারজনের নামের লিস্ট হোক অথবা চার হাজার জনের। লিস্টে নাম না থাকলে নিজেকে অপদার্থ মনে হয়। এখানে এতগুলো নামের মধ্যে আমার নামটা থাকলে ক্ষতি কি ছিলো- (আবার মনোযোগ সহকারে পড়ে) নন্দলাল কর .... নন্দলাল ধর... নন্দলাল গোস্বামী ....নন্দলাল মন্ডল... নন্দলাল ... নন্দলাল মন্ডল? এই তো স্কুটি চোরের নাম। স্কুটি চোরের নাম আছে অথচ ... ও এটা তো আসামীদের নামের লিস্ট। হলোই বা, যার স্কুটি চুরি করা হয়েছে তার নামটা দিতে ক্ষতি কি ছিল! চোর চিটিংবাজের নাম দেওয়া যায়, অথচ আমার নামটা দেওয়া যায় না, আশ্চর্য! কিন্তু বৈষ্ণোদেবীর ভক্ত কোথায়, দেখছি না তো। মুশকিল হল, কি করবো, কি করা উচিৎ আমার? ঘরের মধ্যে ঢুকেই পড়ি- (একপ্রকার জোর করেই ঘরে ঢুকে পড়তে দেখে মেজিস্ট্রেট সাহেব বললেন-)

মেজি : এই লোকটি কে? এখানে কি করছে?

নন্দ : স্যার আমার স্কুটি চুরি হয়ে গেছিল। সেই ব্যাপারে আজ আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

মেজি : এটা কোন মামলা?

(একজন উকিল সহকারী বলে-)

উকিল : এটা স্কুটি চুরির কেস স্যার। কিন্তু আজ এই মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না।

মেজি : কেন?

উকিল : কেন সাক্ষী পাওয়া যায় নি, স্যার।

মেডি : (নন্দকে) আজ আপনি ফিরে যান। পরের তারিখ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

নন্দ : (স্বগত) (দরজার দিকে এগিয়ে যেতে) যাক নিশ্চিন্ত, কাজ পিছিয়ে গেলে বেশ ভালো লাগে। বিশেষত, সরকারি কাজ। কিন্তু পরের তারিখে আমাকে তো আবার আসতে হবে, কি মুশকিল।(আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়) স্যার, আসলে আমার স্কুটিটা চুরি করা হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। তাই যদি ...।

মেজি : আমি জানি, আপনাকেও ওই মামলায় বয়ান দিতে হবে।

নন্দ : স্যার। আজই যদি বয়ানটা লিখিয়ে নেওয়া যায়...

মেজি : আমার আর কোনো কাজ নেই? আজ এই মামলা পেশ করা হবে না।

নন্দ : স্যার ... (কিছু একটা বলতে গেছিল, সেই সময় পাশের একটা লোক জামার হাতা ধরে টান দেয়।)

মহুরী : মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। আপনি পরের তারিখে আসুন; আমি আপনার কাজ তাড়াতাড়ি করিয়ে দেব। দিন পাঁচশো টাকা, মিস্টি খেতে।

নন্দ : আপনার সুগার নেই?

মহুরি : (তাকিয়ে থেকে বলে -) আমি নিম পাতা খাই। মিস্টি আপনার বৌদির জন্য।

নন্দ : আমার কাছে পাঁচশো টাকাই আছে।

মহুরি : দিন-

নন্দ : আমার ওষুধ -

মহুরি : আপনি, রাখুন তো , আপনার কোনো কাজ হবে না। (চলে যাচ্ছিল)

নন্দ : না ধরুন- (টাকাটা দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়)
(আদালতের কোলাহল ছাপিয়ে আবহে গান ভেসে আসে-
'পাঁচশ টাকা বাঁচাতে, যদি হয় খুব চেঁচাতে...
আলো কমতে থাকে, আদালত চত্বরে লোকজনের আনাগোনা - ঘোষণা হয়-)

ঘোষণা : ৩৭৮ নং ধারার, স্কুটি চুরির কেসের শুনানির পরবর্তী তারিখ -২রা মার্চ, ...
(আবহ বাড়ে, ভিড় চলতে থাকে-)

ঘোষণা : ৩৭৮ নং ধারার স্কুটি চুরির কেসের শুনানির পরবর্তী তারিখ - ৫ই মে
(আবহ বাড়ে, ভিড় চলতে থাকে-)

ঘোষণা : ৩৭৮ নং ধারার স্কুটি চুরির কেসের শুনানির পরবর্তী তারিখ-
(ঘোষণা ও আবহ ফেড আউট হয়। অল্প আলোয় সেটের অল্প একটু পরিবর্তন। কোর্টের বড় ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দ, আদালতে চত্বরে লোকজনের আনাগোনা। সরকারি উকিল অপেক্ষা করছে বারান্দায়। সে ইতস্তত করতে করতে একটা সিগারেট ধরায়, উল্টোদিকে আসামির উকিলকে আসতে দেখে তটস্থ হয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়।)

স:উ: : দাদা, আপনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।

আ: উ: : কেন?

স: উ: : এই নিন , এটা ধরুন (সিগারেট প্যাকেটটা ধরিয়ে দেয়)

আ: উ: : (হাত থেকে নিয়ে) কি ব্যাপার এত খাতির করছেন যে? কেসটা আবার ধরিয়েছেন তো?

স: উ: : পুলিশ এখন চার্জশিট রেডি করতে পারেনি। সেজন্য আমি ভিতরে গিয়ে আপনার কাছ থেকে ঝাড় খাবো। তাই একটু তেল দিচ্ছি।

আ:উ: : তাতে কি হয়েছে? আমার মক্কেল তো আজ হাজির হতে পারবে না। শুনানির ডেট চেঞ্জ হবে।

স:উ: : হ্যাঁ, সেই চেঞ্জের দোষটা আসামির ওপর চাপিয়ে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

আ: উ: : ও এই ব্যাপার, সন্ধ্যায় জলখাবারের বিলটা দিয়ে দেবেন, সব হয়ে যাবে (সরকারি উকিল ইঙ্গিত বুঝে হাসেন- দুজনেই আদলতে প্রবেশ করে)

নন্দ বলা : স্যার, আমার স্কুটি চুরি হয়ে গেছিল , সেই সূত্রে আমাকে আজ আসার জন্য হয়েছিল।

মেজি: : এটা কোন মামলা?

স:উ: : স্যার, এটা ৩৭৮ নং ধারার স্কুটি চুরির মামলা কিন্তু, আজ এই মামলা পেশ করা যাবে না। কারণ আসামী শ্রী নন্দলাল মন্ডল অন্য একটি মোকদ্দমায় পেশ হতে গেছেন।

মেজি: : বুঝতে পারছি আসামী অনেক ব্যস্ত। তাই বলে আদালতের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। (নন্দকে) আপনি আপনার বয়ান নথীবদ্ধ করতে পারেন। সাক্ষী নন্দলালের বয়ান রেকর্ড করা হোক-

নন্দ : আমি নন্দলাল বসু, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। থিয়েটার দেখতে গিয়ে হলের সামনে থেকে আমার নীল সাদা রং এর স্কুটি চুরি হয়ে যায়। তার কয়েক মাস ওর পুলিশ আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বলে, ওখানে গেলে আমি আমার স্কুটি পেয়ে যাবো।

আ: উ: : স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা আদালতকে জানাতে চাই যে, শ্রীমান নন্দলালের স্কুটি চুরি হয়ে গেছিল।

নন্দ : স্যার, চোর নিজেই আমাকে বলেছে যে সে আমার স্কুটি চুরি করেছে

আ: উ: : অবজেকশন মাই লর্ড, এই লোকটি আমার মক্কেলকে চোর কীভাবে বলতে পারে। আদালতে এখনো প্রমাণিত হয়নি যে স্কুটিটা আদৌ চুরি হয়েছে, নাকি সাক্ষী মনগড়া কাহিনি বলছে।

মেজি: : আপনি আসামীকে তথাকথিত আসামী বলতে পারেন, কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত চোর বলতে পারেন না।

নন্দ : কি মুশকিল, স্যার আমি এসব বানিয়ে বলছি না। চোর সত্যি সত্যি আমাকে বলেছে, যে সে আমার স্কুটি নিয়ে বৈষ্ণোদেবী গেছিল।

আ:ইউ: : মাই লর্ড, এটা আদলতকে অসম্মান করা হল।

মেজি: : (নন্দর দিকে আঙুল তুলে) আমি তোমাকে আদালত অবমাননার অপরাধে জেলে পাঠাতে পারি, জানো? তুমি সোজাসুজি তোমার বয়ান লেখাও।
(তখুনি পাশে থাকা ওই লোকটি বলে)

মহুরি : আপনি লিখিয়ে দিন স্যার, নয়তো ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।
আপনার স্কুটি কত তারিখ চুরি হয়েছিল?

নন্দ : (স্বগত) সেরেছে, তারিখটা কত ছিল ভুলে গেছি।
স্যার স্কুটি চুরির দিন সন্ধ্যেবেলা আমি থানায় রিপোর্ট করেছিলাম। ওই তারিখটা যদি পুলিশ রেকর্ড থেকে জানা যেত । আসলে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

আ:উ: : মাই লর্ড, সাক্ষীকে কোনো ফাইল দেখানো যায় না-
(মেজিস্ট্রেট রেগে নন্দর দিকে তাকিয়ে থাকে-)

নন্দ : উ-নি-শে নভেম্বর, স্যার ।

মেজি: : স্কুটি এনেছো?

নন্দ : হ্যাঁ, বাইরে আছে ।

মেজি: : পরের দিন ও নিয়ে আসবে।

নন্দ : পরের দিন? কেন স্যার? আমি তো বয়ান লিখিয়ে দিলাম।

মেজি: : প্রত্যেকবার স্কুটি আদালতে পেশ করতে হবে। নিজে যদি না আসতে পারো তো কোনো ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও।

নন্দ : স্কুটির ড্রাইভার থাকে না। শুধু ফোর হুইলারের ড্রাইভার থাকে ।

মেজি: : স্কুটি এখানে পেশ করা জরুরি।
আর শোনো, যতদিন মামলা চলবে, তুমি আদালতের অনুমতি ছাড়া স্কুটি নিয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে পারবে না। বেচতেও পারবে না।

নন্দ : রাজ্যের বাইরে, তেলের দাম যা বাড়ছে.....

মেজি: : কিছু বলছো?

নন্দ : না, স্যার।

স:উ: : স্যার, পরের বার দাখিল করার তারিখ সাক্ষীকে জানিয়ে দেওয়া হোক। এমন কি লিখিয়ে নেওয়া হোক যে, সেদিন স্কুটিকে এখানে পৌছে দেওয়া হবে।

মেজি: : ৩৭৮ নং ধারার স্কুটি হারিয়ে যাওয়ার কেসের পরবর্তী শুনানি হবে ১১ই জুন।
(আদালতের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ, আলো নেভে। আবহে আরো একটি কেসের ডেট শোনা যায়। আলো আসে। আদালতে স্কুটি চুরির মোকদ্দমা চলতে থাকে।

নন্দ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, তার একটু বয়স বেড়েছে।)

মেজি: : স্কুটি এনেছেন?

নন্দ : (ঘাম মুছতে মুছতে) হ্যাঁ।
স্যার একটা কথা বলবো? আমার স্কুটি আর আদালত পর্যন্ত পৌঁছাবার অবস্থায় নেই। বেশ কয়েক ডেটে আমি তাকে পায়ে হেঁটে গড়িয়ে গড়িয়ে এনেছি। আজ তো, ওই থিয়েটার হলের সামনে থেকে একদম আসতেই চাইছিল না, কোনো রকমে ...

মেজি: : ভ্যানে চাপিয়ে আনতে পারতে। এবার থেকে একটা ভ্যান ভাড়া করে নেবে। ভ্যানে চেপে স্কুটি সহজে আসতে পারবে। (নন্দ চুপ)
আমি পরের তারিখ দিয়ে দিচ্ছি।

নন্দ: : স্যার, একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। ধরুন, এর মধ্যে যদি আমার স্কুটিটা শেষ হয়ে যায়,তখন তদন্তের কি হবে?

মেজি: : তদন্ত চলবে।
(ঢং ঢং শব্দ- আদালতের মৃদু গুঞ্জন, নন্দ বেরিয়ে আসে- রাস্তায় আলো আসে নন্দ স্কুটি নিয়ে ঢোকে)

নন্দ : এত সহজে হাল ছাড়লে চলবে? শুনলি তো আবার আসতে হবে। তারপর আবার তারিখ দেবে, পুনরায় তারিখ দেবে। এখন তো তারিখের পর তারিখ চলতে থাকবে। লড়াই যে চলতে থাকবে বন্ধু। লড়াইয়ের মাঝে এই ভাবে বিগড়ে গেলে হবে? চল, স্টার্ট হয়ে যা, আজকেই গ্যারেজে নিয়ে যাবো।
(আবার স্টার্ট করার চেষ্টা করে, ধরে না)
এইরকম করলে চলবে? আদালতে বলেছে আসামী না এলেও চলবে কিন্তু তোকে আসতে হবে। আর তুই যেতেই চাইছিস না, আবার আসবি কিরকম। চল লক্ষ্মীটি স্টার্ট হয়ে যা- (আবার স্টার্ট করার চেষ্টা করে, ধরে না।)
(পাশ দিয়ে দুজন যুবক হেঁটে যাচ্ছিল)

যুবক : কি কাকু, ঠেলা দিতে লাগবে নাকি?

নন্দ : (স্বভাবজাত ভঙ্গিমায়) হ্যাঁ, একটু হাত লাগিয়ে দাও তো ভাই।

অন্যযুবক: (হাসতে হাসতে) গাড়ী আর চলছে না কাকু, বদলে নিন। রোজ ঠেলা মেরে কি লাভ?

নন্দ : না ভাই, বদলানো যাবে না। বরং মেকানিক দেখিয়ে নেব।

যুবক : মেকানিক ওই একই কথা বলবে .... (প্রস্থান)

নন্দ : সে বলুক, মানুষের যেমন সর্দি কাশি হয়, স্কুটির তেমন হতে পারে। মেকানিককে দেখালেই সেরেও যায়। চল, আজ আবার কিছুটা হাঁটতে হবে। (হাঁটতে থাকে-) প্রতি তিন মাস অন্তর এক একটা তারিখ। যেতে আসতে আদালতের রাস্তাটাও

তোর মুখস্থ হয়ে গেছে, বল? এই রাস্তার পাশেই তো শহরের বড়ো থিয়েটারটা; যার সামনে থেকে তুই তীর্থ যাত্রীর হাতে পড়েছিলি। তোর সেই তীর্থযাত্রীকে মনে পড়ে? না বোধ হয়, বৈষ্ণোদেবীর রাস্তাটাও প্রায় ভুলে গেছিস, তাই না? কিন্তু এখনো সেই তীর্থ যাত্রীকে চুরির আসামী বলে চিহ্নিত করা যায় নি। তদন্ত চলছে- কত কিছু বদলে যাবে, মোকদ্দমার মেজিস্ট্রেট বদল হবে, সরকার বদলে যাবে, তোর বৌদি হয়তো আবার মা হবে। অথচ তোকে কে চুরি করেছিল, তাকে ধরা যাবে না। বুঝলি না ... তদন্ত চলছে

(একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ)

ওই যে, ম্যাজিস্ট্রেট সহেব চলে যাচ্ছেন। পেছনে ওই কনস্টেবল। দেখেছিস, আমাদের দেখে হাত নাড়ছে। চল স্টার্ট হয়ে যা- (স্টার্ট দেওয়ার বিফল চেষ্টা করে-) চলবি না তো, এবার তোকে সত্যিই ভ্যানে চাপিয়ে আনবো, তখন মানসম্মান থাকবে তো? (আবার একটা গাড়ির শব্দ) কি দেখছিস? ওই কালো রঙের ফিয়র্ডটা তো? শালা নিমকহারাম, এখন আমাকে পছন্দ নয় তোর, ওই কালো ফিয়র্ড- (মুখ তুলে দেখে চমকে যায়) আরে এতো সাক্ষাৎ দেবদর্শন। বৈষ্ণোদেবীর ভক্ত আসছে মনে হয়। হ্যাঁ, এদিকেই তো আসছে, এতদিন পর আদালতে... (নন্দলালের প্রবেশ)

লোকটি : আরে ভাইসাহেব, এখানে কি করছ? স্কুটিটা চলছে না বুঝি, ঝামেলা করছে? এ হে, স্কুটির কি অবস্থা করেছ তুমি! এত ভালো ছিল স্কুটিটা। এর সাথে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার। বৈষ্ণোদেবীর রাস্তায় ওই চড়াই, পুরোটা উঠে গিয়েছিল। তবে এ তো হলো ইঞ্জিন, যত্ন না নিলে টিকে থাকবে কি করে?

নন্দ : তা ঠিক ... (নন্দলাল চলে যাচ্ছিল-) একটা কথা ছিল নন্দদা-

(দাদা সম্বোধনে ঘুরে দাঁড়ায়)

লোকটি : বলো, বলো হুকুম করো, কি ব্যাপার?

নন্দ : প্রত্যেকবার হাজিরার সময় আমাকে স্কুটিটা আনতে হয়। এই নিয়ে প্রায় ছ-বছর চলছে । আজকাল এই কঙ্কাল জীবটাকে নিয়ে আসা আমার পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে।

লোকটি : ও এই ব্যাপার। আগে বলো নি কেন? চিন্তা করো না, হয়ে যাবে। আমি আমার উকিলকে দিয়ে সব ঠিক করে দেব। তোমাকে আর স্কুটি আনতে হবে না। কিন্তু ভাই একে একটু যত্ন নিও, বৈষ্ণোদেবীর সেই ....

নন্দ : চড়াই রাস্তায় একেবারে উঠে গেছিল? বলছি দাদা মামলার কি হবে? মানে প্রতিবার যেতে আসতে-

লোকটি : মামলা চলবে। আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর তো আমি কিছু বলতে পারি না। (চলে যাচ্ছিল) তুমি আমার একটা উপকার করবে ভাই?

নন্দ : উপ-কার! কি করতে হবে বলুন?

লোকটি : আমার ছেলেটাকে একবেলা টিউশন পড়িয়ে দাও না ভাই। (নন্দ অবাক) আমি চাই আমার ছেলেটা যাই হোক না কেন, যেন সত্যি কথা বলে। ব্যাটা ছেলে এখন থেকে মিথ্যা বলতে শুরু করেছে। কদিন ধরে বুঝতে পারছি পকেট থেকে বান্ডিল লোপাট হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে কিছুতেই স্বীকার করে না।
তুমি তো আমাকে এতদিন চেনো, কখনো শুনেছো আমাকে মিথ্যা বলতে -

নন্দ : না -

লোকটি : তবে? এই নাও একমাসের বেতন ২০০০ টাকা অ্যাডভান্স।
(টাকাটা ধরিয়ে দেয়। নন্দ সন্দেহের চোখে নোটটা দেখে-)
ভয় নেই, নোট বন্দিতে চেঞ্জ করে নিয়েছি, তাহলে মাসের পয়লা তারিখ থেকে পড়ানো শুরু করে দাও। আর মামলার কোনো চিন্তা নেই, সব ঠিক করে দেব-
(পিঠে হাত চাপড়ে প্রস্থান করে, নেপথ্যে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ)

নন্দ : দেখছিস, রাস্তার ওপারে বড় থিয়েটারের সামনে মানুষের ভিড় জমছে। তোর মনে পড়ে, ওই থিয়েটারের সামনে থেকে তুই একদিন বেহাত হলি, আজও ঠিক মতো ধরা দিলি না এই হাতে। ওই নন্দলালের আংটি খচিত হাতের মোহে পড়িস নি তো? শালা ইঞ্জিন কোথাকার (স্টার্ট দেয়, শব্দ করে বন্ধ হয়-)
চল তোকে আজ হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবো- (থমকে দাঁড়ায়) নাটক দেখবি, ওই থিয়েটারে? চল..... (আবহে গান ভেসে আসে-

বাবু সমঝো ইশারে
হর্ন পুকারে - পম পম পম)

(কোরাসের দল শুরুর মতো ঢোকে - ধীরে ধীরে আলো নেভে)

লেখক : **ড. অনির্বাণ পয়ড়্যা,** গবেষক বাংলা ভাষা সাহিত্য, সহযোগী অধ্যাপক, এগ্রা S.S.B College।
Playwright : **Dr. Anirban Payra, Scholar, Associate Professor, Egra S.S.B College.**

নেতাজির অন্তর্ধান কাহিনী বিষয়ক নাটক

সেভেন্টি টু ডেজ

■ পার্থ মজমুদার

চরিত্রলিপি

উত্তমচাঁদ (বয়স আনুমানিক ৪৫-৫০)
অমরনাথ (বয়স আনুমানিক ১৫-১৬)
ভগতরাম (বয়স আনুমানিক ৪৫-৫০)
রহমৎ খাঁ (বয়স আনুমানিক ৪৫-৫০)
সুভাষ/জিয়াউদ্দীন (বয়স আনুমানিক ৪৫-৫০)
গোয়েন্দা/কনস্টেবল (বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫)
হাজী সাহেব (বয়স আনুমানিক ৬৫-৭০)
হাজী সাহেবের স্ত্রী (বয়স আনুমানিক ৫৫-৬০)
লক্ষী (বয়স আনুমানিক ৪০-৪৫)
মি: আর (বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০)
মি: এম (বয়স আনুমানিক ২৫-৩০)
জীবনলাল (বয়স আনুমানিক ৪৫-৫০)
সেনারা কারোনী (বয়স আনুমানিক ৪৫-৪৫)
বন্দুকধারী (৩/৪ জন)

(সময় ১৯৪১ সাল, শীতের সকাল, আনুমানিক সময় ১১:৩০ থেকে ১২টা। ৩ ফেব্রুয়ারি। কাবুল শহরের একটি দোকানে রান্নার বাসনপত্র ও রেডিও বিক্রি হয়। মালিক উত্তম চাঁদ পত্রিকা পড়ছেন। একটি ১৫-১৬ বছরের কর্মচারী নাম অমরনাথ)

উত্তমচাঁদ : বুঝলি অমরনাথ সুভাষ বোস নিজের বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছেন।

অমরনাথ : (নিস্পৃহভাবে) কে সুভাষ বোস? আমাদের হিন্দু গুজার এলাকার?

উত্তমচাঁদ : কাবুলের নয়, ভারতবর্ষের বিশাল বড় মাপের নেতা। স্বাধীনতা সংগ্রামী।

অমরনাথ : ও, তা এখন তিনি কোথায়?

উত্তমচাঁদ : এখন কোথায় কিভাবে বলব, তবে পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কাবিশ নাকি কিছুদিন আগে সুভাষ বোসের সাথে দেখা করেছিলেন, তখন নাকি তিনি গৃহত্যাগ করে সাধু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, মনে হচ্ছে সাধু হয়ে গেছেন।

অমরনাথ : অ: তাই? আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছেন এই পরাক্রমশালী ইংরেজদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না তাই পালিয়ে বাঁচলেন। আর আপনি বলছেন বিশাল নেতা?

(এই কথোপকথন চলাকালীন দোকানে এক দুজন ক্রেতা আসতে পারে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে)

উত্তমচাঁদ : যা জানিস না, বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলবি না। সুভাষ বোস পালানোর লোক নন, কিছু একটা ব্যাপার আছে।

অমরনাথ : ঠিক আছে (নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকে বা দোকানের কাজ করতে থাকে)

(এক আগন্তুকের প্রবেশ। পোষাক খাকি রংয়ের, পেশোয়ারী সালওয়ার, একটি খাঁকি শার্ট, একটি চামড়ার জামা এবং তার উপর একটি ওয়েস্ট কোট বোতাম আটা, মাথায় পাঠানের মত পাগড়ি, পায়ে গরম মোজা ও পেশোয়ারি চপ্পল)

আগন্তুক : আ সালাম আলাইকুম

উত্তমচাঁদ : সালাম, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

আগন্তুক : (খুব নিচু স্বরে) আপনার নাম কি উত্তম চাঁদ?

উত্তমচাঁদ : হ্যাঁ, বলুন আমি কি করতে পারি? (আগন্তুক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে চারিদিকে তাকাচ্ছে কথা বলছে না, অমরনাথের উপস্থিতিতে আগন্তুক কথা বলতে সাবলীল নয় বুঝিয়ে দিচ্ছে) আপনার যা বলার নিঃসংকোচে বলুন, ও অমরনাথ। আমার দোকানের কর্মচারী। অসুবিধে নেই (আগন্তুক ইতস্তত করতে লাগলেন) ঠিক আছে, অমরনাথ তুই বাবুকে একটা চেয়ার দিয়ে চা নিয়ে আয় ।

(অমরনাথের প্রস্থান)

আগন্তুক : (উৎফুল্ল হয়ে) আমি একজন ভারতবাসী, একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে এখানে এসেছি কিন্তু একটু মুশকিলে পড়েছি তাই আপনার সাহায্য চাইছি।

উত্তমচাঁদ : কিন্তু আপনি কে? আপনি আমার নাম জানলেন কি করে? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন বা আপনার মুশকিলই বা কি?

আগন্তুক : আমার নাম ভগতরাম। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মর্দান জেলার ঘালাদের গ্রামে। হয়তো আপনি শুনেছেন যে পাঞ্জাবের গভর্নরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছিলেন হরকিষান তলোয়ার, আমি উনার ভাই, আপনার মামীর প্রতিবেশী। (উত্তমচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করে) ১৯৩০ সালে আপনি যখন নওজোয়ান সভার সেক্রেটারি হিসেবে গ্রেপ্তার হন তখন আমি ছিলাম ওই নওজোয়ান সভার সক্রিয় সদস্য।

উত্তমচাঁদ : এখন বলুন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার আগমন এবং আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

ভগৎ রাম : আমি সুভাষ বোসকে নিয়ে এসেছি। তাকে গোপনে আফগান সীমান্ত পার

করে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিতে চাই কিন্তু—

উত্তমচাঁদ : (হতবিহ্বল অবস্থা) সু-সু-ভা--ভাসো- বোস? (মঞ্চের কোনে ছোট জোনে সাধারণ পোষাকে সুভাষ বোসকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখানো যেতে পারে)

ভগৎরাম : উত্তমচাঁদজী আপনি কি ভাবছেন? হতবিহ্বল হয়ে আছেন কেন?

উত্তমচাঁদ : (জল খেয়ে) না মানে সুভাষ বোস কাবুলে? (পত্রিকা দেখিয়ে) এই মাত্র পড়লাম উনি রহস্যজনকভাবে ১৫ জানুয়ারি নিজ বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হয়েছেন। এবং সম্ভবত সাধু হয়ে গেছেন।

ভগৎরাম : সাধু টাধু এই সব রটনা (এমন সময় অন্য একজন ক্রেতা আসবেন দোকানে কোন কিছু কেনার কথা জিজ্ঞাসা করবে উত্তমচাঁদ ক্রেতার কথা না শুনেই বলে দেবেন যে উনার দোকানে তা নেই)

উত্তমচাঁদ : (ধাতস্ত হয়ে) তা বলুন আমি কি করতে পারি?

ভগৎরাম : আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ, ১৩ দিন হল আমরা পেশোয়ার হয়ে কাবুলে প্রবেশ করেছি লাহুরি দরজার নিকট একটা সরাইতে ছোট ঘর নিয়ে আছি। জায়গাটা অতি জঘন্য। সমস্ত উট ও গাধাওয়ালারা ব্যবসার খাতিরে এদিকে যাওয়া আসা করে। এই সরাইটা তাদের আড্ডার জায়গা। এই কদিন রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযাগ স্থাপনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটা লোক আমাদের পেছনে লেগেছে, খুব সম্ভবত আফগান গোয়েন্দা। বোসবাবু প্রথম দিনই এই লোকটাকে সন্দেহ করছিলেন। এই লোকটা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। (অমরনাথ চা নিয়ে প্রবেশ করবে। ভগৎরাম কথা থামিয়ে দেয় উত্তমচাঁদ বুঝতে পারে)

উত্তমচাঁদ : ঠিক আছে, অমরনাথ তুই একটা কাজ কর বাজারে যা, বাজার থেকে ঘরের জন্য আটা নিয়ে আয়। (অমরনাথ প্রস্থান উদ্যত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভগৎরামের দিকে তাকায়) আর শোন বাজারের সবগুলি দোকান ঘুরবি, যে দোকানে সবচেয়ে ভালো আটা পাবি তাই আনবি। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, আমি দোকান সামলে নেব (অমরনাথের প্রস্থান) (ভগৎরামকে) এবার বলুন তারপর?

ভগৎরাম : এই বিপদে আপনি আমাদের যদি কোনরূপ সাহায্য করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বোস বাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

উত্তমচাঁদ : বোস বাবু আমার কাছে পাঠিয়েছেন? উনি আমাকে চেনেন কিভাবে? উনার মত বিশাল মানুষ তো আমাকে চেনার কথা নয়?

ভগৎরাম : আমি বলেছি আপনার কথা ওনার কাছে। নওজোয়ান সভার সেক্রেটারি থাকার অপরাধে যে আপনার দু'বছর সশ্রম কারাদন্ড হয় এবং কারাদন্ড শেষে যে আপনি কাবুলে কাকার দোকানে কাজ করতে শুরু করেন তা আমি জানতাম।

আমার কাছ থেকে সব শুনে বোস বাবু আমাকে আপনার খোঁজ করতে বলেছেন এবং কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা জানতে বলেছেন।

উত্তমচাঁদ : আপনি যখন আমাকে চিনতেন তাহলে শুরুতে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন কেন?

ভগৎরাম : (হেসে) আসলে আমি আপনাদের দু ভাইকে চিনি। আপনারা দু ভাই-এর চেহারার এত মিল যে কে কোন জন তা ভ্রম হয়। তাছাড়া ১২- ১৩ বছর আগে আপনাকে শেষ দেখেছি তাই নিশ্চিত হবার জন্যই জিজ্ঞেস করেছি।

উত্তমচাঁদ : তা বলুন আমি কি সাহায্য করতে পারি?

ভগৎরাম : প্রথমে আমরা যেন নিরাপদে থাকতে পারি এমন একটা জায়গা ঠিক করে দিন, তারপর রুশীয় দূতাবাসের সঙ্গে যদি আপনার কোন যোগাযোগ থাকে তবে বোস বাবুকে মস্কো পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

উত্তমচাঁদ : আপনারা রুশীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি?

ভগৎরাম : করেছিলাম, তবে কোন অপরিচিত লোককেই রুশ দূতাবাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হবার পর ইতালীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সফল হয়েছি। উনারা বোস বাবুকে রোম বা বার্লিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলেছেন, তবে বোস বাবু রোম বা বার্লিনে যেতে চাইছেন না, আপনি যদি কোন সাহায্য করতে পারেন—

উত্তমচাঁদ : আমারও সেভাবে রুশ দূতাবাসের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই কি যে করি তাই ভাবছি।

ভগৎরাম : প্রথমে আমাদের একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুন। ওই যে বললাম একটা গোয়েন্দা ধরণের লোক আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলছে । আজ রাতটা সরাই-এ থাকা ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।

উত্তমচাঁদ : সরাইটা কোথায় তা বুঝতে পেরেছি। জায়গাটা জঘন্য তাও জানি। কিন্তু লোকটা আপনাদের কিভাবে যন্ত্রণা করছে?

ভগৎরাম : তবে শুনুন

(ফ্ল্যাশব্যাক)

(সরাইয়ের একটা ছোট ঘর, খুব বাজে অবস্থা, কোন জানালা নেই, একটা ছোট দরজা। একটি অপরিচ্ছন্ন শার্ট ও সালোয়ার পরা পাঠানের পোষাকে একজন কিছু কাঠ জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। শীতে কাঁপছেন। ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি। এমন সময় দুটো ছোট বিছানা জাতীয় কিছু নিয়ে ভগৎরামের প্রবেশ)

লোক : এই শীতে টিকে থাকা দায় হয়ে গেছে বুঝলে। তাড়াতাড়ি চলো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

ভগৎরাম : নিন রুটি আর কাবাব আছে খেয়ে নিন (রুটি দেয়, লোকটি খুব কষ্ট করে রুটি ছিড়েন) দাঁড়ান একটু চায়ে ভিজিয়ে নিন নরম হবে। (ভগৎরাম খেতে শুরু করে) একটা কথা বলব আপনাকে ভাবছি।

লোক : কি?

ভগৎরাম : আজ ছ'দিন ধরেই রুটির দোকানের সামনে একটা সন্দেহজনক লোককে দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় আমাদের পেছনে লেগেছে। আফগান গোয়েন্দা কিনা কে জানে?

লোক : ভাববার বিষয়, যাক এখন চল ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। যা ভাববার কাল সকালে ভাববো। (দুজনেই শুয়ে পড়ে, সকালে দরজায় টোকা পড়ার শব্দে ওরা ঘুম থেকে উঠে গোয়েন্দার প্রবেশ - কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রশ্ন করে)

গোয়েন্দা : তোমরা কে? কি মতলবে এসেছ? তোমাদের বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, চলো আমার সাথে কোতোয়ালিতে।

ভগৎরাম : আমরা মুসাফির, সীমান্ত থেকে এসেছি, ইনি আমার ভাই, কানে কিছু শুনতে পান না। কথাও বলতে পারেন না। তাকে নিয়ে সাথী সাহেবের দরগায় যাচ্ছি। বরফ পড়ার জন্য সাথী সাহেবের রাস্তা বন্ধ। রাস্তা খুললেই আমরা রওনা দেব। (পাঠানবেশী লোক বোবা-কালার অভিনয় করে যাবেন)।

গোয়েন্দা : এসব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। চলো আমার সঙ্গে কোতোয়ালিতে।

ভগৎরাম : আমার ভাইটি শীতে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছেন। কেন বৃথা হয়রান করছেন? দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন।

গোয়েন্দা : না না তা হয় না, আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

ভগৎরাম : (রুখে দাঁড়িয়ে) ঠিক আছ, তবে চলুন আমি যাব। আমার ভাইটি যেতে পারবে না। কোথায় কোতোয়ালি বলুন?

গোয়েন্দা : (ভগৎরামের রুখে দাঁড়ানো দেখে নরম হয়) ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার ভাই অসুস্থ, তাই আজকের মত ছেড়ে দিলাম। যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে কেটে পড়। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, দাও চা পানির জন্য কিছু দাও। (ভগৎরাম একটি ১০ টাকার নোট বের করে দেয়, গোয়েন্দা বেরিয়ে চলে যায়)।

লোক : এই লোকটি কিন্তু আমাদের জ্বালাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এক কাজ কর, তুমি বেড়িয়ে যাও। যত দ্রুত সম্ভব ইতালীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলে আমার পালানোর ব্যবস্থা কর। সম্ভব হলে রুশ দূতাবাসের সঙ্গে আবারও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার কথা জানলে রুশ দূতাবাস আমাকে মস্কো পাঠানোর ব্যবস্থা করবেই।

ভগৎরাম : ঠিক আছ আমি বেরোচ্ছি। দেখি আবারও চেষ্টা করে, (প্রস্থান) (পাঠানবেশী লোকটি ঘরের বিভিন্ন কাজ করতে থাকে। পকেট থেকে একটি ম্যাপ বের করে

আফগান সীমান্তের সঙ্গে রাশিয়া, ইতালি, জার্মানির সীমানার দূরত্ব নির্ণয় করে। প্রয়োজনে এই ম্যাপটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। গভীর চিন্তামগ্ন। দরজায় টোকা পড়ে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। গোয়ন্দাকে দেখা যায় ফিরে আসতে। গোয়ন্দা ঘরে ঢুকে সোজা বসে পড়ে)

গোয়েন্দা : কি হে তোমরা মোটেই ভাল লোক নও, আমি বুঝতে পেরেছি। (পাঠানবেশী লোক বোবা, কালা, অত্যন্ত দুর্বল, এমন অভিনয় করতে থাকে, গোয়েন্দার কথা চলতে থাকে) সাথী সাহেব যাবার রাস্তা তো খুলেছে, আমি খবর নিয়েছি। একদিন বাদে একদিন গাড়ি যাচ্ছে। সত্যি করে বলতো তোমাদের মতলবটা কি? (লোকটি বোবা কালার অভিনয় করতে থাকে) তোমার সঙ্গের লোকটি কই? (কোন উত্তর নেই, এবার গোয়েন্দা ক্ষেপে যায়, লোকটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চায়) চল কোতোয়ালি, বড় সাহেবের কাছে চল। তোদের সব খবর বের করছি। (এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ভগৎরামের প্রবেশ। ভগৎরামের হাতে আগে থেকেই একটি ঘড়ি থাকবে)

ভগৎরাম : এই এই কি হয়েছে? আমার ভাইকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? বললাম না উনি বোবা, কালা। ঠিকভাবে হাঁটতেও পারেন না। যা বলার আমাকে বলো। আমি দূর থেকে তোমাকে সরাইয়ে ঢুকতে দেখেছি, তাই গাড়ি স্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে এখানে চলে এসেছি।

গোয়েন্দা : সাথী সাহেব গাড়ি যাচ্ছে, আমি খবর নিয়েছি। তোমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি আমায় বলো, নয়তো চলো বড় সাহেবের কাছে, কোতোয়ালিতে। (ভগৎরাম পাঁচ টাকার নোট বের করে দেয় গোয়েন্দা হাতে নিয়ে)

গোয়েন্দা : মাত্র পাঁচ টাকা, এ দিয়ে হবে না।

ভগৎরাম : বলছো কি? ৫টাকা তো ৩০ আফগানি রুপির সমান। তোমার প্রায় এক মাসের বেতন তাও হবে না? (গোয়েন্দার হঠাৎ ভগৎরামের ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে) বাহ, ঘড়িটা তো খুব সুন্দর। বেশ দামি মনে হচ্ছে। দাও এটা খুলে দিয়ে দাও। বড় সাহেবকে দিলে খুশি হবে। তাহলে তোমাদের আর আমাকে যন্ত্রণা করতে হবে না। (ভগৎরাম ঘড়ি খুলে দেয়। গোয়েন্দা বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে।)

লোক : এভাবে চললে হবে না। আমাদের বিকল্প বাছতে হবে। আচ্ছা তুমি যে সেদিন একজন কার কথা বলেছিলে, নওজোয়ান সভার সেক্রেটারি ছিল, বর্তমানে কাবুলে ব্যবসা করে। উনার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা দেখো।

ভগৎরাম : কিন্তু আমি বেরোলে যদি এই শয়তানটা আবার আসে?

লোক : আজ আর আসবে না। যে ঘুষ খেয়েছে ওগুলো হজম হোক তারপর আসবে (দুজনেই হাসে। ভগৎরাম বেড়িয়ে যায়, লোকটি আবার ম্যাপ নিয়ে বসে,

ফ্ল্যাশব্যাক শেষ হয়, পূর্বের দোকানের দৃশ্যে ফিরে আসে)

(দোকানের দৃশ্য)

ভগৎরাম : বোস বাবুর আদেশেই আপনার কাছে আসা।

উত্তমচাঁদ : সবই বুঝতে পারছি, যত দ্রুত সম্ভব ওখান থেকে কেটে পড়তে হবে। দেখুন ভগৎরাম আমার বাড়িতে রাখতে পারি। কিন্তু সেটাও নিরাপদ হবে বলে মনে হয় না কারণ একদিকে হিন্দু গুজার অর্থাৎ যেখানে আমরা থাকি এলাকাটা ভীষণ নেংরা। তাছাড়া আমার বাড়ির নিচের তলায় ভাড়াটিয়া আছে ওরা প্রায় সময়ই ছাদে ওঠা নামা করে সেই দিক থেকে বোস বাবুর গোপনীয়তা কতটুকু রক্ষা হবে কে জানে? (চিন্তান্বিত) (কিছুটা সময় নিশ্চুপ, অমরনাথ প্রবেশ করে আটা হাতে নিয়ে) তুই যা এটা বাড়ি দিয়ে আয় (অমরনাথের প্রস্থান। তবে আগুন্তুক সম্বন্ধে যে সন্দিগ্ধ তা স্পষ্ট। কিছুটা চিন্তার পর) আচ্ছা আমার এক মুসলমান বন্ধু আছে বেশ ইংরেজি-বিদ্বেষী। সুভাষ বাবুর প্রতি অনুরক্ত আছেন। সুভাষ বাবুকে উনি ভারতের সিংহ বলে ডাকেন। মক্কা করে এসেছেন বলে উনাকে আমরা হাজী সাহেব বলি। উনার বাড়িটা সুন্দর। আপনি যদি বলেন আমি উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি। উনার একটা গেঞ্জি, মোজা বানানোর কারখানা আছে।

ভগৎরাম : আপনি যদি মনে করেন তিনি আমাদের ধরিয়ে দেবেন না তবে নিশ্চয়ই কথা বলুন। আর যাই হোক আজ রাতের মধ্যে সরাই থেকে না সরতে পারলে যে সমূহ বিপদ তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। যে কোন সময় আমরা ধরা পড়ে যাব।

উত্তমচাঁদ : ঠিক আছে, আমি হাজী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

ভগৎরাম : যদি উনি রাজি না হন?

উত্তমচাঁদ : তখন তো আমার বাড়ি আছেই, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনারা বিকেল চারটায় সময় আসুন (ভগৎরাম প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই ছদ্মনাম নিয়েছেন? পাঠানের ছদ্মবেশও গ্রহণ করেছেন দেখতে পাচ্ছি।

ভগৎরাম : হ্যাঁ আমার নাম রহমত খাঁ। আর বোস বাবু নিয়েছেন জিয়াউদ্দিন। ঠিক আছে চারটার সময় বোস বাবুকে নিয়ে আসবো। চলি। (প্রস্থান) (উত্তম চাঁদ দোকান লাগিয়ে বেরুতে যায় চারদিক থেকে তার অন্তরাত্মার কথা ধ্বনিত হবে এই দৃশ্য নির্দেশক নিজের ইচ্ছে মতো সাজিয়ে নেবেন। আলো আবহ পরিবর্তন হবে।)

অন্তরাত্মা ১ : হাজী সাহেব রাজি নাহলে তোমার বাড়িতে আশ্রয় দেবে?

উত্তমচাঁদ : হ্যাঁ দেব

অন্তরাত্মা২ : কাকে আশ্রয় দিচ্ছ বুঝতে পারছ না। সুভাষ বোস। ইংরেজরা হন্যে হয়ে

যাকে খুঁজছে নিশ্চয় ওরা ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলোতেও খোঁজ করবে।

উত্তমচাঁদ : তা এখন আমি কি করব?

অন্তরাত্মা ১ : কি করবে মানে? তুমি অনেক আগে থেকেই ভারতের স্বাধীনতা চাও। তবে কি সুভাষ বোসকে আশ্রয় দেওয়া তোমার কর্তব্য নয়?

অন্তরাত্মা২ : তোমার বাড়িতে সুভাষ বোসকে পেলে কি হবে ভাবতে পারছো তো উত্তমচাঁদ? তোমাকে তোমার স্ত্রী সহ সারা জীবনের জন্য বন্দী করা হবে। তোমার ছেলেমেয়েদের কি হবে ভেবে দেখেছো কি? কেউ কিন্তু তখন তোমার ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দেবে না।

উত্তমচাঁদ : সবই ঠিক আছে কিন্তু নিজের দেশের জন্য যে আমাকে এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।

অন্তরাত্মা২ : (হাসি) দেশের জন্য ত্যাগ? ভাবো কোনটা আগে? তোমার দেশ না তোমার পরিবার।

অন্তরাত্মা১ : দেশ

অন্তরাত্মা২ : পরিবার

অন্তরাত্মা১ : দেশ

অন্তরাত্মা২ : পরিবার

অন্তরাত্মা১ : দেশ, দেশ, দেশ

অন্তরাত্মা২ : পরিবার, পরিবার, পরিবার

উত্তমচাঁদ : (চিৎকার) আঃ তোমরা থামো। (ছায়া মূর্তি বা অন্তরাত্মা অদৃশ্য হয়ে যায়। উত্তমচাঁদ হাঁপাতে থাকে) কি করি? আমার কি করা উচিত (স্বগতোক্তি) এই পরিস্থিতিতে? (কিছুটা সময় পর স্থির সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ায়) না আমাকে সাহায্য করতেই হবে। যদি বোস বাবু দেশের জন্য সব ত্যাগ করতে পারেন তবে আমি এই সামান্য কাজ করতে পারব না? যা হবে পরে দেখা যাবে (দোকান বন্ধ করে রাস্তায় আসে, রাস্তায় হাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা।)

(রাস্তার দৃশ্য)

(১৯৪১ সালের সময়ের কাবুল শহরের কোন রাস্তা। কাবুলি পোষাকে লোকজন আসা যাওয়া করছে। উত্তম চাঁদ দোকান থেকে । হাজী সাহেবের বাড়ির দিকে যেতে থাকে। বিপরীত দিক থেকে হাজী সাহেব উত্তম চাঁদকে ডাক দেয়।)

হাজী সাব : কি হলো উত্তম চাঁদবাবু এই অসময়ে দোকান বন্ধ করে কোথায় যাচ্ছেন?

উত্তম চাঁদ : আরে হাজী সাহেব যে, আমি আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। জরুরি কিছু কথা ছিল।

হাজী সাব : তবে চলুন পানি খেয়ে আসবেন।

উত্তম চাঁদ : না তা এখন না, বরং দেখা যখন হয়েই গেল চলুন আমার দোকানে বসেই কথা বলি। (হাজী সাহেব, উত্তম চাঁদ দোকানে প্রবেশ করে)

উত্তম চাঁদ : একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে কয়েকজন লোক ভারতবর্ষ থেকে গুপ্তভাবে এখানে এসেছেন, তারা আপনার আশ্রয় চাইছেন।

হাজী সাব : (হেসে) তুমি দেখি অতি সরল লোক, বিষয়ের গুরুত্বই বোঝ না। ইউরোপে থাকাকালীন এমন অনেক সাহায্য করেছি, তার পরিণামে আমাকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয়রা তেমন বিশ্বাসযোগ্যও নয়। বৃদ্ধ হয়েছি, রাজনৈতিক হাঙ্গামায় আর জড়াতে চাই না।

উত্তম চাঁদ : (রেগে) ছিঃ হাজী সাহেব আপনি আশ্রয় দেবেন না ঠিক আছে, কিন্তু আমার বন্ধুদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা একদমই উচিত হয়নি আপনার।

হাজী সাব : বিরক্ত হয়ো না। দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। হয়তো তোমার কাছে যারা এসেছেন তারা বিশ্বাসযোগ্য হতেও পারে। তা তাদের নামগুলি কি জানতে পারি?

উত্তম চাঁদ : আপনি যখন সাহায্য করবেনই না, তবে নাম জেনে কি করবেন?

হাজী সাব : না বলছিলাম যদি ভারতের কোন বিশ্বাসযোগ্য নেতা হয় তাহলে হয়তো ভেবে দেখতেও পারি।

উত্তম চাঁদ : আপনি অনুমান করুন।

হাজী সাব : তুমি তো আর সুভাষ বোসকে হাজির করাতে পারবে না। পারবে কি?

উত্তম চাঁদ : (বীরদর্পে) তবে ধরে নিন সুভাষ বোসই।

হাজী সাব : (লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে) সুভাষ বোস! সুভাষ বোসকে আশ্রয় দিতে পারা তো আমার সৌভাগ্যের বিষয়।

উত্তম চাঁদ : এখন বলুন আপনি কি করবেন?

হাজী সাব : তুমি তো আমার বাড়ি চেনো, বলতো সুভাষ বাবুকে আমার বাড়িতে কোন ঘরে রাখি?

উত্তম চাঁদ : মেশিন ঘরের পাশে যে ঘরটা খালি আছে সেখানে রাখতে পারেন।

হাজী সাব : কিন্তু প্রতিদিন মেশিন ঘরে ১০ - ১২ জন লোক কাজ করে। সুভাষ বাবুর গোপনীয়তা বজায় রাখা খুবই কঠিন হবে।

উত্তম চাঁদ : তাও অবশ্য ঠিক। তা এখন কি করা?

হাজী সাব : আমি বলছি তুমি তোমার বাড়িতেই রাখো। বাকি সব ক্ষেত্রে আমি যা যা সাহায্য লাগবে করে দেব। চলি এখন। (হাজী সাহেবের প্রস্থান, অমরনাথ প্রবেশ করে)

উত্তম চাঁদ : (ঘড়ি দেখে, অমরনাথকে) অমরনাথ তুই বাড়ি চলে যা। আমি দোকান লাগিয়ে

আসবো। আর শোন লক্ষ্মীকে বলবি আজ রাতে আমার দু'জন অতিথি খাওয়া দাওয়া করবেন সেই অনুযায়ী যেন ব্যবস্থা রাখে।
(অমরনাথের প্রস্থান, ভগতরাম এর প্রবেশ)

ভগতরাম : কোন খবর?

উত্তম চাঁদ : আপনারা আমার বাড়িতেই থাকবেন। তা সুভাষ বাবু কোথায়?

ভগতরাম : উহু, না সুভাষ বাবু নয়, প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আর আমিও ভগত রাম নই রহমত খাঁ। আপনিও এই নামেই সম্বোধন করবেন।

উত্তম চাঁদ : ঠিক আছে তা উনি কোথায়?

রহমৎ খাঁ : (কাবুল নদের বিপরীত তটে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে দেখায়, বিশেষভাবে জিয়াউদ্দিনের প্রথম প্রকাশ দৃশ্যায়িত হতে পারে। জিয়াউদ্দিন পাঠানের পোষাক পড়া) ওই যে নদীর ওই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উত্তম চাঁদ : উনি সুভাষ বোস? (সন্দিহান)

রহমৎ খাঁ : আপনি তাঁকে সহজে চিনতে পারবেন না। এখন তাড়াতাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করুন।

উত্তম চাঁদ : ঠিক ঠিক (দোকানের দরজা বন্ধ করে রহমৎ খাঁকে) চলুন।

রহমৎ খাঁ : না আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আগে আগে চলুন আমি পেছনে আছি। এর পেছনে থাকবেন প্রফেসর জিয়াউদ্দিন। আমরা সবাই অপরিচিত, মনে থাকে যেন। এটাই উনার নির্দেশ।

(দোকানের আলো নিভে, রাস্তার আলো জ্বলে। তুষারপাত চলছে, প্রচণ্ড শীত, রাস্তায় হাঁটা কষ্টকর। সুভাষ বাবু ও রহমত খাঁ দু একবার মাটিতে পড়ে যান, আবার এগিয়ে চলেন। প্রয়োজনীয় আলো আবহ। রাস্তার আলো নিভে উত্তম চাঁদের বাড়ির জোনের আলো জ্বলবে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(উত্তম চাঁদের শোবার ঘর। দেখা যাবে উত্তম চাঁদের স্ত্রী লক্ষ্মী বিছানায় বসা, রাগান্বিত, উত্তম চাঁদের জন্য অপেক্ষা। উত্তম চাঁদের ঘরে প্রবেশ। দরজা বন্ধ করে)

উত্তম চাঁদ : কি ব্যাপার তুমি এখনো ঘুমাওনি?

লক্ষ্মী : (রাগে গজ গজ করতে করতে) ঘুমাবো কিভাবে? বাড়িতে দু'জন রহস্যজনক লোককে এনে উঠিয়েছ আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই?

উত্তমচাঁদ : তোমাকে বললাম তো ওরা লাগমান থেকে এসেছে। একজন খুবই অসুস্থ। বাড়ি থেকে বেরুবার ক্ষমতা নেই। তাঁর বন্ধুটি তাঁকে দেখভাল করার জন্য ঘরবন্দি, একটু সুস্থ হলেই ওরা সাথী সাহেবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবেন।

লক্ষ্মী : (উগ্র মূর্তি) চুপ আমাকে আর মিথ্যে বলতে হবে না। তোমার কথাই যদি সত্যি হয় তবে তারা ঘুষ দিয়ে, ঘড়ি দিয়ে কনস্টেবলের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে

পালিয়ে আসলো কেন?

উত্তমচাঁদ : (আশ্চর্য হয়ে) আস্তে আস্তে ওরা শুনতে পাবে। তা এই খবর তুমি জানলে কিভাবে?

লক্ষ্মী : কিভাবে জানলাম তা তোমার জানার দরকার নেই। আমি ঠিক বলছি কিনা সেটা বল?

উত্তমচাঁদ : ও বুঝেছি অমরনাথ। তোমার গুপ্তচর। সে নিশ্চয়ই কান পেতে দোকানে আমাদের কথা শুনেছে আর তারপর এসে তোমাকে বলেছে।

লক্ষ্মী : আমি এত সব জানি না। আমি দুই অপরিচিত পুরুষকে আমার বাড়িতে থাকতে দেব না। প্রয়োজনে তুমি তোমার মুসলমান বন্ধুদের সাহায্য নাও। এরপরও যদি তুমি তাদের এখানে রাখতে চাও, তাহলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

উত্তমচাঁদ : চিৎকার করছো কেন?

লক্ষ্মী : চিৎকার করবো না তো কি করব? (ঘর নিস্তব্ধ উত্তম চাঁদ পায়চারি করে)

উত্তমচাঁদ : তবে শোন, সত্যিটা বলছি। (মাইমে পুরো ঘটনা বলবে, লক্ষ্মী ভূত দেখার মত চমকে উঠবে কি করবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না চোখে মুখে আতঙ্ক)

লক্ষ্মী : (অনেকটা নরম গলায়) তুমি কি বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়েছো বুঝতে পারছ? কেউ যদি জানতে পারে কি অবস্থা হবে? সুভাষ বাবু তো গ্রেপ্তার হবেনই, আমাদের ছেলেমেয়েদের কি অবস্থা হবে একবার ভেবেছো?

উত্তমচাঁদ : আমি-তুমি যদি সাবধানে থাকি তবে কিছু হবে না আর তুমি একটিবার ভাবো এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত ছিল? সুভাষবাবুর মত দেশপ্রেমিক আমার অতিথি হয়েছেন এর থেকে আর সৌভাগ্য কি হতে পারে বলো? দেশসেবার এমন মহান সুযোগ কি নষ্ট করা যায়?

লক্ষ্মী : (সম্পূর্ণ পরিবর্তিত) তুমি ঠিক বলছো। সুভাষবাবুর মত দেশপ্রেমিককে সাধ্যমত সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য। তার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতটা গোপনীয়তা সম্ভব বজায় রেখেই আমি সুভাষবাবুর সেবা শুশ্রূষা করে যাব।

উত্তম চাঁদ : এবার শুয়ে পড়ো (এই ঘরের আলো নিভে। অপর একটি ঘরে দেখা যায় সুভাষ বোস তার পরিচিত চেহারায়। রহমত খাঁর সঙ্গে শলা পরামর্শে ব্যস্ত)

সুভাষ : (চিরাচরিত চেহারায় বসে আছেন) বুঝলে রহমত, রাশিয়ানরা আমার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নয়, তাই তোমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তোমাকে পত্রপাঠ না করে দিয়েছে।

রহমৎ : আমিও তাদের এই উত্তরের প্রত্যাশায় ছিলাম না। তবে ইতালীয় দূতাবাস যেহেতু আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আমার মনে হয় তাদের সাহায্য নেওয়াই শ্রেয়।

সুভাষ : তুমি কি পেশোয়ারে খবর পাঠিয়েছো? আমার বন্ধুরা কি রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন কোন লোক পাঠাবে?

রহমৎ : তা পাঠিয়েছি, কিন্তু তা তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তার থেকে ভালো হয় না ইতালীয় দূতাবাসের সাহায্য নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কাবুল ত্যাগ করা? (সুভাষ বোসের কাশি আসে, মুখে চাপা দিয়ে কাশি দেয়। যেন শব্দ না বেরোয়) এখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে আপনি স্বাভাবিকভাবে কাশতে পারেন। কেউ শুনবে না।

সুভাষ : বলা যায় না। নিচে ভাড়াটিয়ারা আছে, পাশে বাড়ি আছে। আমাদের সামান্য অসচেতনতা পুরো প্লেন নষ্ট করে দিতে পারে।

রহমৎ : তা ঠিক।

সুভাষ : আমি চাইছি মস্কো যেতে। রোম বা জার্মানি কিন্তু আমার প্রথম পছন্দ নয়।

রহমৎ : রাশিয়নরা তো আপনাকে সাহায্য করতে না করে দিল।

সুভাষ : (হাসি) আচ্ছা রহমৎ, তুমি একবার দৃশ্যটা ভাবো। বড় দাড়ি লাগিয়ে (ছদ্মবেশের দাড়িটি লাগিয়ে দেখাবে) পাঠানের পোষাক পরে, এক গাছের নিচে জিয়াউদ্দিন সেজে বসে আছে একটা লোক আর তাকে দেখিয়ে রুশ দূতকে বলছো ওই লোকটা সুভাষ বোস। (হাসি) তাও আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা পারসি ভাষায়। কোন পাগল বিশ্বাস করবে বলো।

রহমৎ : কিন্তু তাছাড়া তো উপায়ও ছিল না। আপনি তো আর এখন যেমন আছেন সেভাবে বেরুতে পারবেন না। তাই বলছি ইতালীয় দূতাবাসের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে হয়। একবার যদি আপনি কাবুল ত্যাগ করে রোমে বা জার্মানিতে যেতে পারেন তখন না হয় সেখান থেকে মস্কো যওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু বসে বসে সময় নষ্ট করা কি ঠিক হবে?

সুভাষ : তোমার কথার যথেষ্ট যুক্তি আছ রহমৎ। ঠিক আছে চিন্তা করে দেখব। চলো এখন শুয়ে পড়ি, অন্তত আজ রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। ওই গোয়েন্দা নামক কনস্টেবল-এর ভূত আর তাড়া করবে না (দুজনেরই হাসি)
(আলো নিভে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য)

(সুভাষ বাবুর ঘর। রহমৎ, সুভাষ বোস, উত্তম চাঁদ বসা। গল্প করছে। সময় সকাল। প্রাতঃরাশের সরঞ্জাম থাকবে)

উত্তমচাঁদ : আপনার চিঠি আছে।
(সুভাষ বোস চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করে)

চিঠি — "যেদিন আপনার চিঠি পাই সেদিনই এখানে আপনার উপস্থিতির কথা বার্লিন ও রোমে জানাইয়া দেই। সেখানকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সংবাদে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার বিচিত্র পলায়নে তাঁহারা আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছেন। আপনাকে

সাহয্য করিবার আদেশ আমাকে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে। হের থমাস মারফত আমি সব খবরাখবর আপনাকে পাঠাইব।

ইতি ভবদীয়
সেনোরা কারোনি

সুভাষ : হের টমাস কে?

উত্তম চাঁদ : উনি একজন জার্মান। আমার মতই ঘড়ি বিক্রেতা। তবে প্রকৃতপক্ষে ওনি একজন গুপ্তচর। ঘড়ি বিক্রির নেপথ্যে রাজনৈতিক খবর সংগ্রহ করে রোম ও বার্লিনে পাঠানোই উনার দায়িত্ব।

সুভাষ : যাক কিছুটা হলেও আসার আলো দেখা যাচ্ছে। আমার বিচিত্র পলায়নে অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমার হয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবেন।

উত্তম চাঁদ : বোসবাবু আমিও শুনতে চাই আপনার বিচিত্র পলায়ন কাহিনি।

সুভাষ : (মৃদু হেসে) ১৫ জানুয়ারি আমি রাত ৮টায় মৌলবীর ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে করে রেল স্টেশনে যাই। সেখান থেকে ট্রেনে করে ১৭ জানুয়ারি রাত ৯টায় পেশোয়ার পৌঁছুই। ১৯ জানুয়ারি আমার বন্ধুরা আমাকে পাঠানের পোষাক দিলেন। তারা মৌলবীর বেশ থেকে পাঠানের বেশে আমি নিরাপদ থাকবো ভেবেই এই কাজটা করলেন। সঙ্গে দিলেন রহমৎ আর দুজন বন্দুকধারীকে। ২০ জানুয়ারি আমরা ভারতের সীমা পার হয়ে 'আড্ডা শরীফ' দরগায় রাত কাটিয়ে পরদিন পৌঁছুলাম লালপুরা। পূর্বের বন্দুকধারীরা বিদায় নিলেন, সঙ্গে যুক্ত হলেন অন্য তিনজন বন্দুকধারী। পথ অত্যন্ত দুর্গম। লালপুরায় আশ্রয় দিলেন একজন খান, সেখানকার শাসনকর্তা। বিদায়কালে আমাদের হাতে দিলেন এক পরিচয়পত্র। দুর্গম পথে আবার হাঁটা।

(ফ্ল্যাশব্যাক)

(দেখা যাবে পাহাড়ি রাস্তা, বরফ পড়ছে, প্রায় অন্ধকার। বন্দুকধারী সহ সুভাষ বোস, রহমৎ খাঁরা এগিয়ে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার হাঁটছে)

সুভাষ : রহমৎ আর কতদূর?

রহমৎ : আর কয়েক মাইল গেলেই কাবুল নদী পাব। নদী পার হলেই মোটরের রাস্তা। একটু বিশ্রাম নেবেন?

সুভাষ : না, যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে ততই মঙ্গল। চলো পা চালাও।

রহমৎ : (উপর থেকে তুষারপাত হবে) এই তুষারপাতে হাত পা কেটে যাচ্ছে, একটু আগুন জ্বালিয়ে গরম হয়ে আবার রওনা দিলে ভালো ছিল না?

সুভাষ : না না থামা চলবে না।

রহমৎ : কিন্তু আপনার শরীর তো দিচ্ছে না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

সুভাষ : তবুও চলো আগে নদীর ধারে পৌঁছুই।

সুভাষ : এখানে তো কোন নৌকা নাই। নদী পেরোব কিভাবে?

রহমৎ : নৌকা পাবো না। ভিস্তিওয়ালাদের চামড়ার থলির উপর মাছ ধরার জাল বিছিয়ে নৌকার মত বানিয়ে নদী পারাপার করা হয়। ওই আসছে।

সুভাষ : ওরেব্বাবা!! ভয়ানক, যেকোন সময় ডুবে যাবে তো!

রহমৎ : এছাড়া কোন বিকল্প নেই। এভাবেই জীবন বাজি রেখে নদী পার হতে হবে। (ভিস্তিওয়ালাদের নৌকা আসে। নৌকায় সুভাষ বোস ও রহমৎ উঠে বসে। অন্যান্য যাত্রী আছে। নৌকা চলতে শুরু করে। কিছুদূর গিয়ে ওরা নৌকা থেকে নেমে পড়ে)

রহমৎ : এবার এই গাছের নিচে বসে একটু বিশ্রাম করুন। আমি দেখছি কাবুল শহরের দিকের কোন গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। (সুভাষ বোস গাছের নিচে বসে পড়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে যায়) (তীব্র শীত, গাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু কোন গাড়ি থামছে না। হঠাৎ একটি গাড়ি থামে।) আমরা কাবুল যাব— নিয়ে বাবে ভাই?

ড্রাইভার : (নেপথ্যে) ভেতরে জায়গা নেই। গাড়ির উপরে যে বাক্স আছে তার উপর বসে যেতে হবে। এই শীতে পারবেন তো বাইরে বসে যেতে? বড় বড় গাছের ডালের ঝাপটায় গাড়ি থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে কিন্তু।

রহমৎ : যাই বিপদ থাকুক আমাদের যেতে হবে। (ঘুমন্ত সুভাষকে) মিস্টার জিয়াউদ্দিন উঠুন উঠুন গাড়ি পেয়েছি। (সুভাষ উঠে বসে বেরিয়ে যায়।)
(ফ্ল্যাশব্যাক শেষ) (পূর্বের অবস্থায়)

সুভাষ : তারপর তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে এক মালবাহি গাড়ির উপরে বসে কাবুল আসা। একদিকে ঠাণ্ডা অন্যদিকে কখন বড় বড় গাছের ডালের ঝাপটায় গাড়ি থেকে ছিঁটকে পড়ি সেই ভয়। তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় তল্লাশি। খান সাহেবের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বাঁচা। বোবা কালার অভিনয় করা। খুবই কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত সরাই থানায় আসা, কনস্টেবল এর পিছু লাগা - তাতো আপনি জানেনই। (হঠাৎ দরজার সামনে দেখা যাবে উত্তম চাঁদের ভাড়াটিয়া মিস্টার আর কে। সুভাষ বোসকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠবে)

মিঃ আর : সুভাষ বোস? ওমাগো (দৌঁড়) (সুভাষের আত্মগোপনের বৃথা চেষ্টা। ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি। উত্তম চাঁদ দৌঁড়ে বেরিয়ে যায় মিস্টার আর-এর পেছন পেছন)

সুভাষ : সর্বনাশ হয়ে গেল রহমৎ। দরজাটা লাগিয়ে যায়নি প্রাতঃরাশ দিয়ে। হাওয়ায় খুলে গেছে। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা ঠিক হবে না।

রহমৎ : একটু অপেক্ষা করি, দেখি উত্তমচাঁদবাবু ফিরে এসে কি বলেন
(আলো নিভে)
(কোন এক জায়গায় দেখা যাবে উত্তম চাঁদ ও মিস্টার আর কথা বলছে)

মিঃ আর : আমি আর আপনার বাড়িতে থাকবো না। আজই ছেড়ে চলে যাব।

উত্তম চাঁদ : কেন কি হয়েছে?

মিঃ আর : আপনি বাড়িতে কাকে আশ্রয় দিয়েছেন জানাজানি হলে কি হবে বুঝতে পারছেন? আমার পরিবার, ছেলে - মেয়ের প্রতি ভালোবাসা আছে। তাদেরকে রক্ষা করতেই আমাকে আপনার বাড়ি ত্যাগ করতে হচ্ছে। আমি যাচ্ছি।

উত্তম চাঁদ : (রাগান্বিত) মিস্টার আর, যদি জানাজানি হয় তবে বুঝবো আপনি জানিয়েছেন, তখন কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়বো না।

মিঃ আর : না না আমি কাউকে কিছু বলবো না, শুধু আমি আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

উত্তম চাঁদ : ঠিক আছে, আপনি অসুস্থ, তাই নোংরা বাড়িতে থাকবেন না, ভালো পরিবেশে চলে যাচ্ছেন। এই ভাবেই যেন সবাই জানতে পারে। মনে থাকে যেন।

মিঃ আর : ঠিক আছে, ঠিক আছে । (আলো নিভে। সুভাষবাবুর ঘরের আলো জ্বলে)

সুভাষ : উত্তমবাবু আপনি যাই বলুন আমাদের আবার গা ঢাকা দিতে হবে। মনে হচ্ছে বিপদ খুব কাছেই ঘন্টা নাড়ছে। (উত্তম চাঁদের প্রবেশ)

উত্তম চাঁদ : বিপদ হয়ে গেল সুভাষবাবু। কি করে যে দরজাটা খুলে গেল।

রহমৎ : তা এখন পরিস্থিতি কি?

উত্তম চাঁদ : মিঃ আর আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বলেছে কাউকে কিছু জানাবে না।

সুভাষ : তারপরও আমার মনে হয় আমাদের এখন এখান থেকে সরে পড়াই উচিত।

উত্তম চাঁদ : আপনি ঠিকই বলছেন। কিছুদিনের জন্য কেটে পড়ুন। আমি দোকানে গিয়ে আপনাদের বিকল্প থাকার ব্যবস্থা করছি। বিকেলের মধ্যেই সরে পড়তে হবে।

সুভাষ : তাই ভালো (আলো নেভে)

চতুর্থ দৃশ্য

(আলো জ্বললে দেখা যাবে উত্তম চাঁদের দোকান। দোকানে উত্তম চাঁদ বসা, সঙ্গে আছেন ষণ্ডা মার্কা এক লরির ড্রাইভার)

উত্তম চাঁদ : মানে তুমি বলতে চাইছো যে কোন লোককে যেকোনো সময় তুমি রাশিয়া পাঠাতে পারবে?

মিঃ এম : আলবাৎ পারব। আফগানিস্তানে যার একটা লড়ি থাকবে সে সব জায়গা চিনে। বুঝলেন, আমি এমন পথ জানি যে দিকে শুধুমাত্র আমু নদী পার করলেই রাশিয়ায় পৌঁছানো যায়। তবে ওই পথে সব চোরাকারবারিরা যাথায়াত করে। পথ প্রচণ্ড দুর্গম।

উত্তম চাঁদ : নদী পারাপারের জন্য সেতু আছে কি?

মিঃ এম : সেতু আছে, তবে পরিচয়পত্র থাকলেই সেতু দিয়ে যাওয়া যায়। নয়তো মস্কো দিয়ে অর্থাৎ ভিস্তিওয়ালাদের চামড়ার থলিতে হাওয়া ভরে তারপর জাল বিছিয়ে নদী পারাপার করে। তবে তা বিপজ্জনকও বটে। আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি যাবেন?

উত্তম চাঁদ : না না আমি যাব না। তবে আমার এক বন্ধু আসবেন, তার কাছে পরিচয়পত্র নাই। তুমি ওকে পার করিয়ে দিতে পারবে কি? যা পয়সা লাগে আমি দেব।

মিঃ এম : কোন চিন্তা করবেন না। উনাকে চলে আসতে বলুন। এই কাজে আমার মত তুখোর লোক আর পাবেন না। (এমন সময় রহমৎ প্রবেশ করে) তবে আপনার বন্ধু পার্শি বা পুস্ত জানে কি?

উত্তম চাঁদ : না , তিনি পুস্ত বা পার্শি জানে এমন কোন লোককে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেবেন।

মিঃ এম : তাহলেই হবে। তাকে আমি হাজী সাহেব বানিয়ে নেব, তারপর আমরা উজবেকের ছদ্মবেশে মাজার শরীফে তীর্থযাত্রীর মত যাব। তারপর সেখানে এক রাত থেকে পরদিন বুলক যাব। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, সে রাশিয়ানদের সঙ্গে চোরাকারবার করে বাকিটা সেই বন্ধু করে দেবে। তবে তার জন্য কিছু খরচ লাগবে।

উত্তম চাঁদ : কেমন খরচ? (এমন সময় উত্তম চাঁদের বন্ধু জীবন লাল প্রবেশ করে, জীবনলাল ভারতীয় আফগানদের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক মিস্টার এমকে দেখতে পায়) আরে জীবনলাল এসো এসো। কবে আসলে?

জীবনলাল : আজই, সোজা তোমার এখানেই আসলাম। প্রতিবারের মতো। বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করে, ভাবীর হাতের রান্না না খেয়ে ব্যবসার কাজ শুরু করি না তা তো ভাই জানোই। (সন্দিগ্ধভাবে মিস্টার এম-এর দিকে তাকায়, হাসি)।

উত্তম চাঁদ : তা বেশ বেশ (উত্তম চাঁদের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ) তা বলো তোমার কেমন খরচ লাগবে?

মিঃ এম : তেমন কিছু না, ওই বন্ধুর জন্য একজোড়া হাওয়াই চটি ও একটা লুঙ্গি নিয়ে গেলেই হবে। (এমন সময় রহমৎ প্রবেশ করে। জীবনলালের সন্দেহ আরো বাড়ে)

উত্তমচাঁদ : আসুন আসুন রহমৎজি (মিঃ এম-কে) ইনিই আমার বন্ধু যে পার্শি জানে। আপনি উনার সঙ্গে কথা বলুন, (টাকা বের করে দেয়) আর এই নিন বাকি যা লাগবে পরে দেব (মিঃ এম রহমতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে)

মিঃ এম : নমস্তে, তা আপনারা কবে যাবেন?

উত্তম চাঁদ : রহমৎজি আমি একটু আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলি, আপনারা বাইরে গিয়ে কথা বলুন।

রহমৎ : ঠিক আছে ঠিক আছে (রহমৎ ও মিস্টার এম-এর প্রস্থান)

জীবনলাল : কি ব্যাপার উত্তম? খুব সন্দেজনক লাগছে। এই প্রথম লোকটাকে আমি চিনি, সে এক নম্বর জুয়ারী, ওর সঙ্গে তোমার কি লেনাদেনা? (উত্তম চাঁদ জুতসই জবাব খোঁজে)

উত্তম চাঁদ : না মানে তেমন কিছু নয়।

জীবনলাল : লড়ি চালানোর নামে জুয়াড়ি। চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আর তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছো? দ্বিতীয় লোকটাকেও আমার ভালো ঠেকেনি।

উত্তম চাঁদ : না না বন্ধু, যেভাবে ভাবছো তেমন কিছু না।

জীবনলাল : তবে কি? আমাকে খুলে বলো, আমার কাছে বেশ সন্দেহজনক লাগছে।

উত্তম চাঁদ : আরে বললাম তো তুমি যা ভাবছো তা না।

জীবনলাল : তুমি আবার রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছো না তো? ভাবি জানে? ভারতের অবস্থা ভালো না। এর মধ্যে সুভাষ বোসের অন্তর্ধান নিয়ে ব্রিটিশরা চারিদিকে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছে। দেখো বাবু, কোনোভাবে জড়িয়ে গেছো না তো? আমাকে খুলে বলো।

উত্তম চাঁদ : (বিরক্ত) আঃ বললাম না তেমন কিছু না, তুমি ভুল বুঝছো।

জীবনলাল : (উত্তেজিত) তবে জুয়াড়ি, চোরাকারবারীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক বল? আমি সব ভাবিকে জানাব।

উত্তম চাঁদ : আসলে কি জানো জীবনলাল, তোমার ভাবি খুব অসুস্থ। এই দুই দিন আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে। আমি নিজে রান্ন বান্না করছি, বাজার থেকে কিনে কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছি। এবার তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারছি না।

জীবনলাল : মিথ্যে কথা। আমি সব বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ।

উত্তম চাঁদ : তুমি ভুল বুঝছো, সব কথা তোমাকে পরে বলবো (হাজী সাহেব প্রবেশ করে)

জীবনলাল : নমস্তে হাজী সাহেব (প্রস্থান)

হাজী : নমস্তে

উত্তম চাঁদ : বসুন হাজী সাহেব।

হাজী : (খুব সন্তর্পনে) বলুন কি খবর।

উত্তম চাঁদ : আপাতত অন্য একটা সরাইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি কয়েকদিনের জন্য।

হাজী : সেনারা কারোনির থেকে কোন খবর এসেছে কি?

উত্তম চাঁদ : না, এখনো আসেনি, বোসবাবু তাই একটা চিঠি দিয়েছেন (চিঠি বের করে পড়ে) " রহমত খান দুবার হের টমাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। আশা করি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছেন। সত্ত্বর খবর দিতে পারলে কৃতজ্ঞ থাকব। ভবিষ্যতে যদি আপনি আমাকে কোন খবর দিতে চাহেন, তাহলে আমার বন্ধুর দোকানে পাঠাইয়া দিবেন। প্রত্যেকদিন হের টমাসের কাছে লোক পাঠানোটা ভালো মনে করি না।

হাজী : হের টমাস মানে ওই জার্মান রেডিও বিক্রেতা?

উত্তম চাঁদ : উনি প্রকৃতপক্ষে একজন গুপ্তচর। এদিকে রহমৎ খাঁ খবর দিল সরাইয়ের

খাওয়া খেয়ে বোস বাবু প্রচণ্ড অসুস্থ। আমাশয় হয়েছে। ডাক্তার দেখানোর উপায় নেই। কি করি বলুন তো হাজী সাহেব?

হাজী : এক কাজ করো তুমি আবার এখন বোস বাবুদের তোমার বাড়িতে নিয়ে আসো। একমাত্র যত্নআত্তি দ্বারাই উনাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

উত্তম চাঁদ : কিন্তু যদি আমার বাড়ি সার্চ হয়?

হাজী : এই কয়দিন যখন হয়নি মনে হয় মিস্টার আর কাউকে কথাটা জানায়নি। আর আমার মনে হয় সে কাউকে বলবে না, কারণ সে খুব ভয় পেয়েছে। লোক জানাজানি হলে সে যে নিজেও এই ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে সেই বিষয়টা সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। বাড়িতে তোমার স্ত্রী আছে, সেবা শুশ্রূষা করে বোস বাবুকে সারিয়ে তুলতে পারবেন। আর একটু সুস্থ হলে বোস বাবুকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসো বিকেল বেলা। তখন কর্মচারীরা চলে যায়, বলবে আমি উনাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করেছি। উনার সঙ্গে কথা বলে বাকি সব ঠিক করব।

উত্তম চাঁদ : ঠিক আছে।

হাজী : চলো এবার ওঠা যাক। আর হ্যাঁ জীবন লালকে কিন্তু কিছু বলবে না। লোকটা হালকা মানসিকতার, একটা বোকা। তোমাকে উপকার করতে গিয়ে সব পণ্ড করে দেবে। (দুজনেই উঠে পড়ে, উত্তম চাঁদ দোকান বন্ধ করে) (আলো নিভে)

পঞ্চম দৃশ্য

(উত্তম চাঁদের ঘর। লক্ষ্মী উৎকণ্ঠিত। ঘর গুছাচ্ছে, কারোর অপেক্ষায় বাইরে তাকাচ্ছে। উত্তম চাঁদের প্রবেশ)

লক্ষ্মী : কি গো? কি হলো? বোসবাবুর খবর কি? মিস্টার আর কাউকে বলেনি তো? বোস বাবুদের যেখানে পাঠিয়েছ সেখানে সুরক্ষিত তো? ধরা পড়ে যাবে না তো? আমার দেশ স্বাধীন হবে তো? বলো না বলো?

উত্তম চাঁদ : আহা, এত উতলা হয়ো না, সব ঠিক আছে, ধরা পড়বে না। যে বোস বাবুর সঙ্গে ভারতের হাজার হাজার লক্ষ্মীদের শুভেচ্ছা আছে উনি কি ধরা পড়তে পারেন? তোমার সেবা যত্নের কথা তো বোস বাবু বার বার বলেছেন।
(কিছুটা রোমান্টিক হবে)

লক্ষ্মী : আহা ছাড়ো তো, এই কদিন আমি সারাদিন রাত উৎকণ্ঠায় আছি কি হয়, কি হয়, আর তুমি এসেছ রোমান্স করতে? আচ্ছা বলতো দরজাটা কে খুলেছিল? আমি তো সবসময় বোস বাবুর ঘরের দরজা বন্ধই রাখি, শুধু বন্ধ না, বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখি, তাহলে?

উত্তম চাঁদ : আমার মনে হয় খাবারের থালাগুলো এনে অমরনাথ বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

যাই হোক তার জন্য অমরনাথকে বকাবকি করো না, ও সব বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করছে কিছু একটা।

লক্ষ্মী : না না বকব কেন? ওকে আরো বেশি আদর যত্ন করছি, যেন আমাদের উপর ওর কোনো রাগ না হয়। যেন মুখ বুজে থাকে। তা তিন দিন তো হয়ে গেল, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা যখন ঘটেনি তবে মনে হয় মিস্টার আর মুখ বন্ধই রেখেছে। আর ওর স্ত্রীতো নিজে এসেই দেখে গেছে আমাদের বাড়িতে অপরিচিত কেউ নেই। তাই বলছিলাম কি বোস বাবুদের আবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসলে হয় না? আমি উনাকে সেবা যত্ন করার সুযোগ পাবো।

উত্তম চাঁদ : (কপট গাম্ভীর্য) দেখো লক্ষ্মী মনে রেখো তুমি কিন্তু একজনের বিবাহিত স্ত্রী, সেই অবস্থায় অন্য পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হওয়াটা কিন্তু মোটেই ঠিক হচ্ছে না।

লক্ষ্মী : (উত্তম চাঁদের কৌতুক বুঝতে পেরে, কপট অভিমান) তোমার মতো পুরুষের স্ত্রী হয়েছি আমার আগের জন্মের পূণ্যের সরি, পাপের ফলে। সুভাষ বাবুর মতো মানুষের প্রতি অনুরাগ থাকবে না তো কি তোমার প্রতি থাকবে - কি শৌর্য, কি বীর্য দেখলেই পায়ে ধরে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। লোকটা মানুষ না গো দেবতা।

উত্তম চাঁদ : প্রশংসা শেষ হয়েছে? এবার খাবার দাবার দেবে? কাল বোস বাবুদের আবার আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব।

লক্ষ্মী : তাই? খুব ভালো হবে। (আনন্দিত)

(আলো নিভে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(উত্তম চাঁদের বাড়ি। সুভাষ বোসের পূর্বের ঘর। সুভাষ বোস খুবই দুর্বল, লক্ষ্মী সরবৎ দেয়)

লক্ষ্মী : নিন এই শরবৎটা খেয়ে নিন।

সুভাষ : (হাসি) লক্ষ্মী আমি তো এখন সুস্থই আছি, আর কত যত্ন করবে?

লক্ষ্মী : মোটেই সুস্থ নন, পেটের সমস্যা না থাকলেও দুর্বলতা যথেষ্টই আছে। একটু বেশি বেশি করে খান তবেই এই দুর্বলতা কেটে যাবে।

(রহমৎ ও উত্তম চাঁদ প্রবেশ করে)

উত্তম চাঁদ : আপনার জন্য ভালো খবর আছে।

সুভাষ : শুনবো, তবে তার আগে লক্ষ্মীর সঙ্গে একটু কথা বলি। ও তো মাতৃস্বরূপা। আমার সেবা যত্নই করে যাচ্ছে। আমার জন্য কত কষ্ট করছে।

লক্ষ্মী : আপনার জন্য নয়, আমি আমার দেশমাতৃকার এক বীর সন্তানকে সেবা শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির সেবা করছি।

রহমৎ : আরে বাহ্, ভাবি তো খুব সুন্দর বললেন (সবাই হাসি)

সুভাষ : আচ্ছা লক্ষ্মী, তোমার কাছে আমার একটা কথা জানার ছিল। (সবাই উৎকণ্ঠিত)

লক্ষ্মী : বলুন কি বলবেন?

সুভাষ : আমি তো ঘরে বন্দি, তোমরাই দরজায় তালা লাগিয়ে রাখো। কিন্তু প্রায়ই তোমাকে বিভিন্ন সময় জোরে জোরে গান গাইতে শুনি, তাও আবার এক লাইন বা দু লাইন, কোন কোন সময় অর্ধেক লাইন- ব্যাপারটা কি? কোন সংকেত নয় তো?

উত্তম চাঁদ : (রাগান্বিত) কি লক্ষ্মী বোসবাবু যা বলছেন? তা কি ঠিক? কেন এমন করো?

লক্ষ্মী : (হেসে) ঠিকই বলেছেন বোস বাবু, সংকেতই।

রহমৎ : কি? এসব কি হচ্ছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। (রহমত ও উত্তম চাঁদ উত্তেজিত, সুভাষ মিট মিট হাসছে)

লক্ষ্মী : আসলে কি জানেন, আমি প্রায় সারাদিন এই ঘরের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করি। বোসবাবুর তো কাশি ছিল, তাই যখনই উনি কাশি দিতে শুরু করতেন তখন আমি জোরে জোরে গান গাইতে শুরু করতাম, যেন আমাদের পাশের বাড়ির কেউ আন্দাজ না করতে পারে যে এখানে কেউ লুকিয়ে আছে। কাশি থেমে গেলে গানও থামিয়ে দিতাম। (সবাই হেসে ওঠে)

রহমৎ : বাহ্ ভাবিজি! দারুন বুদ্ধি করেছেন তো! (লক্ষ্মীর প্রস্থান)

সুভাষ : খুব ভালো, এবার উত্তম চাঁদবাবু বলুন কি ভালো খবর নিয়ে এসেছেন?

উত্তম চাঁদ : আপনার চিঠি হের টমাস মারফত সেনারা কারোনির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রহমৎ : কিন্তু ইতালীয় দূতাবাসই বা কতদূর কি করবে বুঝতে পারছি না। হচ্ছে, হবে করে চলছে। আর এদিকে দিন চলে যাচ্ছে।

উত্তম চাঁদ : তাই আমি চোরাই পথে আপনাকে রাশিয়া পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি যদি আপনি সম্মতি দেন তবে তা চূড়ান্ত করব। আপনাকে সে রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে মস্কো যাবার দায়িত্ব আপনার।

রহমৎ : তবে সে পথ খুবই বিপদ সংকুল। আমিও থাকব না, আপনি পারবেন কি? (লক্ষ্মী খাবার নিয়ে প্রবেশ করে)

সুভাষ : এইমাত্র শরবত খেলাম, আবার এখন কি নিয়ে এসেছ?

লক্ষ্মী : খেয়ে নিন, আপনার শরীর খুবই দুর্বল না খেলে বল ফিরে পাবেন না।

উত্তম চাঁদ : নিন খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

লক্ষ্মী : গতকাল মিস্টার আর-এর স্ত্রী এসেছিল, আমি উনাকে আমাদের বাড়ির সবগুলো ঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আমাদের বাড়িতে যে আর কোন অপরিচিত লোক থাকছেন না, তা উনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন তাই আমার মনে হয় এখন আর আমাদের বাড়িতে থাকলে ভয় নেই। তা বিকেলে কি হাজী সাহেবের

বাড়ি যাচ্ছেন? শুনলাম উনি নিমন্ত্রণ করেছেন।

সুভাষ : হ্যাঁ, যাবো ভাবছি, উনি বাইরে থেকে আমাকে সহায্য করার চেষ্টা করছেন, না গেলে খারাপ পাবেন। আর শুনলাম এনার স্ত্রী জার্মান এবং বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই ভাবছি দেখি কথা বলে জার্মান গেলে উনার থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা।

লক্ষ্মী : তা রাতে আমাদের এখানে খাবেন না হাজী সাহেবের ওখান থেকে খেয়ে আসবেন?

সুভাষ : ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তো সব সময় পূর্ণই থাকে (সবাই হেসে ওঠে, লক্ষ্মীর প্রস্থান)

উত্তম চাঁদ : তা বলুন আপনার সম্মতি আছে কি? আমি চূড়ান্ত কথা বলব? তবে নদী পার করে রাশিয়ায় ঢোকার পরও কিন্তু চোরাকারবারী হিসেবে জেলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

সুভাষ : এখানেও তো জেলে বন্দি আছি উত্তমবাবু! এর থেকে খারাপ আর কি হবে? তবে আমি ভাবছি অন্য কথা, (সবাই ফ্রিজ- অন্য কোন জোনে ভিস্তিওয়ালাদের নৌকা দিয়ে নদী পার হবার বিপজ্জনক দৃশ্য দৃশ্যায়িত হবে দৃশ্য শেষে আলো আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে) উফ্ কি বিপজ্জনক!

রহমত : কিন্তু সেনারা কারোনি থেকেও তো কোনো খবর পাচ্ছি না । পেশোয়ারের বন্ধুদের থেকেও না। এই অবস্থায় কি করা? এভাবে দিনের পর দিন বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে?

সুভাষ : তা ঠিক, না উত্তম চাঁদবাবু, আপনি চূড়ান্ত করুন, আমার বিশ্বাস রাশিয়ানরা প্রফেসর জিয়াউদ্দিনকে জেলে বন্দি করলেও সুভাষ বোস পরিচয় পেলে মস্কো পাঠানোর ব্যবস্থা করবে।

উত্তম চাঁদ : ঠিক আছে, আমি কথা বলব। আপনি তৈরি হয়ে নিন, হাজী সাহেব গাড়ি পাঠাবেন।

সুভাষ : মানুষ পোষাক-আশাক নিয়ে তৈরি হয়, আর আমি নকল চুল দাড়ি লাগিয়ে তৈরি হচ্ছি (সবাই হাসে) (আলো নেভে)

সপ্তম দৃশ্য

(উত্তম চাঁদের দোকান, অমরনাথ বসা, সেনারা কারির প্রবেশ)

সেনারা : কি হে ছোকরা তোমার মালিক কোথায়?

অমরনাথ : আপনি বসুন, এক্ষুনি হয়তো চলে আসবে।(সেনারা কারোনি বসে, কোন ক্রেতা আসবে, কোন কিছু কিনে দাম মিটিয়ে চলে যাবে, উত্তম চাঁদের প্রবেশ)

উত্তম চাঁদ : নমস্কার কোন খবর আছে কি?

সেনারা : না তেমন কোন ইতিবাচক খবর নেই।

উত্তম চাঁদ : আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের পর তিন সপ্তাহ কেটে গেল। মস্কো অবস্থিত ইতালীয় দূত ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করেছেন, সেই খবর পাবার পরও দু সপ্তাহ কেটে গেল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বোস বাবু বসে থাকতে পারেন না।

সেনারা : তা আমি বুঝতে পারছি, সম্ভবত ছাড়পত্র নিয়ে মস্কোতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। বোসবাবু যেন রাশিয়ার মধ্য দিয়ে বার্লিন বা রোমে যাবার অনুমতি পান সে চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু রুশ সরকার সেই সুবিধা দিতে প্রস্তুত নন। কি করব বুঝতে পারছি না। আমি চেষ্টা করছি কোন খবর পেলেই আপনাকে জানাবো। আমি আসছি, নমস্কার। (আলোর স্থানান্তর হবে - দেখা যাবে হাজী সাহেব, উনার জার্মান স্ত্রী, সুভাষ বোস কথা বলছে)

হাজী : আপনি রাশিয়ার উপর এতটা ভরসা করার কারণ জানতে পারি কি?

সুভাষ : ইংরেজরা কিন্তু রাশিয়ার বন্ধু নয়, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাশিয়ানরা আমাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে দেবে।

স্ত্রী : আপনি কি মনে করেন শুধু প্রচার কার্যেই ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব?

সুভাষ : আমার বিশ্বাস সর্বাত্মক বিপ্লবের সাহায্যে ইংরেজদের তাড়িয়ে না দিলে তারা সহজে ভারত ছাড়বে না। ভারতকে দুমড়ে মোচড়ে, ভেঙে শেষ করে দেবে। তারা কখনো কোন দেশকে শান্তভাবে স্বাধীনতা দেয় নাই, আয়ারল্যাণ্ডের কথাই ধরুন না, স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও সাতশত বছর পর যখন স্বাধীনতা দিল তখনও আয়ারল্যাণ্ডের কিছু ভূমি নিজের দখলে রেখে দিলো। সুতরাং ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি না।

হাজী : আয়ারল্যাণ্ডের মতো বিপ্লব কি ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে সম্ভব?

সুভাষ : না, বিদেশি শক্তির সহায়তা ছাড়া এমন বিপ্লব সম্ভব নয়। এই যে রুশ বিপ্লব তার পেছনেও তো ছিল জার্মানরা। আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করেছে ফরাসিদের সাহায্যে, তাহলে আমাদের বিদেশি শক্তির সাহায্য নিতে দোষ কোথায়?

স্ত্রী : রাশিয়ানরা আপনাকে সাহায্য করবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

সুভাষ : আমি চেষ্টা করব রাশিয়ানদের সম্মতি আদায়ের। আর যদি ব্যর্থ হই তাহলেও আমি আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু ভারতে থাকলে আমাকে Government কারাগারে বন্দী করে রাখত। কোন আন্দোলন করতে পারতাম না। তাই কারাগারে বন্দি থেকে পচে মরার চাইতে, পলায়ন করে দেশের বাইরে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই আমি সমীচীন মনে করলাম।

হাজী : মস্কো যেতে না পারলে কি করবেন?

সুভাষ : তাহলে রোম বা বার্লিন যাবার চেষ্টা করব। তবুও আমি মস্কো যাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব কারণ আজকের দিনে একমাত্র রাশিয়াই ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে সক্ষম। আমি হয়তো আফগান চোরাকারবারীদের সাহায্য নিয়ে চোরাই পথে মস্কো যাবার চেষ্টা করব। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। আর কিছুদিনের মধ্যে ইতালীয় দূতাবাস থেকে খবর না পেলে সেই সিদ্ধান্ত নেব।

স্ত্রী : হঠকারী সিদ্ধান্ত হবে নাতো?

সুভাষ : ভারতকে স্বাধীন করতে হলে আমাকে সশস্ত্র বিপ্লব করতেই হবে। নয়তো আগামী পঞ্চাশ বছরেও ভারত স্বাধীন হবে না। তাই আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।

হাজী : স্বাধীনতা পেলেই কি আপনি খুশি হবেন?

স্ত্রী : ভারতবর্ষ তো ধর্মগত বিভেদ ও রাজনৈতিক ব্যধিতে আক্রান্ত এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

সুভাষ : স্বাধীনতার পর কুড়ি বছর পর্যন্ত বজ্রের মতো কঠোর কোন ডিক্টেটর যদি ভারতবর্ষ শাসন করে তবে এই বিভেদ দূর হবে। অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদলে ভারত শাসন করলে ভবিষ্যতে বিপদ হবে। কোন নির্মম ডিক্টেটরই সঠিক পথে চালিত করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। ভারতবর্ষের দরকার কামাল পাশার মতো ডিক্টেটরের।

স্ত্রী : আপনি যদি বার্লিনে যান তবে আমাকে বলবেন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব। (হন্তদন্ত হয়ে রহমত খান ও উত্তম চাঁদের প্রবেশ, হাতে চিঠি)

রহমত : আপনার জন্য সুখবর। এই নিন চিঠি।

সুভাষ : বল কি লিখা আছে।

উত্তম চাঁদ : আপনাকে ১৮ই মার্চ এখান থেকে রওনা দিতে হবে।

রহমত : আপনি বার্লিন যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে দুজন জার্মান ও একজন ইতালীয়ান দূত থাকবে। আপনার ছদ্মনাম হবে 'তারাতাইন'।

স্ত্রী : জার্মান কারা কারা যাবেন নাম বলতে পারেন কি?

উত্তম চাঁদ : একজনের নাম ডা: ওয়েলার

স্ত্রী : ডা: ওয়েলার অত্যন্ত চালাক লোক। আমার মনে হয় মিস্টার বোস আপনাকে জার্মানরা মস্কোর হাতে তুলে দেবেন না। জার্মানদের সাহায্য আপনাকে নিতে হবে।

রহমৎ : ১৬ মার্চ সেনারা কারোনির বাড়িতে আপনাকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

২০ মার্চ আপনি আফগান সীমান্ত পার করে জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

সুভাষ : যাক সবার প্রচেষ্টা সার্থক হলো।
(আলো নিভে) (উত্তম চাঁদের ঘরের আলো জ্বলে। দেখা যাবে উত্তম চাঁদ ও লক্ষ্মীকে)

লক্ষ্মী : তুমি সত্যি বলছো?

উত্তম চাঁদ : আগামীকাল বোসবাবু চলে যাচ্ছেন।

লক্ষ্মী : তার মানে বোসবাবু সফল, আমার দেশ স্বাধীন হচ্ছে। (আনন্দ উচ্ছ্বাস) আর ইংরেজদের নির্মম অত্যাচার সইতে হবে না। ধনী-দরিদ্র সব সমান হবে। তোমাকে আর আফগান প্রদেশে থাকতে হবে না। আমরা আবার দেশে ফিরতে পারব। আমার গ্রাম, আমার ছোটবেলার সব স্মৃতি, আমার পরিচিত বসন্তের গন্ধ, পুকুর পাড়ের হাওয়া সব ফিরে পাব। কি মজা হবে না গো! (হঠাৎ বিষন্ন)

উত্তম চাঁদ : কি হলো, হঠাৎ যে একেবারে হাওয়া বেরিয়ে গেল?

লক্ষ্মী : (কান্না)

উত্তম চাঁদ : কি হলো কাঁদছো কেন?

লক্ষ্মী : আর কোনদিন মনে হয় বোসবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। দেশ স্বাধীন করে তো উনি আমাদের রাষ্ট্রনায়ক হয়েই থাকবেন, আমার মত লক্ষ্মী কি আর কোনদিন সুযোগ পাবো উনাকে সেবা করার?

উত্তম চাঁদ : (গম্ভীর) তুমি ঠিক বলছো, আমরা পরম সৌভাগ্যবান যে এমন একজন দেবপ্রতীম লোকের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি।

লক্ষ্মী : এই উনাকে জিজ্ঞাসা করো না উনি কি খেতে ভালোবাসেন? আমি আজ রাতে উনাকে উনার পছন্দের খাবার খাওয়াতে চাই। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, সব বারই এক কথা। " যা হয় একটা হলেই হবে" তুমি একবার জিজ্ঞেস করো, আর যাবার সময় একটু খাবার দিয়ে দেব কিনা?

উত্তম চাঁদ : ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব। এখন চলো শুয়ে পড়ি। কাল সকালে বোসবাবুর সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে হবে।

লক্ষ্মী : উনার শরীরটাও তো ভালো নেই, রহমৎ খাঁ-ও সঙ্গে থাকবে না, উনি একা একা কিভাবে পারবেন? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

উত্তম চাঁদ : একটা কথা বলি আজ তোমাকে, ও রহমৎ খাঁ নয়, মুসলমানও নয়। ওর আসল নাম ভগতরাম। হিন্দু, তোমাকে এতদিন আমি বলিনি ও ছদ্মবেশে বোসবাবুর সঙ্গে আছেন।

লক্ষ্মী : তাই? আমি কল্পনাও করতে পারছি না দেশমাতৃকার জন্য ওরা কি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছেন। আর আমরা?

উত্তম চাঁদ : আমরাও কিন্তু সামান্য হলেও আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নিলাম বোসবাবুর মতো ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়ে। চলো শুয়ে পড়ো। কাল তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, প্রার্থনা করো বোসবাবুর স্বপ্ন যেন সত্যি হয়। আমরা যেন আমাদের মাতৃভূমিকে ফিরে পাই মায়ের মত করেই।

(আলো নিভে)

শেষ দৃশ্য

(সবাই দাঁড়ানো, উত্তম চাঁদ বোসবাবুকে প্রণাম করে বিদায়ের দৃশ্য নান্দনিকতার মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়িত হবে। রেডিওতে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে)

সংবাদ : বিলম্বে পাওয়া সংবাদে জানা গেছে ভারতের প্রতিপত্তিশালী নেতা এবং ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু যিনি গত ১৫ ই জানুয়ারি রহস্যজনকভাবে নিজ বাড়ি থেকে অন্তর্ধান হয়েছিলেন, তিনি গত ২৮শে মার্চ নির্বিঘ্নে বার্লিন পৌঁছে গেছেন।

লেখক: **পার্থ মজুমদার, ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও নাটককার।**
Writer: **Partha Majumder, distinguished actor, director & playwright of Tripura.**

সৈয়দ শামসুল হক রচিত "কবি" গল্প অবলম্বনে

জন্ম ভিটির গান

■ শুভাশিস চৌধুরী

চরিত্রলিপি

১) হামিদ (২০-২১), (২) কামাল (২২-২৫), (৩) শামসু (২২-২৫),

৪) রমজান (৫৭-৫৮), (৫) ফতেমা (স্ত্রী), (৬) মুন্সী (৫৫-৫৭), (৭) জরিনা (স্ত্রী), (৮) নাদীম (ছেলে), (৯) খুশবু (নাতনি), (১০) তালুকদার (৫৭-৫৮),

(১১) মাঝি, গ্রামবাসী

(দৃশ্যপট/সময় রাত। লোকগানের সুর, সেই সঙ্গে দেখা যাবে দুটি লোকের ছায়া, সাইকেল হাঁটিয়ে চলছে গাঁয়ের পথ ধরে। ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করে। আলো জ্বললে দেখা যাবে গ্রামীণ বনেদী বাড়ি। যার দাওয়ায় বসে বাড়ির মালিক রমজান তামাক খাচ্ছেন গড়গড়া সহযোগে আর বিবি ফতেমা তালপাতার পাখায় হাওয়া দিচ্ছেন। হ্যারিকেনের আলো ধীরে ধীরে মঞ্চে ছড়িয়ে পরলে শামসুকে দেখা যাবে। একটু দূরে বাড়িতে ঢোকার মূল দরজা।)

শামসু : চাচা! ও চাচা! চাচী! ফতেমা চাচী! বাড়িতে কেউ নাই নাকি।

ফতেমা : শামসু! আইও, আইও। অহন আইতাছ না দেইখা আমরা আর চিন্তাই অস্থির! ঘুমামু কি? এ ত আর তুমরার ঢাকা শহর না, যে বিজলীবাতির আলোয় সৈন্ধ্যা ঐলেঐ ঝলমল করব। আরে দেখনা! তুমার শামসু আইছে।

রমজান : ওরে বাবা! বেশ বড় বড় লাগদাছে। তা এত দেরী? কি রে হামিদ তুই না সাইকেল দিয়া লৈয়া আইতে গেলি ইশ্টিশান থিক্যা? তা ও এতক্ষণ লাগল?

হামিদ : কি আর কমু, আওনের সময় সাইকেলের চাক্কাডা গেল পাংচার ঐয়া। নৈলে কি আর ইশ্টিশান থিক্যা আইতে এতক্ষণ লাগে? লিক মারুম যে হেই দুহান অ বন্ধ। আর কিতা দুজনের লগে সাইকেল ধরলে তিনজনে আড্ডা মারলাম।

রমজান : কেরে? বসিরের দুহান খোলা আছল না?

হামিদ : কতা শুইন্য চাচী। বসীরচাচার দুহান খুলা থাকলে কি আর আমি সখ কৈরা আডি। তহন রাইত বাজে সাতটা।

রমজান : ও ইডা অ ত কতা।

ফতেমা : তৈলে ত শামসুর বড় কষ্ট ঐল কও। কতডা রাস্তা আডন লগল। তুমরা ঐলা গিয়া শহরের মানুষ। এত কি আর আইট্যা ঐব্যাস আছে।

শামসু : আরে না না, ঐরকম হাঁটাহাঁটির অভ্যাস আমার আছে। তাছাড়া এত আর ঢাকা শহরের গেজ্জাম রাস্তা না। ভালৈ লাগজে হাঁটতে। কত কথা হৈল, দেখা হৈল মানুষজন, ঘরবাড়ি। চেনা মানুষরেঐ নতুন কৈরা চিনতে হয়।

হামিদ : এইবার তৈলে আমি যাই চাচী। তুমরার অতীত তুমরা সামলাও। যাই শামসুদা, যাই গো চাচা।

রমজান : আয় গিয়া। কাইল আইয়া শামসুরে ইট্যু সঙ্গ দিস। তর সাইকেলের চাক্কা শুধু যাতে দেহনশুভা না হয়।

হামিদ : চাক্কার আর দুষ কিতা? পথের মৈধ্যে ত হুদ্দা হাঙ্গের চাক্কা। সরকার যে কবে দুইলা ইট বিছাইচল ইডি ত কবৈ মাইন্সের বাইৎ গেছে। পৈড়া রৈছে হুদা সুকড়ী। ইতার লগে কি চাক্কায় পারে?

রমজান : তার মানে চালানেত্যে ঠেলন বেশি!

শামসু : হিসাব করলে ঐরকমৈ দাড়ায়। (সবাই হাসে)

ফতিমা : যারে হামিদ বাইৎ যা। দিদি জানি তর লাইগ্যা পথ চাইতাছে। কাইল সক্কাল সক্কাল আইছ। চাচা ত কৈয়াঐ দিছে । (হামিদ চলে যায়)

রমজান : বুজলানি শামসু রাইত ঐতাছে দেইখ্যা আবদুর এতক্ষণ বৈয়া থাইক্যা গেল গো। তুমারে বড় বালা পায় লুকটা।

শামসু : আবদুর! কোন আবদুর?

রমজান : তাইনে ঐল গিয়া একজন কবি মানুষ। নাম আবদুর রব মুন্সী। তুমার লগে দেখা করতে চাইছিল। তাইন শুনছে তুমিও একজন কবি। তাই মনের কতা কৈতে চায়।

শামসু : আমার সঙ্গে?

ফতেমা : হ তুমার লগে। কাইল আবার আইব। অহন যাও হাত মুখ ধুইয়া জামা কাপড় ছাড়। তুমি আইয়, হগ্গলে একলগে বৈয়া খামু।

শামসু : কাইল তবে কবি আসতে পারেন?

রমজান : তাইনের কতা কি কমু। মর্জি। কাইল আবার কুন আসর গিয়া বৈয়া যাইব গা। মন থাকলে এনা।

ফতেমা : থাক ইতা কতা। অহন যাওছেন দেহি।

— দৃশ্যান্তর —

সকাল হতেই দেখা যায় ঘরের দাওয়ায় বসে শামসু একটা বই হাতে। কোন কবিতা পড়ছে। এমন সময় কামাল নামে একটি ছেলে ডাকতে ডাকতে মঞ্চে আসে।

কামাল : তুমি যে আইছ হুনছি। কিন্তু একবার যে আইয়া দেহা করুম তার উপায় নাই।

শামসু : হ্যাঁ গো কামাল। আমিও আইসা তোর তলব করছি চাচীর কাছে। শুনলাম তুই নাকি ঢাকায় থাইকা কম্পাউণ্ডারীর কোর্স করতে আচঅ। তবে তাও জানাইছে যে তুই এখন গেরামেই আছস।

কামাল : ঠিকই শুনছ। ঐ কম্পাউণ্ডারীর কোর্সই করতাছি। শেষের পথে। আর ধর না মাস তিনেক। কত্তোদিন পরে আইছৎ। তরে পাইলে মনডা উইড়া যায়গা। অহন ত তুই শহরেরই মানুষ। আইছচ যহন চল ঘুইরা আইগা।

শামসু : কোন দিকে? চল। আমার তো বেড়াইতেই আসা।

কামাল : যাইবি বউমারীর বিলের দিকে? ঘাটে ডিঙ্গি লাগাইন্যা আছে।

শামসু : তুই সাথে থাকেলে আর চিন্তা কি? তবুও তারারে একটু বৈলা যাই। ও চাচী! চাচী!

ফতেমা : ও বন্ধু আইয়া হাজির। রাইতে ঘুম ঐছে?

শামসু : চাচী? কৈতে আছিলাম তুমি যদি চাচারে কও তৈলে আমি একটু হের লগে ঘুইরা আই বউমারীর ঘাট থিকা।

ফতেমা : যাক্ গেরামের কতা বুলছ না শুইন্যা বালৈ লাগদাছে। যাও যাও। তবে দুইজনে দুইমুঠ খাইয়া যাইঅ। কৈতেই কয় সক্কাইলার মুডি হারাদিনের খুডি।

কামাল : আমি খাইয়ালৈয়াঐ বাইরৈছি। তুমি হেরেঐ দও। যারে শামু দুইলা খাইয়া আয়।

শামসু : ঠিক আছে। তুই তাইলে বয়। ঐ তো চাচা আইসা পরছে তুই কথা ক। আমি তৈয়ার হৈয়া আসি।

রমজান : তা কামাল। বন্ধুর কবর লৈতেই আইয়ন না কিতা। আমরার খবর টবরঐ লৈয়।

কামাল : কি যে কন চাচা। তা তবিয়ৎ ঠিক আছে ত। নৈলে অবশ্যই খবর যাইত।

রমজান : আমরার তবিয়ৎ ঠিক না থাকলে চলব? তা তুমার ডাক্তারী চলছে কেমুন?

কামাল : কি যে লজ্জার কথা কন। আমি আবার ডাক্তার ঐলাম কবেত্তে? শিকতাছি কম্পাউণ্ডারী, ইডাঅ অহন শেষ ঐছে না। মাইনযে আমারে বালবাইস্যা, ডাক্তর আতের কাছে পায় না দেইখ্যা ডাহে। ঐ আর কি।

রমজান : যাঐ কউ, তুমারে গেরামের মানুষ ডাক্তারঐ মানে। তবে তুমার ওষুদে কাম অয়। হেইবার যে আমারে বেদনার ওষুদডা দিছলা, অক্করে যাদুর মত কাম করছে।

কামাল : (হাসতে হাসতে) ইডা কিতা কন চাচা! আমনেরা ঐলেন গিয়া মুরুব্বি মানুষ। বুজক্কর লুক ঐয়া এমুন কতা কৈলে হাসিঐ উডে। আরে চাচা বছর বছর কত নেতা মন্ত্রী এই গেরামে আয়ে যায়, হেরারে দৈরা গেরামে হাসপাতাল না ওয়ুক একটা ডিস্‌পেন্সারী খুললে অ তো মাইনষের কাম লাগে।

রমজান : আরে আমরা কি আর হেই দরের ন্যাতা আমরা ঐলাম গিয়া নাতির গরের ফন্তির মত। খালি ফাই ফরমাইস খাডি। ইতা কইয়া লাব নাই।

কামাল : তবু কতাডা মাতাৎ রাইখ্যেন। সুযোগ পাইলে কৈয়েন। আমরার কাছে ত আফনে ঐ নেতা মন্ত্রী সব। হাসপাতাল ঐলে মাইনষের যেমুন সুবিদা অয় আমরারঅ কাজ কম্মের ব্যবস্থা অয়।

রমজান : হ ইডা অ একটা কতা, কাজ কম্মের ব্যবস্থা।

শামসু : চল রে কামাল। খাওয়া শেষ। চাচীঅ নিশ্চিন্ত।

রমজান : তা, কৈ যাইতাচ শুনি।

কামাল : কৈ আর যামু, দুইজনে মিল্যা বউমারীর দিগে ইট্যু ঘুইরা আই। শামসু ত ঐ সব দেকতেই গেরামে আইয়ে। যার যা কাম। একদিন দেইক্য তুমরার শামসু লেইখ্যা আমরার এই গেরামেরে সারা পৃথিবীর মাইনষেরে চিনাইব।

রমজান : হেই ত দেকতাছি। এর মদ্যেই শুনছি ঢাকা শহরের দুকানে বাজারে শামসুর বই পাওয়া যায়। কেডাই জানি কৈছিল।

শামসু : তোমরা আমারে বেশি ভালবাস বৈলা এইসব কথা কও। এখন আমরারে যাইবার অনুমতি দেন।

রমজান : হ যাও। দুই বন্ধুর নমুনা দেইখ্যা মন অয় না খুব তাড়াতাড়ি ফিরবা। তবুও চেষ্টা কৈর। নৈলে তুমরার চাচী আবার চিন্তা করব।

(দুজনে বেরিয়ে যায়। আলোর পরিবর্তন হলে দেখা যায় একটা ডিঙ্গি নৌকায় দুজন বসে। কামাল দাঁড় টানছে।)

শামসু : কামাল এইটাই তো বউমারীর বিল?

কামাল : আরে না, এইডা হৈছে তুমার ছুডু বিল, চল, আগে গেলে দেখবা বিল ত না, যেন একটা সোমুদ্দুর। না দেখলে বুজদা না।

শামসু : তা কতক্ষণ লাগবে?

কামাল : বেশিক্ষণ না। কওছেন তুমারে ঐ বিলে কেরে লৈয়া যাইতাছি?

শামসু : সেই কথা কিভাবে কমু। আমি তো শুধু দৃশ্য দেখতে চাই মন ভরে।

কামাল : আরে ঐ বিলের পাড়ে পাইবা তুমার মনের লগে মিল খাইব একজন মানুষ। শুনছি কাইল তুমি আইবা শুইন্যা গেছল দেখা করতে।

শামসু : ও! মুনশী আবদুর রব।

কামাল : তুমি কি আগেত্যেঐ চিনতা না কিতা।

শামসু : পরে বলছি, এখন কও আর কত দূর।

কামাল : ঐ দেহ চাইয়া, ঐ যে গাছগুলান দেখতাছ তার ফাক দিয়া দেহ একখান মাইট্যা ঘর দেহা যায় ঐডাই ঐল গিয়া কবিচা'র বাড়ি।

শামসু : আরে চাচা নাকি গতকাল আমি আসুম শুইন্যা ঐখানেই বৈসা আছিলেন অনেকক্ষণ, আমার সাথে দেখা করার লাইগ্যা। আইজ আমিই তারে দেখতে আসছি শুনলে নিশ্চয় খুশিই হৈবেন।

কামাল : হ। চল ঐ তো আইয়া পড়ছি। বাড়িৎ আছেনি কেডা জানে।

(মুনশীর বাড়ির উঠোনে দু একটা গাছ, মাটির ঘরে ছায়া পড়ছে তার)

কামাল : ও কবিচা! বাড়িতে আছ নি, দেহ কারে লৈয়া আইছি।

(ডাক শুনে একটা ছোট্ট মেয়ে, যেন নাখাওয়ার প্রতিক, বয়স ৮-৯ দৌড়ে আসে)

খুশবু : দা জান কেউ আইলে বৈতে কৈছে। তুমরা এই মুড়াডিৎ বও। আমি পানি আনতাছি।

কামাল : গরীব ঐতে পারে, কিন্তু আপ্যায়নের ত্রুটি নাই। আর দেহ বাড়িঘর কেমুন পরিষ্কার।

শামসু : হ, তাই তো দেখছি। আসলে কবি মানুষতো, তাই রুচিবোধটাই আলাদা।

খুশবু : (জলের গ্লাস সামনে রেখে) এই পনিটুকু খাইয়া লও। দা জান আইতাছে।

শামসু : তোমার নাম কি?

খুশবু : আইজ্ঞা খুশবু।

শামসু : বাঃ কি মিষ্টি গন্ধ।

খুশবু : শুনেন, আমারে গন্ধ কৈবেন না। আমার নাম খুশবু।

কামাল : ওমা চেইত্যা যাচগা কেরে?

শামসু : ও, তুমি জান, তোমার নামের অর্থ গন্ধ?

খুশবু : জানতাম না কেন, দাদাজান কৈছে খুশবু নামের অর্থ গন্ধ, এই শুইন্যা পাড়ার হগ্গলে আমারে খ্যাপায়। কয় পচা গন্ধ।

শামসু : ভুল বলে সবাই। আমি ত মিষ্টি গন্ধ পেলাম। তুমি সত্যিই খুশবু। খুশবু মানে মিষ্টি গন্ধ।

কামাল : কী টাস টাস কতা, এর লাইগ্যাই সবাই তরে খ্যাপায়। তর দাদাজান কৈ?

খুশবু : আরে এত অস্থির ঐতাছ কেরে? বাইরের মাইনসের সামনে কি খালি গায়ে আইতে পারে? এর লাইগ্য জামা আর লুঙ্গিডা পাল্টাইয়া আইতাছে। ঐ যে আইয়া পড়ছে। আমি অহন যাই। (আবদুর রব আসে পরিস্কার কিন্তু পুরাণো লুঙ্গি আর শার্ট পরে)

মুন্সী : আরে ডাক্তার সায়েব যে, কৈ আমার ত শৈল টৈল খারাপ না, তা আৎকা আমার বাড়িৎ কি মনে কৈরা? আর সঙ্গে নতুন মেহমান!

কামাল : ডাক্তার কৈয়া লজ্জা দেন কেরে? ইট্যু আট্যু কম্পাউণ্ডারী শিকতাছি, তাও শেষ ঐছে না। থাক হেই কথা। এই ঐল গিয়া আমনের আর এক কবি। কবি শামসুল রহমান। আমরা এরে শামসু কৈয়াঐ ডাহি। আমনে যারে দেহনের লাইগ্যা রমজান চাচার বাইৎ গিয়া বৈয়া আইছেন কাইল। আইজ তারেই লৈয়া আইলাম আমনের কাছে। কী খারাপ ঐছে?

মুন্সী : আরে করচছ কী? আমার কি সৌভাইগ্য, ইমুন বড় মাপের কবিরে তুই এইখানে লইয়া আইলি!

কামাল : হ, আইতে চাইছে, তাই লইয়া আইলাম। আইচ্ছা কবিচা, আমরার বাংলার মাষ্টার আছিল অতীন মাষ্টার, তাইন কেমুন আছেন?

মুন্সী : ঐ আছেন আর কি। তাইনের দেওয়া গাই দুইডাই ত অহন পালি। কয়েকশের দুধ দেয়। ঐ বেইচ্যা চলি।

শামসু : তা শুনলাম আপনি এইখানে কবিচা নামেই পরিচিত। তা এইসবে লেখালেখি করেন কখন?

মুন্সী : না তেমুন আর লেখি কৈ! সংসারের কাজের পরে আর পইদ্য লেহনের সময় কৈ, আর আমরার বিদ্যাই আর কতদূর! আমনেরার মত কি আর পারি? তবে পৈদ্য লেখতেন জামাল সাব।

শামসু : উনি আবার কে?

মুন্সী : ঐ তো শোনেন নাই তো নাম। কেমন কৈরা শুনবেন, তাইনের ত ছাপা বই নাই। তাইন এই গেরামেরঐ লুক। তাইনের নাম ঐল জামাল হুসেন বয়াতী। আমার বাইল্যকালের হেডমাস্টার। আহা! কী পৈদ্যঐ না লেখত। শুইনা দেইখা মন ঐত নিজেঅ কিছু লেখি। ঐ থিক্যাঐ লেখি। এর পরে আৎকা একদিন আব্বাঅ গেল, ইস্কুলের বিদ্যাঅ, ঐ ২ কেলাসেই শেষ। এর পরে ঐ নেশাৎ পৈরা ইট্যু কদ্দুর লেহি ইতা পৈড়াই মাইনষে আমারে কয় কবিচা।

কামাল : আরে কবিচার রচনা ত তুমি দেহ নাই, ইমুন সুন্দর দশ বিশ গাঁয়ের কেউ করতে পারত না, এই অঞ্চলের মাইনষের মুখে মুখে কবিচার নাম। তার পৈদ্য ত অহন পুলাপাইন ইস্কুলে সাহিত্যসবায় কয়।

শামসু : কও কি, এ তো বিশাল মাপের কবি। অবশ্য এই রকম বড় মাপের মানুষের কথাবার্তা এইরকমই হয়। তা কবিচা, আমার একখানা কবিতার বই আপনাকে দেওয়ার জন্য নিয়া আইছি। আপনি রাখবেন?

মুন্সী : (হাতে বই নিয়া) এ কি আপনি আমার নামের আগে কবি লেখলেন? এ তো

আমার কাছে স্বপন মনে হয়। আইচ্ছা আপনেরা একটু বসেন, আমি গর থিক্যা একটা জিনিস নিয়া আই।

কামাল : শামসু তুমি আন্দাজ করতে পারতা না, এই অঞ্চলের মানুষ চাচারে কত ভাল পায়।

শামসু : এমন মানুষেরে ভালো না বাইস্যা থাকা যায়, কী রুচিশীল মানুষ, এত দারিদ্রের মধ্যেও এই যে সৃজনশীল মনখানা ধৈরা রাখছেন, তা কজন পারে কও।

কামাল : চল এইবার উডি। আর দেরি করলে চাচি আবার রাগ করব।

শামসু : তাইন আসুক। কৈয়া ত যাইত হৈব নাকি?

মুন্সী : আপনেরারে দেরী করাইয়া দিলাম। শহরের ব্যস্ত মানুষ আপনেরা। এই অধমের ক্ষুদ্র একখানা কিতাব। "মনিহার" এই একখান বই আমার। পৈড়া দেখবেন। আমার প্রথম চেষ্টা। পাড়ার পুলাপাইন পূইষা দিয়া ছাপাইয়া আনছে।

শামসু : (হাতে নিয়ে) বাঃ, খুব মূল্যবান জিনিষ পেলাম। পড়ে জানাব নিশ্চয়, কেমন লাগল।

কামাল : কেন চাচা, তুমার ত আরো একটা বই আছিল।

শামসু : তাই নাকি, তা সেটা দিবেন না?

মুন্সী : সেইখান ঘরে নাই। কয়েকখান গান দিয়া বইডা ছাপছে। আমার বড় ছেলে আইজ ঐ সাতবেড়ের হাটে গেছে। ঐ বইখান ধৈরা গান কৈরা হাটে দুই একখান বেইচ্যা তা দিয়া সওদা কৈরা ফিরে। আইতে অনেক রাইত হৈব। কাইল সকালে হেরে দিয়া একখান বই আমনের চাচার বাড়িতে পাঠাইয়া দিমু নে।

কামাল : হ। এইডাই বালো ঐব। অহন তাইলে উডি।

(দুজনে বেড়িয়ে যায়। মুন্সী আর নাতনী এগিয়ে দিতে আসে।)

(রমজানের বাড়ি। সময় : সকাল)

শামসু : (হাতে একটা বই নিয়ে) বাঃ! অপূর্ব! এই মানুষের বোধ! এ যে কত মানুষের কথা তা হয়তো তুমি নিজেও জান না কবি!

আহা! এমন করে কি কেউ
আর মোর নাম ধরে ডাকবে
তুমি যে গোপনে বও
আমার মতন কে আর বুঝবে!
কখনো কাঁদাও তুমি
কখনো বা হাসাও
সোহাগে ভরাও মাগো

সামনে যবে পাও।
আঁখির আড়ালে ক্ষণে
বিদায়ে কাঁদাও।।
জন্ম শুধু দিলে মাগো
নিলে না তো দায়
সংসারেতে থেকে করি
বাঁচার লড়াই।।

(ঘরের দরজায় কারো ডাকার আওয়াজ) কে? কে ওখানে? ভেতরে আসুন। দরজা খোলা আছে।

নাদিম : (মুন্সীর ছেলে) আইজ্ঞা আমি নাদিম। আবদুর রব মুন্সীর পোলা। বাপজান কৈল এই একখান বই আপনার হাতে দিয়া যাইতে। যদি ভুল না করি আমনেঐ বুধ হয় কবি শামসুল না কিতা?

শামসুর : ঠিকই ধরছ। তবে আমি এখনো কবি হই নাই। ঐ শহরের মানুষের ভালোবাসাতে দুই একটা কবিতার বই ছাপা হয়েছে ঐটুকুই যা। সত্যিকারের কবি তো তোমার আব্বা, যার কাছে মানুষের যাইতে হয়, কবিতার কথা বুঝতে, যার কবিতা মানুষের মুখে মুখে ছড়ায়। দাও, বইটা দাও।

নাদিম : এই নেন। আমার কাম শেষ। এইবার তৈলে আইজ্ঞা করেন।

শামসু : আরে না! বস বস। বইটা একটু দেখি। বই নিয়া টাকা দিমু না। এইটা বইয়ের দাম না, এটাই তাইনের সাম্মানিকি। আর এছাড়া আমি শুনলাম তুমি এই বই নিয়া তার থেকে তুমি মানুষেরে গান শুনাইয়া যা পাও তা দিয়া সওদা আন। তা আইজ ত তোমার একখান গান শুনতেই হয়।

ফাতিমা : আমি অ ত কৈ সকাল সকাল কে এত কথা কয় শামসুলের লগে। তা কবিচা কেমন আছে?

নাদিম : চৈলা যাইতাছে, আল্লাহ ভরষা।

ফতেমা : আরে আল্লায় সবাইরে ভালৈ রাহে, মরি ত নিজের দুষে। তা কি মনে কৈরা এত সক্কাল সক্কাল।

নাদিম : এই ভাইজান কালকা গেছল আমরার বউমারীর বাইৎ। আব্বাই তাইনেরে কতা দিছল এই একখান বই তাইনের কাছে আজগা পাডাইব, তৈ তাইনের কথামত আমি বইডা দিতে আইলাম। কাম শেষ এইবার তৈলে উডি।

ফতেমা : আরে কয় কি? নাদিমের আর এক নাম ঐল গিয়া গান। তুমারে পাইলে কেউ গান না শুইন্যা ছাড়ে? এই এলাকার হগ্গলে তো কবিচাচার কতা আর তুমার সুরে মজে। বও। শামসু তুমি হের তে কুন গান শুনবা ঠিক কর, আমি কিছু

খাইতে দি, সকালে কি কেউ খালি মুখে ফিরৎ যায়? গিরস্তের অমঙ্গল অয় না? (ফতেমা ঘরে যায়)

শামসু : আমি ঠিক এই কথাটাই বলতেছিলাম। চাচীও একই কথা বলল। কি সুন্দর নাম নাদিম। শোন নাদিম, শহর আর গ্রাম সব জায়গার মানুষই প্রাণের গান শুনতে চায়। আর তা আছে আমাদের এই লোকগানেই। শহরের শিল্পীরা এতেই রঙ চড়িয়ে পয়সা কামায়। (ফতেমা খাবার নিয়ে আসে, খেতে খেতে কথা বলে।)

আমি তো শুনি কত ভটিয়ালী, জারি-সারি গান শুধু গিমিক করে ব্যান্ড এর তালে ফেলে বিদেশেও পাড়ি দিতাছে। আর যার আসল গান, যে মালিক, সে পারে না ব্যবসা করতে। মরে না খাইয়া। থাক, সব যদি ব্যবসা হত, তবে বোধ, মনুষ্যত্ব এইসবই ত দোকানে মিলত।

নাদিম : ভাইজানের কতা শুইন্যা মন ভৈরা গেল। কী দিয়া গান শুনাই কন। যন্ত্রপাতি ত কিছুই সঙ্গে নাই।

শামসু : না না ঐ সব ত কৃত্তিম। তোমার খালি গলায় গানই শুনতে চাই। যন্ত্র আপনা আপনিই মনের তারে বাজে।

ফতেমা : কতা না বাড়াইয়া একটা গান ধর দেহি। ঐদিগে আমার সারাদিনের কাম পৈড়া রৈছে। সকাল সকাল মনডা ইট্যু বালা কৈরা কামে লাগি। কওন যায়না কুন সম কৈত্যে ডাক পরব, শেষে আর শুনতাম পারতাম না।

নাদিম : (গান ধরে)

ঝরঝরাইয়া পড়ে পাতা বসন্তের বাহার
বয়স হৈলে যেমন ঝরে পাকনা চুল আমার।।
গাছের গুড়াৎ দিলাম রে জল, কুড়ি ধরার নেশায়
সেইদিন থিক্যা বৈয়া রৈছি আস্তা ফলের আশায়।।
ফুল ফুটল ফলও হৈল, শরীর মন জুড়ায়
(আরে) মানব দেহ এমন জমিন কে জানিত ভাই।।
চাষাবাদে জমিন হয়রে সোনাঝরা ধরা
এই জমিনরে বাইনদা রাখিস পরাণবন্ধু কৈরা।।
জমিন আমার মাই-বাপ রে জমিন মাইয়া পোলা
জমিন আমার সোনা বৌ-রে রঙে হোক না কালা।।
দেখ কেমন বড় মানু জমির পানে চায়
জানে সবে হেরে ছাড়া বাইচা থাকা দায়।।
মনে রাইখ্য তারে যারা অবহেলা করে
পোড়া কপাল তারও জাইন্য সময় কৈব তারে।।

শামসু : কামাল করছ। তুমি এমন গান কি কৈরা শিখলা?

নাদিম : আমরার আবার শিখন। আব্বার কতা আর তাইনের কতায় গেরামের নদীর চলন আর গাছের বাতাসেই এইসব সুর থাহে। আর ভাইজান সুর আইয়ে পেটের টানে। মাইনষে যদি না শুনে তৈলে কি আর বই কিনব? আর বই বেচা না ঐলে সওদা আনুম কেমনে? অহন যাই। বাড়িৎ গিয়া আবার আইজ ঐন্য হাটে যাওন লাগব। (নাদিম মঞ্চ ছেড়ে যায়, দুজন তাকিয়ে যেন গানের কথাই ভাবতে থাকে।)

ফতেমা : গান শুনলে পরাণডা জুড়াইয়া যায়। কি যে যাদু পুলাডার গলাত! না রে শামসু আমি আর বৈ না। রান্দন বারন হগলতা রৈছে। তুমি ইট্যু ঘুইরা টুইরা আইয়গা।

শামসু : হ্যাঁ, সেই ভালো (ফতেমা চলে যায়) না, আজ আমার একাই যাইতে হৈব কবির বাড়ি। একান্তে কথা কৈতে হৈব। কেন জানি মনে হয় কবিচার মনে অনেক কথা জমান আছে যা তাইন আমারেই কৈতে চান। আজই যাইতে হৈব।

১

(ডিঙ্গি নৌকায় মাঝি গান গেয়ে দাঁড় টানে, বসে আছে শামসু। মুন্সীর বাড়ির দিকে চলছে নৌকা। মাঝির গলায় গান।)

বাতাস কান্দে বোঝে না রে মানুষ
(আমার) পরাণ কান্দে ভাইব্যা হয়রে বেহুঁশ।।
(আরে) যে বাতাসে পরাণ বাঁচায় কাটলি তারই গোড়া
কেমনে বাঁচে মানুষ ওরে বুঝবি কবে তোরা।।
গাছে গাছে প্রেম পিরিতির জড়াজড়ি খেলা
সাক্ষী থাকে একলাভাসা বেহুলারই ভেলা।।

শামসু : মাঝি ভাই এ গান তুমি কৈ পাইলা?

মাঝি : এই গান শুনি নাদিম ভাইজানের গলায়। শুনছি এইডি বলে তাইনের আব্বা বানায়। তাইনের গলায় শুনলে তো আমনে আর নৌকার থিক্যা নামতে পারতেন না। যাদু, যাদু।

(পাড়ে এসে নৌকা ভিড়ে। নৌকা থেকে নেমে শামসু যায় মুন্সীর বাড়িতে)

শামসু : ও কবি চা! মুন্সী সাব, বাড়িতে আছেন তো? একবার বাইরে আসুন, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা কৈতে চাই।

কবি : (ভেতর থেকে) বন, শামসু সাব, এই আমি আইতেছি। দেখেন দেখি গোয়লঘরের সামনে একটা মোড়া আছে, একটু লৈয়া বন। (বেরিয়ে এসে) আমার মন কৈতাছিল আইজ আমনে আইবেন আমার কাছে। এর লাইগ্যা আমি আগের থিক্যাঐ সব সাজাইয়া রাখছি। ইডারে কয় পরাণ পিঞ্জিরার টান। আমার সব

সময় মন হয় "তুমি যারে মনের কথা কৈতে পার হে তুমার কাছে ধরা দিবঐ" এ আমার স্যারে কৈত। হের লাইগ্যাই মনে হৈল আপনে না আইয়া পারতেন না।

শামসু : কেন এই রকম মনে হয় আপনার?

কবি : কেন জানিনা, মনে হয় আপনে আমার অনেক দিনের চিনা। কেন যে আপনেরে আমি এত ভালবাসি, আমি নিজেই জানি না। কৈ জানি একটা মিল খায় আপনার লগে আমার। আমার খালি মনে হয় তুমি আমার কথা বোঝ। ঐ দেহেন আপনেরে তুমি কৈয়া লাইলাম।

শামসু : আপনি আমারে তুমি কৈরাই কৈবেন। আমি বয়সে অনেক ছোট।

কবি : গাছ হাসে, গাছ কান্দে নদীর জল কথা কয় গাছের লগে, হে তোমরা বোঝ? এই নদীই তো জানে, বোঝে মানুষের সুখ দুঃখের কথা। তুমি তো বোঝ কবি, মানুষের খাওয়া হাগার পরেও কিছু করার থাহে। হেই কথা লেইখ্যা রাইখ্যা না গেলে হয়? নৈলে মানুষ জানব কেমনে আগের মানুষ কি কইরা গেছে। আর তা না জানলে পরের মানুষ আগ্‌গাইব কেমনে?

শামসু : হ কবিচা। আমারো তাই মনে হয়। পরের মানুষ কি নিয়া আগাইয়া যাইব। কিন্তু আপনার মত এত সহজ কৈরা কজনায় আর কৈতে পারে।

কবি : তুমরা হৈলা গিয়া শহরের পোলাপাইন, ঢাকার শুদ্ধ কথা কও। কত বই কিতাব বড়। আর এর লাইগ্যাই তুমরা ঘরে আটকাইয়া থাহ। নিজের গতিতে ছুটতেও পার না। তুমরা ত নদীতে মাঝি ছাড়া চলতে পার না। হেইডা ভাইব্যা কষ্ট হয়। তবে তুমরা ত আবার সমুদ্রের ডাক শুনতে যাও।

শামসু : এই তো আবার কঠিন হয়ে গেল কবিচা। আমি তো এখনো নদীর হাসি কান্নাই শুনতে পাই না। এই তো যা শুনতে পাইতাছি আপনার কথা থাইকা। সমুদ্র আমারে ডাকব কেন কবিচা?

কবি : ডাকব, ডাকব। ধীরে চলে নদী। তুমিও ধীরজ রাখ।

শামসু : কবিচা আপনার বইখান পড়লাম। আর বাকি লেখাগুলান কিভাবে পামু? আজ আবার বেশিক্ষণ বসতে পারুম না। চাচা-চাচী খুব চিন্তা করব। তা লেখাগুলো যত্ন কৈরা রাখবেন, আমি সময় কৈরা আইসা নিয়া যামু। (এমন সময় গাভীর ডাক শোনা যায়।)

কবি : ঐ দেখ তুমি জাইবাগা শুইন্যা আমার লালীঅ ডাইক্যা উঠল। (হাসতে হাসতে) আরে না না, এর লাইগ্যা না। মনে হয় পানকী আইছে দুধ খাইতে। কৈ রে কেডা আছস, বাতিডা লৈয়া আয়। শোন সামসু, এই সইত্যডার কুনু ভিৎ খুইজ্যা পাইলাম না আইজঅ, কেমনে যে গরুর বাটের থিক্যা সাপে দুধ খায়, হের কি দাত আছে না চোয়াল আছে, কুনুডাঐ জানি না। কী রে (বাতির আলো দেখে) কিছু দেখলি?

(ভেতর থেকে শব্দ আসে 'না') ঐরকমঐ হয়। চল যাই, যাই। তোমারে ডিঙ্গিতে তুইল্যা দিয়া আই।

শামসু : হ চলেন। আসলে পৈত্যেক সময়ই আমরা কিছু না কিছু শিখি। (হাঁটতে হাঁটতে) এই আপনার সাথে কথা কৈতে কৈতেই আজ কত কি জানলাম। এই তো আমার আগামীর সম্বল।

কবি : কী যে কও। তুমরা হৈলা গিয়া শহরের লেখাপড়া জানা মানুষ। কত পড়াশুনা। কত কবি সাহিত্যিক এর লগে তুমরার উঠা বসা। এই সাবধানে দেইখ্যা পাও দিঅ। পৈরা হাত পাও মচকাইলে তুমার চাচা আমারে আস্ত রাখত না। ঐযে ঘাট দেখা যায়। মাঝিঅ তৈরী। আমি আর কেরে?

শামসু : (হাত মিলিয়ে) কথাডা যেন খেয়াল থাকে। পরের বার লেখাগুলি চাই।

(দৃশ্যপটে দেখা যায় শামসু ফিরছে নৌকায় শোনা যায় গানের সুর)

ফতেমার বাড়ি

ফতেমা : শুনছেন, আইজ ত শামসু যাইবগা, আবার কবে আইব না আইব, হের লাইগ্যা ইট্যু ভালা বুড়া রান্দন ত লাগে।

রমজান : তা কর না। কী আনতে হৈব কও। পোলাডা আইলে বালৈ লাগে। তা বাজার থিক্যা কি আনন লাগব কও।

ফতেমা : মাছের কালিয়া আর ইট্যু মোরব্বা করুম ভাবছি। আমনের অ ত এইডি পছন্দ।

রমজান : হ। কর। দুইদিনের লাইগ্যা পোলাডা আইছে, কেমুন জানি কৈরা লাইল বাড়িডারে। এই দুয়েকটা মানুষজন আইয়া বাড়িডারে মাতাইয়া রাখছে।

ফতেমা : তবে একটা কথা খালি মনে হয়।

রমজান : কী?

ফতেমা : হে গেলেগো বাড়িডা বড় খালি খালি লাগে। যদিও সাড়াদিন বাইৎ আর থাহে কৈ। ঘুইরাঘাইরাঐ বেড়ায়, তবুও সৈন্দালা বাইৎ ত আইয়ে। মন হয় বাড়ির মৈধ্যে একটা ঐন্যরহম মানুষ ঘুইরা বেড়ায়। কী একটা সুবাস।

রমজান : আমি বুঝি তুমার মনের কথা, নিজের বুইল্যা ত তুমারে কিছু দিতে পারলাম না, হের মৈদ্যেই ত নিজের মানুষ পাও, বুঝি। হের লাইগ্য আরেকটা চমক রাখছি।

ফতেমা : কী চমক শুনি।

রমজান : আরে দেহ না শামসুররে কেমন চমক দিই।

ফতেমা : কি চমক? শুনি।

রমজান : দেহ না ইট্যু পরে কেডা আইয়া হাজির হয়।

ফতেমা : অত ভাবাইয়নাচেন আমারে। খুইলা কও।

রমজান : অহন গিয়া দেহ শামসু কি করে। কাইল হে গেছল কৈ। তাও ত জিগাইলা না। আইয়া ত নানান কতা কৈয়া ইডাঐ জিগাইলাম না। আমি দেহি বাজারের ব্যবস্থা করি। (দুজনেই চলে যায়)

মুন্সী : ওমা ডাইকা ডুইকা আইন্যা বাড়ি দেহি শুনশান। বড়লোক মানুষ। সমাজের মোড়ল। কত তারার ব্যস্ততা। এমনেই হেরা আমারে কেমুন জানি মনে করে। গরীবের শত দুষ। উঠতে বৈতে দুষ। আসলে গরীবের বাইচা থাহনডাঐ দুষের। ঐ ফকিরের কতাঐ মন অয়। "—পয়সা নাই যার মরণ ভাল সংসারে" । না, একটু ডাইক্যা দেখি। রমজান সাব! ঘরে নি রমজান সাব!

রমজান : (ভেতর থেকে) বও মুন্সী সাব। এই আইতাছি। (সামনে এসে) কবি! আমি যে তুমারে ভালবাসি হেইডা আর কেউ জানুক আর না জানুক, তুমি ত জান। আমি ডাকলে তুমি না আইয়া থাকতে পারবা? কৈ গো ফতেমা, আইয়। আগে শামসুরে ডাইকা দেও।

ফতেমা : ও শামসু, দেইখা যাও কে আইছে, এই যে নেন এই চেয়ারটাতে বন। আমি একটু জল পানি আইনা দিই। আপনেরা বইয়া কথা কন। ঐ যে শামসু অ আইয়া পরছে। আমি আই।

রমজান : তৈ কবি! আমরার এই কবি শামসুর লগে তুমার দেখা হৈছে ত। বাইক্যালাপ?

শামসু : হ্যাঁ । ঐ হাটে গিয়া।

রমজান : কবি! তুমি আমরার এই কবির বই টই যে লেখা আছে জান? আমরা ত অবশ্য তুমার নামই শুধু জানি।

মুন্সী : না, ঐ সব বই টই আমরা কৈত্যে পামু কন। আমরার ঐল গেরামের মুডা মাথা, ঐরকম কঠিন জিনিস কি আমরা পৈড়া অর্থ উদ্ধার করতা পারুম? তবুও পাইলে চেষ্টা করুম।

শামসু : তবে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া কই, আপনার বইখান সেইদিন যেইটা আপনার ছেলে দিয়ে গেল, পইড়া ফালাইছি । বড় ভালো লাগল। প্রাণের কথা তার মধ্যে আপনার ছেলের গলায় গানও অপূর্ব।

মুন্সী : সে আমারে কৈছে। একদিন বাড়িতে আসর কৈরা আপনারে শোনাতি ইচ্ছা করে।

শামসু : বেশ তো এর পরের বার যখন আসব, তখন না হয় আপনার বাড়ি গিয়াই শুনুম। আপনার লেখা নতুন কবিতা গান সবই শোনা হবে।

ফতেমা : তা, কবিচা, তোমার নিজের লেখা শোনাতে এত লজ্জা কেরে?

মুন্সী : লজ্জা না। কিরম জানি লাগে আরকি। (বলে প্রথম গানটা দুকলি গায়।) কৈ আর তেমন লেখি, আপনেরা ভালা পান দেইখা এইসব কথা কৈয়া লজ্জা দেন।

শামসু : অচ্ছা, আপনার কবিতায়, গানে প্রকৃতি এমন নিজের মানুষের মত ধরা দেয় কিভাবে। এর বাইরে কি আর কিছু ভাবেন না?

মুন্সী : কি জানি, আমার মনে হয়, এই চাইরদিগে যে দেহি, তা আমার পর না, আমি একটু কষ্ট পাইলে এই বনের তলাডাও যেন কথা কৈয়া ওডে। আমি একটু খুশি ঐলে চাইরদিগে তারঅ ছবি দেহি। আমি ভাবি আমার বাপ দাদাঅ এইসব দেইখ্যা গেছে, এই লতা, পাতা, মেঘ বাদল চান সূরজ। সব তারাঅ দেখছে। তারা চৈলা গেছে, অহন আমরা আছি। আমরা দেখতাছি। যারা গেছেগা, তারা তারার ভাবনা-চিন্তা, মনডারে এইসবের মৈধ্যে ছড়াইয়া থুইয়া গেছে যা আমার কানে আইয়ে। আমি যা রচনা করি হেই মেঘ-বাদল, চান-সূরজ, লতা-পাতার কাছ থিক্যা শুনা কথা দিয়াঐ করি। হের লগে খালি মনের ভাবনাডিরে মিশাইয়া দিই। আপনে আমার কথা শুইন্যা হাসতাছেন? পাগলে কী কয়।

শামসু : না না, আপনি কৈয়া যান।

মুন্সী : কি আর কমু। এই আমার মনের কথা, ধৈয্য ধৈরা শুনলেন এতেই খুশি।

ফতেমা : (জল খাবার হাতে আসে) ঘরের তে তুমরার কথা শুনতাচলাম। হগলতা কতা বুঝি না কবিচা কিন্তু বড় মধুর লাগে, নেও একটু মুখে দেও, তাইন আবার বাজার যাইত। আইলে শেষে রান্দা। শামসুডা অ যাইবগা কাইল।

রমজান : এইডা বালা কৈছ। ইট্যু পরে আবার ত দরবার শুরু ঐব। কত লুকের কত সমৈস্যা। মুন্সীর কথা বুঝি আর না বুঝি, গান যেমুন ধৈরা বওয়াইয়া দেয় কতাও একৈরকম। (হাসতে হাসতে)

মুন্সী : হ নেন। মুখে তুলেন। বালৈ লাগল। আপনার ডাকে আইয়া অত বড় কবি মাইনষ্যের লগে কতা কওনের সুযোগ ত ঐল।

(তিন জনে খেতে থাকে। ধীরে ধীরে আবহ সঙ্গীতে দৃশ্য পরিবর্তন হয়।)

(শহরের বাড়ি। বই এর তাক সহ ড্রয়িংরুম সাজানো। সময় সকাল)

শামসু : (স্বগতোক্তি) কত দিন হল, সাতবেড়ে যাই না, কেমন আছে চাচা চাচী কে জানে। আজ কদিন হল কেবলই মনে হয় ওদের কথা। নির্বাচন হৈয়া গেল। সরকারের বদল না হৈলেঅ কত নতুন জনপ্রতিনিধি আইল। ঐ সাতবেড়ের থাইকা অ নতুন প্রতিনিধি হৈল। কবিচা কেমন আছে তাই বা কে জানে। হামিদ তো এই ঢাকা শহরেই থাকে শুনছিলাম। (কলিং বেলের শব্দ, কামালের প্রবেশ) আরে

দেখ কাণ্ড। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আর কৈতে কৈতে তুমি হাজির। কী সৌভাগ্য আমার।

কামাল : আর কৈয় না, গতকালকেই আইছি ঢাকায়, একটা কাজে আইজ যাইতে হয়। ভাবলাম তুমার লগে ইট্যু দেখা কৈরাঐ যাই।

শামসু : আগে বও দেখি। (কামাল বসে, শামসু ভেতরে গিয়ে মিষ্টি আর জল নিয়ে ফিরে আসে। কামাল বই দিয়ে সাজানো ঘর দেখতে থাকে।)

তোমরা তো ঐ গাঁয়ে গেলেই পরাণ ভৈরা ভালোবাস। আর এইখানে থাইক্যাও আমার খোঁজ পর্যন্ত নাও না।

কামাল : এইখানে কি আর তুমি আমরার মত সাধারণ মানুষ! কত তুমার নাম ডাক। কবি শামসুল মানে ত শুধু ঢাকা না বাংলাদেশের গর্ব। কেমনে দেখা করি কও। অহন ত এইখানে থাকিও না, কবেই গেরামে ফিরা গেছি। ঐ ঘুইরা ঘুইরা মাইনষ্যের স্বাইস্থের খবরাখবর লৈ। আর কম্পাউন্ডারী দিয়া যা কদ্দুর পুইষা পাতি পাই, তাই দিয়া চলি। সময় কৈ ইহানে আইতাম।

শামসু : তা, আজকে তবে কি মনে ভাইবা দেখা দিলা শুনি।

কামাল : এইখানে ঐ কম্পাউণ্ডারীর একটা ইন্টারভিউ দিলাম। সরকারী চাকরী। ভাবলাম, চিনাজানা কৈতে তুমি ছাড়া আর কেডা আছে কও। তুমি যদি একটু চেষ্টা কৈরা দও আর কি।

শামসু : তা কেমন হৈল ইন্টারভিউ?

কামাল : না, তেমুন কুনু আশা দেহি না, তাছাড়া আমার চিনা-জানা কৈ। আইজকাইল কোয়ালিটির কি আর দাম আছে?খালা-চাচাঅ নাই, টেকের জুড়অ নাই। কেমনে ঐত কওছেন।

শামসু : কয়জন নিব?

কামাল : পোষ্ট ত ৬ডা। আবার বিজ্ঞাপনে লেখা আছল বাড়তে পারে, কমতে পারে আবার বাতিলঅ ঐতে পারে, যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে (হাসি) কাজেই ওপরওয়ালাঐ ভরসা।

শামসু : এই একখান খাটি কথা কৈছ । তবুও জাইনা রাখলাম । ঐ মাষ্টারি করি আর লগে ইট্যু লেখালেখি করি বৈলা দুই চাইরজন আমারে জানে। কাজেই যদি কেউ চিনা পৈরা যায়, তৈলে কৈতে পারি। এর লাইগা জাইনা রাখলাম আর কি।

কামাল : তুমি যে ভাবজ এতেই আমি খুশি। একটা সরকারি চাকরি ঐলে সংসারটার টানাটানি ইট্যু কমে। গেরামের পরিস্থিতি ত জানঐ। তবু যদি কিছু পাক্কা ব্যবস্থা হয় মাইনষেরে একটু ওষুধবিষুদ কিন্না দিতে পারি।

শামসু : তুমার কি পরিবার ঐল নি, কৈ শুনলাম না ত?

কামাল : আরে আমার মা বাপ ঐ আমার সংসার। মা ত যা নিয়া থুই সবই পাড়ার মাইনষ্যেরে বিলানিত থাহে। খালি কয়, দেহচ না মাইনষের কত অভাব। আমরা ত আর না খাইয়া নাই। বুঝ অবস্থা।

শামসু : খালুর মত এমন বড় দিলের মানুষ এখনো আছে বৈলাই ছুইটা যাইতে মন চায় তোমাগো কাছে। নৈলে মানুষ কি আর অহন মানুষ আছে? মানুষ অহন মনুষ্যদল।

কামাল : ঠিক বুঝলাম না।

শামসু : বোঝা গেল না? প্রত্যেকটা মানুষই আইজ কোন না কোন দলের। আসলে সব হৈল ভোটার, নয় ভোটারের বংশধর। নয়তো কোনো সম্প্রদায়ের। তোমার সম্পর্কে বলতে গেলে জানতি হবে তুমি কোন দলের? আবার সেই দলের কোনো উপদল থাকলে তার এ টিমের না বি টিমের।

কামাল : হ (হতাশার সুর) এর লাইগ্যাই আইজকাইল মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাইখ্যা বাচন মুশকিল। শুনছনা, কবিচা মানে ঐ মুন্সী সাবের কী দশা ধরাইছে? এমুন বালা মানুষ। তবে হ, মেরুদণ্ড বেচে নাই। মানুষ বটে একখান।

শামসু : কী হইছে, কবিচাচার, একটু খুইলা কও।

কামাল : অবশ্যই, এইসব খবর কি আর কাগজে আইয়ে? গেল বছর ঐ অঞ্চলে ভোটে দাড়াইল আলতাফ তালুকদার। শুনছ ত তাইনের নাম।

শামসু : না ।

কামাল : আরে রমজান চাচার বাড়িতে ত তুমি থাকতেই কত গেছে । ভুইল্যা গেছ?

শামসু : হয়তোবা দেখছি, নজর করি নাই। কবিচাচার কি হইল সেইটা খুইলা কও।

কামাল : তালুকদার সাব ভুটে খাড়াইছেন, আর তার সব্বক্ষণের সঙ্গী আছলেন রমজান চাচা। আরে ভুটের সম কত রকমের প্রচার হয় ইতা তুমি জানঐ।

শামসু : সেতো সবখানেই হয়।

কামাল : পালা হয়, ভোজ হয়, সঙ বাইর হয়, কত রকমের গান হয়, হেই গান হাটে মাটে গাইয়া মাইনষ্যের কাছে ভুট চায়। হে ত জানঐ।

শামসু : এইসব ত ভোটের নিয়মের মধ্যেই পরে।

কামাল : রমজান চাচা কবিচার কাছে খবর পাঠাইল, আইয়া একদিন তাইনের সঙ্গে দেখা করার লাইগ্যা। কিন্তু তাইন আইলেন না।

শামসু : আইলেন না কেন? তাইন কি কিছু আন্দাজ করতে পারছিলেন?

কামাল : হ। তাইন যারে দিয়া ডাকাইছলেন হে আছল ঐ তালুকদারের থাইপ্যলদার। ঐ

তালুকদার টা ত মাইনষ্যের জাৎ না, হের লাইগ্যাই না করছিল। হের পরে একদিন ডিঙি নৌকা পাঠাইয়া লুক দিয়া প্রায় বাইন্ধা আনলেন।

শামসু : কও কী! এইরকম করল কেন?

কামাল : এই দৃশ্য ভাবলেই গা শিউরা উডে, লুকডা যে অহন বাইচ্যা আছে এইডাঐ কপাল।

(স্মৃতিতে ফিরে যায় হামিদ, রমজানের বাড়িতে, ফতেমা সহ কয়েকজন দাঁড়িয়ে।)

রমজান : তা কবি তুমি ত শুনছঐ তালুকদার সাব নিব্বাচনে খাড়াইছেন।

মুন্সী : হে ত শুনছি, এর লগে আমার কিতা?

রমজান : তাইন পাশ নাঐলে এই সাতবেড়ের কুনু কাম ঐতনা ইডাঅ ত বুঝ না কিতা?

মুন্সী : তা বুঝদাছি, কিন্তু আমার কি করনের আছে?

রমজান : কিছুই না, তাইনের গুণগান লেইখ্যা কয়েকটা গান বাইন্দা লাও।

মুন্সী : এ আফনে কি কৈতাছেন।

রমজান : আহা! তালুকদার সাব তুমারে মান্যি করে। তাইন জানে তুমার লেখা গান মাইনষ্যের বুকের মদ্যে গিয়া লাগে। ঐ রকমের কিছু কথা সাজাইয়া কয়েকখান গান গাইয়া তাইনের লগে ভুটের প্রচার করন আর কি। তাইন জিৎলে তুমার আর কুন কষ্ট রাখত না। তুমি যদি চাও তুমারে কিছু আগাম দেওনের ব্যবস্থা কৈরা দিই। কি রাজী? ওমা চুপ কৈরা রইলা যে।

মুন্সী : এ আবার কুন জাইত্যা গান।

রমজান : ভুটের গান। এমুন কৈরা লেখবা যাতে হগ্গলে ভুট তালুকদাকরেই দেয়। কাশেম যাতে জব্দ হয়।

মুন্সী : ইতা গান লেহনের আমার সময় নাই।

রমজান : কী কী কৈলা, সময় নাই? তুমার মাথা মুথা ঠিক আছেনি? এত বড় একটা দেশের কামে তুমার সময় নাই। এই কথাডা এরার সামনে দাড়াইয়া আমার মুখের উপর কৈতে পারলা?

মুন্সী : আমি ত ঐ রকমের গান কুনু সময় রচনা করি নাই। আর যেই তালুকদার অহন মানুষ ঐয়া উঠত পারল না, যার ঐত্যাচারে মাইয়ালুকটি ঘর থাকতে পারে না, যেই লুকটার যন্ত্রণায় কতডি বালা বালা পরিবার শহরে গেছেগা, দেশ ছাইড়া গেছে গা, আর ধম্মের দুহাই দিয়া হেরার জাগা দহল কৈরা রইছে, হের আবার গুণগান?

রমজান : জবান সামলাইয়া কথা কও মুন্সী। বনের বাঘেরে সেলাম জানাইয়া বনে থাকন

লাগে। ছোট মুখে বড় কথা কৈঅ না। মানীর মান দিয়া চৈল্ল। যাও অহন বাইৎ যাও। কাইল একখান গান শুনতাম চাই।

মুন্সী : একখান কেন, দসখান শোনেন। আমি শুনাইতেঐ তো চাই। আপনারা দশজনে শোনেন দেইখ্যাঐ তো গান বান্দি। তাবে ঐ তালুকদারের গুণগান কৈরা গান আমি রচনা করতি পারুম না। হে আমারে দিয়া ঐত না।

রমজান : তাইলে তুমি রাজি না?

মুন্সী : না।

রমজান : তুমি ভাবছ দেশে তুমারে ছাড়া কবি নাই?

মুন্সী : থাকব না কেন? আমি কি আর দেশের কবি? আমি ঐলাম এই সাতবাইড়ার কবি।

রমজান : কামডা তুমি বালা করলা না মুন্সী আবদুর রব। যা কৈছ, কৈছ। অহন মাফের ওয়াক্ত আছে। ভাইব্যা দেহ কি করবা।

মুন্সী : আমার কতা আমি কৈয়া দিছি। যেই তালুকদার নিজেই মানুষ বালা না, হে মাইনষ্যের বালা করব কৈত্যে। আমনেঅ হের সঙ্গ ছাড়েন।

রমজান : হেইডা আমি বুঝুম। অহন তুমি যাও।

মুন্সী : সেলাম ওয়ালাই কুম। (বেড়িয়ে যায়। সবাই এই দুঃসাহসী বক্তব্য শুনে অবাক হয়)

রমজান : (চিৎকার করে বলতে থাকে) তুমার আর গান রচনা করন লাগব না, তুমার গান ছাড়াঐ তালুকদার সাব জিতব।

(স্মৃতি থেকে ফিরে আসে কামাল)

কামাল : এরপর যা হৈল তা আর কওন যায় না।

শামসু : এরপর আবার কি?

কামাল : হের দুই একদিন পর ভুটের আগেঐ একদিন সকালে দেহা গেল, কবিচার ক্ষেতের ধান গরুএ খায়, নিজের দুইডা দুধেল গাই তালুকদারের লুকে লৈয়া গেছে, আর তার ছেলের হাত থিক্যা কবিচার গানের বইগুলান বাজারের লগের নদীতে ভাসে। কবিচার বাড়িৎ গিয়া তালুকদারের লুকে গিয়া শাসাইয়া আইছে তাইন যাতে অহনতে আর গান না বান্দে। তাইন অহনতে আর কবি না। বাড়াবাড়ি করলে গেরাম ছাড়ন লাগব।

শামসু : তোমরা কেউ কিছু কৈতে পারলা না? সারা গ্রামের মানুষের মুখেই ত তার নাম ছিল। এত ভালোবাস তোমরা অথচ এই বিপদে কেউ পাশে নাই!

কামাল : গেরামে কি গরীবের কুনু গলার জুড় থাহে? ঐখানে থাকলে বুঝদা। আমরা

কেউ মানুষ না, ঐ তুমার কথায় কুনু না কুনু দলের, নয়ত কামের। এর বাইরে আর কিছু না। গলা তুইল্যা কথা কৈতে গেলে গেরাম ছাড়তে ঐব।

শামসু : কিন্তু কবিচার কথা মাইনষে শুনছে, ভোটে ত কাশেম মিয়াই জিৎছে।

কামাল : এর লাইগ্যাই ত আরও ভেজাল ঐছে, তাইন ত আর জিতনের পর ঐদিগে পাঐ দিছেন না। একবার গেলে এনা মাইনষ্যে সুখ-দুঃখের কতা কৈত।

কবিচা আর কিছু লেখে না, পোলাপানঅ আর বাজারে আইয়ে না। তাইন ত অহনে বলে অ-কবি।

শামসু : তালুকদারের ঘোষণাতেই কি তাইন কবি থাইকা অকবি হৈবেন? একজন কবিরে কবিতা লিখতে না দিলে কী যন্ত্রণা হয় সে তোমরা বুঝবা না। তার পাসে যাইয়া দাঁড়াইতে হৈব। আমি যামু। তাঁরে দেখতে খুব ইচ্ছা করতাছে। তোমরা এত বড় ঘটনা আমারে একবার জানাইলা না?

কামাল : একবার যে মনে হয় নাই তা ঠিক না, তবে তুমরার মত এত বড় মানুষের কাছে নালিশ করি কেমনে কও। আর তাছাড়া তুমি হৈলা গিয়া রমজান চাচার আত্মীয়। হের লাইগ্যা—

শামসু : আমারে জানাইছ না, এখন যখন জানছি, যাইতে ত আমার হৈবই। না গেলে তো নিজেরে ক্ষমা করতে পারুম না। এমন বড় মাপের কবি, যে অন্যায়ের সাথে আপোস করেনা, তাঁর পাসে না দাঁড়াইলে আর মানুষ হৈলাম কিভাবে?

কামাল : আইচ্ছা, তৈলে আইজ আমি উঠি। তুমি সময় কৈরা আইয়।

শামসু : তোমার সঙ্গে যামু না, তাতে আমার চাচায় তোমারে সন্দেহ করব, তাই তুমি যাও তোমার মত, আমি আইতাছি। কবিচারে শুধু খবরটা জানাইয়া দিও, আমি আইতেছি, আমি তাঁর পাসে আছি।

(মুন্সীর বাড়ির ভাঙা ঘরের দাওয়া। বসে আছে বিমর্ষ মুন্সী, নাদিম বেত দিয়ে মাছ ধরার ডুলা বানাতে ব্যস্ত আর জরিনা উঠোনে ঝাড়ু হাতে সাফাইয়ের কাজে। দুজনেই কাজ করতে করতে মুন্সীর কথায় উত্তর দেয়)

মুন্সী : বউ কার উঠোনে ঝাড়ু দেও। কেউ কি আর দেখতে আইয়ে? হায় আল্লহ্! এই হৈল এই গাঁইয়া মানুষের কাম। সকাল সৈন্দ্যা দুইবেলা উডান পরিষ্কার রাহন লাগব। ঐ নাদিম তর এক ডুলা বানাইতে কয় ঘন্টা লাগে?

নাদিম : সারছি বাজান। কি করুম কও, ইতা কাম ত অহন এনা করি। এতোদিন ত তোমার উপর দিয়াঐ চৈল্লা গেছি। অহন ত তুমার গান বেইচ্চা চলনের রাস্তা বন্ধ। মাছ বেইচ্চা আর মাঝে মৈধ্যে নাও বাইয়া লুকজন পারাপার কৈরা যে কয়ডা পুইসা পাই, ইডি দিয়াঐ চলন।

মুন্সী : কিতা করবি ক! আমিও তো তেমুন কৈরা জুয়াল তুলতাম পারি না। যতদূর পারি হেইডাঅ ত ফিরুজ মিঞা দয়া কৈরা রাহে দেইখ্যা।

জরিনা : আমনের অত ভাইঙ্গা পরলে চলব? উপরওয়ালা বৈল্লা অ ত এক জন আছেন

মুন্সী : ইডা আবার কি কৈলা বউ।

জরিনা : হ। দেইখ্যেন, একদিন সব ঠিক ঐয়া যাইব। আইজাগা যেমুন ফিরুজ চাচা আইয়া সামলাইছে আরেক দিন আরেক জন ঠিক আইয়া দাড়াইবো। আমনে তো সেই ভুর ভুর থাইক্যা কী সব লেইখ্যাঐ চলছেন। আমনের কাম আমনে করেন, আমি করি আমার কাম। আমনের এত পরিশ্রম কি বিফলে যাইব? ঐ ফিরুজ চাচার মতো লুকেরারে তাইনেঐ পাঠায়।

নাদিম : তুমার লগে বুঝি তাইনের কথা অয়?

জরিনা : (হাসতে হাসতে) নইলে কই কেমনে? তুমরা ত সব খালি আমার তে লুকাইয়া রাখ। লুকাইয়া কি আর থাকে?

মুন্সী : না গো জরিনা, তুমারে আর কষ্ট দিতে চায় না, এর লাইগ্যা কয় না আর কি।

নাদিম : অহন, কিছু রাখছ নি খাওনের? যা কর হে ত সব তুমারঐ কারসাজি। কিছু থাকলে দও, খাইয়া রওনা দিই, যার যার কামে।

মুন্সী : আইচ্ছা তুই কি কাইল অনেক কিছু আইন্যা রাখছত যে জরিনা তর খাওনের জুগান দিব। (রেগে বলে)

জরিনা : আহা! আমি যাইতাছি তো। কাইলকা যে চাইল আনছিল তার তে দুই মুট সরাইয়া রাখছিলাম তো, হের লাইগ্যাঐ তো রাইতের বেলা ভাতটি ইট্টু জাউ রাখছিলাম। আমি যাই পাত পারি।

(জরিনা চলে যায়, ওরা দুজন একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে)

মুন্সী : নাদিমরে! এই হৈল গিয়া মাইয়ালুকের মাইয়া। হের লাইগাঐ দেখিস হিন্দুরার মৈধ্যে দেবীর পূজাঐ বেশির ভাগে করে। হে আমরার ধম্মেও আছে, মাইয়ারারে সম্মান দেওনের কথা, মানে কিতা? ঐ বিপদে পড়লে মাইয়ালুকে উদ্ধার করে।

নাদিম : জারিনারে যে তুমি আমাত্তেও বেশি ভালা পাও, হেই কথা তো আর কেউ না জানুক আমি জানি।

মুন্সী : মা বাপ মরা মাইয়াডা যহন চাচায় সাদি দেয়, তহনৈ বুঝছি, এই মাইয়া আদরের ধন, তারা যে জরিনারে কত ভালোবাসতো হেই কথা তো চাচী নিজেই কইয়া গেছে।

জরিনা : (ভেতর থেকে) রৈদ চৈড়া যাইতাছে কৈলাম, ঘরে আইয়েন। যেইটুকু আছে

মুখে তুইলা যান।

মুন্সী : আইতাছি বাজান। চলরে কামাল।

নাদিম : হ, চলেন।

(দৃশ্য পরিবর্তন)

(রমজান চাচার ঘর দৃশ্যপটে আসার আগে গ্রামের ছবি বুঝাতে প্রয়োজনীয় আবহ ব্যবহার করা যেতে পারে)

রমজান : আরে! শামসু,খবর নাই, টবর নাই আৎকা কৈরা আইয়া পরলা? ভালৈ করছ। নিজের বাড়িতে কি আর খবর দিয়া আওন লাগব? কৈ গো শুনছ, শামসু আইছে, দেইখ্যা যাও।

শামসু : না, অনেক দিন ধৈরাই ভাবতে আছিলাম আসুম। কিন্তু সময় কৈরা উঠতে পারতেছিলাম না। তা আপনারা কেমন আছেন, ভালো তো?

ফতেমা : আমরার আর ভালো-মন্দ। ঐ থাকন আর কি। তা, এইবার তো ভাবছিলাম নতুন মানুষ সঙ্গে নিয়াই আইবা।

শামসু : কি যে বলেন চাচী, আরো কিছুদিন চাকরিটা করতে দাও তারপর সব ঠিক হইব। এখনো তো মানুষরে চিনতেই শিখছি না। মানুষের সুখ, দুঃখ তাপ উত্তাপ একটু বুঝি, তারপর ত শাদী সংসার।

ফতেমা : না বাপু, তুমরার এই সব ভেজাইল্যা কথাবার্তা বুঝি না, তবে তুমার কথা বেশ কিছুদিন আগে কার কাছে জানি শুনছি, তুমি বলে আমরার গেরামের উপরে একটা বই লেখতাছ। তবে আগেই কৈয়া রাখি এইবার কিন্তু দুয়েকটা দিন থাইক্যা যাইবা।

শামসু : হ্যাঁ গো চাচী, এ হৈল জন্মভিটার টান। এর কথা তো আমাদেরই লিখতে হৈব, নৈলে পরের মানুষ জানব কিভাবে আমাদের এই গ্রামের কথা।

রমজান : একদম খাঁটি কথা, শুন ফতেমা এইবার কয়দিনের লাইগ্যা ঐ হামিদরে লগে বাইন্ধা দিও, তৈলে তুমার আর চিন্তা থাকত না।

ফতেমা : হেইডা সকালে দেখুম। অহন ত রাইতের খাওনের বাবস্থা করি।

রমজান : হ। তুমার ঘরে যাও শামসু। তুমি না থাকলেও দুইবেলা ঝারপুচ কৈরা রাখনের কামডা তুমার চাচী ঠিক করে। অপেক্ষায় থাকে কবে তুমি আইবা।

শামসু : হে আমি জানি বৈলাইতো যখন মন চায় চৈলা আসি।

রমজান : তবে গেরামে ঘুরতে গিয়া আমার দিকটাও একটু খেয়াল রাইখ্য।

শামসু : ঠিক বুঝতে পারলাম না চাচার কথাখান।

রমজান : না, মানে এই গাঁয়ের মোড়ল বৈলা আমারও ত একটা মান ঠান আছে, তাই ঘুরতে গিয়া যিখানে সিখানে যার তার বাড়িৎ যাইয়া উইঠ্য না। তুমরা হৈলা গিয়া শহরের কবি মানুষ। আমরার ত ইহানৈ থাকন লাগে।

শামসু : আইচ্ছা। এখন তাইলে যাই, কাল সকালে রোদ উঠার আগেই গ্রামের পথ ঘাট ঘুইরা একটু দেইখা আমু। যদি নতুন কিছু পাই।

রমজান : এইডাই ভাল। চড়া রৈদ শরিল খারাপ করতে পারে। সকাল সকালই ভাল।

(ধীরে ধীরে রাতের আলো গভীর হয়, যে যার ঘরে যায়, আলো জ্বললে দেখা যাবে কামাল উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকছে)

কামাল : শামসু! আইয়া পড়লাম। কাইল রাইতেই খবর পাইছি তুমি আইছ। তুমি তো আবার ভুরবেলা বেড়াইতে চাও, হের লাইগা সব কাম ফালাইয়া হাজিরা দিলাম।

শামসু : ভালোই করলা। আমিও ভাবতাছিলাম তোমার কথাই, আমিও তৈরীই।

ফতেমা : রাইতে ঘুম ঐছেনি শামসু? ঐতো তুমার শাগরেদও হাজির। আর কিতা এইবার বাইরৈয়া পরলেই হয়। তাইন তো উঠতে উঠতে রৈদ তাইত্যা যাইব। তবে একখানা কথা কৈয়া দিই, বেশি দেরী কৈর না, আইয়া নাস্তা কৈরা নৈলে আবার যাইয়। আমি নাস্তা বানাইয়া রাখতাছি।

শামসু : নাগো চাচী, তার প্রেয়োজন নাই, আমরা পথেই কিছু খাইয়া নিমু।

ফতেমা : শোন, পোলার কথা, ইডা তুমার ঢাকা শহর না, যে চাইলেই তুমার ইচ্ছামত খাইতে পারবা। এত সকাইল্যা বেলা গেরাম জুইড়া দুই তিনডা চার দুকানৈ পাইবা, লগে বেশি হৈলে বিস্কুট, ইতা দিয়া কি ঐব, এর লাইগ্যাই কৈলাম তাড়াতাড়ি আইয়া পৈর।

কামাল : চাচী, এত চিন্তা কৈর না, দেরী ঐলে কুচতান খাওনের ব্যবস্থা কোরুম নে, আমি ত আছি লগে না কিতা।

শামসু : চাচী আমরা এখন তাইলে বাইর হৈয়া পড়ি, রোদ চৈড়া গেলে বেড়াইতে কষ্ট হৈব।

ফতেমা : এত তাড়াতাড়ি বাইর হৈতে আছ, আবার আইতে দেরী হৈব কেন, মতলবটা কি, এই কামাল একটু ইদিগে আয়ছেন।

শামসু : আমি আগাই, তুমি কথা খান সাইরা আইয়।

ফতেমা : (ফিস ফিস করে কামালকে বলে) চাইচ, তুই আবার হেরে কবিচার বাড়িৎ লৈয়া ছুডিস না, জানসঐত তর চাচার লগে কিতা ঐচল, ইতা শামসুর কানে গেলে হে যেমন দুঃখ পাইব, তেমনে হেই কতা কানে আইলে তর চাচাঅ চেইত্যা যাইবগা, আমি ইতা সামাল দিতাম পারতাম না।

কামাল : আইচ্ছা, ঐতো শামসু বাইর হৈয়া গেছে, আমি আগ্‌গাই। তবে বেশি ভাইব্বনা, শামসু গেলেও তুমরার কুনু ক্ষতি করত না, চাচারঐত ভাইপুত, কাজেই ছেপ কি আর উপরের দিগে ছিডাইব? আই গো। শামসু!

(নৌকায় দুই বন্ধুর কবিচার বাড়ির দিকে যাওয়ার দৃশ্য (বাজবে লোকগান) শামসু আর কামাল নৌকা বেয়ে পৌঁছায় বউমারির ঘাট, দেখা যায় ক্ষেতে কাজ করছে কবিচা)

কামাল : ঐ দেখ চাইয়া, ঐ ক্ষেতের মৈধ্যে লাঙ্গল বায় কবিচা।

শামসু : এ কী! শরীরে তো কাপড়টুকুনও নামমাত্র। এ তো হাড্ডিসার। এ তো বয়সের ছাপ না, পরিশ্রম আর অনাহারী ছাপ। দাঁড়াও আমি ডাকি, আমি ডাকলে নিশ্চয় সাড়া দিব। মুন্সী সাব! ও মুন্সী সাব! কবিচা!

কামাল : সামনে চল, কানেও শুনে না আইজকাইল। গতকাইলও কৈয়া গেলাম তুমার শরীলডারে একটু বিশ্রাম দেও। কয় বাইচ্যা থাকি কেমনে না খাইয়া। (ধীরে এগিয়ে আসে আব্দুর রব, তিনজন মুখোমুখি হয়) আরে কবিচা, তুমি ত কথাই শুননা। কাইলকার সব কথা জলে। অহন ঘরে চল, দেখ না, কারে লৈয়া আইছি।

মুন্সী : আমি তো গলা শুইন্যাঐ বুঝঝি কে আইছে, আমি তো তার অপেক্ষাতৈ দিন গনতাছি। ঐ তো জোয়াল থুইয়া আইছি। তে আইব নে। (বলতে বলতে কবি পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে, দুজনে ধরে ফেলে)।

শামসু : কী অবস্থা শরীরের, এত পরিশ্রম করা কি এই বয়সে সম্ভব।

কামাল : দেখ তুমার মনের মানুষরে আবার লৈয়া আইলাম।

মুন্সী : আমি তো এই অপেক্ষাতেই আছি। কামাল তুই হামিদরে কইয়া দে, বাহি জুয়ালডা দিয়া আইয়ি।

কামাল : কইতাছি, কইতাছি তুমি কথা একটু কম কও। চল এই গাছ তলায় একটু বও।

মুন্সী : (শামসুর দিকে তাকিয়ে) অনেক, অনেক কথা আছে কবি তুমার লগে।

শামসু : এইসব কথা শোনার জন্যই তো এইবারের আসা। বসেন, বসেন। এইবার ধীরে সুস্থে কন।

কামাল : কবিচা জানি তুমার অনেক কষ্ট। অনেক কথা কওয়ার আছে, হেই কথা শুননের লাইগাই ঢাকা থিক্যা ছুইটা আইছে শামসু। জিরাইয়া জিরাইয়া কও। তুমার শরীলডা ত তেমুন বালা না।

মুন্সী : শুন শামসু তুমি হৈলা গিয়া কবি মানুষ। তুমরা পড়াশুনা কৈরা নানান জায়গায় ঘুইরা ঘুইরা মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কথা তুইলা আইন্যা লেখ। এইসব লেখার কদরৈ অন্যরকম। কিন্তু আমি তো লেখি শুধু আমার এই গেরামের কথা, এই সাতবাইড়ার কথা। এইখানে যেই মানুষগুলান আছে, হেরার কথাঐতো

কৈতাম চাই।

শামসু : তা, এতে তো আপনি মানুষের কথাই কইবার চাইতাছেন, অসুবিধার কি?

মুন্সী : আছে, শামসু আছে। দেখ। শামসু আমি শুধু মানুষের কথা কই না, কই গাছপালা, নদী-নালা, ঝড়-বাদলের কথা, কই আসমান জমিনের কথা। কিন্তু কিছু মানুষের মৈধ্যে তো লুকাইয়া থাকে শুধু লোভ। এরা শুধু চায় আমার উপর দিয়া কেউ কথা কৈতে পারত না। আরে খাওন পরনের পরেও তো মানুষ পরাণ খুইল্যা কথা কইতে না পারলে বাঁচে কেমনে কও।

কামাল : এই কথাডাই কবিচা কৈতে চায় শামসু বুঝতে পারছ?

শামসু : এইটা তো ঠিক, এই যে আমরা শহরে থাকি, সেইখানেও তো একই সমস্যা। আমরার এক কবি কন,

"রাজা আসে যায় / আসে আর যায় / এই রাজা আসে / ঐ রাজা যায়
মানুষের দিন বদলায় না .....

আসলে আমি বুঝি কবিচা আপনে তো মানুষের ভাগ্য লেখতে চান না—

মুন্সী : এই কথাডাই আসল। ভাইগ্য মানুষ নিজে বানায় কর্ম দিয়া। এই কথাডা কৈতে গেছি হেইদিন তুমার চাচার দরবারে, আরে যেই মানুষ খালি নিজের জাতের ধর্মের মানুষ আর নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই চিনে না, যার যন্ত্রণায় আমরার এই গেরামের কত বালা মানুষটি আমরারে ছাইড়া গেল শুধু ঐন্য জাতের ঐন্য ধর্মের বুইল্যা। হের হৈয়া আমি লেখুম গান, কওছেন বাবা শামসু?

শামসু : একদম না। ঠিক করছেন। তৈলে আপনে তো আর পাঁচটা মানুষের মতোই থাকতেন।

মুন্সী : শোন শামসু। আমার যা কথা সব আমি লেইখা রাখছি কাগজে। এই দিনের আলোয় বইয়া বইয়া আমি সব লেখি আর বাস্কের মৈধ্যে রাখি। আমার জরিনা ছাড়া আর কেউ জানে না আর দেখেও না। একদিন দেইখ সব মানুষ শুধু মানুষ খুঁজব। জাত ধর্ম খুজদ না। আরে তুমরা যে আইজকাইল পড়াশুনা কর এই সব তো কেউ না কেউ লেইখ্যা রাইখ্যা গেছল বুইল্যাঐ পাইতাছ না কি তা? আমিও ঐসব কথাই লেইখা রাখি।

শামসু : আমি পড়ছি তো আপনার লেখা, শুনছি সব কথা। এইবার আইছি আপনার লেখাগুলি নিয়া যাইতে। আপনি ভাইবেন না, আপনে একা। আমি এইবার ফিরা গিয়া আপনার কথা-লেখা তুইলা ধরুম মানুষের কাছে। হয়তো সময় লাগবে কিন্তু একদিন আপনার কথা সব মানুষের কাছে পৌছাইব।

মুন্সী : কামাল! সুনছস নতুন কবি কী কয়। শামসু! তুমি/তুমরা আমারে নিশ্চিন্ত করলা।

(আনন্দে যেন দিশাহারা হয়ে অস্থির হয় মুন্সীর শরীর। কথা বলতে বলতে কবিচা পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে, দুজনে ধরে ফেলে)

কামাল : চল, ঘরে। এত শরীর খারাপের মৈধ্যে কেউ জুয়াল লয়? তুমারে ত কালকাঐ কৈয়া গেছি। চল, আস্তে ধীরে। আরে শরীরের আর দুষ কিতা? তুমি ত ভুগদাছ টি বি রুগে। খাওন নাই, দাওন নাই। ঢাকারতে ওষুধ আইন্যা দিয়া কৈলাম ১টা মাস এই ওষুধ খাও। আর পরিশ্রম না কৈরা ভালা কৈরা খাও। নৈলে বাঁচতা না। কার কথা কেডা শুনে। (দুজনে মিলে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দেয়। ঘরের ভেতর থেকে কবির স্ত্রী জরিনা, ছেলে নাদিম এবং নাতনি খুশবু ছুটে আসে)।

জরিনা : কতবার কৈলাম আইজগা আর যাইও না,শরীলডারে ইট্যু বিশ্রাম দাও, কতা যদি শুনত। খুশবু ইট্যু জল লৈয়া আয়। (খুশবু জল আনতে যায়)।

নাদিম : আরে কতবার কৈলাম, যাইও না, শেষে যহন যাইবৈ ঠিক করছে তখন কৈলাম তৈলে খাড়াও আমি একটা গাই দোয়াইয়া আই, ইট্যু পরে যাও, আমিও যামু। কুন ফাকে বাইরৈয়া গেল। ভাইজান তুমরা থাহনে এনা বাইৎ আনছ, নৈলে তো ক্ষেতৈ পৈড়া থাকত।

খুশবু : কিতা হৈছে গো দাজানের?

কামাল : ঐ মাথাডা ঘুরাইছে আর কি। আমরা থাকনে পরতে পারছে না। এই যাত্রায় রক্ষা। নও জলডা খাইয়া লও। আর খাওনের কিছু থাকলে দও।

খুশবু : কিছুই ত নাই, আইচ্ছা দুগা মুড়ি আইন্যা দিই। (ভেতরে যায়)

কামাল : শুন কবিচা, তুমার ইচ্ছা আছল শামসুলের লগে কথা কৈতা, আমার কথা শুইন্যা হেও রাজি হইয়া গেল, তাই আইছে। ইট্যু জিরাইয়া লইয়া শ্বাসকষ্টডাও ত কমতাছে না, শামসু আছে, ইট্যু সারলে হের লগে কথা কৈয়া লও, ততক্ষণে আমি ফরিদের আব্বারে ইট্যু দেইখ্যা আই, তাইনেরো শৈলডা বালা না।

খুশবু : এই নও, মুড়ি বাতাসাডা খাইয়া আট্টু জল খাও, দেখবা শৈল তাল পাইবা।

নাদিম : আমি যাই ক্ষেতেরতে জুয়ালডা তুইল্যা থুইয়া আই, আপনেরা বসেন। আম্মু তুমি তাইনরারে ইট্যু জল পানি দও, কত দূরেত্তে আইছে, আবার আব্বুরে লইয়া কত বড় বিপদডা সামলাইয়া লৈয়া আইছে।

জরিনা : হ বাবা, আমি দেখি কি আছে ঘরে।

কামাল : তুমরার অত চিন্তা করন লাগদ না, তুই যা তর কামে। (বেরিয়ে যায় নাদিম)।

শামসু : কী ভাল নাতনী পাইছেন, বড় হও মা, বড় হৈয়া পড়াশুনা করলে দাজানের মান রক্ষা হৈব। আর এই যে গেল হামিদ হে শুধু ভালো ছেলে নয়, অনেক বড়

মাপের মানুষ, কত্তো যে ওর ভাবনা মানুষের জৈন্য।

মুন্সী : হামিদ ডাক্তার ঐতে না পারলে কি ঐব, যা শিখছে তা দিয়া ঐ গেরামের মানুষেরে বাচাইয়া রাখছে। আমি তুমার গলা শুইনা আন্দাজ করছি কিন্তু চিনতে একটু সময় লাগছে। হেই কথা কৈয়া লাইলাম, কিছু মনে কৈর না।

শামসু : না না, আমি কিছু মনে করি নাই। আপনার উপর সব অত্যাচারের ঘটনাই আমি হাদিমের কাছ থিকা শুনছি। আপনি অনেক বড় মাপের কবি। আমি শহরে যাই, খবরের কাগজের মানুষরে ডাইকা সব জানামু। আপনি একটু সুস্থ হৈয়া উঠেন। আমার বিশ্বাস এই গ্রামরে মানুষ চিনতে পারব আপনার নামে। একদিন লোকে কৈব, এই গ্রামে কবি আব্দুর রব মুন্সী থাকত।

মুন্সী : আরে আমি এই রকম কাম কী করছি? তবে হ্যাঁ, যা লেখি, অন্তর থাইকা এই গেরামের পৈত্যেকটা বাড়ি, গাছ-পালা, নদী-নালার কথা আমি কৈতে চেষ্টা করছি আমার গানে কবিতায়, আমি তুমার অপেক্ষায় আছিলাম কবি। কয়খান কথা কৈতাম।

শামসু : কন কি কথা?

মুন্সী : ডাক্তার হয়ত বুঝতে পারছে আমার দিন ফুরাইছে। শুন, তালুকদার আমার আসল ক্ষতি করতে পারে নাই। আমার রচনা থামাইতে পারে নাই। (ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে ডেকে সামনে এনে) যাছেন বাবা ঐ ট্রাঙ্ক-এর ভিতরেত্তে কাগজপত্রের পুটলাডা লৈয়া আয়ছেন। ইডা তুমার হাতে তুইল্যা দেয়নের অপেক্ষায় আছিলাম। আমি জানি তুমিঐ পারবা ছাইপ্যা মাইনষ্যের ঘরে ঘরে পৌছাইতা।

জরিনা : কী যে করে তাইন, আগা মাথা কিছু বুঝি না। এই রৈদে বানে লাঙগল চালাইয়া কুনু রকমে দুগা খাওনের ব্যবস্থা করে বাড়িতে আইয়াই বৈয়া যায়গা লেখত। কী যে লেখে তাইনৈ জানে, আর ঐ সব তোরঙ্গে ঢুকাইয়া রাখে। এইডাই নেশা।

নাদিম : (ছেলে পুটলি এনে শামসুর হাতে দেয়) খালি কয়, একদিন নিকি আপনে আইবেন। আপনেঐ এর মর্ম বুঝবেন। এই ঐল তাইনের সব লেখা।

জরিনা : লুকটার যে কি ঐব জানি না।

মুন্সী : (কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয়) শামসু কতদিন ভাবছি এই গেরাম ছাইড়া, দেশ ছাইড়া যাইগা যেদিগে দুচোখ যায়, আবার ভাবি কেন যামু এই মাটি ফালাইয়া। এমন সুন্দর চান-সূরজ, গাছ-গাছালি, মেঘ-বাদল আর কুনু দেশে কি আছে? আর আমি চৈলা গেলে অন্যায় ত আর আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব না, এই দেশেই রৈয়া যাইব। তৈলে আমার চৈলা গিয়া লাভ? এর লাইগ্যাই মাটি ধৈরা পৈরা রইলাম।

কামাল : ঐ দেখ, আমি যাইতে যাইতেই আবার তুমার বকবকানি শুরু করছ, এদিগে শ্বাস

টানতে পারতাছ না, কিন্তু বকবকানি থামে না। এবার চুপ কৈরা বিশ্রাম লও।

মুন্সী : না রে হামিদ আর কথা কৈতাম না, আমার সব কথা ঐ পুটলাত কৈরা কবির হাতে তুইল্যা দিছি। শামসু এই সব আমার জন্ম ভিটির গান। এরে তুমি যতনে সাজাইয়া লৈয়।

জরিনা : ঐচে এইবার থামেন দেহি। (মেঘের ডাক শোনা যায়) আরে দেখ আৎকা কৈরা কেমন মেঘ জৈমা আইছে। চলেন দেহি বিতরে লৈয়া যাই।

শামসু : আরে সত্যিই ত। ও হামিদ আমরা যাইবার পারুম ত?

কামাল : এই মেঘ গর্জায়, বর্ষায়ত না। চল রওনা দিই।

জরিনা : ইট্যু দেইখ্যা গেলে পারতেন।

কামাল : আমরা দেরী করলে বিপদ আছে। হে তুমরা বুঝবা না।

মুন্সী : হ হ , হেরারে আটকাইয় না। আমি ত আর তুমরারে থাকতে দিতে পারতাম না। (শ্বাসকষ্ট বাড়ে)

শামসু : কবিচারে ঘরে নিয়া যান, আমরা রওনা দিলাম। চল রে হামিদ।

কামাল : চলেন, বাতাস অহন আস্তে দিতাছে।

শামসু : গিয়া পৌঁছাই চাচারে কৈয়া ত আইজি ঢাকার পথে যাইতে হৈব।

কামাল : আগে ত সাতবেড়ে পৌঁছি তারপর এনা বাড়িতে যাইতা।

শামসু : হে ঠিক পৌঁছামু।

(ওরা দুজনে বেড়িয়ে যায়, ধীরে ধীরে ঝড়ের প্রকোপ বাড়ে। আলো আঁধারের আবহ যাতে মেঘের হঠাৎ শব্দের সাথে খুশবুর 'দা-জা-ন' জরিনার কান্না এবং নাদিম এর 'আ-ব্বা-জা-ন' শব্দের মধ্যেই বেজে যাবে বিরহের সুর। অন্য প্রান্তে ধীরে ধীরে আলোর সাথে দেখা যাবে পুস্তক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শামসু। একটা ছোট্ট আলো তাঁর মুখে, ধীরে তা মঞ্চে ছড়িয়ে পড়বে)

শামসু : আজ এই ক্ষুদ্র আয়োজনে যারা আসতে পেরেছেন সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে যাঁর হাতে যাঁর লেখা এই বই "জন্মভিটির গান" প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল সেই কবি আব্দুর রব মুন্সী গত মাসের ১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। 'ইন্নে লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। আমার দুর্ভাগ্য আমি দায়িত্ব নিয়েও সময়ে তার কাজ শেষ করতে পারিনি। তবে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তার পুত্র নাদীম। আমি তার হাতে এই বই তুলে দিতে পারব এইটুকুই বলার। আর তার জীবন সম্পর্কে শুধু এই কথাই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি—প্রকৃত শিল্পীর মেরুদণ্ড বিক্রি হয় না। তাঁরা বাঁচেন শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের আদর্শ নিয়েই, বেঁচে থাকেন সুস্থ সংস্কৃতির মানুষের হৃদয়ে। তবে তিনি কী রচনা করেছেন তার পরিচয় আমরা

পাব তাঁর পুত্র নাদীম-এর গানে। আমি এবার নাদীমকে অনুরোধ করব তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লেখা ও সুরের একটা গান শোনাতে। এস নাদীম। মঞ্চে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বলে আমাদের কাছে তাঁকে আরেকবার তুলে ধর।

(আলো পড়ে নাদীম-এর মুখে।)

নাদীম : আমার আর কওনের মত কিছু নাই। এত বড় বড় মাইনষের মৈধ্যে আমার মত লুকেরে ডাইক্যা যেই সনমান আমার আব্বাজানরে দিছেন এতেই আমি ধৈন্য। আমরা বাড়ির লুক, পাড়ার লুক বুজঝিই না, তাইন কি লেখছেন। তবুও আপনেরা যহন কৈতাছেন তাইনের একখান গান শুনাই। আমি ত গান শিখছি না, বা-জানের তে শুইন্যাঐ গাই- আসলে কথাডি বলে বালা মাইনষ্যে কয়, হেই শুইন্যাই শোনাই—

কেউ বা কয় আল্লাহ্ তারে কেউ তারে কয় ভগবান
কেউ বা তারেই হরি বলে কেউ আবার কয় খুদাজান।।

তার নামেতেই কেউ বা বাঁচে সারা জীবন কষ্ট করে
কেউ বা আবার তারে বেইচ্যাই
রাজার আসন দখল করে।

এই যে আমার সুনার মাডি, গাছ গাছালি নদীর জল
পালন কৈরা তারেই দেইখ্য পাইবা শান্তি বাঁচার বল।

(আরে) ধর্ম বেইচ্যা, মানুষ ধৈরা, চড়তে পার সিংহাসন
(রাজা) মনে রাইখ্য, হেই মানুষৈ, দিব তুমায় নির্বাসন।।

মানুষ হৈল সবার উপর, আসল হৈল এই কথাখান
ধর্ম লৈয়া ঝগড়া কৈরা, দিও না ভাই নিজের জান।।

(এই গানের শেষে ধীরে আলো ছড়িয়ে পরে সবার মধ্যে।)

লেখক : **শুভাশিস চৌধুরী, বিশিষ্ট নাটককার, ত্রিপুরা।**
Playwright : **Subhasis Chowdhury, distinguished Playwright, Tripura**.

নেশা বিরোধী নাটক
জীবন-সঙ্গী ডট কম

■ বিভু ভট্টাচার্য

চরিত্র-পারমিতা (হবু কনে) মণিকা, বলাকা, কিন্নরী (নৃত্যশিল্পী), মহিতোষ (ব্যবসায়ী -৩০) ও কেশব (হোটেল বয়)। একটি বড় বার কাম রেস্টুরেন্ট এর আভাস। মানানসই আলো, সঙ্গে চলছে তিনটি মেয়ের হুল্লোড় নাচ গান। ১টি চেয়ার-টেবিলে একজন ছেলেকে বসে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। "এরেঞ্জড ম্যারেজ" বিষয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। বিষয়টি "জীবন-সাঙ্গী" ডট-কম সাইট থেকে দেখে উভয়ের পূর্ব পরিকল্পিত।)

(নাটক শুরু হতেই দেখা যায় তীব্র আলোয় তিনটি মেয়ে একটি রেস্টুরেন্টে উদ্দাম আধুনিক নাচ নাচছে। সঙ্গে চলছে ঝাঁঝালো সঙ্গীত। অথবা নির্দেশকের ইচ্ছামত একদিকে একটি চেয়ার টেবিলে বসে চা খাচ্ছে মহীতোষ, একা। হোটেল বয় কেশব খাবার ইত্যাদি নিয়ে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, প্রবেশ করে পারমিতা চোখে কালো চশমা।)

পারমিতা: (লম্বা বিনুনি, মোটা ফ্রেমের চশমা, তাঁতের শাড়ী ইত্যাদি, টেবিলের কাছে গিয়ে মহিতোষকে) হ্যালো! আর ইউ মহীতোষ?

মহিতোষ: (জিন্স, গেঞ্জী, শু, কালো চশমা ইত্যাদি)। ইয়েস, মাহী। আর ইউ পারমিতা?

পারমিতা: ইয়েস, মিতা।

মাহি : ওকে, আই ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং ফর ইউ। হ্যাভ ইওর সিট।

মিতা : (বসে) থ্যাঙ্ক ইউ।

মাহী : পারমিতা। উঁহু আজকাল এতবড় নাম তো চলে না। তবে পরেরটা ঠিকই আছে। মিতা নামটা যুগের সঙ্গে ঠিক মানানসই। (হাসে) অবশ্য আপনাকে দেখে খুব একটা আজকালকার বলে মনেও হচ্ছেনা। এমন লম্বা বিনুনি, মোটা ফ্রেমের চশমা, তাঁতের শাড়ী- এসব তো বলতে গেলে আজকাল দেখাই যায় না।

মিতা : নিজের নামটাও কম লম্বা নয় কিন্তু! মহীতোষ!

মাহী : হা হা হা হা, সে তো মামা মাসীর রাখা। কি আর করা যাবে!

মিতা : (মুচকী হেসে) আপনার বোধহয় এরকমটা খুব পছন্দ, তাই না?

মাহী : আসলে ঐ জীবন-সঙ্গী ডট কম মেট্রিমনিয়েল সাইটে আপনার প্রোফাইল ছবিটা দেখে মানে আপনার মধ্যে যে একটা রাবীন্দ্রিক ব্যাপার আছে সেটা বোঝা যায়নি। বোঝা গেলে এই পশ কাফের পরিবর্তে রবীন্দ্রকাননে বসেও ডেটটা ফিক্স করা

যেত। হা হা

মিতা : (মৃদু হেসে) জানেন, কলকাতার রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থেকেই আমার পড়াশুনা, বাংলা নিয়ে। আপনি বুঝি রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করেন?

মাহী : না, না, ছোটবেলা রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুবই আবৃত্তি করতাম তো।
বল বীর, চির উন্নত মম শির।

মিতী : নজরুল।

মাহী : অ্যা, কিছু বললেন?

মিতা : বলছিলাম, এই কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা।

মাহী : বলেন কি, আমি তো ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি এই কবিতাটি রবিঠাকুরের লেখা। আসলে ঐ রবীন্দ্রনাথ নজরুল সব একই। রসুন জানেন তো রসুন?

মিতা : হাঁ, রান্নায় দিই তো। আমি কিন্তু রান্নাও জানি। বলব?

মাহী : আরে না না খাবার রসুন নয়! আগে গরম কালে পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র সুকান্ত নজরুল সন্ধ্যা হত না। ওটাকেই আমরা সংক্ষেপে বলতাম রসুন সন্ধ্যা। হা হা হা

মিতা : ইশ শ। কি বাজে ইন্টারপ্রিটেশন!

মাহী : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি কি খাবেন বলুন।

মিতা : আমি! আপনিই বরং বলুন। আমি ঠিক এসব জানি না।

মাহী : একালের মেয়ে হয়ে এরকম জায়গায় আসেন নি? আশ্চর্য!

মিতা : আসলে এতবড় জায়গায় আমি বিশেষ আসিনি তো। আপনি নেহাত জোর করলেন তাই। নইলেএরকম বাইরে বেড়িয়ে কারো সঙ্গে দেখাও করিনি।

মাহী : ও!

মিতা : আসলে আমাদের বাড়ীতে বড়রা ছেলেদের সঙ্গে বাইরে মেলামেশা খুব একটা পছন্দ করে না। আমার প্রায় সব বন্ধুই মেয়ে। নেহাত বিয়ের ব্যাপার বলে আজ নিমরাজী হয়েছে। তাও শেষে বাবা নিজে আমার সঙ্গে আসতে বলছিলেন। দিদি বলে কয়ে আটকেছে। আমাদের বাড়ি একটু কনজারভেটিভ আর কি!

মাহী : হ্যাঁ, সেটা তো আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা দুটো মোকা বলি!

মিতা : অ্যাঁ! মোকা?

মাহী : হা হা হা হা। ওয়েটার ! (কাগজ কলম নিয়ে ওয়েটার, কেশব আসে ও লিখে নেয়)

মিতা : না না আমি বাড়ী থেকে ভাত খেয়ে এসেছি। এখন আর খাব না। চা বা কফি বলুন প্লিজ!

মাহী : হা হা হা। আরে এটা কাফে মোকা। মানে এক রকম কফি আরকি! কাফেলাতে কাপুচিনো মোকা এই নামগুলো শোনেন নি নাকি? আপনি শহরে থাকেন তো?

হা হা হা।

মিতা : এত হাসছেন কেন? বললাম তো আমি বাড়ীর বাইরে বেশি বেরোই না। আর এসব জায়গায়তো আমি কোনদিন আসিই নি সেরকম।

মাহী : আজকার যুগে আপনার বয়সী শিক্ষিতা মেয়ে যে এরকম সাদাসিধা হতে পারে, জাস্ট আউট অব ইমাজিনেশন! তাও আবার এরকম চোখ ধাঁধানো সুন্দরী!এই ডেডলি কম্বিনেশন নিয়ে মোকা খাওয়ার মৌকা হারাবেন না প্লিজ।

মিতা : যা! কি যে বলেন!

মাহী : বাঃ ব্লাশ করলে আপনাকে আরো মিষ্টি দেখায়তো! সত্যিই আপনাকে টেরিফিক দেখতে। না না ফ্লার্ট করছি না মোটেই। শুধু এই ওল্ড ফেশনড চশমা, তেল চপচপে বিনুনি, আর এই শাড়িটাড়ি বাদ দিয়ে একটু মেকওভার করে নিলে মডেলিং কোম্পানীগুলোর লাইন পড়ে যেত আপনার পেছনে।

মিতা : আপনি তো ভারী ইয়ে দেখছি।

মাহী : এই যে ভুরুটা বাঁকিয়ে তাকালেন না, এতে কত হৃদয় যে তোলপাড় হয়ে যাবে! নাহ, আমাকেই এখন উঠতি মডেল প্রমোট করার ব্যবসায় নামতে হবে।

মিতা : ওহো বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস কথাটা আপনি নিজেই তুললেন। আচ্ছা আপনার কিসের ব্যবসা? জীবনসঙ্গী ডট কম সাইটে অকুপেশনের জায়গায় তো শুধু বিজনেস লেখা ছিল।

মাহী : অর্ডার, অর্ডার সাপ্লাই। নানারকম মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ের জন্য আমাদের কাছে অর্ডার আসে। সেগুলো কাস্টমারদের কাছে সময়মতো সাপ্লাই করাই আমার ব্যবসা।

মিতা : ও আচ্ছা। আমি অতশত বুঝি না । আপনি কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আসলে বাড়ী থেকে আমাকে বলে দেয়া হয়েছিল এটা জিজ্ঞেস করার জন্য।

মাহী : হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, টিপিক্যাল বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ মেচমেকিং কোয়েশ্চেনেয়ার। আপনিও নিশ্চয়ই ভেবেছেন, আমি আপনাকে, রান্নাবান্না কি পারেন, সেসব কথা জিজ্ঞেস করব!

মিতা : হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সব শিখে এসেছি মায়ের কাছে। বলব? মাছের ঝোলে কি ফোঁড়ন দিতে হয়! শুক্তোয় ঝাল দিতে হয় কিনা! বলি?

মাহী : আর বলবেন কি? আপনি তো সিরিয়াসলি বলতে শুরুই করে দিয়েছেন দেখছি! আরে ওসব আজকাল আর কে খায়! আর আমি তো বলতে গেলে কাজের মধ্যে বাইরেই সব সময় খাই। রাতে পিৎজা বা তন্দুরি চিকেন আনিয়ে দুপেগ হুইস্কি দিয়ে মেরে দিই।

মিতা : কি বললেন! আপনি মদ খান?

মাহী : অ্যাঁ মদ! মদ খাব না কেন? মানে মদ না খেলে খাবটা কি! ওঃ হো আপনি তো দেখছি সেই রবীন্দ্র যুগেই পরে রয়েছেন ! হে হে হে । (বয় কেশব কফি দিয়ে যায়)

মিতা : দেখুন আপনি রবিঠাকুর নিয়ে অকারণে এরকম কথায় কথায় খোঁচা দেবেন না কিন্তু।

মাহী : আচ্ছা আচ্ছা আর বলব না। কিন্তু ম্যাডাম, একটু নেশাভাঙ করে না এরকম হাজবেন্ড আজকাল পাবেন কোথায় বলুন তো! আপনার গুরুদেবের আমলে হয়তো হো হো - আচ্ছা রবিঠাকুরতো বিরাট জমিদার ছিলেন। তা উনিও নিশ্চয়ই ----

মিতা : রবীন্দ্রনাথ সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস নিম পাতার রস খেতেন। যাকগে এসব আপনাকে বলে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথের ডায়েট আপনার পোষাবে না। আমি বরং উঠি। আমাকে আপনার পছন্দ নয় এটা বুঝতে পেরেছি। প্রথম আলাপ থেকেই ক্রমাগত বিদ্রুপ করে কথা বলে যাচ্ছেন। আর ---।

মাহী : আমাকেও আপনার মোটেই সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না, তাই তো। আরে ব্লাইন্ড ডেটে এরকম তো হতেই পারে। দুমিনিট বসুন না। কফিটা অন্তত শেষ করে নিই। তারপর একসঙ্গে উঠব।

মিতা : হু।

মাহী : ড্রিঙ্ক করি শুনে আপনি তো ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন। আচ্ছা আপনি তো রবিদাদুর আমলের লোক। তা আপনার বন্ধু বান্ধবও কি ড্রিঙ্ক ফিঙ্ক করে না নাকি?

মিতা : সর্বনাশ, বলছেন কি! নেশা করবে আমার বন্ধু বান্ধব? দেখুন আমার বন্ধু বলতে মণিকা, বলাকা আর কিন্নরী ! মূলত এই তিনজনই। আর এরা প্রত্যেকেরই অত্যন্ত ভদ্র পরিবারের, রুচিশীল এবং মার্জিত।

মাহী : আচ্ছা একটা কথা। আপনারা একসঙ্গে হলে সময় কাটান বা এনজয় করেন কি করে? নেশাটেশা তো করেন না বলছেন। তাহলে কী গম্ভীর মুখে নিমপাতার রসে চুমুক দিতে দিতে দাদুর কবিতা আওড়ান।! মানে সিরিয়াসলি?

মিতা : আজ্ঞে হ্যাঁ, এনজয় করার জন্য আমাদের নেশা করার প্রয়োজন হয় না। আমরা একসঙ্গে বসে কত গল্প করি, গান করি, আবৃত্তি করি। মণিকা যা আবৃত্তি করে না শুনলে আপনার তাক লেগে যাবে। কি সুন্দর যে লাগে ওর কবিতা পাঠ শুনতে! বলাকা ভারত নাট্যম ড্যান্সার। হল ভর্তি দর্শকদের একদম মাতিয়ে রাখে। সারা দেশে ও কত যে পুরস্কার পেয়েছে! আর আগরওয়ালা ফেমিলির, মানে বিজনেস ম্যানের ঘরের মেয়ে হয়েও কিন্নরীর গলায় শুদ্ধ উচ্চারণে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই হলো আমাদের নেশা। এসবেই বেশ

সময় কেটে যায়। ওসব আজেবাজে জিনিসের প্রয়োজন পড়ে না।

মাহী : ও কে! কি নাম বললেন ! কিন্নরী আগরওয়াল? আচ্ছা ইনি কি সাউথে থাকেন?

মিতা : হ্যাঁ। আপনি চেনেন নাকি? অবশ্য এদের অনেকেই চেনে। ওর বাবা মস্তবড় বিসনেস ম্যান! কিন্নরীর মত ইনোসেন্ট, সফটস্পোকেন, ডিসেন্ট মেয়ে আজকাল-

মাহী : হা হা হা!

মিতা : একি আপনি এরকম বাজে ভাবে হাসছেন কেন? এরকম পাগলের মত হাসির মানেটা কি! আমি চললাম। আপনি যতখুশি ইচ্ছামত হাসুন (যেতে উদ্যত)

মাহী : আরে, আরে, উফফ, হা হা হা। হাসতে হাসতে একেবারে চোখে জল এসে গেল।
হা হা হা । শুদ্ধ উচ্চারণ। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ! হা হা হা । কিন্নরী আগরওয়াল যার বন্ধু, সে আবার, সে আবার নেশা করা লোক দেখলে নাক সিটকোয়! হোয়াট এ জোক?

মিতা : মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো!

মাহী : কি আর বলব? কিন্নরী আগরওয়ালের মত ড্রাগ এডিক্ট মেয়ে শহরে হাতেগোনা। বলি খবর রাখেন কিছু? মদ গাঁজা চরসে ওর আর এখন কিস্যু হয় না। পুরিয়া লাগে। পুরিয়া। পুরিয়া বোঝেন? তাও আবার রেগুলার! পয়সার তো তাদের অভাব নেই! মাসে কত লাখ টাকার মাল যে ঢোকে ওর পকেটে, বলে শেষ করা যাবে না। এই মেয়ে আপনার বন্ধু? সত্যিই অবাক করলেন আমায়!

মিতা : দেখুন আপনি লোক ভাল নন সেটা মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলাম কিন্তু এতটা অসভ্য তা বুঝতে পারিনি। একটা ভদ্র মেয়ের নামে এসব কি মিথ্যে কথা বলছেন আপনি? ছিঃ! এসব কথা বলতে আপনার এতটুকু বাধল না? আপনি নোংরা লোক একটা। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। (উঠতে যায়)

মাহী : নোংরা? আমি নোংরা লোক একটা? আর আপনার বন্ধু ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা তাই না? আমি মিথ্যে বলছি? দাঁড়ান! এই, এই দেখুন, (মোবাইলে ছবি দেখায়)। কিন্নরীকে আমি মাল সাপ্লাই দিয়েছি নিজে। হ্যাঁ, ও রিসিভার আর আমি সাপ্লায়ার! (স্বর উঁচিয়ে) পেডলার বোঝেন? পেডলার?

মিতা : পেডলার? মানে!

মাহী : পেডলার ! মানে ড্রাগ পেডলার!

মিতা : ড্রাগ পেডলার?

মাহী : ড্রাগ পেডলার, হ্যাঁ এটাই আমার ব্যবসা। জিজ্ঞেস করেছিলেন না আমার কিসের ব্যবসা। এখন বলছি এটাই আমার ব্যবসা। ইয়েস , ড্রাগ পেডলার।

মিতা : প্রমাণ

মাহী : হা হা হা বিশ্বাস হয়না? যারা ড্রাগের ব্যবসা করে প্রমাণ ছাড়া করে না। সাপ্লাই দেবার সময় কাস্টমারের সঙ্গে গোপনে নিজের ছবি তুলিয়ে রাখি এসিস্ট্যান্টকে দিয়ে। এই ব্যবসায় রিস্ক বেশি, তাই এগুলো করতে হয়, কেউ ফাসাতে গেলে ওকেও যাতে ফাসিয়ে দিতে পারি। এই যেমন আপনি এসব কথা কাউকে বলতে গেলে আপনার রুচিশীল, সভ্য, ইনোসেন্ট বন্ধুটিও ফেসে যাবে।

মিতা : বাড়ীতে শুনছিলাম আপনার নাকি কোটি কোটি টাকা। এই ব্যবসাতেই এত টাকা!

মাহী : বিজনেসে রিস্ক বেশি তাই প্রফিটও বেশি।

মিতা : প্রকাশেও এসব কথা বলছেন! ভয় করে না আপনার! দেয়ালেরও তো কান আছে ।

মাহী : উঃ উঃ উঃ ম্যাডাম। এত সহজ বোকামিটা আমার মত একজন ড্রাগ পেডলার করবে? বিশ্বাস হয় আপনার? তাহলে খুলেই বলতে হচ্ছে। এই কাফেটা আমার। সব লোকজন আমিই রিক্রুট করি।

মিতা : তাই বলুন আচ্ছা। কোথায় বিক্রি হয় এত ড্রাগ!

মাহী : এটা আমাদের ট্রেড সিক্রেট। তবু আপনি বলেই বলছি। পুরিয়া, পুরিয়া বোঝেন তো

মিতা : হ্যাঁ পুরিয়া মানে ছোট ছোট এরকম (দেখায়)

মাহী : হ্যাঁ, আমাদের রয়েছে এজেন্ট, সাব এজেন্ট, রিটেলার, বয়েজ এন্ড গার্লস। এছাড়া পেকেটিয়ার্স! পেকারস এন্ড মুভারস। নানা পেশায় অগুনতি লোক।

মিতা : বয়েজ এন্ড গার্লস! মানে? এত লোক!

মাহী : হ্যাঁ,প্রত্যেকের ডিউটি আলাদা, শিফটও আলাদা, কেউ কাউকে চেনেনা। রাদার চিনতে দেয়া হয় না। এ এক বিরাট অরগানাইজেশন। আল্টিমেটলি সবই পৌঁছে যায় গেটে।

মিতা : গেট! গেট মানে?

মাহী : গেট মানে গেট! সব বোঝেন আর গেট বোঝেন না?

মিতা : না মানে পরিস্কার করে যদি বলেন!

মাহী : স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। লাকস অফ বয়েজ এন্ড গার্লস। নাম্বার অফ আওয়ার কাস্টমারস আর আনলিমিটেড!

মিতা : অ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ছাত্র, ছাত্রী! ছিঃ ছিঃ আপনি, আপনারা এতটা রুচিহীন?

মাহী : ড্যাম ইওর রুচি! রুচি দেখাচ্ছে আমাকে! শুনুন, কিন্নরি আগরওয়াল আমার প্রাইম কাস্টমার। ও আমার থেকে মাল নেয়। হ্যাঁ, আপনাকে বলছি। রেগুলার!

আমি নোংরা লোক, না? আর আপনার বান্ধবী খুবই ভদ্র, ইনোসেন্ট! নাচ গান কবিতা এসবই তার একমাত্র নেশা! দেখুন, দেখুন নিজের চোখে। (মোবাইল দেখায়) হা হা হা আর আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। এখান থেকে বেরিয়ে আমি খুব সহজেই হাওয়া হয়ে যেতে পারব।

মিতা : ছিঃ ছিঃ ছিঃ না না কিন্নরির নামে এসব আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। আপনি মিথ্যেবাদী । এ গ্রেট লায়ার! কিন্নরির এরকম ছবি থাকতেই পারে না। আপনি শুধু শুধু একটা ভাল মেয়ের নামে বদনাম দেবার চেষ্টা করছেন।

মাহী : মিথ্যে বদনাম! তা ছবি, মোবাইলের ছবিও মিথ্যে কথা বলবে?

মিতা : কৈ দেখি! (মোবাইল হাতে নেয় এবং ব্যাগে ঢুকাতে যায়)

মাহী : একি! একি! ছবি দেখতে নিয়ে আমার মোবাইলটা নিজের ব্যাগে ঢুকাচ্ছেন কেন? আরে ওটা আমার খুব দরকারী। ফেরত দিন শিগগীর। দিন বলছি! (ধমক দেয়)

মিতা : (ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে)। (ভয়েজ চেঞ্জ- দৃঢ় গলায়।) নড়বেন না, মোবাইলটা হাতে পাবার জন্য আমার অনেক সময় নষ্ট হলো।
(শুরুতে যারা নৃত্যশিল্পী, রেস্টুরেন্টে কর্মী ছিল এরাই পোষাক পালটে এবার পিস্তল হাতে তিন থেকে ওকে ঘিরে ধরে।)

মাহী : একি! এরা কোত্থেকে এল?

মিতা : (ভয়েস চেঞ্জ) যে কোন রেডেই প্রিপারেটরী ওয়ার্ক করতে হয় । এরা সেই মিশনেরই অঙ্গ। উহু একটুও নড়বেন না। এটা কিন্তু নাইন এম এম পিস্তল। এছাড়া দৌড়ে পালাবারও আর কোন রাস্তা নেই। অল গেটস আর ক্লোজড।

মাহী : মানে আ আপনি!

মিতা : ইন্সপেক্টর ঈশিতা চ্যাটার্জী। নারকোটিক সেল। কিন্নরি আগরওয়াল যার ছবি একটু আগে দেখালেন তাকে এরেস্ট করা হয়েছে কদিন আগেই। তার কাছ থেকে আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই আমরা। তারপর থেকেই আপনাকে শ্যাডো করছি। কিন্তু আপনার স্বীকারোক্তি আর কিছু সলিড প্রমাণ ছাড়া কিছুই করা যাচ্ছিল না। বলেছিলেন না এই ক্যাফেটা আপনিই চালান। মানে আপনিই মালিক! মনে রাখবেন সব কিছুর উপরে পুলিশ। দিনের পর দিন অবজার্ভ করে আপনার লোক সরিয়ে আমাদের লোক post করা হয়েছে। অল গেটস্ আর ক্লোজড। Today We have taken its complete charge. All are police personal except you! এতক্ষণ যা যা বলেছেন সব এখানে (ভ্যানিটি ব্যাগে টেপ রেকর্ডার দেখায়) টেপ করা আছে। আর আপনার মোবাইলটা প্লাস, বাড়তি পাওনা। (অন্যদের) মাই বয়েজ এন্ড গার্লস, কুল ডাউন, ক্লোজ, ক্লোজ

দ্য সারকিট। (সবাই মাহীকে পিস্তল উঁচিয়ে ঘিরে ধরে।)

মাহী : আমি মানে আমাকে !

মিতা : ইয়েস, ইউ আর আন্ডার এরেস্ট নাউ। কীপ সাইলেন্ট।
বাই দ্য বাই, আপনার ঐ মাহী নামের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া আসল নামটা যোগাড় করে ইন্টারনেটে আপনার ডিটেলস সার্চ করি। তখনই জীবনসঙ্গী ডট কম সার্চ করে আপনার প্রোফাইলটা দেখে এই প্লেনটা মাথায় আসে। বিয়ের সখটাই কাল হল আপনার। তাও আবার রবীন্দ্রনাথের আমলের অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। এসব আপনাকে মানায় নাকি। ছ্যা ছ্যা ছ্যা।

মাহী : বিশ্বাস করুন, আমি আমি মানে।

মিতা : আমি তো শুনেছিলাম আপনি নাকি খুবই ধূর্ত। অনেকদিন ধরে বারবারই পুলিশের জাল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছেন। মোবাইলের রেকডিং যদিও অন করে রেখেছিলাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফাঁদে পা দিয়ে হড়হড় করে সহজে নিজেই সব উগড়ে দেবেন, ভাবিনি। নিজের ফোনটাও এত সহজে বোকার মত আমার হাতে তুলে দেবেন তাও বিশ্বাস করিনি, আপনার পাস্ট রেকর্ড কিন্তু এরকম বলছে না। স্ট্রেঞ্জ ইন্ডিড !

মাহী : না আসলে আপনাকে আমি এরকম ভাবিনি। সত্যি আমি আপনাকে ---

মিতা : ওভার কনফিডেন্স ! হা হা হা। অভিনয়টা ভালই করি তাহলে, না ! আমাকে একেবারে সরল বোকাসোকা গাইয়া ভেবে নিজের গার্ডটা আলগা করে ফেলেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা সপে দিলেন, না ! হা হা হা হা।

মাহী : দেখুন, মানে আমি বিজনেস করি ঠিকই কিন্তু ড্রাগ কখনো নয় !

মিতা : ড্রাগের ব্যবসা করেন না ! হা হা হা।
কিসের ব্যবসা করেন তা তো আপনার রেকর্ডেড কলেই রয়েছে।

মাহী : সত্যি বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু খুবই আন্তরিকভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। এতে পারসোনাল নানা বিষয় হয়তো এসে গিয়েছে কিন্তু --

মিতা : এরকম একটা আলুভাতে মার্কা ব্যাকডেটেড বোগাস মেয়ে নোংরা লোক বলে অপমান করায়, নেশাখোর বলে রিজেক্ট করায় আপনার মেল-ইগো প্রবলভাবে আহত হয়ে গেল। আলগা গার্ড আর হার্ট হওয়া মেল-ইগো-ডেডলি কম্বিনেশন, তাই না ! আচ্ছা আজ তাহলে এই পর্যন্তই। পরে দেখা হবে। হ্যাঁ, আজ আপনি একটা বিরাট চাপ্টার খুলে দিলেন ! (উঠে)

মাহী : ম্যাডাম। ম্যাডাম শুনুন প্লিজ !

মিতা : হা হা হা ! অনেক কষ্টে আপনার মতো একজন ড্রাগ মাফিয়াকে জালে তুলতে পেরেছি। রিওয়ার্ড পাব কিনা জানি না তবে এটা বলতে পারি কাজটায় আমাদের

সোসাইটির অনেকে বেঁচে যাবে। (দীর্ঘশ্বাস)

মাহী : ম্যাডাম প্লিজ।

মিতা : জাল টা ক্লোজ করতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। থ্যাংকস ফর ইউর কোপারেশন। আপনার ড্রাগ ব্যবসার নেটওয়ার্কের মূল গোডাউনে এতক্ষণে রেড শুরু হয়ে গেছে। আমাকে ওখানে শিগগিরই যেতে হবে।

মাহী : ম্যাডাম! ম্যাডাম আমায় রক্ষা করুন প্লিজ আর জীবনে এই ব্যবসা করব না।

মিতা : হা হা হা। আমার লোকেরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে আপনাকে নির্দিষ্ট লক আপে নিয়ে যাবে। বাকি জীবনটা সেখানেই কাটান। হ্যাপি জার্নি, মিস্টার মহীতোষ! ওরফে মাহী। টেক কেয়ার! (ইঙ্গিত করে প্রস্থান)

মাহী : ম্যাডাম, ম্যাডাম!

(সব শিল্পী ও হোটেল বয়- সকলেই পুলিশের লোক। অনুসারী পোষাক। ওরা পিস্তল নিয়ে মাহীকে ঘিরে ধরে। ছেলে পুলিশ ওকে হাতকড়া লাগায়, মেয়ে পুলিশরা ইশারা করে ওকে এগোতে বলে। একবার মহীতোষ বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করে। ১ম মেয়ে পুলিশ কিছু না বলে জোরে ওর পেছনে একটা লাথি মারে।)

গল্পসূত্র - প্রিয়ংকর চক্রবর্তী

লেখক ঃ **বিভু ভট্টাচার্য,** ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যজন।

Playwright : **Bibhu Bhattacharjee, Man of Theatre. The Editor of this Journal.**

ত্রিপুরা থিয়েটার-এর 'জীবন সঙ্গী ডট্ কম' নাটকে শিল্পীবৃন্দ (২০২৩)

ত্রিপুরা থিয়েটার-এর সভাগৃহে বাংলাদেশের প্রতিনিধি

নাটকের শেষে কুমিল্লা, বাংলাদেশে ত্রিপুরা থিয়েটার-এর শিল্পীবৃন্দ

Tripura State Co-operative Bank Ltd.
(A Scheduled Bank)
Head Office | Post Office Chowmunhi
Agartala | Tripura | Pin 799001
E-mail: tripurascbltd@gmail.com | coopbankho@tscb.co.in
Website: www.tscbank.nic.in
শারদীয়া শুভেচ্ছা
Facilities Available:
Deposit Schemes with High Interest Rates
Locker Facility
Bank Gurantee for Contractors
e-Stamping Facility
Insurance Schemes (PMJJBY | PMSBY)
Pension Scheme (APY)
Loan Schemes:
Agri-Allied, MSME, Retail
Salary Loan | Car Loan
Home Loan
Very Low Rate of Interest (Fixed)
Digital Banking:
Mobile Banking (TSCB mBanking App UPI
RTGS | NEFT | IMPS | PFMS |
ATM Debit Cards, CTS, AePS, BBPS
130 BC Points with AePS enabled Micro ATM